বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস

(কায়স্থ কাণ্ড)

নগেন্দ্রনাথ বসু

বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস

কায়স্থ-কাণ্ড

সূচনা

জগতের মধ্যে যে জাতি যতদূর উন্নত, স্ব স্ব সামাজিক অবস্থা ও পদমর্য্যাদা যতটা উচ্চভাবে বুঝিতে সমর্থ, সেই জাতি সমাজের বিশুদ্ধি, বংশের গৌরব ও স্ব স্ব কুলগত সম্মান-রক্ষার দিকে ততদূর অগ্রসর হইয়াছে। তাঁহাদের আত্মমর্য্যাদা-রক্ষার নিদর্শনই বংশ ও কুলগত ইতিহাস-রক্ষা। সুপ্রাচীন আর্য্য-সমাজ স্মরণাতীত কাল হইতে জগতের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জাতি বলিয়া পরিগণিত, জগতের আদিগ্রন্থ বেদসংহিতায় সেই সুপ্রাচীন আর্য্য-সভ্যতার নিদর্শন বিদ্যমান। বেদসংহিতার নারাশংসী গাথায় যেরূপ ব্যক্তিগত আদি-ইতিহাসের বীজ নিহিত, বেদের ব্রাহ্মণাংশে ও কুলকীর্ত্তি-প্রসঙ্গে সেইরূপ বংশবিবরণ বিবৃত হইয়াছে। সুপ্রাচীন আর্য্যঋষিগণ কেবল রাজা বা রাজবংশের পরিচয় দিয়া ক্ষান্ত হন নাই,—বিভিন্ন বৈদিক-যুগের বিভিন্ন সমাজের ঋষিনামধারী মহাপুরুষ বা সমাজপতিগণের প্রসঙ্গে তাঁহাদের কুল বা বংশবিবরণও কীর্ত্তন করিতে বিস্মৃত হন নাই, নানা ব্রাহ্মণ-গ্রন্থে তাহার যথেষ্ট আভাস রহিয়াছে;—সামবেদের আর্ষেয় ও বংশব্রাহ্মণগ্রন্থে তাহার পূর্ণপরিচয় প্রকটিত।

বিবাহাদি মাঙ্গলিক উৎসব উপলক্ষ্যে অভিজাত আর্য্যসন্তানগণ স্ব স্ব কুলপরিচয় বা বংশেতিহাস কীর্ত্তন করিতেন, বৈদিক যুগ হইতেই তাহার সূচনা। রামায়ণে তাহার পরিপুষ্টি। রামায়ণরচনাকালেও বিবাহোৎসবে পূর্ব্ব-বংশাবলি কীর্ত্তিত হইত। রামসীতার বিবাহসভায় আমরা তাহার পূর্ণ-পরিচয় পাইয়াছি:—কুলপুরোহিত মহর্ষি বশিষ্ঠ বরপক্ষের এবং স্বয়ং রাজর্ষি জনক কন্যাপক্ষের আদ্যন্ত কুলকীর্ত্তন করিয়াছিলেন। বশিষ্ঠদেব শ্রীরামচন্দ্রের পূর্ব্বপুরুষগণের নাম আদ্যন্ত কীর্ত্তন করিলে রাজর্ষি জনক কৃতাঞ্জলিপুটে বলিয়াছিলেন,—

> "এবং ব্রুবাণং জনকঃ প্রত্যুবাচ কৃতাঞ্জলিঃ।
> শ্রোতুমর্হসি ভদ্রং তে কুলং নঃ পরিকীর্ত্তিতম্॥

প্রদানে হি মুনিশ্রেষ্ঠ কুলং নিরবশেষতঃ।
বক্তব্যং কুলজাতেন তন্নিবোধ মহামতে ॥" (রামায়ণ ১।৭১।১-২)

বশিষ্ঠ এই প্রকার বলিলে রাজা জনক কৃতাঞ্জলি হইয়া তাঁহাকে বলিলেন, হে মুনিশ্রেষ্ঠ! আপনার মঙ্গল হউক, আমি নিজেই আমার কুলকীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন। হে মহামতে! কন্যাদানকালে সদ্বংশজাত ব্যক্তির আদ্যন্ত কুলকীর্ত্তন করা উচিত, তাই আমি কীর্ত্তন করিতেছি, অবধান করুন।

জনকের উক্তি হইতেই নির্দ্দিষ্ট হইতেছে যে, রামায়ণ-রচনার পূর্ব্ব হইতেই বিবাহ-সভায় কুলকীর্ত্তনের ব্যবস্থা ছিল। ইহার কারণ প্রথমেই জানাইয়াছি।

আর্য্যসমাজে কেবল অভিজাত-বংশ বলিয়া নহে, আর্য্যসভ্যতা বিস্তারের সহিত সকল উচ্চবংশেই এই সনাতন প্রথা অনুসৃত হইয়াছিল। নানাধর্ম্মনৈতিক ও সামাজিক বিপ্লবে সেই সকল উচ্চ সভ্যতার নিদর্শন অধিকাংশ বিলুপ্ত হইলেও ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে তাহার যথেষ্ট আভাস পাইতেছি, তাই আদি মহাপুরাণসমূহে বংশ ও বংশানুচরিত-বর্ণনা মহাপুরাণের প্রধান অঙ্গ বলিয়া পরিগৃহীত হইয়াছে।

যখন ভারতের সর্ব্বত্রই জ্ঞানপ্রবণ বৌদ্ধ ও জৈন ধর্ম্মের সমাদর, তখনও জ্ঞানী বৌদ্ধ ও জৈনমাত্রই বংশ ও বংশানুচরিতের আবশ্যকতা বিস্মৃত হন নাই। বেদ ও রামায়ণে রাজবংশ ও ঋষিবংশের মধ্যেই বংশানুচরিতের উপযুক্ত সমাদর পরিলক্ষিত হইয়াছে, কিন্তু বৌদ্ধযুগে অভিজাত-আর্য্যসন্তান-মাত্রই বংশাবলীর আবশ্যকতা বুঝিয়াছিলেন এবং স্ব স্ব আচার্য্য বা গুরুপরম্পরা লিপিবদ্ধ করা অবশ্যকর্ত্তব্য মনে করিয়াছিলেন। তাই কে কোন্ বংশে জন্মিয়াছেন, কোথা হইতে কোথায় আসিয়াছেন, কে কাহার মতাবলম্বী, কে কাহার শিষ্য, কে কাহার পরিবারভুক্ত, এই সকল পরিচয় অতিযত্নে রক্ষা করিয়া আসিয়াছেন, নানা প্রাচীন গ্রন্থে, নানা শিলালেখ ও তাম্রশাসনে তাহার সন্ধান পাইতেছি।

বিবাহসভায় বরপক্ষে কুলপুরোহিতের এবং কন্যাপক্ষে স্বয়ং কন্যাকর্ত্তার আদ্যন্ত কুলপরিচয়-কীর্ত্তন প্রয়োজন হইত বলিয়াই প্রত্যেক আর্য্যসন্তানকে স্ব স্ব বংশাবলী রক্ষা করিতে হইত, এই কারণে ভারতের সর্ব্বত্রই পূর্ব্বকালে কুলপরিচয়-রক্ষার যথেষ্ট সমাদর ও আগ্রহ ছিল; তাই রাজাধিরাজ হইতে উচ্চ নীচ সকল আর্য্যসন্তানই স্ব স্ব পূর্ব্ব-পুরুষগণের বংশ ও কুলপরিচয় মুখস্থ করিয়া রাখা জাতীয় কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করিতেন।

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এই তিন বর্ণ লইয়া আর্য্যসমাজ। এই বর্ণত্রয়ের অন্তর্গত যে জাতি, যে কুল বা যে পরিবার শিক্ষায়-দীক্ষায়, আচারে-ব্যবহারে, আভিজাত্যে ও পদমর্য্যাদায় প্রাধান্যলাভ করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যেই কুলপরিচয়-রক্ষার বেশী যত্ন ও আগ্রহ দেখা গিয়াছে। আবার ধর্ম্ম বা সমাজ-বিপ্লবে যাঁহাদের আচার-বৈলক্ষণ্য ঘটিয়াছে, আভিজাত্যে যাঁহারা হীন হইয়া পড়িয়াছেন, অবস্থাগতিকে কুলপরিচয়-রক্ষায় স্বভাবতঃই

তাঁহাদের ঔদাসীন্য বা আলস্য আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। এক সময়ে যে সকল প্রথিত বংশের কুলগৌরব সমাজে বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল, শেষোক্ত কারণে তাঁহাদের বংশধরগণ পূর্ব্বগৌরবের নিদর্শন পূর্ব্ববংশানুচরিত ও বংশক্রম হারাইয়া সমাজে ক্রমশঃ খর্ব্বতালাভ করিয়াছেন, কোথাও বা অজ্ঞাতকুলশীল বলিয়া সমাজে অবজ্ঞাত হইয়াছেন। সুতরাং বুঝিতে হইবে যে, বংশক্রম-রক্ষাই আর্য্যসমাজের বিশেষত্ব বা আর্য্যত্ব। যে বংশে বা পরিবারে যত অধিক কুলক্রম বা বংশানুচরিত রক্ষিত হইয়াছে, তাঁহারা আর্য্যসমাজে এক সময়ে তত অধিক সম্মানিত ও উন্নত ছিলেন বলিয়া প্রতিভাত হয়।

তাই সকল প্রাচীন আর্য্যশাস্ত্র হইতে স্থিরীকৃত হইতেছে যে, বংশক্রম-রক্ষা আর্য্যসমাজের বিশেষত্ব। যাঁহারা বংশক্রম-রক্ষায় আবহমান কাল উদাসীন, যে সমাজে কোন ব্যক্তি ধারাবাহিক কুলপরিচয় দিতে অক্ষম, যাঁহাদের মধ্যে কোন কালে কুলপরিচয় রক্ষা বা কুলকীর্ত্তি-ঘোষণা করিবার জন্য উপযুক্ত কুলজ্ঞ বা কুলাচার্য্য নিযুক্ত হন নাই, সেই সমাজ কখনই প্রকৃত আর্য্যসমাজ নহে, তাহাই প্রকৃত শূদ্র বা অনার্য্য-সমাজ বলিয়া পরিগণিত।

বর্ত্তমান বৈজ্ঞানিক ও মানবতত্ত্ববিদ্‌গণের মধ্যে বঙ্গীয় আর্য্যসমাজ সম্বন্ধে বিবিধ যুক্তি ও মতবাদ উপস্থিত হইয়াছে। পাশ্চাত্যগণের মধ্যে অনেকেই বলিতে প্রস্তুত যে, গৌড়-বঙ্গের অভিজাতগণ বহুদিন হইতে আর্য্যশোণিত-সম্বন্ধ-বিচ্যুত হইয়াছেন, তাঁহারা এখন দ্রাবিড়ীয় শোণিত-সংস্রবে দ্রাবিড়-জাতির একতম শাখা বলিয়া গণ্য। আবার কেহ কেহ বলিতে চাহেন যে, প্রাচ্য অর্থাৎ গৌড়-বঙ্গবাসীর আর্য্যত্বের দাবী করিবার কিছুই নাই। এমন কি, কোন কোন মহাত্মা মাপ-কাটী দিয়া মাপিয়া জুখিয়া বলিতে চান যে, বর্ত্তমান বঙ্গবাসিগণ অভিজাত ঋষি বা আর্য্যবংশধর বলিয়া পরিচয় দিবার চেষ্টা করিলেও প্রকৃত প্রস্তাবে তাঁহারা মোঙ্গলীয়-দ্রাবিড়ীয় অথবা দ্রাবিড়-লৌহিত্য বংশসম্ভূত। বাস্তবিক কি তাই? আমরা বহুদিন হইতে দেখিয়া আসিতেছি যে, পশ্চিম-ভারত হইতেই আর্য্য-সভ্যতা প্রাচ্য-ভূমে প্রসারিত হইয়াছে। বেদ তাহার সাক্ষ্য দিতেছে, রামায়ণ, মহাভারত ও পুরাণাদিতে তাহার দৃষ্টান্ত রহিয়াছে, পালী ও প্রাকৃত ভাষায় রচিত জৈন ও বৌদ্ধ প্রাচীন গ্রন্থসমূহে তাহার ভূরি ভূরি আখ্যায়িকা বিবৃত হইয়াছে। সুপ্রাচীন শিলালিপি ও তাম্রশাসনসমূহও তাহার সাক্ষ্যদান করিতেছে। অতি প্রাচীনতম কাল হইতে যে রেখাপাত ঘটিয়াছে, পরবর্ত্তিকালে ক্রমশঃই তাহার উজ্জ্বলতা বৃদ্ধি পাইয়াছে। সুতরাং কিরূপে বলিব যে, আর্য্য-বুদ্‌বুদ্‌ দ্রাবিড়-সমুদ্রে বিলীন হইয়াছে। কেবল পূর্ব্বোক্ত সংস্কৃত ও পালি গ্রন্থ এবং লেখাদি বলিয়া নহে, অধুনাতন বঙ্গের অভিজাত-বংশগণের পূর্ব্বকুলপরিচায়ক কুলশাস্ত্রসমূহেও আর্য্যসভ্যতার লীলাস্থলী পশ্চিমভারত হইতেই তাঁহাদের বীজপুরুষগণের গৌড়াগমন স্থিরীকৃত হইয়াছে। কে কোথা হইতে আসিলেন, কিরূপে তাঁহারা গৌড়বাসী হইলেন, কি জন্য তাঁহারা রাজসম্মান লাভ করিলেন,

তাঁহাদের প্রত্যেকের বংশধরগণ কি জন্য কোথায় কি ভাবে বাস করিলেন—কোন্ কোন্ বংশের সহিত তাঁহারা সম্বন্ধসূত্রে আবদ্ধ হইয়াছিলেন, তাঁহাদের অধস্তন কোন্ সন্তান হইতে কোন্ সমাজের উৎপত্তি ও বিস্তৃতি সাধিত হইয়াছিল, তাঁহাদের মধ্যে কে সমাজপতি, কে গোষ্ঠীপতি, কে সভাপতি, কে দলপতি হইয়াছিলেন? কি ভাবে তাঁহারা ঐ সকল সামাজিক উচ্চাসন লাভ করিয়াছিলেন, কিরূপে তাঁহারা সমাজে প্রভুত্ব-বিস্তারে সমর্থ হইয়াছিলেন, সমাজের নিকট তাঁহারা কতটা দায়ী, এবং সমাজ তাঁহাদের নিকট কতটা ঋণী;—আবার অভিজাতগণের মধ্যে কে সমাজসংস্কারক এবং কে সমাজবিধি উল্লঙ্ঘনকারী, উচ্চনীচ শোণিত-সংস্রবে কাহার উত্থান ও কাহার পতন হইয়াছে, সমাজে কাহার বংশ কুলদীপক বলিয়া সম্মানিত, আবার কাহার বংশ কুলাঙ্গার বলিয়া অবজ্ঞাত হইয়াছে; এইরূপ সমাজের প্রত্যেক অঙ্গের বিশেষ পরিচয় যখন ধারাবাহিকরূপে আমাদের কুলশাস্ত্রে রহিয়াছে, তখন এরূপ অসংখ্য নজীর থাকিতে কে এমন অন্ধ যে বলিবে, 'আমরা আর্য্য-সন্তান নহি?' এরূপ স্থলে ইংরাজ-মানবতত্ত্ববিদের বৈজ্ঞানিক মাপকাটী কখনই গ্রাহ্য হইতে পারে না। তাঁহাদের মনগড়া কথায় মুগ্ধ হইলে চলিবে না। বঙ্গের জাতীয় ইতিহাসের ব্রাহ্মণকাণ্ডে আমি দেখাইয়াছি, কি বারেন্দ্র, কি রাঢ়ীয়, কি বৈদিক, কি শাকদ্বীপী, কি জ্যোতিষ, সকল শ্রেণির ব্রাহ্মণের বীজপুরুষগণ কেহই গৌড়বঙ্গের আদি-অধিবাসী নহেন, সকলেই উত্তরপশ্চিম-প্রদেশ হইতে এদেশে সমাগত, সকলের ধমনীতেই আর্য্যশোণিত প্রবাহিত। এ দেশের জল-বায়ু ও আহার-ব্যবহারের গুণে অনেক স্থলে তাঁহাদের বংশধরগণের মধ্যে আর্য্য-কান্তির অভাব হইলেও তাঁহারা যে প্রকৃত আর্য্যসন্তান, কুলশাস্ত্রসমূহই তাহার যথেষ্ট ও প্রকৃষ্ট প্রমাণ। স্বীকার করি, নানাপ্রকার সমাজ, ধর্ম্ম ও রাজনৈতিক বিপ্লবে এবং আনুষঙ্গিক নানাকারণে তাঁহাদের মধ্যে দুই একস্থলে আর্য্যেতর শোণিত সংক্রামিত না হইয়াছে, এমন নহে; কিন্তু সমুদ্রে বারিবিন্দুবৎ তাহাতে বিরাট্ আর্য্যসমাজকে কলুষিত করিতে পারে নাই এবং এই সামান্য কারণে এখানকার আর্য্যসমাজকে অনার্য্য-ভাবাপন্ন বলিতে প্রস্তুত নহি।

বঙ্গের বিভিন্ন ব্রাহ্মণসমাজের ন্যায় এখানকার কায়স্থসমাজও অতি বিশাল। বঙ্গীয় কায়স্থগণের মধ্যেও প্রধানতঃ চারিশ্রেণী, আবার প্রত্যেক শ্রেণীর মধ্যে বহু অবান্তর শাখা, বহু থাক ও বিভিন্ন সমাজ আছে। তাঁহাদের সকলের বিস্তৃতভাবে কুলপরিচয় দিবার উপযোগী শত শত কুলগ্রন্থ বিদ্যমান। তাঁহাদের বীজপুরুষগণ অনার্য্যবহুল অথবা দ্রাবিড়ীয় প্রভাব-সম্পন্ন প্রাচ্য-গৌড়ে আসিয়া, পাছে তাঁহাদের আর্য্যোচিত আচার-ব্যবহার বিস্মৃত হন, পাছে তাঁহাদের আর্য্যশোণিতে ইতরশোণিত সংক্রান্ত হয়, পাছে তাঁহাদের বর্ণ ও জাতিগত-স্বাতন্ত্র্য বা নিজস্ব হারাইয়া যায়, এজন্য তাঁহারা প্রথম হইতেই বিশেষ সতর্ক—বিশেষ সাবধান ছিলেন। এজন্যই তাঁহারা এদেশে আসিয়া সহসা কাহারও সহিত সম্বন্ধসূত্রস্থাপনে সাহসী হন নাই। একজাতি, একবর্ণধর্ম্মী, একাচারী ও একবিধ রীতিনীতি যাহাদের মধ্যে বিদ্যমান ছিল,

তাঁহারাই পরস্পর যৌনসম্বন্ধ করিতেন এবং তাঁহাদের পরস্পরকে লইয়াই এক একটী স্বতন্ত্র শ্রেণী ও এক একটী স্বতন্ত্র সমাজ গঠিত হইয়াছিল। ঈর্ষা, বিদ্বেষ বা দলাদলী লইয়া অল্পদিন হইতে বিভিন্ন থাক বা দলের উৎপত্তি ঘটিলেও স্ব স্ব স্বাতন্ত্র্য-রক্ষা বা আর্য্যত্ব-রক্ষার জন্যই যে গৌড়বঙ্গের কায়স্থসমাজে প্রথম বিভিন্ন শ্রেণী ও সমাজ গঠিত হইয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। তাঁহারা স্ব স্ব জাতীয়তা বা আর্য্যত্ব-রক্ষার জন্যই ধারাবাহিক কুলপরিচয় বা সম্বন্ধগ্রন্থরক্ষার ব্যবস্থা করিয়া আসিয়াছেন। বৌদ্ধ, জৈন বা ব্রাহ্মণ্য প্রভাবকালে এবং নানা বৈদেশিক ও বিধর্ম্মীর সংস্রবে তাঁহারা এই সনাতন-প্রথা ত্যাগ করিতে পারেন নাই। তাঁহারা জানিতেন, যখন তাঁহারা স্ব স্ব অংশ বংশের স্মৃতি হারাইবেন, যখন এই সনাতন-পদ্ধতি বিস্মৃত হইবেন, তখন তাঁহাদের আদি-গৌরবের সূত্র খর্ব্ব হইবে, তাঁহাদের জাতিগত, সমাজগত ও ব্যক্তিগত বিশেষত্ব নষ্ট হইবে। তাই তাঁহারা স্ব স্ব সম্বন্ধী আত্মীয়স্বজনেরও নামধাম রক্ষা করিয়া গিয়াছেন।

এদেশের ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ উভয় জাতির সুপ্রাচীন কুলগ্রন্থে লিখিত আছে যে, গৌড়াধিপ বল্লালসেনের কুলবিধি-প্রবর্ত্তনের সঙ্গে কুলাচার্য্য-নিয়োগের ব্যবস্থা হয়। তৎপূর্ব্বে প্রত্যেক সমাজে কুলপুরোহিত ও কুলবৃদ্ধগণ কুলপরিচয় লিখিয়া রাখিতেন এবং প্রধানতঃ ভাটগণই কুলমহিমা কীর্ত্তন করিতেন, এ প্রথা অদ্যাপি একবারে বিলুপ্ত হয় নাই। এখনও কোন কোন সমাজে কোন কোন বয়োবৃদ্ধ নিজের এবং আত্মীয়স্বজনের কুলপরিচয় লিখিয়া রাখেন এবং এই কার্য্য জাতীয় গৌরবজনক বলিয়া বিশ্বাস করেন। ইহা সেই পূর্ব্বতন সার্ব্বজনিক প্রথার ক্ষীণস্মৃতি-মাত্র। প্রকৃত-প্রস্তাবে কুলাচার্য্যনিয়োগের সঙ্গে এক দিকে যেমন কুলীন-সমাজের সবিস্তার কুলপরিচয়-রক্ষার সুবিধা হইল, অপর দিকে অকুলীন-সমাজের পক্ষে তাহাতে বিপরীত ফল ফলিল। পূর্ব্বে যাঁহারা কুলপরিচয় লিখিয়া রাখা অবশ্যকর্ত্তব্য বলিয়া মনে করিতেন, এখন কুলাচার্য্যগণ সেই ভার গ্রহণ করায় তাঁহারা ক্রমে ক্রমে একে একে সকলেই ঔদাসীন্য অবলম্বন করিলেন। তাঁহাদের দেখা-দেখি অকুলীন সমাজও তাঁহাদের অনুবর্ত্তী হইলেন। ফলে এই দাঁড়াইল যে, কুলাচার্য্যগণ যাঁহাদের বংশ ও অংশ লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিলেন, তাঁহা-দেরই ধারাবাহিক কুলপরিচয় রহিয়া গেল, আর যাঁহারা বাদ পড়িলেন, তাঁহারা ক্রমে সমাজে পূর্ব্বস্থান-চ্যুত হইলেন,—বংশগত পূর্ব্বমর্য্যাদাও কতকটা হারাইলেন।

বিভিন্ন শ্রেণির বহুসংখ্যক কুলগ্রন্থ আলোচনা করিয়া বুঝিয়াছি যে, যে সকল সমাজ বল্লালী-কুলপ্রথা স্বীকার করেন নাই, সে সকল সমাজও কিছু দিন পরে স্ব স্ব সমাজে বল্লালী-কুলপ্রথার অনুকরণে কুলবিধি চালাইয়া ছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে প্রবীন প্রধান কুলীনেরাই স্ব স্ব কুলপরিচয় আদ্যন্ত রক্ষা করিয়া আসিলেও, কুলীন সমাজের সুবিধা হইবে ভাবিয়া তাঁহাদের মধ্যেও কুলাচার্য্য নিযুক্ত হইল এবং বল্লালী-কায়স্থসমাজের ন্যায় তাঁহাদের মধ্যেও অবশ্যম্ভাবী ফল ফলিয়া গেল।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, পূর্ব্বকালে আর্য্যগণের বিবাহসভায় বরপক্ষে কুলপুরোহিত ও কন্যা-পক্ষে স্বয়ং কন্যাকর্ত্তা কুলপরিচয় দিতেন। সম্ভ্রান্ত ও মান্যগণ্য ব্যক্তির গৃহে বিবাহকালে ও

শ্রাদ্ধাদি বৃহৎ ব্যাপারে ভাটগণ আসিয়া কর্ম্মকর্ত্তার গুণানুকীর্ত্তন করিতেন। কিন্তু বল্লালী-সমাজে এবং তাঁহার অনুবর্ত্তী অপরাপর সমাজেও কুলাচার্য্যনিয়োগের পর তাহার ব্যতিক্রম ঘটিল। ভাটের কার্য্য কতকটা অব্যাহত থাকিলেও কুলপুরোহিত ও কন্যাকর্ত্তা স্ব স্ব কর্ত্তব্য কুলাচার্য্যের উপর দিয়া কতকটা নিশ্চিন্ত হইলেন। পূর্ব্বপ্রথা এককালে বিলুপ্ত না করিয়া বিবাহকালে উভয়পক্ষে তিনপুরুষের মাত্র পরিচয় দিবার ব্যবস্থা রহিল। আর্য্য-সমাজে সগোত্রে বিবাহ নিষিদ্ধ ছিল, এ কারণ বিবাহস্থলে উভয়পক্ষে তিনপুরুষের নামোচ্চারণকালে গোত্রপ্রবর-উচ্চারণের প্রথা থাকিয়া গেল। আজও এই নিয়ম চলিয়া আসিতেছে।

কুলাচার্য্যগণের উপর কুলপরিচয়-রক্ষা ও সম্বন্ধনির্ণয়ের ভার পড়িলে, সমাজে সুফল ও কুফল দুই দেখা দিল। সামাজিক ও পারিবারিক গৌরবরক্ষার জন্য প্রত্যেক পরিবারের কার্য্যকলাপের উপর দৃষ্টি রাখাই যখন কুলাচার্য্যগণের একমাত্র উপজীবিকা ও কর্ত্তব্যকার্য্য হইল, তখন তাঁহারা প্রত্যেক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির বংশাবলি, আদান-প্রদান ও পরিচয়াদি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে লিখিয়া রাখিতে লাগিলেন, তাহাতে একস্থানে সম্ভ্রান্ত সমাজের সম্যক্ পরিচয় পাইবার সুযোগ হইল, সামাজিকমাত্রেই স্ব স্ব কুলমর্য্যাদা রক্ষার জন্য সাধ্যমত যত্নবান্ হইলেন। —পাছে কোন কাজে দোষ বাহির হইয়া পড়ে—পাছে তাহা প্রস্তররেখাবৎ চিরদিনের জন্য লিপিবদ্ধ হয়, এই আশঙ্কায় সকলেই বিশেষ সতর্ক হইলেন, এমন কি, অনেকেই কুলাচার্য্যের মুখাপেক্ষী হইয়া পড়িলেন। তাই একদিন গৌড়বঙ্গের ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ এই উভয় আর্য্যসমাজেই কুলাচার্য্যের যথেষ্ট প্রতিপত্তি ও প্রভাব বৃদ্ধি হইয়াছিল ; এমন কি, একদিন তাঁহারাই সমাজের নিয়ামক ও ভাগ্যবিধাতা হইয়া পড়িয়াছিলেন। তাঁহাদের আদেশ বা অনুরোধ অবজ্ঞা করিবার কাহারও সাধ্য ছিল না। তাঁহারা প্রত্যেক বিবাহসভায় উপস্থিত থাকিতেন,—একদল সংস্কৃত-ভাষায় সংক্ষেপে, আর একদল প্রচলিত বাঙ্গালা ভাষায় বিস্তৃতভাবে উচ্চৈঃস্বরে অংশ, বংশ ও দোষগুণ গান করিতেন। সহস্র সহস্র ব্যক্তি আত্মহারা হইয়া ভক্তিভাবে সেই কুলকাহিনী শুনিতেন। আমাদের দৈনন্দিন ক্রিয়াকলাপে যেমন পঞ্জিকা দেখা আবশ্যক হয়,—পঞ্জিকায় অতি সংক্ষেপে যেমন প্রত্যেক দিনকৃত্য ও অনুষ্ঠানাদি লিখিত থাকে, সেইরূপ প্রত্যেক পরিবারের প্রত্যেক ব্যক্তির অংশ বংশ ও করণীয় সামাজিক কুলনিয়মাদি যাহাতে লিখিত হইত, তাহাই 'কুলপঞ্জিকা' নামে কথিত হইয়াছে। যে সকল শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণ বা কায়স্থ সমাজতত্ত্ব ও কুলপরিচয় রক্ষা করিতেন, তাঁহারাই 'কুলাচার্য্য' বা 'ঘটক' নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছিলেন। ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ উভয়জাতির কুলগ্রন্থেই লিখিত আছে—

"অংশং বংশং তথা দোষং যে জানন্তি মহাজনাঃ।
ত এব ঘটকা জ্ঞেয়া ন নামগ্রহণাৎ পুনঃ॥"

যে মহাজনগণ আদান-প্রদানাদি সম্বন্ধনির্ণয়, পূর্ব্বাপর বংশাবলি এবং প্রত্যেক কুলের দোষ অবগত আছেন, তাঁহারাই প্রকৃত ঘটক, কেবল ঘটক নাম লইলেই ঘটক হয় না। প্রত্যেক সামাজিক ব্যাপারে ঘটক বা কুলাচার্য্য এবং সেই সঙ্গে কুলপঞ্জিকার আবশ্যক হইত।

সামাজিক উৎসবকালে, প্রধানতঃ বিবাহসভায় সকলকে ডাকিয়া গান করিয়া যে কুলগাথা শুনান হইত, তাহা "ডাক" নামে পরিচিত। এক সময়ে আমাদের সমস্ত কায়স্থসমাজে এরূপ শত শত "ডাক" সুপ্রচলিত ছিল। অধিকাংশস্থলে কুলপঞ্জিকাগুলি সাধারণের অধিগম্য ছিল না, কুলাচার্য্যগণের অনেকটা নিজস্ব ও আয়ত্তাধীন ছিল, বিশেষ প্রয়োজন ব্যতীত তাহাতে অপরের সাক্ষাৎ সম্বন্ধ ঘটিত না। কিন্তু "ডাক"গুলি অনেকটা সাধারণ-সম্পত্তি। কি ভাষার প্রাচীনতায়, কি সমাজ-সমালোচনায়, কি পারিবারিক ও ব্যক্তিগত ইতিহাসের গঠনে এই ডাকগুলি আমাদের সর্ব্বাপেক্ষা আদরের গাথা। তাহাতে আমাদের কুলীন-মৌলিক সকল সমাজের সংক্ষিপ্ত কুলপরিচয় গ্রথিত। একদিন বাঙ্গালার বিরাট্ কায়স্থসমাজের সর্ব্বত্রই আমাদের মাতৃভাষায় রচিত এই ডাকগুলি সবিশেষ সমাদৃত ছিল। পরবর্ত্তী কালে সেই সুপ্রাচীন ডাকগুলির আদর্শে বা অনুকরণে আধুনিক ডাক, ডাকুর, ঢাকুর বা ঢাকুরী অভিধেয় কুলগ্রন্থগুলি রচিত হইয়াছে। শেষোক্ত ঢাকুর বা ঢাকুরীগুলির সমধিক প্রচলনে বাঙ্গালা-সাহিত্যের আদি-নিদর্শন ডাকগুলির অধিকাংশই বিলুপ্তপ্রায়,—বলিতে কি অপরাপর কায়স্থসমাজে সেই সকল সুপ্রাচীন ডাকের স্মৃতি-পর্য্যন্ত নাই, কিন্তু আমাদের নিতান্ত সৌভাগ্যের বিষয় বলিতে হইবে যে, আমাদের রক্ষণশীল উত্তররাঢ়ীয় কায়স্থসমাজ হইতে অদ্যাপি ডাকের স্মৃতিলোপ ঘটে নাই। সৌভাগ্যক্রমে উত্তররাঢ়ীয় সমাজের বহুসংখ্যক কুলগ্রন্থের সহিত কয়েকখানি ডাকও আমার হস্তগত হইয়াছে। কুলপঞ্জিকা অপেক্ষা ডাকগুলির প্রাধান্য দেখাইতেছি কেন? তাহার কারণ, ডাকগুলি আমাদের বাঙ্গালা-ভাষার অতি পুরাতন অবস্থার সম্পত্তি,—ডাক-গাথা সর্ব্ব-সমক্ষে গীত হইত বলিয়া ও সকলের আলোচনার বিষয় ছিল বলিয়া ইহার মধ্যে প্রকৃত ইতিহাস স্থানলাভ করিয়াছে,—মিথ্যা প্রবেশ করিতে পারে নাই। তাই আমি বলিতেছি যে, এ গুলি আমাদের বিশেষ পূজার সামগ্রী। এই ডাকগাথার অনুকরণে শতাধিক বর্ষ পূর্ব্বে যে সকল ঢাকুর রচিত হইয়াছে, তাহাতেও সেই পূর্ব্ব সমাজচিত্র—অংশ ও বংশের প্রকৃত আলেখ্য—সেই পূর্ব্বতন রচনারই ক্রম রক্ষিত হইয়াছে। সুখের বিষয়, গৌড়বঙ্গের সকল কায়স্থসমাজ হইতেই এরূপ শতাধিক ঢাকুর সংগৃহীত হইয়াছে। ডাকগাথার ন্যায় এই ঢাকুর-গুলিও এক সময়ে সভামণ্ডপে কবির সুরে গীত হইত, কুলাচার্য্যগণ দলবদ্ধ হইয়া সমস্বরে এই ঢাকুর গান করিতেন। রাজস্থানের ইতিহাসে ভাট ও চারণগণের গ্রথিত রাজপুত-কীর্ত্তিগাথার পরিচয় পাইয়াছেন, আমাদের চারণরূপী কুলাচার্য্যগণও সেইরূপ কুলগাথা গান করিতেন। আদি ডাক ও তৎপরবর্ত্তী ঢাকুরসমূহে আমাদের সেই জাতীয় গানই লিপিবদ্ধ হইয়াছে, সুতরাং এ গুলি আমাদের কত আদরে কত যত্নে রক্ষিতব্য অমূল্যরত্ন, তাহা সহজেই বুঝিতে পারেন।

প্রথমতঃ সমাজতত্ত্বজ্ঞ জ্ঞানী ও ধার্ম্মিক ব্যক্তিই কুলাচার্য্যপদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন, উপযুক্ত পদে যোগ্য ব্যক্তি অধিষ্ঠিত হওয়ায় তাঁহারা সমাজস্থ সকলের শ্রদ্ধা, ভক্তি ও সমাদরের পাত্র হইয়াছিলেন। তাঁহারা নিরপেক্ষভাবে সমাজের দোষগুলি সমালোচনা করিতেন,—

নিরপেক্ষভাবে প্রত্যেক সমাজের কুলমর্য্যাদা বা সামাজিক আসন নির্দ্দেশ করিয়া দিতেন। সকল বিষয়ে তাঁহারা সমাজপতিগণের দক্ষিণহস্ত-স্বরূপ ছিলেন। এ কারণ সমাজ ও আর্য্য ধর্ম্মরক্ষার্থ যে সকল কুলগ্রন্থ রচিত হয়, তাহা "কুলশাস্ত্র" বলিয়া পরিগৃহীত হইয়াছিল। আচার্য্য যেমন আর্য্যসমাজের ধর্ম্ম-বিষয়ে উপদেষ্টা, সেইরূপ যে সকল মহাত্মা কুল-বিষয়ে উপদেষ্টা ছিলেন, তাঁহারাই "কুলাচার্য্য" আখ্যায় সম্মানিত হইয়া ছিলেন।

আর্য্যসমাজে ব্রাহ্মণই এক মাত্র আচার্য্য, কিন্তু কায়স্থ-কুলীন-সমাজে ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ উভয়েই 'কুলাচার্য্য' পদ লাভ করেন। যতদিন তাঁহারা ধর্ম্ম ভাবিয়া সমাজ-সেবায় জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন, ততদিন আর্য্য-কায়স্থ-সমাজের আর্য্য-গৌরব অক্ষুণ্ণ ছিল, ততদিন কুলধর্ম্ম ও সদাচার পরিত্যাগ করিতে কেহই সাহসী হন নাই, ততদিন উজ্জ্বল-প্রভামণ্ডিত সূর্য্যের ন্যায় কুলীন-সমাজও প্রতিভা-মণ্ডিত এবং জাতীয় গৌরব-রক্ষায় তৎপর ছিলেন;—কিন্তু যে দিন হইতে কলিযুগের কালমাহাত্ম্যগুণে কুলাচার্য্য-সমাজে স্বার্থপরতা সমুদিত হইল, অপণ্ডিতের হস্তে কুলশাস্ত্র-রক্ষার ভার পড়িল, সেই দিন হইতেই কায়স্থ-সমাজের ভাগ্যচক্র পরিবর্ত্তিত হইতে চলিল। সদাচারী নিঃস্বার্থ কুলপণ্ডিতগণের কথা বলিতেছি না, কিন্তু অপণ্ডিত কুলজ্ঞগণ স্বার্থের মোহিনী মায়ায় বিমুগ্ধ হইয়া অনেকটা দোষান্বেষী হইয়া পড়িলেন। যেখানে তাঁহাদের স্বার্থে ব্যাঘাত হইবার সম্ভাবনা হইয়াছে, সেখানেই তাঁহারা তাঁহাদের জাতীয় কর্ত্তব্য ভুলিয়া কুলে কলঙ্ক আরোপ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁহাদের হস্তে কত উচ্চ বংশ কলঙ্কের পঙ্কিল সলিলে নিমজ্জিত হইয়াছেন, কত সম্ভ্রান্ত বংশের কুলপরিচয় নষ্ট হইয়াছে, এমন কি, তাঁহাদেরই হস্তে কায়স্থ-সমাজের উপর শূদ্রত্বারোপরূপ বিষময় শেল নিক্ষিপ্ত হইয়াছে। কুলীন-সমাজ মানসম্ভ্রম ও কুলমর্য্যাদা-রক্ষার ভয়েই তাঁহাদের অসঙ্গত দাবী দাওয়া রক্ষা করিয়া চলিতেন, কাজেই তাঁহারা ঐ সকল কুলজ্ঞের নিকট উপেক্ষিত হইলেন না। কিন্তু মৌলিক সমাজ বরাবরই কুলজ্ঞদিগকে সন্দেহের চক্ষে দেখিতেন, কুলীনগণের ন্যায় তাঁহারা কুলজ্ঞগণের ততটা সম্মান রাখিতেন না। পূর্ব্বতন কুলাচার্য্যগণ আর্য্যধর্ম্মরক্ষার ব্যবস্থানুসারে ও সম্বন্ধনির্ণয়ের সুবিধার জন্য মৌলিকগণেরও কুলপঞ্জিকা লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিতেন, কিন্তু পরবর্ত্তী আধুনিক অপণ্ডিত কুলজ্ঞগণ মৌলিকগণের পরিচয়-রক্ষায় তাঁহাদের বিশেষ স্বার্থ নাই ভাবিয়া মৌলিকগণকে এককালে উপেক্ষা করিলেন। এই সময় হইতেই মৌলিকগণের বংশপরিচয় বিলুপ্ত হইবার উপক্রম হয়; তাই এখন পর্য্যন্ত কুলীনগণের রীতিমত বংশাবলি পাইবার যথেষ্ট সুবিধা থাকিলেও মৌলিকগণের আদ্যোপান্ত বংশাবলি সংগ্রহের যথেষ্ট অসুবিধা ঘটিয়াছে। বলিতে কি, এক্ষণে উপযুক্ত ও সুপণ্ডিত কুলাচার্য্যগণের অভাবে এবং প্রকৃত সমাজতত্ত্বানভিজ্ঞ ও জাতীয় কর্ত্তব্যজ্ঞান-পরিশূন্য কুলজ্ঞের হস্তে কায়স্থসমাজ উপযুক্ত মর্য্যাদা ও উপযুক্ত ব্যবস্থা না পাওয়াতেই কুলশাস্ত্র ও কুলজ্ঞের হতাদর ঘটিয়াছে। তাই এক সময়ে কায়স্থসমাজের সর্ব্বত্রই যাঁহাদের গতিবিধি ছিল,—কুলীনসমাজে যশোমণ্ডিত ও প্রপূজিত হইয়া যাঁহারা সমাজের দক্ষিণহস্তস্বরূপ

বিরাজ করিতেন, আজ তাঁহাদের সে সম্মান, সে প্রতিপত্তি, সেরূপ গতিবিধি দেখা যায় না; এখন সকল সমাজেই যেন তাঁহারা অতি মহার্ঘ্য হইয়া পড়িয়াছেন। পূর্ব্বে বংশপরম্পরায় যাঁহারা কুলপরিচয় ও কুলশাস্ত্র রক্ষা করিয়া আসিতেন, তাঁহাদের বংশধরগণ সকলেই প্রায় একে একে সমাজের সেই গরীয়সী ও মহীয়সী বৃত্তি পরিত্যাগ করিয়াছেন! তাঁহাদের বৃত্তিলোপ ও তাঁহাদের বংশলোপের সহিত আমাদের জাতীয়-গৌরবদ্যোতক সহস্র সহস্র কুলগ্রন্থ বিলুপ্ত হইয়াছে—প্রত্যেক সমাজে এখনও দুই এক জন কুলজ্ঞ-বংশধর সেই অতীতের মহাশ্মশানে যেন নির্ব্বাণোন্মুখ বহ্নির ন্যায় বিরাজ করিতেছেন!

কেবল যে কুলাচার্য্যদিগের দোষে আজ আমাদের জাতীয় গৌরবস্মৃতি বিস্মৃতিসলিলে বিলুপ্ত হইবার উপক্রম হইয়াছে, তাহা নহে। কায়স্থসমাজের ঔদাসীন্যই এই বিরাট্ প্রলয়-কাণ্ডের মূল কারণ। যদি কায়স্থ-সমাজ মনে করিতেন, তাহা হইলে অনায়াসেই কুলাচার্য্য ও কুলশাস্ত্ররক্ষার ব্যবস্থা করিতে পারিতেন। কায়স্থসমাজের অধঃপতন ও আত্মবিস্মৃতিই কুলপরিচয়-বিলোপের অন্যতম কারণ। কায়স্থসমাজের ইতিহাস-প্রসঙ্গে সেই বিরাট্ আত্ম-বিস্মৃতির কাহিনী বিবৃত করিবার চেষ্টা পাইয়াছি।

যাহা হউক, এই অপূর্ব্ব আত্মবিস্মৃতির দিনেও আমি বহু চেষ্টায় প্রায় তিন শত কুলগ্রন্থ সংগ্রহ করিতে সমর্থ হইয়াছি। আমাদের সমাজপূজ্য চির-আরাধ্য ব্যাসকল্প ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ-কুলাচার্য্যগণ কিরূপ অসাধারণ সূক্ষ্মবুদ্ধি দ্বারা সমাজের আন্তর্জাতিক ইতিহাস লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, কিরূপ সুকৌশলে আমাদের আর্য্যজাতীয়ত্বের নিদর্শন অতীতের কালগ্রাস হইতে রক্ষা করিয়া আসিয়াছেন, ঐ সকল কুলগ্রন্থ তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। আশা করি, কায়স্থসমাজ সমবেতভাবে চেষ্টা করিলে ঐরূপ অতীতগৌরবের নিদর্শন আরও শত শত আবিষ্কার করিতে পারেন। ঐ সকল কুলশাস্ত্রগুলি প্রধানতঃ তিন শ্রেণিতে বিভক্ত করা যাইতে পারে—

১ম—আদি কুলকারিকা ও ডাক নামক গাথাসমূহ।

২য়—কুলপঞ্জিকা, ঢাকুরী, সমীকরণকারিকা ও কুলাকুলবিচার।

৩য়—কক্ষানির্ণয়, ভাবনির্ণয়, ঢাকুর ও আধুনিক কুলপঞ্জিকা।

যাঁহারা বলিয়া থাকেন যে, ভারতবাসী ইতিহাসের উপযোগিতা বুঝেন নাই, ইতিহাসের সমাদর করেন নাই, তাঁহারা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত। বিশাল ভারতের কথা ছাড়িয়া দিন—একমাত্র এই বঙ্গদেশের উক্ত তিন শ্রেণির কুলগ্রন্থ আলোচনা করিলে আমরা বেশ বুঝিতে পারি যে, আর্য্য-কায়স্থসমাজ ইতিহাসের কতদূর আদর করিতেন—ইতিহাসের উপযোগিতা কতটা বুঝিয়াছিলেন। ঐ সকল গতস্মৃতির নিদর্শন কীটদষ্ট পুথি হইতে আমরা প্রত্যেক সমাজের অভ্যুত্থান, প্রত্যেক সমাজের গঠন, প্রত্যেক সমাজের বিস্তৃতি, প্রত্যেক সমাজের বংশসম্বন্ধ, প্রত্যেক সমাজের আদান-প্রদান, প্রত্যেক সমাজের কুলাচার, প্রত্যেক সমাজের—এমন কি প্রত্যেক পরিবারের ধারাবাহিক বংশেতিহাস এবং প্রত্যেক সমাজ ও পরিবারের অধঃপতনের কারণতত্ত্ব সন্ধান পাইতেছি। ঐ সকল কুলগ্রন্থে কত শত ধর্ম্মবীর, কর্ম্মবীর ও দানবীরের

প্রসঙ্গ রহিয়াছে। কে কোন্ কুল উজ্জ্বল করিয়াছেন, কাহার কাহার সহিত তাঁহারা সম্বন্ধ-সূত্রে আবদ্ধ ছিলেন, তাঁহাদের কোন্ পূর্ব্বপুরুষ কোথায় বাস করিতেন এবং পরবর্ত্তী বংশধরগণের কে কোথায় থাকিয়া তাঁহাদের নামরক্ষা করিতেছেন ইত্যাদি বহু পরিচয় ঐ সকল কুলগ্রন্থে পাইতেছি। আমরা সেক্সপীয়র, মিল্টন, নেপোলিয়ান, মাট্‌সিনি, মার্টিন-লুথার প্রভৃতির জীবনী পাঠ করিয়া প্রশংসা করিয়া থাকি, কিন্তু তাঁহাদের আদ্যোপান্ত কুলপরিচয় ও আত্মীয়স্বজনের সম্বন্ধ কে কোথায় পাইয়াছেন বা শুনিয়াছেন? কিন্তু স্বার্থত্যাগের উজ্জ্বলদৃষ্টান্ত ব্যাসসিংহ ও তাঁহার পিতা সমাজপূজ্য করণগুরু লক্ষ্মীধর সিংহ, রাজা লক্ষ্মীবর সিংহ, উদ্যোগী বল্লাল সিংহ, রাজা যুধিষ্ঠির, রাজা নরপতি ঘোষ, রাজা সন্তোষ দত্ত, প্রেমের সন্ন্যাসী নরোত্তম ঠাকুর, মহাপ্রভুর পার্ষদ অদ্বিতীয় পদকর্ত্তা বাসুদেব ঘোষ, ব্রাহ্মণসমাজের কুলবিধাতা রাজা গণেশ দত্তখান, দাসবংশতিলক রামদাস সরস্বতী প্রভৃতি প্রাচীন মহাত্মা হইতে আধুনিক কর্ম্মবীর রাজা সীতারাম রায়, সিংহবংশতিলক লালাবাবু পর্য্যন্ত সহস্র সহস্র মহাত্মার কুলপরিচয়ের সঙ্গে তাঁহাদের আত্মীয়স্বজনের সম্যক্ পরিচয় ঐ সকল কুলগ্রন্থে প্রচ্ছন্নভাবে রক্ষিত রহিয়াছে।

এইরূপে দক্ষিণরাঢ়ীয় কায়স্থ-সমাজ-সংস্কারক গৌড়াধিপের রাজস্বসচিব পুরন্দর খান, ভাগবতের প্রথম অনুবাদক গুণরাজ খান, নবদ্বীপপতি ব্রাহ্মণপালক বুদ্ধিমন্ত খান, কোটী-পতির আত্মজ রঘুনাথ দাস গোস্বামী, বঙ্গজ-সমাজপতি প্রাতঃস্মরণীয় চন্দ্রদ্বীপের বসুরাজবংশ, গুহবংশতিলক মহারাজ প্রতাপাদিত্য, বারেন্দ্রকুলতিলক নন্দীবংশীয় গৌড়রাজসান্ধিবিগ্রহিক সন্ধ্যাকরনন্দী, নাগবংশীয় জটাধর প্রভৃতির ধারাবাহিক পরিচয় বিভিন্ন শ্রেণীর কুলগ্রন্থে কীর্ত্তিত হইয়াছে। এরূপ সার্ব্বজনীন ইতিহাস আর্য্যভারতে ছাড়া আর কি কোথাও পাইয়াছেন, না শুনিয়াছেন?

আজকাল পাশ্চাত্যশিক্ষার প্রভাবে আমরা য়ুরোপের ইতিহাস পাঠ করিয়া মুগ্ধ হই ও গৌরবপ্রকাশ করিয়া থাকি। আমরা এমনই আত্মবিস্মৃত যে, আমাদের নিজের ঘরে গৌরবস্পর্দ্ধী বিশাল ইতিহাস রহিয়াছে—সে দিকে একবারও আমরা লক্ষ্য করি না এবং তাহার অত্যাবশ্যকতাও অনুভব করি না। ইহা কি আমাদের নিতান্ত লজ্জার বিষয় নহে? বর্ত্তমান সভ্যজগতের যে দিকে তাকাই, সেই দিকেই আন্তর্জাতিক উন্নতির চেষ্টা ও আত্ম-মর্য্যাদারক্ষার আয়োজন লক্ষিত হইবে। আমাদেরও বঙ্গের বিরাট্ কায়স্থসমাজের কোন কোন অংশে জাতীয় উন্নতি ও আত্মমর্য্যাদারক্ষার চেষ্টা না হইতেছে, এমন নহে। কিন্তু কেবল স্বসমাজে সংস্কারপ্রবর্ত্তন, শিক্ষাবিস্তার ও লোকসংখ্যার তালিকা করিলেই যথেষ্ট হইল না, সমাজস্থ প্রত্যেকের আদ্যন্ত কুলপরিচয়-সংগ্রহ করা অত্যাবশ্যক। নচেৎ আমাদের জাতীয় কর্ত্তব্য শেষ হইল বা আর্য্যধর্ম্ম অক্ষুণ্ণ রাখিবার চেষ্টা হইল বলিয়া মনে করিব না। এখনও আমাদের আদ্যন্ত কুলপরিচয় বা প্রকৃত সামাজিক ইতিহাস সঙ্কলনের যথেষ্ট সুযোগ আছে, তাহার আভাস পূর্ব্বেই দিয়াছি। কিন্তু কালবিলম্ব করিলে আর এ

সুযোগ থাকিবে না। বিশেষতঃ বঙ্গদেশের জলবায়ুর গুণে প্রত্যহই প্রত্যেক সমাজের গৌরবদ্যোতক কত শত ঐতিহাসিক পুথি কীটদষ্ট বা অগ্নিদগ্ধ হইতেছে। এখন আর নিশ্চেষ্ট থাকিলে চলিবে না।

বিংশবর্ষ পূর্ব্ব হইতে আমাদের সকল সমাজের কুলগ্রন্থরক্ষার আবশ্যকতা অনুভব করিয়া জাতীয় কর্ত্তব্য ভাবিয়া এতদিন ঐ সকল অধুনাদুষ্প্রাপ্য পুথি সংগ্রহ করিতেছি; বহুদিন হইতে ঐ সকল প্রকাশ করিবার একান্ত বাসনা থাকিলেও এতদিন সময়াভাবে ও নানাকারণে আমার সেই বলবতী ইচ্ছা পূর্ণ করিবার সুযোগ পাই নাই। অল্পদিন হইল, আমার জীবনের প্রধান ব্রত "বিশ্বকোষ" সমাধা করিয়া আমার বহুদিনের বাসনা পূর্ণ করিবার জন্য অগ্রসর হইয়াছি।

পঞ্চদশ বর্ষ পূর্ব্বে বঙ্গের জাতীয় ইতিহাসের ব্রাহ্মণকাণ্ডের ভূমিকায় এই সকল কুলগ্রন্থ-রক্ষার উপযোগিতা সম্বন্ধে সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিলাম। ঐরূপ কুলগ্রন্থের সাহায্যেই রাঢ়ীয়, বারেন্দ্র, বৈদিক, শাকদ্বীপী প্রভৃতি বিভিন্ন শ্রেণির ব্রাহ্মণসমাজের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস লিখিত হইয়াছে। এই সকল ব্রাহ্মণ-সমাজের কুলপরিচায়ক অমূল্য কুলগ্রন্থগুলি সম্পূর্ণ প্রকাশের একান্ত ইচ্ছা থাকিলেও ব্রাহ্মণসমাজের নিকট উপযুক্ত উৎসাহ না পাওয়ায় আমার অভিলাষ পূর্ণ করিতে পারি নাই। সুখের বিষয়, বঙ্গের কায়স্থসমাজ সমগ্র প্রাচীন কুলগ্রন্থ-রক্ষার্থে মনোযোগী হইয়াছেন। কুলীন ও মৌলিক সকল শ্রেণির কায়স্থই কুলগ্রন্থরক্ষা ও আদ্যোপান্ত বংশাবলি-প্রকাশে উদ্যোগী হইয়া উৎসাহ দান করিতেছেন। কায়স্থ-সমাজের যত্ন, একাগ্রতা, উদারতা ও আনুকূল্যে বঙ্গের বিশাল কায়স্থসমাজের সমগ্র ইতিহাস এবং গণ্যমান্য কুলীন ও মৌলিক সকল কায়স্থের আদ্যন্ত বংশাবলী-প্রকাশে অগ্রসর হইলাম।

এই গুরুতর দায়িত্বপূর্ণ সার্ব্বজনীন ব্যাপারে অনেক ভুলচুক থাকিবার সম্ভাবনা। বিশেষতঃ যে যে বংশের কুলপরিচয় কুলাচার্য্যগণ বহুপূর্ব্ব হইতে ছাড়িয়া গিয়াছেন, সেই সেই বংশের বর্ত্তমান বংশধরগণ মনোযোগী হইয়া যদি স্ব স্ব কুলপরিচয় না পাঠাইয়া থাকেন, তবে তাঁহাদের বংশ-বিবরণ এই গ্রন্থেও না থাকারই সম্ভাবনা। এ'কারণ সামাজিক কায়স্থ মহোদয়-গণের প্রতি আমার সানুনয় অনুরোধ—এখনও সকলেই স্ব স্ব জাতীয় কর্ত্তব্য মনে করিয়া যাহাতে সকল শ্রেণি ও সকল সমাজের কুলপরিচয় আমার হস্তগত হয়, তদ্বিষয়ে মনোযোগী হউন।

গৌড়বঙ্গের সামাজিক, রাজনৈতিক ও ধর্ম্মসাম্প্রদায়িক ইতিহাসে কায়স্থজাতি সর্ব্বপ্রধান স্থান অধিকার করিয়াছিলেন—সকল দিকেই তাঁহাদের প্রাধান্য, সকল দিকেই তাঁহাদের আধিপত্য এবং সকল দিকেই তাঁহারা স্মরণীয় ও বরণীয় হইয়াছিলেন। এখানকার কায়স্থসমাজ কেবল স্ব স্ব জাতীয় লেখ্যবৃত্তি দ্বারাই যে শ্রেষ্ঠতালাভ করিয়াছিলেন, অথবা কেবল রাজসেবা বা রাজবল্লভতাপ্রযুক্ত যে মহাসমৃদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন তাহা নহে। জ্ঞানে-গুণে দয়া-দাক্ষিণ্যে শক্তি-সামর্থ্যে ধর্ম্মে-কর্ম্মে সকলদিকেই এখানকার কায়স্থসমাজ একদিন উন্নতির পরাকাষ্ঠা দেখাইয়া গিয়াছেন, তাই বলি গৌড়বঙ্গের প্রকৃত ইতিহাসের প্রধান অংশই কায়স্থসমাজের ইতিহাস।

গৌড়বঙ্গের যেখানে প্রাচীন রাজধানী, যেখানে সমৃদ্ধ বাণিজ্যকেন্দ্র, যেখানে ধর্ম্মস্থান বা পীঠস্থান, সেখানেই কায়স্থের সংস্রব। বলিতে কি, রাঢ়বঙ্গের প্রতি পল্লীতে কায়স্থের কৃতিত্ব, কায়স্থের কীর্ত্তিকলাপ, কায়স্থের খ্যাতি ও প্রতিপত্তি মুখরিত। অতীত ইতিহাস সাক্ষ্য দিতেছে, গৌড়মণ্ডলে কায়স্থজাতি যেরূপ অনন্যসাধারণ প্রভুত্ব ও প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছিলেন, কাশ্মীর ব্যতীত ভারতের অপর কোথাও এই জাতির অদৃষ্টাকাশে আর সেরূপ সৌভাগ্য সমুদিত হয় নাই। সে দিন একজন ঐতিহাসিক আইন্-ই-অক্‌বরীর দোহাই দিয়া লিখিয়াছেন যে, মোগল-সম্রাট্ অক্‌বরের সময় প্রায় সমস্ত বাঙ্গালা কায়স্থশাসিত ছিল। আবুল্‌ফজল্ লিখিয়াছেন, "সুবা বাঙ্গালা ২৪টী সরকার ও ৭৮৭টী মহলে বিভক্ত ও ইহার রাজস্ব ৫৯ কোটী ৮৪ লক্ষ ৫৯৩১৯ দাম নির্দ্দিষ্ট আছে। এখানকার ভূস্বামী প্রায় সকলেই কায়স্থ। তাঁহাদের সৈন্যসংখ্যা ২৩৩৩০ অশ্বারোহী, ৮০১১৫০ পদাতি, ১১৭০টী গজ, ৪২৬০ কামান এবং ৪৪০০ নৌকা।" *

অক্‌বরের অন্যতম প্রধান সভাসদ্ ও ঐতিহাসিক আবুল্‌ফজল কেবল তাঁহার সমসাময়িক বাঙ্গালার অবস্থা লিখিয়া ক্ষান্ত হন নাই। তিনি আরও লিপিবদ্ধ করিয়াছেন যে, মুসলমান আগমনের পূর্ব্বে এই বঙ্গভূমি ১৯৩২ বর্ষকাল ভিন্ন ভিন্ন স্বাধীন কায়স্থ-রাজবংশের শাসনাধীন ছিল। † আবুল্‌ফজলের উক্তি কিছু অতিরঞ্জিত হইলেও এবং তাঁহার উদ্ধৃত কায়স্থরাজগণের তালিকায় কিছু কিছু ভ্রমপ্রমাদ থাকিলেও তাঁহার উক্তি এককালে উড়াইয়া দেওয়া যায় না—আমাদের সংগৃহীত নানা প্রাচীন কুলগ্রন্থ, বহুতর শিলালেখ ও তাম্রশাসন আবুল্‌ফজলের কতকটা সমর্থন করিতেছে, সুতরাং আমরা অনায়াসেই বলিতে পারি যে, গৌড়মণ্ডলের সুপ্রাচীন ইতিহাসই কায়স্থসমাজের কতকটা ইতিহাস।

এই কায়স্থ-সমাজের ইতিহাস হইতে আমরা জানিতে পারি যে, মসিজীবী কায়স্থজাতি কিরূপে রাজসংসারের লেখ্যবৃত্তি হইতে ভারতসাম্রাজ্যের প্রাচ্যাংশের আধিপত্যলাভে সমর্থ হইয়াছিলেন, আর্য্য ও দ্রাবিড়-সভ্যতার সংঘর্ষভূমি বঙ্গদেশে কিরূপে তাঁহারা জাতীয়তা বা আর্য্যত্ব রক্ষা করিয়াছিলেন,—একদিন যে কায়স্থ-রাজবংশ আর্য্যাবর্ত্তের প্রবল পরাক্রান্ত নৃপতিগণের সহিত প্রতিপক্ষতা করিয়াছিলেন, হিন্দু বৌদ্ধ প্রভৃতি সকল সমাজের উপর একদিন যাঁহারা সমাজপতিত্ব বা শাসনবিস্তার করিয়াছিলেন, কিরূপে তাঁহাদের বংশধরগণের অভূতপূর্ব্ব অধঃপতন ঘটিল, কিরূপে ও কি কারণে তাঁহাদের সেই পূর্ব্বসম্মান বিলুপ্ত হইল!

কায়স্থকাণ্ডের প্রথমাংশে কায়স্থরাজগণের ইতিহাস লিপিবদ্ধ হইয়াছে বলিয়াই এই অংশের "রাজন্যকাণ্ড" নাম দেওয়া হইল। দ্বিতীয়াংশ হইতেই কায়স্থকাণ্ড বা সাধারণ কায়স্থসমাজের ইতিহাস আরম্ভ।

* "The Subah of Bengal consists of 24 *Sirkars* and 787 *Mahals*. The revenue is 59 crores, 84 lakhs, 59319 *dams*, in money. The zamindars are mostly *Kayaths*. The troops number 23330 Cavalry, 801150 infantry, 1170 elephants, 4260 guns, and 4,400 boats." Ain-i-Akbari, translated by Col. H. S. Garrett., Vol II. p. 129.

† Garrett's Ain-i-Akbari, Vol II. p. 145.

রাজন্য-কাণ্ড

প্রথম অধ্যায়

আদি কায়স্থ-সমাজ

ভারতীয় আর্য্যসমাজে গুণ ও কর্ম্মানুসারে জাতিবিভাগ হইয়াছে। পুরুষ-পরম্পরায় যে বংশ যে কার্য্য করিয়া আসিয়াছেন, অথবা যে বংশ যেরূপ গুণের অধিকারী হইয়াছেন, সেই গুণ ও কর্ম্ম তাঁহাদের স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিয়া আসিয়াছে। সেই স্বাতন্ত্র্যই বর্ণ বা জাতীয়ত্বের মূল[১]। এইরূপে রাজকীয় লেখ্যবিভাগে যাঁহারা পুরুষানুক্রমে নিয়োজিত হইতেন, কালে তাঁহারাই কায়স্থাখ্যা লাভ করেন। সামান্য নকলনবিসী কেরাণীর কার্য্য হইতে রাজাধিকরণের বা রাজসভার সান্ধিবিগ্রহিকাদির কার্য্য পুরুষানুক্রমে যাঁহাদের একচেটিয়া বৃত্তি হইয়া পড়িয়াছিল, তাঁহারাই কায়স্থ।

কোন্ সময়ে এই কায়স্থ জাতির উৎপত্তি হইয়াছে, তাহা ঠিক জানিবার উপায় নাই। অথবা ঠিক তিথি নক্ষত্র বা শুভক্ষণ দেখিয়া এই জাতির নামকরণ হয় নাই। পুরাণ ও ধর্ম্মশাস্ত্রে এই জাতির উৎপত্তি ও বিস্তৃতি সম্বন্ধে অনেক কথা আছে, তাহা এই ইতিহাসের আলোচ্য নহে। সুপ্রাচীন লেখমালা বা প্রাচীন ইতিহাসসমূহে এই জাতির যেরূপ পরিচয় পাওয়া যায়, তাহাই আমাদের প্রধানতঃ আলোচ্য।

পুরুষ-পরম্পরায় রাজসংসারে বাস, রাজকীয় লেখ্যবৃত্তিগ্রহণ ও রাজসাহচর্য্য হেতু এই জাতি পুরাণে ও ধর্ম্মশাস্ত্রে ক্ষত্রিয়বর্ণান্তর্গত[২] বলিয়া পরিচিত হইলেও ভারতীয় সুপ্রাচীন লেখমালায় এই জাতি লাজূক বা রাজূক, শ্রীকরণ, করণিক, কায়স্থঠক্কুর ও শ্রীকরণিক ঠক্কুর ইত্যাদি সংজ্ঞায় অভিহিত হইয়াছেন। এই সকল আখ্যা কত পূর্ব্বকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে, তাহাও ঠিক জানা যায় নাই। মৌর্য্যসম্রাট্ প্রিয়দর্শীর অনুশাসনসমূহে আমরা সর্ব্বপ্রথম রাজূকের পরিচয় পাই। প্রিয়দর্শীর দিল্লী-শিবালিক, দিল্লী-মিরাট, আলাহাবাদ, রধিয়া, মথিয়া ও রামপুরবা ইত্যাদি স্থানের অশোকস্তম্ভে উৎকীর্ণ ধর্ম্মলিপিতে রাজূকের পরিচয় আছে, নিম্নে তাহার অনুবাদ প্রকাশ করিতেছি—

'দেবগণের প্রিয় প্রিয়দর্শিরাজ এইরূপ বলিতেছেন, আমার অভিষেকের ষড়্‌বিংশতি বর্ষ পরে এই ধর্ম্মলিপি (আমার আদেশে) লিপিবদ্ধ হইল। আমার রাজূকগণ বহুলোকের মধ্যে শত সহস্র প্রাণিগণের মধ্যে শাসনকর্ত্তৃরূপে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। (তাঁহাদিগকে)

(১) বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস, ব্রাহ্মণকাণ্ড, ১মাংশের উপক্রমণিকা দ্রষ্টব্য।

(২) এ বিষয় মৎপ্রণীত কায়স্থের বর্ণনির্ণয় গ্রন্থে সবিস্তার আলোচিত হইয়াছে।

পুরস্কার বা দণ্ডবিধান করিতে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়াছি। কেন? রাজূকেরা নির্ব্বিঘ্নে ও নির্ভয়ে যাহাতে তাঁহাদের কার্য্য করিতে পারেন, জনপদের প্রজাসাধারণের হিত ও সুখ বিধান করিতে পারেন এবং অনুগ্রহ করিতে পারেন। কিসে প্রজাগণ সুখী এবং দুঃখী হইবে, তাহা তাঁহারা জানেন। তাঁহারা জন ও জানপদকে ধর্ম্মানুসারে উপদেশ করিবেন। কেন? এই কার্য্যে তাঁহারা ইহলোকে ও পরলোকে পরমসুখ লাভ করিতে পারিবেন। রাজূকেরা সর্ব্বদাই আমার সেবা করিতে অভিলাষী। আমার অপর কর্ম্মচারীরাও, যাহারা আমার অভিপ্রায় জানে, আমার কার্য্য করিবে এবং তাহারাও প্রজাগণকে এরূপ আদেশ দিবে, যাহাতে রাজূকেরা আমার অনুগ্রহলাভে সমর্থ হয়। যেমন কোন ব্যক্তি উপযুক্ত ধাত্রীর হস্তে শিশুকে ন্যস্ত করিয়া শান্তিবোধ করে এবং মনে মনে বলিয়া থাকে, ধাত্রী আমার শিশুটীকে ভাল করিয়াই রাখিবে, আমিও সেইরূপ জানপদগণের মঙ্গল ও সুখের জন্য রাজূককে দিয়া কার্য্য করিতেছি। নির্ভয়ে এবং শান্তিবোধ করিয়া বিমনা না হইয়া তাহারা কার্য্য করিতে পারিবে। এই জন্যই আমি পুরস্কার ও দণ্ড-বিধানে রাজূকগণকে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা প্রদান করিয়াছি। আমার অভিপ্রায় কি? তাহা এই, রাজকীয় কার্য্যে তাঁহারা সমতা দেখাইবেন, দণ্ডবিধানেও সমতা দেখাইবেন।'[৩]

রাজূকগণের কিরূপ প্রভাব ছিল, অশোক-লিপি হইতে তাহার স্পষ্ট আভাস পাওয়া যাই-তেছে। অশোক-লিপি সম্বন্ধে যিনি সর্ব্বাপেক্ষা অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছেন, সেই সুবিখ্যাত প্রত্নতত্ত্ববিদ্ ডাক্তার বুহলার রাজূকগণকে 'কায়স্থ' বলিয়াই অবধারণ করিয়াছেন[৪]। মেদিনীপুরবাসী একশ্রেণির কায়স্থ অদ্যাপি 'রাজু' নামে পরিচিত এবং বঙ্গীয় কায়স্থগণের

(৩) মূল লিপি এইরূপ—

"দেবানং-পিয়ে পিয়দসি-লাজ হেবং আহ সড়ুবীসতিবসাভিসিতেন মে ইয়ং ধংমলিপি লিখাপিত লজূকা মে বহূসু পানসতসহসেসু জনসি আয়ত তেসং যে অভিহালে ব দণ্ডে ব অতপতিয়ে মে কটে কিং তি লজুক অস্বথ অভীত কংমানি পবতয়েবু তি জনস জানপদস হিতসুখং উপদহেবু অনুগহিনেবু চ। সুখীয়ন-দুখীয়নং জানিসংতি ধংমযুতেন চ বিয়োবদিসংতি জনং জানপদং কিং তি হিদতং চ পালতং চ আলাধয়েবু লজূকা পি লঘংতি পটিচলি-তবে মং পুলিসানি পি মে ছংদংনানি পটিচলিসং তি তে পি চ কানি বিয়োবদিসংতি যেন মং লজুক চঘংতি আলা-ধয়িতবে অথাহি পজং বিয়তায়ে ধাতিয়ে নিসিজিতু অস্বথে হোতি বিয়তধাতি চ ঘতি মে পজং সুখং পলিহটবে তি হেবং মম লজুক কট জানপদস হিতসুখায়ে যেন এতে অভীত অস্বথা সংতং অবিমন কংমানি পবতয়েবু তি এতেন মে লজূকানং অভিহালে ব দংডে ব অতপতিয়ে কটে ইছিতবিয়ে হি এস কিংতি বিয়োহালসমতা চ সিয় দংড-সমতা চ।" (প্রিয়দর্শীর স্তম্ভলিপি) Epigraphia Indica, Vol. II. p. 252—253.

(৪) রাজুক সম্বন্ধে Dr. Buhler এইরূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন,—

"In note 1 to my German translation of Rock Edict III, I have pointed out that Professor Jacobi has found the Jaina Prakrit representative of *lājūka*, or *rājūka* (Girnar) in the Kalapasutra where *rajjū* means 'a writer, a clerk.' I have added that

তার বিভিন্ন উপাধিতে বিভূষিত।[৫] রাজপুতানার রাজবংশ যেরূপ রাজপুত বলিয়া পরিচিত, তথাকার চৈত্রগুপ্ত কায়স্থগণও সেইরূপ 'রাজধানা'[৬] নামেই অভিহিত। 'রাজধানা', রাজস্থানীয় ও 'রাজুক' একার্থবোধক। মহারাষ্ট্রপ্রদেশে রাজ বা 'রাজে' উপাধিধারী প্রভু-কায়স্থও[৭] বিদ্যমান।

খৃঃ পূঃ চতুর্থ শতাব্দে মৌর্য্যসম্রাট্ অশোকের[৮] অভ্যুদয়। তৎপূর্ব্ব হইতেই কায়স্থগণ রাজসংসারে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিলেন। বিষ্ণুস্মৃতি ও যাজ্ঞবল্ক্য-স্মৃতি হইতে আমরা তাহার আভাস পাই। অন্যত্র দেখাইয়াছি, খৃঃ পূঃ চতুর্থ বা পঞ্চম শতাব্দে যাজ্ঞবল্ক্য-স্মৃতি[৯] প্রকাশিত হয়। তাহারও পূর্ব্বে বিষ্ণুস্মৃতি প্রচারিত হইয়াছিল।[৯] বিষ্ণুস্মৃতিতে কায়স্থ রাজাধিকরণের লেখক বলিয়া পরিচিত। কিন্তু যাজ্ঞবল্ক্য যে ভাবে কায়স্থ শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন, তাহাতে কায়স্থগণের রাজাধিকরণের লেখক অপেক্ষা আরও বেশী অধিকার ছিল বলিয়া মনে হয়। যাজ্ঞবল্ক্য লিখিয়াছেন—'চাট, তস্কর, দুর্বৃত্ত, মহাসাহসিক, বিশেষতঃ কায়স্থদিগের হস্ত হইতে রাজা বিশেষভাবে প্রজা রক্ষা করিবেন।'[১০] কায়স্থের প্রতি এরূপ প্রখর রাজদৃষ্টি রাখিবার কারণ কি? যাজ্ঞবল্ক্যের মিতাক্ষরানাম্নী প্রসিদ্ধ টীকায় চালুক্যরাজ বিক্রমাদিত্যের সভাসদ্ বিজ্ঞানেশ্বর ১১শ শতাব্দীর শেষভাগে লিখিয়াছেন, 'গণক ও লেখকগণই কায়স্থ। তাঁহারা রাজবল্লভ, মায়াবী ও দুর্নিবার বলিয়া, তাঁহাদিগের হস্ত হইতে পীড্যমান প্রজাবৃন্দকে বিশেষভাবে রক্ষা করিবেন।'[১১] ইহারই অল্পকাল পরে কোঙ্কণের অধীশ্বর শিলাহাররাজ অপরাদিত্য যাজ্ঞবল্ক্য-স্মৃতির একখানি বৃহৎ ভাষ্য প্রণয়ন করেন। এই ভাষ্যে

lajūka i, e. lajjūka, was an old name of the writer-caste, which is later called *Divira* (*Dabir*) or Kayasthas and that Asoka calls his great administrative officials simply the 'writers', because they were chiefly taken from that caste".

Epigraphia Indica, Vol. II. p 254.

উক্ত প্রত্নতত্ত্ববিদ্ অন্যত্রও লিখিয়াছেন,—"that Asoka's Rajukas were better scholars than the Karkuns of the British Government offices before the introduction of the European system of education." EPIGRAPHIA INDICA, Vol. I. p. 17.

(৫) কায়স্থপত্রিকা ৩য় খণ্ড (১৩১৯ সাল) ২২৮ পৃষ্ঠার পাদটীকা।

(৬) কায়স্থের বর্ণনির্ণয় ২য় সংস্করণ ৩৫ ও ১৩০ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

(৭) কায়স্থের বর্ণনির্ণয় ১১৬ পৃষ্ঠা।

(৮) বঙ্গের জাতীয়-ইতিহাস, বৈশ্যকাণ্ড, ১মাংশ ১০৮ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

(৯) বিশ্বকোষ ২২শ ভাগ স্মৃতি শব্দ ৩৪৯ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

(১০) "চাটতস্করদুর্বৃত্তমহাসাহসিকাদিভিঃ।
পীড্যমানাঃ প্রজা রক্ষেৎ কায়স্থৈশ্চ বিশেষতঃ॥" (যাজ্ঞবল্ক্য ১।৩৩)

(১১) 'কায়স্থা গণকা লেখকাশ্চ তৈঃ পীড্যমানাঃ বিশেষতো রক্ষেৎ, তেষাং রাজবল্লভতয়াতিমায়াবিত্বাচ্চ দুর্নিবারত্বাৎ।' (মিতাক্ষরা)

তিনি কায়স্থগণকে করাধিকারী বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন।"[১২] এই সময়ে বা ইহারই অতি অল্পকাল পরে রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণপ্রবর শূলপাণি তাঁহার দীপকলিকানাম্নী যাজ্ঞবল্ক্য-টীকায় কায়স্থকে রাজ-সম্বন্ধ-প্রযুক্ত প্রভাবশালী[১৩] বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। সুতরাং ভাষ্য ও টীকার সাহায্যে আমরা বুঝিতে পারিতেছি, যাজ্ঞবল্ক্যের 'কায়স্থ' কেবল গণক বা লেখক নহেন, তাঁহারা অতি প্রাচীনকাল হইতেই করাধ্যক্ষের (Revenue officer) কার্য্য করিয়া আসিতেছেন। তাঁহাদের হস্তে করাধিকার থাকায় তাঁহারা একপ্রকার প্রজাগণের দণ্ডমুণ্ডের কর্ত্তা ছিলেন। তাঁহাদের লেখনীর তাড়নায় যে কোন প্রজার সহজেই ভাগ্যবিপর্য্যয় ঘটিতে পারিত। তাঁহারা রাজ-সম্বন্ধ-প্রযুক্ত কিরূপ প্রভাবশালী ছিলেন, তাহা অশোকের স্তম্ভলিপি হইতেই অনেকটা পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। পাছে তাঁহারা কোন প্রকার অন্যায় আচরণ করেন, সেই জন্যই তাঁহাদের উপর লক্ষ্য রাখিবার রাজার বিশেষ ব্যবস্থা হইয়াছিল। অশোকলিপির 'রাজূকই' বিজ্ঞানেশ্বরের 'রাজবল্লভ' হইতেছেন।

সুপণ্ডিত বূলহর আলোচনা করিয়া দেখাইয়াছেন, অশোকের উক্ত স্তম্ভলিপিগুলি যখন প্রচারিত হয়, তখন প্রিয়দর্শী বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করেন নাই। তখনও তিনি ব্রাহ্মণ, বৌদ্ধ ও জৈনদিগকে সমভাবেই দেখিতেন। তখনও পর্য্যন্ত তিনি সাধারণ জ্ঞানমার্গে বা ব্রাহ্মণ-প্রবর্ত্তিত রাজনীতি অনুসারে পরিচালিত হইতেছিলেন।"[১৪] এরূপস্থলে মৌর্য্যসম্রাট্ রাজূকগণের উপর যেরূপ সম্মান ও অধিকার প্রদান করিয়াছিলেন, তাহা পূর্ব্ব-প্রথারই অনুবর্ত্তন। 'অভিষেকের ঊনত্রিংশ বর্ষ পরে অশোক বৌদ্ধ ধর্ম্মে দীক্ষিত হন। এই সময় হইতেই বৌদ্ধধর্ম্মের প্রতি তাঁহার একান্ত নিষ্ঠা বা গোঁড়ামি বাড়িয়া যায়।"[১৪] তাঁহার অতি প্রিয়পাত্র রাজূকগণও যে তাঁহার মতানুবর্ত্তী হইয়াছিলেন, তাহা অস্বীকার করা যায় না।

পর্ব্বতগাত্রে খোদিত অশোকের তৃতীয় অনুশাসন হইতেও আমরা জানিতে পারি যে, রাজূক-গণ কেবল শাসন বা রাজস্ববিভাগে সর্ব্বময় কর্ত্তা ছিলেন, তাহা নহে, ধর্ম্মবিভাগেও তাঁহাদের বিশেষ কর্তৃত্ব ছিল, তাঁহারা মৌর্য্যসম্রাট্ কর্ত্তৃক ধর্ম্মমহামাত্রপদেও অধিষ্ঠিত হইয়াছিলেন

(১২) 'কায়স্থাঃ করাধিকৃতাঃ' (অপরার্ক)

(১৩) 'কায়স্থৈঃ রাজসম্বন্ধাৎ প্রভবিষ্ণুভিঃ' (শূলপাণিকৃত দীপকলিকা টীকা)

(১৪) I believe it to be certain that Piyadasi-Asoka had not yet joined the Buddhists when the Pillar edicts where completed. His conversion to Buddhism fell, as I shall show in a new discussion of the Sahasram and Rupnath edicts, in the twenty-ninth year of his reign. Up to the end of his twenty-seventh year he continued to preach and otherwise to work for the spread of that general morality which all Indian religions, based on the *Jnānamārga* or path of knowledge prescribe for the people at large and which is common to the Brahmans, Jainas and Buddhists".

Epigraphia Indica, Vol. II. p. 246.

এবং বুদ্ধের পবিত্র উপদেশ প্রচার করিবার জন্য সম্রাট্ কর্ত্তৃক তাঁহারা বহু দূরদেশেও প্রেরিত হইতেন।[১৫] অধিক সম্ভব, যে দিন হইতে রাজূকগণ করাধ্যক্ষ হইতে ধর্ম্মাধ্যক্ষের পদে উন্নীত হইলেন, সেইদিন হইতেই তাঁহারা ব্রাহ্মণ-শাস্ত্রকারগণের বিষদৃষ্টিতে পড়িলেন। যতদিন ভারতে বৌদ্ধ-প্রাধান্য চলিয়াছিল, ততদিন তাঁহারা এই ধর্ম্মাধ্যক্ষের পদলাভে বঞ্চিত হন নাই। ব্রাহ্মণই হিন্দুশাস্ত্রে একমাত্র ধর্ম্মপ্রবক্তা বলিয়া পরিগণিত, কিন্তু রাজূক বা কায়স্থগণ যখন ব্রাহ্মণের ন্যায় ধর্ম্মোপদেশকার্য্যে অগ্রসর হইলেন, বংশপরম্পরায় তাঁহারা যখন ধর্ম্মাধর্ম্মবিষয়ক কার্য্য-সমূহ চালাইতে লাগিলেন—তখন কোথাও কোথাও যে তাঁহারা ব্রাহ্মণবৎ গণ্য হইয়া পড়িবেন, তাহাতে আর বিচিত্র কি? সেই সঙ্গে ব্রাহ্মণসমাজেরও তাঁহাদের উপর জাতক্রোধ উপস্থিত হইয়াছিল, এই কারণেই সৌরপুরাণে রাজোপসেবক ধর্ম্মাচার্য্য কায়স্থগণ অপাংক্তেয় বলিয়া নিন্দিত হইয়াছেন[১৬]। ভারতের সর্ব্বত্র ব্রাহ্মণপ্রভাব বিস্তৃত হইবার পরও সেই পূর্ব্বাচারের নিদর্শন এককালে বিলুপ্ত হয় নাই, এখনও দাক্ষিণাত্যে কুম্ভকোণম্ প্রভৃতি স্থানে[১৭] এবং আসাম-প্রদেশের বহুস্থানে কায়স্থগণ মঠাধ্যক্ষতা করিতেছেন। এমন কি নাসিক জেলায় ইগৎপুরী নামক স্থানে কএকঘর কায়স্থ-পরিবার এখনও ব্রাহ্মণত্বের দাবী করিয়া থাকেন।[১৮]

কায়স্থ-সমাজের অতি পূর্ব্বতন অবস্থা জানিতে হইলে মৌর্য্য, শুঙ্গ, কাণ্ব, শক ও আন্ধ্র-রাজবংশের ইতিহাসও জানা আবশ্যক। এখানে সংক্ষেপে সেই প্রাচীন ইতিহাস লিখিতেছি।

মৌর্য্যবংশ

চন্দ্রগুপ্ত ও তৎপৌত্র অশোক সম্বন্ধে আমরা অন্যত্র বিশেষভাবে আলোচনা করিয়া দেখাইয়াছি যে,[১৯] পাশ্চাত্য ঐতিহাসিকগণ এ দেশের প্রাচীন মতের উপর আস্থা স্থাপন না করাতেই কালনির্ণয়ে ও ঐতিহাসিক পৌর্ব্বাপর্য্য-নির্ণয়ে গোলযোগ ঘটাইয়াছেন।

পাশ্চাত্য ঐতিহাসিকগণ সকলেই একবাক্যে স্বীকার করিয়া থাকেন, ৩২৫ খৃঃ পূর্ব্বাব্দে সেপ্টেম্বর মাসে মহাবীর আলেকসান্দর ভারত পরিত্যাগ করেন। তাঁহার আখ্যায়িকা-লেখক গ্রীক-ঐতিহাসিকগণ তাঁহার সমসাময়িক Sandrocottus নামক এক ব্যক্তির পরিচয় দিয়াছেন। মাকিদনবীরের মৃত্যুর পর যখন তাঁহার সামন্তবর্গের মধ্যে রাজ্যবিভাগ লইয়া গোলযোগ উপস্থিত হয়, সেই সময়েই উক্ত চন্দ্রগুপ্তের অভ্যুদয়। ৩১৭ খৃঃ পূর্ব্বাব্দে যখন গ্রীক-

(১৫) Vincent A. Smith's Asoka, 2nd Ed. (1907).

(১৬) "কায়স্থা লম্বকর্ণাশ্চ নিত্যং রাজোপসেবকাঃ।
নক্ষত্রতিথিবক্তারো ভিষক্‌শাস্ত্রোপজীবিনঃ॥৯
হীনাতিরিক্তদেহাশ্চ শ্রাদ্ধে বর্জ্জ্যাঃ প্রযত্নতঃ।১১" (সৌরপুরাণ ১৯ অধ্যায়)

(১৭) Wilson's Mackenzie Collections, p. 615.

(১৮) Bombay Gazetteer, Vol. XVI. p. 41.

(১৯) বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস, বৈশ্যকাণ্ড, ১মাংশ, ৯৪ হইতে ১২০ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

বীরগণ ভারত ছাড়িয়া গবিনি রণক্ষেত্রে উপস্থিত হন, সেই অবসরে তিনি দেশীয় সামন্তবর্গকে উত্তেজিত করিয়া ভারতপ্রান্ত হইতে গ্রীকদিগকে বিতাড়িত করিয়া সমগ্র পঞ্জাব অধিকার করেন। অল্পদিন-মধ্যেই শৌর্য্যবীর্য্য ও সহায়-সম্পত্তিতে চন্দ্রগুপ্ত সমগ্র ভারতবর্ষের সম্রাট্ হইয়াছিলেন। উক্ত Sandrocottusকেই পাশ্চাত্য-ঐতিহাসিকগণ চাণক্য-প্রতিষ্ঠাপিত মৌর্য্য-সম্রাট্ চন্দ্রগুপ্ত বলিয়া স্বীকার করিয়া আসিতেছেন। কিন্তু অন্যত্র প্রমাণ করিয়া দেখাইয়াছি, এই Sandrocottus এবং প্রথম মৌর্য্যসম্রাট্ চন্দ্রগুপ্ত এক ব্যক্তি নহেন। গ্রীক-ঐতিহাসিকগণ এই চন্দ্রগুপ্ত সম্বন্ধে অনেক কথা লিখিয়া গেলেও তাঁহার প্রতিষ্ঠাতা চাণক্যের কিছুমাত্র উল্লেখ করেন নাই। হিন্দু, বৌদ্ধ ও জৈন-সমাজে প্রথম মৌর্য্যসম্রাট্ চন্দ্রগুপ্ত সম্বন্ধে যে সকল প্রাচীন কাহিনী প্রচলিত আছে, তাহার সহিতও পাশ্চাত্য গ্রীক-ঐতিহাসিকগণের কিছুমাত্র সামঞ্জস্য নাই। বিশেষতঃ, তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ উক্ত Sandracottusকে নাপিত-পুত্র বলিয়া পরিচিত করিয়াছেন। ইত্যাদি কারণে আলেক্সান্দরের সমসাময়িক চন্দ্রগুপ্তকে প্রথম মৌর্য্য-সম্রাট্ বলিয়া স্বীকার করিতে পারিলাম না। বরং বৌদ্ধ ও জৈনগ্রন্থ একত্র আলোচনা করিয়া আমরা বুঝিয়াছি, আলেক্সান্দরের সমসাময়িক Sandracottusই মৌর্য্য-সম্রাট্ চন্দ্রগুপ্তের পৌত্র অশোক। দিব্যাবদানে অশোকের নাপিতানীর গর্ভজাতত্ব সম্বন্ধে প্রসঙ্গ আছে[২০]। বাল্যকালে তাঁহার উদ্ধত স্বভাব ও তক্ষশিলায় নির্ব্বাসন এবং সেই সুদূর পঞ্জাব প্রদেশে তাঁহার সৌভাগ্যোদয়ের প্রসঙ্গ হইতে আমরা বুঝিতে পারি, তাঁহার নির্ব্বাসনকালে তিনিই মহাবীর আলেক্সান্দরের শিবিরে উপস্থিত হইয়াছিলেন এবং মাকিদন্-বীরের মৃত্যুর পর তাঁহার সামন্তগণের মধ্যে যে সময়ে গোলযোগ উপস্থিত হয়, সেই অবকাশে অশোকই পঞ্জাব অধিকার করিয়াছিলেন। হিন্দু, বৌদ্ধ বা জৈন কোন গ্রন্থেই প্রথম মৌর্য্য-সম্রাটের সহিত যবনকন্যার বিবাহ-প্রসঙ্গ নাই, কিন্তু আমরা সুপ্রাচীন শিলালিপি হইতে জানিতে পারি, সম্রাট্ অশোকই যবনকন্যার পাণিগ্রহণ করেন এবং যবন-রাজগণের সহিত তাঁহার বিশেষ মিত্রতা হইয়াছিল। বিশেষতঃ যাঁহারা ভারতের গুপ্ত ও অন্ধ্রবংশের পূর্ব্বাপর ইতিহাস-পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারা জানেন, এই দুই পরাক্রান্ত রাজবংশের অনেকস্থলেই পিতামহ ও পৌত্র একনামেই সুপরিচিত হইয়াছেন। এইরূপে সম্রাট্ অশোকও গ্রীক-ঐতিহাসিকগণের নিকট যে পিতামহের নামে পরিচিত হইবেন, তাহা কিছু অসম্ভব নহে।

সুপ্রাচীন জৈনকাহিনী-মতে মহাবীর-স্বামীর মোক্ষ হইতে ১৫৫ বর্ষ পরে অর্থাৎ ৩৭২ খৃঃ-পূর্ব্বাব্দে চন্দ্রগুপ্ত রাজা হইয়াছিলেন।[২১] আবার সিংহলী বৌদ্ধদিগের মহাবংশে লিখিত

(২০) বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস, বৈশ্যকাণ্ড, ১মাংশ, ৯৯ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

(২১) "বীরমোক্ষাব্দবর্ষশতে সপ্তত্যব্দে শতে গতে।
পঞ্চপঞ্চাশদধিকে চন্দ্রগুপ্তোঽভবন্নৃপঃ॥" হেমচন্দ্রের পরিশিষ্টপর্ব্ব ৮।৩৩৯।

জৈনগ্রন্থ ত্রিলোকসারে লিখিত আছে,—

"পণছ সয়বস পণমাসজুদং গমিয় বীরণিবুইদো সগরাজো।"

আছে, বুদ্ধনির্ব্বাণের ২১৮ বর্ষ পরে (৫৪৩—২১৮=৩২৪ খৃঃ পূর্ব্বাব্দে) অশোকের অভ্যুদয়।[২২] ব্রহ্মাণ্ডাদি পুরাণমতে চন্দ্রগুপ্ত ২৪ ও বিন্দুসার ২৫ বর্ষ রাজত্ব করেন। এখানে ৩৭২ খৃঃ পূর্ব্বাব্দের ৪৮ বর্ষ পরে ৩২৪ খৃঃ পূর্ব্বাব্দ হইতেছে ; সুতরাং হিন্দু ও জৈন পুরাণের সহিত বৌদ্ধ মহাবংশের বিশেষ অনৈক্য হইতেছে না। বর্ত্তমান প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণ অশোকের ৩৭ বর্ষমাত্র রাজ্যকাল অবধারণ করিয়াছেন। এদিকে তাঁহার বানপ্রস্থ অবস্থায় সুবর্ণগিরি হইতে বুদ্ধ বৌদ্ধরূপে তাঁহার যে অনুশাসনলিপি প্রচারিত হইয়াছে, তাহাতে ২৫৬ অঙ্ক দৃষ্ট হয়। এই অঙ্ককে বুদ্ধ-নির্ব্বাণাব্দ ও তাঁহার রাজ্যকালের শেষ বর্ষ ধরিয়া লইলেও তাঁহার রাজ্যকাল ৩৭ বর্ষই হয়।[২৩] এখানেও আমরা ২৮৭ খৃঃ পূর্ব্বাব্দে তাঁহার 'বিবাস' বা সংসারত্যাগেরই আভাস পাইতেছি। মহাপুরাণ-অনুসারে চন্দ্রগুপ্ত হইতে বৃহদ্রথ পর্য্যন্ত ৯ জন মৌর্য্য-নৃপতি ১৩৭ বৎসর রাজত্ব করিয়া গিয়াছেন। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ৩৭২ খৃঃ পূর্ব্বাব্দে চন্দ্রগুপ্তের অভিষেক হইয়াছিল। তাহার ১৩৭ বর্ষ পরে বা ২৩৫ খৃঃ পূর্ব্বাব্দে মৌর্য্যবংশের অবসান ধরিয়া লইতে হইবে।

মৌর্য্যবংশের অধঃপতনের কারণ ব্রাহ্মণ-প্রভাব। মৌর্য্য-সম্রাট্ অশোক বৃদ্ধবয়সে নিজে একজন গোঁড়া বৌদ্ধ হইলেও সকল ধর্ম্মের প্রতি সমভাবে সম্মান প্রদর্শন করিতেন। তাঁহার সময় প্রজাদিগের ধর্ম্ম সম্বন্ধে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা ছিল। সাধারণ প্রজাবর্গ অশোকের ব্যবহারে সন্তুষ্ট থাকিলেও ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের নেতা ব্রাহ্মণগণ কখনও সন্তুষ্ট হইতে পারেন নাই। স্মরণাতীত কাল হইতে যে অবিসম্বাদিত শ্রেষ্ঠতা তাঁহারা ভোগ করিয়া আসিতেছিলেন, তাঁহার মূলে কুঠারাঘাত হইল,—সকল জাতি সমান স্বাধীনতা পাইয়া কে আর এখন তাঁহাদিগকে পূর্ব্বের ন্যায় সম্মান ও শ্রদ্ধা করিবে ? তাঁহারা বুঝিলেন, সমতা-রক্ষার ছলে বৌদ্ধসম্রাট্ ব্রাহ্মণ-ধর্ম্মের ঘোর শত্রুতা-সাধন করিতেছেন। এইরূপ বিশ্বাসে তাঁহাদিগের মনে দারুণ বিদ্বেষের সঞ্চার হইল। অতঃপর যখন মৌর্য্যসম্রাট্ দণ্ড-সমতা ও ব্যবহার-সমতা রক্ষার জন্য বিধি-ব্যবস্থা প্রচার করিতে আরম্ভ করিলেন, তখন সেই বিদ্বেষাগ্নিতে উপযুক্ত অনিল-সঞ্চার হইল। ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম্মের প্রাধান্য সময়ে অপরাধ সম্বন্ধে ব্রাহ্মণগণের একপ্রকার স্বাতন্ত্র্য ছিল। ব্রাহ্মণ যত গর্হিত অপরাধই করুন না কেন, তাঁহাদিগের কখনও প্রাণদণ্ড হইত না। তাঁহাদিগের প্রতি কোন প্রকার শারীরিক শাস্তি বিধান করাও অবৈধ বলিয়া বিবেচিত হইত। শিখা-কর্ত্তন কি বিত্তসহ রাজ্য হইতে বহিষ্করণই তাঁহাদিগের পক্ষে চূড়ান্ত দণ্ড ছিল। সাক্ষ্য দিবার জন্য তাঁহাদিগকে ধর্ম্মাধিকরণে উপস্থিত করাইবার কোনই উপায় ছিল না এবং যদি কখনও তাঁহারা অনুগ্রহ

অর্থাৎ শকরাজের ৬০৫ বর্ষ পূর্ব্বে (অর্থাৎ ৫২৭ খৃঃ পূর্ব্বাব্দে) শেষ তীর্থঙ্কর মহাবীরস্বামী নির্ব্বাণ লাভ করেন। এরূপ স্থলে ৫২৭—১৫৫ অর্থাৎ ৩৭২ খৃঃ পূর্ব্বাব্দে চন্দ্রগুপ্তের রাজ্যলাভ হইতেছে।

(২২) "জিননিব্বানতো পচ্ছা পুরে তস্সাভিসেকতো।
অট্ঠারসং বস্সসতং দ্বয়মেবং বিজানিয়ং॥" (মহাবংশ ৫ম পরিঃ)

(২৩) Journal of the Royal Asiatic Society, 1910, p. 1808.

করিয়া উপস্থিত হইতেন, সে স্থলে তাঁহাদের উক্তিমাত্র লিখিয়া লইতে হইত, কোনমতেই তাঁহাদিগকে জেরা করা যাইত না। কিন্তু "ব্যবহার-সমতার" প্রতিষ্ঠা করিয়া অশোক এই চিরন্তন অধিকার হইতে তাঁহাদিগকে বঞ্চিত করিলেন। আজ কি না, তাঁহাদিগকেও ঘৃণিত, অস্পৃশ্য, অনার্য্য এবং শূদ্র প্রভৃতির সঙ্গে সমানভাবে শূলারোহণ ও কারাবাসাদি ক্লেশ সহ্য করিতে হইবে! অশোকের বংশ ব্রাহ্মণের চক্ষুঃশূল হইয়া পড়িল। ইহার পর, আবার যখন জীব-দুঃখকাতর অশোক জীবহিংসা রহিত করিলেন, তখন সেই বিদ্বেষাগ্নি ধূমায়িত হইয়া উঠিল। একবার মনে সন্দেহের ও অবিশ্বাসের ছায়াপাত হইলে প্রতি কার্য্যেই দুরভিসন্ধি দেখিতে পাওয়া যায়। ব্রাহ্মণেরা ভাবিলেন, এই যে জীবহিংসা-নিবারণ, ইহার মূল কেবল ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মবিদ্বেষী বৌদ্ধরাজার ব্রাহ্মণ-নির্য্যাতনের স্পৃহা। জীবহিংসা রহিত হইলে যজ্ঞপূজাদিতে বলিও রহিত হইবে। বলিপ্রিয় ব্রাহ্মণসমাজ আর সহ্য করিতে পারিলেন না। অশোকের উপর তাঁহারা একেবারে খড়্গহস্ত হইয়া উঠিলেন। ইহার উপর অশোক ব্রাহ্মণদিগের আধিপত্য ও মাহাত্ম্যের মূলে কুঠারাঘাত করিয়া "ধর্ম্মমহামাত্র" নামে এক নূতন পদের সৃষ্টি করিলেন। সামাজিক ও নৈতিক ধর্ম্মসম্বন্ধীয় যে সকল বিধি ব্যবস্থা পূর্ব্বে ব্রাহ্মণদিগের হস্তে ন্যস্ত ছিল, যাহার উল্লঙ্ঘন করিলে ব্রাহ্মণদিগের ব্যবস্থানত প্রায়শ্চিত্ত ও দণ্ডগ্রহণ করিতে হইত, সেই সকলের ভার এখন তাঁহাদিগের নিকট হইতে কাড়িয়া লইয়া এই সকল ধর্ম্মমহামাত্রদিগের হস্তে সমর্পিত হইল। ইহার পর আবার বিস্ফোটকের উপর লবণ নিক্ষেপ করিয়া অশোক সগর্ব্বে প্রচার করিলেন যে, "এতদিন যাঁহারা ভূদেব বলিয়া পূজিত হইয়া আসিতেছিলেন, কয়েক বৎসরের মধ্যেই তাঁহাদিগকে তিনি মিথ্যা ও অপ্রাকৃত বলিয়া প্রতিপন্ন করিয়াছেন।" যাঁহাদিগকে ভোজন করাইলে শত শত পাপক্ষয় হয়, তাঁহাদিগের সম্বন্ধে একজন অব্রাহ্মণ রাজার এত বড় আস্পর্দ্ধার কথা কি আর সহজে উপেক্ষিত হয়। ব্রাহ্মণেরা মৌর্য্য-বংশধ্বংসের জন্য বদ্ধপরিকর হইলেন। কিন্তু যতদিন পর্য্যন্ত দোর্দ্দণ্ডপ্রতাপ অশোক জীবিত ছিলেন, ততদিন তাঁহারা বড় উচ্চবাচ্য করিতে সাহসী হইলেন না। কিন্তু তাঁহার মৃত্যুর পরে যখন হীনবল মৌর্য্য-রাজগণ সিংহাসনের শোভাস্বরূপ বিরাজ করিতে লাগিলেন, তখন তাঁহারা মৌর্য্যরাজের প্রধান সেনাপতি পুষ্যমিত্রকে রাজত্বের লোভ দেখাইয়া রাজার বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিয়া তুলিলেন। পুষ্যমিত্র বৌদ্ধদ্বেষী ও পরম ব্রাহ্মণভক্ত। কৌশলে সিংহাসন হস্তগত করিবার পরামর্শ হইল। গ্রীকগণ তখন মধ্যে মধ্যে ভারতের পশ্চিমপ্রান্ত আক্রমণ করিতেছিল। একবার তাহাদিগকে পরাজিত করিয়া পুষ্যমিত্র যখন পাটলিপুত্রে ফিরিয়া আসিলেন, তখন মৌর্য্যাধিপ বৃহদ্রথ তাঁহার অভ্যর্থনার্থ নগরের বাহিরে এক বিরাট সৈন্য-প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করিলেন। উৎসবের মধ্যে কেমন করিয়া কাহার একটী শর যাইয়া রাজার ললাটে বিদ্ধ হইল। সেই স্থানে তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন। ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের ভক্তসেবক পুষ্যমিত্র এইরূপে মৌর্য্যবংশের ধ্বংসসাধন করিয়া ভারতের সিংহাসনে উপবেশন করিলেন। ইহার অব্যবহিত পরেই পূর্ব্ব-ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের প্রতিক্রিয়া আরম্ভ হইল। যেখান হইতে অহিংসা

ধর্ম্ম ঘোষিত হইয়াছিল, অশোকের রাজধানী সেই পাটলিপুত্রের বুকের উপর বসিয়া পুষ্যমিত্র এক বিরাট অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া অহিংসা ধর্ম্মের বিরুদ্ধ-ঘোষণা করিলেন। তাঁহার জননী প্রতিমাসে বিদ্যাচার্য্য ব্রাহ্মণদিগকে ৮০০ শত সুবর্ণমুদ্রা দান করিতে লাগিলেন। শুঙ্গবংশ-প্রতিষ্ঠাতা পুষ্যমিত্রের আধিপত্য-বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে ব্রাহ্মণগণ পুনরায় সমাজের, ধর্ম্মের এবং আচার-ব্যবহারের নেতা হইলেন এবং রাজাকে উপদেশদানে পরিচালিত করিতে লাগিলেন।[২৪]

বৈশ্যকাণ্ড-প্রসঙ্গে পূর্ব্বে লিখিয়াছিলাম, শুঙ্গমিত্র-বংশ শাকদ্বীপীয় ব্রাহ্মণ ছিলেন। কিন্তু সম্প্রতি প্রমাণিত হইয়াছে,[২৫] শুঙ্গগণ সামবেদী ভরদ্বাজ গোত্রীয় আচার্য্য ছিলেন। ঠিক কোন্ সময়ে মৌর্য্যবংশ ধ্বংস হয়, তাহা জানা যায় নাই। অধিকাংশ পুরাণের মতে মৌর্য্যবংশ ১৩৭ বৎসর রাজত্ব করেন। এরূপ স্থলে ২৩৫ খৃঃ পূর্ব্বাব্দে মৌর্য্যবংশের অবসান ও শুঙ্গবংশের প্রতিষ্ঠা হইয়া থাকিবে।

শুঙ্গবংশ

যখন শুঙ্গবংশ বৈদিক ক্রিয়াকাণ্ড প্রচারদ্বারা অহিংসাধর্ম্মের মূলোচ্ছেদে অগ্রসর হইয়াছিলেন, অহিংসাধর্ম্মের পৃষ্ঠপোষক বৌদ্ধ ও জৈনাচার্য্যগণ সে সময়ে নিশ্চিন্ত ও নিশ্চেষ্ট ছিলেন বলিয়া মনে হয় না। তাঁহারাও পরাক্রান্ত বৌদ্ধ ও জৈন নৃপালবর্গের আশ্রয় লইয়া স্ব স্ব ধর্ম্ম-প্রতিষ্ঠায় মনোযোগী হইয়াছিলেন, সন্দেহ নাই। সম্ভবতঃ তাঁহাদেরই উত্তেজনায় শাকলের বৌদ্ধ-ধর্ম্মানুরক্ত যবন-নরপতি মিলিন্দ (Menander) শুঙ্গাধিকার আক্রমণ করেন। শুঙ্গ পুষ্যমিত্রের সমসাময়িক মহাভাষ্যকার পতঞ্জলি পুষ্যমিত্রের যজ্ঞ সন্দর্শন করিয়াছিলেন এবং তিনি যবনরাজ কর্ত্তৃক সাকেত অবরোধ ও মাধ্যমিক জয়ের কথাও লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। যাহা হউক, বৌদ্ধ যবনপতি বিশেষ সুবিধা করিতে না পারিলেও জৈনধর্ম্মী কলিঙ্গাধিপতি ভিখুরাজ-খারবেল অনেকটা সফলকাম হইয়াছিলেন। খণ্ডগিরির হাথিগুম্ফায় ১৬৫ মৌর্য্যাব্দে উৎকীর্ণ এই জৈন নরপালের একখানি বৃহৎ লিপি আছে, তাহা হইতে আমরা জানিতে পারি যে ১৬৫ মৌর্য্যাব্দের (২০৭ খৃঃ পূর্ব্বাব্দের) কএক বর্ষ পূর্ব্বে তিনি মগধ আক্রমণ করেন। তাঁহার ভয়ে রাজগৃহাধিপ মথুরায় পলাইয়াছিলেন।[২৫] 'মিলিন্দপনহ্' নামক বৌদ্ধগ্রন্থ ও কলিঙ্গাধিপ

(২৪) বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস, বৈশ্যকাণ্ড, প্রথমাংশ, ১৪০ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

(২৫) সম্প্রতি মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় এসিয়াটিক সোসাইটীর সভায় একটী বক্তৃতায় এই মত প্রকাশ করিয়াছেন (Vide Journal of the Asiatic Society of Bengal, for 1912. 281.)

(২৫) Actes dil Vl Congres International des Orientalistes, Sect. Ary. to. iii, p. 135ff. গ্রন্থে উক্ত খারবেলের শিলালেখ প্রকাশিত হইয়াছে। এই শিলালেখে যে ১৬৫ মৌর্য্যাব্দ আছে, তাহা উক্ত শিলালেখের পাঠনির্ণেতা পণ্ডিত ভগবান্ লাল-ইন্দ্রজীর মতে অশোকের কলিঙ্গবিজয় হইতে, কিন্তু ডাক্তার বুহ্লরের মতে, ১ম মৌর্য্যসম্রাট্ চন্দ্রগুপ্তের অভিষেক হইতেই এই অব্দ আরম্ভ; আমরা শেষোক্ত মতই সমীচীন মনে করি। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, জৈনকাহিনী অনুসারে ৩৭২ খৃঃ পূর্ব্বাব্দে চন্দ্রগুপ্তের অভিষেক। সুতরাং তাহার ১৬৫ বর্ষ পরে অর্থাৎ ২০৭খৃঃ পূর্ব্বাব্দে উক্ত জৈনলিপি খোদিত হইয়া থাকিবে।

খারবেলের শিলালেখ হইতে আমরা কতকটা বুঝিতে পারি যে, শুঙ্গাধিকারভুক্ত আর্য্যাবর্ত্তে ব্রাহ্মণ-প্রভাবের সহিত বৈদিকাচার প্রচলিত থাকিলেও পঞ্জাবের পশ্চিমাংশে মিলিন্দরাজের অধিকারমধ্যে তখন বৌদ্ধপ্রভাব এবং কলিঙ্গে বা উৎকলে তখনও জৈনপ্রভাব অব্যাহত ছিল। সে সময়ে দাক্ষিণাত্যে আন্ধ্র-সাতবাহনবংশের প্রভুত্ব বিস্তৃত হইয়াছিল।[২৬] এদিকে কালিদাসের মালবিকাগ্নিমিত্র নাটক হইতেও আমরা আভাস পাই যে, রাজা পুষ্যমিত্র যে সময়ে বৌদ্ধ ও জৈন নৃপতির সহিত যুদ্ধবিগ্রহে লিপ্ত ছিলেন, তৎকালে তৎপুত্র যুবরাজ অগ্নিমিত্র বিদিশায় (বর্ত্তমান ভিল্‌সা) রাজপ্রতিনিধিরূপে রাজ্যশাসন করিতেছিলেন। দাক্ষিণাত্যের কতকাংশ যে শুঙ্গবংশের অধিকারভুক্ত ছিল, এতদ্দ্বারা তাহারই সন্ধান পাইতেছি।

যতকাল মৌর্য্যবংশ ভারতে আধিপত্য-বিস্তার করিয়াছিলেন, ততকাল রাজকগণ স্ব স্ব পদমর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। পূর্ব্ব প্রমাণানুসারে শুঙ্গ পুষ্যমিত্র নিজে একজন বৈদিক আর্য্যবংশধর ও বৈদিক মার্গপ্রবর্ত্তক হইতেছেন, তিনি নিজে মৌর্য্যরাজ্য অধিকার করিয়াই অশ্বমেধযজ্ঞের আয়োজন করিলেন, তাঁহার উদ্দেশ্য বৌদ্ধপ্রভাবান্বিত মৌর্য্যরাজ্যে আবার ব্রাহ্মণ-প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা। দিব্যাবদানে লিখিত আছে, সম্রাট্ অশোক ভারতের বিভিন্ন স্থানে বৌদ্ধধর্ম্মপ্রতিষ্ঠাজ্ঞাপক যে ৮৪০০০ ধর্ম্মরাজিকা প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, পুষ্যমিত্র সেই সমস্ত ধর্ম্মরাজিকা ধ্বংস করেন। এই কাহিনী হইতেই বৌদ্ধধর্ম্মের উপর তাঁহার প্রগাঢ় বিদ্বেষের পরিচয় পাওয়া যায়।

অধিকাংশ পুরাণমতে পুষ্যমিত্রকে লইয়া দশজন শুঙ্গের রাজত্বকাল ১১২ বর্ষ (অর্থাৎ ২৩৫ হইতে ১২৩ খৃঃ পূর্ব্বাব্দ পর্য্যন্ত)। শেষ শুঙ্গাধিপ দেবভূতি ব্যসনাসক্ত হইলে তাঁহার মন্ত্রী কাণ্ব বাসুদেব তাঁহাকে বিনাশ করিয়া সিংহাসনে আরোহণ করেন। বাসুদেব হইতে

কাণ্ববংশ

কাণ্ববংশের প্রতিষ্ঠা। পুষ্যমিত্রের যত্নে ব্রাহ্মণশক্তি উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইলেও কাণ্ব বাসুদেবের রাজ্যাপহরণের সহিত ব্রাহ্মণ-সমাজে গৃহবিবাদ উপস্থিত হইয়াছিল। দেবভূতির হত্যাকাণ্ডে তাঁহার আত্মীয়স্বজনগণ সকলেই বিচলিত হইয়াছিলেন, তাঁহারাও কাণ্বদিগের প্রভাব খর্ব্ব করিবার জন্য ষড়যন্ত্র করিতেছিলেন। যাহা হউক, রাজনৈতিক বিপ্লবের মধ্যে কাণ্ব-বংশীয় চারিজন নৃপতি ৪৫ বর্ষমাত্র (প্রায় ১২৩ খৃঃ পূর্ব্বাব্দ হইতে ৭৮ খৃঃ পূর্ব্বাব্দ পর্য্যন্ত) রাজত্ব করেন। সম্ভবতঃ পুষ্যমিত্রবংশ[২৭] ও কাণ্ববংশের বিবাদেই কাণ্বরাজগণের মধ্যে কেহই দীর্ঘকাল

(২৬) Buhler, *Secte der Jaina*. p. 31-41 ; Buhler, *Monatschrift fur den Orient*, Sept. 1884, p. 231 ; Epigraphia Indica, Vol. II. p. 89.

(২৭) খৃঃ পূঃ ২য় শতাব্দে পুষ্যমিত্রবংশ সাম্রাজ্য হারাইলেও ইঁহাদের প্রতিপত্তি এককালে বিলুপ্ত হইয়াছিল বলিয়া মনে হয় না। ভিতরি হইতে আবিষ্কৃত গুপ্তসম্রাট্ স্কন্দগুপ্তের স্তম্ভলিপি হইতে জানা যায় যে, (খৃষ্টীয় ৫ম শতাব্দে) পুষ্যমিত্রগণ ধনবলে ও বাহুবলে অতিশয় পরাক্রান্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন, স্কন্দগুপ্তের হস্তে তাঁহাদের সে শক্তি-সামর্থ্য এককালে বিধ্বস্ত হইয়াছিল। Dr. Fleet's Corpus Inscriptionum Indicarum, Vol, III. p. 55.

রাজত্ব করিতে পারেন নাই। পূর্ব্বেই লিখিয়াছি যে, পুষ্যমিত্রের আধিপত্যকালেই দাক্ষিণাত্যে সাতকর্ণি নামক এক আন্ধ্ররাজ প্রবল হইয়া উঠিয়াছিলেন। সিমুক নামক তাঁহারই কোন বংশধর প্রায় ৭৮ খৃঃ পূর্ব্বাব্দে বলপূর্ব্বক শেষ কাণ্বরাজ সুশর্ম্মার নিকট হইতে পাটলিপুত্রের সিংহাসন অধিকার করেন। সেই আন্ধ্ররাজই ঐতিহাসিকগণের নিকট সাতবাহন নামে পরিচিত।২৮

১৫৭ বর্ষকাল অর্থাৎ প্রায় ২৩৫ খৃঃ পূর্ব্বাব্দ হইতে ৭৮ খৃঃ পূর্ব্বাব্দ পর্য্যন্ত আর্য্যাবর্ত্তে শুঙ্গ ও কাণ্ববংশের অধিকারে ব্রাহ্মণপ্রাধান্য অপ্রতিহত ছিল। তৎপূর্ব্বে বৌদ্ধ ও জৈনাধিকারে যাঁহারা প্রবল ছিলেন, এ সময়ে তাঁহাদের পূর্ব্ব-প্রতিপত্তি অনেকটা হ্রাস হইয়াছিল। সেই সঙ্গে মনে হয়, রাজুকগণও পূর্ব্বসম্মানচ্যুত ও ব্রাহ্মণ-রাজপুরুষগণের বিদ্বেষভাজন হইয়া পড়িয়াছিলেন। তাঁহাদের জাতীয় লেখ্যবৃত্তি অব্যাহত থাকিলেও ব্রাহ্মণ-রাজগণ আর তাঁহাদিগকে পূর্ব্বের ন্যায় রাজ্যরক্ষা ও রাজ্যশাসনকার্য্যে উচ্চ রাজকীয় পদে নিযুক্ত না করিয়া বরং তাঁহাদিগকে উচ্চ রাজকীয় কর্ম্ম হইতে অপসারিত করিতে লাগিলেন। এই কারণেই শুঙ্গ ও কাণ্বায়ন ব্রাহ্মণগণের আধিপত্যকালে রাজুক বা উচ্চপদস্থ কায়স্থ-কর্ম্মচারীর কোন সন্ধানই পাওয়া যায় না।

যে সময়ে কাণ্বরাজগণের মধ্যে গৃহবিবাদ চলিতেছিল এবং আন্ধ্ররাজের লোলুপদৃষ্টি পাটলিপুত্রের উপর নিপতিত হইতেছিল, ঠিক সেই সময়েই পশ্চিম-সীমান্তবাসী শকবংশ ধীরে ধীরে ভারতের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া মথুরা পর্য্যন্ত অধিকার করিয়া বসিয়াছিলেন। কাণ্বরাজকে বিনাশ করিয়া আন্ধ্ররাজ পাটলিপুত্র অধিকার করেন, সেই বিপ্লব ও বিগ্রহের অবসরে শকরাজ বারাণসী পর্য্যন্ত অধিকার করিয়া বসিয়াছিলেন। বৌদ্ধ-বারাণসী সারনাথ হইতে সেই শকাধিপ কনিষ্কের ক্ষত্রপ বনস্পরের শিলালেখ আবিষ্কৃত হইয়াছে।

উত্তরপশ্চিম প্রদেশের তখনকার প্রাচীন জনপদসমূহ হইতে যে সকল সুপ্রাচীন লেখমালা ও পুরাকীর্ত্তির ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহা হইতে আমরা জানিতে পারি যে, এ সময়ে সমস্ত আর্য্যাবর্ত্তে আবার বৌদ্ধ ও জৈনধর্ম্ম প্রভাব বিস্তার করিতেছিল। শকাধিপ-গণের মধ্যে যিনি শক্তিসামর্থ্যে, আধিপত্যে ও সম্মানে শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছিলেন, তাঁহারই নাম কনিষ্ক। উত্তরে খোতন খস্ঘর, দক্ষিণে বিন্ধ্যাচল, পশ্চিমে আফগানস্থান পারস্তসীমা এবং পূর্ব্বে মগধ পর্য্যন্ত তাঁহার অধিকারভুক্ত হইয়াছিল। সেই শকসম্রাট্ই পাটলিপুত্র হইতে বৌদ্ধাচার্য্য অশ্বঘোষকে নিজ রাজধানী পুরুষপুর (বর্ত্তমান পেশাবরে) লইয়া আসেন। পূর্ব্ব-ভারতেও যে তাঁহার আধিপত্য প্রসারিত হইয়াছিল, সারনাথ হইতে আবিষ্কৃত তাঁহার সমসাময়িক শিলালিপি হইতেই তাহা প্রমাণিত হইয়াছে। সম্রাট্ অশোকের ন্যায় তিনিও বৌদ্ধ মহাধর্ম্মসঙ্গীতি আহ্বান করেন। এই মহাধর্ম্মসঙ্ঘে যশোমিত্র, অশ্বঘোষপ্রমুখ ৫০০ শত বৌদ্ধাচার্য্য মিলিত হইয়া সুপ্রাচীন বৌদ্ধশাস্ত্রগুলি উদ্ধার ও

(২৮) Vincent A. Smith's Early of India, 2nd ed. p. 193.

ত্রিপিটকের সুবিস্তৃত টীকা সঙ্কলন করেন। তাঁহাদের অনন্যসাধারণ পরিশ্রমের ফল তাম্রপট্টে লিপিবদ্ধ ও কাশ্মীরের রাজধানী শ্রীনগরের নিকট একটী নবনির্ম্মিত স্তূপমধ্যে সংরক্ষিত হইয়াছিল। অধুনা কয়েকজন খ্যাতনামা ঐতিহাসিক স্থির করিয়াছেন, সম্রাট্ কনিষ্কের আহূত এই মহাধর্ম্মসঙ্ঘের স্মৃতি চিরস্থায়ী করিবার জন্য (৫৭ খৃঃ পূর্ব্বাব্দে) 'সংবৎ' অব্দ প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল।[২৯]

সেই মহাপরাক্রম বৌদ্ধসম্রাট্কে কেহ কেহ তুর্কী বর্ব্বর বলিয়া মনে করেন। কিন্তু তাঁহার স্বর্ণমুদ্রায় তাঁহার যেরূপ প্রতিকৃতি আছে, তাহাতে তাঁহাকে উত্তরপশ্চিম-ভারতীয় আর্য্যসন্তান বলিয়াই মনে হইবে। তাঁহার মূর্ত্তিতে বর্ব্বরতার লেশমাত্র নাই, তাঁহার যোদ্ধৃবেশও অনার্য্যোচিত বা ভারতবহির্ভূত নহে। তাঁহার পূর্ব্বপুরুষ শাকদ্বীপ বা মধ্যএসিয়ার তুষার নামক স্থানে বাস করিতেন, তাহা হইতেই তাঁহাকে 'তুখারি' ও যে শ্রেণি হইতে তাঁহার উদ্ভব, সেই শ্রেণি হইতে তাঁহাকে 'কুষন্' বা 'গুষন্' বলা হইয়াছে। তাঁহার মুদ্রায় 'কনেরকি' শব্দ থাকায় কেহ কেহ মনে করেন, তাহাই 'করণিক' শব্দের অপভ্রংশ অথবা 'করণিক' শব্দ তাহা হইতে সংস্কৃত। আবার কোন কোন পণ্ডিত এরূপও লিখিয়াছেন—কনিষ্ক যে শ্রেণি হইতে সমুদ্ভূত, সেই শ্রেণির কেহ কেহ 'খরন্' নামেও খ্যাত ছিলেন। স্বদেশের নামানুসারে তাঁহারা স্কাইথ (Skythia) নামেও অভিহিত হইতেন। এই 'কোরন্' ও 'স্কাইথ' শব্দই ভারতবাসীর নিকট পরে 'করণ' বা 'কায়স্থ' নামে পরিচিত হইয়াছে।[৩০] কোন কোন পণ্ডিত করণ ও কায়স্থের উৎপত্তি-প্রসঙ্গে এইরূপ অপূর্ব্ব ধারণা করিয়া থাকেন বলিয়াই এখানে আমরা কনিষ্কের প্রসঙ্গ উত্থাপন করিতে বাধ্য হইয়াছি। বাস্তবিক কনেরকি, খরন্ বা স্কাইথ শব্দের সহিত করণিক, করণ বা কায়স্থ শব্দের কিছুমাত্র সম্বন্ধ নাই। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, বিষ্ণু ও যাজ্ঞবল্ক্যস্মৃতিতে স্পষ্টই কায়স্থ শব্দের উল্লেখ আছে, ঐ দুই স্মৃতি ভারতে শকাধিকারের বহু পূর্ব্ববর্ত্তী। মনুসংহিতায় কায়স্থ শব্দের উল্লেখ না থাকিলেও লেখ্যপ্রকরণে 'করণ' শব্দের উল্লেখ আছে।[৩১] মনুসংহিতা যে বৌদ্ধসূচনার পূর্ব্বরচনা তাহা বলাই নিষ্প্রয়োজন।[৩২] মহাপুরাণবর্ণিত শাকদ্বীপই পাশ্চাত্য প্রাচীন ঐতিহাসিকগণের নিকট Skythae ও Sakitai নামে অভিহিত হইয়াছে।[৩৩] পারস্যের অতিপ্রাচীন কীলরূপা শিলালিপিতে ও শককুষণ মুদ্রায় 'শাক' ও 'শক' নাম[৩৪] এবং প্রাচীন চীন-ইতিহাসে 'সে' ও 'সেক'[৩৫] নামেও শাকদ্বীপিগণ পরিচিত। এই 'সে' বা 'শাক' জাতির বসতি সিন্ধুর

(২৯) Journal of the Royal Asiatic Society, 1912, p. 686-687.
(৩০) ভারতী ১৩১৩ সাল ১৫৫ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।
(৩১) মনুসংহিতা ৮।৫১।
(৩২) বিশ্বকোষ, ২২শ ভাগ, স্মৃতি শব্দে বিস্তৃত আলোচনা দ্রষ্টব্য।
(৩৩) বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস, ব্রাহ্মণকাণ্ড, ৪র্থ অংশ ৭ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।
(৩৪) Numismatic Chronicle, 1893, No. 2, 5,
(৩৫) Vincent A. Smiths' Early History of India, 2nd ed. p. 197.

দক্ষিণাংশও খৃষ্টীয় ১ম শতাব্দ পর্য্যন্ত গ্রীক ভৌগোলিকগণের নিকট Scythia নামেই পরিচিত ছিল।[৩৬] এরূপ অবস্থায় 'স্কাইথিয়া' হইতে 'কায়স্থ' শব্দ আসিতেই পারে না।

যাহা হউক, শকপ্রভাববিস্তারের সহিত রাজক-বংশধরগণ বা শ্রেষ্ঠ কায়স্থগণ স্ব স্ব পিতৃ-পুরুষার্জ্জিত সম্মানোদ্ধারে মনোযোগী হইয়াছিলেন। এই সময়ে তাঁহাদের মধ্যে যাঁহারা ব্রাহ্মণপ্রভাব খর্ব্ব করিবার জন্য শকরাজগণের পক্ষে অস্ত্রধারণ করিয়াছিলেন, তাঁহারা 'শকসেন' নামে পরিচিত হন, এই শক-সেনদিগের বংশধরগণ অদ্যাপি কায়স্থসমাজের একটী প্রধান শ্রেণীরূপে পরিচিত হইতেছেন।

শকসেনের উৎপত্তি

আদি শকসেনগণ অল্পদিন মধ্যেই স্ব স্ব প্রতিপত্তি বিস্তারে সমর্থ হইয়াছিলেন। এমন কি, তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ তখনকার পরাক্রান্ত দাক্ষিণাত্যপতি আন্ধ্রাজগণের সহিতও সম্বন্ধসূত্রে আবদ্ধ হইয়াছিলেন। এই সম্বন্ধসূত্রেই 'মঢ়রীপুত্র সকসেন' নামক নৃপতির জন্ম। আন্ধ্রাজকন্যা মঢ়রীর গর্ভে যে শকসেন নৃপতি আবির্ভূত হন, তিনিই কাণেড়ির গুহালিপিতে "মঢ়রীপুত্র শকসেন" নামে প্রথিত হইয়াছিলেন। সম্ভবতঃ ইনি মাতামহের উত্তরাধিকার লাভ করেন। বোম্বাই প্রদেশে ঠানার নিকটবর্ত্তী কাণেড়ীর একটী গুহামধ্যে তাঁহার রাজ্যাঙ্কের ৮ম বর্ষে উৎকীর্ণ একখানি অনুশাসনলিপি পাওয়া গিয়াছে।[৩৭] শকসেন কায়স্থগণ এতই প্রবল হইয়া উঠিয়াছিলেন যে, তাঁহারা দীর্ঘকাল আপনাদিগকে 'শকসেন-জাতীয়' বলিয়া পরিচয় দিতে কুণ্ঠিত হন নাই।[৩৮]

সম্ভবতঃ প্রায় ৭৮ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত আর্য্যাবর্ত্তে কনিষ্কের বংশ বা কুষনগণ সাম্রাজ্য করিয়াছিলেন। তাঁহাদের শিলালেখসমূহের বিশেষত্ব এই যে, সর্ব্বত্রই 'সংবৎসর' বা 'সংবৎ' শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। তৎপরে নাগ ও অপরাপর শকবংশের হস্তে তাঁহাদের প্রভাব খর্ব্ব হয়। শকসম্রাট্গণের বংশধর 'সাহী' উপাধিধারী কুষনবংশ গঙ্গাযমুনার অন্তর্ব্বেদী পরিত্যাগ করিয়া পঞ্জাব অঞ্চলে সামান্য নৃপতিরূপে বহুকাল রাজত্ব করিতে থাকেন।

শকসম্রাট্গণের আধিপত্যকালে সৌরাষ্ট্র, মালব প্রভৃতি অঞ্চলে তাঁহাদের ক্ষত্রপ বা মহাসামন্তরূপে শকগণ আধিপত্য করিতেছিলেন, কিন্তু সম্রাট্ কনিষ্কের মৃত্যু ও তৎপরে কুষন্গণের পূর্ব্ব-প্রভাব কিছু হ্রাস হইয়া আসিলে সৌরাষ্ট্র ও মালব অঞ্চলে নহপান, উষবদাত প্রভৃতি শকরাজগণ স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। এই সকল শকক্ষত্রপগণ একদিকে যেমন অতিশয় ব্রাহ্মণভক্তি, অপরদিকে সেইরূপ বৌদ্ধ-শ্রমণদিগের প্রতিও উচ্চ সম্মান প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন। ইহাতে মনে হয়, শকক্ষত্রপগণ ধর্ম্মসম্বন্ধে সাম্য-নীতি অবলম্বন করিয়াছিলেন; এ কারণ ব্রাহ্মণ ও শ্রমণ উভয় সমাজেই এই সকল শকক্ষত্রপ সমাদর লাভ করেন। তাঁহারা অনেক সময়ে ব্রাহ্মণ-মন্ত্রীর পরামর্শেই চলিতেন। ব্রাহ্মণমন্ত্রীর প্রভুত্বে শকসেনগণ শকক্ষত্রপগণের নিকট উপযুক্ত

(৩৬) Periplus, ch. XXXVIII.
(৩৭) Journal of the Bombay Branch Royal Asiatic Society, Vol. XII. p. 409.
(৩৮) Cunningham's Arch. Sur. Reports, Vol. III. p. 59.

প্রতিপত্তিলাভ করিতে পারেন নাই। অধিক সম্ভব, আর্য্যাবর্ত্তে শকসাম্রাজ্য বিলুপ্ত হইলে শকসেনগণ দক্ষিণাপথে আন্ধ্ররাজগণের আশ্রয়গ্রহণ করেন। ইঁহারা প্রভুভক্তিতে ও কার্য্যকুশলতায় আন্ধ্ররাজগণকে সন্তুষ্ট করিয়া রাজকীয় উচ্চপদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন, এমন কি তন্মধ্যে কেহ কেহ আন্ধ্ররাজকন্যা বিবাহ করিয়া উচ্চ রাজপ্রতিনিধিরূপে অধিষ্ঠিত হইয়াছিলেন, এইরূপ রাজপ্রতিনিধি ও তাঁহাদের সম্বন্ধী মঢ়রীপুত্র-শকসেনের নাম পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি।[৩৯]

যে শকসেনবংশ আন্ধ্রগণের অধিকারে উচ্চ রাজকীয় পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন, ইতিহাসে তাঁহারাই 'সাতবাহন' নামে পরিচিত। এই 'সাতবাহন' শব্দই প্রাকৃত ভাষার উচ্চারণে 'সালিবাহন' হইয়াছে। সর্ব্বত্রই প্রবাদ আছে যে, সালিবাহন হইতেই "শকাব্দ" আরম্ভ। এই কারণ শকাব্দকে অনেকে 'সালিবাহনশক' বলিয়া থাকেন। দাক্ষিণাত্যে গল্প প্রচলিত আছে যে, উজ্জয়িনীপতি পৈঠনে সালিবাহন রাজাকে আক্রমণ করেন, কিন্তু তিনিই শেষে সালিবাহনহস্তে পরাজিত হন।[৪০] কেহ কেহ উক্ত উজ্জয়িনীপতিকে শকাধিপ চষ্টন মনে করেন। পূর্ব্বেই লিখিয়াছি, কনিষ্কবংশের প্রভাব খর্ব্ব হইলে উজ্জয়িনী ও সৌরাষ্ট্রের ক্ষত্রপগণ স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। ক্রমে তাঁহারা বলগর্ব্বিত হইয়া আন্ধ্ররাজ্য অধিকারে অগ্রসর হইয়াছিলেন। অবশেষে সাতবাহনরাজের হস্তে তাঁহাদের দর্প চূর্ণ হইয়াছিল, সন্দেহ নাই। যে সাতবাহনরাজের হস্তে ক্ষত্রপগর্ব্ব খর্ব্ব হয়, তিনিই গোতমীপুত্র সাতকর্ণি। নাসিকের গুহায় এই সাতকর্ণির সুবৃহৎ শিলালিপি উৎকীর্ণ আছে, তৎপাঠে জানা যায় যে, তিনি অশিক, অশ্মক, মূলক, সুরাষ্ট্র, কুকুর, অপরান্ত, অনূপ, বিদর্ভ ও অকরাবন্তী প্রভৃতি জনপদের এবং বিন্ধ্য, পারিযাত্র, সহ্য, কৃষ্ণগিরি, মলয়, মহেন্দ্র, শ্রেষ্ঠগিরি ও চকোর ইত্যাদি পর্ব্বতের অধীশ্বর এবং মহারাজাধিরাজ উপাধিতে ভূষিত ছিলেন। তিনি অসংখ্য যুদ্ধে শত্রুদমন করিয়াছেন, ক্ষত্রিয়গণের গর্ব্ব ও অহঙ্কার চূর্ণ এবং শক-যবন-পহ্লববংশ ধ্বংস করিয়াছিলেন, খগারাতবংশের চিহ্ন পর্য্যন্ত লোপ করিয়াছিলেন এবং সাতবাহনবংশের গৌরব পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেন।[৪১]

(৩৯) এই শকসেন সম্বন্ধে ডাক্তার ভাণ্ডারকর মহাশয় লিখিয়াছেন, "For this name and that of his mother Madhari point to a connection with the Sakas whose representatives the Kshatrapas were, and this connection is unfolded in this inscription".

Dr. R. G. Bhandarkar's Early History of Dekkan, p. 21 note.

'শকসেন' শব্দ দেখিয়া আমরাও ভাণ্ডারকর মহাশয়ের মতানুবর্ত্তী হইয়া শক স্থির করিয়াছিলাম, কিন্তু এখন দেখিতেছি, শকেরা কোথাও 'শকসেন' নামে পরিচিত হন নাই। রাজুক-বংশধর কায়স্থগণের যে শাখা শকরাজগণের সেনাবিভাগে প্রবেশ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের বংশধরেরাই 'শকসেন' নামে ইতিহাসে ও সমাজে পরিচিত হন, পূর্ব্বেই তাহার প্রমাণ দিয়াছি। (Vide Cunningham's Arch. Sur. Reports, Vol. III. p. 59.)

(৪০) Dr. Bhadarkars' Early History of Dekkan, p. 37.

(৪১) "খগারাতবংশনিরবসেসকরস সাতবাহনকুলযসপতিঠাপনকরস"

"খতিয়দপমানমদনস সকযবনপহ্লবনিসূদনস"

Transactions of the 2nd Oriental Congress, p. 807.

কোন কোন পুরাবিদের মতে উজ্জয়িনীপতি শকাধিপ চষ্টন গোতমীপুত্র সাতকর্ণির ক্ষত্রপ ছিলেন।[৪২] প্রত্নতত্ত্ববিদ্ কনিংহামের মতে এই চষ্টনই শকাব্দ-প্রবর্ত্তক। খুব সম্ভব, সাতবাহনরাজ গোতমীপুত্র সাতকর্ণি শক-যবন-পহ্লবাদিকে পরাস্ত করিয়া যে নূতন অব্দ প্রচার করেন, এবং যে অব্দ তাঁহার ক্ষত্রপ উজ্জয়িনীপতি চষ্টন বংশপরম্পরায় ব্যবহার করিতে থাকেন, তাহাই উভয় বংশের নামানুসারে 'সালিবাহন-শক' নামে পরিচিত হয়। বর্ত্তমান পুরাবিদ্গণের মতে ২১৮ বা ২৩৯ খৃষ্টাব্দে সাতবাহনবংশের অধিকার বিলুপ্ত হয়।[৪৩] কিন্তু উজ্জয়িনীপতি চষ্টনের বংশ প্রায় ৩৮০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত আধিপত্য করিয়া গিয়াছেন।[৪৪] এই জন্য সাতবাহনবংশলোপের পরও বহুকাল শকরাজগণের ব্যবহৃত অব্দ 'শকনৃপকাল' বা 'শকাব্দ' নামে চলিয়া আসিয়াছে। তাই ভারত হইতে শকাধিকার এককালে বিলুপ্ত হইলেও ভারতীয় পঞ্জিকাসমূহে এই অব্দ "শকনরপতেরতীতাব্দঃ" নামে লিখিত হইয়া আসিতেছে।

শক ও সাতবাহনবংশের সহিত পূর্ব্বকালে কায়স্থ-সংস্রব ঘটিয়াছিল বলিয়াই প্রসঙ্গক্রমে এই দুই বংশের রাজ্যকালের সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রদত্ত হইল। পূর্ব্বেই লিখিয়াছি, পৈঠনপত্তনে সাতবাহনবংশের পূর্ব্বতন রাজধানী ছিল। উজ্জয়িনীপতি এই স্থানে সাতকর্ণিরাজকে আক্রমণ করেন ও শেষে তাঁহারই হস্তে পরাজিত হয়েন। এই পৈঠনপত্তনের সহিত দাক্ষিণাত্যের প্রভু-কায়স্থবংশের বহুকালের সংস্রব রহিয়াছে। আমরা স্কন্দপুরাণের সহ্যাদ্রিখণ্ড হইতে সেই সংস্রবের ক্ষীণ ইতিহাস পাইতেছি। সহ্যাদ্রিখণ্ডে লিখিত আছে, সূর্য্যবংশীয় রাজা অশ্বপতি কোন সময়ে তীর্থযাত্রা উপলক্ষে পৈঠনপত্তনে গমন করেন। এখানে তিনি মুনিবর ভৃগুর কোপে পতিত হন এবং তাহারই ফলে তাঁহার বংশধরগণ রাজ্য হারাইয়া "লিপিকা-জীবন" বা কায়স্থবৃত্তি গ্রহণ করিতে বাধ্য হন।[৪৫] পূর্ব্বেই লিখিয়াছি, গোতমীপুত্র সাতকর্ণি তাঁহার শিলালিপিতে "ক্ষত্রিয়দর্পমানমর্দ্দন" বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন। ইহা অসম্ভব নহে যে, তিনি ভৃগু বা ভার্গবগোত্রীয় ব্রাহ্মণের পরামর্শে পৈঠনের অশ্বপতির অধিকার লোপ করেন, অবশেষে অশ্বপতির বংশধরগণ আধিপত্য হারাইয়া আন্ধ্ররাজগণের রাজকীয় লিপিবিভাগে কর্ম্ম করিতে বাধ্য হয়েন। তাঁহাদের বংশধরগণ অধুনা 'পত্তনপ্রভু' নামে পরিচিত ও একটী স্বতন্ত্র শ্রেণী বলিয়া গণ্য হইলেও অতি পূর্ব্বকাল হইতেই ইঁহারা চৈত্রগুপ্ত ও চন্দ্রসেনীয় কায়স্থগণের সহিত সম্বন্ধসূত্রে আবদ্ধ ছিলেন, তাহারও পরিচয় পাওয়া গিয়াছে।[৪৬]

(৪২) Dr. Oldenberg considers Chastana to be a Satrap appointed by Gotamiputra. এই মত উদ্ধৃত করিয়া ডাক্তার ভাণ্ডারকর আবার প্রতিবাদ করিয়াছেন। Vide Dekkan, p. 27 note.

(৪৩) Bhandarkar's Dekkan 2nd ed. p. 86; Vincent A. Smith, The Early History of India, 2nd ed. p. 202 (Table).

(৪৪) বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস, ব্রাহ্মণকাণ্ড, ৪র্থ অংশ, ২৩ পৃষ্ঠা।

(৪৫) কায়স্থের বর্ণনির্ণয় ৪৯, ৫২ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

(৪৬) কায়স্থের বর্ণনির্ণয় ১১৮ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

শক ও আন্ধ্ররাজগণ সকলেই সাম্যবাদী ছিলেন। তাঁহারা ব্রাহ্মণ ও শ্রমণ উভয়কেই সমাদর করিয়া গিয়াছেন। শকসম্রাট্ কনিষ্কের যত্নে মহাযান-ধর্ম্মের সূত্রপাত এবং নাগার্জ্জুনের যত্নে মহাযানমতের প্রতিষ্ঠা হয়। চীন-পরিব্রাজক যুয়ঙ্‌চুয়ঙ্‌ খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে লিখিয়া গিয়াছেন, সাতবাহনরাজ নাগার্জ্জুনের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন।[৪৭] ব্রাহ্মণ ও শ্রমণদিগকে একতাসূত্রে আবদ্ধ করিবার জন্যই নাগার্জ্জুন মহাযানধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিলেন। ব্রাহ্মণসমাজ যে গীতা ও উপনিষদের চিরদিন আদর ও সম্মান করিয়া আসিতেছেন, যে সকল দেবদেবীকে প্রধান উপাস্য বলিয়া মনে করিতেন, নাগার্জ্জুন সেই সকল তত্ত্বগ্রন্থ ও দেবদেবীকে সসম্মানে গ্রহণ করিয়াছিলেন। বিশেষতঃ দক্ষিণাপথের অধীশ্বর নাগার্জ্জুনের সহায় থাকায় অল্পদিনমধ্যেই তৎ-প্রবর্ত্তিত মহাযানধর্ম্ম আব্রাহ্মণ সাধারণে রাজধর্ম্ম ভাবিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন। শকসাম্রাজ্য ধ্বংসের পর উত্তরাপথে নাগবংশই প্রবল হইয়াছিল, সেই নাগবংশেই নাগার্জ্জুনের আবির্ভাব। স্ববংশীয় মহাপুরুষ নাগার্জ্জুনের প্রভাব সহজেই নাগরাজবংশের মধ্যে বিস্তৃত হইয়াছিল। এইরূপে অল্পদিনমধ্যেই সমস্ত ভারতবর্ষে নাগার্জ্জুনের মহাযানধর্ম্ম পরিগৃহীত হয়। মহাযান-ধর্ম্মে দেবদেবী ও গুরুপূজার বিধান থাকায় প্রথমতঃ ব্রাহ্মণসমাজ এই নবধর্ম্মের বিরুদ্ধাচরণ করিতে প্রবৃত্ত হন নাই, বরং অনেকেই এই নবধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। সেই সঙ্গে রাজপুরুষ কায়স্থগণ অনেকেই মহাযানসম্প্রদায়ভুক্ত হইয়াছিলেন। অহিংসা ও শূন্যবাদ যে ধর্ম্মের মূলমন্ত্র, বলিপ্রিয় বৈদিক বিপ্রসমাজের কথনই তাহা অনুমোদিত হইতে পারে না। কিছুকাল পরে ব্রাহ্মণসমাজ দেখিলেন, মহাযানেরা সাধারণ লোকের জন্য দেবদেবীর পূজা প্রচলিত করিলেও আর্য্য ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের মূল বৈদিক কর্ম্মকাণ্ড গ্রহণ করিতেছে না। যাগযজ্ঞাদি বৈদিক কর্ম্মে পূর্ব্ববৎ সাধারণের মতিগতি নাই। যে আচার লইয়া ব্রাহ্মণসমাজের প্রতিষ্ঠা, সেই বৈদিক আচার ও বৈদিক ক্রিয়াকাণ্ড বিলুপ্ত হইতেছে; সুতরাং বৈদিক বিপ্রকুল আবার চিন্তাকুল হইলেন। কিরূপে এই নব বৌদ্ধধর্ম্মের প্রভাব খর্ব্ব করিবেন, তজ্জন্য তাঁহারা সকলেই বদ্ধপরিকর হইলেন। উত্তরভারতে নাগবংশ যতদিন প্রবল ছিল, ততদিন সেখানে বৈদিক সমাজ মস্তকোত্তলন করিতে পারে নাই। দক্ষিণাপথের সাতবাহনবংশীয়গণ ব্রাহ্মণভক্ত হইলেও বৌদ্ধবিদ্বেষী ছিলেন না। সেখানেও বৈদিকগণের উদ্দেশ্যসাধনের সুযোগ ঘটে নাই। বরং এ সময়ে অনেকেই কতকটা মহাযানধর্ম্মের পক্ষপাতী ছিলেন। দাক্ষিণাত্যে ত্রৈকূটক ও আভীর-বংশের অভ্যুদয়ে শক ক্ষত্রপগণ কিছু অবসন্ন হইয়া পড়েন। ত্রৈকূটক ও আভীরদিগের সহিত শকক্ষত্রপগণ কিছুকাল যুদ্ধবিগ্রহে লিপ্ত থাকেন, এই বিপ্লবের সময় গুপ্তবংশের অভ্যুদয়। উত্তরাপথে নাগবংশ দমন করিয়া গুপ্তগণ দাক্ষিণাত্যের প্রতিও লোলুপদৃষ্টি নিক্ষেপ করেন। যখন চারিদিকে এইরূপ গোলযোগ চলিয়াছিল, সেই সময়ে বৈদিক বিপ্রগণ স্ব স্ব অবস্থা কতকটা হৃদয়ঙ্গম করেন। এই সময়ে রাজস্ববিভাগের প্রধান প্রধান কর্ম্মচারী কায়স্থগণও প্রভুত্বলাভের জন্য অনেকে বৈদিকবিপ্রগণের পক্ষাবলম্বন করেন।

(৪৭) Watter's On Yuang Chuang, Vol. II. p. 200.

৩১৯-২০ খৃষ্টাব্দে গুপ্তসাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা হইল। অল্পদিন-মধ্যেই গুপ্তসম্রাট্ সমুদ্রগুপ্ত সমস্ত আর্য্যাবর্ত্ত ও দাক্ষিণাত্যের কতকটা অধিকার করিয়া অশ্বমেধযজ্ঞের আয়োজন করিলেন। অশ্বমেধ যজ্ঞোপলক্ষে আবার বৈদিকধর্ম্ম প্রবর্ত্তনের আয়োজন চলিতে লাগিল। সেই সঙ্গে ভারতীয় আর্য্য-সমাজের উপর বৈদিক বিপ্রগণেরও প্রতিপত্তি প্রতিষ্ঠিত হইল। গুপ্তসম্রাট্গণ প্রাচীন স্মৃতি অনুসারেই রাজ্যশাসন করিতে লাগিলেন। সুতরাং জ্ঞানী ও গুণী ব্রাহ্মণগণই প্রধান মন্ত্রিত্ব এবং কায়স্থগণ রাজাধিকরণের লেখক[৪৮], করাধিকারী ও সান্ধিবিগ্রহিক[৪৯] পদে নিযুক্ত হইতে লাগিলেন। এতদ্ব্যতীত যোগ্যতা অনুসারে কায়স্থের মধ্যে আরও অনেক সম্মানার্হ উচ্চতর রাজকীয় পদলাভও ঘটিয়াছিল।

গুপ্তবংশ ব্রাহ্মণভক্ত ছিলেন। সমুদ্রগুপ্ত অশ্বমেধ যজ্ঞ করিয়া আবার বৈদিক ব্রাহ্মণ-প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করেন।[৫০] তাঁহার বিস্তৃত সাম্রাজ্য-মধ্যে নামমাত্র তাঁহার আধিপত্য স্বীকার করিয়া বহু ব্রাহ্মণবংশ রাজত্ব করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে 'পরিব্রাজক' ও 'উচ্চকল্প' বংশ প্রধান, এই উভয় বংশ 'মহারাজ' উপাধিতে বিভূষিত ছিলেন। পরিব্রাজক রাজগণকে আমরা ইতিহাসপ্রসিদ্ধ কাণ্বরাজগণের অধস্তন বংশধর বলিয়া মনে করি। আন্ধ্ররাজ বলপূর্ব্বক কাণ্ব সুশর্ম্মার রাজ্য অধিকার করিলে[৫১] সম্ভবতঃ তিনি প্রব্রজ্যা অবলম্বন করেন এবং তাঁহার বংশধরেরা কয়েক শতাব্দী অতি হীনভাবে অতিবাহিত করেন। ব্রাহ্মণধর্ম্ম-প্রতিষ্ঠার জন্য যে সময়ে চারিদিকে আয়োজন চলিতেছিল, সে সময়ে সুশর্ম্মার বংশধরগণ নিশ্চিন্ত ছিলেন না। সম্রাট্ সমুদ্রগুপ্ত অশ্বমেধযজ্ঞ করিয়া যখন আবার বৈদিক ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা করিলেন, তৎকালে ব্রাহ্মণ-সম্রাটের বংশধর যে তাঁহার নিকট বিশেষভাবে সম্মানিত হইবেন, তাহা অসম্ভব নহে। উক্ত পরিব্রাজক-বংশধর মহারাজ সংক্ষোভের তাম্রলেখ হইতে এইরূপ পরিচয় পাই—

'চতুর্দ্দশ-বিদ্যাস্থান-বিদিত-পরমার্থ-তত্ত্বদর্শী, কপিলের ন্যায় মহর্ষি, সর্ব্বতত্ত্বজ্ঞ, ভরদ্বাজগোত্রে

(৪৮) হিন্দুরাজত্বকালে স্মৃতিশাস্ত্রের নিয়মানুসারে কায়স্থগণ লেখকরূপে যে যে কার্য্য করিতেন, শুক্রনীতির ২য় অধ্যায়ে তাহার সম্যক্ পরিচয় আছে। কি ধর্ম্মাধিকরণে, কি সেনাবিভাগে, কি রাজস্ববিভাগে লেখাপড়া বা হিসাব রাখার সকল কার্য্যেই কায়স্থ নিযুক্ত হইতেন। [কায়স্থের বর্ণনির্ণয় ৮ হইতে ১৭ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।]

(৪৯) এই সান্ধিবিগ্রহিক (minister for peace and war and the chief secretary)-পদ গুপ্তবংশের রাজ্যকাল হইতে কায়স্থগণের একচেটিয়া ও অনেকস্থলে পুরুষানুক্রমণিক হইয়াছিল। তাহারও ইতিহাস পরে লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

(৫০) বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস, বৈশ্যকাণ্ড, ১মাংশ, ৫ম অধ্যায়ে এই গুপ্তবংশের বিবরণ আছে, এখানে আর পুনরুল্লেখ করা হইল না।

(৫১) 'কাণ্বায়নাস্ততো ভূপাঃ সুশর্ম্মাণঃ প্রসহ্য তান্।
শুঙ্গানাঞ্চৈব যচ্ছেষং ক্ষপিত্বা তু বলীয়সঃ॥
শিমুকোহন্ধ্রঃ সজাতীয়ঃ প্রাপ্স্যতীমাং বসুন্ধরাম্।" (মৎস্যপুরাণ ২৭৩।১-২)

নৃপতি-পরিব্রাজক সুশর্ম্মার কুলোৎপন্ন মহারাজ দেবাঢ্য, তৎপুত্র মহারাজ প্রভঞ্জন, তৎপুত্র মহারাজ দামোদর, তৎপুত্র মহারাজ হস্তী, তৎপুত্র মহারাজ সংক্ষোভ।"[৫২]

পূর্ব্বেই আভাস দিয়াছি যে, পুষ্যমিত্র বা শুঙ্গবংশ গুপ্তবংশের আধিপত্যকালে বিদ্যমান ছিলেন।[৫৩] ঐরূপ কাণ্ব সুশর্ম্মার বংশীয়গণেরও সন্ধান পাইতেছি। মহারাজ সংক্ষোভের তাম্রশাসন হইতে বুঝা যাইতেছে যে, ভরদ্বাজগোত্রজ মহারাজ সুশর্ম্মা একজন সর্ব্বশাস্ত্রদর্শী মহর্ষিকল্প সাধুপুরুষ ছিলেন। হয় তাঁহার রাজকর্ম্মে ঔদাসীন্য হেতু আন্ধ্রগণের পাটলিপুত্র অধিকারের সুবিধা হইয়াছিল, অথবা আন্ধ্রকর্ত্তৃক হৃতরাজ্য হইয়া তিনি পরিব্রাজক-ধর্ম্ম গ্রহণ করেন। এ কারণ তাঁহার বংশধরগণ পুরাবিদ্‌গণের নিকট 'পরিব্রাজক-মহারাজ' নামেই পরিচিত। পুষ্যমিত্র বা শুঙ্গবংশের সহিত গুপ্ত-সম্রাট্‌গণের সদ্ভাব ছিল না। স্কন্দগুপ্তের শিলালিপিতে লিখিত আছে, পুষ্যমিত্রগণ ধনবলে ও বাহুবলে অতিশয় প্রবল হইয়া উঠিয়াছিলেন। এই কারণে গুপ্তসম্রাট্ তাঁহার দর্পচূর্ণ করেন।[৫৩] এদিকে আবার পরিব্রাজকবংশীয়গণের তাম্রশাসন ও শিলালিপি হইতে পাওয়া যাইতেছে যে, সুশর্ম্মার কুলোৎপন্ন দেবাঢ্য ও তাঁহার বংশপরম্পরা গুপ্তসম্রাট্‌গণের অধিকারে বাঘেলখণ্ড ও বুন্দেলখণ্ড অঞ্চলে মধ্যপ্রদেশে আধিপত্যলাভ করিয়াছিলেন। স্ব স্ব অনুশাসনলিপিতেই মহারাজ হস্তী 'গুরু-পিতৃ-মাতৃ-পূজাতৎপর' 'অত্যন্তদেব-ব্রাহ্মণভক্ত' 'সমরশতবিজয়ী' এবং তৎপুত্র সংক্ষোভ 'বর্ণাশ্রমধর্ম্মনিরত পরমভাগবত' ও 'অত্যন্তপিতৃভক্ত' বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।[৫২] এ ছাড়া ঐ দুই মহারাজের সনন্দপত্রেও ভগবান্ ও ভগবতীর মন্দিরপ্রতিষ্ঠা, ঐ সকল মন্দিরে নিয়মিতরূপে বলি, চরু ও সত্রাদি অনুষ্ঠানের জন্য এবং চিরস্থায়িরূপে উক্ত দেবসেবা ও মন্দিরাদির সংস্কার জন্য বহু দেবোত্তর গ্রাম দানের উল্লেখ আছে।[৫৪] এই সকল সমসাময়িক প্রমাণ হইতে বেশ প্রতিপন্ন হইতেছে যে, গুপ্তাধিকারে অভিজাত ব্রাহ্মণরাজবংশের হস্তে বর্ণাশ্রমধর্ম্ম-প্রতিষ্ঠা, দেবব্রাহ্মণপূজা এবং বৈদিক ও পৌরাণিক অনুষ্ঠান রক্ষার ব্যবস্থা হইতেছিল। এ সময় প্রধান মন্ত্রিত্ব ধর্ম্মাধিকরণের প্রধান বিচারপতির কার্য্য এবং ধর্ম্মপ্রচারকার্য্য উপযুক্ত ব্রাহ্মণের হস্তে ন্যস্ত হইয়াছিল। এ সময়ে প্রতি গ্রামে বা নগরে একজন উপযুক্ত ব্রাহ্মণ গ্রামপতি বা সামাজিক ও ধর্ম্মনৈতিক বিচারের কর্ত্তা, কায়স্থগণ তাঁহাদের দক্ষিণহস্তস্বরূপ লেখক, শুল্ক বা

(৫২) "চতুর্দ্দশবিদ্যাস্থানবিদিত-পরমার্থস্য কপিলস্যেব মহর্ষেঃ সর্ব্বতত্ত্বজ্ঞস্য ভরদ্বাজসগোত্রস্য নৃপ-পরিব্রাজক-সুশর্ম্মণঃ কুলোৎপন্নেন মহারাজশ্রীদেবাঢ্যপুত্রপ্রণপ্ত্রা মহারাজশ্রীপ্রভঞ্জনপ্রণপ্ত্রা মহারাজশ্রীদামোদরনপ্ত্রা গোসহস্রহস্ত্যশ্বহিরণ্যানেকভূমিপ্রদস্য গুরু-পিতৃ-মাতৃ-পূজাতৎপরস্যাত্যন্তদেবব্রাহ্মণভক্তস্যানেকসমরশতবিজয়িনঃ সাষ্টাদশাটবী-রাজ্যাভ্যন্তরং ডভালারাজ্যমন্বয়াগতং সমুপালয়িতোরনেকগুণবিখ্যাতযশসো মহারাজশ্রীহস্তিনঃ সুতেন বর্ণাশ্রমধর্ম্মস্থাপননিরতেন পরমভাগবতেনাত্যন্তপিতৃভক্তেন স্ববংশামোদকরেণ মহারাজশ্রীসংক্ষোভেণ।"

Dr. Fleet's Gupta Inscriptions. p. 114.

(৫৩) Dr. Fleet's Gupta Inscriptions (Corpus Inscriptionum), Vol. III. p, 96, 114.

(৫৪) Do. Do. Do. p. 116.

মাণ্ডল আদায়ের কার্য্যে (অর্থাৎ সম্রাটের প্রধান আয়ের উপায় নির্দ্ধারণ তাঁহাদের স্বজাতি) বৈশ্য, প্রতিহার বা দ্বারবানের কার্য্যে শূদ্র নিযুক্ত হইয়াছিল।[৫৫] এই ব্রাহ্মণ-মহারাজগণের অধিকারে 'দত্ত'পদবীযুক্ত কায়স্থগণ পুরুষানুক্রমে অমাত্য, ভোগিক ও মহাসান্ধিবিগ্রহিকপদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। ১৫৬ গুপ্তাব্দে উৎকীর্ণ (খোহ্ নামক গ্রাম হইতে আবিষ্কৃত) মহারাজ হস্তীর তাম্রশাসন হইতে জানিতে পারা যায় যে, সূর্য্যদত্ত নামে একব্যক্তি তাঁহার মহাসান্ধিবিগ্রহিক ছিলেন। এই সূর্য্যদত্তের পিতা রবিদত্ত ভোগিক, রবিদত্তের পিতা নরদত্ত ভোগিক, এবং নরদত্তের পিতা বক্রদত্ত অমাত্যপদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন।[৫৬] উক্ত হস্তিরাজের (মাঝগাঁও হইতে আবিষ্কৃত) ১৯১ গুপ্তাব্দে উৎকীর্ণ আর একখানি তাম্রশাসন হইতে জানা যায় যে, উক্ত সূর্য্যদত্তের পুত্র বিভুদত্ত পরিব্রাজক মহারাজের মহাসান্ধিবিগ্রহিক ছিলেন।[৫৭]

হস্তিরাজের পুত্র মহারাজ সংক্ষোভের তাম্রশাসনেও জীবিতদাসের পৌত্র ও ভুজঙ্গদাসের পুত্র ঈশ্বরদাসকে উক্ত শাসনলেখক বা সান্ধিবিগ্রহিকপদে অধিষ্ঠিত দেখিতে পাই।[৫৮]

গুপ্তাধিকারে কায়স্থ-রাজকর্ম্মচারী

পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, অতি প্রাচীনকাল হইতেই সান্ধিবিগ্রহিকপদ কায়স্থজাতির প্রায় একচেটিয়া ছিল। কটক হইতে আবিষ্কৃত মহাভবগুপ্তের তাম্রলেখের প্রকাশক মহাশয় মুক্তকণ্ঠে প্রকাশ করিয়াছেন, "সান্ধিবিগ্রহিক অর্থাৎ সন্ধি ও যুদ্ধ-বিষয়ের মন্ত্রী, লেখক ও কর্ম্মাধ্যক্ষ সর্ব্বত্রই কায়স্থজাতি নিযুক্ত হইতেন। কেবল আলোচ্য কটকশাসন বলিয়া নহে, সিংহল ও মধ্যভারত হইতে আবিষ্কৃত তাম্রশাসন ও শিলালেখসমূহে সর্ব্বত্রই এই তথ্য পাওয়া গিয়াছে।"[৫৯]

খৃষ্টীয় ৪র্থ শতাব্দীর প্রারম্ভে গুপ্তবংশের অভ্যুদয়। এই শতাব্দীর শেষভাগ হইতেই আমরা কায়স্থগণকে উচ্চপদে অধিষ্ঠিত হইতে দেখি। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, আন্ধ্র সাতবাহন-দিগের সময়ে মধ্যপ্রদেশে কায়স্থগণ রাজপ্রতিনিধিত্ব পর্য্যন্ত পাইয়াছিলেন। আন্ধ্রপ্রভাব

(৫৫) এই সময়ের অবস্থা লক্ষ্য করিয়া শুক্রনীতিতে লিখিত হইয়াছে—

"গ্রামপো ব্রাহ্মণো যোজ্যঃ কায়স্থো লেখকস্তথা।
শুল্কগ্রাহী তু বৈশ্যো হি প্রতিহারশ্চ পাদজঃ।" (শুক্রনীতি ২।৪২০)

(৫৬) Dr. Fleet's Corpus Inscriptionum Indicarum, Vol. III. p. 105. উক্ত পণ্ডিতের মতে অমাত্য শব্দের অর্থ Counsellor, ভোগিক শব্দের অর্থ a technical official title, possibly connected with the territorial term ভোগ and ভুক্তি।

(৫৭) Dr. Fleet, Corpus Ins. Indi. III. p. 108.

(৫৮) Dr. Fleet, Do Do. p. 111.

(৫৯) "It is a noticeable fact that the *Sandhi-Vigrahi* or Minister of Peace and War, and the Secretary were always Kâyasthas, or men of the writer caste. This not only occurs in the Kataka-plates, but in grants or inscriptions found in Ceylon and Central India." (Indian Antiquary, Vol V. p. 57.)

ধ্বংস হইলে এ অঞ্চলে সম্ভবতঃ শকাধিকার বিস্তৃত হয়। এই শকরাজগণের কতকগুলি মুদ্রা ও অতি অল্পসংখ্যক শিলালেখ ভিন্ন বিশেষ কিছু ইতিহাস এ পর্য্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নাই, সুতরাং তাঁহাদের সময়ে শাসনবিভাগে কায়স্থগণের কিরূপ অধিকার ছিল, তাহা ঠিক জানিতে পারা যায় নাই। সমস্ত আর্য্যাবর্ত্তে ও দাক্ষিণাত্যে গুপ্তপ্রভাব বিস্তৃত হইলে ব্রাহ্মণের সহিত কায়স্থগণও উচ্চ রাজকীয় পদে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। তাহা উক্ত ব্রাহ্মণ-পরিব্রাজক-বংশধরগণের সমসাময়িক লিপি হইতে প্রমাণিত হইয়াছে। ব্রাহ্মণ-রাজ কায়স্থগণকে কিরূপভাবে দেখিতেন, অমাত্য, ভোগিক[৬০] ও সান্ধিবিগ্রহিকাদি প্রভৃতি কিরূপ শ্রেষ্ঠ রাজকীয়পদে কায়স্থগণকে নিযুক্ত করিতেন, তাহার প্রমাণ পূর্ব্বেই দিয়াছি। উক্ত পরিব্রাজক-রাজবংশ কেবল যে কায়স্থকে উচ্চ রাজকীয় পদে নিযুক্ত করিয়া ক্ষান্ত ছিলেন, তাহা নহে—এমন কি, যেখানে যেখানে তাঁহারা বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণদিগকে গ্রাম দান করিয়াছেন, প্রায় সেই সেই স্থলে সেই সঙ্গে কায়স্থগণকেও কিছু কিছু ভূমিদান করিয়া গিয়াছেন।[৬১] এই সকল ভূমিগৃহীতার মধ্যে দিবাকরদত্ত, ভাস্করদত্ত ও সূর্য্যদত্তের নাম পাই।[৬২]

পরিব্রাজকবংশীয় মহারাজগণের সমসাময়িক উচ্চকল্পের মহারাজগণের শিলালিপি ও তাম্রশাসনে আমরা 'দত্ত' ও 'দাস' উপাধিক কায়স্থগণকে পূর্ব্ববৎ রাজপদে অধিষ্ঠিত দেখি। মহারাজ জয়নাথের তাম্রশাসন হইতে পাওয়া যাইতেছে যে, অমাত্য রাজ্যিলের পৌত্র ও ভোগিক ব্রহ্মদত্তের পুত্র গুপ্তকীর্ত্তি তাঁহার তাম্রশাসনলেখক বা সান্ধিবিগ্রহিক এবং শর্ব্বদত্ত তাঁহার

(৬০) পরিব্রাজক-বংশীয়গণের তাম্রশাসনের অনুবাদক Dr. Fleet 'ভোগিক' শব্দের এইরূপ অর্থ করিয়াছেন—"If we may judge by the passage in line 8 of the Kavi grant of Jayabhata II (Ind. Ant. V. p. 114) the Bhogikas came in rank below the Samantas and Visayapatis" *Corpus*, III. p. 100, note 2.

(৬১) Dr. Fleet, Corpus, III. p. 96.

(৬২) ডাক্তার ফ্লিট এই সকল ব্যক্তিকে ব্রাহ্মণ ঠাওরাইয়াছেন। ঐ শাসনপত্রে ব্রাহ্মণদিগের পরিচায়ক বেদ ও গোত্রের স্পষ্ট উল্লেখ আছে। কিন্তু দিবাকর-দত্তাদির নামোল্লেখকালে বেদ বা গোত্রোল্লেখ নাই। সূর্য্যদত্ত যে মহারাজ হস্তীর সান্ধিবিগ্রহিক ছিলেন, সে কথা পূর্ব্বেই লিখিয়াছি। সান্ধিবিগ্রহিকপদে সাধারণতঃ কায়স্থগণ নিযুক্ত হইতেন, সে কথাও পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। দুই এক স্থানে অন্য জাতি সান্ধিবিগ্রহিক হইয়াছেন বটে, সেখানে তাঁহাদের স্পষ্ট জাতির উল্লেখ আছে, কিন্তু এরূপ সান্ধিবিগ্রহিক নিতান্ত বিরল। সান্ধিবিগ্রহিকপদ কায়স্থের একচেটিয়া ছিল বলিয়া প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থে সান্ধিবিগ্রহিক 'সন্ধিবিগ্রহলেখক' (অপরার্ক ৩,৮৬, বীরমিত্রোদয় ও কেশববৈজয়ন্তী ৬ অঃ), 'সন্ধিবিগ্রহকায়স্থ' (সোমদেবের কথাসরিৎসাগর ৪২।৯১) এবং 'সন্ধিবিগ্রহাধিকরণাধিকৃত' নামেও পরিচিত ছিলেন (৬৪ সংখ্যক পাদটীকা দ্রষ্টব্য)। ব্রাহ্মণের সহিত কায়স্থও ভূমিদান পাইতেন, পরিব্রাজকবংশীয় মহারাজগণের সমসাময়িক ও পরবর্ত্তী উচ্চকল্প-রাজগণের তাম্রশাসন হইতে ইহাও জানিতে পারা গিয়াছে। তাঁহাদের পরিচয় পরে লেখা হইয়াছে। তাঁহাদের বহু পরেও এ প্রথার পরিচয় পাইয়াছি। গোয়ালিয়ারের 'সাসবহুকা দেহরা' নামক মন্দিরে ১১৫০ সংবতে (১০৯৩ খৃষ্টাব্দে) উৎকীর্ণ মহীপালের শিলালিপিতে আছে—

'দূতকোপরিক-দীক্ষিত-গৃহপতি-স্থপতিসম্রাট্' ছিলেন।[৬৩] মহারাজ জয়নাথ শাশাতনিগ্রামবাসী দিবির[৬৪] সর্ব্ববাঢ়, তৎপুত্র ভাগবতগঙ্গ এবং তৎপুত্র রক্ষবোট ও অজগরদাসকে ভগবানের দেবাগ্রহারস্বরূপ ধবষণ্ডিকা গ্রাম দান করেন। পূর্ব্বকালে কায়স্থগণের মধ্যে আয়ব্যয়লেখকগণই 'দিবির' নামে পরিচিত ছিলেন। পরমভাগবত মহারাজ জয়নাথ দিবির কায়স্থকে কেন গ্রাম দান করিয়াছিলেন? তাঁহার উদ্দেশ্য যে পুরুষানুক্রমে যখনই প্রয়োজন হইবে, দিবিরের বংশধরের দেবমন্দিরের সংস্কার, নিত্যনৈমিত্তিক পূজাদির বলি ও চরু যোগাইবেন এবং অতিথিসেবা

" রামেশ্বরো দ্বিজবরস্তথা দামোদরো দ্বিজঃ।
অষ্টাদশৈতে বিপ্রাশ্চ পদিনো শড্ঢলো দ্বিজঃ॥
পাদোনপদিকৌ রত্নতিহুণকৌ সুরার্চ্চকৌ।
দ্বাবর্দ্ধপদিনাবেষ বিপ্রাণাং সংগ্রহঃ কৃতঃ॥
দদৌ দেবপদানাঞ্চ মধ্যাদর্দ্ধপদং নৃপঃ।
বিধায় শাশ্বতং লোহভট-কায়স্থসূরয়ে॥"

(Indian Antiquary, Vol. XV. p. 40, প্রাচীন লেখমালা ১ম ভাগ, ৯৪ পৃষ্ঠা)

অর্থাৎ দ্বিজবর রামেশ্বর, দামোদর, শড্ঢল প্রভৃতি ১৮ জনকে একপাদ করিয়া, দেবপূজক রত্ন ও তিহুণকে এক পাদের সিকি কম এবং দেবোত্তরের মধ্য হইতে লোহভট নামক কায়স্থ-পণ্ডিতকে অর্দ্ধপাদ দেওয়া হইল।

(৬৩) Dr. Fleet, Corpus, III. p. 119.

(৬৪) জয়নাথের উক্ত তাম্রশাসনের অনুবাদক ডাক্তার ফ্লিট লিখিয়াছেন—"Divira is a technichal official title, explained by Dr. Buhler as meaning a clerks, writers or accountants". Corpus Inscriptionum, Vol III. p. 123.

ডাক্তার বুহ্‌লর দেখাইয়াছেন 'দিপি' ও 'লিপি' এই দুই শব্দ প্রাচীন পারসিক ভাষায় লিখিত কীলরূপা শিলালিপির 'দিপি' হইতে আসিয়াছে—(Indian Palaeography, p. 5. and Indian Studies, Vol. III. p. 21, Westergaard's Zwei Abhandlung. 33) অশোকের খরোষ্ঠীলিপিতে দিপি, দিপতি, দিপপতি, লিখি এবং তাঁহার ব্রাহ্মী লিপিতে 'লিপি' ও 'লিবি' ব্যবহৃত হইয়াছে। এইরূপে দিপি ও দিবি হইতে 'দিবির' হইতে পারে। সুতরাং লিপিকর লেখক ও দিবির এক পর্য্যায়বাচী। কাশ্মীরে খৃষ্টীয় ৬ষ্ঠ শতাব্দের পর কায়স্থগণ রাজপদ ও তদধীন সকল উচ্চপদেই প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন, রাজতরঙ্গিণী হইতে তাহার বিস্তৃত পরিচয় পাওয়া যায়। এ কারণ কায়স্থগণের সময় যে সকল কায়স্থ লেখক ও গণকের কার্য্য করিতেন, তাঁহারা 'দিবির' কায়স্থ নামে পরিচিত হইয়াছেন। (রাজতরঙ্গিণী ৮।১৩১।) কাশ্মীরের সুপ্রসিদ্ধ কবি ব্যাসদাস ক্ষেমেন্দ্র তাঁহার লোকপ্রকাশে (৩য় প্রকাশে দিবিরের পরিচয়-দানকালে গঞ্জদিবির (treasury accountant), নগর-দিবির (City Accountant), গ্রামদিবির (Village accountant) ও খবাসদিবির (=দবীরখাস Privy-purse) দিবিরগণকে এই কয় শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়া তাঁহাদিগকে কায়স্থ বলিয়া পরিচিত করিয়াছেন। কাথি হইতে আবিষ্কৃত ধরসেনের তাম্রশাসনে 'সন্ধিবিগ্রহাধিকরণাধিকৃত দিবিরপতি স্কন্দভটেন লিখিতং' এইরূপ আছে। বুহ্‌লর এখানে দিবিরপতির Chief Secretary অর্থ করিয়াছেন। (Indian Antiquary, Vol. VI. p. 10)

অন্যত্রও ডাক্তার বুল্‌হর ক্ষেমেন্দ্রের অনুবর্ত্তী হইয়া দিবিরকে কায়স্থজাতি বলিয়াই স্থির করিয়াছেন।

(Epigraphia Indica, Vol. II. p. 254.)

চালাইবেন।"[৬৫] এই তাম্রশাসনখানিও ফল্গুদত্তের পৌত্র বরাহদিন্নের[৬৬] পুত্র গল্লুনামক সান্ধি-বিগ্রহিকের লিখিত।

উক্ত মহারাজ জয়নাথের পুত্র মহারাজ সর্ব্বনাথও ঐরূপ বিষ্ণুমন্দিরের সংস্কার ও তাহার নিত্যসেবা, বলি, চরু, সত্র, গন্ধ, ধূপ, মাল্য, দীপাদি পুরুষানুক্রমে নির্ব্বাহ করিবার জন্য শিবনন্দী, শক্তিনাগ, কুমারনাগ ও স্কন্দনাগকে তমসানদীতীরস্থ আশ্রমক নামক গ্রাম ভাগ করিয়া দিয়াছিলেন, এ সংবাদ তাঁহার তাম্রশাসন হইতেই পাওয়া যাইতেছে। এই তাম্রশাসন উক্ত বরাহদত্তের পুত্র মহাসান্ধিবিগ্রহিক মনোরথকর্তৃক লিখিত।[৬৭] এই মনোরথের পুত্র নাথদত্তও পরে মহারাজ সর্ব্বনাথের সান্ধিবিগ্রহিক হইয়াছিলেন, সর্ব্বনাথের অপর তাম্রশাসনে তাহার পরিচয় পাওয়া গিয়াছে।[৬৮]

উদ্ধৃত কএকটী প্রমাণ হইতে বেশ বুঝা যাইতেছে যে, গুপ্তাধিকারে ব্রাহ্মণাভ্যুদয়ের সময়ে কায়স্থগণ পুরুষানুক্রমে সান্ধিবিগ্রহিক প্রভৃতি উচ্চপদে নিযুক্ত ছিলেন এবং ব্রাহ্মণরাজবংশেরও তাঁহারা এতই প্রিয় হইয়া পড়িয়াছিলেন যে, তাঁহারা অনেককে পুরুষানুক্রমে দেবসেবা চালাইবার জন্য শাসনদ্বারা গ্রামদানও করিয়া গিয়াছেন। খৃষ্টীয় ৬ষ্ঠ শতাব্দ পর্য্যন্ত গুপ্তসম্রাট্-গণের প্রভাব অক্ষুণ্ণ ছিল, ঐ শতাব্দীর মধ্যভাগে হূণ নামক শকজাতীয় আর এক বংশ পঞ্জাব হইতে আসিয়া গুপ্তসাম্রাজ্য ধ্বংস করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। গুপ্তসম্রাট্ তাঁহাদের আক্রমণের গতি রোধ করিতে পারেন নাই। হূণাধিপ তোরমাণ ও মিহিরকুল অল্পদিন মধ্যে মগধ পর্য্যন্ত অধিকার করিয়া বসেন। অবশেষে গুপ্তসম্রাট্ বালাদিত্য মালবপতি যশোধর্ম্মা প্রভৃতির সাহায্যে বহু কষ্টে মিহিরকুলকে পরাজয় ও কিয়ৎপরিমাণে নষ্টগৌরব উদ্ধার করেন। ইহার অল্পদিন পরেই মালবপতি মহাবল যশোধর্ম্মা সমস্ত আর্য্যাবর্ত্ত জয় করিয়া রাজচক্রবর্ত্তী হইলেন,—পূর্ব্বে লৌহিত্য বা ব্রহ্মপুত্র নদ হইতে মহেন্দ্রগিরির উপত্যকা, উত্তরে হিমাচল হইতে গঙ্গাতট এবং পশ্চিমে সমুদ্র পর্য্যন্ত সকল জনপদের সামন্তগণ তাঁহার আধিপত্য স্বীকার করিয়াছিলেন।[৬৯]

(৬৫) "বিদিতং বোস্তু যথৈব গ্রামো ময়া চন্দ্রার্কসমকালিকঃ শাশাতনেয়-সর্ব্ববাঢ়-দিবিন্ন তৎপুত্র-ভাগবতগজ-তৎপুত্র-রুদ্রবোট-অগ্রগরদাসানাং স্বপুণ্যাভিবৃদ্ধয়ে ভগবৎপাদেভ্যঃ দেবাগ্রহারোৎসৃষ্টঃ। এভিশ্চাত্র প্রতিষ্ঠাপিতক-ভগবৎপাদানাং পুত্রপ্রপৌত্রতৎপুত্রাদিক্রমেণ খণ্ডকুট্টপ্রতিসংস্কারেণ বলিচরুসত্রপ্রবর্ত্তানাদ্যনুষ্ঠানেন চ স্বপুণ্যাভিবৃদ্ধিঃ কর্ত্তব্যা।" (খোহ্ গ্রাম হইতে আবিষ্কৃত মহারাজ জয়নাথের তাম্রশাসন Dr. Fleet, Corpus, III. p. 2.)

(৬৬) 'দিন্ন' ও 'দত্ত' একপর্য্যায় শব্দ ও একার্থবাচী।

(৬৭) Khoh copperplate inscription of the Maharaja Sarvanatha, dated the year 193. Vide Dr. Fleet's Corpus Inscri. Vol. III, p. 120-8

(৬৮) Vide Dr. Fleet. Corp. Ins. Ind. Vol. III. p. 135-138.

(৬৯) "আলৌহিত্যোপকণ্ঠাত্তালবনগহনোপত্যকাদামহেন্দ্রাদাগঙ্গাশ্লিষ্টসানোস্তুহিনশিখরিণঃ পশ্চিমাদাপয়োধেঃ।
সামন্তৈর্যস্য বাহুদ্রবিণহৃতমদৈঃ পাদয়োরানমদ্ভিশ্চূড়ারত্নাংশুরাজিব্যতিকরশবলা ভূমিভাগাঃ ক্রিয়ন্তে॥"
(মন্দসোরে উৎকীর্ণ যশোধর্ম্মার স্তম্ভলিপি —Dr. Fleet, III. 154.)

উক্ত রাজচক্রবর্ত্তী যশোধর্ম্মার সময়েও কায়স্থগণ শ্রেষ্ঠ রাজপদ পাইতেন। অশোকের রাজুকপদই এই রাজচক্রবর্ত্তীর সময়ে 'রাজস্থানীয়' আখ্যা লাভ করিয়া থাকিবে। আমরা এক নিগমবংশকে উক্ত 'রাজস্থানীয়' পদে অধিষ্ঠিত দেখি। মন্দসোর হইতে এই রাজস্থানীয় বংশের শিলালিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে, তৎপাঠে জানা যায় যে, ৫৮৯ মালবস্থিত্যব্দে (৫৩৩-৩৪ খৃষ্টাব্দে) নিগমবংশীয় দক্ষ নামক একব্যক্তি (মালবের অন্তর্গত দশপুরের নিকট) এক বৃহৎ কূপ প্রতিষ্ঠা করেন, সেই দক্ষের জ্যেষ্ঠভ্রাতা ধর্ম্মদাস মহারাজ বিষ্ণুবর্দ্ধনের মন্ত্রী এবং তাঁহার পিতৃব্য অভয়দত্ত বিন্ধ্য ও পারিযাত্রের মধ্যবর্ত্তী পশ্চিমসমুদ্র পর্য্যন্ত বিস্তীর্ণ জনপদের 'রাজস্থানীয়' ছিলেন।[১০] তাঁহার জ্যেষ্ঠ জীবদ্দাস একজন পরম ধার্ম্মিক এবং সংস্কৃত ও প্রাকৃত ভাষায় পণ্ডিত ছিলেন। তাঁহার পিতা রবিকীর্ত্তি, তৎপিতা বরাহদাস এবং বরাহের পিতা ষষ্ঠীদত্ত। যে অভয়দত্ত মহারাজ বিষ্ণুবর্দ্ধনের রাজস্থানীয়[১১] বা রাজপ্রতিনিধি ছিলেন, তাঁহার প্রপিতামহ ষষ্ঠীদত্ত সেই বংশের প্রতিষ্ঠাতা নৃপগণের আশ্রিত, তজ্জন্য তাঁহার পুণ্যকীর্ত্তি দিগন্ত বিশ্রুত হইয়াছিল এবং তাঁহার বংশধরগণ 'নৈগম'[১২] বলিয়া খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন।

"প্রনিধিদৃগনুগম্যা যস্য বৌদ্ধেন চাক্ষ্ণা ন নিশি তনু দবীয়ো বাস্ত্যদৃষ্টং ধরিত্র্যাম্।
পদমুদয়ি দধানোঽস্তরং তস্য চাভূৎ স ভয়মভয়দত্তো নাম চিন্বন্ প্রজানাম্॥
বিন্ধ্যাসাবন্ধ্যকর্ম্মা শিখরতটপটৎপাণ্ডুরেবাম্বুরাশের্গোলাঙ্গুলৈঃ সহেলং প্লুতি-নমিততরোঃ পারিযাত্রস্য চাদ্রেঃ।
আসিন্ধোরন্তরালং নিজশুচিসচিবাধ্যাসিতানেকদেশাং রাজস্থানীয়বৃত্ত্যা সুরগুরুরিব যো বর্ণিনাং ভূতয়ে পাৎ॥"
(Dr. Fleet, III. p. 154.)

(১০) Dr. Fleet., Corpus Ins. Ind. III. 153.

(১১) ক্ষেমেন্দ্রের লোকপ্রকাশে (৪র্থ প্র-)—"প্রজাপালনার্থমুদ্বহতি রক্ষয়তি চ স রাজস্থানীয়ঃ" অর্থাৎ প্রজাপালনের উদ্দেশ্যে যে ব্যক্তি কর্ম্ম করিয়া থাকেন ও প্রজাদিগের রক্ষা করিয়া থাকেন, তিনিই রাজস্থানীয়। ডাক্তার বুহ্‌লর রাজস্থানীয় শব্দের Viceroy বা রাজপ্রতিনিধি অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন। আমরা অশোকের 'রাজুক' ও 'রাজস্থানীয়' একার্থবাচী মনে করি। 'রাজুক' ও 'রাজস্থানীয়'গণই যাজ্ঞবল্ক্য স্মৃতিতে 'রাষ্ট্রাধিকৃত' আখ্যা লাভ করিয়াছেন। (যাজ্ঞবল্ক্য ১।৩৮)

(১২) ডাক্তার ফ্লিট 'নৈগম' শব্দের 'an interpreter of Vedic quotations and words" অর্থাৎ 'বৈদিকমন্ত্র ও শব্দের অর্থপ্রবক্তা'—এইরূপ অর্থ করিয়াছেন এবং এই 'নৈগম'শব্দ ধরিয়া ষষ্ঠীদত্তের বংশকে ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচিত করিয়াছেন। (Vide Corpus Ins. Indi. III. 152) শিলালিপি ও তাম্রশাসনসমূহে যেখানে যেখানে কোন ব্রাহ্মণবংশের পরিচয় আছে, সেখানেই সাধারণতঃ গোত্র ও বেদের উল্লেখ দেখা যায়। কিন্তু এই সুবৃহৎ মন্দসোরলিপিতে ষষ্ঠীদত্ত ও তাঁহার বংশধরগণ সম্বন্ধে দীর্ঘচ্ছন্দে ১৮টী শ্লোকে তাঁহাদের বিদ্যাবত্তার যথেষ্ট গৌরবজনক পরিচয় থাকিলেও স্পষ্টতঃ কোথাও তাঁহাদিগকে ব্রাহ্মণ বলা হয় নাই, অথবা তাঁহাদের গোত্র ও বেদের কোন উল্লেখ নাই, এরূপস্থলে এই বংশকে কখনই ব্রাহ্মণ বলা যায় না। বলা বাহুল্য, রাজুক বা রাজস্থানীয় কায়স্থবংশের একটী প্রধান শাখা উত্তরপশ্চিমপ্রদেশে অদ্যাপি 'নিগম' নামে পরিচিত। নিগম-কায়স্থশ্রেণী প্রাচীন শিলালিপিতে 'নৈগম' বলিয়া খ্যাত ছিলেন, সম্ভবতঃ ষষ্ঠীদত্ত হইতেই নিগম বা নৈগম শ্রেণীর প্রতিষ্ঠা।

দ্বিতীয় অধ্যায়

বঙ্গের আদি কায়স্থ-সমাজ

সূচনায় জানাইয়াছি যে, একদিন এই গৌড়বঙ্গ কায়স্থপ্রধান স্থান বলিয়া সর্ব্বত্র পরিচিত ছিল। সাড়ে তিন শত বর্ষ পূর্ব্বে দিল্লীশ্বর অক্‌বরের সভাসদ্ ও ঐতিহাসিক আবুল্‌ফজল্ লিখিয়া গিয়াছেন যে, এই গৌড়বঙ্গ উনিশশত বর্ষেরও অধিককাল কায়স্থশাসিত ছিল। যদিও ইহা অত্যুক্তি বলিয়া মনে হইবে, তথাপি তাঁহার বিবরণী সমস্তটা অলীক বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া যায় না, তাহার আভাস উপক্রমেই দিয়াছি।

আবুল্‌ফজল্ কি প্রমাণে সেই দূর অতীতের দীর্ঘকাল কায়স্থশাসনের উল্লেখ করিয়াছেন, এক্ষণে সেই সকল প্রমাণের যথেষ্ট অভাব ঘটিয়াছে। বাস্তবিক সম্রাট্ অশোকের পূর্ব্ববর্ত্তী বঙ্গের ইতিহাস্ নিবিড় তমসাচ্ছন্ন। জৈনদিগের প্রাচীন অঙ্গ ও কল্পসূত্র হইতে দেখিতে পাই যে, খৃষ্টজন্মের ৮০০ বর্ষ পূর্ব্বে অর্থাৎ প্রায় সাতাইশ শত বর্ষ হইতে চলিল ২৩শ তীর্থঙ্কর পার্শ্বনাথ স্বামী পুণ্ড্র, রাঢ় ও তাম্রলিপ্ত প্রদেশে বৈদিক কর্ম্মকাণ্ডের প্রতিকূলে 'চাতুর্যাম'ধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিলেন। তাঁহারও পূর্ব্বে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের জ্ঞাতি ২২শ তীর্থঙ্কর নেমিনাথ অঙ্গবঙ্গে ভিক্ষুধর্ম্ম প্রচার করেন। ভগবান্ বুদ্ধ ও শেষ তীর্থঙ্কর মহাবীরস্বামীও যথাক্রমে অঙ্গে ও রাঢ়দেশে স্ব স্ব ধর্ম্মমত প্রচার করিয়াছিলেন। বলা বাহুল্য, ইঁহারা সকলেই বৈদিক আর্য্যধর্ম্ম-বিরোধী হওয়ায় তাঁহাদের প্রভাবে প্রাচ্যভারত অনেকটা বৈদিকাচারবিহীন ছিল—এ কারণ এখানে অতি পূর্ব্বকালে ব্রাহ্মণপ্রভাব ছিল না বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। বৈদিক বিপ্রগণ অঙ্গবঙ্গের প্রতি অতি ঘৃণার চক্ষেই দৃষ্টিপাত করিয়া গিয়াছেন। এই কারণ ব্রাহ্মণদিগের গ্রন্থে অঙ্গবঙ্গের সুপ্রাচীন কাহিনী স্থানলাভ করিতে পারে নাই, অথবা অতি প্রাচীনকালে অঙ্গবঙ্গের যে সকল কাহিনী ব্রাহ্মণবিরোধী জৈন-বৌদ্ধগণ লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছিলেন, ব্রাহ্মণাভ্যুদয় কালে যত্নাভাবে সেই সকল বিলুপ্ত হওয়া কিছু অসম্ভব নহে। সেই অতীতকালের ক্ষীণস্মৃতি প্রচলিত দুই একখানি বৌদ্ধ ও জৈনগ্রন্থে মাত্র পাইতেছি। তাহা হইতেই আমরা সামান্যতঃ জানিতে পারি যে, মহাবীরস্বামী ও শাক্যবুদ্ধ উভয়ের জন্মকালে অঙ্গদেশে ব্রহ্মদত্ত ও মগধে শ্রেণিক বিম্বিসারের পিতা ভট্টিয় রাজত্ব করিতেছিলেন। ব্রহ্মদত্ত ভট্টিয়কে পরাজয় করিয়াছিলেন। তাহার প্রতিশোধ লইবার জন্য বিম্বিসার অঙ্গের রাজধানী চম্পা অধিকার করেন। পিতার মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত বিম্বিসার এই চম্পাপুরীতেই অবস্থান করিয়াছিলেন। এই সময়েই বুদ্ধদেব এখানে সঙ্ঘের কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য সম্বন্ধে উপদেশ দিয়াছিলেন। মহাবীরস্বামীরও তৎকালে এখানকার এক কায়স্থগৃহে পারণ করিবার প্রসঙ্গ আছে। বিম্বিসারের পুত্র

অজাতশত্রু চম্পায় আসিয়া রাজধানী করেন। এ সময়ও এখানে বৌদ্ধপ্রভাব ছিল, কিন্তু অল্পদিন পরেই গণধর সুধর্ম্মস্বামী জম্বূস্বামীর সহিত চম্পায় আসিয়া জৈনধর্ম্ম প্রচার করেন। ইহার কিছুকাল পরে জম্বূস্বামীর শিষ্য বৎসগোত্রসম্ভূত শয্যম্ভব এখানে আসেন, তাঁহার নিকট জৈনধর্ম্মের উপদেশ শুনিয়া বহুলোক জৈনধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছিলেন। জৈনশাস্ত্রমতে বীর-মোক্ষের ৬০ বর্ষ পরে অর্থাৎ ৪৬৭ খৃষ্ট-পূর্ব্বাব্দে ১ম নন্দের অভিষেক।[১] ইহারই চারি বর্ষ পরে অর্থাৎ ৪৬৩ খৃষ্ট-পূর্ব্বাব্দে গণধর জম্বূস্বামী মোক্ষলাভ করেন। ১ম নন্দের পর আরও ৭ জন নন্দ রাজত্ব করেন, কল্পকপুত্র শকটালের ভ্রাতৃগণ তাঁহাদের মন্ত্রিত্ব করিয়াছিলেন। তৎপরে ৯ম নন্দ রাজা হইলে শকটাল তাঁহার মন্ত্রী হইলেন। এই শকটালের পুত্র জৈনাচার্য্য স্থূলভদ্র। স্থূলভদ্রের কিছু পূর্ব্বে জৈনদিগের শেষ শ্রুতকেবলী ভদ্রবাহুর অভ্যুদয়। সমস্ত ভারতেই তাঁহার শিষ্যপ্রশিষ্য ছড়াইয়া পড়িয়াছিলেন। তাঁহার কাশ্যপগোত্রীয় চারিজন প্রধান শিষ্য ছিল, তন্মধ্যে প্রধান শিষ্যের নাম গোদাস। এই গোদাস হইতে চারিটি শাখার সৃষ্টি, এই চারিশাখার নাম তাম্রলিপ্তিকা, কোটীবর্ষীয়া, পুণ্ড্রবর্দ্ধনীয়া ও দাসী কর্ব্বটীয়া।[২] এই অতি প্রাচীনকালে চারিটী শাখার নাম হইতেই প্রতিপন্ন হইতেছে যে, দক্ষিণ, উত্তর, পূর্ব্ব ও পশ্চিম সমস্ত বঙ্গেই জৈনদিগের শাখাপ্রশাখা বিস্তৃত হইয়াছিল।

মৌর্য্যসম্রাট্‌গণের ইতিহাস পাঠ করিয়াও আমরা জানিতে পারিয়াছি, তাঁহারা সকলেই এক সময়ে জৈনধর্ম্মে অনুরক্ত ছিলেন। মৌর্য্যাধিপ চন্দ্রগুপ্ত শ্রুতকেবলী ভদ্রবাহুর নিকট জৈনধর্ম্মে দীক্ষিত হন। অশোক প্রথমে আনুষ্ঠানিক বৈদিকধর্ম্মের কতকটা পক্ষপাতী হইলেও মধ্যে জৈনধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছিলেন, শেষে তিনি একজন গোঁড়া বৌদ্ধ হইলেও তাঁহার পৌত্র দশরথ জৈন আজীবকগণের প্রতি অনুরক্ত ছিলেন, দশরথের শিলালিপি[৩] হইতেই তাহার পরিচয় পাইতেছি। এরূপস্থলে অতি প্রাচীনকাল হইতেই রাঢ়বঙ্গে বিশেষভাবে জৈনপ্রভাব ও তৎসঙ্গে বৌদ্ধসংস্রব ছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই।

চীন-পরিব্রাজকগণের বর্ণনা হইতেও আমরা বেশ বুঝিতে পারি যে, সম্রাট্ অশোক এ অঞ্চলে বৌদ্ধধর্ম্ম-প্রচারের বিশেষ আয়োজন করিয়াছিলেন। তিনি উত্তর, পশ্চিম ও পূর্ব্ববঙ্গে ধর্ম্মরাজিকা প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, সম্ভবতঃ পুষ্যমিত্রের যত্নে তাঁহার অধিকাংশই বিলুপ্ত হয়। কেবল ভীমপ্রবাহা পদ্মা ও বলেশ্বরের তরঙ্গভীতি পূর্ব্ববঙ্গের ধর্ম্মরাজিকা রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছিল, মুসলমান আমলে সেই ধর্ম্মরাজিকা বিলুপ্ত হইলেও ঢাকা-জেলাস্থ সুপ্রসিদ্ধ ধামরাই গ্রাম আজও সেই ধর্ম্মরাজিকার স্মৃতি বজায় রাখিয়াছে।

যাহা হউক, উত্তর ও পশ্চিমবঙ্গে গুপ্তাধিকার বিস্তারের সহিত কতকটা বৈদিক ও

(১) হেমচন্দ্রের পরিশিষ্টপর্ব্ব ৬।৬১।

(২) জৈন কল্পসূত্র দ্রষ্টব্য।

(৩) বরাবর গুহায় খোদিত মহারাজ দশরথের অনুশাসনলিপি দ্রষ্টব্য।

পৌরাণিক মত প্রচলিত হইলেও পূর্ব্ব ও দক্ষিণবঙ্গ বহুকাল জৈননির্গ্রন্থ ও বৌদ্ধশ্রমণগণের লীলাস্থলী বলিয়াই পরিচিত ছিল।

জৈন ও বৌদ্ধগ্রন্থে ব্রহ্মদত্ত নৃপতির নাম পাওয়া যায়। আবুল্‌ফজলের কথা বিশ্বাস করিলে তাঁহাকে কায়স্থ-নৃপতি বলিয়া গ্রহণ করিতে হয়। তিনি শ্রেণিকরাজের নিকট অঙ্গ ও পশ্চিম বঙ্গ হারাইয়া দক্ষিণরাঢ় বা পূর্ব্ববঙ্গ আশ্রয় করিয়াছিলেন। বলা বাহুল্য, সেই সুপ্রাচীনকাল হইতে গুপ্তশাসনের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত এখানকার কায়স্থ-সন্তানগণ হয় জৈন, নয় বৌদ্ধধর্ম্মের পক্ষপাতী ছিলেন। বহুশত বর্ষ ধরিয়া যে ধর্ম্মের প্রভাব যে সমাজের উপর আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিল, সেই মূলধর্ম্ম বিলুপ্ত হইলেও সমাজের স্তরে স্তরে প্রস্তররেখাবৎ তাহার চিহ্ন অবশ্য থাকিয়া যাইবে। এ কারণ এখানকার সেই পূর্ব্বতন কায়স্থ-সমাজের অনন্তর-জাত বর্ত্তমান সমাজেও তাহার ক্ষীণ স্মৃতির অত্যন্তাভাব ঘটে নাই।

গুপ্তাধিকারে যেমন পশ্চিম-ভারতে কায়স্থগণ ধীরে ধীরে ব্রাহ্মণভক্ত ও উচ্চ-রাজকীয় পদে অধিষ্ঠিত হইয়াছিলেন, এখানকার কায়স্থসমাজকে সেরূপ নীতি অবলম্বন করিতে হয় নাই। তাঁহারা পূর্ব্বতন মৌর্য্য ও শকাধিকারে বরাবর স্ব স্ব প্রতিপত্তি অক্ষুণ্ণ রাখিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। শুঙ্গ, কাণ্ব ও গুপ্তাধিকারে তাঁহারা বাধ্য হইয়া কতকটা রাজনীতির অনুবর্ত্তী হইলেও পূর্ব্ব এবং দক্ষিণ-বঙ্গের তখনকার কায়স্থ-সমাজ অনেকটা পূর্ব্ব রীতিনীতি রক্ষা করিয়া চলিতেছিলেন; তবে গুপ্তাধিকারে তাঁহাদের দায়াদ উত্তর ও পশ্চিমবঙ্গের কায়স্থগণের প্রভাব ধীরে ধীরে তাঁহাদের মধ্যে সংক্রামিত হইতেছিল। গুপ্ত-প্রভাব যখন খর্ব্ব হইয়া আসিতেছিল, তৎকালে রাঢ় ও বরেন্দ্রের কায়স্থ-অধিপ বা মহামাণ্ডলিকগণ স্বাধীনতা অবলম্বনের সহিত পূর্ব্ব ও দক্ষিণবঙ্গে আধিপত্য বিস্তার করিতেছিলেন এবং অধিকারভুক্ত স্থানসমূহে কায়স্থগণ নবনীতির অনুবর্ত্তন করিতেছিলেন।

মালবপতি যশোধর্ম্মার শিলালেখ হইতে জানা যায় যে, তিনি লৌহিত্য বা কামরূপ পর্য্যন্ত সমস্ত প্রাচ্যভারত জয় করিয়াছিলেন এবং তাঁহার সময়ে গুপ্তবংশের পূর্ব্বপ্রভাব লুপ্তপ্রায় হইয়াছিল। পূর্ব্ব অধ্যায়ে লিখিয়াছি যে, তাঁহার রাজত্বকালে কায়স্থগণ নানা উচ্চপদে অধিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। এমন কি, নিগমকায়স্থ ষষ্ঠীদত্তের বংশধর অভয়দত্ত বিন্ধ্য ও পারিযাত্রের মধ্যবর্ত্তী প্রদেশে 'রাজস্থানীয়' বা রাজপ্রতিনিধি-পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। ঐ সময়ের শিলালেখ-সমূহে নন্দী, কুণ্ড, নাগ, পালিত প্রভৃতি উপাধিধারী কায়স্থ-কর্ম্মচারিগণের পরিচয় আছে। সম্ভবতঃ মালবপতি যশোধর্ম্মার বঙ্গাক্রমণ-কালে ঐরূপ কায়স্থ-কর্ম্মচারী তাঁহার সহিত এদেশেও আসিয়া থাকিবেন। তাঁহার সম-সময়ে বা অত্যল্পকাল পরেই 'বারক-মণ্ডল' বা বরেন্দ্র অঞ্চলে ধর্ম্মাদিত্য নামে এক নৃপতির অভ্যুদয় ঘটে। সমুদ্রতীর পর্য্যন্ত ভূভাগ তাঁহার শাসনাধীন ছিল। অধিক সম্ভব, যশোধর্ম্মার বঙ্গবিজয়ের পর ধর্ম্মাদিত্য প্রথমতঃ তাঁহার অধীন মহারাজ বা রাজস্থানীয় রূপেই রাজত্ব করিতেন। যশোধর্ম্মার মৃত্যু ও গুপ্তসম্রাট্‌গণের প্রভাব হ্রাসের সঙ্গে সঙ্গে তিনি স্বাধীনতা অবলম্বন ও সমস্ত প্রাচ্যভারত অধিকার করিয়া 'মহারাজাধিরাজ' 'পরমভট্টারক'

উপাধি গ্রহণ করেন। রাজস্থানীয় অভয়দত্তের মত ধর্ম্মাদিত্যের নামমাত্র অধীনে মহারাজ স্থাণুদত্ত পূর্ব্ববঙ্গ শাসন করিতেন। কয়েক বর্ষ হইল, ফরিদপুর জেলা হইতে উক্ত মহারাজাধিরাজ ধর্ম্মাদিত্য এবং তৎপরবর্ত্তী মহারাজাধিরাজ গোপচন্দ্র ও মহারাজাধিরাজ সমাচারদেবের যথাক্রমে চারিখানি তাম্রশাসন আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই চারিখানি তাম্রশাসনই বঙ্গীয়-কায়স্থ-সমাজের সুপ্রাচীন ইতিহাসের অপূর্ব্ব ও অমূল্য উপকরণ বলিয়া পরিগৃহীত হইতে পারে; এই কারণে এই চারিখানি শাসন সম্বন্ধেই আলোচনা করা একান্ত প্রয়োজন বলিয়া মনে হয়। এই চারিখানি তাম্রশাসনের মধ্যে দুইখানি মহারাজাধিরাজ ধর্ম্মাদিত্যের আধিপত্যকালে, একখানি মহারাজাধিরাজ গোপচন্দ্রের অধিকারকালে এবং অন্য একখানি মহারাজাধিরাজ সমাচারদেবের রাজ্যশাসনকালে প্রদত্ত হইয়াছিল। ধর্ম্মাদিত্য ও গোপচন্দ্র 'ভট্টারক' উপাধিতে ভূষিত, কিন্তু সমাচারদেবের এরূপ কোন উপাধির পরিচয় নাই।

এই তিন জনই একবংশীয় কি না, তাহারও কোন সন্ধান পাওয়া যায় নাই। যথাক্রমে আদিত্য, চন্দ্র ও দেব এই তিনটী উপাধি হইতে তিন জনকেই ভিন্ন বংশীয় বলিয়া মনে হয়। তাম্রশাসন-চতুষ্টয়ের পাঠ ও অনুবাদ-প্রকাশক উক্ত তিন জন নৃপতিকেই ব্রাহ্মণ বলিয়া মনে করিয়াছেন।[৪] কিন্তু অনুমান ভিন্ন কোন প্রমাণ দিতে পারেন নাই। চীনপরিব্রাজক য়ুঅং চুঅং খৃষ্টীয় ৭ম শতাব্দীতে স্বয়ং কামরূপে আসিয়া এখানকার অধিপতি কুমার ভাস্করবর্ম্মাকে ভ্রমবশতঃ 'ব্রাহ্মণ' বলিয়া উল্লেখ করিয়াছিলেন, ইঁহাদের সম্ভবতঃ সেইরূপ কোন ভ্রম হইবার সম্ভাবনা। বাস্তবিক চীনপরিব্রাজক যখন পুণ্ড্রবর্দ্ধন বা সমতটে আগমন করেন, তখনও তিনি এখানে কোন ব্রাহ্মণ-নৃপতির সংবাদ পান নাই। উক্ত চীনপরিব্রাজকের আগমনের প্রায় শতবর্ষ পূর্ব্বে মহারাজাধিরাজ ধর্ম্মাদিত্যের অভ্যুদয়।[৫] তাঁহার ও তৎপরবর্ত্তী মহারাজাধিরাজ গোপচন্দ্র ও সমাচারদেবের তাম্রশাসন হইতে প্রমাণিত হইতেছে যে, সেই দুর অতীতকালেও তখনকার বঙ্গসমাজে এখনকার মত দত্ত, মিত্র, ঘোষ, সেন, কুণ্ড, নাগ, পালিত, চন্দ্র, ভোগ, ভূতি প্রভৃতি উপাধিধারী কায়স্থগণ বিদ্যমান ছিলেন। উক্ত চারিখানি তাম্রশাসন হইতেই বেশ বুঝা যায় যে, উক্ত মহারাজাধিরাজগণের অধিকারে উপরিক, অধিকরণিক, বিষয়পতি, মহত্তর, সাধনিক প্রভৃতি তাম্রশাসন-বর্ণিত রাজকীয় পদে সর্ব্বত্রই কায়স্থ অধিষ্ঠিত ছিল। এ অবস্থায় মনে হয় যে, ধর্ম্মাদিত্য প্রভৃতি বঙ্গীয় মহারাজাধিরাজগণ কায়স্থ ছিলেন, তাই তাঁহাদের অধিকারে একমাত্র কুলস্বামী ও বৃহচ্চট্ট ব্যতীত সকল রাজকীয় পদে কায়স্থকেই অধিষ্ঠিত দেখিতে পাওয়া যায়। আদিত্য, চন্দ্র ও দেব উপাধি অতি প্রাচীনকাল হইতেই বঙ্গের

(৪) Journal of the Asiatic Society of Bengal, 1911, p. 500.

(৫) ডাক্তার হোরন্‌লি, পার্গিটার প্রভৃতি পুরাবিদ্‌গণের মতে ধর্ম্মাদিত্য মালবপতি যশোধর্ম্মারই নামান্তর, কিন্তু ধর্ম্মাদিত্য ও যশোধর্ম্মাকে অভিন্ন বলিয়া গ্রহণ করিবার কোন উপযুক্ত প্রমাণই এ পর্য্যন্ত বাহির হয় নাই। মালবপতি যশোধর্ম্মা বঙ্গবিজয় করিয়া গেলে পরেই ধর্ম্মাদিত্যের অভ্যুদয় এবং যশোধর্ম্মার মৃত্যুর পরেই সম্ভবত ধর্ম্মাদিত্য সমস্ত অঙ্গ-বঙ্গ অধিকার করিয়া 'মহারাজাধিরাজ' উপাধি গ্রহণ করেন।

কায়স্থ-সমাজে প্রচলিত। কিন্তু এখানকার ব্রাহ্মণ-সমাজে এরূপ কোন উপাধির সন্ধানই পাওয়া যায় নাই। এই সকল কারণে উপাধি হইতেও ধর্ম্মাদিত্য, গোপচন্দ্র ও সমাচারদেবকে কায়স্থ বলিয়া গ্রহণ করিতে আর আপত্তি থাকে না। ধর্ম্মাদিত্যের অধীন মহারাজ স্থাণুদত্তকেও দত্তবংশীয় কায়স্থ মনে করি।

ধর্ম্মাদিত্যের সমসাময়িক দুইখানি তাম্রশাসনের মধ্যে তাঁহার ৩য় রাজ্যসংবতে উৎকীর্ণ তাম্রশাসনে এইরূপ লিখিত আছে[৬]—

'ওম্ স্বস্তি, পৃথিবীর মধ্যে যাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী নাই, (যাঁহার) যযাতি-অম্বরীষের সমান অধিকার, (সেই) মহারাজাধিরাজ শ্রীধর্ম্মাদিত্যের রাজ্যে তৎপ্রসাদলব্ধ-বৈভব মহারাজ স্থাণুদত্তের শাসনকালে তাঁহার নিযুক্ত বরাকমণ্ডলে বিষয়পতি জাজাবের যখন আয়োগ ও অধিকরণ বা শাসন চলিতেছে, তৎকালে এই বিষয়ের মহত্তর এটিত, কুলচন্দ্র, গরুড়, বৃহচ্চট্ট, আলুক, ভাশৈত্য, শুভদেব, চন্দ্রঘোষ, অনিমিত্র, গুণচন্দ্র, কালসখ, কুলস্বামী, দুর্লভ, সত্যচন্দ্র, অর্জ্জুনবপ্প, কুণ্ডলিগুপ্ত প্রমুখ বিষয়-মহত্তর ও সাধারণ প্রজাবৃন্দকে সাধনিক বাতভোগের দ্বারা জানান হইয়াছে ; 'আমি ইচ্ছা করিয়াছি, আপনাদের নিকট হইতে একখণ্ড চাষের জমি ক্রয় করিয়া ব্রাহ্মণকে দান করিব। তজ্জন্য আপনারা উপযুক্ত মূল্য লইয়া বিষয় হইতে ভাগ করিয়া দিন।......এই জমির চতুঃসীমা এইরূপ—পূর্ব্বে হিমসেন-পাটক, দক্ষিণে ত্রিঘট্টিকা ও তাম্র-পট্টের জমি, দক্ষিণে ত্রিঘট্টিকা ও শীলকুণ্ড এবং 'নাবাতাক্ষেণি' বা জাহাজ নির্ম্মাণের বন্দর ও হিমসেন পাটক। ইত্যাদি ৮

ধর্ম্মাদিত্যের সময়কার দ্বিতীয় তাম্রশাসনে স্পষ্টই কায়স্থ-প্রসঙ্গ আছে। এই কারণে এই তাম্রশাসনের অধিকাংশ স্থলের অনুবাদই প্রকাশ করিতেছি[৭]—

(৬) (মূলের অক্ষরান্তর—সম্মুখভাগ)

ওঁ স্বস্ত্যস্যাং পৃথিব্যামপ্রতিরথে যযাত্যম্বরীষ-সমধৃতৌ ম-
হারাজাধিরাজ শ্রীধর্ম্মাদিত্যরাজ্যে তৎপ্রসাদলব্ধাস্পদে মহারাজস্থা-
ণুদত্তস্যাধ্যাসনকালে তদ্বিনিযুক্তকবারকমণ্ডলে বিষয়পতিজ-
জাবস্যায়োগোঽধিকরণং বিষয়মহত্তরেটিতকুল-চন্দ্রগরুড়বৃহচ্চ-
ট্টালুকানাচারভাশৈত্যশুভদেবঘোষচন্দ্রানিমিত্রগুণচন্দ্রকালস-
খকুলস্বামিদুর্ল্লভসত্যচন্দ্রার্জ্জুনবপ্পকুণ্ডলিগুপ্তপুরোগাঃ প্রকৃতয়শ্চ
সাধনিকবাতভোগেন বিজ্ঞাপ্তাঃ ইচ্ছাম্যহং ভবতাং সকাশাৎ ক্ষেত্রখণ্ডমপ-
ক্রীয় ব্রাহ্মণস্য প্রতিপাদয়িতুং তদর্হথ মত্তো মূল্যং গৃহীত্বা বিষয়ে বিভ-
জ্য দাতুমিতি। (Indian Antiquary, Vol. XXXIX, p. 197)

(৭) (মূলের অক্ষরান্তর—সম্মুখভাগ)

স্বস্ত্যস্যাম্পৃথিব্যামপ্রতিরথে নৃগনহুষযযাত্য-
ম্বরীষসমধৃতৌ মহারাজাধিরাজশ্রীধর্ম্মাদিত্যভট্টারকরা-
জ্যে তদনুমোদনালব্ধাস্পদো নব্যাবকাশিকায়াং মহাপ্রতি-

'স্বস্তি। এই পৃথিবীতে (যাঁহার) প্রতিদ্বন্দ্বী নাই, নৃগ-নহুষ-যযাতি-অম্বরীষের সমান অধিকার, মহারাজাধিরাজ শ্রীধর্ম্মাদিত্য ভট্টারকের রাজ্যে তাঁহার অনুমোদনলব্ধাস্পদ নব্যাবকাশিকায় মহাপ্রতিহারোপরিক নাগদেবের অধিষ্ঠান বা শাসনকালে, তৎকর্ত্তৃক বারকমণ্ডলের অন্তর্গত বিষয়ে ব্যাপারকার্য্যে গোপালস্বামী নিযুক্ত ছিলেন। যখন নাগদেব রাজকীয় ব্যবহারানুসারে কার্য্য করিতেছেন, তৎকালে জ্যেষ্ঠ-কায়স্থ নয়সেন অধিকরণ বা শাসনবিভাগের প্রধান এবং এই বিষয়ের সোমঘোষ প্রমুখ অপরাপর মহত্তরগণের নিকট উপস্থিত হইয়া বসুদেবস্বামী সাদরে জানাইয়াছিলেন, "আপনাদের অনুগ্রহে উপযুক্ত মূল্য দিয়া আপনাদের কৃষিক্ষেত্রের মধ্য হইতে কতকটা জমি ক্রয় করিতে ইচ্ছা করিয়াছি। আমার মাতা, পিতা ও নিজের

হারোপরিকনাগদেবস্যাধ্যাসনকালেনেনাপি বারকমণ্ডল-
বিষয়াধিনিযুক্তকব্যাপারকারণ্ডয় গোপালস্বামী
যতোস্ত সব্যবহরতো বসুদেবস্বামিনা সাদরমভিগম্য
জ্যেষ্ঠকায়স্থ-নয়সেনপ্রমুখমধিকরণম্মহত্তর-
সোমঘোষপুরঃসরশ্চ বিষয়াণাং মহত্তরা বিজ্ঞাপ্তাঃ
ইচ্ছেয়ন্তবতান্ প্রসাদাদ্যথার্ঘেণ ভবস্ত্যোয়েব ক্ষেত্রখণ্ডলকে-
ক্রীত্বা মাতাপিত্রোরাত্মনশ্চ পুণ্যাভিবৃদ্ধয়ে গুণবৎ কাণ্ব বা-
জিসনেয়লৌহিত্যসগোত্রায় ব্রাহ্মণে সোমস্বামিনে প্রতি-
পাদিতুং তদর্হথাস্মদ্ বিজ্ঞাপবসাস্তানমাংসংনিভক্ত মিত্যেদ্যা-
ভ্যর্থানমধিকৃত্যাস্ত্যেতৎপ্রাক্ক্রিয়মাণকমর্য্যাদা চতুর্দ্দীনারিক্য
কুল্যবাপেন ক্ষেত্রাণি বিক্রিয়ন্তানিত্যস্মাবসুস্বামিনঃ

(পশ্চাদ্ভাগ)

খিল ... ... কুল্যবাপস্য প্রার্ত্তবাপাধিকস্য দীনার-
দ্বয়মাদায় যথার্হক্ষ যষ্টগর্গণ্ডযবাস্ত্রয়ুরস্মানি
শাৎপলানি শ্রীমান্ মহত্তরথোড়সম্বন্ধক্ষেত্রখণ্ডলকাণ্ডসনী
পুত্তপালজন্মভূতেরবধারণায়াবধৃত্য পূর্ব্বেন্দু শিবদপুত্তত
ধর্ম্মশীল-শিবঃস্রহস্তাষ্টকনবকমলেনাপবিক্য বসুদে-
বব্রাহ্মণায় বিক্রীতমস্তেনাপি ক্রীতং। সীমালিঙ্গানি চাত্র
পূর্ব্বস্যাম্ সোগ-তাম্রপট্টসীমা। বৃদ্ধাশ্বত্থপুট্ট কিপর্কটীবৃক্ষসী-
মা পশ্চিমস্যাং গোরথসকৃৎপরস্তাস্তাটকরঘণ্ডেরস্যাপি-
শেভিশ্চ নৌদণ্ডকসীমা। উত্তরস্যাং গগর্গষামতাম্রপট্টসীমা।
ভবন্তি চাত্র ধর্ম্মশাস্ত্রশ্লোকানি। যষ্টিং বর্ষসহস্রাণি
স্বর্গে মোদন্তি ভূমিদঃ আক্ষেপ্তা চানুমন্তা চ তান্যেব
নরকে বসেৎ। স্বদত্তাং পরদত্তাম্বা যো হরেত বসু-
ন্ধরাং স্ববিষ্ঠায়াং কৃমিভূর্ত্বা পিতৃভিঃ সহ পচ্যতে

পুণ্যবৃদ্ধির জন্ম কাণ্ব বাজসনেয়শাখা লৌহিত্যে গোত্র সোমস্বামী নামক গুণবান্ ব্রাহ্মণকে এই ক্ষেত্রখণ্ড দান করিতে ইচ্ছা করি। তজ্জন্ম ক্ষেত্রখণ্ডটি পৃথক্ করিয়া দিবার জন্ম অনুরোধ করিতেছি।” এখানকার প্রতি কুল্যবাপ জমির হার চারি দীনার নির্দ্দিষ্ট আছে। অতএব এই অনুরোধরক্ষার জন্ম উক্ত বসুস্বামীর নিকট দুই দিনার লইয়া কুল্যবাপ ও প্রবর্ত্ত-বাপ জমির মূল্যস্বরূপ এবং পুস্তপাল জন্মভূতির অবধারণ অনুসারে চিহ্নিত করিয়া দিয়া মহত্তর খোর-সম্বন্ধ জমি হইতে ধর্ম্মশীল শিবচন্দ্র-হস্তনির্দ্দিষ্ট অষ্টক-নবক নলের মাপে জমিটি পৃথক্ করিয়া দিয়া উক্ত বসুদেব ব্রাহ্মণকে বিক্রয় করা হইয়াছে। তিনি ঐ সমস্ত জমি খরিদ করিয়াছেন। উহার সীমা এইরূপ নির্দ্দিষ্ট হইল—পূর্ব্বে সোগতাম্রপট্টসীমা, দেক্ষিণে বুড়া অশ্বথ, পট্টকী ও পর্পটীগাছের সীমা, পশ্চিমে গো-শকট যাইবার পথ ও নৌদণ্ডকসীমা, উত্তরে গর্গস্বামীর তাম্রপট্টসীমা।”

মহারাজাধিরাজ গোপচন্দ্রের ১৯ সংবৎসরে উৎকীর্ণ তাম্রশাসনখানির সংক্ষেপানুবাদও প্রকাশ করিতেছি[৮]—

(গোপচন্দ্রের সময়ের তাম্রশাসন—সম্মুখভাগ)

“স্বস্ত্যস্যাম্ পৃথিব্যামপ্রতিরথে যযাত্যম্বরীষসমধৃতৌ মহা-
রাজাধিরাজ শ্রীগোপচন্দ্রভট্টারকরাজ্যে ... ... নবাস্প-
দস্ত নব্যাবকাশিকায়াং মহাপ্রতিহার-ব্যাপারাস্ত্রাধৃতমূলক্রি-
য়ামাত্য-উপরিক-নাগদেবস্যাধ্যাসনকালে বারকমণ্ডলবিষয়-
ব্যাপারায় বিনিযুক্ত...বৎসপালস্বামিনা...ষ্ঠ-ব্যবহার-
ত: জ্যেষ্ঠকায়স্থ-নয়সেন-প্রমুখমধিকরণ ... ... মহ-
ত্তর-বিষয়কুণ্ড-প ... ... হ ... ... ঘোষ
চন্দ্রানাচার-রাজ্য ... ... ল ... ... বহ ... মহ-
ত্তরাঃ প্রধানব্যাপারিণ ... ... য ... ... র ... ... মন-
সা যথার্হং বিজ্ঞাপ্তাঃ ইচ্ছেয়ং ভবতাং প্রসাদাদ্ ... ... মহাকো-
টিকনাম ... ...প ... ...ত্ত ... ...স্তো ক্ষেত্রকুল্যা-
বাপৈকং যথার্ঘ্যেণোপক্রীয় মাতাপিত্রোরাত্মনশ্চ পুণ্যাভিবৃদ্ধয়ে গু-
ণবস্ত কাণ্ববাজসনেয়-লৌহিত্যভট্ট-গোমিদত্তস্বামি প্রতি-
ত্তিপা দতুং তদর্হথ ভরদ্বাজসগোত্র ভবস্তোস্মস্তো মূল.মাগা-
য় ... ...ধৈনমস... ...অকতমত যত এদভ্যর্থনমধিক-

(পশ্চাদ্ভাগ)

ত্যাগম্যমানা প্রাক্প্রবৃত্তিমর্য্যাদা চতুর্দ্দীনারিকৃতা কুল্যবাপেন ক্ষেত্রা-
ণি বিক্রীয়মানানীতি পুস্তপাল-নরভূতের্স্থলাবধারণ-
য়াবধৃত্য বিষয়াধিকরণাধিকরণকজনকুলবারান্ প্রকল্প্য প্র-
তীত-ধর্ম্মশীল-শিবচন্দ্র-হস্তাষ্টকনবকনলেনাপবিঞ্চ্য বৎসপাল-

"স্বস্তি, এই পৃথিবীতে অপ্রতিদ্বন্দ্বী, যযাতি অম্বরীষের সমান অধিকার, (সেই) মহারাজাধিরাজ শ্রীগোপচন্দ্র ভট্টারকের রাজ্যে তাঁহার নিকট লব্ধাস্পদ নব্যাবকাশিকায় অধিষ্ঠিত মহা-প্রতিহার-ব্যাপার পারাস্তাধৃত-মূলক্রয়ামাত্য-উপরিক নাগদেবের অধিকারকালে বারকমণ্ডলের অন্তর্গত বিষয়ে—ব্যাপারি-কার্য্যে নিযুক্ত বৎসপাল স্বামী দ্বারা ব্যবহারানুসারে বিষয়াধিকরণের প্রধান জ্যেষ্ঠ-কায়স্থ নয়সেন এবং উক্ত বিষয়ের মধ্যে মহত্তরগণের প্রধান বিষয়কুণ্ড, চন্দ্রঘোষ, অনাচার এবং প্রধান প্রধান ব্যাপারিদিগকে জানান হইয়াছে যে, 'আপনাদের প্রসাদে মহাকট্টিক নামক ব্যক্তির নিকট হইতে উপযুক্ত মূল্য দিয়া কৃষিজমি খরিদ করিতে ইচ্ছা করিয়াছি এবং আমার মাতা পিতা ও নিজের পুণ্য বৃদ্ধির জন্য কাণ্ব বাজসনেয় লৌহিত্য গোত্র ভট্ট গোমিদত্ত স্বামীকে আমি ভরদ্বাজ গোত্র উক্ত জমি দান করিতে ইচ্ছা করিয়াছি। আপনারা উপযুক্ত মূল্য লইয়া উক্ত চাসের জমিটি চিহ্নিত করিয়া দিউন।' তাঁহার প্রার্থনায় স্থানীয় পদ্ধতি অনুসারে প্রতিকুল্যবাপ জমির চারি দীনার হারে পুস্তপাল নয়ভূতির অবধারণ অনুসারে বিষয়াধিকরণিক ও কুলবরগণকে জানাইয়া ধর্ম্মশীল শিবচন্দ্রের হস্তনির্দ্দিষ্ট অষ্ট-নবক নল দ্বারা মাপিয়া বৎসপাল স্বামীকে উক্ত ক্ষেত্রকুল্যবাপ বিক্রয় করা হইল। এইরূপে তিনি ক্রয় করিয়া ভট্ট-গোমিদত্ত স্বামীকে পুত্রপৌত্রাদিক্রমে ভোগ করিবার জন্য দান করিলেন। ইহার সীমা এইরূপ নির্দ্দিষ্ট হইল। পূর্ব্বে ধ্রুবিলাতি অগ্রহার সীমা, পশ্চিমে শীলকুণ্ড গ্রাম সীমা, এবং উত্তরে ও দক্ষিণে করঙ্ক সীমা।'

তৎপরে মহারাজাধিরাজ সমাচারদেবের ১৪শ সংবৎসরে উৎকীর্ণ তাম্রশাসনেও এইরূপ পরিচয় পাইয়াছি"—

স্বামিনে ক্ষেত্রকুল্যবাপৈকম্বিক্রীতং অনেনাপি ক্রীত্বা ভট্ট-গোমিদত্তস্বামি-
নে পুত্রপৌত্রক্রমেণ বিধিনা প্র'তপাদিতং সীমালিঙ্গানি চাত্র
পূর্ব্বস্যাং ধ্রুবিলাত্যগ্রহারসীমা দক্ষিণস্যাং করঙ্কঃ
পশ্চিমস্যাং শীলকুণ্ড-গ্রামসীমা উত্তরস্যাং করঙ্কসী-
মা স্বদত্তাং পরদত্তাম্বা যো হরেত বসুন্ধরাং
সম্বৎ ১৯ শ্রবিষ্ঠায়াং কৃমিভূর্ত্বা পিতৃভিঃ সহ পচ্যতে

(৯) (সমাচারদেবের সময়ের তাম্রশাসন—সম্মুখভাগ)

স্বস্ত্যস্যাং পৃথিব্যামপ্রতিরথে নৃগনহুষ-যযাত্যম্বরীষসম-
ধৃতৌ মহারাজাধিরাজশ্রীসমাচারদেবে প্রতপত্যেতচ্চরণকমল-
যুগলারাধনোপাত্ত-নব্যাবকাশিকায়াং সুবর্ণবীথ্যাধিকৃতান্তর-
ঙ্গ উপরিক-জীবদত্তস্তদনুমোদিতক-বারকমণ্ডলে বিষয়-
পতি পবিত্রক যতোস্য ব্যবহারতঃ সুপ্রতীকস্বামিনা জ্যেষ্ঠাধি-
করণিক-দামুক-প্রমুখমধিকরণং বিষয়-মহত্তর-বৎস-
কুণ্ড-মহত্তর-শুচিপালিত-মহত্তর-বিহিতঘোষ মহদ

"স্বস্তি, এই পৃথিবীতে অপ্রতিদ্বন্দ্বী, নৃগ-নহুষ-যযাতি-অম্বরীষের সমানাধিকার, মহারাজাধিরাজ শ্রীসমাচারদেবের রাজ্যে সেই নৃপতির চরণকমলযুগল আরাধনা করিয়া যিনি নব্যাবকাশিকা লাভ করিয়াছেন, এবং যিনি সুবর্ণবীথির অধিকারে এবং অন্তরঙ্গ-উপরিক পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন, সেই জীবদত্তের শাসনকালে তাঁহার অনুমোদনে নিযুক্ত বারকমণ্ডলে বিষয়পতি হইতেছেন পবিক্রক। তৎকালে জ্যেষ্ঠাধিকরণিক দামুক বিষয়াধিকরণের প্রধান এবং বৎস কুণ্ড, শুচি পালিত, বিহিত ঘোষ, প্রিয় দত্ত, জনার্দ্দন কুণ্ড প্রভৃতি প্রধান প্রধান মহত্তর ছিলেন, সেই সকল প্রধান এবং অপরাপর ব্যবহারীদিগের নিকট উপস্থিত হইয়া সুপ্রতিকস্বামী এইরূপে জানান যে, "আমি আপনাদিগের প্রসাদে কতকগুলি পতিত জমি লইতে ইচ্ছা করি এবং আপনারা অনুগ্রহ করিয়া বলি, চরু, ও সত্রাদি নির্ব্বাহের জন্য আমাকে ব্রাহ্মণ নিযুক্ত করিয়া তাম্রশাসন দ্বারা উক্ত জমি দান করুন", তদনুসারে তাঁহার অনুরোধ রক্ষা করিয়া নিম্নলিখিত—'যে ভূমি ছয় প্রকার বন্য জন্তু কর্ত্তৃক অধ্যুষিত, সে ভূমি রাজার অর্থাগমপক্ষে ভাবী ফলপ্রদ হয় না। বৎসগণের ভোগের জন্য নির্দ্দিষ্ট ভূমি রাজার অর্থ ও ধর্ম্ম বৃদ্ধি করিয়া থাকে।' এই শাস্ত্রবাক্য স্মরণ করিয়া ব্রাহ্মণকে দান করা কর্ত্তব্য ভাবিয়া করণিক নয়নাগ কেশবাদি কুলবরকে মধ্যস্থ করিয়া এবং তাম্রশাসন দ্বারা পূর্ব্বদত্ত জমি বাদে চতুঃসীমাবদ্ধ ব্যাঘ্রচোরকের ভিতর অবশিষ্ট জমি এই সুপ্রতীকস্বামীকে এই তাম্রশাসনবলে দান করা হইল।

মহত্তর-প্রিয়দত্ত মহত্তর-জনার্দ্দনকুণ্ডাদয়ঃ অন্যে চ
বহবঃ প্রধানা ব্যবহারিণশ্চ বিজ্ঞাপ্তা ইচ্ছামাহং ভবতাং প্রসা-
দাচ্চিরোবসন্নখিলভূখণ্ডলকং বলি-চরু-সত্র-প্রবর্ত্তনীয়-
ব্রাহ্মণোপযোগায় চ তাম্রপট্টীকৃত্য তদর্হথ প্রসাদং কর্ত্তু-
মিতি যত এতদভ্যর্থনমুপলভ্য শংথোপরিলিখিতা ... ...

(ঐ পশ্চাদ্ভাগ)

ৈর্ব্যবহারিভিঃ সংস্মৃত্য সা যটা স্বাপদৈর্জুষ্টা রাজ্ঞো ভাব্যর্থনিষ্ফলা
বৎসভোগ্যীকৃতা ভূমির্নৃপস্যৈবার্থধর্ম্মকৃৎ তদস্মৈ ব্রাহ্মণায় দীয়তামি-
ত্যবধৃত্য করণিক-নয়নাগ-কেশবাদীন্ কুলবারান্ প্রকল্প্য প্রাক্‌তাম্রপট্টী-
কৃত্য ক্ষেত্রকুল্যবাপত্রয়মপাস্য ব্যাঘ্রচোরকো যচ্ছেষং তচ্চতুঃসীমা-
লিঙ্গনির্দ্দিষ্টং কৃত্বাস্য সুপ্রতীকস্বামিনঃ তাম্রপট্টীকৃত্য প্রতিপাদিতং
সীমালিঙ্গানি চাত্র পূর্ব্বস্যাং পিশাচপর্কটী দক্ষিণেন বিদ্যা-
ধর-জোটিকা পশ্চিমায়াং চন্দ্রচম্পকোটকেণঃ উত্তরেণ গো-
পেন্দ্রচোরকগ্রামসীমা চেতি। ভবন্তি চাত্র শ্লোকাঃ ষষ্টিং বর্ষসহ-
স্রাণি স্বর্গে মোদতি ভূমিদঃ আক্ষেপ্তা চানুমন্তা চ তান্যেব নরকে বসেৎ।
স্বদত্তাম্পরদত্তাম্বা যো হরেত বসুন্ধরাং ষষ্ঠিটায়াং কৃমির্ভূত্বা পিতৃভিঃ
সহ পচ্যতে॥ সম্বৎস ১৪ কার্ত্তি দি ১

ইহার চতুঃসীমা এইরূপ—পূর্ব্বে পিশাচপর্কটী, দক্ষিণে বিদ্যাধর জোটিকা, পশ্চিমে চন্দ্রচম্প-কোটকেন, এবং উত্তরে গোপেন্দ্রচোরক গ্রামসীমা।"

উপরে যে চারিখানি তাম্রশাসনের পরিচয় দিলাম, তাহা হইতে আমরা বেশ বুঝিতে পারিতেছি যে, ধর্ম্মাদিত্য, গোপচন্দ্র ও সমাচারদেব এই তিন ব্যক্তি মহারাজাধিরাজরূপে পরিচিত হইলেও মণ্ডল (প্রদেশ) বা বিষয় (জেলা)-শাসনকার্য্যে তাঁহারা নিরপেক্ষ ছিলেন। প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তা উপরিকগণই তাঁহার অধিকারে সর্ব্বেসর্ব্বা ছিলেন, এই উপরিকগণও সময় সময় 'মহারাজ' উপাধি ব্যবহার করিতেন, তাহা আমরা ধর্ম্মাদিত্যের সমকালে তদধীন মহারাজ স্থাণুদত্তের নাম হইতেই জানিতে পারিতেছি।" এদিকে ধর্ম্মাদিত্যের অপর তাম্রশাসনে নাগদেব তাঁহার 'মহাপ্রতিহারোপরিক' বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন। উভয় তাম্রশাসন আলোচনা করিলে 'মহাপ্রতিহারোপরিক' ও 'মহারাজ' দুইটী ভিন্ন উপাধি হইলেও দুইটীর তুল্য অধিকার ছিল বলিয়া প্রতিপন্ন হইবে। মহারাজাধিরাজ ধর্ম্মাদিত্যের সময় যে নাগদেব 'মহাপ্রতিহারোপরিক' বলিয়া পরিচিত ছিলেন, মহারাজাধিরাজ গোপচন্দ্রের সময় সেই নাগদেবই 'মহাপ্রতিহারব্যাপারাত্ত্যধৃত-মূলক্রিয়ামাত্য-উপরিক' বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন। 'মূলক্রিয়ামাত্য' শব্দ দ্বারা নাগদেব যে মহারাজাধিরাজ গোপচন্দ্রের সর্ব্বপ্রধান মন্ত্রী ও উপরিক বা সকলের উপর প্রধান কর্ম্মাধ্যক্ষ ছিলেন, তাহাও জানা যাইতেছে।

মহারাজাধিরাজ সমাচারদেবের আধিপত্য-কালে জীবদত্ত তাঁহার সুবর্ণবীথির অধ্যক্ষ ও অন্তরঙ্গোপরিক অর্থাৎ গুপ্তমন্ত্রণাসচিবগণের মধ্যে সর্ব্বোপরি ছিলেন। প্রকৃত প্রস্তাবে এই উপরিকগণ প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তা (Divisional Commissioner) এবং তাঁহার অধীন বিষয়পতিগণ জেলার মাজিষ্ট্রেটের তুল্য ছিলেন। এই তাম্রশাসনের সমকালে পূর্ব্ববঙ্গে উক্ত বিষয়পতিগণও অসামান্য ক্ষমতা ভোগ করিতেন। ধর্ম্মাদিত্যের সময় বারকমণ্ডলে জজাব এবং সমাচারদেবের সময় পবিত্রক বিষয়পতি ছিলেন। গোপচন্দ্রের সময়ে কে বিষয়পতি ছিলেন, তাহা জানা যায় নাই, সম্ভবতঃ এ সময়ে নাগদেবই উপরিক ও বিষয়পতি উভয়ের কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন। অধিকরণ বা শাসনবিভাগে মহারাজাধিরাজ ধর্ম্মাদিত্য ও গোপচন্দ্র উভয়ের সময়েই জ্যেষ্ঠ-কায়স্থ নয়সেন প্রধান আধিকরণিক বা বিচারপতি ছিলেন। মহারাজ সমাচারদেবের সময়ের তাম্রশাসনে দামুক জ্যেষ্ঠাধিকরণিক বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন। ধর্ম্মাদিত্য ও গোপচন্দ্রের তাম্রশাসনে যেমন আধিকরণিক নয়সেনকে জ্যেষ্ঠ-কায়স্থ বলা হইয়াছে, সমাচারদেবের তাম্রশাসনে সেইরূপ দামুকের পূর্ব্বে জ্যেষ্ঠাধিকরণিক শব্দ রহিয়াছে, এরূপ স্থলে 'জ্যেষ্ঠ-কায়স্থ' ও 'জ্যেষ্ঠাধিকরণিক' একই পর্য্যায়বাচী হইতেছে। পরবর্ত্তী শাসনপত্রের লেখক বা সান্ধিবিগ্রহিক কায়স্থগণ বহুস্থলে 'শ্রীকরণিক' ও 'করণিক ঠকুর' বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন। তাঁহাদের মধ্যে যাঁহারা বয়োজ্যেষ্ঠ ও বিচারবিভাগে শ্রেষ্ঠ ছিলেন, তিনিও জ্যেষ্ঠাধিকরণিক বা কেবল অধিকরণিক বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন। এতদ্ভিন্ন উক্ত তিন মহারাজাধিরাজের আমলে দত্ত, সেন, ঘোষ, মিত্র, চন্দ্র, দেব, কুণ্ড, পালিত, নাগ, ভূতি,

ভোগ ইত্যাদি পদ্ধতিযুক্ত কায়স্থগণই মহত্তর বা গ্রামের মধ্যে প্রধান ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত ছিলেন।[১০]

উক্ত তাম্রশাসনচতুষ্টয়ের লিপি-পর্য্যালোচনায় পুরাবিদ্‌গণ বলিয়া থাকেন, মালব-পতি রাজচক্রবর্ত্তী যশোধর্ম্মার অভ্যুদয়ের পরে এবং আর্য্যাবর্ত্তের সম্রাট্ হর্ষবর্দ্ধনের 'অভ্যুদয়ের পূর্ব্বেই তাম্রশাসনবর্ণিত ধর্ম্মাদিত্যপ্রমুখ মহারাজাধিরাজত্রয় আবির্ভূত হইয়াছিলেন,'[১০] এরূপ স্থলে খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীতে ঐ তিন জন বঙ্গাধিপকেই পাইতেছি এবং তাঁহাদের সময়ে শাসন ও বিচারবিভাগে নানা পদ্ধতিযুক্ত কায়স্থের সন্ধান পাইতেছি। তাঁহাদের প্রভাব ও প্রতিপত্তি কম ছিল না। ভারতের নানা স্থান হইতে যে শত শত তাম্রশাসন আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহার অধিকাংশই রাজমুদ্রা-পরিচিহ্নিত কিন্তু উক্ত শাসনচতুষ্টয়ে মহারাজাধিরাজগণের নামোল্লেখ থাকিলেও তাম্রশাসনের সহিত যে মুদ্রাসংলগ্ন আছে, তাহাতে 'বারকমণ্ডলবিষয়াধিকরণস্য' উৎকীর্ণ আছে. ইহাতে প্রতিপন্ন হইতেছে যে, যে অঞ্চল হইতে ঐ তাম্রশাসনগুলি পাওয়া গিয়াছে—অর্থাৎ ফরিদপুরের মণ্ডলবিষয়ের আধিকরণিকগণই রাজ্যশাসন করিতেছিলেন। আধিকরণিকগণ যে কায়স্থ ছিলেন, তাহা "জ্যেষ্ঠকায়স্থ-নয়সেনপ্রমুখমধিকরণম্মহত্তর-সোমঘোষ-

(১০) উক্ত তাম্রশাসন-চতুষ্টয়ের পাঠোদ্ধারকারী ও অনুবাদক হাইকোর্টের ভূতপূর্ব্ব বিচারপতি মাননীয় পার্গিটার সাহেব উক্ত পদবীগুলি সম্বন্ধে এইরূপ মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন—

"The names of the *mahattaras* in this inscription do not appear to be genuine compound words in which the component parts depend on one another, such as Dharmáditya, and Kulachandra in grant A (II. 2—4), but seem to consist merely of two separate words in juxtaposition. Hence we may with full propriety write them at Vatsa Kunda, Suchi Pálita, Vihita Ghosa, Priya Datta and Janárdana Kunda; and perhaps Jíva Datta may be so treated. Hence it appears that in these names we have four of the caste-surnames which are common in Bengal now, namely, Kunda (modern Kundú). Palit, Ghosh and Datt. A caste-name *Karanika* is mentioned (1, 15). *Karanika* is not classical Sanskrit, but is evidently a word formed from *karana* waich was the name of a caste that had the occupation of writing, accounts, etc. (Dicty.); hence *karanika* apparently meant a member of this caste. This caste was presumably either the same as, or closely akin to, the *kayastha* caste. The position of senior member of the Board was in grants B and C, held by the then oldest kayastha named Naya Sena. As this grant is later than those, it is worthy of note that whereas the modern name kayastha is mentioned in grants B and C, the name used in this later grant is *karanika*, a title which is not used now. Where a person's caste is mentioned the surname is sometimes omitted, as in the case of the *karanikas*, for, while one is named Naya Nága (Nág is another modern surname), the other is called simply Kesava (1. 15). It seems a fair inference that the second parts of these names were established as caste-surnames at the time of this inscription." *Journal of the Asiatic Society of Bengal, 1911, p. 501*

পুরঃসরশ্চ"[১১] ইত্যাদি দুই জন বিভিন্ন মহারাজাধিরাজের সময়ে উৎকীর্ণ তাম্রশাসনের উক্তি হইতেই প্রমাণিত হইয়াছে[১২]। এমন কি, উক্ত তাম্রশাসন হইতে স্পষ্টই জানা গিয়াছে যে, ব্রাহ্মণকেও ঐ সকল কায়স্থ অধিকরণিক ও মহত্তরদিগের নিকট আবেদন করিয়া ও উপযুক্ত মূল্য দিয়া জমি খরিদ করিতে হইত। প্রায় চৌদ্দশত বর্ষ পূর্ব্ব হইতেই পূর্ব্ববঙ্গে কায়স্থ-আধিপত্য প্রসারিত হইয়াছিল, তাহা সেই সময়ের তাম্রপট্ট হইতেই অবধারিত হইতেছে।

বঙ্গীয় কায়স্থগণের পদবী

বর্ত্তমানকালে বঙ্গীয় কায়স্থগণের মধ্যে যে সকল পদ্ধতি বা পদবী প্রচলিত আছে, পূর্ব্বোক্ত তাম্রশাসন হইতে আমরা তাহার অনেকগুলির সন্ধান পাইয়াছি, পূর্ব্বেই তাহা উল্লেখ করা হইয়াছে। কিরূপে এই সকল উপাধির সৃষ্টি হইল, এখানে সংক্ষেপে তাহার আলোচনা করিতেছি,—

প্রথম অধ্যায়েই লিখিয়াছি, গুপ্ত-সম্রাট্‌গণের সময়ে পরিব্রাজক ও উচ্চকল্পের ব্রাহ্মণ-মহারাজগণের অধিকারে দত্ত, দাস, নন্দী, নাগ, পালিত প্রভৃতি উপাধিধারী কায়স্থগণ মালব, গুজরাট, মধ্য-প্রদেশ প্রভৃতি স্থানে রাজকীয় কর্ম্মে নিযুক্ত ছিলেন, সম্ভবতঃ তাঁহাদেরই জ্ঞাতি ও আত্মীয় স্বজনগণ রাজকীয় কর্ম্মোপলক্ষে গুপ্তাধিকারকালে বা তৎপূর্ব্বে গৌড়বঙ্গে আসিয়া পড়েন, এই সময়ে সর্ব্বত্র ব্রাহ্মণপ্রভাব ছিল বলিয়াই বঙ্গীয় কায়স্থগণের আদিকুলগ্রন্থসমূহে ব্রাহ্মণ-ভক্তি ও ব্রাহ্মণ সহ বঙ্গাগমন-প্রবাদ চলিয়া আসিতেছে। খুব সম্ভব, গুপ্তসম্রাট্‌গণ অভিজাত ব্রাহ্মণ-সন্তানগণকেই রাজপ্রতিনিধিরূপে তাঁহাদের অধিকারভুক্ত বিভিন্ন প্রদেশে পাঠাইয়াছিলেন, এবং তাঁহাদের সঙ্গে রাজকার্য্যদক্ষ কায়স্থগণও আসিয়াছিলেন। ধর্ম্মবিভাগে ব্রাহ্মণগণের এক মাত্র অধিকার এবং দক্ষতা থাকিলেও শাসনবিভাগে কায়স্থগণই তাঁহাদের দক্ষিণহস্ত-স্বরূপ কার্য্য করিতেন, ক্রমে ক্রমে কায়স্থেরাই শাসনবিভাগে সর্ব্বেসর্ব্বা হইয়া পড়িয়াছিলেন।

অতি-পূর্ব্বকাল হইতেই মগধ-অঙ্গ-বঙ্গ-কলিঙ্গ অর্থাৎ সমস্ত প্রাচ্য ভারত আর্য্য, বৈদিক ও স্মার্ত্ত ব্রাহ্মণগণের চক্ষে অতি হেয় ও পতিত দেশ বলিয়া গণ্য ছিল, এই কারণে খৃষ্টীয় ৪র্থ হইতে ৬ষ্ঠ শতাব্দী পর্য্যন্ত আর্য্যাবর্ত্তে ব্রাহ্মণ-প্রাধান্য-কালে যদিও এ অঞ্চলে বৈদিকানুষ্ঠাননির্ব্বাহ করিবার জন্য কোন কোন ব্রাহ্মণ আসিয়া ব্রহ্মোত্তর জমি লইয়া বাস করিতেছিলেন, তথাপি এ অঞ্চলে আধিপত্য করিবার উদ্দেশ্যে বংশানুক্রমে বাস করিবার জন্য কোন উচ্চ পদস্থ বৈদিক ব্রাহ্মণ আসিয়া ছিলেন কি না, সন্দেহ। তৎকালে এদেশে দশকর্ম্মনির্ব্বাহ করিবার জন্য যে সকল ব্রাহ্মণ আসিয়া ছিলেন বা আসিতেছিলেন, তাঁহারা সেরূপ উচ্চ পদস্থ বা অবস্থাপন্ন ব্যক্তি ছিলেন বলিয়া মনে হয় না। উচ্চ পদস্থ ব্রাহ্মণের অভাবে উচ্চ পদস্থ কায়স্থকর্ম্মচারিগণ শাসনকর্ত্তৃত্বের সঙ্গে ক্রমে এ দেশের অধিপতি ও তাঁহাদের আত্মীয় স্বজনগণ নানা রাজকীয় বিভাগে সর্ব্বেসর্ব্বা হইয়া পড়িলেন। গুপ্ত-সম্রাট্‌গণের সময়ে অথবা মালবপতি যশোধর্ম্মার দিগ্বিজয়কালে

(১১) Vide Indian Antiquary for 1910, p. 208 ; and Journal of the Asiatic Society of Bengal, for 1911. p. 476.

(১২) Indian Antiquary, 1910, p. 200 and p. 204.

যে সকল উচ্চ পদস্থ ব্রাহ্মণ এ দেশে আসিয়াছিলেন, তাঁহারা পাতিত্যের আশঙ্কায় এ দেশে স্থায়িভাবে বাস করিতেন না, এখানে আসিয়া তীর্থগুলি দর্শন করিয়াই স্বদেশে ফিরিতেন।[১৩] কিন্তু কায়স্থগণ রাজকর্ম্মোপলক্ষে আসিয়া সহায়-সম্পত্তি বৃদ্ধির সহিত বংশপরম্পরায় এ অঞ্চলে বাস করিতে থাকেন, এ অবস্থায় কায়স্থগণই যে, এদেশে আধিপত্যে ও মানসম্ভ্রমে সর্ব্বপ্রধান হইয়া পড়িবেন, তাহাতে সন্দেহ কি? তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষগণ পশ্চিমভারত হইতে যে যে পদবী-যুক্ত হইয়া আসিয়াছিলেন, তাঁহার বংশধরেরাও সেই সেই পদবী ব্যবহার করিতে লাগিলেন, পূর্ব্বোক্ত তাম্রশাসনচতুষ্টয় হইতে তাহার আভাস পাওয়া যাইতেছে। গুপ্তাধিপত্য-বিস্তারের বহুপূর্ব্ব হইতেই এদেশে কায়স্থগণের আগমন হইয়াছিল, পূর্ব্বেই তাহার আভাস দিয়াছি। পর অধ্যায়ে তাঁহাদের ইতিহাস বিবৃত হইবে। কিন্তু সেই অতি-পূর্ব্বাগত কায়স্থগণ এ দেশের জলবায়ু ও সাম্প্রদায়িক ধর্ম্ম-প্রভাবের গুণে অধিকাংশই জৈন, বৌদ্ধ বা শৈব সমাজভুক্ত হইয়া পড়িয়া ছিলেন। তাঁহাদের কিরূপ পদবী ছিল, তাহা ঠিক জানা যায় নাই, তবে তাঁহারা তাঁহাদের অধীশ্বর ও ধর্ম্মাচার্য্যগণের উপাধির অনুকরণে পদবী চালাইয়া থাকিবেন তাহা অসম্ভব নহে। রাণা, রাহুত, গুপ্ত, বর্দ্ধন, শূর, বর্ম্মা ইত্যাদি অধিপতিগণের উপাধির অনুকরণে এবং ভদ্র, রক্ষিত, পাল, নাথ, অর্ণব, কীর্ত্তি, শর্ম্মা, দণ্ডী, বন্ধু ইত্যাদি উপাধি ধর্ম্মাচার্য্যগণের উপাধির অনুকরণে গৃহীত হইয়া থাকিবে।

পূর্ব্ব উপাধি ব্যতীত গুপ্তসম্রাট্‌গণের পূর্ব্বে, সমকালে ও পরবর্ত্তী সময়ে যিনি যে দেবতার উপাসক ছিলেন, তাঁহার সেই দেবতার নামানুসারে—ব্রহ্ম, বিষ্ণু, রুদ্র, গণ, ইন্দ্র, চন্দ্র, সোম, আদিত্য, নাগ প্রভৃতি উপাধি এবং স্ব স্ব বীর্য্যবত্তা বা পারদর্শিতা অনুসারে ধনু, বাণ, গুণ, শর, তেজ, শক্তি, ধর, আইচ, আশ, পীল, বল, দাম, নাদ, যশ, মান, ক্ষেম ইত্যাদি পদবীতেও ভূষিত হইয়াছিলেন। পশ্চিমাঞ্চল হইতে যিনি যে পদবী লইয়া আসিয়াছিলেন, তাঁহার বংশধরেরা সেই পদবীদ্বারা পরিচিত হইয়া আসিতেছেন, এ কথা পূর্ব্বেই লিখিয়াছি। ফরিদপুরের তাম্রশাসন-বর্ণিত সেন, ঘোষ, দত্ত, চন্দ্র, পালিত, কুণ্ড, ভোগ, ভূতি, দেব ইত্যাদি পদবীগুলির মধ্যে সমাচারদেবের তাম্রশাসনে বৎস কুণ্ড, শুচি পালিত, বিহিত ঘোষ, প্রিয় দত্ত ও জনার্দ্দন কুণ্ড ইঁহারা 'কুলবার' বা 'কুলবর'[১৪] বলিয়া অভিহিত হইয়াছেন। ইহাদ্বারা আমরা মনে করিতে পারি যে, খৃষ্টীয় ৬ষ্ঠ শতাব্দীতে ঘোষ, কুণ্ড, দত্ত ও পালিত উপাধিধারী কোন কোন কায়স্থ 'কুলবর' বা 'কুলীন' বলিয়া সম্মানিত ছিলেন। তাম্রশাসনোক্ত 'ভোগ' ও 'ভোগিক' একার্থবাচক, উহা বর্ত্তমান ভোই এবং 'ভূতি' ভুই পদবীতে পরিণত হইয়াছে।

(১৩) "অঙ্গবঙ্গকলিঙ্গেষু সৌরাষ্ট্রমগধেষু চ।
তীর্থযাত্রাং বিনা গচ্ছন্ পুনঃ সংস্কারমর্হতি।" (মনু)

(১৪) উত্তররাঢ়ীয় কায়স্থ-কুলপঞ্জিকায়—"শুন শুন কুলবর-কথা পুরাতন" ইত্যাদি বর্ণনায় 'কুলীন' শব্দের স্থানে 'কুলবর' শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে।

তৃতীয় অধ্যায়

বঙ্গের পূর্ব্বতন কায়স্থ-রাজবংশ

পূর্ব্ব অধ্যায়ে লিখিয়াছি যে, অতি প্রাচীনকাল হইতেই বঙ্গে কায়স্থগণের আগমন ঘটিয়াছে। মৌর্য্য-সম্রাট্ অশোকের সময় তাঁহার প্রিয় রাজুকগণ গৌড়বঙ্গে শাসন ও বিচারবিভাগে কর্ত্তৃত্ব করিয়াছিলেন, প্রসঙ্গক্রমে তাহা সর্ব্বপ্রথমেই প্রকাশ করিয়াছি। কাণ্ব ও শুঙ্গ-ব্রাহ্মণবংশের আধিপত্যকালে তাঁহাদের প্রভাব অনেকটা হ্রাস হইলেও শক ও আন্ধ্ররাজগণের সময়ে আবার তাঁহারা পূর্ব্বপ্রভাব অর্জ্জন করিয়াছিলেন, পূর্ব্বেই তাহার আভাস দিয়াছি। এমন কি, মালবের শকাধিপগণ যেমন দাক্ষিণাত্যের অধীশ্বর আন্ধ্র সাতবাহনগণের অধীন 'ক্ষত্রপ' বলিয়া পরিচিত হইয়াছিলেন, মধ্যপ্রদেশে সাতবাহনগণের আত্মীয়তাসূত্রে শকসেন-কায়স্থগণও সেইরূপ রাজ-প্রতিনিধি বা ক্ষত্রপপদে অধিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। আমাদের সকল মহাপুরাণ হইতেই জানা গিয়াছে যে, আন্ধ্রগণ পাটলিপুত্র পর্য্যন্ত অধিকার করিয়াছিলেন, সম্ভবতঃ সেই সঙ্গে সমস্ত প্রাচ্যভারত তাঁহাদের অধিকারভুক্ত হইয়াছিল। মালব ও মধ্যপ্রদেশে তাঁহাদের অধীন ক্ষত্রপগণ যেরূপ শাসনকর্ত্তৃত্ব করিতেছিলেন, প্রাচ্যভারতেও সেইরূপ শক ও কায়স্থ ক্ষত্রপগণের অধিকার বিস্তৃত হইয়াছিল।

বৌদ্ধবারাণসী সারনাথ হইতে আবিষ্কৃত শকসম্রাট্ কনিষ্কের শিলালিপি হইতে জানা যায় যে, তাঁহার অধিকারভুক্ত প্রাচ্যভারত শাসন করিবার জন্য তাঁহার অধীনে বনস্পর নামে একজন ক্ষত্রপ নিযুক্ত ছিলেন। মগধ ও বঙ্গ তাঁহার অধিকারভুক্ত হইলে এখানেও 'ক্ষত্রপ' নিযুক্ত হইয়াছিলেন, সন্দেহ নাই। শুঙ্গ ও কাণ্ববংশের সময় পুনরায় প্রাচীন ভারতীয় প্রথায় ক্ষত্রপ-গণের স্থানে 'মাণ্ডলিক' ও 'বিষয়পতি' নিযুক্ত হইলেও দক্ষিণাপথের অধীশ্বর সাতবাহনবংশের প্রাচ্যভারতে আধিপত্য-বিস্তারের সহিত এখানেও মালব ও মধ্যপ্রদেশের ন্যায় 'ক্ষত্রপ' নিযুক্ত হইয়াছিলেন।[১] ভাগলপুর জেলায় সুলতানগঞ্জের নিকট একটী বৌদ্ধস্তূপের ধ্বংসাবশেষ হইতে

(১) 'ক্ষত্রপ' শব্দই পশ্চিমভারতে মুসলমান আমলে 'ছত্রপতি' এবং ইংরাজ ইতিহাসে Satrap নামে পরি-চিত। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ মনে করেন যে, এই শব্দ পারস্যের সুপ্রাচীন কীলরূপা শিলালিপিবর্ণিত 'ক্ষত্রপাবন্' শব্দ হইতে আসিয়াছে। ইহার অর্থ 'মণ্ডল বা বিষয়ের রক্ষক।' এই ক্ষত্রপের অধিকার সম্বন্ধে এইরূপ বর্ণিত আছে:—

"Cyrus the great divided his empire into provinces; a definitive organization was given by Darius, who established twenty great satrapies and fixed their *tribute*.

'মহাক্ষত্রপ' রুদ্রসেনের ২টা মুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছে, এই ক্ষত্রপমুদ্রা হইতেও এখানে ক্ষত্রপাধিকার সূচিত হইতেছে।[২] এই মুদ্রালিপি হইতে মনে হয় যে, খৃষ্টীয় ৪র্থ শতাব্দে বঙ্গে ক্ষত্রপগণ বিদ্যমান ছিলেন। গুপ্তসম্রাট্ সমুদ্রগুপ্তের শিলালিপিতে তিনি রুদ্রদেব নামে পরিচিত। তিনি সমুদ্রগুপ্তের নিকট পরাজয় স্বীকার করেন।[৩] এই ক্ষত্রপবংশ বহুকাল বঙ্গদেশ শাসন করিয়াছিলেন, পরে তাহার পরিচয় দিব। এক্ষণে এই প্রাচীন ক্ষত্রপগণের সহিত অপরাপর রাজন্যবৃন্দের কিরূপ সংস্রব ছিল, তাহারই আলোচনা আবশ্যক।

যদিও মৌর্য্যসম্রাট্ চন্দ্রগুপ্তের পূর্ব্ব হইতেই অসবর্ণবিবাহ নিষিদ্ধ হইয়াছিল, তথাপি শক, নাগ, গুপ্ত প্রভৃতি অধীশ্বরগণের সময়ের নানা তাম্রশাসন আলোচনা করিলে মনে হয়, তাঁহাদের সময় ঝল্ল, মল্ল, লিচ্ছবি, শক, নাগ, গুপ্ত প্রভৃতি রাজবংশমধ্যে পরস্পর বৈবাহিক আদান-প্রদান প্রচলিত ছিল। যদিও গুপ্ত-সম্রাট্গণ কোন স্থানেই আপনাদিগকে ক্ষত্রিয় বলিয়া পরিচিত করেন নাই, কিন্তু নেপালের লিচ্ছবি নামক ক্ষত্রিয়বংশের সহিত তাঁহারা যে সম্বন্ধসূত্রে আবদ্ধ ছিলেন, তাহা তাঁহাদের পক্ষে অনেকটা গৌরবজনক হইয়াছিল, এমন কি, অশ্বমেধযজ্ঞকর্ত্তা গোব্রাহ্মণভক্ত সম্রাট্ সমুদ্রগুপ্তও নিজমুদ্রায় মাতৃকুল 'লিচ্ছবির' পরিচয় দিতে কুণ্ঠাবোধ করেন নাই। এখন লিচ্ছবি নাম শুনিয়া হয়ত অনেকে মনুসংহিতার 'ব্রাত্যক্ষত্রিয় নিচ্ছিবি'

(Herodot. iii. 89. sqq) The Satrap was the head of the adminstration of his province; he collected the taxes, controlled the local officials and the subject tribes and cities, and was the supreme judge of the province to whose "Chair" (Neham. iii. 7) every civil and criminal case could be brought. He was responsible for the safety of the roads (cf. Xenophon, Anab, i 9. 13). and had to put down brigands and rebels. He was assisted by a council of Persians, to which also provincials were admitted ; and was controlled by a royal secretary and by emissaries of the king."

Encyclopædia Britannica, 11th ed. Vol. XXV. p. 230.

পারস্যে ক্ষত্রপদিগের যেরূপ অধিকার ভারতেও ক্ষত্রপদিগের ঠিক ঐরূপ অধিকার ছিল। মৌর্য্যসম্রাট্ অশোকের অধীন রাজুক ও ধর্ম্মামাত্যগণের উপরও ঐরূপ অধিকার ছিল। শকাধিকারকালে রাজকশ্রেষ্ঠগণ 'ক্ষত্রপ' উপাধি লাভ করেন। গুপ্তসম্রাট্গণের সময় তাঁহাদের অধীন ক্ষত্রপগণ 'উপরিক' 'মাণ্ডলিক' বা 'বিষয়পতি' নামে পরিচিত হন। সেই সকল ক্ষত্রপ বা মাণ্ডলিকগণের এদেশে কিরূপ অধিকার ছিল, ফরিদপুর হইতে আবিষ্কৃত মহারাজাধিরাজ ধর্ম্মাদিত্য, গোপচন্দ্র ও সমাচারদেবের তাম্রশাসন হইতে জানা গিয়াছে। বঙ্গে উপরিক বা মাণ্ডলিক ও বিষয়পতিগণ বহুকাল ক্ষত্রপ উপাধি ব্যবহার করিয়াছিলেন, প্রাচীন কুলগ্রন্থ হইতে তাহার প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। কালে যে এই ক্ষত্রপগণ যখনই স্বাধীনতা ঘোষণা করিয়াছেন,তখনই তাঁহাদের 'মহাক্ষত্রপ' উপাধিগ্রহণের সংবাদ পাই। যেমন সাতবাহনবংশের অধীন ক্ষত্রপ চষ্টনের পৌত্র রুদ্রদাম আধিপত্য ও শাসনবিস্তারের সহিত বহু জনপদ অধিকার করিয়া 'মহাক্ষত্রপ' উপাধি গ্রহণ করিয়াছিলেন।

(২) Journal of the Asiatic Society of Bengal. Vol. XXXIII, p. 361.

(৩) Fleet's Corpus Ind. Indi, Vol. III. p. 13.

জাতিই ধরিবেন, হয়ত ব্রাত্যক্ষত্রিয় নাম শুনিয়াও অনেকে নাসিকাকুঞ্চন করিবেন, কিন্তু আমরা যে সময়ের কথা লিখিতেছি, সে সময়ের আভিজাত্যমর্য্যাদা এখনকার মত সাধারণ মানদণ্ডে তুলিত হইত না। স্ব স্ব বংশমর্য্যাদা, শৌর্য্য, বীর্য্য, ও আচরিত ধর্ম্ম লক্ষ্য করিয়াই আভিজাত্য নির্ণীত হইত, যোগ্যতম ব্যক্তিই সমাজের আদর্শস্বরূপ বিবেচিত হইতেন। সমাজ আচারে ব্যবহারে তাঁহারই অনুবর্ত্তন করিতেন। তাই সুপ্রাচীন স্মৃতি-পুরাণে যাঁহারা বৃষলত্ব-প্রাপ্ত ব্রাত্য অথবা সমাজবাহ্য বলিয়া পরিগণিত ছিলেন—কালের স্রোতে আধিপত্যের শক্তি-মন্ত্রে আচারব্যবহারের সংস্কারে, উন্নতির সঙ্গে তাঁহারাই আবার শ্রেষ্ঠ ও গরিষ্ঠ হইয়া সমাজে উচ্চস্থান লাভ করিয়াছেন। বৈদিকমার্গপ্রবর্ত্তক গুপ্তসম্রাটের সহিত সেই সেই জাতির আত্মীয়তা ও সম্বন্ধই তাঁহাদের উচ্চ আভিজাত্য ও অবস্থার উন্নতির উজ্জ্বলতর সাক্ষ্য। বাস্তবিক ভারতীয় শ্রেষ্ঠ আর্য্যসমাজের ইহাই সনাতন রীতি—গুণ, জ্ঞান ও শক্তির সেবা। যেখানে এই তিনটীর একত্র সম্মিলন—সেখানেই তাহার প্রাধান্য। একদিন ঐ তিনটীর অভাবে যাহারা নিন্দিত ও ঘৃণিত হইয়াছিল, সময়ের সুযোগে ও প্রকৃতির সুকৃতিতে ঐ তিনটীর প্রভাবে তাহারাই আবার সেই বর্ণের শ্রেষ্ঠ জাতি বলিয়া সমাদৃত হইয়াছেন।

অনেকের বিশ্বাস যে, বৌদ্ধ ও জৈনের অভ্যুদয়কালে প্রাচ্যভারতে সমস্ত একাকার হইয়া পড়িয়াছিল, তাই শকাদি নানা সমাজবাহ্য জাতি আসিয়া প্রাচ্যসমাজের অঙ্গপুষ্টি করিয়াছিল। জৈন বা বৌদ্ধপ্রভাবেই তাহারা উচ্চজাতি বলিয়া গণ্য হইতে পারিয়াছিল। কিন্তু আমরা বলিতে বাধ্য যে, বৌদ্ধ-জৈনাদি নানা ধর্ম্মবিপ্লবেও এখানকার আর্য্যসমাজে বর্ণভেদ বা জাতিভেদ উঠিতে পারে নাই। সে সময়ের জৈন বা বৌদ্ধসমাজের আচার-ব্যবহার ও ধর্ম্মশাস্ত্র যাঁহারা আলোচনা করিয়াছেন, তাঁহারাই বলিতে পারিবেন যে, আর্য্য বা ত্রৈবর্ণিক ও শূদ্র এই জাতি-ভেদ চিরদিন প্রতীচ্য ও প্রাচ্যভারতে অক্ষুণ্ণ ছিল,[৪] আমাদের স্মৃতিপুরাণাদিতে যেমন আর্য্য বা ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এই ত্রিবর্ণের উচ্চাধিকার প্রদত্ত হইয়াছে, কিন্তু শূদ্রের কোন উচ্চকর্ম্মে অধিকার নাই, জৈন ও বৌদ্ধাচার্য্যগণও সেইরূপ শূদ্রকে কোন উচ্চাধিকার প্রদান করেন নাই। জৈনদিগের ধর্ম্মসংহিতায় শূদ্রগণ 'অভূম' অর্থাৎ অনধিকারী বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। এদিকে বৌদ্ধদিগের "মহাবগগ্" নামক সুপ্রাচীন পালিগ্রন্থে 'শূদ্রদিগকে কোন উচ্চ অধিকার দিবে না' এইরূপ বুদ্ধদেবের আদেশ আছে। সুতরাং জৈন ও বৌদ্ধদিগের প্রাচীনতম শাস্ত্র হইতে আমরা পাইতেছি যে, ভারতের আর্য্যসমাজের জাতিবিচাররূপ সনাতন নিয়ম কেহই পরিত্যাগ করেন নাই[৪]। মহাভারতে আমরা পাইয়াছি যে, অঙ্গের লোকেরা শাশ্বতধর্ম্ম পালন করিয়া থাকেন।[৫] জৈন ও বৌদ্ধদিগের প্রাধান্যকালে এখানে ধর্ম্মনীতি কতকটা পরিবর্ত্তিত হইলেও প্রাচীন আচার বিশেষ পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল বলিয়া মনে হয় না। যেমন সুপ্রাচীন ব্রাহ্মণসমাজ মানবধর্ম্মশাস্ত্র অনুসারে আচার ও ব্যবহার রক্ষা করিয়া আসিয়াছেন,—জৈন ও বৌদ্ধগণও

(৪) বিশ্বকোষ, ১৭শ ভাগ, 'বঙ্গদেশ' শব্দ ৪০৫ পৃষ্ঠায় বিস্তৃত বিবরণ দ্রষ্টব্য।

(৫) কর্ণপর্ব্ব ৪৫ অঃ।

সেই মনুর স্মৃতি অনুসারেই বরাবর চলিয়া আসিয়াছেন, এমন কি শ্যাম ব্রহ্ম প্রভৃতি স্থানের বৌদ্ধসমাজ আজও মনুস্মৃতি অনুসারেই রাজধর্ম্ম ও লোকধর্ম্ম চালাইতেছেন।[৬]

প্রতীচ্য ও প্রাচ্য ভারতে ভিক্ষুধর্ম্মসম্বন্ধেই অতি পূর্ব্বকাল হইতে মতভেদ ঘটিয়া আসিয়াছে। প্রতীচ্যভারতের বৈদিক কর্ম্মকাণ্ডানুমোদিত গৃহ্য ও ধর্ম্মসূত্রে বর্ণাশ্রমধর্ম্ম যেরূপ নির্দ্দিষ্ট আছে, প্রাচ্যভারতে জ্ঞানকাণ্ডমূলক জৈন ও বৌদ্ধ সূত্রগন্থে ঠিক সেরূপভাবে বর্ণাশ্রমধর্ম্ম নির্দ্দিষ্ট হয় নাই। গৃহ্য ও ধর্ম্মসূত্রে ১ম কৈশোরে ও যৌবনপ্রারম্ভে উপনয়নের পর গুরুগৃহে ব্রহ্মচর্য্য, ২য় যৌবনে ও প্রৌঢ়ে গার্হস্থ্য, ৩য় পঞ্চাশোর্দ্ধে বানপ্রস্থ এবং ৪র্থ বা জীবনের অন্তিমকালে ভিক্ষুধর্ম্ম নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, কিন্তু উপনিষদ্, জ্ঞানী ঋষভদেব ও কপিলের অনুবর্ত্তী জৈন ও বৌদ্ধসমাজ এরূপভাবে বর্ণাশ্রমধর্ম্ম স্বীকার করেন নাই, তাঁহারা জীবন ক্ষণভঙ্গুর জানিয়া প্রয়োজন হইলে যে কোন সময়েই ভিক্ষুধর্ম্মের ব্যবস্থা করিয়াছেন, তাই প্রতীচ্যভারত অপেক্ষা প্রাচ্যভারতে সকল সম্প্রদায়ের আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেই জানে, জন্মিলেই মরিতে হইবে, এ জীবন কিছুই নয়, ভিক্ষুধর্ম্মই জ্ঞানীর শ্রেষ্ঠধর্ম্ম। প্রতীচ্য ব্রাহ্মণগণ কর্ম্মী বা বৈদিক কর্ম্মকাণ্ডের ভক্ত ছিলেন, কিন্তু প্রাচ্যগণ জ্ঞানকাণ্ডের অনুরাগী সাধক, তাই অতি পূর্ব্বকাল হইতেই এই মূল মতভেদ লইয়া প্রাচ্য ও প্রতীচ্যে বিবাদ। আধ্যাত্মিকমার্গে জ্ঞানীর জয় হইলেও লৌকিক জগতে কর্ম্মীরই চিরদিন প্রাধান্য। তাহারই ফলে পাশ্চাত্যগণ পুনঃপুনঃ প্রাচ্যের উপর প্রাধান্যস্থাপনে সমর্থ হইয়াছেন। তাই প্রাচ্যভারতের পূর্ব্বাপর সামাজিক অবস্থা আলোচনা করিয়া বুঝিতে পারিয়াছি, এখানকার জলবায়ুর প্রকৃতি-গুণে যে যে উচ্চবর্ণ এখানে আসিয়া উপনিবেশী হইয়াছিলেন, তাঁহারা আবার কিছুকাল পরে বা কয়েক পুরুষ পরে প্রাচ্যসমাজে মিশিয়া প্রাচ্যভাবাপন্ন হইয়া গিয়াছেন। জ্ঞানে গুণে আধ্যাত্মিক মানে যদিও অনেকে আদর্শস্থানীয় হইয়াছেন, কিন্তু শৌর্য্যে বীর্য্যে ও অধ্যবসায়-প্রভাবে পাশ্চাত্য বা বৈদিক কর্ম্মকাণ্ডপ্রিয় বীরগণের নিকট পুনঃপুনঃ প্রাচ্যকে পরাজয় স্বীকার করিতে হইয়াছে। যদিও কোন কোন সময়ে পাশ্চাত্যের উপর প্রাচ্যের লৌকিক আধিপত্যের সংবাদ পাইয়াছি, কিন্তু তাহা নিতান্ত অল্পকালস্থায়ী। এই কারণে বঙ্গ চিরদিনই পাশ্চাত্যের দোহাই দিয়া আসিতেছেন, পাশ্চাত্যের প্রভাব অবনতমস্তকে স্বীকার করিয়া আসিয়াছেন। তাই বঙ্গের শ্রেষ্ঠজাতিমাত্রেই পাশ্চাত্যবংশোদ্ভব বলিয়া সকলেই গৌরব প্রকাশ করিয়া থাকেন।

বহু পূর্ব্বকাল হইতে এখানে বৈদিকেতর ধর্ম্ম প্রাধান্যলাভ করিলেও প্রাচ্যভারতের জৈন ও বৌদ্ধসমাজে সাত্ত্বিক ও ব্রহ্মবিদ্ ব্রাহ্মণগণের সম্মান এবং সাবিত্রীর শ্রেষ্ঠতা স্বীকৃত হইয়াছে।[৭] তাই বুদ্ধ এবং তীর্থঙ্করদিগকেও বেদ ও ব্রহ্মবিদ্যায় অধীত হইতে দেখি।[৮]

(৬) বিশ্বকোষ ২২শ ভাগ 'স্মৃতি' শব্দে বিস্তৃত বিবরণ দ্রষ্টব্য।

(৭) বৌদ্ধসূত্র মহাবগ্গে বুদ্ধ বলিয়াছেন, "সকল যজ্ঞমধ্যে অগ্নিযজ্ঞ প্রধান, সকল বেদমন্ত্র হইতে সাবিত্রীমন্ত্র প্রধান।" (মহাবগ্গ ৬।৩৫।৮)

(৮) জৈন কল্পসূত্র ও ললিতবিস্তর দ্রষ্টব্য।

যাহা হউক,পাশ্চাত্যপ্রভাবেই বঙ্গের প্রাচীনতম রাজন্ত বা শাসকসমাজ সমান-আচারসম্পন্ন, সমধর্ম্মাবলম্বী ও সমানবর্ণ বলিয়া পরিচিত বিভিন্ন রাজবংশের সহিত আত্মীয়তাসূত্রে সম্মিলিত হইয়াছিলেন। তাই আমরা শক, শকসেন, আন্ধ্র, লিচ্ছবি, বৃজ্জি, গুপ্ত, মৌখরি, বর্ম্মপ্রভৃতি রাজবংশের মধ্যে যৌনসম্বন্ধ প্রচলিত ছিল দেখিতে পাই। এইরূপে শকাধিকারকালে ও তৎপরে শক, সাতবাহন ও শকসেন-ক্ষত্রপগণ পরস্পর বিবাহ-সম্বন্ধ দ্বারা অনেকটা এক হইয়া পড়িয়াছিলেন। তাই সুলতানগঞ্জ হইতে আবিষ্কৃত মুদ্রার রুদ্রসেনকে অনেকে 'শকক্ষত্রপ' বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। বাস্তবিক তাঁহারা শকসেনবংশীয় ক্ষত্রপ। শকসেনক্ষত্রপগণই বঙ্গের সুপ্রাচীন দেববংশীয়দিগের কুলগ্রন্থে 'ক্ষত্রপ কায়স্থ' বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন। সাধারণের কৌতূহল-পরিতৃপ্তির জন্য নিম্নে সেই কুলগ্রন্থ* উদ্ধৃত হইল—

ক্ষত্রপ কায়স্থবংশ

"বন্দ্যঘট্টদেবকুলং দেবানাং কুলমুত্তমম্।
শৃণ্বন্তি হি লোকাঃ সর্ব্বে ভট্টেন বিবৃতং যথা ॥১
কর্ণসৈন্যা এতে দেবাঃ খ্যাতিবন্তো মহীতলে।
শাণ্ডিল্যগোত্রমেতেষাং জগত্যাং পরিবেদিতম্ ॥২
হরিদ্বারাদাগতাস্তে স্থিতবন্তো মগধেষু।
ক্ষত্রপকায়স্থা দ্বিজাঃ ক্ষত্রিয়কুলসম্ভবাঃ ॥৩
প্রবাদঃ শ্রূয়তে তেষু ব্রহ্মাবর্ত্তে দেবভূমৌ।
পবিত্রহ্রদকূলেষু সর্ব্বে তে নিবসন্তি স্ম ॥৪
দেববংশগুণাবলিং যন্ময়া পরিকীর্ত্তিতম্।
শ্রোতব্যং কৌতূহলেন সর্ব্বৈর্হি মানবৈস্তথা ॥৫
আসীদ্রাজা দাতা কর্ণঃ খ্যাতিবাংশ্চ মহীতলে।
কর্ণসেননামধেয়ঃ কর্ণপুরস্য ভূপতিঃ ॥৬
ক্ষত্রপঃ কায়স্থো রাজা মহাসুরো মহাবলী।
কর্ণস্বর্ণরাজ্যস্থাতা উক্তঞ্চ ভারতে যথা ॥৭
কর্ণভাগীরথী সন্ধিঃ নয়নরঞ্জনশ্চ হি।
যত্র কর্ণপুরং রাজা নির্ম্মমে বহুকৌশলৈঃ ॥৮

* এই কুলগ্রন্থখানি চারি শত বর্ষের আদর্শ পুঁথি দৃষ্টে ১৩২২ শকে নকল করা হইয়াছে। অধুনা পশ্চিম ময়মনসিংহবাসী হাইকোর্টের উকীল শ্রীযুক্ত গোবিন্দচন্দ্র দেব রায় মহাশয় পুঁথিখানি পাঠাইয়াছেন। পুরুষানুক্রমে এই কুলগ্রন্থখানি তাঁহাদের গৃহে শ্রাদ্ধাদি কালে পঠিত হইয়া আসিতেছে। কুলগ্রন্থরচয়িতা কুলাচার্য্য বা ভট্টকবিগণ অনেকে সংস্কৃত ভাষায় সেরূপ ব্যুৎপন্ন ছিলেন না, এ কারণ তাঁহাদের রচিত কুলগ্রন্থে যথেষ্ট ছন্দোদোষ ও ব্যাকরণদোষ লক্ষিত হয়। আলোচ্য কুলগ্রন্থেও এরূপ দোষের অভাব নাই। মূলগ্রন্থে যেরূপ আছে, তাহাই উদ্ধৃত হইল।

বিচিত্রং হি কর্ণপুরং স্বর্ণেন নির্ম্মিতং যথা।
অতোঽস্মাহং ভাষায়াঞ্চ বর্ণনায়াঃ পরাঙ্মুখঃ ॥৯
সৌধমালাসমাকীর্ণং ধনজনপরিপূর্ণং।
যত্নেন রক্ষিতং সৈন্যৈর্দুর্ভেদ্যং তৎপুরং সদা ॥১০
তৎপুরবাসিনঃ সর্ব্বে আনন্দে চ সদা মগ্নাঃ।
কর্ণসেনপ্রভাবেণ রাজ্যঞ্চ নির্ব্বৈরং তথা ॥১১
দেবাংশেন কর্ণপতেঃ কুমারো জাতবান্ধীঃ।
বৃষকেতুরিতি নাম্না প্রসিদ্ধশ্চ হি ভারতে ॥১২
শুভান্নপ্রাশনাদীনাগতাংশ্চ ততঃ পরং।
বিভীষণো লঙ্কেশ্বরো যথাগতো মহাকৃতিঃ ॥১৩
তস্মাদভবত্তত্র হেমবৃষ্টিঃ সুরলোকাৎ।
অথ কর্ণস্বর্ণনামা রাজ্যশ্চ বভূব চেতি ॥১৪
অমুজ্ঞয়া দেবাঃ সর্ব্বে কর্ণপুরে সমবেতাঃ।
পর্য্যায়ক্রমেণ রাজা দেবাংশ্চ বিভক্তবান্ ॥১৫
শাণ্ডিল্যা মৌদ্গল্যাশ্চেতি বাৎস্যাঃ পরাশরাস্তথা।
ভরদ্বাজো ঘৃতকৌশিক আলম্যানাশ্চ গোত্রকাঃ ॥১৬
কর্ণস্বর্ণসমাজেষু গোত্রো হি কুলপদ্ধতিঃ।
শাণ্ডিল্যদেবাশ্চ সর্ব্বে ভবন্ত কুলনায়কাঃ ॥১৭
কর্ণ-স্বর্ণসমাজে তু জনৈস্ত পরিবর্দ্ধিতঃ।
দীর্ঘকালং পরিব্যাপ্য সর্ব্বে তে ববসুস্তত্র ॥১৮
রণপরায়ণা দেবা গোত্রৈশ্চ বহুভিন্নকাঃ।
স্থাপয়ামাস যত্নেন রাজ্যকাম্যঙ্গবঙ্গয়োঃ ॥১৯

অর্থাৎ 'দেব উপাধিযুক্ত যতগুলি বংশ আছে, তন্মধ্যে 'বন্দ্যঘট্য' নামক গ্রামবাসী দেববংশই শ্রেষ্ঠ। ভট্টকর্ত্তৃক বিবৃত তাঁহাদের বংশবিবরণ সকলে এইরূপ শুনিয়াছেন। সেই দেববংশ এ জগতে খ্যাতিমন্ত 'কর্ণসৈন্য' বা কর্ণসেনবংশীয় বলিয়া খ্যাত। তাঁহাদের শাণ্ডিলগোত্রই পরিচিত। তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষগণ হরিদ্বার হইতে মগধে আসিয়া বাস করেন। তাঁহারা ক্ষত্রিয়কুলসম্ভব দ্বিজ ও ক্ষত্রপ কায়স্থ। প্রবাদ শুনা যায় যে, তাঁহারা দেবভূমি ব্রহ্মাবর্ত্তে পবিত্র হ্রদের কূলে বাস করিতেন। সেই দেববংশের গুণাবলী কীর্ত্তন করিতেছি, সকলে শ্রবণ করুন। মহীতলে দাতাকর্ণ নামে খ্যাতিবান্ কর্ণসেন নামে কর্ণপুরের রাজা ছিলেন। তিনি কায়স্থ ক্ষত্রপ রাজা, মহাসুর, মহাবলী এবং কর্ণস্বর্ণরাজ্যস্থাপয়িতা বলিয়া কথিত। সেই নয়নরঞ্জন কর্ণরাজ ভাগীরথীর সন্ধিস্থলে বহুকৌশলে কর্ণপুর নির্ম্মাণ করেন। এই কর্ণপুর অতি বিচিত্র, যেন স্বর্ণে বিনির্ম্মিত, ভাষায় তাহার পরিচয় দিতেও আমি অক্ষম। সেই নগর সৌধমালায় সমাকীর্ণ, ধনজন-পরি-

পূর্ণ, সযত্নে সৈন্যগণ দ্বারা সুরক্ষিত। সেই পুরের অধিবাসিগণ সর্ব্বদাই আনন্দে মগ্ন থাকিতেন, কর্ণসেনের প্রভাবে রাজ্যে কোন শত্রুই ছিল না। সেই কর্ণরাজের দেবাংশে এক কুমার জন্মগ্রহণ করেন, তিনি বৃষকেতু নামে ভারতে প্রসিদ্ধ। তাঁহার শুভ অন্নপ্রাশনের দিন লঙ্কেশ্বর বিভীষণ কর্ণপুরে আসিয়াছিলেন, তাঁহার আগমনে এখানে স্বুবর্ণবৃষ্টি হইয়াছিল, তজ্জন্য (কর্ণের রাজধানী) কর্ণস্বর্ণ নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছিল। রাজার অনুজ্ঞায় 'দেব' উপাধিধারী সকল কায়স্থই কর্ণপুরে আগমন করেন, তাঁহারা শাণ্ডিল্য, মৌদ্গল্য, বাৎস্য, পরাশর, ভরদ্বাজ, ঘৃতকৌশিক ও আলম্যান এই সপ্তগোত্রে বিভক্ত। ইঁহারা সকলেই 'কর্ণস্বর্ণ' বা কাণসোণা সমাজের 'দেব' বলিয়া পরিচিত। ইঁহাদের মধ্যে শাণ্ডিল্য দেবগণই কুলনায়ক হইয়াছিলেন। বহুকাল পর্য্যন্ত সকলে সেই স্থানে বাস করিয়াছিলেন। সেই যুদ্ধতৎপর নানা গোত্রে বিভক্ত দেবগণ অঙ্গবঙ্গের মধ্যে বহু রাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন।

উদ্ধৃত কুলবিবরণ হইতে প্রমাণিত হইতেছে যে, বঙ্গে দাতাকর্ণ নামে প্রসিদ্ধ কর্ণস্বর্ণ বা কর্ণসুবর্ণরাজ্যপ্রতিষ্ঠাতা রাজা কর্ণসেন ক্ষত্রপ কায়স্থরাজবংশে জন্মগ্রহণ করেন, তাঁহার শাণ্ডিল্য-গোত্র ও দেব পদ্ধতি। তাঁহার পূর্ব্বপুরুষগণ প্রথমে হরিদ্বারের নিকট বাস করিতেন, তৎপরে মগধে আসিয়া বাস করেন। তাঁহারা অঙ্গবঙ্গের মধ্যে নানাস্থানে রাজ্যপ্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। রাজা কর্ণসেন ভাগীরথীর সন্নিস্থানে নিজ নামানুসারে কর্ণপুর রাজধানী নির্ম্মাণ করেন। তাঁহার পুত্রের অন্নপ্রাশনকালে লঙ্কা হইতে বিভীষণ আসিয়াছিলেন, তৎকালে কর্ণরাজধানীতে এত সুবর্ণদান হইয়াছিল যে পরে ঐ স্থান 'কর্ণস্বর্ণ' বা কর্ণসুবর্ণ নামে প্রথিত হয়।

পূর্ব্বেই লিখিয়াছি যে, সুলতানগঞ্জের নিকটবর্ত্তী সুপ্রাচীন ধ্বস্তস্তূপ হইতে মহাক্ষত্রপ রুদ্রসেনের ২টী মুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছে। লিপিপর্য্যালোচনা করিয়া সুপ্রসিদ্ধ প্রত্নতত্ত্ববিদ্ কনিংহাম সাহেব ঐ মুদ্রাটী খৃষ্টীয় ৪র্থ শতাব্দীর বলিয়া স্থির করিয়াছেন।* তাঁহার মতে এই রুদ্রসেন মালবের মহাক্ষত্রপবংশীয় সূর্য্যসেন বা সত্যসেনের পুত্র। কিন্তু আমরা ঐ রুদ্রসেনকে মালবের শকক্ষত্রপবংশীয় বলিয়া মনে করি না। মালবে ৫০ জনের অধিক শকক্ষত্রপ রাজত্ব করিয়া গিয়াছেন এবং তাঁহাদের বহুশত মুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই সকলের মধ্যে রুদ্রসেন একজন বিশেষ পরাক্রমশালী নৃপতি ছিলেন বলিয়া মনে হয় না। অথচ এদেশে এই সামান্য নৃপতির মুদ্রা পাওয়া গেল, কিন্তু তৎপূর্ব্ববর্ত্তী পরাক্রান্ত শকক্ষত্রপগণের আর কাহারও মুদ্রা পাওয়া গেল না, তাহাই বা কিরূপে স্বীকার করি? এরূপস্থলে মালবের রুদ্রসেন ও সুলতান-গঞ্জের রুদ্রসেন বিভিন্ন ব্যক্তি বলিয়াই আমাদের মনে হয়।

উদ্ধৃত কুলগ্রন্থের প্রমাণানুসারে কায়স্থ-ক্ষত্রপবংশ হরিদ্বার হইতেই আগমন করেন। শক-সম্রাট্‌গণের অধীনে ক্ষত্রপরূপে সম্ভবতঃ তাঁহারা মগধ শাসন করিতেন। গুপ্তবংশের অভ্যুদয়-কালে মগধ হইতে বিতাড়িত হইয়া প্রথমে অঙ্গে বা ভাগলপুর (সুলতানগঞ্জ) অঞ্চলে তৎপরে বঙ্গে চলিয়া আইসেন। গুপ্তসম্রাট্ সমুদ্রগুপ্তের আলাহাবাদের শিলালিপিতে সমুদ্রগুপ্তের নিকট

* Cunningham's Arch. Sur. Report. Vol. XV. p. 29-30.

পরাজিত আর্য্যাবর্ত্ত-নৃপতিগণের মধ্যে সর্ব্বপ্রথম রুদ্রদেবের নাম পাওয়া যায়। এই রুদ্রদেবকে সুলতানগঞ্জের মুদ্রানির্দ্দিষ্ট মহাক্ষত্রপ রুদ্রসেন বলিয়া মনে করি। সমুদ্রগুপ্তের শিলালিপিতে শকাদি নৃপতিগণের স্বতন্ত্র উল্লেখ থাকায় রুদ্রদেবকে আমরা শকক্ষত্রপ বলিয়া গ্রহণ করিতে পারিলাম না। উক্ত কুলগ্রন্থ হইতে বুঝিয়াছি, কর্ণসেনের যেমন প্রকৃত পদবী হইতেছে 'দেব', সেইরূপ মহাক্ষত্রপ রুদ্রসেনের প্রকৃত পদবী 'দেব' ছিল বলিয়াই সমুদ্রগুপ্তের শিলালিপিতে তিনি 'রুদ্র-দেব' নামে অভিহিত হইয়াছেন। মহাক্ষত্রপ রুদ্রসেনের মুদ্রালিপির অক্ষররূপ হইতেও তাঁহাকে সমুদ্রগুপ্তের সমসাময়িক বলিয়া মনে হয়। পাটলিপুত্রে সমুদ্রগুপ্তের রাজধানী ছিল। তাঁহার সময়ে সম্ভবতঃ রুদ্রদেব অঙ্গে বা ভাগলপুর অঞ্চলে রাজত্ব করিতেছিলেন, সুতরাং আর্য্যাবর্ত্ত-নৃপতিগণের মধ্যে রুদ্রদেবই সমুদ্রগুপ্তের অব্যবহিত পার্শ্ববর্ত্তী নৃপতি হওয়ায় তাঁহার নামটী সর্ব্বপ্রথম উক্ত হইয়াছে। সম্রাট্ সমুদ্রগুপ্ত প্রায় ৩৪৮-৩৯৯ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। ঐ সময়মধ্যে মহাক্ষত্রপ রুদ্রসেনদেবের অভ্যুদয় স্বীকার করিতে হইবে। রুদ্রদেব সমুদ্র-গুপ্তের নিকট পরাজিত বা নিহত হইলে সম্ভবতঃ তৎপুত্র বঙ্গদেশে পলাইয়া আসেন। এই পলাতক রুদ্রসেন-দেব-পুত্রের ঔরসে খুব সম্ভব কর্ণসেন জন্মগ্রহণ করেন। পিতামহ গুপ্ত-সম্রাটের নিকট পরাজিত ও তৎপুত্র নিজ রাজ্য ত্যাগ করিয়া পলায়নপর হইয়াছিলেন বলিয়া সম্ভবতঃ কুলগ্রন্থে তাঁহাদের নাম গৃহীত হয় নাই। কর্ণসেন নূতন রাজ্যপ্রতিষ্ঠা ও দেববংশের মুখোজ্জ্বল করিয়াছিলেন, বলিয়া তাঁহারই পরিচয় কুলগ্রন্থে উজ্জ্বলভাবে বিবৃত হইয়াছে। কুল-গ্রন্থে যে লঙ্কাধিপ বিভীষণের প্রসঙ্গ আছে, কাশ্মীরের প্রসিদ্ধ ইতিহাস রাজতরঙ্গিণী ও সিংহলের 'মহাবংশ' হইতে তাহার কিছু কিছু আভাস পাইয়াছি। রাজতরঙ্গিণীতে লিখিত আছে, কাশ্মীরপতি মেঘবাহন লঙ্কাপতি বিভীষণকে পরাজিত করেন।[৯] সেই মেঘবাহন প্রাগ্-জ্যোতিষ-রাজকুমারীর পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন।[১০] এরূপস্থলে মনে হয়, সিংহলে না গিয়া যে সময়ে বিভীষণ বঙ্গে আসিয়া বাস করিতেছিলেন, সেই সময়ে মেঘবাহন বিভীষণকে যুদ্ধে পরাস্ত করেন। রাজতরঙ্গিণীর লিখিত বৃত্তান্ত হইতে মনে হয় যে, মেঘবাহন ৪৪০ খৃষ্টাব্দের নিকটবর্ত্তী সময়ে বিদ্যমান ছিলেন।[১১] সিংহলের মহাবংশ আলোচনা করিলেও জানিতে পারি, ৪৫০ খৃষ্টাব্দের কিছুপরে ধাতুসেন সিংহল বা লঙ্কার অধিপতি ছিলেন। তিনি স্থবির-বাদীদিগের জন্য ১৮টী বিহার ও ১৮টী বাপী প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। এই ১৮টী বিহারের মধ্যে একটীর নাম ধাতুসেন, একটীর নাম কাশ্যপীপিট্ঠক ও একটীর নাম বিভীষণ-বিহার[১২]। মহাবংশে মহারাজ ধাতুসেনের দুই বিভিন্ন পত্নীর গর্ভজাত দুইটী পুত্রের নাম পাওয়া যায়, একটীর কস্সপো (কশ্যপ) অপরটীর নাম মোগগল্লানো (মৌদ্গল্যায়ন)। কশ্যপ দুই ব্যক্তির

(৯) রাজতরঙ্গিণী ৩।৭৬-৭৮। (১০) রাজতরঙ্গিণী ২।১৫১-৫৩।

(১১) বিশ্বকোষ ৪র্থ ভাগ কাশ্মীর শব্দ দ্রষ্টব্য।

(১২) Turnour's Mahawanso, p. 256-257.

পরামর্শে পিতাকে বন্দী করিয়া রাজছত্র গ্রহণ করেন। মৌদ্গল্যায়নও ভ্রাতার বিরুদ্ধে অস্ত্র-ধারণ করিয়াছিলেন, কিন্তু উপযুক্ত সেনাবলের অভাবে জম্বুদ্বীপে (ভারতবর্ষে) পলাইয়া আসেন।[১৩] এই মোগ্গল্লানকেই আমরা লঙ্কার রাজপুত্র বিভীষণ বলিয়া মনে করি। পূর্ব্বেই লিখিয়াছি যে, মহারাজ ধাতুসেন নিজ ও নিজপুত্রের নামানুসারে বিহার প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। তাঁহার অপর পুত্রের নামানুসারে যখন কাস্সপিট্ঠক অর্থাৎ কাশ্যপীপিষ্টক বিহারের নাম পাইতেছি, অথচ তাহার প্রিয়পুত্র [illegible]গ্গল্লানের নামে কোন বিহারের উল্লেখ পাইতেছি না, তৎপরেই বিভীষণ-বিহারের না[illegible] দেখিতেছি, আবার ঐ সময়ে প্রাচ্যভারতে কাশ্মীরপতি মেঘবাহনের নিকট সিংহলাধিপ বিভীষণের পরাজয়সংবাদ এবং কুলগ্রন্থে কর্ণসেনের রাজধানীতে তাঁহার আগমন-সংবাদ পাইতেছি, তখন মোগ্গল্লান ও বিভীষণকে অভিন্ন ব্যক্তি বলিয়া গ্রহণ করিতে বিশেষ আপত্তি দেখিতেছি না। সম্ভবতঃ সিংহলপতি ধাতুসেনের বন্দিত্বকালে ও বিভীষণের পলায়নকালে মহাস্থবির মহানামও প্রাচ্যভারতে চলিয়া আসেন। তিনি বুদ্ধগয়ায় বহুদিন যে অবস্থান করিয়াছিলেন, মহাবোধি হইতে আবিষ্কৃত তাঁহার শিলালিপি হইতেই তাহা প্রমাণিত হইয়াছে[১৪]। এ সময়ে দ্রাবিড় বা আন্ধ্রগণের সহিত সিংহলের যথেষ্ট সংস্রব ছিল, আন্ধ্ররাজগণ স্ব স্ব নামের সহিত মাতৃনামও ব্যবহার করিতেন। বিভীষণও সম্ভবতঃ কোন দ্রাবিড়-রাজকন্যার গর্ভজাত বলিয়া আন্ধ্রদিগের আদর্শে মাতৃনামে পরিচিত ছিলেন, সম্ভবতঃ তাঁহার পুরানাম ছিল মৌদ্গলীপুত্র বিভীষণ, খুব সম্ভব তাহা হইতেই তিনি মোগ্গল্লান (মৌদ্গল্যায়ন) নামে মহাবংশে পরিচিত হইয়াছেন।

কর্ণসেন সম্বন্ধে ভট্টগ্রন্থে যেরূপ লিখিত হইয়াছে, মুর্শিদাবাদ অঞ্চলে অদ্যাপি কতকটা ঐরূপ প্রবাদ শুনা যায়[১৫]। সুতরাং রাজতরঙ্গিণী, মহাবংশ ও জনশ্রুতি একত্র করিলে উক্ত ভট্টগ্রন্থের উক্তি ঐতিহাসিক সত্য বলিয়া অনায়াসেই গ্রহণ করিতে পারা যায়। এরূপস্থলে অতিপূর্ব্বকাল হইতেই বঙ্গদেশ কায়স্থরাজবংশের শাসনাধীন ছিল বলিয়া প্রমাণিত হইতেছে।

গুপ্তসম্রাট্গণের শিলালিপি আলোচনা দ্বারা জানা গিয়াছে, সমুদ্রগুপ্ত, তৎপুত্র দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত এবং ২য় চন্দ্রগুপ্তপুত্র প্রথম কুমারগুপ্তের সময় (৪৫০ খৃষ্টাব্দ) পর্য্যন্ত গুপ্তসম্রাট্গণের আধিপত্য অব্যাহত ছিল। মনে হয়, এ সময়ে অঙ্গবঙ্গে উক্ত দেববংশীয় যে সকল কায়স্থ-ক্ষত্রপ বিদ্যমান ছিলেন, তাঁহারা গুপ্তসম্রাট্গণের মহাসামন্তরূপে অধীনতা স্বীকার করিয়া চলিতেন। কুমারগুপ্তের পুত্র স্কন্দগুপ্তের সময়ে পশ্চিমভারতে পুষ্যমিত্র, হূণ ও নাগবংশীয়গণ প্রবল হইয়া গুপ্তসাম্রাজ্য আক্রমণ করেন। তাঁহাদের গতিরোধ করিবার জন্য স্কন্দগুপ্ত পশ্চিমভারতে অনেকটা বিব্রত হইয়াছিলেন, এই সুযোগে কায়স্থ-ক্ষত্রপ কর্ণদেব পূর্ব্বপুরুষের প্রণষ্টগৌরব উদ্ধার করিয়া পরাক্রান্ত স্বাধীন নৃপতি বলিয়া পরিচিত হইয়াছিলেন। এরূপস্থলে

(১৩) Turnour's Mahawanso, p. 260.

(১৪) Fleet's Corpus Ins. Ind. III. p.

(১৫) শ্রীনিখিলনাথ রায়ের মুর্শিদাবাদের ইতিহাস, ১ম ভাগ।

৪৫০ খৃষ্টাব্দের পর কর্ণসেনের অভ্যুদয় মোটামুটী ধরিয়া লইতে পারি। যতদিন স্কন্দগুপ্ত জীবিত ছিলেন, ততদিন পরাক্রান্ত হূণগণ গুপ্তসাম্রাজ্য অধিকারে সমর্থ হন নাই। ৪৬৭ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়, তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা পুরগুপ্তের সময় হইতেই হূণগণের অত্যাচার বৃদ্ধি হইতে থাকে, পুরগুপ্তের পুত্র নরসিংহগুপ্ত বা নরবালাদিত্য হূণরাজের নিকট পরাজয় স্বীকার করেন। গুপ্তসম্রাট্ প্রায় ৫১০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত হূণগণের অধীনতা স্বীকার করিতে [বা]ধ্য হইয়াছিলেন। পশ্চিমাঞ্চলের সেই বিপ্লবের সময় প্রাচ্যভারতে রাঢ়বঙ্গের অধিপতি কর্ণসেন যে নির্ব্বিবাদে ও সুখস্বচ্ছন্দে আধিপত্য করিয়া যাইবেন, তাহা অসম্ভব নহে। বটুভট্ট-রচিত উক্ত 'দেববংশ' হইতে জানা যায় যে, কর্ণপতির দেবাংশে এক কুমার জন্মগ্রহণ করেন, তিনি 'বৃষকেতু' নামে পরিচিত হইয়াছিলেন। ইঁহারই শুভ অন্নপ্রাশনের দিন লঙ্কেশ্বর বিভীষণ উপস্থিত হন।[১৬] বাণভট্টের হর্ষচরিত হইতে আমরা জানিতে পারি যে, সুহ্মাধিপতি দেবসেনের মহিষী দেবকী দেবরের প্রতি অনুরক্তা ছিলেন। তিনি বিষচূর্ণগর্ভ কর্ণোৎপলসাহায্যে দেবসেনকে নিহত করেন। এই দেবসেনই সম্ভবতঃ লিপিকরপ্রমাদে 'দেবাংশ'রূপে উক্ত ভট্টগ্রন্থে গৃহীত হইয়াছেন। বাণভট্ট যে সময়ের কথা উল্লেখ করিয়াছেন, সেই সময়ে আমরা কর্ণসেনের পুত্র দেবসেন বা বৃষকেতুকে পাইতে পারি।

খৃষ্টীয় ৬ষ্ঠ শতাব্দে বরাহমিহির বৃহৎসংহিতায় বর্ত্তমান বঙ্গদেশকে পৌণ্ড্র, সমতট, বর্দ্ধমান, সুহ্ম, তাম্রলিপ্ত, বঙ্গ ও উপবঙ্গ এই কয় ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। আবার খৃষ্টীয় ৭ম শতাব্দীতে চীন-পরিব্রাজক য়ুঅন্ চুয়ং (হিউএন্ সিয়ং) এদেশে আসিয়া এ অঞ্চল পুণ্ড্রবর্দ্ধন, কর্ণসুবর্ণ, সমতট ও তাম্রলিপ্ত এই কয় খণ্ডে বিভক্ত দেখিয়া গিয়াছেন। এরূপস্থলে খৃষ্টীয় ৬ষ্ঠ শতাব্দে কর্ণসুবর্ণের প্রতিষ্ঠা হইলেও ইহার নাম বেশী দূর পর্য্যন্ত খ্যাত নাই। বরাহমিহির বর্দ্ধমান ও সুহ্ম নামে যে স্থানের উল্লেখ করিয়াছেন, চীনপরিব্রাজকের সময় তাহাই কর্ণসুবর্ণরাজ্য বলিয়া প্রথিত হইয়াছিল। এরূপস্থলে সুহ্মাধিপতি ও কর্ণসুবর্ণাধিপতি অভিন্ন ব্যক্তিই হইতেছেন। যাহা হউক, দেবসেন পত্নীহস্তে নিহত হইলে দেবকীর প্রণয়ী দেবসেন-ভ্রাতা রাজা হইয়াছিলেন সন্দেহ নাই, কিন্তু এই ভ্রাতৃহন্তার রাজপদ নিরাপদ্ ছিল বলিয়া মনে হয় না, রাজপুরুষ ও প্রজাবৃন্দ তাঁহার বিরুদ্ধে থাকায় তাঁহাকে বেশীদিন রাজ্যসুখ ভোগ করিতে হয় নাই। যে সময়ে কর্ণসুবর্ণরাজ্যে এইরূপ বিপ্লব উপস্থিত, তাহারই অত্যল্পকাল পরে মালবে যশোধর্ম্মার এবং বঙ্গে ধর্ম্মাদিত্য নামে এক ব্যক্তির অভ্যুদয়। সম্ভবতঃ দেবসেনভ্রাতা ও নিকটবর্ত্তী অপরাপর নৃপতিগণকে পরাজিত করিয়া ধর্ম্মাদিত্য মহারাজাধিরাজ উপাধি ধারণ করেন।

(১৬) "দেবাংশেন কর্ণপতেঃ কুমারো জাতবানসৌ।
বৃষকেতুরিতি নাম প্রসিদ্ধশ্চ হি ভারতে ॥১২
শুভান্নপ্রাশনদিনমাগতশ্চ ততঃপরম্।
বিভীষণো লঙ্কেশ্বরো যত্রাগতো মহাকৃতিঃ ॥১৩" (বটুভট্টের দেববংশ)
আদর্শে 'দেবসেনঃ' শব্দ ছিল, তাহাই বোধহয়, লিপিকরপ্রমাদে 'দেবাংশেন' হইয়াছে

যদিও গুপ্তসম্রাট্ বালাদিত্য যশোধর্ম্মা, সেনাপতি ভটার্ক প্রভৃতি বীরগণের সাহায্যে হূণপতি মিহিরকুলকে পরাজিত করিয়া প্রণষ্টগৌরব কতকটা উদ্ধার করিয়াছিলেন, কিন্তু এ সময়ে গুপ্তশক্তি অনেকটা অন্তঃসারশূন্য হইয়া পড়িয়াছিল। ৫২০ খৃষ্টাব্দে বালাদিত্যের মৃত্যুর পর যশোধর্ম্মা প্রভৃতি তাঁহার অনুগত সামন্তরাজগণ সকলেই স্বাধীনতা ঘোষণা করিলেন। এমন কি, ইহারই কয়েক বৎসর পরে মালবপতি যশোধর্ম্মা সমগ্র আর্য্যাবর্ত্ত, এমন কি, ব্রহ্মপুত্র পর্য্যন্ত জয় করিয়া রাজচক্রবর্ত্তী হইয়াছিলেন। এ সময়ে গুপ্তসম্রাট্গণ মালবপতির নিকট আর্য্যাবর্ত্তের অধিকাংশ হারাইয়াছিলেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। যতদিন যশোধর্ম্মা জীবিত ছিলেন, ততদিন গুপ্তসম্রাট্বংশধরগণ মহাসামন্তরূপে পরিগণিত হইয়াছিলেন। যশোধর্ম্মার মৃত্যুর পর তাঁহার অধীন সামন্তনৃপতিগণ সকলেই স্বাধীনতা ঘোষণা করিয়াছিলেন, এই সময়ে গুপ্তবংশের এক শাখা মালবে ও এক শাখা মগধে আধিপত্য করিতে থাকেন। অপর কোন স্থানে তাঁহাদের আধিপত্য ছিল বলিয়া মনে হয় না।[১৭] পশ্চিম ও মধ্যভারতে যেরূপ সামন্তরাজগণ স্বাধীনতা ঘোষণা করিতেছিলেন, প্রাচ্যভারতের সামন্ত রাজন্যবর্গও এ শুভ সুযোগ পরিত্যাগ করেন নাই। এই সময় যে সকল বঙ্গনৃপতি প্রাচ্যভারতের অধীশ্বর বলিয়া প্রপূজিত হইয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে মহারাজাধিরাজ ধর্ম্মাদিত্যদেব, গোপচন্দ্রদেব ও সমাচারদেবের সংক্ষিপ্ত পরিচয় পূর্ব্ব অধ্যায়ে বিবৃত হইয়াছে।

পূর্ব্বেই লিখিয়াছি, মালবপতি যশোধর্ম্মার সমকালেই ধর্ম্মাদিত্যের অভ্যুদয়। তিনি সমস্ত বরেন্দ্র ও বঙ্গ অধিকার করিয়া পরমভট্টারক ও মহারাজাধিরাজ উপাধি গ্রহণ করেন এবং তাঁহার অধীনে মহাসামন্ত স্থাণুদত্ত 'মহারাজ' উপাধিতে ভূষিত হইয়া সমতট বা দক্ষিণবঙ্গ শাসন করিতেন, পূর্ব্ব-অধ্যায়ে উদ্ধৃত তাম্রলেখ হইতেই তাহা প্রতিপন্ন হইয়াছে। তৎপরে প্রায় ৫২৯-৩০ খৃষ্টাব্দে মালবপতি যশোধর্ম্মা বঙ্গবিজয় করেন, এই সময়ে মালবপতির নিকট পরাজিত হইয়া ধর্ম্মাদিত্যের প্রভাব অনেকটা কমিয়া যায় এবং নিজেই অনেকটা মহাসামন্তরূপে পরিগণিত হন, তাই তিনি ও তাঁহার উত্তরাধিকারী গোপচন্দ্রদেব ও সমাচারদেব মহারাজাধিরাজ উপাধি ব্যবহার করিলেও তাঁহাদের অধীনে স্থাণুদত্তের ন্যায় আর কোন মহারাজের সন্ধান পাইতেছি না। যাহা হউক, উভয়েই গঙ্গা হইতে সমুদ্রকূল পর্য্যন্ত অর্থাৎ কর্ণসুবর্ণ ও সমতটের কিয়দংশ অধিকারে রাখিতে পারিয়াছিলেন। পূর্ব্ববর্ত্তী নৃপতিগণের সহিত ধর্ম্মাদিত্যদেব, গোপচন্দ্রদেব ও সমাচারদেবের কি সম্বন্ধ ছিল, তাহা জানিবার উপায় নাই। বটুভট্টরচিত উক্ত দেববংশ-গাথায় লিখিত আছে—

"রণপরায়ণা দেবা গোত্রৈশ্চ বহুবিভক্তাঃ।
স্থাপয়ামাসুঃ যত্নেন রাজ্যকাঙ্গবঙ্গয়োঃ॥"

কর্ণসেনের পর তাঁহার সমাজস্থ নানা গোত্রে বিভক্ত যুদ্ধপ্রিয় (কায়স্থ) দেববংশ চেষ্টা

(১৭) বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস, বৈশ্যকাণ্ড, ১মাংশ।

দ্বারা অঙ্গ ও বঙ্গে বহু রাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন। আমাদের মনে হয় যে, ধর্ম্মাদিত্য, গোপচন্দ্র ও সমাচার দেব এই তিন জনেই কাণসোণা-সমাজস্থ ঐরূপ কোন দেববংশ হইবেন।

শশাঙ্কদেব

সমাচারদেবের পর শশাঙ্কদেবের নাম পাই। প্রাচ্যভারতের ইতিহাসে মৌর্য্যসম্রাট্ অশোক ও সমুদ্রগুপ্তের পর এই শশাঙ্কদেবের ন্যায় বোধ হয় আর কোন নৃপতি তাদৃশ প্রসিদ্ধিলাভ করিতে পারেন নাই। বর্ত্তমান ঐতিহাসিকগণ ইঁহার পুরা নাম 'শশাঙ্ক নরেন্দ্রগুপ্ত' এইরূপ লিখিয়া থাকেন। তাহার কারণ এই—

বাণভট্টের হর্ষচরিত ও চীনপরিব্রাজকের ভ্রমণকাহিনীতে লিখিত আছে, হর্ষের পিতা প্রভাকরবর্দ্ধনের মৃত্যুর পর তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র রাজ্যবর্দ্ধন (প্রায় ৬০৫ খৃষ্টাব্দে) পিতৃসিংহাসনে আরোহণ করেন। রাজ্যশ্রী নামে তাঁহার এক অসামান্য-গুণবতী ও পরমাসুন্দরী ভগিনী ছিলেন, বৌদ্ধ-সম্মতীয় মতে তাঁহার বিশেষ আস্থা ছিল, কান্যকুব্জরাজ মৌখরি গ্রহবর্ম্মার সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। সিংহাসনে আরোহণ করিতে না করিতেই রাজ্যবর্দ্ধন শুনিলেন যে, মালবপতি তাঁহার ভগিনীপতির প্রাণসংহার করিয়া ভগিনীকে শৃঙ্খলচুম্বিত-চরণে বন্দী করিয়া রাখিয়াছেন। কালবিলম্ব না করিয়া রাজ্যবর্দ্ধন দ্রুতগামী দশ সহস্র সৈন্য লইয়া মালবরাজের বিরুদ্ধে অভিযান করিলেন ও সহজেই মালবরাজ দেবগুপ্তকে পরাজিত করিলেন। কিন্তু মালবরাজের আত্মীয় গৌড়াধিপ রাজ্যবর্দ্ধনকে শিবিরে নিমন্ত্রণ করিয়া আনিয়া বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া গোপনে তাঁহার হত্যাসাধন করেন। জ্যেষ্ঠভ্রাতা রাজ্যবর্দ্ধনের এইরূপ শোচনীয় পরিণাম শ্রবণমাত্র হর্ষবর্দ্ধন অত্যন্ত শোকাকুল হইয়া উঠেন এবং অবিলম্বে বহু সৈন্য লইয়া গৌড়-অভিমুখে যাত্রা করেন। চীনপরিব্রাজক এই ঘটনার ৩১ বর্ষ পরে বোধগয়া, পৌণ্ড্রবর্দ্ধন ও কর্ণসুবর্ণে আসিয়া কর্ণসুবর্ণের অধিপতি শশাঙ্কের দারুণ বৌদ্ধবিদ্বেষের নিদর্শন দেখিয়া গিয়াছেন এবং লোকমুখে শুনিয়া তাঁহার অত্যাচারকাহিনী লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। চীনপরিব্রাজকের বর্ণনায় জানা যায় যে, রাজ্যবর্দ্ধনের হত্যাকাণ্ডে শশাঙ্কদেব লিপ্ত ছিলেন। এই কারণে হর্ষবর্দ্ধন তাঁহাকে শাস্তি দিবার জন্য অগ্রসর হইয়াছিলেন।

গৌড়পতি ও কর্ণসুবর্ণপতিকে অভিন্ন মনে করিয়া পাশ্চাত্য প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণ শশাঙ্কের পুরা নাম 'শশাঙ্ক নরেন্দ্রগুপ্ত' লিখিয়াছেন এবং আমরাও তদনুসারে গৌড়পতি ও কর্ণসুবর্ণপতিকে এক মনে করিয়াছিলাম,[১৮] কিন্তু এখন আলোচনা দ্বারা বুঝিতেছি যে, গৌড়পতি নরেন্দ্রগুপ্ত ও কর্ণসুবর্ণের অধিপতি শশাঙ্কদেব এক ব্যক্তি হইতে পারেন না। হর্ষচরিতের একখানি পুথিতে রাজ্যবর্দ্ধনহন্তার পুরা নাম নরেন্দ্রগুপ্ত লিখিত আছে।[১৯] এ দিকে চীনপরিব্রাজক য়ুঅন্ চুঅং (হিউএন্‌সিয়ং) লিখিয়াছেন যে, বৌদ্ধদ্বেষী কর্ণসুবর্ণপতি শশাঙ্কই

(১৮) বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস, বৈশ্যকাণ্ড, ১মাংশ, ১৬৬ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

(১৯) Dr. Buhler in Epigraphia Indica, Vol. I. p. 70.

বিশ্বাসঘাতকতাপূর্ব্বক রাজ্যবর্দ্ধনকে বিনাশ করেন।[২০] বোধ হয়, ঐরূপ উক্তি দেখিয়াই কর্ণসুবর্ণপতি শশাঙ্ক ও গৌড়পতি নরেন্দ্রগুপ্তকে অভিন্ন ব্যক্তি বলিয়া অনেকেই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। কিন্তু যে সময়ের কথা লিখিতেছি সে সময়ে গৌড় ও কর্ণসুবর্ণ দুইটি স্বতন্ত্র রাজ্য ও স্বতন্ত্র রাজার অধিকারভুক্ত ছিল।[২১]

চীনপরিব্রাজকের আগমনকালে (৬৩১-৬৩৮ খৃঃ অব্দে) প্রাচ্যভারত মগধ, ঈরিণ বা হিরণ্যপর্ব্বত, চম্পা, কয়ঙ্গল, পুণ্ড্রবর্দ্ধন, কামরূপ, সমতট, তমোলিপ্তি, কর্ণসুবর্ণ ও উড্র এই কয়খণ্ডে বিভক্ত ছিল। তাহার মধ্যে পৌণ্ড্রবর্দ্ধনই গৌড় বলিয়া প্রধানতঃ পরিচিত ছিল।[২২] এ অবস্থায় রাজ্যবর্দ্ধনের নিহন্তা গৌড়াধিপকে পুণ্ড্রবর্দ্ধন-রাজ্যের অধিপতি বলিয়াই মনে করি। কোন প্রাচীন পুস্তক বা খোদিত লিপিতে শশাঙ্কের নামান্তর নরেন্দ্রগুপ্ত বাহির হয় নাই; বরং তাঁহার যে সুপ্রাচীন মোহর আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহাতে তিনি 'মহাসামন্ত শ্রীশশাঙ্কদেব' নামে পরিচিত হইয়াছেন।[২৩] এ অবস্থায় অনায়াসেই মনে করা যাইতে পারে যে, কর্ণসুবর্ণ-প্রতিষ্ঠাতা কর্ণদেবের বংশেই শশাঙ্কদেবের জন্ম। সুলতানগঞ্জের মুদ্রায় রুদ্রদেব যেরূপ 'মহাক্ষত্রপ' নামে এবং ভট্টগ্রন্থে কর্ণদেব যেরূপ ক্ষত্রপবংশোদ্ভব বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন, সেইরূপ শশাঙ্কদেবও প্রথমে 'মহাসামন্ত' বলিয়াই পরিচয় দিতেন। তাঁহার অভ্যুদয়-কালে প্রথিত গুপ্তবংশের গৌরবরবি এক কালে অস্তমিত হয় নাই। তখনও মালবে ও গৌড়ে গুপ্তবংশ আধিপত্য করিতেছিলেন। বাণভট্টের হর্ষচরিতবর্ণিত মালবরাজ দেবগুপ্ত ও গৌড়াধিপ নরেন্দ্রগুপ্ত হইতেই তাহার সন্ধান পাইতেছি। মগধ হইতে পুণ্ড্রবর্দ্ধন পর্য্যন্ত গুপ্তবংশের অধিকারভুক্ত ছিল।[২৪] কর্ণসুবর্ণপতি শশাঙ্কদেব প্রথমে তাঁহাদের মিত্ররাজ ও মহাসামন্তরূপে গণ্য ছিলেন। রোটাস্‌গড় হইতে আবিষ্কৃত তাঁহার মোহর হইতেই প্রমাণিত হইতেছে। সম্ভবতঃ পৌণ্ড্রবর্দ্ধনপতি নরেন্দ্রগুপ্তের শিবিরে যখন রাজ্যবর্দ্ধন নিমন্ত্রণগ্রহণ করেন, সে সময় শশাঙ্কদেবও তথায় উপস্থিত ছিলেন। এ কারণ তিনিও রাজ্যবর্দ্ধনহন্তা-মধ্যে গণ্য হইতে পারেন। তিনি 'শশাঙ্ক-সেন' নামেও পরিচিত হইয়াছেন।[২৫] এ সময়ে

(২০) Beal's Buddhist Records of the Western World, Vol. I. p. 210.

(২১) চীনপরিব্রাজক য়ুয়ন্ চুয়ং (হিউএন্‌সিয়ং) পুণ্ড্রবর্দ্ধন বা গৌড় এবং কর্ণসুবর্ণ এই দুইটী জনপদেই আসিয়াছিলেন এবং দুইটীকে বিভিন্ন রাজ্য বলিয়াই উল্লেখ করিয়াছেন।

(২২) "পুণ্ড্রাঃ স্যুর্ব্বরেন্দ্রীগৌড়নীবৃতিঃ" (ত্রিকাণ্ডশেষ)

(২৩) Fleet's Gupta Inscriptions, p. 283. কনিংহাম্ সাহেব লিখিয়াছেন যে, জৈনগ্রন্থে শশাঙ্কের অপর নাম নরেন্দ্রগুপ্ত লেখা আছে। (Arch. Sur. Rept. IX. p. 157) সম্ভবতঃ পরবর্ত্তী জৈনগ্রন্থকার দুই ব্যক্তিকে এক করিয়া ফেলিয়াছেন।

(২৪) প্রত্নতত্ত্ববিদ্ ডাক্তার হোর্ণলি সাহেবও এই গৌড়াধিপ গুপ্তকে শশাঙ্ক নরেন্দ্রগুপ্ত নামে পরিচিত করিয়াছেন। এই গৌড়াধিপের প্রকৃত নাম 'নরেন্দ্রগুপ্ত' হইতে পারে, কিন্তু তিনি ও শশাঙ্কদেব সম্পূর্ণ ভিন্ন ব্যক্তি।

(২৫) শ্রীপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের বাঙ্গলার পুরাবৃত্ত, ১১১ পৃঃ।

কান্যকুব্জ-অঞ্চলে মৌখরি বর্ম্মবংশ আধিপত্য করিতেন। হর্ষের ভগিনীপতি মৌখরি গ্রহবর্ম্মার মৃত্যু, তৎপরে হর্ষদেবের হস্তে গৌড়াধিপ গুপ্তের নিপাত এবং কান্যকুব্জে হর্ষের রাজধানী-পরিবর্ত্তনকালে কর্ণসুবর্ণপতি শশাঙ্কদেবও বলসঞ্চয়পূর্ব্বক মহারাজাধিরাজ উপাধি গ্রহণপূর্ব্বক সার্ব্বভৌম হইবার আশায় উদ্দীপিত হইয়াছিলেন, সন্দেহ নাই। পার্শ্ববর্ত্তী নৃপতিবৃন্দ তাঁহারই ভয়ে সন্ত্রস্ত ছিলেন। হর্ষবর্দ্ধন কান্যকুব্জে অধিষ্ঠিত হইলে, সম্ভবতঃ এখানকার মৌখরি-রাজবংশ (গ্রহবর্ম্মার আত্মীয়) তাঁহাদের পূর্ব্বাধিকার ছাড়িয়া মগধে আসিয়া আধিপত্য করিতে থাকেন।[২৬] এই রাজবংশের সহিত শশাঙ্কদেবের প্রথম সংঘর্ষ উপস্থিত হইয়াছিল। পূর্ব্বেই লিখিয়াছি, গ্রহবর্ম্মার মহিষী রাজ্যশ্রী বৌদ্ধ সম্মতীয় মতাবলম্বী ছিলেন, গ্রহবর্ম্মার আত্মীয়স্বজন মৌখরিগণও ঐরূপ বৌদ্ধধর্ম্মানুরক্ত থাকাই সম্ভবপর। এদিকে শশাঙ্কদেব একজন গোঁড়া শৈব ছিলেন। তাঁহার সহিত মগধের বর্ম্মবংশের সংঘর্ষ অনেকটা ধর্ম্মযুদ্ধে পরিণত হইয়াছিল। তাহারই পরিণাম শশাঙ্ককর্ত্তৃক মগধের বিশাল বৌদ্ধকীর্ত্তি-বিলোপের আয়োজন। চীনপরিব্রাজকের ভ্রমণকাহিনী হইতে জানিতে পারি যে, প্রধান বৌদ্ধপীঠস্থান কুশীনগর হইতে শশাঙ্ক শ্রমণগণকে বিদূরিত করিয়াছিলেন, স্বয়ং অশোক পাটলিপুত্রে সর্ব্বদাই যে বুদ্ধপদচিহ্নযুক্ত উজ্জ্বল পাষাণখণ্ড পূজা করিতেন, বৌদ্ধসমাজে প্রধান উপাস্য বলিয়া চিরদিন যাহার উপাসনা চলিতেছিল, কর্ণসুবর্ণপতি সেই পবিত্র পাষাণখণ্ড গঙ্গাগর্ভে নিক্ষেপ করিয়াছিলেন, তৎপরে তাহা পুনরায় স্বস্থানে নীত হইয়াছিল।[২৭] ভগবান্ বুদ্ধ গয়ায় যে বোধিদ্রুমমূলে বোধিজ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন, শশাঙ্ক সেই বোধিদ্রুম উন্মূলিত করিয়া তাহার মূল পর্য্যন্ত পুড়াইয়া দিয়াছিলেন। এই ঘটনার কয়েকমাস পরেই মগধপতি পূর্ণবর্ম্মার যত্নে সেই বোধিতরু রক্ষিত হইয়াছিল।[২৮] এই বোধিদ্রুমের পার্শ্বেই ১৬০ ফিট্ উচ্চ একটী বৃহৎ বুদ্ধমন্দির ও তন্মধ্যে বোধিদ্রুমমূলে ভূমিস্পর্শ-মুদ্রায় সমাসীন বুদ্ধমূর্ত্তি ছিল, রাজা শশাঙ্ক সেই পাষাণময়ী মূর্ত্তি তুলিয়া ফেলিয়া (নিজ উপাস্য) শিবমূর্ত্তি স্থাপনের বৃথা চেষ্টা করিয়াছিলেন।[২৯] চীনপরিব্রাজকের উক্ত বিবরণী হইতে বেশ আভাস পাওয়া যাইতেছে যে, রাজা শশাঙ্ক মগধের রাজধানী পাটলিপুত্র ও বৌদ্ধসমাজের প্রধানকেন্দ্র বোধগয়া আক্রমণ করিয়াছিলেন এবং মগধপতি তাঁহার নিকট পরাজিত হইয়াছিলেন, নচেৎ তিনি বৌদ্ধসমাজের প্রধান উপাস্য বস্তু নষ্ট করিতে কখনই সাহসী হইতেন না। কিন্তু তাঁহার এই জয়লাভ স্থায়ী ফলদায়ী হয় নাই। কারণ চীনপরিব্রাজক লিখিয়াছেন যে, রাজা শশাঙ্ক কর্ত্তৃক বোধিদ্রুম উন্মূলনের কএক মাস পরে মগধপতি পূর্ণবর্ম্মা পুনরায় বোধিদ্রুমরক্ষার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। মগধের বাহিরে তখন প্রবল পরাক্রান্ত হর্ষদেবের অধিকার, এই কারণে শশাঙ্কদেব মগধ-আক্রমণে কতকটা

(২৬) বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস, বৈশ্যকাণ্ড, ১মাংশ ১৬০ পৃঃ।

(২৭) Watter's Yuan Chuang, Vol II. p. 92.

(২৮) Watter, II. p. 115.

(২৯) Vide Watter, II. p. 116.

কৃতকার্য্য হইলেও মগধের বাহিরে অর্থাৎ সারনাথ প্রভৃতি স্থানের বৌদ্ধতীর্থসমূহে হস্তক্ষেপ করিতে সাহসী হন নাই। কিন্তু মগধ হইতে কর্ণসুবর্ণ পর্য্যন্ত সমুদয় ভূভাগ কিছুদিনের জন্য তাঁহার করতলগত হইয়াছিল, সন্দেহ নাই।

৬০৬ খৃষ্টাব্দে রাজ্যভার গ্রহণ, প্রিয় ভগিনী রাজ্যশ্রীর উদ্ধারসাধন ও ভ্রাতৃহন্তা গৌড়াধিপ নরেন্দ্রগুপ্তের প্রাণসংহার করিয়া হর্ষদেব সম্ভবতঃ পিতৃরাজধানী থানেশ্বরে ফিরিয়া আসেন, তৎপরে কান্যকুব্জে রাজধানী-পরিবর্ত্তন ও স্বরাজ্যের সুশৃঙ্খলাস্থাপনে কিছুদিন কাটিয়া যায়। সেই সময়েই সম্ভবতঃ শশাঙ্কদেব মগধ আক্রমণ করেন।

যাহা হউক, রাজা শশাঙ্কের অত্যাচার-সংবাদ হর্ষদেবের কর্ণগোচর হইলে তিনি কর্ণসুবর্ণপতিকে উপযুক্ত শাস্তিপ্রদানের নিমিত্ত অগ্রসর হইয়াছিলেন, সন্দেহ নাই। এই সময় তাঁহার হৃদয়ে আর্য্যাবর্ত্তের সম্রাট্ হইবার বাসনা জাগিয়া উঠে। চীনপরিব্রাজক লিখিয়াছেন, পাঁচ ছয় বর্ষের মধ্যে তাঁহার জিগীষার কিছুমাত্র তৃপ্তি হইল না। মুহূর্ত্তের জন্যও তাঁহার সৈন্যগণ যুদ্ধবেশ পরিত্যাগ করিতে পারিত না। বলা বাহুল্য, গৌড়, মগধ ও কর্ণসুবর্ণে তাঁহার সহিত শশাঙ্কদেবের দারুণ যুদ্ধ চলিয়াছিল। হর্ষদেব প্রথমতঃ মগধ উদ্ধার করিয়া তাঁহার প্রিয় সহচর মাধবগুপ্তকে তাঁহার আধিপত্য দিয়া থাকিবেন, কিন্তু মাধবগুপ্ত হর্ষদেবের সঙ্গ পরিত্যাগ না করিয়া নিজ প্রিয়পুত্র আদিত্যসেনের উপর শাসনকর্তৃত্ব অর্পণ করেন। সম্ভবতঃ ৬০৯ খৃষ্টাব্দে এই ঘটনা ঘটে।[৩০] মগধ হইতে হর্ষদেব পূর্ব্বাভিমুখে সসৈন্যে বিজয়পতাকা তুলিয়া অগ্রসর হইতে লাগিলেন।

প্রথমতঃ যে সময়ে গৌড়পতিকে শাস্তি দিবার জন্য হর্ষদেব গৌড় ও প্রাগ্‌জ্যোতিষের সীমায় উপস্থিত হন, সেই সময়ে পথিমধ্যে কামরূপপতি ভাস্করবর্ম্মার দূত আসিয়া নানা উপহারাদি প্রদানপূর্ব্বক নিবেদন করিল, কামরূপপতির শৈশব হইতে সংকল্প যে, মহাদেবের চরণযুগল ব্যতীত আর কোথাও মাথা নোয়াইবেন না। ইহা ৩টী উপায়ে হইতে পারে—১ সমস্ত জগৎ জয়, ২ মরণ, অথবা ৩ মহারাজাধিরাজ হর্ষদেবের ন্যায় বীরের সঙ্গে মিত্রতা।[৩১] ভাস্করবর্ম্মার এরূপ মিত্রতা-প্রার্থনার প্রধান কারণ মনে হয়, তৎকালে গৌড়াধিপ গুপ্ত ও কর্ণসুবর্ণাধিপ শশাঙ্কের আক্রমণ-ভীতি। হর্ষদেব কামরূপাধিপের উপহার সাদরে গ্রহণ করিয়াছিলেন, সেইদিন হইতে উভয়ে মিত্রতাপাশে আবদ্ধ হইলেন। এই মিত্রতার ফলে হর্ষদেব পশ্চিম হইতে এবং ভাস্করবর্ম্মা পূর্ব্ব হইতে গৌড় ও কর্ণসুবর্ণরাজ্য আক্রমণ করিয়া থাকিবেন। দুই দিক্ হইতে দুই প্রবল শত্রুর আক্রমণে গৌড়পতি নিহত ও শশাঙ্কদেব ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। এবার হর্ষদেবকে কেবল শত্রুজয় করিয়া যে কারণে ফিরিতে হইয়াছিল, তাহা পূর্ব্বেই লিখিয়াছি। কিন্তু তাঁহার দ্বিতীয়বার আক্রমণে শশাঙ্কদেব

(৩০) বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস, বৈশ্যকাণ্ড, ১মাংশ, ১৬৩ পৃঃ দ্রষ্টব্য।

(৩১) বাণভট্টের হর্ষচরিত।

কর্ণসুবর্ণ-রাজধানী হারাইয়া কর্ণসুবর্ণের দক্ষিণ-অংশে দুর্গম পার্ব্বত্যপ্রদেশে আশ্রয় লইতে বাধ্য হইয়াছিলেন। এই সময়ে হর্ষদেবের নবাধিকারভুক্ত কর্ণসুবর্ণরাজ্যের শাসনশৃঙ্খলা-স্থাপনের ভার কিছুকাল তাঁহার মিত্ররাজ কামরূপপতি ভাস্করবর্ম্মার উপরই ন্যস্ত হইয়া থাকিবে, কারণ কর্ণসুবর্ণরাজ্য কামরূপরাজ্যের ঠিক দক্ষিণ-পশ্চিম পার্শ্ববর্ত্তী থাকায় ভাস্করবর্ম্মার পক্ষে ইহার সুশাসন সুবিধাজনক ছিল। কর্ণসুবর্ণের উপর যে কামরূপপতি কিছুকাল আধিপত্য করিয়াছিলেন, তাহার নিঃসন্দিগ্ধ সুস্পষ্ট প্রমাণও সম্প্রতি বাহির হইয়াছে। অল্পদিন হইল শ্রীহট্টের পঞ্চখণ্ড হইতে ভাস্করবর্ম্মার একখানি তাম্রশাসন আবিষ্কৃত হইয়াছে।[৩২] এই তাম্রশাসনেই লিখিত আছে—

"মহানৌহস্ত্যশ্বপত্তিসংপত্ত্যুপাত্তজয়শব্দান্বর্থস্কন্ধাবারাৎ কর্ণসুবর্ণবাসকাৎ।"

অর্থাৎ মহা নৌকা, হস্তী, অশ্ব ও পদাতিসম্পদ্‌ভূষিত জয়শব্দসম্বলিত কর্ণসুবর্ণসমাবাসিত স্কন্ধাবার হইতে (প্রদত্ত হইতেছে)।

উক্ত তাম্রশাসন হইতেই পাইতেছি যে, যে সময় কামরূপপতি ভাস্করবর্ম্মা চতুরঙ্গবলে কর্ণসুবর্ণের জয়স্কন্ধাবারে অবস্থান করিতেছিলেন, সেই সময় তিনি পুণ্যার্জ্জন কামনায় ব্রাহ্মণকে যে ভূমিদান করিয়াছিলেন, সেই ভূমিদানের সনন্দস্বরূপ উক্ত তাম্রশাসন উৎকীর্ণ হইয়াছিল।

আরও এক কথা, হর্ষচরিত ও চীনপরিব্রাজকের ভ্রমণকাহিনী হইতে বেশ বুঝা যায় যে, হর্ষদেব নিজ আত্মীয়স্বজন অপেক্ষা ভাস্করবর্ম্মাকে ভালবাসিতেন ও শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিতেন।[৩৩] সম্ভবতঃ ভাস্করবর্ম্মা হর্ষদেবের সাম্রাজ্যপ্রতিষ্ঠায় একজন প্রধান সহায় হইয়াছিলেন এবং কর্ণসুবর্ণের মহাসমরে তিনি হর্ষদেবের দক্ষিণহস্তস্বরূপ হইয়া যে রূপ বীরত্ব প্রদর্শন করিয়া জয়ার্জ্জন করিয়াছিলেন, তাহাতে কামরূপরাজ্যের সংলগ্ন কর্ণসুবর্ণের উত্তরপূর্ব্বাংশ তাঁহার অধিকারভুক্ত হওয়া কিছু বিচিত্র নহে!

এই কর্ণসুবর্ণের আয়তন কিরূপ ছিল, এখানে তাহার আলোচনা বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হইবে না।

কর্ণসুবর্ণরাজ্য

উক্ত ঘটনার কিছুকাল পরে (প্রায় ৬৩৮ খৃষ্টাব্দে) চীনপরিব্রাজক পুণ্ড্রবর্দ্ধন হইয়া কামরূপ, কামরূপ হইয়া সমতট, সমতট হইয়া তাম্রলিপ্তি এবং তাম্রলিপ্ত হইয়া কর্ণসুবর্ণে আগমন করেন। তাঁহার বর্ণনায়

(৩২) কামরূপ-অনুসন্ধান-সমিতির ১ম বার্ষিক অধিবেশনে (১৩২০ সাল, ১১ই জ্যৈষ্ঠ) শ্রীযুক্ত পণ্ডিত পদ্মনাথ বিদ্যাবিনোদ এম্ এ মহাশয় এই তাম্রশাসনের প্রাপ্তিসংবাদ ও বিস্তৃত পরিচয় প্রকাশ করিয়া ঐতিহাসিকগণের ধন্যবাদভাজন হইয়াছেন।

(৩৩) এখানে একটী উদাহরণেই যথেষ্ট হইতে পারে। যখন কান্যকুব্জে হর্ষদেব এক বিরাট বুদ্ধ-মহোৎসবের অনুষ্ঠান করেন, সেই উৎসবক্ষেত্রে তাঁহার জামাতা বলভীরাজ ও ১৮ জন করদনৃপতি উপস্থিত থাকিলেও সম্রাট্ হর্ষদেব নিজে শক্রবেশে ভূষিত হন এবং ভাস্করবর্ম্মাকে ব্রহ্মার বেশে সজ্জিত করিয়া তাঁহাকে সর্ব্বাপেক্ষা সম্মানিত করিয়াছিলেন। (বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস, বৈশ্যকাণ্ড, ১মাংশ, ১৭১ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)

তাম্রলিপ্ত হইতে ৭০০ লি (প্রায় ১৬৫ মাইল) উত্তরপশ্চিমে কর্ণসুবর্ণ এবং কর্ণসুবর্ণের ৭০০ লি দক্ষিণপশ্চিমে উড্র (উট) রাজধানী অবস্থিত। তাঁহার সময়ে প্রাচ্যভারতের বিভিন্ন রাজ্যগুলির কিঞ্চিদধিক এইরূপ পরিমাণ নির্দ্দিষ্ট ছিল—

মগধ	৫০০০ লি	কামরূপ	১০০০০ লির অধিক
ইরিণপর্ব্বত বা হিরণ্যপর্ব্বত	৩০০০ লি	সমতট	৩০০০ লি
চম্পা "	৪০০০ লি	তাম্রলিপ্তি	১৪০০ লি
কয়ঙ্গল৩৪ "	২০০০ লি	কর্ণসুবর্ণ	৪৪৫০ লি
পুণ্ড্রবর্দ্ধন "	৪০০০ লি	উড্র	৭০০০ লি
		কোঙ্গোদ	১০০০ লি

উদ্ধৃত তালিকা হইতে পাওয়া যাইতেছে যে, খৃষ্টীয় ৭ম শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধে প্রাচ্যভারতে কামরূপরাজ্যই সর্ব্বাপেক্ষা আকারে বড় ছিল, এই বৃহদায়তনের কারণ কুমার ভাস্করবর্ম্মার প্রভুত্ব-বিস্তার। যোগিনীতন্ত্রের প্রমাণ হইতেও জানা যায় যে, এক সময়ে সমস্ত ব্রহ্মপুত্র উপত্যকা, জলপাইগুড়ী, কোচবিহার, রঙ্গপুর, বগুড়ার কিয়দংশ, ময়মনসিংহ ও ঢাকা জেলার কিয়দংশ কামরূপসীমা মধ্যে গণ্য হইত।[৩৫] কিন্তু অঙ্গবঙ্গের মধ্যে তখনও কর্ণসুবর্ণ আয়তনে সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ। হর্ষদেবের আক্রমণের পূর্ব্বে অর্থাৎ শশাঙ্কদেবের অভ্যুদয়কালে এই রাজ্য আরও যে বিশাল আয়তন ছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই।

পুরাবিদ্ ফার্গুসন্ সাহেব লিখিয়াছেন, 'বর্ত্তমান বর্দ্ধমান জেলার উত্তরাংশ, বীরভূম ও মুর্শিদাবাদ জেলার সমস্ত এবং কৃষ্ণনগর ও যশোহর জেলার যে অংশ গঙ্গাজল ছাড়াইয়া বাস-

(৩৪) চীনপরিব্রাজক য়ুয়ন্ চুয়ঙ্গ এই জনপদের Ka-chu-wen-ki-lo নামে উল্লেখ করিয়াছেন। এই নাম সম্বন্ধে ওয়াটার সাহেব লিখিয়াছেন—"This would give us an original like Kajangala, and Kajangala and Kajangalā is the name of a place in this neighbourhood mentioned in very early Buddhist Pali texts" [J. R. A. S. 1904, pp.86-88] Watters, II. p, 183. সন্ধ্যাকর নন্দীর রামচরিতে এই স্থান কয়ঙ্গল এবং এখানকার সামন্ত 'কয়ঙ্গলীয় মণ্ডপাধিপতি'রূপেই বর্ণিত হইয়াছেন।

(৩৫)　"নেপালস্য কাঞ্চনাদ্রিং ব্রহ্মপুত্রস্য সঙ্গমম্।
করতোয়াং সমাশ্রিত্য যাবদ্দিক্করবাসিনীম্॥১৬
উত্তরস্যাং কঞ্জগিরিঃ করতোয়া তু পশ্চিমে।
তীর্থশ্রেষ্ঠো দিক্ষু নদী পূর্ব্বস্যাং গিরিকন্যকে॥১৭
দক্ষিণে ব্রহ্মপুত্রস্য লাক্ষায়াঃ সঙ্গমাবধি।
কামরূপ ইতি খ্যাতঃ সর্ব্বশাস্ত্রেষু নিশ্চিতঃ॥"১৮　(যোগিনীতন্ত্র ১১শ পটল)

বিশ্বকোষ ৩য় ভাগ 'কামরূপ' শব্দে বিস্তৃত বিবরণ দ্রষ্টব্য।

এখানে ইহাও বলা আবশ্যক যে, যে সময়ের কথা লিখিত হইল, তৎকালে ময়মনসিংহ জেলার পূর্ব্বাংশ এবং ঢাকা জেলার কতকাংশ সমুদ্রগর্ভশায়ী ছিল।

যোগ্য ছিল, এই সমুদয় ভূখণ্ড কর্ণসুবর্ণরাজ্যের অন্তর্গত ছিল।'[৩৬] আবার সুবিখ্যাত প্রত্নতত্ত্ববিৎ কনিংহাম মনে করেন যে, সুবর্ণরেখা নদীপ্রবাহের নিকট সিংহভূম ও বরাহভূম জেলার মধ্যে কোন স্থানে কর্ণসুবর্ণের রাজধানী ছিল।[৩৭] তৎপরে ডাক্তার ওয়াডেল সাহেব প্রমাণ করিতে চেষ্টা করেন—বর্দ্ধমান জেলার কাঞ্চননগরই প্রাচীন কর্ণসুবর্ণ।[৩৮]

চীনপরিব্রাজক কর্ণসুবর্ণের পুরাতন রাজধানীর পার্শ্বে লো-তো-মো-চি বা 'রক্তমৃত্তি' নামে একটী সুবৃহৎ সঙ্ঘারাম দেখিয়াছিলেন। মুর্শিদাবাদ জেলায় অদ্যাপি রাঙ্গামাটী নামে একটী প্রাচীন গ্রামের পার্শ্বে একটী সুবৃহৎ রাঙ্গামাটী নামে স্তূপ দৃষ্ট হয়, এই রাঙ্গামাটীর টিপিই চীনপরিব্রাজক-বর্ণিত 'রক্তমৃত্তি' সঙ্ঘারামের ধ্বংসাবশেষ।

কনিংহাম সাহেবের অনুমানও মিথ্যা নয় যে সিংহভূম জেলার কোন স্থানে কর্ণসুবর্ণের এক সময়ে রাজধানী ছিল। পূর্ব্বেই লিখিয়াছি, রাজা শশাঙ্ক হর্ষদেব ও ভাস্করবর্ম্মার সমবেত আক্রমণে ব্যতিব্যস্ত ও পরাজিত হইয়া পার্ব্বত্যপ্রদেশে আসিয়া আত্মরক্ষা করেন। প্রত্নতত্ত্ববিৎ কনিংহামের সহকারী পুরাতত্ত্বান্বেষী বেগ্‌লার সাহেব সিংহভূম ও ময়ূরভঞ্জের সীমাস্থিত বেণুসাগর নামক স্থানে রাজা শশাঙ্কের কীর্ত্তি দেখিয়া আসিয়াছেন।[৩৯] আমরাও বৈতরণীনদীর অদূরে ও উক্ত বেণুসাগরের দেড়ক্রোশ অন্তরে ময়ূরভঞ্জের অন্যতম প্রাচীন রাজধানী খিজিঙ্গ বা খিচিং নামক স্থানে সুবিশাল শৈবকীর্ত্তি দেখিয়া আসিয়াছি। রাজা শশাঙ্ক যে একনিষ্ঠ শিবভক্ত ছিলেন, তাহা তাঁহার সমসাময়িক কবি বাণভট্ট ও চীনপরিব্রাজক উভয়েই প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। এক সময়ে ঠিক খিচিং হইতে বেণুসাগর পর্য্যন্ত একটী বৃহৎ রাজধানী ছিল. তাহা এই ভূখণ্ডের অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করিলে অনায়াসেই স্বীকার করিতে হয়। এই স্থানে যে এক সময়ে শত শত ইষ্টক-অট্টালিকা, পাষাণে নির্ম্মিত শত শত দেবমন্দির এবং শত শত স্বচ্ছসলিল সরোবর বিদ্যমান ছিল, এখনও তাহার যথেষ্ট নিদর্শন রহিয়াছে। অদ্যাপি এই নির্জ্জন ও দুর্গম স্থানে শতাধিক বাঁধান পুষ্করিণী ও অনেকগুলি সুপ্রাচীন ভগ্ন শিবমন্দির বিদ্যমান। আমার মনে হয়, শশাঙ্কদেব রাজ্যের উত্তরাংশ হারাইয়া দীর্ঘকাল এই নির্জ্জন ও দুর্গম পার্ব্বত্যপ্রদেশে অতিবাহিত করিয়াছিলেন। পূর্ব্বেই লিখিয়াছি, বরাহমিহির যে ভূখণ্ড বর্দ্ধমান ও সুহ্ম বলিয়া পরিচিত করিয়াছেন, চীনপরিব্রাজকের ভ্রমণকাহিনীতে তাহাই 'কর্ণসুবর্ণ' নামে পরিচিত হইয়াছে। মহাভারতের প্রসিদ্ধ টীকাকার নীলকণ্ঠ 'সুহ্ম' দেশের বর্ত্তমান নাম 'রাঢ়' নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ময়ূরভঞ্জ উৎকলবাসিগণের নিকট অদ্যাপি 'রাঢ়' নামে পরিচিত।[৪০] এরূপস্থলে সিংহভূম ও ময়ূরভঞ্জ পর্য্যন্ত এক সময় কর্ণসুবর্ণরাজ্যের অন্তর্গত ছিল বলিয়াই মনে হয়। চীনপরিব্রাজকের ভ্রমণকাহিনীর বিবৃতিলেখক ওয়াটার সাহেব লিখিয়াছেন, 'চীনপরিব্রাজক

(৩৬) Ancient Geography of India, p. 258,
(৩৭) Cunningham's Ancient Geography of India, p. 505.
(৩৮) Dr. Waddell's Exact Site of Pataliputra, p. 27.
(৩৯) Cunningham's Arch. Sur. Reports, Vol. XIII. p. 74.
(৪০) Mayurabhanja Archæalogical Survey Reports, Vol. I. p. LXIV.

কর্ণসুবর্ণের যেরূপ অবস্থান নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহার সহিত পরবর্ত্তী কাহিনীর সামঞ্জস্য নাই। এজন্য আমরা তাম্রলিপ্তির ৭০০ লি উত্তরপশ্চিমের পরিবর্ত্তে অবশ্যই উত্তরপূর্ব্বে ধরিয়া লইব।"[৪১] কিন্তু আমরা চীনপরিব্রাজকের বর্ণনায় অসামঞ্জস্য পাইতেছি না। তিনি যে তাম্রলিপ্তের ৭০০ লি উত্তরপশ্চিমে কর্ণসুবর্ণের অবস্থান নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহাই ঠিক। তিনি বরাবর একটী জনপদের রাজধানী বা প্রধান কেন্দ্রের দূরত্বই নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন। তখনও শশাঙ্কদেব জীবিত, তখনও তিনি পূর্ব্ববর্ণিত ময়ূরভঞ্জের প্রান্তসীমায় অবস্থান করিতেছিলেন। আমরা মনে করি, ঐ স্থানই চীনপরিব্রাজকের সমকালীন কর্ণসুবর্ণের রাজধানী, ঐ স্থান তাম্রলিপ্ত হইতে প্রায় ৭০০ লি উত্তরপশ্চিমে অবস্থিত বটে। কিন্তু তিনি সেই দুর্গম প্রদেশ না গিয়া বৌদ্ধকীর্ত্তি দর্শন করিবার জন্য কর্ণসুবর্ণের পূর্ব্বরাজধানী মুর্শিদাবাদ-জেলাস্থ রাঙ্গামাটী কাণসোণায় আসিয়াছিলেন। তিনি বৌদ্ধদ্বেষী রাজা শশাঙ্ককে অতি ঘৃণার চক্ষেই দেখিতেন, এ কারণেই তিনি তাঁহার নূতন রাজধানীতে যান নাই বা এখানে তাঁহার নামোল্লেখ পর্য্যন্ত করেন নাই।

কাণসোণা রাঙ্গামাটী

মুর্শিদাবাদজেলার বর্ত্তমান সদর বহরমপুর হইতে ৮ মাইল দক্ষিণে ভাগীরথীর তীরে রাঙ্গামাটী নামে যে প্রাচীন গ্রাম রহিয়াছে, পঞ্চাশবৎসর পূর্ব্ব পর্য্যন্ত তাহাই 'কাণসোণা' নামে প্রসিদ্ধ ছিল। রাঙ্গামাটীর সুবিস্তৃত ও সমুচ্চ স্তূপ চীন-পরিব্রাজক বর্ণিত রক্তমৃত্তি-সঙ্ঘারামের স্মৃতি আজও বজায় রাখিয়াছে। বহুতর দীঘি, সরোবর ও প্রাসাদের ধ্বংসাবশেষ এখনও এই রাঙ্গামাটীর চতুর্দ্দিকে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে। ১৮৫৩ খৃঃ অব্দে কাপ্তেন লেয়ার্ড সাহেব এইস্থান দর্শন করিয়া লিখিয়াছেন—"রাঙ্গামাটী পূর্ব্বকালে কাণসোণাপুরী নামেই প্রসিদ্ধ ছিল। গৌড়-পতি কর্ণসেন এই নগরী নির্ম্মাণ করেন। তাঁহার সম্বন্ধে বহুতর প্রবাদ এখনও প্রচলিত রহিয়াছে। এখনও লোকে 'রাক্ষসের ডাঙ্গা' ও 'কর্ণসেনের রাজবাড়ী' দেখাইয়া থাকে। রাজবাটীর ধ্বংসাবশেষের নিদর্শন এখনও তিন দিকে বিরাজমান। অপর দিক্ নদীগর্ভে সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হইয়াছে। রাজবাটীর পূর্ব্বদিকে কিছুদিন পূর্ব্ব পর্য্যন্ত সুপ্রাচীন তোরণ ও তাহার পার্শ্বে দুইটী বৃহৎ বুরুজ বিদ্যমান ছিল। অল্পদিন হইল, সমস্তই ভাগীরথীর গর্ভশায়ী হইয়াছে।"[৪২]

মুসলমান আমলেও এই কাণসোণা-রাঙ্গামাটীর গৌরব কতকটা অক্ষুণ্ণ ছিল। এখানকার হিন্দু জমিদার নদীয়ারাজের সমান সম্মান পাইতেন।[৪৩]

(৪১) Watters' Yuan-Chuang, Vol, II. p. 192

(৪২) Journal of the Asiatic Society of Bengal, 1853, pt. 3.

(৪৩) "Rangamati formed one of the ten Fauzdaris into which Bengal was divided under the Musulman rule. Its Hindu Zamindar was a considerable person ; and on the occasion of the great Punya'h at Mutijhil in 1767, received a khilat worth Rs. 7278, or as much as the Zamindar of Nadiya".

Mr. Long's Essay—on the Banks of the Bhagirathi.

আমরা পূর্ব্বোদ্ধৃত বটু ভট্টের দেববংশ হইতেও পাইয়াছি, ভাগীরথীর সন্ধিস্থানে নিজনামানুসারে রাজা কর্ণসেন কর্ণ-স্বর্ণপুরী নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। তাঁহার উত্তরাধিকারিগণ এস্থানে বহুকাল রাজত্ব করেন। মৌদ্গল্য গোত্রীয় দেববংশোদ্ভব রাজা রাধাকান্ত দেব বাহাদুরও তাঁহার শব্দকল্পদ্রুমগ্রন্থে নিজ পরিচয় প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন, "মুর্শিদাবাদের নিকট কর্ণস্বর্ণ নামক স্থানে তাঁহার পূর্ব্বপুরুষগণ বাস করিতেন।"[৪৪] এই কর্ণস্বর্ণ সমাজের দেববংশ অদ্যাপি বঙ্গের সর্ব্বত্র কাণসোণার দে বলিয়া পরিচিত। বাস্তবিক মুর্শিদাবাদ জেলার মধ্যে এমন উচ্চ ও স্বাস্থ্যকর স্থান আর নাই। ১৮৩৫ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত এখানে ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানীর একটী বৃহৎ রেশমের কুঠী ছিল। ১৮৪৬ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত এই স্থান একটী প্রধান স্বাস্থ্যনিবাস বলিয়াই গণ্য ছিল। বনভোজন ও পক্ষী-শিকারের আশায় বহু সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি আসিয়া এখানে সর্ব্বদাই বাস করিতেন।[৪৫] লং সাহেব এখানকার সুন্দর দৃশ্য ও ঢেউখেলান জমি দেখিয়া আপনার প্রিয় জন্মভূমি ইংলণ্ডের সহিত তুলনা করিয়াছেন।

রাঙ্গামাটী কাণসোণা হইতে গয়সাবাদ পর্য্যন্ত প্রায় ৮ ক্রোশস্থান পর্য্যবেক্ষণ করিলে ইহার মধ্যে মধ্যে একটী সুবৃহৎ রাজধানী ছিল বলিয়া সহজেই ধারণা হইবে। গয়সাবাদ হইতে পালি অক্ষরের ক্ষোদিত লিপি বাহির হইয়াছে।[৪৬] চীন-পরিব্রাজক য়ুঅন্‌চুঅং (হিউএন্‌সিয়ং) আসিয়াও এখানে প্রায় ৪ ক্রোশ বিস্তৃত কর্ণসুবর্ণ রাজধানী এবং রাঙ্গামাটীর অদূরে অশোক-নির্ম্মিত কতকগুলি স্তূপ দেখিয়া গিয়াছেন। তদ্ভিন্ন এখানে ১০টী বৌদ্ধ সঙ্ঘারাম ও তাহাতে দুই হাজারের অধিক বৌদ্ধ শ্রমণ দেখিয়া ছিলেন। তাঁহার সময়ে এখানে ৫০টী হিন্দুদেব-মন্দিরও বিরাজ করিতেছিল। কিন্তু কালের স্রোতে ভাগীরথীর প্রবল তরঙ্গাঘাতে সেই সমস্ত প্রাচীন কীর্ত্তি অধুনা বিলুপ্ত হইয়াছে। কেবল রাঙ্গামাটীর রক্তময় ইষ্টকস্তূপ এবং গয়সাবাদের খোদিত পালি লিপি এখানকার অতি প্রাচীন স্মৃতি অদ্যাপি রক্ষা করিতেছে।

মহারাজ শশাঙ্কদেবের সময়ই কাণসোণার চরম সমৃদ্ধির সময়। তিনি নিজে পরম শৈব বলিয়া পরিচিত হইলেও, সমদর্শী, বিদ্যানুরাগী ও প্রজারঞ্জক নৃপতি ছিলেন। মগধ ও কুশীনগরে তাঁহার বৌদ্ধকীর্ত্তি-বিলোপের প্রসঙ্গে বৌদ্ধচীন-পরিব্রাজক তাঁহাকে ঘৃণার চক্ষে দেখিলেও তিনি নিজ রাজ্যবাসী বিভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী প্রজাদিগের উপর কখনই বিদ্বেষ-ভাবাপন্ন ছিলেন না। যদি তিনি প্রকৃতই বৌদ্ধ-বিদ্বেষী হইতেন, তাহা হইলে চীন পরিব্রাজক তাঁহার প্রধান রাজধানী কর্ণসুবর্ণে ১০টী বৌদ্ধ সঙ্ঘারাম ও তাহাতে দুই হাজারের অধিক বৌদ্ধ শ্রমণের অবস্থিতি দেখিতে পাইতেন না।

(৪৪) "কায়স্থানাং কুলে দেববংশস্তোদ্ভবহেতুকঃ।
মুর্শিদাবাদনগরাসন্নে স্বজনপালকঃ।
কর্ণস্বর্ণনামধেয় সমাজে বাসকারকঃ।"
রাজা স্যার রাধাকান্তদেবের শব্দকল্পদ্রুমের ভূমিকা।

(৪৫) Hunter's Statistical Account of Bengal, IX. p. 93.

(৪৬) Vide Hunter's Bengal, IX. p. 92.

তাঁহার মগধ-আক্রমণকালে সম্ভবতঃ বৌদ্ধ শ্রমণেরা তাঁহার বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছিলেন, তাহারই প্রতিশোধ লইবার জন্ম সম্ভবতঃ তিনি তাঁহাদের প্রধান উপাস্য জিনিসগুলি নষ্ট করিতে উদ্যোগী হইয়াছিলেন। কিন্তু নিজ রাজ্য মধ্যে বৌদ্ধ প্রজাদিগের উপর কখনও তিনি এরূপ অসদাচরণ করেন নাই। তিনি নিজ অধিকারবাসী বিভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী প্রজা-বর্গকে সমভাবে দেখিতেন। চীনপরিব্রাজকের বর্ণনা হইতেই আমরা তাহার আভাষ পাইয়াছি।

অল্পদিন হইল, গঞ্জাম হইতে মহাসামন্ত সৈন্যভীত মাধবরাজের ৩০০ গৌপ্তাব্দে (৬১৯৬২০ খৃঃ অঃ) উৎকীর্ণ একখানি তাম্রশাসন পাওয়া গিয়াছে। এই তাম্রশাসনে "মহারাজাধিরাজ শশাঙ্ক-দেব"[৪৭] "চতুরুদধি-সলিল-বীচি-মেখলা-নিলীন-সদ্বীপ-গিরিপত্তনবতী বসুন্ধরা"র অধীশ্বর বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছেন।[৪৮] উক্ত তাম্রশাসন হইতেই প্রমাণিত হইতেছে, হর্ষদেবের নিকট পরাজিত হইবার ১০।১১বর্ষ পরেও তিনি একটী বিস্তৃত ভূমণ্ডলের অধিপতি ছিলেন, এমন কি উৎকলের দক্ষিণাংশ ও কলিঙ্গের উত্তরাংশস্থিত কোঙ্গোদমণ্ডলের অধিপতি পর্য্যন্ত তাঁহার অধীনতা স্বীকার করিতেন। কোঙ্গোদ-মণ্ডলের[৪৯] অধিপতি আপনাকে কলিঙ্গা-ধিপতি বলিয়া পরিচিত করিলেও মহারাজাধিরাজ শশাঙ্কের অধীনতা স্বীকার করিয়া যেন গৌরবান্বিত হইয়াছিলেন। ইহাতেও শশাঙ্কদেবের প্রবল প্রতাপের যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। চীন-পরিব্রাজক শশাঙ্কদেবের মৃত্যু সম্বন্ধে এইরূপ অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন, "শশাঙ্ক বোধিদ্রুমের নিকটস্থ বিহারে প্রতিষ্ঠিত বুদ্ধমূর্ত্তি ধ্বংস করিয়া তন্মধ্যে শিবমূর্ত্তি স্থাপন করিতে আদেশ করিয়াছিলেন, যে কর্ম্মচারীর উপর এই ভার ছিল, বুদ্ধের পবিত্র মূর্ত্তিতে হস্তক্ষেপ করিতে তাঁহার সাহস হয় নাই। সে ব্যক্তি মূর্ত্তির সম্মুখে একটী প্রাচীর তুলিয়া দিয়া সেই পবিত্র মূর্ত্তি একেবারে ঢাকিয়া ফেলিয়া প্রাচীরগাত্রে শিবমূর্ত্তি আঁকিয়া দিয়াছিল। এই ঘটনার পর শশাঙ্ক কতকটা ভীতি-বিহ্বল হইয়া পড়িয়াছিলেন, তাঁহার শরীরে বহুসংখক ক্ষত প্রকাশ পাইয়াছিল। ক্রমে শরীরের মাংস পচিয়া পড়িতে আরম্ভ হইল। এইরূপে কিছুদিন কষ্ট ভোগ করিয়া শশাঙ্কদেব কালগ্রাসে পতিত হন।"

চীন-পরিব্রাজকের এই উক্তি কতদূর বিশ্বাসজনক তাহা বুঝিতে পারিলাম না। বঙ্গের সরযূপারী শাকদ্বীপী ব্রাহ্মণগণের কুলপঞ্জিকায় লিখিত আছে, এক সময়ে মহারাজ শশাঙ্ক গ্রহবৈগুণ্যবশতঃ কঠিন রোগে আক্রান্ত হইয়াছিলেন, চিকিৎসার দ্বারা তাঁহার রোগমুক্তি না হওয়ায় গ্রহযজ্ঞ দ্বারা স্বস্ত্যয়ন করাইবার জন্ম সরযূপার হইতে কয়েকজন শাকদ্বীপী ব্রাহ্মণ আনাইয়া ছিলেন। তাঁহাদের শান্তিস্বস্ত্যয়নগুণে নরপতি রোগমুক্ত হইয়া তাঁহাদিগকে

(৪৭) মাধবরাজের তাম্রশাসন হইতেও আমরা জানিতেছি যে শশাঙ্কদেবের অপর কোনও নাম বা বিরুদ ছিল না, থাকিলে মাধবরাজ নিজ অধীশ্বরের পুরা নাম ও উপাধি ব্যবহার করিতে কখনই বিরত হইতেন না। শশাঙ্কদেবের নিজ মোহরের ন্যায় এই তাম্রশাসনখানিও তাঁহার একমাত্র নামের পরিচায়ক।

(৪৮) Vide Epigraphia Indica, Vol. IV. p. 143.

(৪৯) চীনপরিব্রাজক Kungyii-to নামে এই জনপদের উল্লেখ করিয়াছেন।

এদেশে স্থাপন করিয়াছিলেন। এখনও তাঁহাদের বংশধরগণ এদেশে বাস করিতেছেন।[৫০] চীন-পরিব্রাজকের উক্তি ও কুলপঞ্জিকার বর্ণনা একত্র করিলে মনে হয়, মহারাজ শশাঙ্ক কিছুকাল প্রাণসংশয়কর ক্ষতরোগে কষ্ট পাইতেছিলেন, এই সংবাদ লোকমুখে বিকৃতভাবে চীন-পরিব্রাজকের কর্ণগোচর হওয়ায় তিনি শশাঙ্কদেবের মৃত্যুসংবাদ রটনা করিয়া থাকিবেন। পূর্ব্বেই লিখিয়াছি, কর্ণসুবর্ণপতি তাঁহার অধিকারভুক্ত রাজ্যের পশ্চিম উত্তরাংশ অর্থাৎ সমতল ভূভাগ হারাইয়াছিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার অধিকারভুক্ত পার্ব্বত্য মুদিশে হর্ষদেবের অধিকার বিস্তৃত হইতে পারে নাই। উৎকলের অধুনা গড়জাত নামে প্রসিদ্ধ পার্ব্বত্য-প্রদেশে শশাঙ্কদেবের আধিপত্য যে অপ্রতিহত ছিল, এমন কি, কোঙ্গোদমণ্ডল অর্থাৎ বর্ত্তমান পুরী ও গঞ্জাম জেলার মহাবীর রাজন্যবর্গ তাঁহার নিকট মস্তক অবনত করিয়াছিলেন, সে সংবাদ পূর্ব্বেই দিয়াছি। চীন-পরিব্রাজক ৬৩৮ খৃঃ অব্দে উক্ত কোঙ্গোদমণ্ডলে উপস্থিত হইয়াছিলেন। তিনি লিখিয়াছেন, এখানকার ভাষা ও উত্তরভারতের ভাষা এক, এখানে প্রায় এক শত দেবমন্দির এবং দশ সহস্রের অধিক তীর্থিকের বাস, কিন্তু এখানে কেহই বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী নহে। পর্ব্বতের অধিত্যকা হইতে সমুদ্রের উপকূল পর্য্যন্ত ভূভাগ মধ্যে প্রায় ১০টী সহর আছে। নগরগুলি স্বভাবতঃ সুদৃঢ় ও মহাসাহসী বীরগণ কর্ত্তৃক রক্ষিত থাকায় প্রবল শত্রুতে সহজে আক্রমণ করিতে পারে না। সমুদ্রোপকূলবর্ত্তী ভূভাগে বহুতর দুর্ম্মূল্য দ্রব্য এবং পার্ব্বত্য ভূভাগে সুদীর্ঘ ভ্রমণ-সহিষ্ণু কৃষ্ণকায় বৃহৎ হস্তী সকল পাওয়া যায়।[৫১]

চীন-পরিব্রাজকের জীবনী গ্রন্থ হইতে আমরা জানিতে পারি, তাঁহার কোঙ্গোদ-মণ্ডলে পৌঁছিবার কালে কান্যকুব্জপতি শিলাদিত্য হর্ষবর্দ্ধন বহুতর সৈন্যদল সহ এই সুদৃঢ় জনপদ আক্রমণ করিয়াছিলেন।[৫২] সম্ভবতঃ মহারাজ শশাঙ্কদেবের মৃত্যুসংবাদ পাইয়া তাঁহার এই অভিযান। কিন্তু এখানকার মহাসমরে তিনি কতদূর কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন কেহই সে কথা লেখেন নাই। সম্ভবতঃ এখানকার যুদ্ধে হর্ষদেব কিছুই করিতে পারেন নাই, নচেৎ তাঁহার বিশেষ অনুরক্ত চীন-পরিব্রাজকের কাহিনীতে কখনই সেই বিজয়বার্ত্তা পরিত্যক্ত হইত না। মহারাজ শশাঙ্কদেবের মহাসামন্ত পূর্ব্বোক্ত মাধবরাজের বংশধর মধ্যমরাজের তাম্রশাসনে এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে—

"স শ্রীমানতুলশশাঙ্কধবলক্ষৌণি যশখ্যাপিতা"[৫৩]

এই দ্ব্যর্থ শ্লোকার্দ্ধ হইতেই মধ্যমরাজের বীরত্ব ও মহারাজাধিরাজ শশাঙ্কদেবের অতুল যশরক্ষার কথাই স্পষ্টীকৃত হইতেছে। আমাদের মনে হয় যে হর্ষদেবের কোঙ্গোদমণ্ডলে অভিযানকালে অথবা তাহার অব্যবহিত পরে প্রায় ৬৩৯ খৃষ্টাব্দে মহারাজ শশাঙ্কদেব

(৫০) বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস ব্রাহ্মণকাণ্ড, ৪র্থ অংশ ৮৬-৮৮ পৃঃ দ্রষ্টব্য।

(৫১) Vide Watters' Yuan Chuang, Vol. II. p. 196.

(৫২) Watters, II. p. 197.

(৫৩) সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, সন ১৩১৬ সাল, ১১৯ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

ইহলোক পরিত্যাগ করেন। তাঁহার তিরোধানের বহু পরেও যে বীরপ্রসূ কোদোদ-মণ্ডল নিজ স্বাধীনতা রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন মধামরাজের তাম্রশাসন হইতেই তাহা প্রমাণিত হইয়াছে।

শশাঙ্কের কীর্ত্তি ও প্রভাবের নিদর্শন

মহারাজ শশাঙ্কদেবের উৎসাহে রাঢ় ও বঙ্গের অন্তর্বাণিজ্য এবং নানাবিধ শিল্পকলার যথেষ্ট উন্নতি হইয়াছিল। তাঁহার রাজ্যে দস্যুভয় বা চৌরভয় না থাকায় রাজ্যমধ্যে নানাবিধ শস্য ও ফলমূলাদি প্রচুর পরিমাণে হওয়ায় এবং তৎকালে এখানকার জলবায়ু অতিশয় স্বাস্থ্যকর থাকায় এই স্থান ধনজনে পরিপূর্ণ হইয়াছিল এবং সম্পত্তিশালী ধনকুবেরগণের বাসস্থান বলিয়া প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছিল। তৎকালে সুদূর চীন, সিংহল ও ভারত-মহাসাগরীয় দ্বীপপুঞ্জের সহিত ইহার রাজনৈতিক, ধর্ম্মনৈতিক ও বাণিজ্যবিষয়ক যথেষ্ট সম্বন্ধ ছিল। ভাগীরথীতটস্থ কর্ণসুবর্ণ রাজধানী হইতে বরাবর সমুদ্র পর্য্যন্ত জলপথে গমনাগমনের সুবিধা ছিল। তৎকালে সপ্তগ্রাম-ত্রিবেণী এখানকার সামুদ্রিক বাণিজ্যের প্রধান কেন্দ্র বলিয়া পরিচিত ছিল। এতদ্ব্যতীত রাঢ়বঙ্গের সহিত নানাস্থানের অন্তর্বাণিজ্যের সুবিধা করিবার জন্য মুর্শিদাবাদ, বর্দ্ধমান ও হুগলী জেলায় অনেকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নদীর সহিত সম্মিলিত 'কাণসোণার খাল' নামে কতকগুলি খাল বিদ্যমান ছিল, এখনও হুগলী জেলার নানাস্থানে 'কাণসোণা' খালের নিদর্শন দেখিতে পাওয়া যায়। অধুনা সেই সকল প্রাচীন খালের অধিকাংশই মজিয়া গিয়াছে। যেখানে যেখানে অদ্যাপি কাণসোণা-খাল বা তাহার গর্ভ বিদ্যমান, তাহার দুই পার্শ্বে এক সময়ে বহুলোকের বসতিস্থান এবং বহু শস্যশালিনী ভূমি শোভিত ছিল, তাহার প্রমাণের অভাব নাই। কাণসোণার খালগুলি অনেকে মহারাজ শশাঙ্কদেবের কীর্ত্তি বলিয়া মনে করেন। এমন কি ১৭৫৫ খৃঃ অব্দের মানচিত্রে পুরাতন দামোদর নদী কাণসোণা নামে খ্যাত ছিল।[৫৪] সাঁওতালী ভাষায় দামোদর ও কাণসোণা একার্থবাচী। হুগলী জেলার উলুবেড়িয়ার নিকট যে কাণসোণার খাল আছে, অনেকে তাহাকে দামোদরের প্রাচীন গর্ভ বলিয়া মনে করেন। এতদ্ভিন্ন মহারাজ শশাঙ্ক শেষ দশায় বৈতরণীতীরে প্রোক্ত বেণুসাগর ও খিচিঙ্গের নিকট যেখানে অবস্থান করিতেন, সেই বেণুসাগরের কএক মাইল দূরে অদ্যাপি সোণাপোসী ও রাঙ্গামাটী নামক গ্রাম বর্ত্তমান।

দেববংশের অধিকারকালে অন্তর্বাণিজ্যের সুবিধার জন্য যেরূপ বহু স্থানে খাল কাটা হইয়াছিল, সেইরূপ নানাস্থানে বৃহৎ বৃহৎ বহু জলাশয়ও খনিত হইয়াছিল। এই সকল সরোবরের মধ্যে মেদিনীপুর জেলায় বর্ত্তমান দাঁতনের নিকট শশাঙ্কদীঘি সবিশেষ উল্লেখ-যোগ্য। এরূপ বৃহৎ দীঘী রাঢ়দেশের ভিতর আর কোথায়ও দৃষ্ট হয় না। বর্ত্তমান বর্দ্ধমান সহরের নিকট যে কাঞ্চননগর নামক স্থান আছে, কেহ কেহ মনে করেন, এখানেও শশাঙ্কদেব কিছুকাল অবস্থান করিয়াছিলেন। এই কাঞ্চন-নগরের নিকট দামোদরের অপর পারে

(৫৪) Col. Gastrell's Revenue Survey Report of Bankura.

রাঙ্গামাটী নামে এখনও একটী গণ্ডগ্রাম বিদ্যমান। উহার ছয় মাইল পশ্চিমে শশাঙ্কগ্রাম এবং উক্ত গ্রাম হইতে প্রাচীন দামোদরের গর্ভের উত্তর পারে গৌর নদীর নিকট আর একটী শশাঙ্ক নামক গ্রাম শশাঙ্কদেবের স্মৃতি এখনও জাগরূক রাখিয়াছে। কেহ কেহ মনে করেন যে, শশাঙ্কদেবের উত্তর-পুরুষগণ বহুকাল এই অঞ্চলে রাজত্ব করিয়া গিয়াছেন। ঐ সময়ে রাঢ়ীয়রাজগণের মধ্যে প্রচণ্ডদেব ও শক্তিদেবের নাম শুনা যায়।[৫৫]

শশাঙ্কদেবের সময়ে রাঢ়ীয় শিল্পিগণ শিল্পকলায় কতদূর উন্নতিলাভ করিয়াছিলেন, পুনঃ পুনঃ মুসলমান ও মরাঠা আক্রমণে যদিও সেই সকল প্রাচীন কীর্ত্তি উত্তর ও মধ্যরাঢ় হইতে অধিকাংশ বিলুপ্ত হইয়াছে, কিন্তু এখনও বৈতরণীর উত্তরতীরস্থ ময়ূরভঞ্জ ও সিংহভূম সীমায় সেই প্রাচীন রাঢ়ীয় শিল্পের যথেষ্ট নিদর্শন বিদ্যমান। বেণুসাগর ও খিচিঙ্গ নামক স্থানে সেই অপূর্ব্ব শিল্পনৈপুণ্যের নিদর্শন দেখিয়া আসিয়াছি। এই প্রস্তাবের প্রারম্ভেই সংক্ষেপে তাহার আভাষ দিয়াছি। যাঁহারা গৌড়ের অতীতশিল্প এবং ভুবনেশ্বর ও কণারকের মন্দিরের দেবকীর্ত্তি দর্শন করিয়া তাহাদের শিল্প-নৈপুণ্যের ভূরি ভূরি প্রশংসা করিয়া থাকেন, সুদূর বৈতরণীতীরস্থ মহারাজ শশাঙ্ক-প্রতিষ্ঠিত উক্ত শিল্প নিদর্শনগুলি তাঁহাদিগের আরও যে বিস্ময়োৎপাদন করিতে সমর্থ হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। কত কালাপাহাড়, কত মরাঠার অত্যাচার হইয়া গিয়াছে, তথাপি সেই বিধ্বস্ত শিল্পের নিদর্শন মধ্যে যেরূপ সুন্দর, যেরূপ মনোরম, যেরূপ জীবন্ত দেবদেবীর মূর্ত্তি রহিয়াছে, তাহার তুলনা প্রাচ্য-ভারতে অপর কোথাও আছে বলিয়া মনে করি না। শিবশক্তি বা শিবানুচরগণের মূর্ত্তিসমূহে যেরূপ অসাধারণ শিল্পনৈপুণ্য ও দৈবশক্তির পরিচয় প্রকটিত হইয়াছে, গৌড় হইতে আবিষ্কৃত দুই একটী মূর্ত্তি ব্যতীত কোথাও আর তাহার অনুরূপ নিদর্শন পাই নাই। রাঢ়ীয়-শিল্পিগণ মহারাজ শশাঙ্ক-দেবের সহিত যে কলিঙ্গবাসী হইয়াছিলেন, এবং তাঁহাদেরই বংশধরগণ ভুবনেশ্বর, জগন্নাথ ও কণারকের মন্দির নির্ম্মাণে সহায়তা করিয়া শিল্পজগতে চিরস্থায়ী কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন, তাহাতে সন্দেহ নাই।

স্বজাতির প্রভাব

মহারাজ শশাঙ্কদেবের সহিত সমস্ত উৎকলে এমন কি সুদূর সম্বলপুর প্রদেশে রাঢ়ীয়-কায়স্থ প্রভাব প্রসারিত হইয়াছিল। তাঁহার অনুগ্রহে তাঁহার স্বজাতি বহুসংখ্যক কায়স্থ এখানে আসিয়া বাস করিয়াছিলেন। এমন কি তাঁহার আত্মীয়স্বজনের মধ্যে কেহ কেহ তাঁহার সময়ে মধ্যপ্রদেশে পর্য্যন্ত আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে মহারাজ সূর্য্যঘোষের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।[৫৬] শশাঙ্কের

(৫৫) Vide Dr. Waddell's Pataliputra, Plate III.

(৫৬) নাগপুরের চিত্রশালায় এই কায়স্থনৃপতি সূর্য্যঘোষের প্রভাবজ্ঞাপক খোদিত শিলালিপি রক্ষিত আছে। এই শিলালিপি হইতে জানা যায় যে মধ্যপ্রদেশে সোমবংশীয় (সাধারণে কেশরিবংশ নামে খ্যাত) রাজগণের অভ্যুদয়ের পূর্ব্বে রাজা সূর্য্যঘোষের অভ্যুদয়। তাঁহার প্রাসাদোপরি হইতে পড়িয়া গিয়া তাঁহার প্রিয়পুত্রের মৃত্যু হওয়ায় তিনি পুত্রের পারত্রিক মঙ্গলকামনায় কতকগুলি হিন্দু দেবমন্দির ও বৌদ্ধ শ্রমণদিগের জন্য কয়েকটী বিহার

তিরোধানের পর কলিঙ্গ ও দক্ষিণ কোশল হইতে তাঁহার স্বজাতি-কায়স্থগণের প্রভুত্ব কিছু হ্রাস হইলেও পরবর্ত্তী কালে তাঁহাদের বংশধরগণ ও আত্মীয়স্বজনগণ উৎকলের প্রায় সকল সামন্ত রাজ্যে উচ্চ রাজকীয় পদে অধিষ্ঠিত হইয়াছিলেন, বিভিন্ন সময়ে উৎকীর্ণ বিভিন্ন জনপদের অধীশ্বরগণের তাম্রশাসন হইতে তাহার যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। এই বাঙ্গালী কায়স্থ-প্রভাবহেতুই খৃষ্টীয় সপ্তম হইতে খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত সমগ্র উৎকল এমন কি দক্ষিণ-কোশল ও বিন্ধ্যপ্রদেশ হইতে যে সকল তাম্রশাসন আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহাতে বঙ্গীয় লিপির পূর্ণ নিদর্শন বিদ্যমান।

মহারাজ শশাঙ্কদেব সকল ধর্ম্মে সমদর্শী ছিলেন ও অপক্ষপাতে পুত্রবৎ প্রজাপালন করিতেন।

ধর্ম্মপ্রভাব

তিনি নিজে পরম শৈব বলিয়া পরিচিত হইলেও তাঁহার সময়ে কর্ণ-সুবর্ণ বা রাঢ় এবং সমতট বা বঙ্গে সর্ব্বাপেক্ষা দিগম্বর জৈনের সংখ্যা অধিক ছিল। হীনযান ও মহাযান বৌদ্ধদিগের সংখ্যাও নিতান্ত অল্প ছিল না। ব্রাহ্মণভক্ত শৈবরাজের যত্নে বহুসংখ্যক হিন্দু দেবমন্দির প্রতিষ্ঠিত হইলেও জনসাধারণে হয় জৈন নয় বৌদ্ধ ধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন। রাঢ়ে বঙ্গে এরূপ বৌদ্ধ ও জৈনের সংখ্যা অধিক থাকায় শৈব শশাঙ্কদেব এখানে স্বপক্ষীয় অধিক লোক পান নাই, একারণই তিনি সম্ভবতঃ হর্ষবর্দ্ধনের গতিরোধ করিতে সমর্থ হন নাই। কিন্তু এখানে পূর্ব্বোক্ত কোঙ্গোদমণ্ডলে তৎকালে আদৌ বৌদ্ধের বাস ছিল না, চীনপরিব্রাজকের ভ্রমণকাহিনী হইতেই তাহার পরিচয় দিয়াছি। শশাঙ্ক-দেবের মহাসামন্ত কোঙ্গোদপতি মাধবরাজ ও তাঁহার বংশধরগণ সকলেই পরম শৈব বলিয়া স্ব স্ব তাম্রশাসনে পরিচিত হইয়াছেন। সম্ভবতঃ এ অঞ্চলের অধিকাংশ লোকেই তৎকালে শৈবধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন। বৈতরণী নদীর তীরে যেখানে মহারাজ শশাঙ্কদেবের দেবকীর্ত্তি বাহির হইয়াছে, সেই বৈতরণীর উভয়পার্শ্বে 'গোনাসিকা' নামক বৈতরণীর উৎপত্তি-স্থান হইতে সমুদ্রসঙ্গম পর্য্যন্ত বরাবর উভয়তীরে শত শত শিবলিঙ্গ ও শিবমন্দিরের ভগ্নাবশেষ অদ্যাপি দৃষ্ট হইয়া থাকে, এরূপস্থলে আমরা মনে করিতে পারি পরমশৈব শশাঙ্কদেব ও তাঁহার আত্মীয়স্বজনের আগমনের প্রভাবে এই প্রদেশ এককালে শৈবময় হইয়া গিয়াছিল। শৈব সামন্ত ও প্রজামণ্ডলীই এই দুর্গম প্রদেশে শশাঙ্কদেবকে রক্ষা করিয়াছিলেন সন্দেহ নাই।

শশাঙ্কের সমসাময়িক গৌড় ও বঙ্গাধিপগণ

কোন কোন ঐতিহাসিক মনে করেন, "চীনপরিব্রাজক বাঙ্গলার বিভিন্ন প্রদেশের রাজধানী পুণ্ড্রবর্দ্ধন, সমতট, তাম্রলিপ্তি এবং কর্ণসুবর্ণের বিবরণে কোন রাজার উল্লেখ করেন নাই। পুণ্ড্র

নির্ম্মাণ করাইয়া দিয়াছিলেন। শিলালিপির অনেকটা ভগ্ন হওয়ায় সম্পূর্ণ বিবরণ উদ্ধার করিবার উপায় নাই। অধ্যাপক কিলহোর্ণ সাহেব বহুকষ্টে ইহার পাঠোদ্ধার করিয়াছেন। রাজা সূর্য্যঘোষ খৃষ্টীয় ৭ম শতাব্দীর মধ্যভাগে মধ্যপ্রদেশ শাসন করিতেন, উক্ত লিপি হইতেই তাহা প্রমাণিত হইয়াছে।

(Vide Journal of the Royal Asiatic Society, 1905, pp, 609.)

বর্দ্ধন, সমতট এবং তাম্রলিপ্তির প্রাচীন রাজবংশ সম্ভবতঃ শশাঙ্ক কর্তৃক উন্মূলিত হইয়াছিল এবং কর্ণসুবর্ণে শশাঙ্কের উত্তরাধিকারী হর্ষবর্দ্ধন কর্তৃক সিংহাসনচ্যুত হইয়াছিলেন।"[৫৭] আমরা কিন্তু এরূপ মনে করি না। চীনপরিব্রাজক কয়ঙ্গল বা বর্ত্তমান রাজমহলের বর্ণনা কালে লিখিয়াছেন, যে তাঁহার আগমনের কয়েক শতাব্দী পূর্ব্বে এখানকার রাজবংশ লুপ্ত হইয়াছে, সেই কারণে এখানকার রাজধানী পরিত্যক্ত।[৫৮] হিরণ্যপর্ব্বত বা বর্ত্তমান মুঙ্গেরের পরিচয়দানকালে তিনি লিখিয়াছেন, অল্পদিন হইল নিকটস্থ জনপদের রাজা এখানকার অধিপতিকে রাজ্যচ্যুত করিয়া বৌদ্ধ শ্রমণদিগকে রাজধানী প্রদান করিয়াছেন।[৫৯] যে ব্যক্তি হিরণ্যপর্ব্বতের অধিপতিকে সিংহাসনচ্যুত করিয়াছিলেন, তাঁহাকে আমরা পুণ্ড্রবর্দ্ধনপতি নরেন্দ্রগুপ্ত মনে করি। চীনপরিব্রাজক হিউএন্‌সিয়ং পুণ্ড্রবর্দ্ধন রাজধানীতে আসিয়া এখানে ২০টী বৌদ্ধ সঙ্ঘারাম এবং হীনযান ও মহাযান মতাবলম্বী ৩০০০ হাজারের অধিক শ্রমণ বা বৌদ্ধভিক্ষু দেখিয়াছিলেন।[৬০] এই বৌদ্ধপ্রাধান্য হইতে মনে হয়, এখানকার অধিপতি বৌদ্ধ ছিলেন এবং তিনিই বৌদ্ধ ভিক্ষুদিগকে মুঙ্গের রাজধানী দান করিয়াছিলেন, মগধ পর্য্যন্ত এই পুণ্ড্রবর্দ্ধনপতির অধিকারভুক্ত হইয়াছিল। কর্ণসুবর্ণপতি শশাঙ্কদেব প্রথমতঃ তাঁহার মহা-সামন্তরূপে পরিচিত ছিলেন, সে কথা পূর্ব্বেই লিখিয়াছি। তাঁহার অধিরাজ বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী থাকায় কর্ণসুবর্ণ-রাজধানীতে বৌদ্ধ শ্রমণগণের কিছুমাত্র অসুবিধা ঘটিতে পারে নাই। এ সময় সমতট স্বতন্ত্র বৌদ্ধ নৃপতির অধিকারভুক্ত ছিল। চীনপরিব্রাজক ইৎসিং (ই-চিং) ৬৭৩ খৃঃ অব্দে তাম্রলিপ্তি সঙ্ঘারামে আগমন করেন। তিনি লিখিয়াছেন, তৎপূর্ব্বে সেঙ্গ্‌চি নামক একজন চীনপরিব্রাজক চীনদেশ হইতে জলপথে সমতটে আগমন করিয়াছিলেন।[৬১] সেঙ্গ্‌চি রাজভট নামক একজন নিষ্ঠাবান্‌ বৌদ্ধ নৃপতিকে সমতটের সিংহাসনে আসীন দেখিয়াছিলেন। এই নৃপতি একজন প্রগাঢ় বৌদ্ধধর্ম্মানুরক্ত ও বৌদ্ধ শ্রমণগণের অদ্বিতীয় প্রতিপালক বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন। চীনপরিব্রাজক যুঅন্‌-চুঅঙ্গ্‌ আসিয়া ৬৩৮ খৃঃ অব্দে সমতট-রাজ-ধানীতে ২০০০ শ্রমণ দেখিয়াছিলেন, কিন্তু এই রাজভট নৃপতির সময়ে সেঙ্গ্‌চি তথায় ৪০০০ অধিক বৌদ্ধ শ্রমণ দেখিয়া গিয়াছেন।[৬২] ইৎসিংএর আগমনের পূর্ব্বে প্রায় ৬৫০ হইতে ৬৫৫ খৃঃ অব্দ মধ্যে রাজভট নামক নৃপতি সমতটে আধিপত্য করিতেন।

ঢাকাজেলাস্থ রাইপুরা থানার অন্তর্গত আস্‌রফ্‌পুর নামক গ্রাম হইতে দেবখড়্গ নামক এক বৌদ্ধ নৃপতির দুইখানি তাম্রশাসন পাওয়া গিয়াছে।[৬৩] প্রথমখানি হইতে

(৫৭) গৌড়রাজমালা, ১ম ভাগ, ১ম খণ্ড, ১৩ পৃষ্ঠা।

(৫৮) Watters' Yuan Chuang, Vol. II. p. 178.

(৫৯) Watters, II. p. 183. (৬০) Watters, II. p. 184.

(৬১) I-Tsing's Record of the Buddhist Religion, translated by J. Takakusu.

(৬২) Watters' Yuan Chuang, Vol. II. p. 188.

(৬৩) Memoirs of the Asiatic Society of Bengal, Vol. I. p. 86.

আমরা জানিতে পারি, রাজা দেবখড়্গ নিজ প্রিয়পুত্র রাজরাজভটের[৬৩] আয়ুষ্কামনায় মহাদেবী প্রভাবতী প্রভৃতি বারজন সম্ভ্রান্ত-রাজমহিলা ও রাজপুরুষের ভুজ্যমান বিভিন্ন পাটক হইতে দশ দ্রোণ[িক] জমি বৌদ্ধাচার্য্যকে দান করেন এবং তাহা বিহার ও বিহারিকার অন্তর্ভুক্ত করা[ই]য়।[৬৫] দেবখড়্গের দ্বিতীয় তাম্রফলকে লিখিত আছে—বুদ্ধ, ধর্ম্ম ও সঙ্ঘের পরম [শ্রদ্ধা]মান্ উপাসক শ্রীমৎ খড়্গোদ্যম ক্ষিতিতল (অর্থাৎ এই প্রদেশ) জয় করিয়াছিলেন। তৎপুত্র ক্ষিতিপতি জাতখড়্গ শত্রুকুল ধ্বংস করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। তৎপুত্র নর[পতি] শ্রীদেবখড়্গ। তৎপুত্র ত্রৈলোক্য-ভয়দূরীকরণে সমর্থ রাজ-রাজ রত্নত্রয়োদ্দেশ্যে (বুদ্ধ, ধর্ম ও সঙ্ঘের জন্য) স্বভূমি দান করিতেছেন।[৬৬] উক্ত তাম্র-শাসনদ্বয়ের পাঠোদ্ধারকারী উভয় তাম্রশাসনের লিপিকে খৃষ্টীয় অষ্টম ও নবম শতাব্দীর অক্ষর বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। কিন্তু আমরা এই উভয় তাম্রশাসনের লিপি আলোচনা করিয়া বুঝিয়াছি, গঞ্জাম্ হইতে আবিষ্কৃত শশাঙ্কদেবের মহাসামন্ত মাধবরাজের তাম্রশাসন এবং অফ্‌সড় হইতে আবিষ্কৃত মগধাধিপ আদিত্যসেনের খোদিত লিপির অক্ষরবিন্যাসের সহিত দেবখড়্গের তাম্রপট্টলিপির যথেষ্ট সামঞ্জস্য রহিয়াছে। এরূপস্থলে দেবখড়্গকেও আমরা খৃষ্টীয় ৭ম শতাব্দীর লোক বলিয়া অনায়াসেই গ্রহণ করিতে পারি। পূর্ব্বেই লিখিয়াছি ৬৫০-৬৫৫ খৃঃ অব্দ মধ্যে চীনপরিব্রাজক সেঙ্গ্‌চি সমতটপতি রাজভটের বৌদ্ধধর্ম্মানুরাগিতা ও শ্রমণ-প্রতিপালকতার যথেষ্ট পরিচয় দিয়া গিয়াছেন। এখন দেবখড়্গপুত্র উক্ত রাজরাজভট ও রাজভট উভয়কেই অভিন্ন ব্যক্তি বলিয়া গ্রহণ করিতে কোন সন্দেহ থাকিতেছে না। এরূপস্থলে শশাঙ্কদেব বা চীনপরিব্রাজক চুঅন্ চুঅঙ্গের সময়ে সমতটে নৃপতির অভাব ছিল না, তাহাই প্রতিপন্ন হইতেছে। সম্ভবতঃ য়ুঅন্ চুঅঙ্গ কামরূপ হইয়া সমতট রাজ্যে আসিলেও রাজধানীতে উপস্থিত হইতে সমর্থ হন নাই, অথবা সমতটপতি দেবখড়্গ তাঁহার সমুচিত সম্মান প্রদর্শন করেন নাই,—একারণ তিনি বৌদ্ধ সমৃদ্ধির উল্লেখ করিলেও নৃপতির নামোল্লেখ আবশ্যক মনে করেন নাই[৬৭]। যাহা হউক আমরা ইৎ-সিংএর বিবরণী হইতে

(৬৩) পাঠোদ্ধারকর্ত্তা 'রাজরাজভট্ট' পাঠ করিয়াছেন, কিন্তু ১ম তাম্রফলকের ৬ষ্ঠ পংক্তিতে 'শ্রীনেত্রভটেন' শব্দে যেরূপ 'ভট' আছে, সেইরূপ ১০শ পংক্তিতে 'রাজরাজভট' শব্দই দেখিতেছি, একারণ 'রাজরাজভট' প্রকৃত পাঠ বলিয়া গ্রহণ করিলাম।

(৬৫) Memoirs, A. S. B. I. p. 90.

(৬৬) Memoirs, A. S. B. I. p 90-91.

(৬৭) চীনপরিব্রাজক য়ুঅন্-চুঅঙ্গ যখন কাশ্মীরে পদার্পণ করেন, তৎকালে কাশ্মীরপতি তাঁহাকে রাজপ্রাসাদে আহ্বান করিয়া তাঁহাকে যথেষ্ট সমাদর ও সম্মান করিয়াছিলেন। চীনপরিব্রাজক এখানে দুই বর্ষ থাকিয়া বৌদ্ধশাস্ত্র অধ্যয়ন ও বৌদ্ধগ্রন্থ সকল নকল করিয়া লইয়াছিলেন। দীর্ঘকাল এই কাশ্মীরে অবস্থান ও কাশ্মীরপতির নিকট যথেষ্ট সম্মানিত হইলেও আশ্চর্য্যের বিষয় তিনি তাঁহার নামটী আদৌ উল্লেখ করেন নাই। (Watters, Yuan Chuang Vol. I. p. 25) এইরূপ তিনি বহুস্থানে গিয়া তথাকার অধিপতিগণের নাম প্রকাশ করা আদৌ আবশ্যক মনে করেন নাই। (Vide Sankara Pandurang's Gaudavaho, intro. p. 227.)

বুঝিতে পারিতেছি, কর্ণসুবর্ণপতি শশাঙ্কের সময় দেবখড়্গ এবং তৎপূর্ব্বে তাঁহার পিতা জাতখড়্গ সমতট প্রদেশ শাসন করিতেন। শশাঙ্কদেবের সহিত সমতটপতির বিরোধের সংবাদও এ পর্য্যন্ত পাওয়া যায় নাই।

শশাঙ্কদেবের মৃত্যুর পর কে তাঁহার উত্তরাধিকার লাভ করেন, এখনও পর্য্যন্ত তাহার ঠিক সন্ধান পাওয়া যায় নাই। তবে তাঁহার অনুরক্ত মহাসামন্ত শৈলবংশীয় রাজন্যগণ তাঁহার পূর্ব্বাধিকার উদ্ধারে যে যথেষ্ট সচেষ্ট ছিলেন, তাহার কতক কতক ক্ষীণ আভাষ পাওয়া গিয়াছে। রঘোলি হইতে প্রাপ্ত তাম্রশাসনে লিখিত আছে, শৈলবংশতিলক শ্রীবর্দ্ধন নামক নৃপতির সৌবর্দ্ধন নামে একপুত্র ছিলেন, সৌবর্দ্ধনের তিন পুত্র জন্মে, তন্মধ্যে শৌর্য্যেবীর্য্যে অদ্বিতীয়, শত্রুবিদারণপটু একপুত্র পুণ্ড্ররাজকে নিহত করিয়া সমস্ত পুণ্ড্রদেশ স্বীয় অধিকার-ভুক্ত করিয়াছিলেন।[৬৮] সেই পৌণ্ড্রজিৎ বা পুণ্ড্রাধিপের নাম উক্ত তাম্রশাসনে প্রকাশ নাই। নেপাল হইতে আবিষ্কৃত দ্বিতীয় জয়দেবের শিলালিপিতে লিখিত আছে, রাজা জয়দেব ভগদত্তবংশীয় গৌড়োড্রাদিকলিঙ্গ-কোশলপতি হর্ষদেবের কন্যা রাজ্যমতীর পাণিগ্রহণ করেন।[৬৯] যিনি গৌড়োড্র-কলিঙ্গ-কোশলপতি বলিয়া উক্ত হইয়াছেন, তিনি কখনই একজন সামান্য নৃপতি ছিলেন না। ভগদত্তবংশীয় বলিয়া পরিচয় থাকায় তাঁহাকে আমরা কামরূপপতি ভাস্করবর্ম্মার বংশসম্ভূত বলিয়া মনে করি। পূর্ব্বেই জানাইয়াছি, এক সময় ভাস্করবর্ম্মা কর্ণসুবর্ণে আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিলেন, পুণ্ড্রবর্দ্ধনেও তাঁহার আধিপত্য বিস্তৃত হইয়াছিল, সন্দেহ নাই। ৬৪৮ খৃঃ অব্দে সম্রাট্ হর্ষবর্দ্ধনের মৃত্যুর পর যখন তাঁহার সাম্রাজ্য মধ্যে নানাদিকে বিপ্লব উপস্থিত হইয়াছিল, তাঁহার সেনাপতি যখন তাঁহার নিকট অবমানিত হইয়া তিব্বতে ফিরিয়া গিয়া ভোটসৈন্য লইয়া আসিয়া তাঁহাকে বন্দী করিয়া লইয়া যান, এই সুযোগে যখন মগধাধিপ আদিত্যসেন বা তাঁহার বংশধর সমস্ত প্রাচ্যভারত অধিকার করিয়া মহারাজাধিরাজ পরম-ভট্টারক উপাধি গ্রহণ করিয়াছিলেন, তৎকালে প্রাগ্‌জ্যোতিষাধিপতি ভাস্করবর্ম্মাও হর্ষদেবের সেনাপতি রাজ্যাপহারী অর্জ্জুন অরুণাশ্বকে পদচ্যুত করিবার জন্য চীনদূতকে যথেষ্ট সাহায্য পাঠাইয়া ছিলেন। এ সময়ের চীনগ্রন্থে ভাস্করবর্ম্মা প্রাচ্যভারতের অধীশ্বর বলিয়া অভিহিত হইয়াছেন।[৭০] সম্ভবতঃ যে সময়ে হর্ষের সেনাপতি বলপূর্ব্বক হর্ষের সিংহাসন অধি-কার করেন, সেই সুযোগে ভাস্করবর্ম্মাও প্রাচ্যভারতে আধিপত্য বিস্তারে নিশ্চিন্ত ছিলেন বলিয়া মনে হয় না। ক্রমে ভাস্করবর্ম্মার বংশধর হর্ষদেব কলিঙ্গ এমন কি কোশল পর্য্যন্ত আধিপত্য বিস্তারে সমর্থ হইয়াছিলেন, সন্দেহ নাই। কলিঙ্গে অথবা কোশলে তাঁহার সহিত শৈলবংশের ঘোরতর যুদ্ধ হইয়াছিল, প্রথম প্রথম তিনি কলিঙ্গ ও কোশলবিজয়ে

(৬৮) Epigraphia Indica, Vol. IX. p. 44.

(৬৯) Indian Antiquary, Vol IX. p. 178.

(৭০) Vincent A. Smith's Early History of India, (2nd ed.) p. 327

সমর্থ হইয়াছিলেন। এই সময় তিনি প্রাচ্যভারতে গৌড়োড্রকলিঙ্গ-কোশলাধিপ বলিয়া পরিচিত হইয়া থাকিবেন। অবশেষে দুর্দ্ধর্ষ মহাবীর শৈলবংশের চেষ্টায় ঘোরতর সমরে তিনিও পরাজিত ও নিহত হইতে পারেন। শৈলবংশের তাম্রশাসনে এই হর্ষদেবই সম্ভবতঃ পুণ্ড্রাধিপ বলিয়া অভিহিত হইয়াছেন।

সৌবর্দ্ধন-পুত্র গৌড় অধি[illegible] করিয়া নিজে রাজা হইয়াছিলেন বলিয়া মনে হয় না। এ কারণ তাম্রশাসনে তাঁহার না[illegible] পর্য্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই। তাঁহার পূর্ব্বপুরুষগণ যাঁহাকে তাঁহাদের অধীশ্বর বলিয়া পূজা করিতেন, সেই শশাঙ্কদেবের বংশধর বা আত্মীয় কাহাকেও তাঁহারা গৌড়ের সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়া থাকিবেন। শৈলবংশের সাহায্যে যিনি গৌড়ের সিংহাসন লাভ করিয়াছিলেন, তাঁহার নাম এখনও জানা যায় নাই। তবে ঐ সময়ে রাঢ়দেশে শান্তিপুর অঞ্চলে প্রচণ্ডদেব নামে এক রাজা রাজত্ব করিতেছিলেন। দিনাজপুর, রাজসাহী, বগুড়া, ও রঙ্গপুরের অধিকাংশ তাঁহার অধিকারভুক্ত হইয়াছিল, এরূপ প্রবাদ আছে। এরূপ বিপুল রাজ্য ও সহায়সম্পত্তি লাভ করিলেও অল্পদিন মধ্যেই তাঁহার সংসার-বৈরাগ্য উপস্থিত হয়। তিনি আপন প্রিয়পুত্র শক্তিদেবের উপর রাজ্যভার অর্পণ করিয়া সন্ন্যাসব্রত অবলম্বন করেন। ভিক্ষুবেশে নানাতীর্থ ভ্রমণ করিয়া অবশেষে তিনি নেপালে উপস্থিত হন। এখানে বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া শেষজীবন অতিবাহিত করেন। দীক্ষাগ্রহণের পর তিনি "শান্তিকর সিদ্ধাচার্য্য" নামে পরিচিত হইয়াছিলেন। নেপালের প্রসিদ্ধ স্বয়ম্ভুক্ষেত্র তাঁহারই প্রতিষ্ঠিত।

শৈলবংশীয়গণ যে কিছুকাল পৌণ্ড্রবর্দ্ধন রাজ্যে বাস করিয়াছিলেন মহাস্থানগড়ের নিকট-বর্ত্তী শিলাবর্ষ নামক ভূভাগ তাহারই কতকটা স্মৃতি রক্ষা করিতেছে বলিয়া মনে হইতে পারে।

তৃতীয় অধ্যায়

—*—

কাশ্মীরে কায়স্থরাজবংশ

যে সময়ে পৌণ্ড্র, রাঢ় ও সমতটে কায়স্থ-প্রভাব বিলুপ্ত হইতেছিল, তৎকালে সুদূরে কাশ্মীর এবং হিমালয় প্রদেশে কায়স্থগণ ধীরে ধীরে মস্তকোত্তলন করিতেছিলেন। কহ্লণের রাজতরঙ্গিণী গ্রন্থে কাশ্মীরের কায়স্থবংশের বিস্তৃত ইতিহাস বিবৃত হইয়াছে। এই কায়স্থবংশের সহিত বিভিন্ন সময়ে গৌড়বঙ্গের সম্বন্ধ ঘটিয়াছিল বলিয়া সেই প্রথিত রাজবংশের বিবরণ অতি সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ করা প্রয়োজন মনে করিতেছি।

পূর্ব্ব অধ্যায়ে লিখিয়াছি, খৃষ্টীয় ৫ম ও ৬ষ্ঠ শতাব্দীতে নাগবংশীয় কায়স্থগণ কান্যকুব্জ, মালব, গুজরাট প্রভৃতি অঞ্চলে ব্রাহ্মণ সামন্ত-নৃপতিগণের অধীনে উচ্চরাজকীয়পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। ঐ সময়ে কাশ্মীরের সহিত মালবের যে যথেষ্ট রাজনৈতিক সম্বন্ধ ছিল, রাজতরঙ্গিণী হইতেই তাহার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। কহ্লণের বর্ণনা হইতে জানা যায়, উজ্জয়িনীপতি বিক্রমাদিত্য (খৃষ্টীয় ৬ষ্ঠ শতাব্দে) মাতৃগুপ্ত নামক এক প্রসিদ্ধ কবিকে অরাজক কাশ্মীর রাজ্য প্রদান করিয়াছিলেন। সেই কবি চারিবর্ষ একমাস একদিন কাশ্মীরে রাজত্ব করিয়াছিলেন। মাতৃগুপ্ত নিজ জন্মভূমি-মালবের আদর্শে এখানেও কায়স্থগণকে উচ্চ রাজকীয় পদে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয়। তাঁহাদের মধ্যে কাশ্মীরের ইতিহাসে দুর্লভবর্দ্ধন নামক একব্যক্তি প্রথম কায়স্থ-নৃপতি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন। রাজতরঙ্গিণীতে তিনি অশ্বঘোষ[1]-কায়স্থবংশীয় এবং কর্কোটনাগের ঔরসজাত বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।[2] কর্কোটনাগের নাম শুনিয়া অনেকে তাঁহার প্রকৃত জাতি ও

(১) এসিয়াটিক-সোসাইটী হইতে মুদ্রিত রাজতরঙ্গিণীতে 'অশ্বধাম', বিশ্বকোষ-কার্য্যালয়ে রক্ষিত পুথিতে 'অশ্বঘোষ' এবং ডাক্তার ষ্টেইন্ সাহেব যে রাজতরঙ্গিণী প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে 'অশ্বঘাস' পাঠ আছে। ষ্টেইন্ সাহেব 'অশ্বঘাস-কায়স্থের' an official (in charge) of the fodder for horses অর্থাৎ ঘোড়ার ঘাস যে রাজপুরুষের তত্ত্বাবধানে থাকে—এইরূপ অর্থ করিয়াছেন, তাঁহার এই অর্থ সঙ্গত বলিয়া মনে হইল না। কারণ এরূপ কোন রাজকীয়পদের উল্লেখ রাজতরঙ্গিণী অথবা ভারতের নানাস্থান হইতে আবিষ্কৃত শিলালেখ ও তাম্রশাসনে এ পর্য্যন্ত পাওয়া যায় নাই। এরূপ স্থলে বিশ্বকোষ-কার্য্যালয়ে রক্ষিত সাড়ে তিনশত বর্ষের প্রাচীন পুথির পাঠই সঙ্গত বলিয়া বোধ হয়। অশ্বঘোষ একজন সুপ্রসিদ্ধ বৌদ্ধাচার্য্য ছিলেন। দুর্লভবর্দ্ধনের পূর্ব্ব-পুরুষের মধ্যে কেহ বৌদ্ধ-সমাজে প্রসিদ্ধ এই নামটী গ্রহণ করিয়া থাকিবেন। তাহা হইতে 'অশ্বঘোষ' নাম হইয়া থাকিবে।

(২) "হেতুং স রূপমাত্রং কৃত্বা জামাতরং নৃপঃ।
অথাশ্বঘোষকায়স্থকন্যে দুর্লভবর্দ্ধনম্।

উৎপত্তি সম্বন্ধে সন্দিহান। রাজতরঙ্গিণীর কোন কোন সমালোচক এরূপও লিখিয়াছেন যে কাশ্মীরবাসী একান্ত নাগভক্ত ছিলেন। কহ্লণ এই বংশকে বাড়াইবার জন্যই কর্কোটনাগের বংশজাত বলিয়া পরিচিত ক[illegible]য়াছেন। কিন্তু প্রকৃতপ্রস্তাবে কর্কোটনাগ ব্যক্তিবিশেষের নাম বলিয়া মনে করি। কা[illegible]বাসী যে নাগের পূজা করিতেন, মহাভারতে তিনি তক্ষক-নাগ বলিয়া পরিচিত এবং রা[illegible]রঙ্গিণী ও নীলমতপুরাণে কাশ্মীরপালক প্রথম নাগরাজ নীল এবং অপর রক্ষক মহাপদ্ম [illegible] পরিচিত হইয়াছেন। এরূপস্থলে দুর্লভবর্দ্ধনের পিতা কর্কোটনাগকে কদ্রুর গর্ভজাত [illegible]বর্ণিত মহাসর্প বলিয়া গ্রহণ করিতে পারিতেছি না। কর্কোট নাগ একজন প্রকৃত কায়[illegible] ছিলেন, তাহাতে সন্দেহ নাই।"

কাশ্মীরপতি গোনর্দ্দের শেষ বংশধর বালাদিত্য দুর্লভবর্দ্ধনের রূপে গুণে মুগ্ধ হইয়া তাঁহার একমাত্র কন্যারত্ন অনঙ্গলেখাকে তাঁহার হস্তে সম্প্রদান করেন। কাশ্মীরপতি তাঁহার বুদ্ধির প্রাখর্য্যদর্শনে তাঁহার প্রজ্ঞাদিত্য নাম রাখেন।[৪] সেই কাশ্মীরপতি পূর্ব্ব-সাগর পর্য্যন্ত জয় করিয়া বাঙ্গালায় কাশ্মীরীগণের বাসের জন্য কালম্বা নামে একটী নগর স্থাপন করেন। বালাদিত্যের মৃত্যুর পর তাঁহার মন্ত্রী খঙ্খের যত্নে রাজজামাতা দুর্লভবর্দ্ধনই সিংহাসনে অভিষিক্ত হইলেন। তাঁহার মহিষী অনঙ্গলেখা 'অনঙ্গভবন' নামে একটি বিহার প্রতিষ্ঠা করেন। মহিষী অনেকটা বৌদ্ধধর্ম্মানুরক্ত হইলেও মহারাজ দুর্লভবর্দ্ধন অতিশয় ব্রাহ্মণভক্ত ছিলেন। এক জ্যোতিষী মল্লণ নামক রাজকুমারের অল্পায়ুর কথা প্রকাশ করায় কাশ্মীরপতি বিশোককোট নামক শৈলস্থিত চন্দ্রগ্রাম পুত্রের কল্যাণে[illegible] ব্রাহ্মণগণকে দান করেন এবং পুত্র দ্বারা মল্লণস্বামী নামে শিবস্থাপন করাইয়াছিলেন। তৎপরে তিনি শ্রীনগরে দুর্লভস্বামী নামে এক বিষ্ণুমূর্ত্তিও প্রতিষ্ঠা করেন। ইনি ৩৬ বর্ষ রাজত্বের পর (প্রায় ৬৫৭খৃঃ অব্দে) ইহলোক পরিত্যাগ করেন। তাঁহারই আধিপত্যকালে চীনপরিব্রাজক য়ুঅন্-চুঅঙ্ কাশ্মীররাজ্যে আগমন করেন। চীন-ইতিহাসে তিনি তু-লো-প নামে পরিচিত এবং ৬২৭ হইতে ৬৪৯ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত চীন হইতে কিপিন বা কাবুল-উপত্যকার সমস্ত পথঘাট তাঁহার

মাতুঃ কর্কোটনাগেন সুস্নাতায়াঃ সমীয়ুষা।
রাজ্যারৈব হি সঞ্জাতা রাজ্ঞা ন জ্ঞায়ি তেন সা॥
(৩) অভূৎ সর্ব্বস্ব চক্ষুষ্যঃ স তু দুর্লভবর্দ্ধনঃ।
প্রজ্ঞয়া দ্যোতমানং তং প্রজ্ঞাদিত্য ইতি প্রথাম্॥" (রাজতরঙ্গিণী ৩।৪৮৯-[illegible]০)

(৪) গৌড়বঙ্গে অদ্যাপি প্রথিত কায়স্থ নাগবংশের একধারা কর্কোট নাগের বংশধর বলিয়া পরিচয় দিয়া আসিতেছেন। বারেন্দ্র-কায়স্থদিগের ঢাকুর গ্রন্থে এক কর্কোট নাগের পরিচয় আছে—

"কোলাঞ্চ নগর ধাম, দেবদত্ত নাগ নাম, প্রথমে আইলা বঙ্গদেশে।
শিব তার বংশধর, কর্কোট জটাধর, শিবের সন্তান হইল শেষে॥
সাধ্য মধ্য নাগ ঘর, কর্কোট জটাধর, শুন তার কহি পরিচয়।
সৌপায়ন-গোত্র সার, পঞ্চ-প্রবর তার, লিখি তাহা করিয়া নির্ণয়॥"

শাসনাধীন ছিল।[৫] তাঁহার মুদ্রায় 'শ্রীদুর্লভদেব' নাম খোদিত আছে।[৬] তাঁহার সময় কাশ্মীর রাজ্যের বিস্তৃতি ১৪০০শত মাইলের উপর ছিল। চীনপরিব্রাজক এখানকার বিস্তৃত কৃষিক্ষেত্র, অসংখ্যপ্রকার ফলফুল, নাগাশ্ব, কুঙ্কুম ও নানাপ্রকার ভেষজ দ্রব্য দেখিয়া বিমুগ্ধ হইয়াছিলেন। তৎকালে এখানে ১০০টি বৌদ্ধ সঙ্ঘারাম ও তাহাতে ৫০০০ হাজারের অধিক শ্রমণের বাস ছিল। কাশ্মীরপতি চীনপরিব্রাজককে যথেষ্ট সমাদর করিয়াছিলেন এবং নিজে তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করিয়া আনিয়া নিজ প্রাসাদ মধ্যেই তাঁহার বাসস্থান নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছিলেন।[৭] দুর্লভবর্দ্ধনের মৃত্যুর পর তৎপুত্র দুর্লভক-প্রতাপাদিত্য পিতৃ-সিংহাসনে আরোহণ করেন। তাঁহারই নামে প্রতাপপুর নগর স্থাপিত হয়। এখানে বহুসংখ্যক ধনকুবের বণিক্‌গণ আসিয়া বাস করিতেন। তাঁহার মুদ্রায় 'শ্রীপ্রতাপ' নাম উৎকীর্ণ আছে।[৮]

তাঁহার তিন পুত্র বজ্রাদিত্য, ললিতাদিত্য ও উদয়াদিত্য। ৫০ বৎসর রাজত্ব করিয়া (প্রায় ৭১২ খৃঃ অব্দে) প্রতাপাদিত্যের মৃত্যু হয়। তৎপরে তাঁহার প্রথম পুত্র চন্দ্রাপীড়-বজ্রাদিত্য সিংহাসনে অভিষিক্ত হইলেন। চন্দ্রাপীড়ের প্রভাব ও সুনাম চীনসাম্রাজ্য পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল। চীন-ইতিহাস হইতে পাওয়া যায় যে, তিনি ৭১৩ খৃষ্টাব্দে আরব-প্রভাব দমন করিবার জন্য চীনসম্রাটের সাহায্য প্রার্থনা করেন। চীনসম্রাট্ ৭২০ খৃঃ অব্দে বহু খেলাত পাঠাইয়া তাঁহাকে সম্মানিত করিয়াছিলেন।[৯] তিনি 'ত্রিভুবনস্বামী' নামে নারায়ণ-মূর্ত্তি, তাঁহার পত্নী প্রকাশা 'প্রকাশিকা' নামে বিহার, রাজ-গুরু মিহিরদত্ত 'গম্ভীরস্বামী' নামে এবং নগরাধ্যক্ষ ছলিত 'ছলিতকস্বামী' বিষ্ণুমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁহার মধ্যম সহোদর তারাপীড়-উদয়াদিত্য এক ব্রাহ্মণের কৃত্যারূপ অভিচার-ক্রিয়া দ্বারা তাঁহাকে মারিয়া নিজে রাজা হন। তিনি অতিশয় গর্ব্বিত ও উদ্ধতস্বভাব ছিলেন। তিনিও কয়েক বৎসর রাজত্ব করিয়া এক ব্রাহ্মণের অভিচার-ক্রিয়ায় পঞ্চত্ব-প্রাপ্ত হন। তৎপরে তাঁহার কনিষ্ঠ সহোদর মুক্তাপীড়-ললিতাদিত্য রাজা হইলেন। এই মুক্তাপীড়-ললিতাদিত্যের ন্যায় পরাক্রান্ত নৃপতি বোধ হয় আর কেহই কাশ্মীরের সিংহাসনে আরোহণ করেন নাই। তিনি একজন দিগ্বিজয়ী অসাধারণ নৃপতি ছিলেন। পূর্ব্বে কান্যকুব্জ ও গৌড়দেশ, দক্ষিণে কলিঙ্গ ও কর্ণাট, পশ্চিমে কাম্বোজ এবং উত্তরে ভুখার, দরদ ও স্ত্রীরাজ্য প্রভৃতি বহু স্থান জয় করিয়াছিলেন। তিনিই কাশ্মীররাজ্যে সর্ব্বপ্রথম এই কয়েকটী রাজকীয় কর্ম্মবিভাগ প্রতিষ্ঠিত করেন—মহাপ্রতীহারপীড়া (Office of high chamberlain), মহাসন্ধিবিগ্রহ (Chief minister of foriegn affairs), মহাশ্বশালা (Chief master

(৫) A. Remusat, Nouv. Melanges Asiat. I. p. 212
(৬) Cunningham's Coins of Med. India, p. 38.
(৭) Watters' Yuan Chuang, Vol I. pp. 258-261.
(৮) Cunningham's Coins of Med. India, p. 44.
(৯) চীন ইতিহাসে চন্দ্রাপীড় Tchan-to-pi-li নামে অভিহিত। A Remusat, Nouv. Melanges Asiat, I. pp. 166.

of the horse), মহাভাণ্ডাগার (High-keeper of the treasury) ও মহাসাধনভাগ (Supreme Executive officer)। তাঁহার সময়ে কান্যকুব্জের সিংহাসনে মহারাজ যশোবর্ম্মা অধিষ্ঠিত ছিলেন। তাঁহার সভায় কবিবর ভবভূতি ও বাক্‌পতি বিরাজ করিতেন। ললিতাদিত্য যশোবর্ম্মাকে পরাজয় করিয়া ভবভূতি ও বাক্‌পতিকে কাশ্মীরে লইয়া আসেন। তিনি যে সকল রাজ্য জয় করিয়াছিলেন, সেই সকল রাজ্যেই তাঁহার জয়স্তম্ভ স্থাপিত হইয়াছিল। সুনিশ্চিতপুর, দর্পিতপুর, পরিহাসপুর ও ফলপুর নগর নির্ম্মাণ করিয়া নানাপ্রকার বাসভবন ও প্রমোদভবনে সুসজ্জিত করিয়াছিলেন। এতদ্ভিন্ন তিনি বহু দেবমূর্ত্তি, দেবমন্দির ও বৌদ্ধস্তূপ নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। তন্মধ্যে ললিতপুরে সূর্য্যমূর্ত্তি, হুষ্কপুরে মুক্তাস্বামী, পরিহাসপুরে 'পরিহাস-কেশব' নামে সোণার বিষ্ণুমূর্ত্তি, পাষাণময় স্বর্ণনখশোভিত মহাবরাহমূর্ত্তি, গোবর্দ্ধনধর কৃষ্ণমূর্ত্তি ও বুদ্ধমূর্ত্তি প্রধান। তাঁহার মহিষী কমলাবতী কমলাকেশব, প্রধান মন্ত্রী মিত্রশর্ম্মা মিত্রেশ্বর নামে শিবলিঙ্গ এবং সামন্তরাজ কয্য শ্রীকয্যস্বামী নামে বিষ্ণুমূর্ত্তি ও কয্যবিহার নামে বিহার প্রস্তুত করাইয়াছিলেন। সেই বিহারে সর্ব্বজ্ঞমিত্র নামে একজন বৌদ্ধ শ্রমণ যোগবলে বোধিজ্ঞান লাভ করেন। তাঁহার চঙ্কুণ নামে আর এক তুখার-মন্ত্রী চঙ্কুণবিহার, একটী বৃহৎ স্তূপ এবং সোণার বুদ্ধপ্রতিমা প্রতিষ্ঠা করেন। চক্রমর্দ্দিকা নামে ললিতাদিত্যের এক প্রিয়তমা 'চক্রপুর' নামে এক নগর স্থাপন করিয়াছিলেন। পরিহাসপুরে ললিতাদিত্যের একটী বৃহৎ অনাথাশ্রম ছিল। তাহাতে নিত্য লক্ষলোকের ভোজনোপযোগী পাত্র ও খাদ্যাদির ব্যবস্থা হইত। এতদ্ভিন্ন তিনি মরুভূমিতে একটী নগর নির্ম্মাণ করাইয়া শ্রান্ত ও পিপাসিতের জলপানের সুবিধা করাইয়া দেন। উক্ত পরিহাসকেশবের মন্দিরের পার্শ্বে তিনি একটী স্বতন্ত্র রৌপ্যমন্দির নির্ম্মাণ করাইয়া তাহাতে রামস্বামী নামে বিষ্ণুমূর্ত্তি এবং তাঁহার মহিষী চক্রমর্দ্দিকা চক্রেশ্বরের পার্শ্বে লক্ষ্মণস্বামী নামে আর একটী বিষ্ণুমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করেন।

রামস্বামীর মন্দিরের সহিত গৌড়ীয় বীরগণের কীর্ত্তি উদ্ভাসিত রহিয়াছে। এ সম্বন্ধে এখানে কিছু লেখা আবশ্যক মনে করিতেছি। মহামতি কহ্লণ লিখিয়াছেন—"ললিতাদিত্য যশোবর্ম্মাকে বশীভূত করিয়া কলিঙ্গাভিমুখে যাত্রা করেন, তখন গৌড়মণ্ডল হইতে অসংখ্য হস্তী আসিয়া তাঁহার সহিত মিলিত হইয়াছিল।" ইহাতে মনে হয়, গৌড়পতি তাঁহার সহিত যুদ্ধ না করিয়া তাঁহার বশ্যতা-স্বীকার করিয়াছিলেন এবং নবীন সম্রাটের মনস্তুষ্টির জন্য হস্তী উপঢৌকন পাঠাইয়াছিলেন। কাশ্মীরে ফিরিয়া গিয়া ললিতাদিত্য গৌড়পতিকে কাশ্মীরে আহ্বান করিয়াছিলেন। তিনি আপনার উপাস্য পরিহাসকেশবকে মধ্যস্থ রাখিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন যে, তিনি গৌড়পতির কোন অনিষ্ট করিবেন না। তথাপি তিনি ত্রিগ্রামবাসী এক নরহন্তার দ্বারা তাঁহার বধ-সাধন করেন। এই সংবাদ অল্পদিন মধ্যেই গৌড়ে পৌঁছিল। গৌড়পতির একদল অনুগত ভৃত্য কাশ্মীররাজের সেই দুষ্কার্য্যের প্রতিশোধ লইবার জন্য সারদাতীর্থ দর্শন-ছলে কাশ্মীরে আসিয়া পরিহাসকেশবের মন্দির ধ্বংস করিবার জন্য অগ্রসর হইলেন। গৌড়বীরেরা মন্দির আক্রমণ করিবে জানিতে পারিয়া পূজকেরা মন্দিরের কপাট বন্ধ

করিয়া দিয়াছিলেন, গৌড়ীয়েরা পার্শ্ববর্ত্তী রামস্বামীর রৌপ্যময় মন্দিরকেই শ্রীপরিহাসকেশবের মন্দির ভাবিয়া তাহা ধ্বংস করিলেন ও দেবমূর্ত্তি চূর্ণ করিয়া ফেলিলেন। এদিকে কাশ্মীরী সৈন্য আসিয়া তাঁহাদিগকে ঘেরিয়া ফেলিল। গৌড়ীয়গণ রামস্বামীর মূর্ত্তি ভাঙ্গিতে ব্যস্ত ছিলেন— কাশ্মীর-সৈন্য পশ্চাদ্দিক্ হইতে তাহাদের শিরশ্ছেদ করিতে লাগিল, কিন্তু তাহাতেও কেহ বিচলিত না হইয়া একে একে সকলেই শত্রু-করে প্রাণ উৎসর্গ করিলেন। ধন্য রাজভক্তি! সেই ঘটনা লক্ষ্য করিয়া কহ্লণ লিখিয়াছেন, "গৌড় হইতে দীর্ঘভ্য কাশ্মীরের পথের কথাই বা কি বলিব! গৌড়গণ দ্বারা যাহা সাধিত হইয়াছিল, বিধাতার পক্ষেও তাহা অসাধ্য। আজও রামস্বামীর মন্দির শূন্য দেখা যায়। সেই গৌড়বীরগণের যশে ব্রহ্মাণ্ড পরিপূর্ণ রহিয়াছে।"[১০]

চীনের তং-বংশের ইতিহাসে এই মুক্তাপীড়ের নাম পাওয়া যায়। চীনসম্রাট্ হিউএন্-চুঙ্গের সভায় চীনসৈন্যকর্ত্তৃক বল্‌তিস্তান-জয়ের পর (৭৩৬ খৃঃ অব্দের কিছু পর) কাশ্মীরপতি দূত পাঠাইয়াছিলেন এবং মধ্যদেশের অধিপতির সহযোগে তিব্বতীয়গণের বিরুদ্ধে দুই লক্ষ সেনা দিয়া সাহায্য করিতে সম্মত হইয়াছিলেন।[১১] সুপ্রসিদ্ধ মুসলমান ঐতিহাসিক অল্-বেরুণী 'মুত্তৈ' নামে এই মুক্তাপীড়ের উল্লেখ করিয়াছেন।[১২] মুক্তাপীড় তুরুষ্কদিগকে সম্পূর্ণ পরাজয় করিলে সেই ঘটনা চিরস্মরণীয় করিবার জন্য কাশ্মীরবাসী চৈত্র মাসের ২য় দিবসে বরাবর একটী উৎসব করিতেন! সেই উৎসব 'মুত্তৈ' উৎসব নামে পরে পরিচিত হয়।[১৩] রাজতরঙ্গিণীর অনুবাদক ডাক্তার ষ্টেইন্ সাহেব লিখিয়াছেন, চীনপরিব্রাজক হিউএন্-সিয়ঙ্গের আগমনকালে চন্দ্রভাগা হইতে লবণ-শৈলমালা পর্য্যন্ত কাশ্মীররাজ্যের অন্তর্গত হইয়াছিল। কিন্তু মুক্তাপীড়-ললিতাদিত্যের সময় পঞ্জাবের নিম্ন অংশে এমন কি পূর্ব্বদিকে যমুনাতীর পর্য্যন্ত অধিকার বিস্তৃত হওয়ায় কান্যকুব্জপতির সহিত তাঁহার সংঘর্ষ উপস্থিত হইয়াছিল।[১৪]

পূর্ব্বে যে চঙ্কুণ-বিহারের নাম করা হইয়াছে, চীন-পরিব্রাজক ওউ-কোং (৭৫৭-৬০ খৃষ্টাব্দে) কাশ্মীরে আসিয়া উক্ত বিহারে অবস্থান করিয়াছিলেন।[১৫] ললিতাদিত্য মগধ হইতে যে অপূর্ব্ব বুদ্ধমূর্ত্তি আনিয়াছিলেন, চঙ্কুণ সেই মূর্ত্তি উক্ত বিহারে প্রতিষ্ঠিত করেন।

(১০) "ক্ব দীর্ঘকাললঙ্ঘ্যোঽধ্বা শাস্তে ভক্তিঃ ক্ব চ প্রভৌ। বিধাতুরপ্যসাধ্যং তদ্‌যদ্‌গৌড়ৈর্বিহিতং তদা॥
লোকোত্তরস্বামিভক্তিপ্রভাবাণি পদে পদে। তাদৃশানি তদাভূবন্ ভৃত্যরত্নানি ভূভৃতাম্॥
রাজ্ঞঃ প্রিয়ো রক্ষিতোঽভূদ্‌গৌড়রাক্ষসবিপ্লবে। রামস্বাম্যপহারেণ শ্রীপরীহাসকেশবঃ॥
অদ্যাপি দৃশ্যতে শূন্যং রামস্বামিপুরাস্পদম্। ব্রহ্মাণ্ডং গৌড়বীরাণাং সনাথং যশসা পুনঃ॥"

(রাজতরঙ্গিণী ৪।৩৩০-৩৩৩)

(১১) মুক্তাপীড় চীন-ইতিহাসে Mu-to-pi নামে এবং মধ্যভারতের অধীশ্বর I-cha-fon-mo বা যশোবর্ম্মন্ নামে পরিচিত। (Vide M. M. Chavannes and Levi, Journal Asiat. 1895, p. 353)

(১২) অধ্যাপক বুহ্‌লর সাহেব মুক্তাপীড়ের অপভ্রংশে মুত্তপীর এবং তাহাই মুসলমান ঐতিহাসিকের নিকট 'মুত্তৈ' হইয়াছে মনে করেন। Indian Antiquary, XXI. p. 383.

(১৩) Alberni's India, by E. Sachau, Vol. II. p. 178.

(১৪) Dr. Stein's Rája-tarangini, Vol I. intro. p. 89.

(১৫) Levi and Chavannes, Journal Asiatique, 1895, VI. p. 352.

শেষ দশায় ললিতাদিত্য পুনরায় উত্তরাপথে যুদ্ধযাত্রা করেন। এই অভিযানেই তাঁহার মৃত্যু হয়। তিনি ৩৬ বর্ষ ৭ মাস ১১ দিন রাজত্ব করেন।

তৎপরে তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র কুবলয়াদিত্য রাজা হইলেন। তিনি পরমধার্ম্মিক ও অতিশয় প্রজারঞ্জক ছিলেন। তাঁহার বৈমাত্রেয় ভ্রাতা বজ্রাদিত্য সিংহাসন অধিকার করিবার জন্ত বিদ্রোহী হইয়াছিলেন। যুদ্ধে কুবলয়াপীড়েরই জয় হয়। বজ্রাদিত্য জ্যেষ্ঠের অধীনতা-স্বীকার করেন। ইহার কিছুদিন পরেই জনৈক মন্ত্রী বিদ্রোহী হইয়া তাঁহার প্রাণসংহারে উদ্যত হইলেন। কাশ্মীরপতি তাহা জানিতে পারিয়া দলবলসহ তাঁহার বধসাধনার্থ উদ্যোগী হইয়াছিলেন, কিন্তু শেষে মানবজীবন ক্ষণবিধ্বংসী, পাপের শাস্তা স্বয়ং ভগবান্ এই ভাবিয়া নিজে রাজ্য পরিত্যাগপূর্ব্বক প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন। তাঁহার বানপ্রস্থকালে কাশ্মীর মধ্যে হাহাকার উঠিয়াছিল, তাঁহার পিতৃমন্ত্রী মিত্রশর্ম্মা সস্ত্রীক জলে নিমগ্ন হইয়া শোকাবেগ নিবারণ করিয়াছিলেন। কুবলয়াপীড় ১ বৎসর ১৫ দিন মাত্র রাজত্ব করেন। তৎপরে বজ্রাদিত্য রাজা হন। তিনি নিষ্ঠুর, দেবস্বাপহারী, অতিশয় অত্যাচারী ও স্ত্রীবিলাসী ছিলেন। যক্ষ্মারোগে তাঁহার মৃত্যু হয়। তিনি ৭ বৎসর মাত্র রাজত্ব করেন। তৎপরে তৎপুত্র পৃথিব্যাপীড় ৪ বৎসর ১ মাস ও তদনন্তর তাঁহার বৈমাত্রেয় ভ্রাতা সংগ্রামাপীড় ৭ বৎসর মাত্র রাজত্ব করেন। সংগ্রামাপীড়ের মৃত্যু হইলে বজ্রাপীড়ের কনিষ্ঠপুত্র জয়াপীড় রাজা হইলেন। এই জয়াপীড় বা জয়াদিত্য অশেষ গুণশালী, শাস্ত্রানুরাগী, ব্রাহ্মণভক্ত ও একজন দিগ্বিজয়ী নৃপতি ছিলেন। তিনি নানাস্থান জয় করিয়া বহু সৈন্য সমভিব্যাহারে প্রয়াগে উপস্থিত হইয়া ৯৯৯৯৯টী বেগবান্ অশ্ব ব্রাহ্মণদিগকে দান করেন। এই দানের পর তথায় একটী স্বনামে স্তম্ভ প্রতিষ্ঠা করেন, সেই স্তম্ভের উপর এইরূপ ক্ষোদিত হইয়াছিল "যে আমার ন্যায় লক্ষ অশ্ব ব্রাহ্মণকে দান করিতে পারিবে, সে যেন আমার এই স্তম্ভ ভাঙ্গিয়া ফেলে।"[১৬]

তৎপরে তিনি নানা দিগ্দেশ জয়পূর্ব্বক গঙ্গাতীরে সৈন্যগণকে বিদায় দিয়া রাত্রিকালে ছদ্ম-বেশে ভিন্নরাজ্যে অগ্রসর হইলেন। জয়ন্ত নামক গৌড়রাজের অধিকার মধ্যে আসিয়া গুপ্তভাবে ক্রমে ক্রমে পৌণ্ড্রবর্দ্ধন নগরে প্রবেশ করিলেন। পুরবাসিবর্গের ঐশ্বর্য্য ও রাজধানীর সমৃদ্ধি দর্শনে অতিশয় আনন্দিত হইলেন। এখানে কার্ত্তিকেয়দেবের এক অপূর্ব্ব মন্দির ছিল। নৃত্য দেখিবার অভিপ্রায়ে জয়াদিত্য সেই মন্দিরে প্রবেশ করিলেন। নৃত্যগীতাদিশাস্ত্রেও তাঁহার অভিজ্ঞতা ছিল। তাঁহার তেজঃপুঞ্জ কলেবর দেখিয়া দর্শকমাত্রই চমৎকৃত হইলেন। দেবনর্ত্তকী কমলা জয়াপীড়ের অনুপমরূপ দেখিয়া তাঁহাকে রাজা বা রাজপুত্র বলিয়া মনে মনে স্থির করিয়া লইল এবং তাম্বূল দিয়া তাহার এক অন্তরঙ্গকে কাশ্মীররাজের নিকট পাঠাইয়া দিল। জয়াপীড় সহাস্যবদনে সেই তাম্বূল গ্রহণ করিলেন ও নৃত্য শেষ হইলে কমলার সহিত তাহার আলয়ে আসিলেন। কমলার আতিথেয়তায় কাশ্মীররাজ বড়ই আনন্দ-লাভ করিলেন। একদিন তিনি কথায় কথায় কমলার মুখে শুনিলেন যে, প্রতিদিন রাত্রি-

(১৬) রাজতরঙ্গিণী ৪।৪১৬-৪১৭।

কালে একটা দুর্দ্দান্ত সিংহ আসিয়া বহুলোকের প্রাণনাশ করিতেছে। মনুষ্য, হস্তী, ঘোটক কত মারিয়াছে, তাহার ইয়ত্তা নাই; তাই নগরবাসী সকলেই বিষম চিন্তাযুক্ত। মহাবীর জয়াদিত্যের একবার সেই সিংহটা দেখিবার ইচ্ছা হইল। পরদিন রাত্রিকালে তিনি একাকী গুপ্তভাবে বাহির হইলেন। কায়স্থবীর সম্মুখযুদ্ধে সেই সিংহকে নাশ করিলেন। পরদিন প্রাতঃকালে গৌড়াধিপ শুনিলেন যে, সেই ভীষণ সিংহ নিহত হইয়াছে। রাজা কৌতূহল-পরবশ হইয়া দেখিতে আসিলেন,—মৃত সিংহের দন্তমধ্য হইতে একটা কয়ূর পাইলেন। তাহার উপর লেখা ছিল, 'শ্রীজয়াপীড়'। এইরূপে গৌড়াধিপ জয়ন্ত সিংহ-হন্তার পরিচয় পাইলেন। জয়াপীড়ের নাম শুনিয়া সমস্ত নগর বিচলিত হইল। রাজা সকলকে শান্ত করিয়া জয়াপীড়ের অনুসন্ধানার্থ চারিদিকে চর পাঠাইলেন। কমলার গৃহে কাশ্মীর-রাজের সন্ধান হইল। তখন গৌড়াধিপ অমাত্য ও অন্তঃপুরবর্গে পরিবৃত হইয়া মহাজাঁকজমক করিয়া জয়াপীড়কে রাজভবনে আনিলেন। গৌড়াধিপের একমাত্র কন্যা কল্যাণদেবী। কল্যাণ-নিলয় কাশ্মীরপতি সম্মুখাগত রাজলক্ষ্মীর ন্যায় কল্যাণদেবীর পাণিগ্রহণ করিলেন। অবশেষে তিনি অন্য কোন সাহায্য ব্যতীত নিজ প্রভাবেই অবলীলাক্রমে পঞ্চগৌড়ের রাজগণকে পরাজয় করিয়া শ্বশুরকে তাঁহাদের অধীশ্বর করিলেন। মিত্রশর্ম্মার পুত্র দেবশর্ম্মা নামক তাঁহার অমাত্য প্রভু-পরিত্যক্ত সৈন্যগণকে লইয়া তাঁহার সহিত আসিয়া যোগ দিয়াছিলেন। অগ্রে জয়শ্রী, তৎপশ্চাৎ সুলোচনা কল্যাণদেবী ও কমলাকে তৎসঙ্গে লইয়া জয়াপীড় নিজ রাজ্যাভিমুখে প্রধাবিত হইলেন। পূর্ব্বে তিনি কান্যকুব্জরাজকে পরাজয় করিয়াছিলেন। গমনকালে পৌরুষ ও উদারতা প্রকাশপূর্ব্বক সেই রাজার রাজচিহ্ন সিংহাসন গ্রহণ করিলেন।[১৭]

(১৭) গৌড়ের ইতিহাসের সহিত এই অংশ বিশেষভাবে জড়িত বলিয়া কহ্লণের মূল শ্লোকগুলিও এখানে উদ্ধৃত হইল—

"স্বদেশাগমনানুজ্ঞাং সৈন্যস্যাপ্তমুখেন সঃ। দত্ত্বা নিশায়ামেকাকী নির্যযৌ কটকান্তরাৎ ॥
মণ্ডলেষু নরেন্দ্রাণাং পয়োদানামিবার্য্যমা। গৌড়রাজাশ্রয়ং গুপ্তং জয়ন্তাখ্যেন ভূভুজা ॥
প্রবিবেশ ক্রমেণাথ নগরং পৌণ্ড্রবর্দ্ধনম্। তস্মিন্ সৌরাজ্যরম্যাভিঃ প্রীতঃ পৌরবিভূতিভিঃ ॥
লাস্যং স দ্রষ্টুমবিশৎ কার্ত্তিকেয়নিকেতনম্। ভরতানুগমালক্ষ্য নৃত্যগীতাদিশাস্ত্রবিৎ ॥
ততো দেবগৃহদ্বারশিলামধ্যাস্ত স ক্ষণম্। তেজোবিশেষচকিতৈর্জনৈঃ পরিহৃতান্তিকম্ ॥
নর্ত্তকী কমলানাম কান্তিমন্তং দদর্শ তং। অসামান্যাকৃতেঃ পুংসঃ সা দদর্শ সবিস্ময়া ॥
অসংপৃষ্টেহপ্যধাবন্তং করং তস্যান্তরান্তরা। অচিন্তয়ত্ততো গূঢ়ং চরন্নেব ভবেদয়ং ॥
রাজা বা রাজপুত্রো বা লোকোত্তরকুলোদ্ভবঃ। এবং গ্রহীতুমভ্যাসঃ পৃষ্ঠস্থাঃ পর্ণবীটিকাঃ।
অংসপৃষ্ঠেন যেনায়ং লসৎপাণিঃ প্রতিক্ষণং ॥
লোলশ্রোত্রপুটো মদোৎকমধুপাপাতাত্যয়েহপি দ্বিপঃ সিংহঃসত্যপি পৃষ্ঠতঃ করিকুলে ব্যাবৃত্ত্য বিপ্রেক্ষিতা
মেঘৌন্মুখ্যশমেহপ্যশান্তবদনোদ্গীর্ণস্বরো বর্হিণশ্চেষ্টানাং বিরমেহত্র হেতুবিগমেহপ্যভ্যাসদীর্ঘাস্থিতিঃ ॥
ইত্যন্তশ্চিন্তয়ন্তী সা কৃত্বা সংক্রান্তসম্বিদম্। সখীমতিগ্রহৃদয়াং বিসসর্জ্জ তদন্তিকম্ ॥
প্রাবৎ পৃষ্ঠং গতে পাণৌ পূগখণ্ডাংস্তয়ার্পিতান্। বক্ত্রে ক্ষিপঞ্জয়াপীড়ঃ পরিবৃত্ত্য দদর্শ তাম্ ॥

কাশ্মীরে উপস্থিত হইয়া শুনিলেন যে, তাঁহার পূর্ব্ব শ্যালক যয্য তাঁহার রাজ্যাধিকার করিয়াছেন। উভয়ে যুদ্ধ উপস্থিত হইল। সেই যুদ্ধে পুষ্কলেত্র নামক গ্রামে যয্য নিহত হইলেন। মহিষী কল্যাণদেবী পুষ্কলেত্রের রণস্থলে কল্যাণপুর নামক নগর স্থাপন করেন। স্বয়ং জয়াপীড় মহ্লণপুর নামক নগর ও তন্মধ্যে কেশবমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করেন। কমলাও নিজ নামে কমলাপুর নগর স্থাপন করিয়াছিল। এই সময়ে কাশ্মীরে যথেষ্ট বিদ্যাচর্চ্চা ছিল। জয়াপীড় ক্ষীরস্বামী নামক পণ্ডিতের ব্যাকরণ অধ্যয়ন করেন। তাঁহারই যত্নে পতঞ্জলির মহাভাষ্য ও কাশিকাবৃত্তি প্রচারিত হয়। সুকবি দামোদরগুপ্ত তাঁহার প্রধান মন্ত্রী এবং কবি ও বৈয়াকরণ বামন তাঁহার অন্যতম মন্ত্রী ছিলেন। উদ্ভটভট্ট, মনোরথ, শঙ্খদত্ত, চটক ও সন্ধিমান প্রভৃতি কবিগণও তাঁহার সভা উজ্জ্বল করিতেন। জয়াপীড় পরে জয়পুর প্রভৃতি

ক্লান্তসংস্তৃতাসি কস্য ত্বং পৃষ্টায়া ইতি সুভ্রুবঃ। দদত্যা বীটিকাং তস্যা বৃত্তান্তমুপলব্ধবান্॥
তয়া জনিতদাক্ষিণ্যস্তৈস্তৈর্ম্মধুরভাষিতৈঃ। সখ্যাঃ সমাপ্তা নৃত্যায়া নিন্যে স বসতিং শনৈঃ॥
অগ্রাম্যপেশলালাপা তথা তং সা বিলাসিনী। উপাচরৎ পরার্ধ্যশ্রীঃ সোঽপ্যভূদ্বিস্মিতো যথা॥
ততঃ শশাঙ্কধবলে সম্প্রাপ্তে রজনীমুখে। পাণিনাদায় ভূপালং শয্যাবেশ্ম বিবেশ সা॥
ততঃ কাঞ্চনপর্য্যঙ্কশায়ী মৈরেয়মত্তয়া। তয়ার্থিতোঽপি শিথিলং বিদধে নাধরাংশুকম্॥
প্রবেশয়ন্নিব বৃহদ্বক্ষস্তাং সত্রপাং ততঃ। দীর্ঘবাহুঃ সমাশ্লিষ্য স শনৈরিদমব্রবীৎ॥
ন ত্বং পদ্মপলাশাক্ষি ন মে হৃদয়হারিণী। কিন্তু কালানুরোধোঽয়ং সাপরাধং করোতি মাম্॥
দাসত্বমায়ং কল্যাণি গুণৈঃ ক্রীতোঽস্ম্যকৃত্রিমৈঃ। অচিরাজ্জাতিবৃত্তান্তা ধ্রুবং দাক্ষিণ্যমেষ্যসি॥
কার্য্যশেষমনিষ্পাদ্য সজ্জং মানিনি কঞ্চন। অংভোগে কৃতসঙ্কল্পং সুখানাং ত্বমবেহি মাম্॥
তামেবমুক্ত্বা পর্য্যঙ্কং সাঙ্গুলীয়েন পাণিনা। বাদয়ন্নিব নিঃশঙ্কং শ্লোকমেতং পপাঠ সঃ॥
অসমাপ্তজিগীষস্য স্ত্রীচিন্তা কা মনস্বিনঃ। অনাক্রম্য জগৎসর্ব্বং নো সন্ধ্যাং ভজতে রবিঃ॥
শ্লোকেনাত্মগতং তেন পঠিতেন মহীভুজা। সা কলাকুশলাজ্ঞাসীন্মহান্তং কঞ্চিদেব তম্॥
গন্তুকামঞ্চ তং প্রাতর্নৃপং প্রণয়িনী বলাৎ। অর্থয়িত্বা চিরং কালমপ্রস্থানমযাচত॥
একদা বন্দিতুং সন্ধ্যাং প্রযাতঃ সরিতস্তটম্। চিরায়াতো গৃহং তস্যা দদর্শ ভূপবিহ্বলম্॥
কিমেতদিতি পৃষ্টাথ তমূচে সা শুচিস্মিতা। সিংহোঽত্র সুমহান্ রাত্রৌ নিপত্যাহন্তি দেহিনঃ॥
নরনাগাশ্বসংহারঃ কৃতস্তেন দিনে দিনে। ত্বয়া দূরং চিরায়াতে তদ্ভয়েন সমাকুলাঃ॥
রাজানো রাজপুত্রা বা তদ্ভয়েন বিশঙ্কিতাঃ। গৃহেভ্যো নাত্র নির্যান্তি প্রবৃত্তে ক্ষণদাক্ষণে॥
তামিতি ব্রুবতীং মুগ্ধাং নিষিধ্য চ বিহস্য চ। সব্রীড় ইব তাং রাত্রিং জয়াপীড়োঽত্যবাহয়ৎ॥
অপরেদ্যুর্দিনাপায়ে নির্গতো নগরান্তরাৎ। সিংহাগমপ্রতীক্ষোঽভূন্মহাবটতরোরধঃ॥
অদৃশ্যত ততো দূরাদুৎফুল্লবকুলচ্ছবিঃ। অট্টহাসঃ কৃতান্তস্য সকারীব মৃগাধিপঃ॥
অর্দ্ধনাদেন বাহুং তমথ মন্থরগামিনং। রাজসি হো মদন্ সিংহং সমাহ্বয়ত হেলয়া॥
শুদ্ধশ্রোত্রো ব্যাত্তবক্ত্রঃ কম্প্রকূর্চ্চঃ প্রদীপ্তদৃক্। তদগ্রপূর্ব্বকায়স্তং সগর্জ্জঃ সমুপাদ্রবৎ॥
তস্যাক্রন্তানবিলে কফোণিং পততঃ ক্রুধা। ক্ষিপ্রকারী জয়াপীড়ো বক্ষঃ ক্ষুরিকয়াভিনৎ॥
শোণিতং স্রবদঙ্কেভসিন্দূরাক্তং বিমুক্ততা। একপ্রহারভিন্নেন তেনাত্যাজত জীবিতং॥
আমুক্তব্রণপট্টঃ স কফোণিমথ গোপয়ন্। প্রবিশ্য নর্ত্তকীবেশ্ম নিশি সুষ্বাপ পূর্ব্ববৎ॥

আরও কয়েকটী নগর, জয়াদেবী নামে দেবী-প্রতিমা, রামলক্ষ্মণের মূর্ত্তি ও অনন্তশায়ী বিষ্ণুমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করেন। সুপ্রসিদ্ধ দ্বারাবতীপুরীর আদর্শে অভ্যন্তর-জয়পুর নামে নগর প্রতিষ্ঠাও তাঁহার আর একটী প্রধান কীর্ত্তি। এখানে জয়দত্ত নামে এক[illegible] কর্ম্মচারী একটী বৃহৎ বৌদ্ধমঠ এবং মথুরাপতি প্রমোদের জামাতা আচ আচেশ্বর ন[illegible] শিবলিঙ্গ স্থাপন করেন। তৎপরে জয়াদিত্য হিমালয় প্রদেশের বহুস্থান জয় করিয়াছিলেন[illegible] কর্ম্মপর্ব্বতে তিনি তাম্রখনি আবিষ্কার করেন এবং সেই তাম্র তুলিয়া লইয়া তাহার মূল্য হ[illegible] একোনশতকোটী স্বর্ণমুদ্রা স্বনামে প্রচার করেন। তাঁহার মুদ্রায় 'শ্রীবিনয়াদিত্য' এইরূপ [illegible] উৎকীর্ণ আছে। অবশেষে তিনি ব্রহ্মশাপে মৃত্যুমুখে পতিত হন। তাঁহার জননী অমৃতপ্রভা পুত্রের সদ্গতির জন্য অমৃত-কেশব নামে হরিমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করেন। জয়াপীড়ের পর তৎপুত্র ললিতাপীড় মহিষী দুর্গার যত্নে সিংহাসন লাভ করেন। তিনি অতিশয় কামাসক্ত ছিলেন, ব্রাহ্মণগণের নিকট হইতে সুবর্ণপার্শ্ব, ফলপুর ও লোচনোৎস নামক স্থানত্রয় কাড়িয়া লয়েন। তাঁহার রাজত্বকাল দ্বাদশ বর্ষ মাত্র।

ললিতাপীড়ের পর তাহার বৈমাত্রেয় গৌড়-রাজকুমারী কল্যাণদেবীর গর্ভজাত—(২য়) পৃথিব্যাপীড় নাম গ্রহণপূর্ব্বক করতঃ ৭ বৎসর রাজত্ব করেন। তৎপরে ললিতাপীড়ের শিশুপুত্র বৃহস্পতি ওরফে চিপ্পট-জয়পীড় রাজা হইলেন। বৃহস্পতির মাতা জয়াদেবী অখুববাসী কল্প-পালের কন্যা।

পাঃ

প্রভাতায়াং বিভাবর্য্যাং শ্রুত্বা সিংহং হতং নৃপঃ। প্রহৃষ্টঃ কৌতুকাদ্ দ্রষ্টুং জয়ন্তো নির্যযৌ স্বয়ম্॥
স দৃষ্ট্বা তং মহাকায়মেকপ্রকৃতিসংহৃতং। সাশ্চর্য্যো নিশ্চয়াম্মেনে প্রহর্ত্তারমমানুষম্॥
তস্য দণ্ডান্তরালব্ধং কেয়ূরং পার্শ্বগার্পিতং। শ্রীজয়াপীড়নামাঙ্কং দদর্শাথ সবিস্ময়ঃ॥
স্যাৎ কুতোঽত্র স ভূপাল ইতি ব্রুবতি পার্থিবে। জয়াপীড়াগমাশঙ্কি পুরমাসীদ্ভয়াকুলম্॥
ততঃ পৌরান্ বিমৃষ্যৈব জয়ন্তঃ ক্ষিতিপোঽব্রবীৎ। প্রহর্ষাবসরে মূঢ়াঃ কস্মাদ্বো ভয়সম্ভবঃ॥
শ্রূয়তে হি জয়াপীড়ো রাজা ভুজবলোর্জ্জিতঃ॥ কেনাপি হেতুনা ভ্রাম্যন্নেকাক্যেব দিগন্তরে॥
রাজপুত্রঃ কল্লট ইত্যুক্ত্বা কল্যাণদেব্যসৌ। তস্মৈ নিয়মিতা দাতুং নিষ্পুত্রেণ সতা ময়া॥
সোঽন্বেষ্যশ্চেৎ স্বয়ং প্রাপ্তস্তত্রত্যাহরণেচ্ছয়া। রত্নদীপং প্রতিষ্ঠামো নিধানা সাদনং গৃহাৎ॥
অস্মিন্নেব পুরে তেন ভাব্যং ভুবনশাসিনা। ক্রয়াদেনং সমান্বিষ্য যোঽস্মৈ দদ্যামভীপ্সিতং॥
বাচি স প্রত্যয়াঃ পৌরা ভূপতেঃ সত্যবাদিনঃ। অন্বিষ্য কমলাবাসবর্ত্তিনং তং ন্যবেদয়ন্॥
সামাত্যস্তঃপুরোঽভ্যেত্য প্রযত্নেন প্রসাদ্য তম্। ততঃ স্ববেশ্ম নৃপতির্নিণায় বিহিতোৎসবঃ॥
কল্যাণদেব্যাস্তেনাথ কল্যাণাভিনিবেশিনা। রাজলক্ষ্ম্যা ব্যপাত্রায়া ইব সোঽগ্রিগ্রহৎ করম্॥
ব্যধাদ্বিনাপি সামগ্রীং তত্র শক্তিং প্রকাশয়ন্। পঞ্চগৌড়াধিপান্ জিত্বা শ্বশুরং তদধীশ্বরম্॥
গতশেষং প্রভুত্যক্তং সৈন্যং সংবাহয়ন্ স্থিতঃ। মিত্রশর্ম্মাত্মজো দেব-শর্ম্মামাত্যস্তমাযযৌ॥
নিজদেশং প্রতি ততঃ স প্রতস্থে তদর্পিতঃ। অগ্রে জয়শ্রিয়ং কুর্ব্বন্ পশ্চাত্তেঽথ সুলোচনে।
সিংহাসনং জিতাদাদৌ কান্যকুব্জমহীভুজঃ। স রাজ্যককুদং রাজা জহারোদারপৌরুষঃ॥"

(রাজতরঙ্গিণী ৪।৪১২—৪৭(০

কিরূপে বাস করিব? তখন রাজা আদিশূর কান্যকুব্জ হইতে বেদবিদ্ সাগ্নিক ব্রাহ্মণ আনিয়া রাণীর ক্রোধ শান্তি করিলেন।”[১২]

আবার সুপ্রসিদ্ধ রাঢ়ীয় কুলাচার্য্য বংশীবদন-বিদ্যারত্ন-সংগৃহীত কুলপঞ্জিকায় দেখা যায়, “গৌড়াধিপ আদিশূরের অগ্নিহোত্র যজ্ঞ করিতে ইচ্ছা হইল, তিনি একদিন সভাস্থলে মন্ত্রী, পুরোহিত প্রভৃতিকে সম্বোধন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, আমি ক্ষত্রকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছি, ব্রতযজ্ঞাদি কিছুই করি নাই, এখন আমি অগ্নিহোত্র যজ্ঞ করিব, কোথায় বেদপারগ সাগ্নিক বিপ্রগণ অবস্থান করেন, তাহা আমার জানিতে ইচ্ছা হইয়াছে, অনুগ্রহপূর্ব্বক বলুন। এক ব্রাহ্মণ কহিলেন, কান্যকুব্জে বেদপারগ সাগ্নিক ব্রাহ্মণগণ অবস্থান করেন, তথা হইতে পাঁচজন ব্রাহ্মণ আনিয়া যজ্ঞ করুন।”[১৩]

কুলগ্রন্থে আদিশূর সম্বন্ধে যেরূপ পরিচয় বর্ণিত হইয়াছে, তাহা মোটামুটি লিখিলাম[১৪]। এ সকল উপাখ্যান প্রবাদমূলক বলিয়া গণ্য হইতে পারে, কিন্তু ঐতিহাসিকের নিকট ঐ সকল কথা কতদূর মূল্যবান্ বলিয়া গণ্য হইবে, সে বিচারভার ঐতিহাসিকগণের উপরই অর্পিত হইল, তবে এইমাত্র বলিতে পারি, ঐ সকল কুলগ্রন্থবর্ণিত কিংবদন্তীর মূলে কতক কতক প্রকৃত কাহিনী নিহিত আছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। ঐ সকল কুলবিবরণ বহু পূর্ব্বতন ঘটনার দূরশ্রুত প্রতিধ্বনি বলিয়া মনে করিতে পারি। এখন প্রকৃত ইতিহাসের অনুসরণ করিয়া দেখা যাউক, ঐ সকল কুলকাহিনীর সহিত ইতিহাসের কতটা সামঞ্জস্য আছে।

(১২) “নাম্না চন্দ্রমুখী নৃপেন্দ্রতিলকশ্রীচন্দ্রকেতোঃ পুরা সৎপুণ্যাশ্রয়কান্যকুব্জবসতেঃ কন্যা চ পুণ্যার্থিনী।
পত্নী গাঢ়তমপ্রতাপনিবহখ্যাতাদিশূরস্য চ ক্ষৌণীন্দ্রস্য বভূব সাপি চতুরা চান্দ্রায়ণাচারিণী॥
তস্মাদাবগতঃ কশ্চিদ্ব্রাহ্মণঃ স্বর্ণকৌশিকঃ। ততঃ সমাহূতস্তত্র বিপ্রো রজতকৌশিকঃ॥
কৌণ্ডিন্যঃকৌশিকঃ পশ্চাৎ ঘৃতকৌশিককৌশিকৌ। এতে পঞ্চ সমায়াতাঃ পঞ্চগোত্রধরামরাঃ॥
চন্দ্রমুখী উবাচ—পারত বেদং পূরয়তেদং মদ্‌ব্রতমগ্নিং জ্বালয়ত।
বরুণাবাহনপূর্ব্বকং কুম্ভীগতো কুরুতাবনীদেবাঃ॥
বিপ্রা উচুঃ—বয়ং নৈব জানীমহে বেদানীমিদং বিজ্ঞাস্তোস্তবো ন শ্রুতোহগ্নিঃ।
এতচ্ছ্রুত্বা নরপতিযোষা বচনমবোচৎ বহুতরয়োষা।
ব্রাহ্মণহীনে দেশে বাসো কিমিহ করিষ্যে পিতুরভিলাষঃ॥”
(গৌড়ে-ব্রাহ্মণধৃত বারেন্দ্রকুলপঞ্জিকা)

(১৩) “অহং ক্ষত্রকুলে জাতো ন কুর্য্যাং ব্রতযজ্ঞকং।
অগ্নিহোত্রীয়যজ্ঞঞ্চ করিষ্যামি দ্বিজোত্তম॥
কুত্র কুত্র স্থিতা বিপ্রা বেদপারগসাগ্নিকাঃ।
বিপ্র উবাচ—কান্যকুব্জস্থিতা বিপ্রাঃ সাগ্নিকা বেদপারগাঃ।
তস্মাৎ পঞ্চ সমানীয় যজ্ঞনিষ্পন্নতাং কুরু॥”
(৺বংশীবদন-ঘটক-সংগৃহীত রাঢ়ীয়-কুলকারিকা)

(১৪) এইরূপ আরও অনেক কুলকথা প্রচলিত আছে, কিন্তু সেই সকল রচনা নিতান্ত আধুনিক বলিয়া এ স্থলে আর উদ্ধৃত করা হইল না।

রাঢ়ীয়-কুলপঞ্জিকা হইতে একটী বিশেষ কথা জানিতে পারি, শ্রীজয়ন্ত-পুত্র রাজা ভূশূর বিভিন্ন স্থানের নামানুসারে রাঢ়ীয়, বারেন্দ্র ও সাতশতী এই শ্রেণীবিভাগ করিয়াছিলেন।[১৫]

রাঢ়ীয় ও বারেন্দ্র উভয় কুলগ্রন্থেই ভূশূর আদিশূরের পুত্র বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন।[১৬] এরূপস্থলে জয়ন্ত ও আদিশূর এক ও অভিন্নব্যক্তি অথবা জয়ন্ত নামক কোন নৃপতির 'আদিশূর' উপাধি ছিল, ইহাই প্রতিপন্ন হইতেছে। কহ্লণ-পণ্ডিত-বিরচিত রাজতরঙ্গিণী নামক কাশ্মীরের সুপ্রসিদ্ধ ইতিহাসে "জয়ন্ত" নামক এক রাজার উল্লেখ আছে। ঐতিহাসিকের নিকট তাঁহার বিবরণ অতীব মূল্যবান্ বলিয়া গৃহীত হইতে পারে, এজন্য পূর্ব্ব অধ্যায়ে কাশ্মীরের কায়স্থ-রাজপ্রসঙ্গে জয়াদিত্যের ইতিবৃত্তে তাঁহার পরিচয় বর্ণিত হইয়াছে। কাশ্মীরপতি জয়াপীড় প্রায় ৭৭২ খৃঃ অব্দে সিংহাসন লাভ করেন। সেই বর্ষেই তিনি কান্যকুব্জ প্রভৃতি জয় করিয়া যে ভাবে গৌড়ে আগমন করেন, সে কথাও পূর্ব্বে লিখিয়াছি। তৎকালে জয়ন্ত নামে একজন গৌড়রাজ ছিলেন, পৌণ্ড্রবর্দ্ধনে তাঁহার রাজধানী ছিল। তাঁহার রাজধানী সমৃদ্ধিশালিনী হইলেও তিনি একজন সামান্য রাজা বলিয়াই প্রথমে গণ্য ছিলেন। তাঁহার জামাতা কাশ্মীরাধিপতি জয়াদিত্যের কৌশলপ্রভাবে তিনি পঞ্চগৌড়ের অধীশ্বর হইয়াছিলেন।[১৭]

সারস্বত, কান্যকুব্জ, গৌড়, মৈথিল ও উৎকলদিগের বাসভূমিই পঞ্চগৌড়।[১৮] এরূপস্থলে কান্যকুব্জও গৌড়াধিপের অধিকারভুক্ত হইয়াছিল। খুব সম্ভব, তিনিই শূরবংশমধ্যে প্রথম পঞ্চগৌড়ের অধীশ্বর হইয়াছিলেন বলিয়া পরবর্ত্তীকালে 'আদিশূর' নামেই প্রসিদ্ধ হইয়াছিলেন। যেমন মল্লভূম-বিষ্ণুপুরের মল্লবংশীয় আদি নৃপতি 'আদিমল্ল' নামে পরিচিত, ময়ূরভঞ্জের ভঞ্জবংশীয় প্রথম নৃপতি আদিভঞ্জ এবং বরাহভূমের বরাহবংশীয় প্রথম নৃপতি আদিবরাহ নামে পরিচিত, অথচ তাঁহাদের প্রকৃত নাম সাধারণে বিস্মৃত হইয়াছেন, সেইরূপ আদিশূরের প্রকৃত নামটী একপ্রকার সকলেই ভুলিয়া গিয়াছেন; তাঁহার আদিশূর উপাধিটীই এখন চলিয়া আসিতেছে। যাহা হউক, রাঢ়ীয়-কুলমঞ্জরীর একমাত্র শ্লোক ও রাজতরঙ্গিণীর সাহায্যে তমসাবৃত প্রাচীন গৌড়ীয় ইতিহাসের 'আদিশূর' উপাধিধারী প্রকৃত জয়ন্ত রাজার সন্ধান পাওয়া গিয়াছে।[১৯] গৌড়াধিপ জয়ন্ত ও তাঁহার জামাতা জয়াদিত্যকর্ত্তৃক কান্যকুব্জ-আক্রমণ

(১৫) "ভূশূরেণ চ রাজ্ঞাপি শ্রীজয়ন্তসুতেন চ।
নাম্নাপি দেশভেদৈস্তু রাঢ়ী বারেন্দ্র সাতশতী ॥" (রাঢ়ীয় কুলমঞ্জরী)

(১৬) গৌড়ে ব্রাহ্মণ, ৪১ পৃষ্ঠার ৪ পাদটীকা। (১৭) ৮৫-৮৬ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

(১৮) "সারস্বতাঃ কান্যকুব্জাঃ গৌড়া মৈথিলিকোৎকলাঃ।
পঞ্চগৌড়া ইতি খ্যাতাঃ বিন্ধ্যস্যোত্তরবাসিনঃ ॥" (স্কন্দপুরাণ)

(১৯) আদিশূর ও জয়ন্তের অভিন্নত্ব সম্বন্ধে কেহ কেহ সন্দিহান। কেহ আবার এমনও বলিতে চান—"যতদিন না সমসাময়িক লিপিতে বা সাহিত্যে জয়ন্তের নামোল্লেখ দৃষ্ট হয়, ততদিন জয়ন্ত প্রকৃত ব্যক্তি, কিম্বা জয়াপীড়ের অজ্ঞাতবাস উপন্যাসের উপনায়ক মাত্র, তাহা বলা কঠিন।" (গৌড়রাজমালা ১৮ পৃষ্ঠা) কিন্তু আমরা

পরবর্ত্তী ভাটদিগের মুখে নানাবর্ণে অতিরঞ্জিত হইয়া আধুনিক কুলকারিকায় বিভিন্নমূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে।

কহ্লণের বর্ণনা হইতে স্পষ্টই জানা যাইতেছে, কাশ্মীরাধিপ শক্তিপ্রকাশ না করিয়া কেবল কৌশল দ্বারাই পঞ্চগৌড়ের রাজন্যবর্গকে পরাস্ত করিয়া শ্বশুর জয়ন্তকে তাঁহাদিগের অধীশ্বর

বলি, যদি জয়াপীড়ের পূর্ব্ব ইতিহাস প্রকৃত ঘটনা হয়, তাহা হইলে তাহার এক অংশের প্রামাণ্য ও অপর অংশের অপ্রামাণ্য কিরূপে স্বীকার ক[illegible] কবি কহ্লণের বর্ণনায় কতকটা অত্যুক্তি থাকিতে পারে। কিন্তু যখন রাজতরঙ্গিণী হইতেই আমরা পাইতে[illegible] যে, কল্যাণদেবীর পুত্র কিছুদিন কাশ্মীরের সিংহাসন অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন, তখন জয়াপীড়ের পৌণ্ড্রবর্দ্ধনে আগমন ও গৌড়াধিপ জয়ন্তের কন্যা কল্যাণদেবীর পাণিগ্রহণ কখনই কবিকল্পনা বলিয়া গ্রহণ করা সঙ্গত হয় না।

বর্ত্তমান ঐতিহাসিকগণ সকলেই ঘোষণা করিয়াছেন যে, কর্কোটবংশ হইতেই কাশ্মীরের প্রকৃত ইতিহাস আরম্ভ—"The authentic chronicles of the kingdom begin with the Karkota dynasty, which was founded by Durlabha-vardhana during Harsha's lifetime," (Vincent A. Smith's Early History of India p. 343.) রাজতরঙ্গিণীর প্রসিদ্ধ অনুবাদক ষ্টেইন্ সাহেবও রাজতরঙ্গিণী-সমালোচনা করিয়া লিখিয়াছেন—"As Kalhana's succession list of the Karkota may be accepted on the whole as quite historical, we may attach credit also to the traditional record regarding the immediately preceding rulers."

(Dr. Steins' Intro. to th[illegible]jatarangini, Vol. I. p. 87.)

এরূপস্থলে গৌড়াধিপ জয়ন্তের অস্তিত্বসম্বন্ধে কোন সন্দেহই আসিতে পারে না। তার পর গৌড়রাজমালাপ্রণেতা বলিতে চান যে "কহ্লণ বহুবচনান্ত 'পঞ্চ গৌড়াধিপান্' [গৌড়ের পাঁচজন নৃপতির] উল্লেখ করিয়াছেন, একবচনান্ত 'পঞ্চগৌড়াধিপম্' লিখিয়া যান নাই।" (গৌড়রাজমালা ১৮ পৃষ্ঠার পাদটীকা) আমরা কোন স্থানে লিখি নাই যে, কহ্লণ জয়ন্তকে 'পঞ্চগৌড়াধিপ' বলিয়াছেন। হরিমিশ্রের প্রসিদ্ধ কুলকারিকায় আদিশূর 'পঞ্চগৌড়াধিপ' বলিয়া অভিহিত হইয়াছেন। এক গৌড় বা পৌণ্ড্রবর্দ্ধন রাজ্যে যে এক সময়ে ৫ জন রাজা ছিলেন, এ কথা কহ্লণ কোথাও লিখিয়া যান নাই। 'পঞ্চগৌড়ের অধিপগণকে পরাজয় করিয়া শ্বশুরকে তাঁহাদের অধীশ্বর করিয়াছিলেন।' ইহাই কহ্লণের উক্তির প্রকৃত অনুবাদ। হরিমিশ্রের কারিকা মহারাজ দনৌজমাধবের সভায় প্রায় ৫৫০ বর্ষ পূর্ব্বে রচিত হয়। ইহার উক্তি এককালে উড়াইয়া দেওয়া যায় না। ব্রাহ্মণডাঙ্গানিবাসী বংশীবদন-বিদ্যারত্ন ঘটক মহাশয়-সংগৃহীত বহুসংখ্যক কুলগ্রন্থের কথা রাঢ়ীয় শ্রেণির ব্রাহ্মণ ঘটক ও কুলীন ব্রাহ্মণমাত্রেই অবগত আছেন। ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে অর্থাৎ ২৮ বর্ষ পূর্ব্বে গৌড়ে-ব্রাহ্মণ-রচয়িতা ৺মহিমচন্দ্র মজুমদার মহাশয় উক্ত বিদ্যারত্ন মহাশয়ের বহু কুলগ্রন্থের উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার গ্রন্থে বিদ্যারত্ন মহাশয়ের নাম পাইয়াই আজ পঞ্চদশ বর্ষের অধিক হইল আমরা ব্রাহ্মণডাঙ্গায় উক্ত ঘটক মহাশয়ের গৃহে উপস্থিত হইয়াছিলাম। তৎকালে তাঁহার বৃদ্ধা কন্যা আমাদিগকে তাঁহার সংগৃহীত কুলগ্রন্থ দেখিতে দিয়াছিলেন,—এরূপ বহুসংখ্যক কুলগ্রন্থ আমি আর কোথাও দেখি নাই। বৃদ্ধা যক্ষের ধনের ন্যায় সে গুলি রক্ষা করিতেছিলেন, মূল গ্রন্থগুলি গৃহের বাহির করিবার কাহারও শক্তি ছিল না। বহুকষ্টে কএকখানি কুলগ্রন্থ স্বহস্তে নকল করিয়া আনিয়াছি। মূল গ্রন্থগুলি সেই গৃহেই রক্ষিত আছে। তন্মধ্যে 'রাঢ়ীয় কুলমঞ্জরী' নামক প্রায় দুই শত বর্ষের হস্তলিখিত পুথিতে শ্রেণিবিভাগপ্রসঙ্গে বর্ণিত হইয়াছে—

"ভূশূরেণ চ রাজ্ঞাপি শ্রীজয়ন্তসুতেন চ।
নাম্নাপি দেশভেদৈস্তু রাঢ়ীবারেন্দ্রসাতশতী॥"

করিয়াছিলেন।[২০] বিভিন্ন রাজপ্রভাবে গৌড়াধিপের যে অভ্যুদয় ঘটিয়াছে, সে কথা দেশীয় কুলাচার্য্য বা ভাটবৃন্দ কেহই বর্ণনা করেন নাই। হরিমিশ্র ও বাচস্পতি মিশ্রের প্রাচীন কারিকা হইতে জানা যায় যে, আদিশূর নিজ ভুজবলে পঞ্চগৌড়ের অধিপতি হইয়াছিলেন এবং অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, কর্ণাট, কর্ণসুবর্ণ, কামরূপ, সৌরাষ্ট্র,. মগধ, মালব ও জাহ্নব পর্য্যন্ত জয় করিয়াছিলেন। বিভিন্ন রাজ্য-জয়কালে তাঁহার জামাতা জয়াপীড় কোন কোন স্থলে হয়ত তাঁহার সেনাপরিচালনা করিয়াছিলেন, কাশ্মীর-ঐতিহাসিক কহ্লণ নিজ দেশের অধিপতিকে বাড়াইবার জন্য তৎকর্ত্তৃক পঞ্চগৌড়ের অধিপ[তি]গণের পরাজয় ও তাঁহার শ্বশুর গৌড়াধিপের অধীশ্বরপদলাভের কথা লিখিয়া থাকিবেন।

যাহা হউক, এখন উদ্ধৃত প্রমাণ হইতে বেশ বুঝিতেছি যে, ৭৩২ খৃষ্টাব্দে আদিশূরের রাজ্যাভিষেক এবং ৭৭২ বা ৭৭৩ খৃষ্টাব্দে অধীশ্বরত্বলাভ। বাচস্পতিমিশ্রের কুলরামে লিখিত আছে যে, আদিশূরের সময় যিনি কান্যকুব্জের রাজা ছিলেন, তাঁহার নাম বীরসিংহ। কিন্তু উত্তররাঢ়ীয়কায়স্থকুলগ্রন্থ, রাজতরঙ্গিণী এবং সেই সময়ের গৌড়বধ ও কর্পূরমঞ্জরী প্রভৃতি কাব্য ও নাটকাদি আলোচনা করিলে জানা যায় যে, তৎকালে যশোবর্ম্মা-কমলায়ুধ ও বজ্রায়ুধ নামে দুইজন প্রবল পরাক্রান্ত নৃপতি কান্যকুব্জের সিংহাসন অলঙ্কৃত করিতেছিলেন। রাজতরঙ্গিণীতে অতি সামান্যভাবে বর্ণিত হইলেও মহাকবি বাক্‌পতি কর্ত্তৃক প্রাকৃত ভাষায় বিরচিত 'গউড়বহো' বা 'গৌড়বধ' নামক কাব্যে যশোবর্ম্মার শৌর্য্যবীর্য্য ও কীর্ত্তিকলাপের পরিচয় উজ্জ্বল ভাষায় বর্ণিত হইয়াছে। কবি বাক্‌পতি স্বয়ং তাঁহার সভা উজ্জ্বল করিয়াছিলেন, সুতরাং বাক্‌পতির কবিতানিচয় সাময়িক ঘটনাপ্রসূত বলিয়া পরবর্ত্তী প্রবাদমূলক কুলবিবরণ অপেক্ষা সমধিক আদৃত ও প্রামাণিক বলিয়া গৃহীত হইয়া থাকে।

এতদ্ভিন্ন উক্ত ঘটক মহাশয়ের সংগৃহীত 'রাঢ়ীয়-কুলপঞ্জী' নামক একখানি পুথিতে 'ভূশূরেণ চ রাজ্ঞাপি আদিশূর-সুতেন চ' এইরূপ পাঠ দেখিয়াছি, ইহাই পাঠান্তর বলিয়া গ্রহণ করিয়াছি। (জাতীয় ইতিহাস, ব্রাহ্মণকাণ্ড, ১মাংশ, ১১৪ পৃঃ) যে রাঢ়ীয় কুলমঞ্জরীতে ভূশূর শ্রীজয়ন্তসুত বলিয়া পরিচিত, সেই কুলমঞ্জরীর অন্যত্র শূররাজবংশ সম্বন্ধে এইরূপ শ্লোক দৃষ্ট হয়—

"আদিশূরো ভূশূরশ্চ ক্ষিতিশূরোঽবনীশূরঃ।
ধরণীশূরকশ্চাপি ধরাশূরোঽনুশূরকঃ।
এতে সপ্তশূরাঃ প্রোক্তাঃ ক্রমশঃ সুতবর্ণিতাঃ॥
বেদবাণাঙ্গশাকে তু নৃপোঽভূচ্চাদিশূরকঃ।
বসুকর্ম্মাঙ্গকে শাকে গৌড়ে বিপ্রাঃ সমাগতাঃ॥" (রাঢ়ীয়-কুলমঞ্জরী)

এই রাঢ়ীয় কুলমঞ্জরীর প্রমাণেও জয়ন্ত ও আদিশূর অভিন্ন ব্যক্তি হইতেছেন। আদিশূর ব্যক্তিবিশেষের নাম নহে, উহা উপাধি, তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি।

(২০) "কথাবিনাপি সামগ্রীং তত্র শক্তিং প্রকাশয়ন্।
পঞ্চগৌড়াধিপান্ জিত্বা শ্বশুরং অধীশ্বরম্॥" (রাজতরঙ্গিণী

চন্দ্রবংশ-কুলভূষণ কনোজাধিপ যশোবর্ম্মার খ্যাতি ইতিহাসে অবিদিত নাই। তাঁহার বীরত্ব, দয়া, ধর্ম্ম, প্রজাবাৎসল্য প্রভৃতি সদ্‌গুণাবলী এক দিন তাঁহাকে হিন্দুসমাজে শীর্ষস্থানীয় করিয়াছিল। রাজকবি বাক্‌পতি লালিত্যময়ী কাব্যলহরীতে তাঁহার গুণগাথা প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। বাক্‌পতিরচিত 'গউড়বহো' কাব্য রাজা যশোবর্ম্মার গৌড়বিজয় ও গৌড়পতিবধপ্রসঙ্গে রচিত হইয়াছিল। প্রবল পরাক্রান্ত গৌড়রাজের পরাজয় মানসে রাজা যশোবর্ম্মা স্বীয় বাহিনী লইয়া উত্তরবঙ্গাভিমুখে যাত্রা করেন। কান্যকুব্জপতি কথন ইন্দ্রের সমতুল্যপ্রভাবশালী বলিয়া পরিকীর্ত্তিত। তিনিই যেন বালক-হরিরূপে[২১] মহা প্রলয়াক্রান্ত সৃষ্টির রক্ষাবিধান সময়ে পুত্রনির্ব্বিশেষে রাজ্যপালন করিতেছেন। কারণ তাঁহার বীরত্বপ্রভাব অপ্রতিহত থাকায়, তাঁহার প্রজাবর্গকে কখনও বিপক্ষের নিগ্রহ সহ্য করিতে হয় নাই, একমাত্র তাঁহার প্রতাপই তাঁহার ধরিত্রী শাসন ও পালন অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছে। বিজিত অরাতিবৃন্দের বাপীনীরে জলক্রীড়া এবং রণশয্যাশায়ী শত্রুসেনাসমূহের কুলকামিনীগণের বৈধব্য ঘটনা তাঁহার বীরত্বকাহিনীর উৎকৃষ্ট পরিচয়স্থল।

কনোজপতি যশোবর্ম্মার পরিচয়

রাজা যশোবর্ম্মার 'গৌড়বিজয়যাত্রা' পাঠ করিলে আমাদের মহাকবি কালিদাসের রঘুবংশে অজরাজের দিগ্বিজয়-যাত্রা মনে পড়ে। রাজা গজাশ্বরথবাহিনী সমাকুল হইয়া ইন্দ্রকে লাঞ্ছনাপূর্ব্বক অভীষ্টপথে গমন করিতেছেন। পুরাঙ্গনাগণ গবাক্ষকক্ষে সমাসীন হইয়া জয়োল্লাসে আত্মহারা হইয়া গিয়াছেন। শারদীয় শোভাসঙ্কুল বনভূমির অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য সন্দর্শন করিতে করিতে তিনি শোণনদের উপত্যকাভূমে আসিয়া সমুপস্থিত হইলেন। এখান হইতে রাজা সদলে বিন্ধ্যপর্ব্বতে আসিয়া বিন্ধ্যবাসিনী (কালী) দেবীর পূজা ও অর্চ্চনা করিলেন। এইরূপে নানাস্থান অতিক্রম করিতে করিতে ক্রমে হেমন্ত, শীত ও বসন্তকাল অতিবাহিত হইল। গ্রীষ্মের প্রখর কিরণজালে দাবদগ্ধ বনরাজির ন্যায় তাঁহার তাপক্লিষ্ট সেনামণ্ডলী অশেষবিধ কষ্ট সহ্য করিতে করিতে বর্ষার শীতল কোমল বারিধারা অঙ্গে মাখিয়া গৌড়রাজ্যে উপনীত হইল। তাঁহার আগমনে ভীত হইয়া গৌড়ীয় সামন্ত ও সেনানীবর্গ পলায়ন করিলেন, কিন্তু কাপুরুষের ন্যায় পৃষ্ঠপ্রদর্শন নিতান্ত হেয় বলিয়া তাঁহারা পুনরায় কনোজাধিপতির সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। গৌড়ীয়সেনার শোণিতে রণক্ষেত্র রক্তপ্লাবিত হইয়াছিল। পলায়নপর গৌড়-মগধাধিপ বিজেতা যশোবর্ম্মা কর্ত্তৃক ধৃত ও নিহত হইলেন। অতঃপর কনোজাধিপ সমুদ্রোপকূলের বনশোভা সন্দর্শনপূর্ব্বক বঙ্গেশ্বরকে পরাভব ও বশীভূত করিয়া মলয়পর্ব্বত (সহ্যাদ্রির দক্ষিণ) সন্নিধানে দাক্ষিণাত্যপতিকে পরাজয় করেন। এই

(২১) চচ্‌নামায় 'হর্‌চন্দর্‌' নামে এক রাজার উল্লেখ আছে, কোন কোন ঐতিহাসিক তাঁহাকেই যশোবর্ম্মার পূর্ব্ববর্ত্তী কনোজপতি বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। (Vincent A. Smith's Early History of India, 2nd ed. p. 347.) কিন্তু বাক্‌পতির হরিরূপী যশোবর্ম্মাই যদি মুসলমান ঐতিহাসিক কর্ত্তৃক হর্‌চন্দর বলিয়া উক্ত হইয়া থাকেন, তাহা হইলে যশোবর্ম্মাকে হর্‌চন্দরের উত্তরাধিকারী বলিতে সন্দেহ হয়।

স্থানে সমুদ্রতীর পরিদর্শন করিয়া তিনি পারসিকজাতিকে যুদ্ধে বিপর্যস্ত এবং পশ্চিমঘাট পর্ব্বতের পশ্চিমবাসী প্রত্যেক দেশবাসীর নিকট হইতে কর সংগ্রহ করিয়াছিলেন।

জয়োল্লাসে দৃপ্ত রাজা যশোবর্ম্মা ক্রমে নর্ম্মদাতীরে আসিয়া সমুপস্থিত হইলেন। রাজা কার্ত্তবীর্য্যের পবিত্রকীর্ত্তি ও নদীমাহাত্ম্য স্মরণ করিয়া কয়েকদিন তিনি এস্থানে অবস্থান করেন। পরে সমুদ্রতীরে নির্ম্মলবায়ু সেবনপূর্ব্বক রণক্লেশ অপনোদনের জন্য কিছুকাল তথায় অতিবাহিত করিলেন, অতঃপর সদলে মরুদেশ (মারবাড়) ও শ্রীকণ্ঠ (থানেশ্বর) অভিমুখে অগ্রসর হইলেন। থানেশ্বরে জন্মেজয়ের 'সর্পসত্রের' কথা স্মরণ করিয়া তিনি সেই পবিত্রক্ষেত্রে কএক দিন যাপন করিয়াছিলেন, তদনন্তর কুরুক্ষেত্রে জলক্রীড়া সমাপন করিয়া ভারতীয় যুদ্ধের খ্যাতনামা যোদ্ধা কর্ণের রণক্ষেত্র-সন্দর্শনে আগমন করেন। কুরুপাণ্ডবগণের সেই লীলাক্ষেত্র হইতে ক্রমে রাজা যশোবর্ম্মা অযোধ্যানগরীতে আসিয়া উপনীত হইলেন। এখানে তিনি এক দিনে একটী সুরপ্রাসাদ (মন্দির) নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। অতঃপর মন্দরপর্ব্বতবাসী জনগণকে পরাভব করিবার মানসে যাত্রা করেন। মন্দরবাসী তাঁহার বশ্যতা স্বীকার করিলে তিনি স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হৃদয়ে যক্ষেশ্বরের বিলাসভূমি হিমালয়প্রদেশে গমন করিলেন। এইরূপে রাজ্যবিজয়বাসনা সমাপন করিয়া রাজ্যেশ্বর যশোবর্ম্মা স্বরাজ্যে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। রাজভবনে আনন্দ উৎস ছুটিল। রাজা অধীনস্থ সামন্ত ও সমভিব্যাহারী বিজিত রাজন্যগণকে সোৎসুকে বিদায় দিলেন। গৌড়বিজয়ের পর তিনি যে সকল রূপমাধুর্য্যময়ী মাগধ-রাজকুল-ললনাকে বন্দিনীরূপে আনিয়াছিলেন, ক্রীতদাসীর ন্যায় সেই সকল রাজকুলবধূ কনোজ-রাজদরবারে সর্ব্বসমক্ষে তাঁহার রাজশ্রীমণ্ডিত বরবপুতে চামর ঢুলাইয়াছিল।

কবি বাক্‌পতি যেরূপ উজ্জ্বলভাষায় ও যেরূপ উৎসাহে তাঁহার 'গৌড়বধ' মহাকাব্য আরম্ভ করিয়াছেন, তাঁহার প্রতিপালক যশোবর্ম্মার বিজয়কাহিনী যেরূপভাবে প্রথমে কীর্ত্তন করিয়া গিয়াছেন, আশ্চর্য্যের বিষয় যে, তিনি গৌড়বধকাহিনী লিখিয়াই যেন কোন আকস্মিক কারণে, যেন কোন দৈব-দুর্ঘটনায় তাঁহার মহাকাব্যের নায়কের শেষে আর সেরূপ পরিচয় দিতে পারিলেন না। যে গৌড়রাজকে বধ করিয়া যশোবর্ম্মা যশোভাজন হইয়াছিলেন, কবি যেন সেই গৌড়রাজের নামটী পর্য্যন্ত প্রকাশ করিবার আর অবসর পাইলেন না, ইহার কারণ কি? সে দুর্ঘটনার কথা কবি বাক্‌পতি প্রকাশ করেন নাই বটে, কিন্তু রাজতরঙ্গিণী হইতে তাহার এইরূপ আভাস পাইয়াছি,—

"পবন যেখানে কন্যাগণকে কুব্জ করিয়া দিয়াছিলেন, সেই গাধিপুরে (কান্যকুব্জে) অতি অল্পকালমধ্যে রাজা যশোবর্ম্মার বাহিনীদল বিক্ষোভিত করিয়া নরপতি ললিতাদিত্য প্রতাপে আদিত্যের ন্যায় উদ্দীপ্ত হইয়াছিলেন। এই সময় মতিমান্ কান্যকুব্জপতি উদ্দীপ্ত ললিতাদিত্যকে যে পৃষ্ঠপ্রদর্শনপূর্ব্বক আপ্যায়িত করিয়াছিলেন, তাহাতে তিনি নীতিজ্ঞ ও বিচক্ষণগণের নিকট বিশেষ প্রীতির পাত্র হইয়াছিলেন। কিন্তু রাজা যশোবর্ম্মার যাঁহারা সহায় ছিলেন, তাঁহারা এ কার্য্যে বড়ই অভিমানগ্রস্ত হইয়াছিলেন। তাহা না হইবেই বা

কেন, বসন্তকাল অপেক্ষা চন্দনানিলেরই প্রাধান্য কিছু অধিক! যশোবর্ম্মা ও ললিতাদিত্য উভয়ের সন্ধি সম্বন্ধে যে সকল নিয়মপত্রাদি যশোবর্ম্মার সান্ধিবিগ্রহিক দ্বারা লিখিত হয়, তাহাতে "যশোবর্ম্মা ও ললিতাদিত্যের এই সন্ধি হইল" এইরূপ কথা লিখিত হওয়ায় ললিতাদিত্যের সান্ধিবিগ্রহিক মিত্রশর্ম্মা প্রভুর নাম পূর্ব্বে নির্দ্দেশ না দেখিয়া প্রভুর অসম্মান মনে করিয়াছিলেন। উৎকট যুদ্ধবিগ্রহবিষয়ে উদ্ধত সেনানীগণ এই ব্যাপারে অসূয়া প্রকাশ করিয়াছিলেন। রাজা মিত্রশর্ম্মার এইরূপ উচিত ব্যবহারে তাঁহার উপর বহু সম্মানপ্রদর্শন করিলেন। তিনি প্রীত হইয়া মিত্রশর্ম্মাকে পূর্ব্ব হইতে প্রসিদ্ধ অষ্টাদশটী কর্ম্মস্থান হইতে উত্তর পাঁচটী প্রধান কর্ম্মস্থানের কর্ত্তৃরূপ পঞ্চ মহাশব্দ দ্বারা ভূষিত করিলেন। সেই পাঁচটি কর্ম্মস্থানের নাম মহাপ্রতীহারপীড়া, মহাসন্ধিবিগ্রহ, মহাশ্বশালা, মহাভাণ্ডাগার ও মহাসাধনভোগ। এই সকল বিষয়ে শাহিমুখ্য রাজগণই পূর্ব্বে অধ্যক্ষতা করিতেন। যশোবর্ম্মা সপরিবারে হৃতসর্ব্বস্ব হইলেন। বাক্‌পতিরাজ ও ভবভূতি প্রভৃতি দ্বারা সেবিত বিজিত রাজা যশোবর্ম্মা ললিতাদিত্যের গুণ ও স্তুতি করিবার জন্যই যেন বন্দিত্ব স্থানে গমন করিলেন।"[২২]

কাশ্মীরাধিপ ললিতাদিত্য কর্ত্তৃক কনৌজরাজের পরাজয় এবং কনৌজসভা পরিত্যাগপূর্ব্বক কাশ্মীররাজসভায় মহাকবি ভবভূতি ও রাজকবি বাক্‌পতির গমনহেতু গৌড়বধকাব্য একপ্রকার সম্পূর্ণ হয় নাই, এই দুর্ঘটনা প্রকাশ করাও কবি বাক্‌পতি উপযুক্ত মনে করেন নাই। বিশেষতঃ তিনি একদিন যে 'কমলায়ুধ' উপাধিধারী মহারাজ যশোবর্ম্মদেবের সভায় রাজকবিরূপে বিশেষ সমাদৃত ও সম্মানিত ছিলেন, যে রাজার আদর-অভ্যর্থনা তিনি ইহজীবনে ভুলিতে পারিবেন কি না সন্দেহ, যে কমলায়ুধকে তিনি আপনার একমাত্র প্রতিপালক বলিয়া মনে করিতেন, সেই মহানুভবের বিজয়কাহিনী ঘোষণা করিতে গিয়া কেমন করিয়া তিনি আবার তাঁহারই পরাজয় কীর্ত্তন করিবেন? তাই তিনি নিজ গৌড়বধকাব্য সম্পূর্ণ করিতে অগ্রসর হন নাই।

পূর্ব্বেই দেখাইয়াছি, মহাকবি ভবভূতি রাজা যশোবর্ম্মার সভায় অবস্থান করিতেন, তাঁহার মালতীমাধব, বীরচরিত ও উত্তরচরিত এই কাব্যত্রয় আলোচনা করিলেও সে সময়ের সমাজচিত্র আমরা বেশ দেখিতে পাই। কুমারিল ও শঙ্কর বৌদ্ধমতপ্লাবিত ভারতভূমে ব্রাহ্মণ্যধর্ম্ম ও বৈদিক ক্রিয়াকলাপাদি স্থাপনে যেরূপ বদ্ধপরিকর হইয়াছিলেন, কবি ভবভূতি স্বীয় দৃশ্যকাব্যে যেন সেই মতেরই পোষকতা করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার মালতীমাধবে পরিব্রাজিকা কামন্দকীর কার্য্যকলাপ পর্য্যালোচনা করিলে, তৎকালে বৌদ্ধসমাজের ভগ্নাবস্থা বলিয়াই মনে হইবে। মালতীমাধবকে বিবাহসূত্রে আবদ্ধকরণ এবং মালতীর সৌভাগ্যবৃদ্ধির জন্য কৃষ্ণাচতুর্দ্দশীতে শিবপূজার্থে পুষ্পচয়ন ইত্যাদি অবলোকন করিলে মনে হয় যেন হিন্দুধর্ম্ম আবার নবীনসাজে ও নব অনুরাগে পুনরভ্যুদিত হইতেছিল। বাস্তবিক হিন্দুরাজার প্রভাবে বৌদ্ধগণ শিবপূজা করিবেন কি বুদ্ধমার্গ অনুসরণ

যশোবর্ম্মার সময়ের সমাজচিত্র

(২২) রাজতরঙ্গিণী—৪র্থ তরঙ্গ ১৩৪-১৪৪ শ্লোক।

করিবেন, এই উভয় শঙ্কটে পড়িয়াছিলেন। এ সময় বৌদ্ধগণ ক্রমেই যেন হিন্দুধর্ম্মের প্রতি ঢলিয়া পড়িতেছিলেন, এমন কি, তাঁহারা হিন্দুসংহিতাদিপাঠেও মনোযোগী হইতেছিলেন। এই সময়ে তান্ত্রিকসমাজের চিত্র অতি ভীষণ ও অতি শোচনীয়। মালতীমাধবের পঞ্চমাঙ্কে চামুণ্ডাসমীপে এবং বাক্‌পতির বর্ণনায় বিন্ধ্যবাসিনীর সম্মুখে নরবলির চিত্র বিভীষিকাময়। ভবভূতির বীরচরিত ও উত্তরচরিতে বৈদিকমার্গ প্রবর্ত্তনের যত্ন সুস্পষ্ট। লবকুশের জাতকর্ম্ম, চূড়াকরণ, উপনয়ন ও বেদাধ্যয়ন; রামচন্দ্রের দীক্ষাগ্রহণ, গোদানমঙ্গল ও বিবাহাদিসংস্কার; ভাণ্ডায়নাদির ব্রহ্মচর্য্য, অতিথিসৎকার ও তাহার প্রয়োজনীয়তা ইত্যাদি দ্বারা পদে পদেই যেন সেই প্রাচীন বৈদিকসমাজের চিত্র মনে আসিয়া পড়ে। ভবভূতি বেদ, উপনিষদ্, ধর্ম্মসংহিতা, রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণ প্রভৃতি হইতে মত উদ্ধৃত করিয়া বৈদিকসমাজের আদর্শ গঠন করিয়াছেন। বৌদ্ধ ও তান্ত্রিকধর্ম্ম হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইয়া জনসাধারণে যাহাতে বৈদিক আচার-ব্যবহারের অনুসরণ করেন, ভবভূতির গ্রন্থত্রয়ে সেই গূঢ় উদ্দেশ্য অভিব্যক্ত রহিয়াছে। বাস্তবিক কুমারিল ও শঙ্করাচার্য্যের যত্নে দাক্ষিণাত্যে যে বৈদিকধর্ম্ম প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল, কনৌজরাজসভা হইতেই উত্তরভারতে সেই বেদমার্গ-প্রবর্ত্তনের চেষ্টা চলিতেছিল। মহারাজ যশোবর্ম্মা দুষ্টের দমন ও পুনরায় বৈদিকধর্ম্ম স্থাপনার্থ বিশেষ যত্নবান্ ছিলেন, সেইজন্যই তিনি বাক্‌পতির গৌড়বধকাব্যে হরির অন্যতম অবতার বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছেন। বাস্তবিক তিনি হিন্দুসমাজে যে নবভাব উজ্জীবিত করিতেছিলেন, গৌড়বাসীকে তাহার অমৃতময় ফলাস্বাদ করাইবার জন্যই যেন তাঁহার সমসাময়িক গৌড়াধিপ জয়ন্ত কনৌজরাজসভা হইতে সাগ্নিক ব্রাহ্মণ আনাইবার জন্য বদ্ধপরিকর হইয়াছিলেন।

গৌড়ের সিংহাসনে প্রথমে যখন জয়ন্ত অভিষিক্ত হন, তখন হইতেই কনৌজের দিকে তাঁহার দৃষ্টি ছিল, সেইজন্যই বারেন্দ্র ও রাঢ়ীয় কোন কোন কুলগ্রন্থে লিখিত আছে যে, ৬৫৪ শক অর্থাৎ ৭৩২ খৃষ্টাব্দ হইতেই গৌড়ে ব্রাহ্মণ আনয়নের আয়োজন চলিতেছিল, কিন্তু তখনও সমস্ত গৌড়ে হিন্দু-আধিপত্য স্থাপিত হয় নাই, তখনও বৌদ্ধপ্রভাব, বৌদ্ধাচার ও তান্ত্রিকতায় গৌড়ভূমি সমাচ্ছন্ন,—তাই সহজেই আচারভ্রষ্ট হইবার আশঙ্কায় কান্যকুব্জবাসী নিষ্ঠাবান্ সাগ্নিকগণ প্রথমে গৌড়ে বাস করিতে সম্মত হন নাই।[২৩] কিন্তু শুভক্ষণে কাশ্মীরের কায়স্থ-রাজ দিগ্বিজয়ী ললিতাদিত্যের পৌত্র জয়াদিত্য পৌণ্ড্রবর্দ্ধনে আগমন করিলেন, শুভক্ষণে কাশ্মীর ও গৌড়পতি সম্বন্ধসূত্রে আবদ্ধ হইলেন। উভয়ের বিজয়-নিশান শুভক্ষণে কান্যকুব্জ-হৃদয়ে সুশোভিত হইল,—তাই আবার গৌড়মণ্ডল কিছুদিনের জন্য বৈদিক ধর্ম্ম-প্রচারকের লীলাক্ষেত্র,—যজ্ঞভূমির আস্পদীভূত হইয়াছিল। আজও যে বঙ্গভূমে হিন্দুধর্ম্মের কঠোর অনু-

(২৩) আদিশূরের যজ্ঞ সম্পন্ন করিবার জন্য ৬৫৪ অথবা ৬৬৮ শকে ক্ষিতীশ, মেধাতিথি, বীতরাগ, সুধানিধি ও সৌভরি পঞ্চ সাগ্নিক ব্রাহ্মণ গৌড়দেশে আগমন করেন, কিন্তু যজ্ঞ সমাপন করিয়া তাঁহারা কান্যকুব্জে ফিরিয়া যান। রাঢ়ীয় ও বারেন্দ্র ব্রাহ্মণদিগের কোন কোন কুলগ্রন্থে একথা স্পষ্ট লিখিত আছে।

শাসনসমূহ প্রতিপালিত ও বঙ্গবাসিগণকে ধর্ম্মসূত্রে গ্রথিত দেখা যাইতেছে, সব গিয়াছে বটে, কিন্তু এখনও যে সদাচার-প্রতিপালনের জন্য বঙ্গবাসী উন্মুখ, এখনও যে ব্রাহ্মণপ্রাধান্যরূপ সমাজশাসনে বঙ্গের হিন্দুসমাজ নিয়ন্ত্রিত, সেই মিলনের দিন হইতেই তাহার সূচনা;—সাগ্নিক ব্রাহ্মণগণ হইতেই তাহা প্রস্তাবিত এবং পরে এখানকার কায়স্থগণ হইতেই তাহা সমর্থিত ও প্রতিপালিত হইয়াছিল।

যতদিন যশোবর্ম্মা জীবিত ছিলেন, ততদিন কান্যকুব্জে পৃথুর রাজ্য চলিয়াছিল। বিপদে সম্পদে হিন্দুকুলতিলক যশোবর্ম্মা একদিনের জন্যও স্বীয় উদ্দেশ্য বিস্মৃত হন নাই। কত বৈদেশিক আক্রমণে তিনি উত্যক্ত হইয়াছেন, কতবার কাশ্মীর-সৈন্য কান্যকুব্জের যথাসর্ব্বস্ব গ্রাস করিতে অগ্রসর হইয়াছে, তথাপি যশোবর্ম্মা কনৌজের সিংহাসনে বসিয়া বৈদিক ধর্ম্মোদ্ধারের যে যত্ন ও অধ্যবসায় দেখাইয়া গিয়াছেন, তাহারই প্রভাবে আজও কান্যকুব্জ বঙ্গবাসীর চক্ষে সাগ্নিক বিপ্রের লীলাভূমি, বেদবিধিপালনকারী বুদ্ধিজীবী কায়স্থগণের আদিজন্মভূমি ও পুণ্যময় মহাক্ষেত্ররূপে সমাদৃত হইয়া থাকে। কিন্তু কালের কি কঠোর নিয়ম! সে রামও নাই, সে অযোধ্যাও নাই! সেই স্বর্ণপুরী এখন যেন মহাশ্মশানে পরিণত!

কনৌজের পরবর্ত্তী আয়ুধবংশ

মহারাজ যশোবর্ম্মার পর কনৌজ-সিংহাসনে যথাক্রমে বজ্রায়ুধ, ইন্দ্রায়ুধ ও চক্রায়ুধ রাজত্ব করিয়া গিয়াছেন। বাক্‌পতির গৌড়বধকাব্যে যশোবর্ম্মার পরিচয় যেরূপ বিস্তৃতভাবে লিপিবদ্ধ হইয়াছে, প্রসিদ্ধ কর্পূরমঞ্জরী-নাটিকায় সেইরূপ পঞ্চালপতি বজ্রায়ুধের কনৌজে গমন ও তাঁহার [illegible] আভাস পাওয়া যায়। যশোবর্ম্মা যেরূপ কাশ্মীরপতি ললিতাদিত্যের নিকট পরাজিত হইয়াছিলেন, সেইরূপ বজ্রায়ুধও কাশ্মীর-পতি জয়াপীড়ের নিকট পরাজিত ও সিংহাসনচ্যুত হইয়াছিলেন।[২৪] এই বজ্রায়ুধের সহিত কমলায়ুধ যশোবর্ম্মার কিরূপ সম্বন্ধ ছিল, তাহা জানা যায় নাই। তবে ললিতাদিত্য যেরূপ তাঁহার এক পুত্রের নাম 'বজ্রাদিত্য' রাখিয়াছিলেন, সেইরূপ কমলায়ুধও তাঁহার একপুত্রের নাম 'বজ্রায়ুধ' রাখিতে পারেন। রাজতরঙ্গিণী হইতে জানা যায় যে, জয়াপীড় পঞ্চগৌড়ের নৃপতিগণকে পরাজিত করিয়া শ্বশুরকে তাঁহাদের অধীশ্বররূপে স্থাপনপূর্ব্বক ফিরিবার সময় কনৌজ-সিংহাসন কাড়িয়া লইয়া যান। সম্ভবতঃ এই সময়ে জয়াপীড়ের কৌশলেই হউক, অথবা যে কোন কারণেই হউক, কনৌজপতি গৌড়াধিপের প্রাধান্য স্বীকার করিতে বাধ্য হন। বজ্রায়ুধ সিংহাসনচ্যুত হইলে যশোবর্ম্মার অপর পুত্র চক্রায়ুধ সম্ভবতঃ গৌড়পতির চেষ্টায় কনৌজের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। জৈনদিগের নানাগ্রন্থে তিনি 'আমরাজ' নামে প্রসিদ্ধ। কিন্তু সিংহাসন-লাভের পর তিনি জৈনধর্ম্মে বিশেষ অনুরক্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন এবং সেই জন্যই বৈদিককর্ম্মানুরক্ত ব্রাহ্মণসমাজ তাঁহার উপর নিতান্ত বিরক্ত হইয়াছিলেন। বৈদিকমার্গপ্রবর্ত্তক গৌড়পতির সাহায্যে সম্ভবতঃ ব্রাহ্মণসমাজই চক্রায়ুধকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া তাঁহার পুত্র ইন্দ্ররাজ বা ইন্দ্রায়ুধকে

(২৪) Vincent A. Smiths' Early History of India, p. 249.

অভিষিক্ত করিয়াছিলেন। কারণ এই সময়ে সমস্ত পঞ্চগৌড়ে গৌড়াধিপ জয়ন্তের প্রাধান্ত স্বীকৃত হইয়াছিল। জিনসেনের জৈন-হরিবংশ হইতে জানিতে পারি যে, ৭০৫ শকে (৭৮৩ খৃষ্টাব্দে) ৪ জন রাজা ৫ দিক্ পালন করিতেছিলেন, তন্মধ্যে ইন্দ্রায়ুধ নামক রাজা উত্তর দিক্, কৃষ্ণরাজের পুত্র শ্রীবল্লভ দক্ষিণ দিক্, অবন্তিপতি ও বৎসরাজ পূর্ব্ব ও মধ্য দিক্ এবং সৌর্য্যগণের রাজা জয়শীল বীরবরাহ পশ্চিম দিক্ শাসন করিতেছিলেন।[২৫] যাহা হউক, তৎকালে কনৌজে নবাভ্যুদিত বৈদিকসমাজের সহিত এখানকার জৈনসমাজের বিশেষ সংঘর্ষ চলিতেছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। ইন্দ্রায়ুধ জৈনগ্রন্থে ইন্দুক[২৬] নামে পরিচিত। তিনি বৈদিকদিগের পক্ষ-সমর্থন করিয়াছিলেন বলিয়াই হয়ত জৈনগ্রন্থকারগণ তাঁহার যথেষ্ট নিন্দাবাদ করিয়া গিয়াছেন।

সমসাময়িক গ্রন্থ, শিলালিপি বা তাম্রশাসনে আদিশূর শব্দের স্পষ্ট উল্লেখ না থাকায় আদি-শূরের অস্তিত্ব সম্বন্ধেও কেহ কেহ সন্দিহান। কিন্তু যখন রাঢ়ীয় ও বারেন্দ্র ব্রাহ্মণদিগের, এতদ্ভিন্ন উত্তররাঢ়ীয়, দক্ষিণরাঢ়ীয় ও বঙ্গজ-কায়স্থদিগের, এমন কি সুবর্ণবণিক্‌দিগের কুল-গ্রন্থেও 'আদিশূর' নাম রহিয়াছে, সার্দ্ধপঞ্চশতবর্ষাধিক প্রাচীন হরিমিশ্রের রচিত কারিকাতেও যখন আদিশূর নাম পাইতেছি, তখন এই নাম কখনই উপেক্ষার বিষয় নহে। আবার বিভিন্ন সময়ের বিভিন্ন কুলগ্রন্থে আদিশূরের আবির্ভাবকাল সম্বন্ধে নানারূপ কালনির্দ্দেশ থাকায় আদিশূর ঠিক কোন্ সময়ে ছিলেন, তাহা লইয়াও বিষম গোলযোগ। আমরা নানাগ্রন্থ আলোচনা করিয়া বুঝিয়াছি যে, 'আদিশূর' ব্যক্তিবিশেষের নাম নহে। মুসলমান-আগমনের পূর্ব্বে বিভিন্ন সময়ে যে যে হিন্দু-নৃপতি হিন্দুসমাজ-সংস্কারে মনোযোগী হইয়াছেন, কুলগ্রন্থকারগণ সেই সেই নৃপতিকেই আদিশূর নাম দিয়া গৌরবান্বিত করিয়াছেন। তন্মধ্যে রাঢ়ীয় ও বারেন্দ্র-ব্রাহ্মণগণের বীজপুরুষ ক্ষিতীশ, তিথিমেধা, বীতরাগ, সুধানিধি ও সৌভরি পঞ্চগোত্রীয় এই পঞ্চ ব্রাহ্মণ যাঁহার যজ্ঞ করিতে আসেন, তিনিই ১ম আদিশূর। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, 'আদিশূর' একটী উপাধি। গৌড়াধিপ জয়ন্তই রাঢ়ীয়-কুলমঞ্জরীমতে ১ম আদিশূর বলিয়া পরিচিত। কোন কোন ঐতিহাসিক বলিতে চান, 'বর্ত্তমান কালকে আদিশূর-আনীত ব্রাহ্মণগণের কাল হইতে গড়পড়তায় ৩৪।৩৫ পুরুষের কাল বলা যাইতে পারে। প্রতি পুরুষে ২৫ বৎসর ধরিয়া লইলে, আদিশূর ৮৫০ বর্ষ পূর্ব্বে [১০৬০ খৃষ্টাব্দে] বর্ত্তমান ছিলেন, এরূপ অনুমান করা যাইতে পারে। এই

আদিশূরের অস্তিত্ব

(২৫) "শাকেষব্দশতেষু সপ্তসু দিশং পঞ্চোত্তরেষূত্তরাং
পাতীন্দ্রায়ুধনাম্নি কৃষ্ণনৃপজে শ্রীবল্লভে দক্ষিণাম্।
পূর্ব্বাং শ্রীমদবন্তিভূভৃতি নৃপে বৎসরাজেঽপরাং
সৌর্য্যাণামধিমণ্ডলং জয়যুতে বীরে বরাহেঽবতি ॥" (জিনসেনের হরিবংশ)

(২৬) ইন্দুক স্থানে কোন কোন পুথিতে লিপিপ্রমাদে 'দন্দুক' পাঠ উদ্ধৃত হইয়াছে, তদ্দৃষ্টে বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস, ব্রাহ্মণকাণ্ডে ১মাংশে এক সময় 'দন্দুক' পাঠ গৃহীত হইয়াছিল। কিন্তু এখন দেখিতেছি—'ইন্দুক' পাঠই সমীচীন।

অনুমান 'বেদবাণাঙ্কশাকে তু গৌড়ে বিপ্রাঃ সমাগতাঃ। [৯৫৪ শকে বা ১০৩২ খৃষ্টাব্দে গৌড়ে ব্রাহ্মণগণ আগমন করিয়াছিলেন] এই কিম্বদন্তীবিরোধী নহে।"[২৭] কিন্তু ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল, কনিংহাম প্রভৃতি অধুনা সকল প্রত্নতাত্ত্বিক ও পুরাবিদ্ তিন পুরুষে গড়পড়তা একশত বর্ষ স্থির করিয়া আসিতেছেন। এরূপস্থলে ৩৫ পুরুষে মোটামুটি ১১৬০ হইতে ১১৭০ বর্ষ ধরিয়া লওয়া যায়। এরূপস্থলেও কুলপঞ্জিকাধৃত ৬৫৪ (৭৩২ খৃষ্টাব্দে) বা ৬৬৮ শকে (৭৪৬ খৃষ্টাব্দে) ১ম আদিশূরের সভায় ক্ষিতীশাদি পঞ্চ সাগ্নিক বিপ্রের আগমন-কাল অনায়াসেই ধরিয়া লইতে পারি।

আদিশূরের আবির্ভাবকাল ও তদানীন্তন গৌড়ের অবস্থা

পূর্ব্ব অধ্যায়ে লিখিয়াছি, কাশ্মীরপতি ললিতাদিত্য ৭২৩° হইতে ৭৬০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত এবং তৎপৌত্র জয়াপীড় ৭৭২ হইতে ৮০৬ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। ললিতাদিত্যের ষড়যন্ত্রে কাশ্মীরে গৌড়াধিপ নিহত হইলে সম্ভবতঃ আদিশূর পৌণ্ড্রবর্দ্ধন অধিকার করিয়া নিজ আধিপত্য-বিস্তারের সুবিধা পাইয়াছিলেন। পূর্ব্বে রাঢ়ীয়-কুলমঞ্জরীর প্রমাণে লিখিয়াছি, এক সময় আদিশূর ও জয়ন্ত অভিন্ন ব্যক্তি বলিয়াই পরিচিত ছিলেন। জয়াপীড় ৭৭২ খৃষ্টাব্দে যখন পৌণ্ড্রবর্দ্ধনে আগমন করেন, তৎকালে জয়ন্ত গৌড়ের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন, সে কথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। সম্প্রতি কোন কোন পুরাতত্ত্ববিৎ ৭৩২ খৃষ্টাব্দে আদিশূরের আবির্ভাব ও তাহার দীর্ঘ-কাল পরে ৭৭২ খৃষ্টাব্দে পৌণ্ড্রবর্দ্ধনে জয়ন্তের অবস্থান লক্ষ্য করিয়া উভয় নামটী বিভিন্ন ব্যক্তির বলিয়া মনে করিতেছেন। তাঁহাদের আপত্তি এই, ৭৩২ খৃষ্টাব্দে জয়ন্তকে ধরিলে জয়াপীড়ের গৌড়াগমনকালে তাঁহার ৪০বর্ষ রাজ্যকাল হয়। ইহার উত্তরে আমাদের বক্তব্য এই যে, আদি-শূরের এরূপ দীর্ঘকাল রাজত্ব কিছু অসম্ভব নহে; আদিশূরের নাম যেরূপ গৌড়বঙ্গে প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছে, বৌদ্ধ-বিপ্লাবিত বঙ্গভূমে তিনি যেরূপ ব্রাহ্মণ্য-মর্য্যাদা-প্রতিষ্ঠায় এবং বৈদিকধর্ম্মসংস্থাপনে অগ্রসর হইয়াছিলেন, বিশেষতঃ প্রথমে পঞ্চসাগ্নিক ব্রাহ্মণের যজ্ঞোপলক্ষে আগমনকালে পুত্রাদির অনুল্লেখ, পুনরায় তাহার কিছুকাল পরে তাঁহাদের স্ত্রী পুত্রগণসহ আদিশূরের সভায় পুনরাগমন এবং এই সময়ে গৌড়পতির নিকট তাঁহাদের পঞ্চগ্রামলাভ ইত্যাদি সংবাদ হইতে আমরা মোটামুটি ধরিয়া লইতে পারি যে, আদিশূর বহুকাল রাজত্ব করিয়াছিলেন। তিনি যে একজন প্রবল প্রতাপশালী নৃপতি ছিলেন, তাঁহার রাজ্য যে বিশেষরূপে সুশাসিত ও সমৃদ্ধিসম্পন্ন ছিল, জয়াপীড়ের প্রসঙ্গে রাজতরঙ্গিণীকার মুক্তকণ্ঠে তাহা ঘোষণা করিয়া গিয়াছেন। কাশ্মীরপতি জয়াপীড় পঞ্চগৌড়ের অধীশ্বরগণকে পরাজয় করিয়া তাঁহার শ্বশুর জয়ন্তকে উহার অধীশ্বর করিয়াছিলেন, কহ্লণের এই উক্তি নিজদেশীয় নৃপতির প্রশংসা বাড়াইবার কথা হইতে পারে। সম্ভবতঃ যশোবর্ম্মার মৃত্যুর পর গৌড়পতি নিজভুজবলে উত্তর-ভারতের অধিকাংশ স্থান জয় করিয়াছিলেন। অবশেষে জামাতার অধিনায়কত্বে তাঁহার রাজ্যবৃদ্ধির পথ

(২৭) গৌড়রাজমালা, ৫৯ পৃষ্ঠা।

সহজেই সুগম হইয়াছিল। আইন-ই-অক্‌বরীতে লিখিত আছে, রাজা জয়ন্ত ৬০ বর্ষ রাজত্ব করেন।[২৮]

এরূপ স্থলে আমরা মোটামুটি ৭৩২ হইতে ৭৮২ খৃঃ পর্য্যন্ত রাজা জয়ন্তের রাজত্বকাল অনায়াসেই ধরিয়া লইতে পারি, সুতরাং যাঁহার সভায় রাঢ়ীয় ও বারেন্দ্র-ব্রাহ্মণগণের পূর্ব্বপুরুষ সাগ্নিক ব্রাহ্মণগণ ও পরে তাঁহাদের সহিত পুত্রগণও আগমন করিয়াছিলেন, তিনি যে কাশ্মীরপতি জয়াপীড়ের সমসাময়িক, তাহাতে আর সন্দেহ থাকিতেছে না। আদিশূরের অভ্যুদয়ের পূর্ব্বে মগধ হইতে গৌড় পর্য্যন্ত সমস্ত প্রাচ্যভারতে বৌদ্ধ ও জৈনধর্ম্ম প্রবল ছিল, পূর্ব্ব পূর্ব্ব অধ্যায়ে তাহার আলোচনা করিয়াছি, কিন্তু তৎকালে দাক্ষিণাত্যের পুণ্যভূমে কুমারিল ও শঙ্করাচার্য্যের অভ্যুদয়ে সর্ব্বত্রই বৈদিক ও বেদান্তমার্গের যথেষ্ট সমাদর হইয়াছিল এবং তাহার প্রভাব ধীরে ধীরে উত্তর-ভারতে কনৌজের রাজধানীতেও বিস্তৃত হইতেছিল। বাক্‌পতি ও ভবভূতির গ্রন্থে আমরা তাহার যেরূপ আভাস পাইয়াছি, পূর্ব্বেই তাহার উল্লেখ করিয়াছি। মহারাজ যশোবর্ম্মার গৌড়াক্রমণের সঙ্গে প্রাচ্যভারতেও তাহার অল্প অল্প প্রতিক্রিয়া আরম্ভ হইয়াছিল। মহারাজ যশোবর্ম্মার প্রেরণায় গৌড়মণ্ডলে যে সকল ব্রাহ্মণ কায়স্থ বৈদিকধর্ম্ম-প্রচারে মনোযোগী হইয়াছিলেন, আদিশূরের পিতা মাধবকে[২৯] আমরা তাঁহাদের অন্যতম মনে করি। কিন্তু তাঁহার তাদৃশ সহায়সম্পত্তি ও প্রভুত্ব না থাকায় উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতে পারে নাই। তৎপুত্র জয়ন্তই প্রকৃতপ্রস্তাবে গৌড়মণ্ডলে বৈদিকধর্ম্মপ্রচারে কতকটা সফলকাম হইয়াছিলেন। তৎকালে উত্তরভারতে কান্যকুব্জই বৈদিকসমাজের কেন্দ্র বলিয়া পরিচিত থাকায় আদিশূর সেই স্থান হইতেই উপযুক্ত ব্রাহ্মণ আনয়ন করিয়াছিলেন। উক্ত সাগ্নিক ব্রাহ্মণাগমনের পূর্ব্বেও এদেশে কতকগুলি সারস্বত ব্রাহ্মণ বাস করিতেন, তাঁহারাই কুলগ্রন্থে 'সপ্তশতী' ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচিত। রাঢ়দেশে সেই সকল ব্রাহ্মণের যে উপনিবেশ ছিল, তাহা অধুনা বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত 'সাত শইকা' পরগণা নামে পরিচিত। তাঁহাদের মধ্যে দেশ, কাল ও অবস্থাভেদে বৈদিক-ক্রিয়াকাণ্ড অনেকটা লোপ পাইলেও তাঁহাদের প্রতাপ, প্রভুত্ব ও সমাজশক্তি অল্প ছিল না। মনে হয়, বিভিন্নমতাবলম্বী নৃপতিগণের সহিত যখন আদিশূরের ঘোর সমরানল প্রজ্বলিত হয় ও গৌড়বঙ্গে বৈদিকান্দোলনে সাধারণ জনগণের সহিত সংঘর্ষ উপস্থিত হয়, তখন উক্ত ব্রাহ্মণগণই স্ব স্ব অর্থ ও সামর্থ্য দ্বারা গৌড়াধিপের প্রধান সহায় হইয়াছিলেন, গৌড়ে ব্রাহ্মণপ্রতিষ্ঠায় ঐ সকল ব্রাহ্মণও যে অগ্রণী হইয়াছিলেন, তাহাতে সন্দেহ নাই।

(২৮) Col. Jarrett's Ain-i-Akbari, Vol. II. p. 145.

আবুল্-ফজল্ আদিশূর ও জয়ন্তকে ভিন্ন ব্যক্তি ও ভিন্ন রাজবংশজাত বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। সম্ভবতঃ কুলগ্রন্থে একাধিক আদিশূর ও ভিন্ন ভিন্ন স্থানে জয়ন্ত ও আদিশূরের উল্লেখ থাকায় আদিশূর ও জয়ন্ত পৃথক্ ভাবে উক্ত হইয়া থাকিবেন।

(২৯) কেহ কেহ মাধবশূরের পিতা কবিশূরের উল্লেখ করিয়াছেন। কবিশূর ও মাধবশূর উভয়েই সম্ভবতঃ ক্ষুদ্র সামন্ত-নৃপতি ছিলেন।

আদিশূরের অভ্যুদয়ের পূর্ব্ব হইতেই যে রাঢ়দেশে সপ্তশতী ব্রাহ্মণের আধিপত্য বিস্তৃত হইয়াছিল, শ্রীনারায়ণের ছন্দোগ-পরিশিষ্ট-প্রকাশ হইতে তাহার স্পষ্ট সন্ধান পাওয়া গিয়াছে—বিশেষ প্রয়োজন বোধে নিম্নে সেই পরিচয় উদ্ধৃত হইতেছে ;—

সপ্তশতী ব্রাহ্মণ-প্রভাব

"সর্ব্বদা নরেন্দ্রবৃন্দবন্দিত পবিত্রজন্মা কাঞ্জিবিল্লীয় কত মহাত্মাই ভূম্যধিকারী হইয়াছিলেন। তাঁহাদের বিশালবংশের ভূমিশাসনকালে সামবেদী ও সোমপীথী পরিতোষ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি (উক্ত বংশীয়) ব্রাহ্মণরাজের নিকট হইতে তা[illegible]টী শাসনলাভ করেন, সে জন্যই উত্তররাঢ় জগতে পূজিত হইয়াছে। তাঁহা হইতে চতুর্থখণ্ড, পিশাচখণ্ড, বাপুলী, হিজ্জলবন প্রভৃতি অন্যান্য পবিত্র কুলস্থান হইয়াছিল। তদনন্তর ধর্ম্ম নামক পরিতোষের পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। নির্ম্মলমতি নামানুরূপচরিত্র সেই মহাত্মা বিবিধ সভায় সম্মানিত হইয়া বেদান্ত-নিয়মানুষ্ঠানে ভূমণ্ডল পবিত্র করিয়াছিলেন। কোবিদবৃন্দ-বন্দনীয়, নিখিল সদ্‌গুণাশ্রয়, শ্রীহরির চরণচিন্তনপরায়ণ, সাধুগণের অগ্রণী ভদ্রেশ্বর তাঁহা হইতে জন্মলাভ করেন। ভদ্রেশ্বরের পুত্র দ্বিজচক্রবর্ত্তী গদাধর রাজপ্রতিগ্রহে পরাঙ্মুখ হইয়া সর্ব্বদা কেবল পুণ্যরাশি উপার্জ্জন করিয়াই সময় অতিবাহিত করিয়াছেন। প্রভাকরমতাবলম্বী গ্রামণী উমাপতি তাঁহার পুত্র। সেই পণ্ডিতকুল-চূড়ামণি উমাপতির শিষ্য ও উপশিষ্যবর্গে সসাগরা ধরা পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল। পুণ্যবান্ সেই মহাত্মা সাধকবৃন্দের সৎকারে দয়ার্দ্রচিত্ত হইয়া [illegible]রাজ জয়পালের নিকট হইতে মহাশ্রাদ্ধে প্রভূত মহাদান গ্রহণ করিয়াছিলেন। তৎপুত্র গোন পুরাণশাস্ত্রে পারদর্শী ও তন্ত্রশাস্ত্রে বৃহস্পতির ন্যায় অভিজ্ঞ হইয়াছিলেন। পুণ্যাত্মা গোন বহুবার সর্ব্বস্ব দক্ষিণা প্রদান করিয়াছিলেন। তাঁহার পবিত্র কীর্ত্তিপ্রবাহে দিঙ্মণ্ডল বিধৌত হইয়াছিল, তিনি ব্রাহ্মণবর্গের মঙ্গলকর নির্ম্মল গুণাবলীতে সর্ব্বদা ভূষিত ছিলেন। তাঁহার সময়ে ধর্ম্মাধিকার-প্রভুত্ব ব্রাহ্মণগৃহে ন্যস্ত থাকায় শ্রী কলঙ্ক-বিরহিত হইয়াছিলেন। তাঁহার সন্তান শ্রীনারায়ণ পুরাণশাস্ত্রের অধ্যাপক ছিলেন। পণ্ডিতসভায় ও ব্রাহ্মণগণের নিকট নম্রস্বভাব সর্ব্বদা কৃষ্ণ-পরায়ণ নারায়ণ উপাস্যবিষ্ণু ও প্রভাকরমত স্থাপন দ্বারা কীর্ত্তিলাভ করিয়াছিলেন। তিনিই লোকহিতার্থে ছন্দোগ-পরিশিষ্টের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ 'পরিশিষ্টপ্রকাশাখ্য' টীকা রচনা করেন।"[৩০]

(৩০) "ইহ জগতি বন্দিতপদাঃ সদা নরেন্দ্রৈঃ পবিত্রজন্মানঃ। বসুধাভুজঃ কতি নাভূবন্ কাঞ্জিবিল্লীয়াঃ॥
অবতি মহতি যেষামন্বয়ে সোমপীথী সমজনি পরিতোষশ্ছান্দসাং দেহবন্ধঃ।
অলভত স হি বিপ্রাচ্ছাসনং তালবাটীং তদিহ ভজতি পূজামুত্তরা যেন রাঢ়া॥
তস্মাচ্চতুর্থখণ্ডং পিশাচখণ্ডং তথাচ বাপুলী হিজ্জলবনাদিকমপরং নিঃসৃতমনঘং কুলস্থানম্॥
যজ্ঞেঽথ ভুবনত্রয়পাবনহেতুরেকঃ শ্রৌতে বিধৌ সততনির্ম্মলধীপ্রসারঃ।
প্রাক্‌পূজিতো বিবিধসংসদি ধর্ম্মনামা নামানুরূপচরিতঃ পরিতোষসূনুঃ॥
তস্মাদজায়ত সদায়তনং গুণানাং ভদ্রেশ্বরো নিখিলকোবিদবন্দনীয়ঃ।
মধ্যে সতাং ক্ষিতিসুতাং প্রথমাভিধেয়ঃ সেবাভিষিক্তহৃদয়ঃ পদয়োর্মুরারেঃ॥

সপ্তশতী সমাজে কাঞ্জিবিল্লী বা কাঞ্জাড়ী একটী প্রসিদ্ধ গাঁঞি। ছন্দোগপরিশিষ্টপ্রকাশ হইতে বুঝিতেছি যে, এই ব্রাহ্মণবংশ এক সময়ে রাঢ়াংশের ভূমিপতি ছিলেন। তাঁহাদের নিকট সামবেদী ও সোমপীথী পরিতোষ তালবাটী প্রভৃতি ৫টী শাসন লাভ করেন। গৌড়াধিপ দেবপালের ভ্রাতা জয়পালের নিকট তাঁহার বংশধর পণ্ডিতবর উমাপতি মহাদান গ্রহণ করেন। দেবপাল ৮৩০ হইতে ৮৩৫ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। এরূপ স্থলে উমাপতির বৃদ্ধপ্রপিতামহ পরিতোষকে আমরা ৭৩২ খৃষ্টাব্দের নিকট বলিয়া অনায়াসেই গ্রহণ করিতে পারি। পরিতোষ সোমপীথী, সুতরাং একজন বৈদিক ব্রাহ্মণ ছিলেন। যে সময়ে পূর্ব্বোক্ত পঞ্চসাগ্নিক ব্রাহ্মণ আদিশূরের নিকট পঞ্চশাসন গ্রাম লাভ করেন, তৎকালে পরিতোষও রাঢ়ে তালবাটী শাসন লাভ করিয়া রাঢ়বাসী হইয়াছিলেন এবং তাঁহার বংশধরগণ পরে কাঞ্জাড়ী হইতে কাঞ্জিবিল্লীয় নামে পরিচিত হইলেন। যাহা হউক, আদিশূরের সমকালেই যে কাঞ্জাড়ী প্রভৃতি সাতশতীবিপ্রগণ বিশেষ প্রবল ও সামন্তনৃপতিরূপে গণ্য ছিলেন, তাহারই আভাস পাইতেছি।

আদিশূর জয়ন্তের আহ্বানে প্রথমে যশোবর্ম্মা-কমলায়ুধের সময় সাগ্নিক ব্রাহ্মণগণ গৌড়ে যজ্ঞ করিবার জন্য আগমন করিয়াছিলেন এবং যজ্ঞান্তে আবার তাঁহারা স্বদেশে ফিরিয়া যান। ৭৫১ খৃষ্টাব্দে যশোবর্ম্মার মৃত্যু ও গৌড়পতি জয়ন্তের নানাস্থানে আধিপত্য-বিস্তার, তৎপরে বজ্রায়ুধের পতন ও কনৌজে গৌড়পতির শাসন-বিস্তারের সঙ্গে উক্ত সাগ্নিক বিপ্রগণ পুত্রপরিজনসহ গৌড়ে আসিয়া রাজদত্ত শাসনভূমিতে বাস করিতে থাকেন। তৎপরে চক্রায়ুধের ১ম আধিপত্যকালে যখন কনৌজ-রাজসভায় জৈনাচার্য্যগণের প্রতিপত্তি বাড়িয়া উঠিতেছিল, সে সময়েও অনেক নিষ্ঠাবান্ ব্রাহ্মণ গৌড়-রাজসভায় আগমন করেন। সম্ভবতঃ তাঁহাদেরই উত্তেজনায় গৌড়পতি চক্রায়ুধকে রাজ্যচ্যুত করিয়া তাঁহার পুত্র ইন্দ্রায়ুধকে রাজা করিয়াছিলেন। এ সময় হইতে কনৌজের সহিত গৌড়ের উত্তরোত্তর অবিচ্ছিন্ন সম্বন্ধ ও আত্মীয়তা বৃদ্ধি হইতেছিল।

* তস্মাদ্গদাধর ইতি দ্বিজচক্রবর্ত্তী রাজপ্রতিগ্রহপরাঙ্মুখমানসোঽভূৎ।
পুণ্যানি কেবলমহর্নিশমর্জ্জয়ন্ যঃ শান্তশ্চিরায় সময়ং গময়াম্বভূব॥
তস্মাদ্ভূষিতসাঙ্কিভূমিবলয়ঃ শিষ্যোপশিষ্যৈর্ব্রজৈর্বিদ্বন্মৌলিরভূদুমাপতিরিতি প্রভাকরগ্রামণীঃ।
স্মাপালাজ্জয়পালতঃ স হি মহাপ্রাজ্ঞঃ প্রভূতং মহাদানং চার্থিগণার্হণাত্রহৃদয়ঃ প্রত্যগ্রহীৎ পুণ্যবান্॥
তস্যাত্মজঃ সুকৃতবানথ কৃতসর্ব্বস্বদক্ষিণো বহুধা। উদিয়ায় গোননামা গুরুরিব তন্ত্রে পুরাণজ্ঞঃ॥
শশ্বদ্বিপ্রজনীননির্ম্মলগুণে ভূলোকবাচস্পতৌ প্রেঙ্খৎকীর্ত্তিসরিৎপ্রবাহনিবহপ্রক্ষালিতাশামুখে।
যস্মিন্ কৃষ্ণপদৈকলীনহৃদয়ে ধর্ম্মাধিকারাস্পদং বিভ্রাণে দ্বিজমন্দিরাণ্যধিবসন্ নির্ধূতদোষাঃ শ্রিয়ঃ॥
জাতস্ততঃ স্মৃতিপুরাণবিদাদ্ভুপাস্তবিদ্যাপ্রভাকরমতস্থিতিলব্ধকীর্ত্তিঃ।
নম্রঃ সতাং সদসি বিপ্রজনেষু চ শ্রীনারায়ণঃ সততকৃষ্ণপরায়ণাত্মা॥
ছন্দোগপরিশিষ্টস্য সর্ব্বাত্মা লোকহেতবে। পরিশিষ্টপ্রকাশাখ্যশ্চক্রে তেনৈব শ্রীমতা॥"

(ছন্দোগ-পরিশিষ্টপ্রকাশ)

গৌড়-রাঢ়ে ব্রাহ্মণ-প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হইলেও জনসাধারণ ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মে প্রকৃত প্রস্তাবে আস্থাবান্ হইয়াছিলেন বলিয়া মনে হয় না। অল্পলোকই বৈদিক পথের পথিক হইয়াছিলেন। পশ্চিম হইতে উত্তরোত্তর ব্রাহ্মণ ও কায়স্থের আগমন এবং রাজসভায় তাঁহাদের ক্ষমতাবৃদ্ধির সহিত ব্রাহ্মণপ্রভুত্ব-বিস্তার এবং জৈন ও বৌদ্ধ-আচার্য্যগণের ক্ষমতাহ্রাসে তাঁহাদের অনুগত জনসাধারণ প্রকাশ্যে কিছু বলিতে না পারিলেও মনে মনে গৌড়াধিপের উপর অসন্তুষ্ট ও বিরক্ত হইতেছিল। প্রথমে যখন জয়ন্ত গৌড়াধিপহন্তা যশোবর্ম্মা বা ললিতাদিত্যের প্রতিনিধির বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করেন, তৎকালে গৌড়রাজহত্যার প্রতিশোধ লইবার অভিপ্রায়ে সকলেই তাঁহার জন্য অস্ত্রধারণ করিয়াছিলেন এবং প্রাণপণে তাঁহার প্রভুত্ব, সম্পদ্ ও রাজ্যবিস্তারে আনুকূল্য করিয়াছিলেন। তাঁহার যাগযজ্ঞ-ক্রিয়াকলাপ-দর্শনেও কেহ বিচলিত হন নাই। কিন্তু যখন নানা স্থান হইতে দলে দলে ব্রাহ্মণ-কায়স্থ আসিয়া তাঁহাদের উপর কর্তৃত্ব চালাইতে লাগিলেন, তাঁহাদের ধর্ম্ম, মত ও বিশ্বাসের বিরুদ্ধে নূতন মতপ্রচারে মনোযোগী হইলেন,—তখন যে রক্ষণশীল গৌড়ীয় জনসাধারণ মনে মনে গৌড়পতি ও তাঁহার অনুগৃহীত ব্রাহ্মণ-কায়স্থের উপর বিদ্বেষভাব পোষণ করিবেন, তাহা স্বভাবসিদ্ধ।

পূর্ব্বেই দেখাইয়াছি যে, বৎসরাজ ৭৮৩ খৃষ্টাব্দে পূর্ব্ব ও মধ্যভারত শাসন করিতেছিলেন। রাষ্ট্রকূটপতি ৩য় গোবিন্দের দুইখানি তাম্রশাসন-পাঠে জানা যায় যে, বৎসরাজ গৌড়জয়জনিত অহঙ্কারে মত্ত ছিলেন এবং গৌড়রাজের শরদিন্দু-ধবল-ছত্রদ্বয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। (গোবিন্দের পিতা রাষ্ট্রকূটপতি) ধ্রুব সেই বৎসরাজকে [illegible] পরাজিত করিয়া তাঁহার অহঙ্কার চূর্ণ ও সেই ধবল ছত্রের সহিত তাঁহার দিগন্তব্যাপী যশও কাড়িয়া লইয়াছিলেন[৩১] এবং তাঁহাকে মরুভূমিতে আশ্রয় লইতে বাধ্য করিয়াছিলেন। এমন কি কর্করাজের ৭৩৪ শকে উৎকীর্ণ তাম্রশাসন হইতে আভাস পাওয়া গিয়াছে যে, উক্ত গোবিন্দ গৌড়েন্দ্র ও বঙ্গপতি-বিজেতা গুর্জ্জরপতি বৎসরাজকে বিপর্য্যস্ত করিয়া অনুজ ইন্দ্ররাজকে মালবে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন।"[৩২]

উদ্ধৃত বিবরণী হইতে পাওয়া যাইতেছে যে, ৭৮৩ খৃষ্টাব্দের কিছু পূর্ব্বে গুর্জ্জরপতি বৎসরাজ মালব অধিকার করিয়া গৌড় ও বঙ্গপতিকে পরাজয় করিয়াছিলেন। তৎকালে গৌড়ের

(৩১) "হেলা-স্বীকৃত-গৌড়রাজ্যকমলামত্তং প্রবেশ্যাচিরা-
দুর্মার্গং মরুমধ্যমপ্রতিবলৈর্যো বৎসরাজং বলৈঃ।
গৌড়ীয়ং শরদিন্দুপাদধবলং ছত্রদ্বয়ং কেবলং
তস্মান্নাহৃত-তদ্যশোঽপি ককুভাং প্রান্তে স্থিতং তৎক্ষণাৎ॥"

Epigraphia Indica, Vol VI. p. 242.

(৩২) "গৌড়েন্দ্র-বঙ্গপতি নির্জ্জয়-দুর্বিদগ্ধ-সদ্গুর্জ্জরেশ্বরদিগর্গলতাং চ যস্য।
নীত্বা ভুজং বিহতমালবরক্ষণার্থং স্বামী তথান্যমপি রাজ্যফলানি ভুঙ্‌ক্তে॥"

Indian Antiquary, Vol. XII. p. 158.

সিংহাসনে জয়ন্ত অধিষ্ঠিত ছিলেন এবং বঙ্গপতিও তাঁহার অধীন সামন্তরূপে পূর্ব্ববঙ্গ শাসন করিতেছিলেন। গুর্জ্জরপতি বৎসরাজের সহিত তাঁহাদের ঘোরতর যুদ্ধ হইয়াছিল, সন্দেহ নাই। এ সময়ে একে প্রজাসাধারণ গৌড়পতির উপর বিদ্বেষপরায়ণ, তদুপরি প্রবল শত্রুর আক্রমণ, বৃদ্ধ এ সময়ে নিজ পদমর্য্যাদা রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন বলিয়া বোধ হয় না। বৃদ্ধ নৃপতি গুর্জ্জরের হস্তে কেবল পরাজিত বলিয়া নহে, সম্ভবতঃ রাজ্যচ্যুত হইয়া থাকিবেন। সুতরাং সমস্ত প্রাচ্যভারত কিছুদিন গুর্জ্জরের শাসনাধীন হইয়াছিল। অবশেষে বৎসরাজ রাষ্ট্রকূটপতি ধ্রুব ও তৎপুত্র গোবিন্দের নিকট সম্পূর্ণ পরাজিত হইয়া মরুভূমি আশ্রয় করিয়াছিলেন। এ সময়ে প্রাচ্যভারত এক রাজার শাসনদণ্ডাধীন ছিল না। সেই সময়ের অবস্থা লক্ষ্য করিয়া তিব্বতীয় ঐতিহাসিক তারানাথ লিখিয়াছেন যে 'উৎকলে, বঙ্গে ও প্রাচ্যের পঞ্চ প্রদেশে[৩৩] প্রত্যেক ক্ষত্রিয়[৩৪], ব্রাহ্মণ ও বণিক্ পার্শ্ববর্ত্তী জনপদে স্ব স্ব প্রাধান্য-বিস্তার করিয়াছিলেন, কিন্তু সমগ্র দেশের কোন রাজা ছিল না।'[৩৫]

ব্রাহ্ম-মত

পূর্ব্বেই লিখিয়াছি যে, আদিশূরের যজ্ঞ করিবার জন্য ৬৫৪ শকে পঞ্চ সাগ্নিক ব্রাহ্মণ আগমন করেন। এ সময়ে আদিশূরের সভায় ব্রাহ্মণসহ কায়স্থগণের আগমনের কথাও আধুনিক কোন কোন গ্রন্থে বিবৃত হইয়াছে; কিন্তু হরিমিশ্র, বাচস্পতিমিশ্র, মহেশমিশ্র, শ্যামলতৃরানন প্রভৃতির প্রাচীন ও প্রামাণ্য গ্রন্থসমূহে কোথাও এ কথা লিখিত হয় নাই। বাস্তবিক যাঁহারা সকল ঋষিকল্প ব্রাহ্মণ যজ্ঞ করিবার জন্য আসিয়াছিলেন, তাঁহাদের [illegible] কায়স্থ আগমনের কোনও প্রয়োজন ছিল না। বিশেষতঃ এই সময়ে আদিশূর গৌড়ে একচ্ছত্র আধিপত্য লাভ করিতে পারেন নাই। তখনও তিনি একজন মহাসামন্ত বলিয়াই পরিচিত ছিলেন এবং গৌড়মধ্যেও তৎকালে পূর্ব্বতন কায়স্থরাজবংশ ও রাঢ়ের স্থানে স্থানে ব্রাহ্মণ-রাজবংশ বিদ্যমান ছিলেন। কিন্তু বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয় যে, রাঢ়বাসী জনসাধারণের মনে এরূপ বিশ্বাস বদ্ধমূল হইয়াছে যে, সকলেই বলিয়া থাকেন যে, আদিশূরের সভাতেই কনৌজ হইতে ভট্টনারায়ণাদি পঞ্চ ব্রাহ্মণ ও মকরন্দ ঘোষ, দশরথ বসু প্রভৃতি পঞ্চ কায়স্থ একত্র আগমন করেন। এরূপ বিশ্বাসের প্রধান কারণ—রাজা রাধাকান্ত দেব বাহাদুরের শব্দকল্পদ্রুম-অভিধান। শব্দকল্পদ্রুমে 'কায়স্থ'-শব্দে বঙ্গে কায়স্থাগমন-প্রসঙ্গে কুলপঞ্জীর দোহাই দিয়া কতকগুলি কল্পিত বচন উদ্ধৃত হইয়াছে। তাহাই পরে নানাগ্রন্থে উদ্ধৃত ও অনুবাদিত হইয়া সাধারণকে ভ্রান্তবিশ্বাসে পরিচালিত করিয়াছে। এখানে সেই সকল কল্পিত বচন উদ্ধৃত করিয়া তাহার খণ্ডন ও ভ্রমপ্রদর্শন নিতান্ত প্রয়োজন মনে করিতেছি। মূল বচন এইরূপ—

(৩৩) এই পঞ্চ প্রদেশই রাঢ়ীয় কুলাচার্য্য হরিমিশ্রের কারিকায় সম্ভবতঃ পঞ্চগৌড় নামে বর্ণিত হইয়াছে।

(৩৪) তারানাথ যাঁহাদিগকে ক্ষত্রিয় বলিয়া উল্লেখ করিয়াছিলেন, তাঁহারা প্রকৃতপ্রস্তাবে কায়স্থ। কারণ তৎকালে সমস্ত গৌড়ে কায়স্থ-প্রাধান্য অক্ষুণ্ণ ছিল। এমন কি গৌড়াধিপ জয়ন্ত নিজেও য কায়স্থ ছিলেন, তাহা তারানাথের পূর্ব্ববর্ত্তী আবুল-ফজলের গ্রন্থ হইতেও পাওয়া গিয়াছে।

(Vide Col. Jarrett's Ain-i-Akbari, Vol. II. p. 145.)

৩৫ Indian Antiquary, Vol. IV. p. 366.

"পাত্রং পপ্রচ্ছ পূতং পরম-সুরপদ-দ্বন্দ্বপত্রার্চ্চকোঽসৌ
কা সন্তে কাগুপীশাঃ ক্রতুকৃতিকুশলাঃ কাপি শূদ্রাঃ কুলীনাঃ।
পাত্রস্তেষামবোচৎ পরিচয়মখিলং ভূপবাক্যাৎ দ্বিজাস্তে
কোলাঞ্চস্থাঃ কুরঙ্গা ইব কিল তপসা নৈব কেষামধীনাঃ।
কোলাঞ্চস্য মহীপতিঃ ক্ষিতিভুজামেকপ্রধানঃ প্রথী
স্বেষ্টে নিষ্ঠমতির্মহাশয়বরঃ শ্রীবীরসিংহঃ স্বভূৎ।
তদ্দেশবাসিনঃ [illegible]ধিকৃতিনঃ পাপালিসংহারিণঃ
সন্তি ব্যাসসমাঃ [illegible]াসদ ইতো গৌড়েন্দ্রভূমীশ্বরাঃ॥"
"ভূপোঽভূদ্ভবনে স্বচেষ্টিতপরঃ সদ্ভৃত্যভার্য্যান্বিতান্
ভূদেবান্ বৃষবান্ বিচিত্রলিখনৈরানেতুকামঃ স্বয়ম্।
পাত্রেণ প্রণয়প্রমোদরচিতাং শ্রীবীরসিংহে লিপিং
গৌড়ক্ষ্মাপতিরেব পুণ্যসুমতির্দূতেন প্রাস্থাপয়ৎ॥"
'সুকৃতসুকৃতসত্ত্বাঃ সর্ব্বশাস্ত্রার্থদক্ষা লপিতহতবিপক্ষাঃ স্বস্তিবাক্যাঃ শ্রুতিজ্ঞাঃ।
সুজিতসুগতবৃন্দে গৌড়রাজ্যে মদীয়ে দ্বিজকুলবরজাতাঃ সানুকম্পাঃ প্রয়াস্তু॥
নৃপতিসুকৃতিসারঃ স্বীয়বংশাবতারঃ প্রবলবলবিচারো বীরসিংহোঽতিবীরঃ।
ময়ি বরসপিতাস্তে ভূমিদেবান্ সশূদ্রান্ পুনরপি মম গৌড়ে প্রাপয় ত্বং নিতান্তম্॥"
"মুদা গন্তুকামাঃ পুরাবাসগৌড়াঃ সমাহায় কোলাঞ্চদেশ[illegible] ক্ষিতীশম্।
নৃপাজ্ঞাঞ্চ লব্ধা সদারাদিভৃত্যা মহাযোগিনস্তে বভূবুঃ সশূদ্রা[illegible]
"মহারাজরাজাদিশূরো মহাত্মা ত্বয়া বীরসিংহস্য মেঽস্ত্বাদিসখ্যম্।
ভবাজ্ঞানুসারাদ্ধি প্রস্থাপয়ামি দ্বিজান্ পঞ্চগোত্রান্ সদারাদিভৃত্যান্॥"
"চলচ্চঞ্চলাশালিযানাঃ প্রধানা বৃহচ্ছ্মশ্রুগুম্ফাতিশোভানলাভাঃ।
ক্রতুজ্ঞাঃ শ্রুতিজ্ঞাঃ প্রতিজ্ঞানসাধ্যাঃ সবর্ম্মাস্ত্রশস্ত্রাঃ প্রযাতাঃ প্রয়াগম্॥
ততঃ স্নানদানাদি কৃত্বা চ বিপ্রাঃ যযুস্তেঽপি বারাণসীং পঞ্চগোত্রাঃ।
ততো বিশ্বনাথং সমালোক্য দানৈর্ধনঃ প্রাপ্য তস্মাদ্গয়াভূমিমাপুঃ॥"
"পিতৃন্ বান্ধবাংস্তারয়িত্বা গয়ায়াং গতাঃ শাসিতং গৌড়রাজ্যেশরাজ্যম্।
ততস্তেজসা তে দিশো ভাসয়ন্তঃ শ্রুতিং ব্যাহৃতিং ভারতীং পাঠয়ন্তঃ॥
ততো হস্তদূর্ব্বাঙ্কতাঃ পঞ্চগোত্রা নৃপস্যাশিষং কর্ত্তুমেব প্রতস্থুঃ।
অমী পঞ্চ মধ্যাহ্নমার্ত্তণ্ডতুল্যা দ্বিজাঃ স্থাপিতাশাঃ পরব্রহ্মসঙ্গ॥"
"দৃষ্টৈবং বেশমেষামবনিপতিরসৌ ভ্রান্তচিত্তো দ্বিজানাং
তৈরালাপং ন কৃত্বা স্বগৃহমপি যযৌ গন্তুকামাঃ পুনস্তে।
বুদ্ধা ভূপালবুদ্ধিং ক্ষণমপি চ বুধাঃ শুষ্কবৃক্ষাশিষস্তে
তজ্জাতং প্রাপ্য দূর্ব্বাঙ্কতমপি স বভৌ শুষ্কবৃক্ষঃ সুবৃক্ষঃ॥"
"সবিস্ময়া বৈ গলবদ্ধবস্ত্রা ভূপাদয়স্তে চরণারবিন্দম্।
পবিত্রকীর্ত্তিং ভুবি ভূসুরাণাং শ্রুত্বা চ পেতুঃ সকলাঃ প্রণম্য॥
ক্ষমধ্বমস্মাকমুচিতত্ববানং মূঢ়াত্মনাকাপরাধং হি বিপ্রাঃ।
ততো জ্ঞাত্বা বিপ্রাঃ কিমু নাম গোত্রং ততশ্চ সর্ব্বে গদিতুং প্রবৃত্তাঃ॥"

"অভূবন্দ্যবংশোদ্ভবো ভট্টনারায়ণোঽয়ক শাণ্ডিল্যগোত্রে গরীয়ান্।
তপস্বান্ যশস্বান্ দয়াবান্ সুবিদ্বান্ বিবস্বানিবাস্যাং সভায়াং বিভাতি॥
শ্রুতিতত্ত্বতদঙ্গবিচারকরোঽবনিপালকঃ কাশ্যপগোত্রবরঃ
ক্রতুদক্ষসমঃ কিল দক্ষমহাশয়ো নাম ইতি ভুবি ভাতি যতিঃ॥
সমস্তশাস্ত্রপণ্ডিতস্তথাগতপ্রখণ্ডিতঃ প্রচণ্ডসর্ববৈরিদর্পখর্ব্বকারকঃ।
সাবর্ণগোত্রসম্ভবোঽত্র ভাতি বেদগর্ভকঃ ছান্দড়ঃ প্রভাতি ভূপ বাৎস্যগোত্রসম্ভবঃ॥
যশঃসুধাকরোত্তপৎসপত্নীসঙ্গযোষিতাননাম্বুজে মহাতপস্তপোবশীকৃতেন্দ্রিয়ঃ॥
অয়ং শ্রীহর্ষোঽনিশং দানহর্ষো মহর্ষিযথাস্যাং তপোভিঃ [illegible]ভাতি।
ক্ষিতীন্দ্র! ক্ষিতৌ যো ভরদ্বাজগোত্রেশ্বরো বিপ্রবর্য্যঃ প্রতাপারিশৌর্য্যঃ॥"

অর্থাৎ রাজা মহারাজাদিসেবিত পূজ্যপাদ সেই আদিশূর পুণ্যচেতা মন্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, মন্ত্রিন্! সেই বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণগণ এবং বিশুদ্ধ নবগুণসম্পন্ন কুলীন শূদ্রগণ কোথায় কি ভাবে বাস করিতেছেন? রাজার বাক্যে মন্ত্রিবর তাঁহাদিগের সমগ্র পরিচয় বলিলেন, সেই বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণগণ তপস্যাদ্বারা কাহারো অধীন না হইয়া কোলাঞ্চে বসতি করিতেছেন। কেশরীর ন্যায় সমস্ত রাজার মধ্যে প্রধান জ্ঞানী অবিগীত-শিষ্টাচারবান্ মহাশয়পদলাঞ্ছন শ্রীযুত বীরসিংহই সেই কোলাঞ্চের একমাত্র ভূপতি। গৌড়েশ্বরের ভূমির শাসনকর্ত্তা সেই দেশবাসী সভাসদ্ সকলেই বেদবিধিবোধিত যাগাদি ক্রিয়ারত, পাপপুঞ্জনাশক, সুতরাং ব্যাসতুল্য হইয়া বাস করিতেছেন। মন্ত্রী[illegible] শুনিয়া রাজা নিজভবনে সদ্ভৃত্য ও ভার্য্যাসহ ব্রাহ্মণগণকে আনিবার ইচ্ছায় বীরসিংহকে মন্ত্রী দ্বারা গৌড়পতির উপযুক্ত পত্র লিখিয়া দূত পাঠাইয়া দিলেন। (লিপির তাৎপর্য্য এইরূপ) সুচরিত পুণ্যবান্ সর্ব্বশাস্ত্রার্থদক্ষ, শাস্ত্রালাপনে বিপক্ষগণ নিয়ত যাঁহাদের নিকট পরাজিত, যাঁহাদের মুখে নিয়ত স্বস্তিবাক্য উচ্চারিত, বেদবিৎ সুগত বা বুদ্ধমতানুবর্ত্তিগণ যাঁহাদের নিকট সম্পূর্ণ পরাজিত, এরূপ দয়াশীল শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ-সন্তানগণকে আমার গৌড়রাজ্যে পাঠাইয়া দিবেন। নৃপতিগণের সুকৃতিস্বরূপ নিজ-বংশের অবতার, প্রবলগণের বলবিচারক মহাবীর বীরসিংহ? আমার সহিত বন্ধুত্ব স্থাপনের জন্য পুনরায় এই গৌড়ে শূদ্রগণের সহিত ব্রাহ্মণগণকে পাঠাইয়া দিবেন। তখন আনন্দে পূর্ব্বাবাস গৌড়ে গমন করিবার বাসনায় কোলাঞ্চদেশ ও তাহার রাজাকে ত্যাগ করিয়া ভার্য্যাদি ও ভৃত্যসহ সেই মহাযোগী (ব্রাহ্মণ)-গণ ও শূদ্রগণ প্রস্তুত হইলেন। (রাজা বীরসিংহ পত্রোত্তরে জানাইলেন) 'মহাত্মা মহারাজ আদিশূর আপনার সহিত পূর্ব্ব হইতেই আমার সখ্য আছে। আপনার আজ্ঞানুসারে পঞ্চ-গোত্রোদ্ভব ব্রাহ্মণগণকে ভার্য্যাদি ও ভৃত্য সহিত যাইতে দিলাম।' সেই পঞ্চ ব্রাহ্মণ অতি বেগবান্ অশ্বে চলিলেন, তাঁহাদের বড় বড় দাড়ী ও অতি সুন্দর গোঁফ, সকলেই যজ্ঞবিৎ, বেদবিৎ, প্রতিজ্ঞাপালনে তৎপর, বর্ম্মচর্ম্ম ও অস্ত্রশস্ত্রে ভূষিত। (প্রথমে তাঁহারা) প্রয়াগে গেলেন। এখানে সেই পঞ্চগোত্র প্রয়াগে স্নানদানাদি করিয়া বারাণসীধামে চলিলেন। বিশ্বনাথ দর্শন ও দানাদি দ্বারা যশোপার্জ্জন করিয়া তথা হইতে গয়ায় আসিলেন। গয়ায় পিতৃগণ ও বান্ধবগণকে উদ্ধার করিয়া গৌড়পতির রাজ্যে প্রবেশ করিলেন। সমস্ত দিঙ্মণ্ডল উদ্ভাসিত

করিয়া বেদধ্বনি করিতে লাগিলেন। পরে সেই মধ্যাহ্নমার্ত্তণ্ড সদৃশ পঞ্চ বিপ্র অশ্ব রাখিয়া হাতে দূর্ব্বাক্ষত লইয়া রাজাকে আশীর্ব্বাদ করিতে চলিলেন। রাজা দ্বিজগণের বেশভূষা দেখিয়া তাঁহাদের সহিত আলাপ না করিয়াই নিজগৃহে গমন করিলেন। তখন সেই পঞ্চব্রাহ্মণ ভূপালের মনের ভাব বুঝিতে পারিয়া ফিরিয়া যাইবার অভিপ্রায়ে হস্ত হইতে দূর্ব্বাক্ষত শুষ্কবৃক্ষে আশীর্ব্বাদস্বরূপ নিক্ষেপ করিলেন। তাঁহাদের হস্ত হইতে পতিত দূর্ব্বাক্ষতস্পর্শে সেই শুষ্কবৃক্ষ সুন্দরবৃক্ষে পরিণত হইল। রাজা তদ্দৃষ্টে সবিস্ময়ে গলবদ্ধবস্ত্রে সেই ব্রাহ্মণগণের চরণারবৃন্দে পতিত হইলেন এবং ব্রাহ্মণগণকে স্তবস্তুতি ও প্রণাম করিয়া বলিলেন, 'আমি অতি মূঢ়মতি, আমার অপরাধ ক্ষমা করুন এবং আপনাদের নামগোত্র প্রভৃতি বলুন।' তখন সেই ব্রাহ্মণগণ পরিচয়দানে প্রবৃত্ত হইলেন—'শাণ্ডিল্যগোত্রে বন্দ্যবংশে এই গরীয়ান্ ভট্টনারায়ণ জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। ইনি তপস্বী, যশস্বী, দয়াশীল, সুবিদ্বান্ এবং সূর্য্যের ন্যায় মূর্ত্তিমান্ হইয়া এই সভা উজ্জ্বল করিতেছেন। শ্রুতিতত্ত্ব ও তদর্থবিচারক কাশ্যপগোত্রশ্রেষ্ঠ দক্ষের ন্যায় যজ্ঞশীল এই দক্ষ মহাশয় পৃথিবীতে প্রসিদ্ধ। সমস্ত শাস্ত্রে পণ্ডিত, বৌদ্ধমত-খণ্ডনকারী, সকল প্রচণ্ড বৈরীর দর্প ও গর্ব্ব-খর্ব্বকারক সাবর্ণ-গোত্রসম্ভব এই বেদগর্ভ সভা উজ্জ্বল করিতেছেন। বাৎস্যগোত্র-সম্ভব মহাতাপস ছান্দড় তপস্যাদ্বারা যাঁহার ইন্দ্রিয় সকল বশীভূত, তিনিও এখানে বিরাজ করিতেছেন। হে মহারাজ! সর্ব্বদাই দানদ্বারা হর্ষোৎফুল্ল, তপঃপ্রভাবে মহর্ষিতুল্য দীপ্তিমান্, পৃথিবীতে যিনি ভরদ্বাজগোত্রের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও ভরদ্বাজ-গোত্রের রাজা, ব্রাহ্মণের শ্রেষ্ঠ, প্রবল শত্রুগণের নিকটও [illegible] শৌর্য্য প্রকাশিত, সেই শ্রীহর্ষও এই সভা উজ্জ্বল করিয়াছেন।"

উপরে শব্দকল্পদ্রুমোক্ত যে কুলপঞ্জীর বিবরণ উদ্ধৃত হইল, ঐ সকল বচন কাহার রচিত বা কোন্ সময়ে রচিত, তাহার কিছুই লেখা নাই। বিশেষতঃ ব্রাহ্মণ ও শূদ্রাগমন সম্বন্ধে উক্ত বিবরণীতে যাহা লিখিত হইয়াছে, তাহা কোন প্রাচীন কুলগ্রন্থ বা ইতিহাস-সম্মত নহে। যে সকল কারণে শব্দকল্পদ্রুমের বচনগুলি নিতান্ত আধুনিক ও কুলশাস্ত্রানভিজ্ঞের রচনা বলিয়া স্থির করিতে হইয়াছে, একে একে তাহার কারণ নির্দ্দেশ করিতেছি—

শব্দকল্পদ্রুমের ভ্রান্তমত নিরসন

১, হরিমিশ্র, এড়ুমিশ্র, বাচস্পতিমিশ্র প্রভৃতি প্রামাণিক ও প্রাচীন কুলাচার্য্যগণ সকলেই লিখিয়াছেন—ক্ষিতীশ, মেধাতিথি বা তিথিমেধা, বীতরাগ, সুধানিধি ও সৌভরি এই পঞ্চ ধর্ম্মাত্মা যজ্ঞ করিবার জন্য আদিশূরের সভায় আগমন করেন। ভট্টনারায়ণ, শ্রীহর্ষ, দক্ষ, বেদগর্ভ ও ছান্দড় এই পঞ্চজন যজ্ঞ করিবার জন্য আসেন নাই। ক্ষিতীশাদি পঞ্চ সাগ্নিকের প্রত্যেকের বহুসংখ্যক পুত্র হইয়াছিল, সেই সকল পুত্রগণের মধ্যেই ভট্টনারায়ণাদি পরিগণিত।[৩৬]

(৩৬) সম্বন্ধ-নির্ণয়, ২য় সং ২৮৪ পৃষ্ঠা, গৌড়ে ব্রাহ্মণ ৭২ পৃষ্ঠা এবং বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস, ব্রাহ্মণকাণ্ড, ২য় সংস্করণ, ১মাংশ ১০৩ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

২, শব্দকল্পদ্রুমে ভট্টনারায়ণের পরিচয়-প্রসঙ্গে তাঁহাকে 'বন্দ্যবংশোদ্ভব' বলা হইয়াছে। প্রকৃত প্রস্তাবে ভট্টনারায়ণ 'বন্দ্য' বলিয়া কখন পরিচিত হন নাই, তাঁহার বংশধর আদিবরাহ 'বন্দিঘাট' গ্রাম লাভ করেন, তাঁহার বংশধরগণ পরবর্ত্তী কালে উক্ত গাঞি অনুসারে 'বন্দ্যঘাটী' বা বন্দ্যবংশ বলিয়া পরিচিত হন।[৩৭]

৩, শব্দকল্পদ্রুমে আদিশূর বীরসিংহকে যে পত্র দেন তাহাতে লিখিত হইয়াছে—

"ময়ি বরসথিতাস্তে ভূমিদেবান্ সশূদ্রান্। পুনরপি মম গৌড়ে প্রাপয় ত্বং নিতান্তম্॥"

এখানে গৌড়দেশে শূদ্রগণের সহিত ব্রাহ্মণগণের পুনরায় আসিবার কথা। কিন্তু তৎপূর্ব্বে যে ব্রাহ্মণ ও শূদ্র আসিয়াছিল, তাহার কোন উল্লেখ নাই। ইহার পরের শ্লোকে—

"নৃপাজ্ঞাঞ্চ লব্ধা সদারাদিভৃত্যা মহাযোগিনস্তে বভূবুঃ সশূদ্রাঃ" এই বচনে মহাযোগী পঞ্চ ব্রাহ্মণের সহিত তাঁহাদের স্ত্রী ও ভৃত্যগণ এবং সেই সঙ্গে শূদ্রগণের আসিবার কথা রহিয়াছে।

সকলেই স্বীকার করিবেন যে, যজ্ঞের জন্য ব্রাহ্মণেরই প্রয়োজন, শূদ্রের কোন প্রয়োজন হয় না। এমন কি যজ্ঞস্থলে শূদ্রের প্রবেশাধিকার নাই। যদি পঞ্চ সাগ্নিক ব্রাহ্মণ স্ত্রী ও ভৃত্য লইয়া আসিয়া থাকেন, তাহা হইলে তাঁহাদের সঙ্গে আবার শূদ্রগণের আসিবার প্রয়োজন কি? শূদ্রগণ আদিশূরের সময় কোলাঞ্চদেশে বাস করিতেছিলেন এবং আদিশূর তাঁহাদিগকে আমন্ত্রণ করিয়া আনিয়াছিলেন, কোন প্রাচীন গ্রন্থে এরূপ কথা নাই।

৪, শব্দকল্পদ্রুমে উক্ত পঞ্চশূদ্রের পরিচয়-দানকালে লিখিত আছে—

"কোলাঞ্চাৎ পঞ্চ শূদ্রা বয়মপি নৃপতেঃ কিঙ্করা ভূসুরাণাম্।"

অর্থাৎ কোলাঞ্চ হইতে আমরা পঞ্চশূদ্র আসিতেছি, আমরা ব্রাহ্মণগণের কিঙ্কর।

তৎপরে উক্ত পঞ্চশূদ্রের মধ্যে মকরন্দের পরিচয়-দানকালে লিখিত আছে—"মকরন্দ ইতি প্রতিভাতি যতিদ্বিজবন্দ্যকুলোদ্ভবভট্টগতিঃ। স চ ঘোষকুলাম্বুজভানুরয়ং।" দশরথের পরিচয়-প্রসঙ্গে "বসুধাধিপচক্রবর্ত্তিনো বসুতুল্যা বসুবংশসম্ভবাঃ।" এইরূপ পুরুষোত্তমের পরিচয়দান-কালে "অহঞ্চ পুরুষোত্তমঃ কুলভৃদগ্রগণ্যঃ কৃতী সুদত্তকুলসম্ভবো নিখিলশাস্ত্রবিদ্যোত্তমঃ।"

সুতরাং শব্দকল্পদ্রুমের কুলপঞ্জীকার বলিতে চান যে, পঞ্চ সাগ্নিক ব্রাহ্মণ যে ৫টী চাকর সঙ্গে আনিয়াছিলেন, তাঁহারা সামান্য লোক নহেন। একজন হইতেছেন বন্দ্যকুলোদ্ভব ভট্টগতি, একজন হইতেছেন বসুধাধিপচক্রবর্ত্তী বসুবংশসম্ভূত, অপর আর একজন হইতেছেন নিখিলশাস্ত্র-বিদ্যায় শ্রেষ্ঠ। পূর্ব্বেই লিখিয়াছি, ভট্টনারায়ণ 'বন্দ্য' ছিলেন না, সুতরাং তাঁহার সহিত যদি মকরন্দ ঘোষ আসিয়া থাকেন, তাহা হইলে তিনি 'বন্দ্যকুলোদ্ভবভট্টগতি' হন কিরূপে? বসুধাধিপচক্রবর্ত্তিগণের বংশে যাঁহারা জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহাদের বংশধরগণের মধ্যে যদি কেহ দশরথ বসু হন, তাহা হইলে তিনিই বা কেন অপরের ভৃত্যত্ব স্বীকার করিতে যাইবেন? বিশেষতঃ রাজচক্রবর্ত্তী বসুবংশে কেহ যে শূদ্র ছিলেন, এ পর্য্যন্ত তাহার কোন প্রমাণ পাওয়া যায় নাই। আবার সর্ব্ববিদ্যায় শ্রেষ্ঠতা লাভ করিয়াছেন, এরূপ শূদ্রের সংবাদ আদিশূরের

(৩৭) বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস, ব্রাহ্মণকাণ্ড, ১মাংশ এবং পূর্ব্বোক্ত সম্বন্ধ-নির্ণয়াদি গ্রন্থ দ্রষ্টব্য।

সময় কেন অপর কোন সময়ে পাই নাই। নিখিলশাস্ত্রবিত্তা বলিলে তন্মধ্যে শ্রুতি-স্মৃতিও ধরিতে হয়, কিন্তু শ্রুতি-স্মৃতিতে তৎকালে শূদ্রের অধিকার ছিল না। এরূপ স্থলে ঐ সকল কল্পিত শ্লোকের যে কিছুমাত্র মূল্য নাই এবং ঐ শ্লোকের উপর নির্ভর করিয়া যে গৌড়ে ব্রাহ্মণ-কায়স্থাগমন সম্বন্ধে কোন কথাই বলা চলে না, তাহা সহজেই স্বীকার করিতে হইবে। শব্দকল্পদ্রুমের ঐ সকল অমূলক ও কাল্পনিক বচন হইতে সাধারণের ভ্রান্তধারণা হইয়াছে বলিয়াই এখানে তাহার প্রসঙ্গ উত্থাপন করিতে হইল। বাস্তবিক সুপ্রাচীন কুলগ্রন্থ হইতেই আমরা জানিতে পারিতেছি যে, ভট্টনারায়ণাদি পঞ্চ ব্রাহ্মণ আদিশূরের যজ্ঞ করিতে আসেন নাই, এবং তাঁহাদের সহিত মকরন্দঘোষাদিরও আসিবার প্রয়োজন হয় নাই। আদিশূর জয়ন্তের অভ্যুদয়ের শতাধিক বর্ষ পরে মকরন্দ ঘোষাদির জন্ম হইয়াছিল, তাহা যথাস্থানে আলোচিত হইয়াছে।

জয়ন্তের সময় গৌড়ের অবস্থা।

চীনপরিব্রাজক হিউএন্‌সিয়ং পৌণ্ড্রবর্দ্ধনে আসিয়া এখানকার যেরূপ সমৃদ্ধি দর্শন করিয়া গিয়াছেন, গৌড়াধিপ জয়ন্তের আধিপত্যকালেও এখানকার পূর্ব্ব সমৃদ্ধির কিছুমাত্র হ্রাস হয় নাই। রাজতরঙ্গিণীতে লিখিত আছে, যে সময় জয়াপীড় গৌড়ে আগমন করেন, তৎকালে এই রাজ্য সুশাসিত, সমৃদ্ধিশালী ও সুখ-শান্তিবিরাজিত ছিল। এখানকার অধিবাসিগণ বিত্তানুরাগী ও বড়ই সঙ্গীতপ্রিয় ছিলেন। তৎ-কালে পৌণ্ড্রবর্দ্ধনে কার্ত্তিকেয়-মন্দিরে যথেষ্ট আমোদ প্রমোদ ও নাট্যাভিনয় হইত। রাজধানীর বড় বড় লোক তাহাতে যোগদান করিতেন। এমন কি কাশ্মীরপতি জয়াপীড়ও এখানে ছদ্ম-বেশে নৃত্যাভিনয় দেখিতে আসেন। এখানকার দেবনর্ত্তকী কমলার নৃত্যদর্শনে কাশ্মীরপতিও চমৎকৃত হইয়াছিলেন। এমন কি কাশ্মীরপতি লুকাইয়া লুকাইয়া সেই নর্ত্তকীর গৃহে যাতা-য়াত করিতেন। সেই রমণীর ঐশ্বর্য্য ও সাজসজ্জাদর্শনে কাশ্মীরপতিও অবাক্ হইয়াছিলেন। সেই রমণী সোণার খাটে শয়ন করিত, সোণার পাত্র ব্যবহার করিত, কাশ্মীরপতির সহিত সংস্কৃতভাষায় কথা কহিত। ইহাতে মনে হয় যে তৎকালে গৌড়ে যথেষ্ট সংস্কৃতভাষার চর্চ্চা ছিল, সেই নর্ত্তকীর রূপে গুণে কাশ্মীরপতি এরূপ মুগ্ধ হইয়াছিলেন যে, গৌড়রাজকন্যা কল্যাণদেবীকে বিবাহ করিয়া কাশ্মীরে ফিরিবার সময় তিনি দেবনর্ত্তকী কমলাকেও পত্নীরূপে কাশ্মীরে লইয়া গিয়াছিলেন। তৎকালে দেবনর্ত্তকীগণের সমাজে একটু উচ্চস্থান ছিল বলিয়াই মনে হয়।

আদিশূর-জয়ন্তের সময় যে ভাবে পুনরায় ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল, পূর্ব্বেই সংক্ষেপে তাহার আভাস দিয়াছি। হর্ষদেব ও শশাঙ্কদেবের সময় হইতে শৈবধর্ম্মের বিস্তার হইতে-ছিল। জয়ন্তের সময় তাহার প্রসার আরও বৃদ্ধি হইয়াছিল। বৈদিকগণও এ সময়ে শৈবধর্ম্মে আস্থা প্রদর্শন করিতেছিলেন। বৌদ্ধ ও জৈন জনসাধারণও অনেকে শৈবধর্ম্মের অনুবর্ত্তী হইতে-ছিলেন। তৎকালে সাতশতী ব্রাহ্মণগণের মধ্যে অনেকেই বৈষ্ণব ছিলেন। এ সময় তান্ত্রিক-সমাজও কম প্রবল ছিলেন না, বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ্য উভয় সমাজেই তান্ত্রিকতা প্রসারলাভ করিতে-

ছিল। এই সকল সম্প্রদায়ের সংমিশ্রণে তান্ত্রিক শৈবধর্ম্মই প্রবল হইয়াছিল। তাঁহাদের ক্রিয়াকলাপে তাঁহারা ব্রাহ্মণ কি বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী তাহা সহসা চেনা যাইত না। সহজিয়া বৌদ্ধগণও এ সময় গৌড়বঙ্গের সর্ব্বত্র মাথা তুলিতেছিলেন। পূর্ব্ব অধ্যায়ে যে রাঢ়াধিপ শান্তিকর সিদ্ধাচার্য্যের উল্লেখ করিয়াছি, তিনি বৌদ্ধশ্রমণ হইয়া এই সহজিয়া মতের একজন প্রধান আচার্য্য হইয়াছিলেন, এই সময়ে তাঁহার পদাবলি নেপাল হইতে গৌড়বঙ্গ পর্য্যন্ত সর্ব্বত্রই গীত হইতেছিল। জনসাধারণ আত্মহারা হইয়া সেই গান শুনিয়া আনন্দ উপভোগ করিত। কিন্তু মূল বৌদ্ধধর্ম্ম কি হীনযান কি মহাযান উভয় ধর্ম্মের এ সময় যথেষ্ট বিকৃতি ঘটিয়াছিল। এই ধর্ম্মাবলম্বী উচ্চনীচ জনসাধারণ বৈদিক, পৌরাণিক, তান্ত্রিক, কি সহজিয়া কোন্ মতে চলিবেন, তাহা লইয়াও গোলযোগ উপস্থিত হইয়াছিল। নানাধর্ম্মের এইরূপ সংঘর্ষকালে আদিশূরের চেষ্টায় ব্রাহ্মণ্যপ্রাধান্যই পুনরায় প্রতিষ্ঠিত হইতেছিল; কিন্তু দুঃখের বিষয়, গৌড়াধিপের প্রকৃত উদ্দেশ্য সুসিদ্ধ হইল না। তাঁহার ইচ্ছা ছিল যে, বিশুদ্ধ বৈদিকধর্ম্ম ও বৈদিকাচার নিজ অধিকারে চালাইয়া যাইবেন, কিন্তু এখানকার জলবায়ু ও মানবের প্রকৃতির গুণে তাঁহার সে উদ্দেশ্য ঠিক সুসিদ্ধ হয় নাই। বৈদিকেরাও এখানে আসিয়া আপাতমনোরম সহজানন্দে ক্রমে ক্রমে গা ঢালিয়া দিয়াছিলেন। আদিশূরের বংশধরগণও সে স্রোতঃ নিবারণ করিতে সমর্থ হন নাই।

আদিশূরের রাজধানী

আদিশূর জয়ন্তের সমৃদ্ধিশালী রাজধানী পৌণ্ড্রবর্দ্ধন কোথায় ছিল? তাহা লইয়া যথেষ্ট মতভেদ [illegible] পূর্ব্বে জাতীয় ইতিহাস ব্রাহ্মণকাণ্ডে আমরা প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছি যে, বর্ত্তমান মালদহের উত্তরে যে বারদোয়ারি পাড়ুয়া বা হজরৎ পাণ্ডুয়ার বিস্তীর্ণ ধ্বংসাবশেষ পড়িয়া আছে, তাহাই আদিশূর জয়ন্তের রাজধানী পৌণ্ড্রবর্দ্ধন। এখন কিন্তু গৌড়াধিপ জয়ন্তের শতবর্ষ-পূর্ব্ববর্ত্তী চীন পরিব্রাজক হিউএন্‌-সিয়ঙ্গের ভ্রমণ-বিবরণী হইতে অন্যরূপ মনে হইতেছে। চীন-পরিব্রাজক রাজমহলের নিকট গঙ্গা পার হইয়া পূর্ব্বদিকে ১০০ মাইলের অধিক গেলে পর পৌণ্ড্রবর্দ্ধন নগরী প্রাপ্ত হন। মালদহ জেলাস্থ উক্ত পাণ্ডুয়া গঙ্গাতীর হইতে বেশী দূর নয়। এরূপ স্থলে দিনাজপুর, রঙ্গপুর বা বগুড়ার মধ্যে পৌণ্ড্রবর্দ্ধন রাজধানী খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে। অল্প দিন হইল, বগুড়া জেলার আদমদীঘী ষ্টেসনের অধীন উত্তরবঙ্গ-রেলপথের তিলকপুর ষ্টেসনের পূর্ব্বদিকে ৪ মাইল দূরে যে পুণ্ডরী বা পুণ্ডরীয়া[৩৮] নামে এক ক্ষুদ্র গ্রাম আছে, তাহাই কেহ কেহ গৌড়ের সুপ্রাচীন রাজধানী পৌণ্ড্রবর্দ্ধন স্থির করিয়াছেন।[৩৯] এখানে পৌণ্ড্রবর্দ্ধনের রাজধানী থাকা কিছু অসম্ভব নহে। কারণ ইহারই পার্শ্বে 'দেওরা' বা দেবপালের রাজবাটী, তাহার দেড়ক্রোশ দূরে রামশালা গ্রাম, তাহার কিছু দূরে আদমদীঘী থানার নিকট রামপুর ও রামণীগাঁ, তাহার ৩ ক্রোশ দক্ষিণে রেললাইনের ১ মাইল দূরে বড়বড়িয়া গ্রাম,[৪০]

(৩৮) গবর্মেণ্টের জরিপের মানচিত্রে এই স্থান Pundoora বা পাণ্ডুয়া নামে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

(৩৯) শ্রীযুক্ত কৈলাসচন্দ্র সিংহ-রচিত পৌণ্ড্রবর্দ্ধন প্রবন্ধ, সাহিত্য, ১৩১৮, ৭৮৪-৮৮ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

(৪০) এই গ্রামে সুবৃহৎ সপ্তকাণ্ড রামায়ণ-রচয়িতা অদ্ভুতাচার্য্য জন্মগ্রহণ করেন।

তাহার পার্শ্বে বিজয়কান্দি ও যশোহর গ্রাম এবং ২॥০ ক্রোশ দক্ষিণপূর্ব্বে 'জয়সাগর' রহিয়াছে। উক্ত গ্রামসমূহ হইতে আমরা প্রসিদ্ধ পালবংশীয় দেবপাল, জয়পাল ও রামপালের নাম পাইতেছি। রামপালচরিতের উপসংহারে কবি সন্ধ্যাকরনন্দী নিজ বাসস্থানের পরিচয় প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন,—

"বসুধাশিরোবরেন্দ্রীমণ্ডলচূড়ামণিকুলস্থানং।
শ্রীপৌণ্ড্রবর্দ্ধনপুরপ্রতিবদ্ধঃ পুণ্যভূঃ বৃহদ্বটুঃ॥"

অর্থাৎ 'পৃথিবীর শীর্ষস্থানীয় বরেন্দ্রীমণ্ডল, তাহার চূড়ামণিরূপ কুলস্থানই পুণ্যভূমি বৃহদ্বটু—(এই স্থান) শ্রীপৌণ্ড্রবর্দ্ধনপুরে সংবদ্ধ'। 'বটু' শব্দের অপভ্রংশে বড়ু বা বড়ুয়া। এইরূপে বৃহদ্বটুর অপভ্রংশে বড়বড়ুয়া ও বড়বড়িয়া হওয়া সম্ভবপর। উপরে যে 'বড়বড়িয়া' গ্রামের উল্লেখ করিলাম, তাঁহার নিকট হইতে ৫ ক্রোশের মধ্যে বহুতর পুরাতন ধ্বংসাবশেষের নিদর্শন রহিয়াছে। পালরাজগণের স্মৃতি, পৌণ্ড্রের অপভ্রংশে 'পুণ্ডরিয়া' নাম ও বিশাল ধ্বংসাবশেষ হইতে অনায়াসেই মনে হইবে যে, এক সময়ে এখানে পালরাজগণের রাজধানী 'পৌণ্ড্র-বর্দ্ধনপুর' অবস্থিত ছিল। বড়বড়িয়ার পার্শ্ববর্ত্তী 'বিজয়কান্দি' ও 'যশোহর' গ্রাম হইতে মনে হয় যে, এখানে সেনরাজ বিজয়সেন কিছুকাল ছাউনী করিয়া ছিলেন এবং যেখানে তাঁহার সহিত যুদ্ধে রামপালের যশ অপহৃত হয়, সেই স্থান পরে 'যশোহর' নামে পরিচিত হইয়াছে। সম্ভবতঃ রামপাল এখানে পরাজিত হইয়া রাজধানী পরিবর্ত্তন করেন। গঙ্গা-করতোয়া-সঙ্গমে তাঁহার নূতন রাজধানী 'শ্রীরামাবতী' প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল।[৪১] কিন্তু বৃহদ্বটুর সন্নিহিত পৌণ্ড্রবর্দ্ধনপুর ও জয়ন্তের রাজধানী পৌণ্ড্রবর্দ্ধন অভিন্ন বলিয়া গ্রহণ করিতে সন্দেহ আছে। কেহ কেহ মনে করেন গৌড় বা পৌণ্ড্রের রাজধানীর প্রকৃত নাম বর্দ্ধনপুর, পৌণ্ড্রের রাজধানী বলিয়া পৌণ্ড্রবর্দ্ধনপুর বলা হইত। বর্দ্ধনপুরই পরে 'বর্দ্ধনকুটী' ও অধুনা রাজবাড়ী নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছে। পূর্ব্বোক্ত পুণ্ডরিয়া গ্রাম হইতে ১৩ ক্রোশ উত্তরপূর্ব্বে বর্দ্ধনকুটী অবস্থিত। ইহারই নিকট মদনতৈর, গোবিন্দগঞ্জ এবং মদনতৈরের ৬ মাইল দক্ষিণ পূর্ব্বে গড়ফতেপুরের পার্শ্বে কুমারপালা গ্রামগুলি কুমারপাল, মদনপাল, গোবিন্দপাল প্রভৃতি পরবর্ত্তী পালনরপতিগণের স্মৃতি যেন জাগাইয়া রাখিয়াছে, এরূপ স্থলে উক্ত বর্দ্ধনকুটীও এক সময় পৌণ্ড্রবর্দ্ধনপুর নামে শেষপাল-নৃপতিগণের রাজধানীরূপে গণ্য ছিল বলিয়া মনে করিতে পারি। কিন্তু চীনপরিব্রাজক যে গৌড়-রাজধানীতে আসিয়া ছিলেন ও কাশ্মীরপতি জয়াপীড় যে পৌণ্ড্রবর্দ্ধন-নগরে কার্ত্তিকেয়-মন্দিরে উপস্থিত হইয়াছিলেন, ইহা সেই 'পৌণ্ড্রবর্দ্ধন' বলিয়া মনে হয় না। উক্ত বর্দ্ধনকুটী হইতে ১২ মাইল দক্ষিণে ও বগুড়া সহর হইতে ৭ মাইল উত্তরপশ্চিমে মহাস্থানগড় নামে যে সুপ্রাচীন স্থান আছে, চীন-পরিব্রাজক ও রাজতরঙ্গিণীর বর্ণনা-অনুসারে এই স্থানকেই আমরা জয়ন্তের রাজধানী পৌণ্ড্রবর্দ্ধননগরী মনে করি। চীন-পরিব্রাজক এখানে আসিয়া ১০০ দেবমন্দির, ২০টী বৌদ্ধ সঙ্ঘারাম ও তাহাতে তিন হাজারের অধিক শ্রমণ ও বহুসংখ্যক দিগম্বর জৈন দর্শন করিয়া

(৪১) পরবর্ত্তী ৫ম অধ্যায়ে 'রামপাল' প্রসঙ্গে এই রামাবতী সম্বন্ধে আলোচনা দ্রষ্টব্য।

ছিলেন। এখনও এই মহাস্থানে হিন্দু, বৌদ্ধ ও জৈন সম্প্রদায়ের অতীত নিদর্শন যথেষ্ট রহিয়াছে। চীন-পরিব্রাজক পৌণ্ড্রবর্দ্ধন রাজধানী হইতে প্রায় ২০লি বা সাড়ে তিন মাইল দূরে 'পো-ষি-পো' নামে মহাযান-সম্প্রদায়ের একটী বৃহৎ বিহার দর্শন করিয়া ছিলেন[৪২], মহাস্থান গড়ের প্রায় ৪ মাইল পশ্চিমে বিহার ও 'ভাসুবিহার' গ্রাম বিদ্যমান, এই ভাসুবিহারে 'নরপতির ধাপ' নামে একটী প্রকাণ্ড স্তূপ দর্শকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ইহারই পার্শ্বে 'সন্ন্যাসীর বাড়ী' নামে একটী সুন্দর চিত্র-খোদিত ইষ্টকালয়ের ধ্বংসাবশেষ এবং তাহার উত্তরে শশাঙ্ক-দীঘী বর্ত্তমান। ভাসুবিহারই সম্ভবতঃ চীন-পরিব্রাজকের 'পো-ষি-পো' বিহার। কর্ণসুবর্ণ বা রাঢ়পতি মহারাজ শশাঙ্কদেব পৌণ্ড্রবর্দ্ধন অধিকার করিয়া এখানে পুষ্করিণী প্রতিষ্ঠা করিয়া থাকিবেন। রাজতরঙ্গিণী হইতে পৌণ্ড্রবর্দ্ধনের যে কার্ত্তিকেয়-মন্দিরের পরিচয় পাইয়াছি, মহাস্থানগড়ের এক মাইল দক্ষিণপূর্ব্বে করতোয়াতীরে অধুনা গোকুল নামক স্থানে কার্ত্তিকেয়দেবের একটী প্রকাণ্ড মন্দির ছিল, তাহারও প্রবাদ শুনা যায়।[৪৩] এখানকার স্থানীয় করতোয়া-মাহাত্ম্যেও উক্ত কার্ত্তিকেয়-নিকেতনের উল্লেখ আছে। এই সকল কারণে বর্ত্তমান মহাস্থানই গৌড়ের সুপ্রাচীন রাজধানী পৌণ্ড্রবর্দ্ধন বলিয়া মনে করিতেছি। পালরাজগণের সময় পৌণ্ড্রবর্দ্ধন রাজধানী বিভিন্ন স্থানে স্থানান্তরিত হওয়ায় ও সেই সেই স্থান পৌণ্ড্রদেশের রাজধানী বলিয়া তাহাও পরে 'পৌণ্ড্রবর্দ্ধনপুর' নামে পরিচিত হওয়ায় আদি পৌণ্ড্রবর্দ্ধনের নাম ক্রমে বিলুপ্ত বা পরিবর্ত্তিত হইয়া থাকিবে। চীন-পরিব্রাজক বর্ত্তমান মুঙ্গের দর্শন করিয়া লিখিয়া ছিলেন যে, 'অল্পদিন হইল নিকটবর্ত্তী জনপদের রাজা এখানকার অধিপতিকে রাজ্যচ্যুত করিয়া বৌদ্ধ শ্রমণদিগকে অর্পণ করিয়াছেন।[৪৪] পরবর্ত্তী কালে এই মুঙ্গেরই দেবপালের রাজধানী বলিয়া পরিচিত হয়।[৪৫] সম্ভবতঃ তিনি মহাযান শ্রমণদিগের নিকট হইতে মুঙ্গের গ্রহণ করিয়া তৎপরিবর্ত্তে এই স্থান তাঁহাদিগকে অর্পণ করিয়া থাকিবেন, তাঁহাদিগের নামানুসারে এই স্থান 'মহাযানস্থান' নামে পরিচিত হয়। পূর্ব্ব হইতে এই স্থানের কার্ত্তিকেয়ের মন্দির প্রসিদ্ধ ছিল এবং তৎপরে মহাযানদিগের একটী কেন্দ্র বলিয়া পরিগণিত হইলেও বহুদূর দেশ হইতে পুণ্যার্থী তীর্থযাত্রিগণ এখানে আগমন করিতেন। ক্রমে হিন্দু ও বৌদ্ধ সাধারণের নিকট এই স্থান তীর্থ বলিয়া পরিচিত হইল। স্কন্দপুরাণীয় পৌণ্ড্রখণ্ডান্তর্গত করতোয়া-মাহাত্ম্যে ইহারই পরিচয় পাইতেছি। করতোয়া-মাহাত্ম্যে পঞ্চক্রোশী পুণ্যক্ষেত্র বলিয়া এই স্থান কীর্ত্তিত হইয়াছে। মহাযান-স্থানই পরবর্ত্তী কালে 'মহাস্থান' নামে পরিচিত হইল। পূর্ব্ব হইতেই এখানে গড় থাকায় এই স্থান 'মহাস্থানগড়' নামেও অভিহিত হইতেছে। যে পঞ্চ ব্রাহ্মণ কুলগ্রন্থে সাত্ত্বিক মুনি বলিয়া প্রশংসিত, যে স্থানে তাঁহাদের প্রথম পদার্পণ ঘটিয়াছিল—যে স্থান

(৪২) Watters' Yuan Chuang, Vol II. p. 184.
(৪৩) রঙ্গপুর-সাহিত্য-পরিষৎ হইতে প্রকাশিত 'বগুড়ার ইতিহাস', ৫২ পৃষ্ঠা।
(৪৪) Watter's Yuan Chuang, Vol. II. p. 178.
(৪৫) ৫ম অধ্যায়ে ধর্ম্মপাল ও দেবপালের প্রসঙ্গ দ্রষ্টব্য।

হইতে গৌড়বঙ্গে বৈদিকাচার-প্রবর্ত্তনের সূত্রপাত হইয়াছিল, তাহারও বহু পূর্ব্বে এমন কি অশোকের সময়েও যে পৌণ্ড্রবর্দ্ধন জৈনদিগের একটী প্রধান কেন্দ্র বলিয়া পরিচিত ছিল,[৪৬] প্রসিদ্ধ সাঞ্চিস্তূপ হইতে আবিষ্কৃত খৃষ্টপূর্ব্ব ৩য় শতাব্দীর ধ্বংসাবশেষ হইতেও যে পৌণ্ড্র-বর্দ্ধনবাসী বৌদ্ধের ধর্ম্মানুরাগের পরিচয় বাহির হইয়াছে,[৪৭]—সেই স্থান যে পরবর্ত্তী কালে সর্ব্বসাধারণের নিকট পুণ্যতীর্থ বলিয়া পরিচিত হইবে, তাহা যেন স্বভাবসিদ্ধ বলিয়াই মনে হয়।

যে সময়ে সুদূর উত্তর-ভারতে মহারাজ জয়ন্তের আধিপত্য বিস্তৃত হইয়াছিল, সেই সময়ে তাঁহার আত্মীয়স্বজনগণ যে, সেই দূরদেশে তাঁহার প্রতিনিধিরূপে আধিপত্য করিতে থাকেন, সুদূর নেপাল ও হিমালয়প্রদেশ হইতে আবিষ্কৃত শিলালিপি ও তাম্রশাসন হইতে তাহার সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। জয়ন্ত অন্তিমকালে পঞ্চগৌড়ের আধিপত্য হারাইলেও শূরবংশীয় তাঁহার আত্মীয় স্বজনের বংশধরগণ পরবর্ত্তী কালেও হিমাদ্রিপ্রদেশে আধিপত্য করিয়া গিয়াছেন, পাণ্ডুকেশ্বর হইতে আবিষ্কৃত ৮৫৩ খৃঃ অব্দে উৎকীর্ণ ললিতশূরের তাম্রশাসন[৪৮] এবং নেপাল হইতে আবিষ্কৃত রণশূরের[৪৯] শিলালিপি হইতে তাহার সন্ধান পাওয়া যাইতেছে।

গৌড়পতি জয়ন্তশূর রাজ্যচ্যুত বা কালগ্রাসে পতিত হইলে ভূশূর গৌড়রাজধানী পৌণ্ড্রবর্দ্ধন ত্যাগ করিয়া রাঢ়দেশে চলিয়া আসেন। এই সময় উত্তর ও পূর্ব্ববঙ্গের বৌদ্ধ জনসাধারণ অরাজক গৌড়রাজ্যের সিংহাসনে বঙ্গরাজপুত্র গোপালকে অভিষিক্ত করিয়াছিলেন। প্রথমে হয়ত গোপাল বৎসরাজের একজন মহাসামন্তরূপে অধিষ্ঠিত হইয়াছিলেন, অবশেষে প্রজাসাধারণের চেষ্টায় ও বৎসরাজের মরুরাজ্যে পলায়নের সঙ্গে তিনিও স্বাধীন হইলেন। তখনও ব্রাহ্মণ-উপনিবেশ 'সাতশইকায়' আদিশূরের অনুরক্ত ও পরাক্রান্ত ব্রাহ্মণরাজগণ সামন্তভাবে বাস করিতেছিলেন। তাঁহাদের অধিকারের নিকটবর্ত্তী স্থান অনেকটা নিরাপদ্ মনে করিয়া ভূশূর তথায় আসিয়া নূতন রাজধানী স্থাপন করেন।[৫০] এ সময়ও সমস্ত রাঢ় শূরবংশের অধিকারভুক্ত ছিল। ভূশূর পিতার ন্যায় রাজনীতিকুশল, সাহসী ও শক্তিশালী ছিলেন না, তবে তিনি পিতার ন্যায় দেবদ্বিজভক্ত ও স্বধর্ম্মনিরত ছিলেন। তাঁহারই সময়ে এখানকার ব্রাহ্মণসমাজ রাঢ়ীয়, বারেন্দ্র ও সাতশতী এই তিন শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়া

ভূশূর ও তাঁহার রাজধানী

(৪৬) দিব্যাবদান ৪২৭ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

(৪৭) Epigraphia Indica, Vol. II. p. 95.

(৪৮) Proc. Asiatic Society of Bengal, 1877. p. 72.

(৪৯) Bendall's Catalogue of the Buddhist Mss, p. XIII, and Cunningham, Arch. Sur. Rept. Vol. III. plate XLV.

(৫০) বিশ্বকোষে 'বঙ্গদেশ' শব্দে ও বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস ব্রাহ্মণকাণ্ডে পূর্ব্বে লিখিয়াছিলাম যে, গোপালের পুত্র ধর্ম্মপাল ভূশূরকে বিতাড়িত করিয়া গৌড়ের সিংহাসন অধিকার করেন। কিন্তু সেই সময়ের পূর্ব্বাপর ঘটনাবলী আলোচনা করিয়া এখন দেখিতেছি যে, বৎসরাজই ভূশূরকে গৌড়-রাজ্যাধিকার হইতে বঞ্চিত করিয়াছিলেন।

পড়েন। যাঁহারা বৌদ্ধ পালাধিকারভুক্ত গৌড়রাজ্যে বাস করিতেন, তাঁহারা বারেন্দ্র বলিয়া খ্যাত হইলেন; যাঁহারা পূর্ব্ব হইতে রাঢ়দেশে বাস করিতেন, অথবা ভূশূরের সহিত গৌড় ত্যাগ করিয়া রাঢ়ে আসিয়া বাস করেন, তাঁহারা রাঢ়ীয় এবং আদিশূরের প্রধান সহায় সপ্তশত ব্রাহ্মণগণের বংশধরগণ 'সাতশতী' নামে পরিচিত হইলেন।[৫১] যেখানে ভূশূরের রাজধানী প্রতিষ্ঠিত হয়, তাহা 'শূরনগর' নামে পরিচিত হইল। এই স্থান বর্দ্ধমান জেলার 'সাতশইকা' পরগণার বাহিরে কাঁটোয়ার কিছু দূরে মন্তেশ্বর থানায় অবস্থিত। এক্ষণে 'শূরো' নামে পরিচিত।[৫২]

পূর্ব্বে শশাঙ্কদেবের প্রসঙ্গে রাঢ়দেশের সমৃদ্ধির কথা লিখিত হইয়াছে। ভূশূরকর্তৃক পুনরায় রাঢ়দেশে রাজধানী প্রতিষ্ঠিত হইলে যাঁহারা বৈদিকধর্ম্মের পক্ষপাতী ও ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মে অনুরাগী ছিলেন, এরূপ বহুসম্ভ্রান্ত উচ্চজাতি দলে দলে রাঢ়ে আসিয়া বাস করিতে লাগিলেন। গৌড়ে পালরাজগণের আধিপত্য-বিস্তারের সহিত যাঁহারা পূর্ব্বে ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মে অনুরক্ত ছিলেন, এরূপ উচ্চনীচ সকল জাতিই বৌদ্ধাচারী হইতেছিলেন, কিন্তু রাঢ়দেশে আদিশূরের প্রবর্ত্তিত সদাচার-রক্ষায় অনেকে উদ্যোগী ছিলেন। বলিতে কি, গৌড়ের সহিত রাঢ়দেশের ধর্ম্ম ও আচার-ব্যবহারের যথেষ্ট পার্থক্য ঘটিতেছিল, তাহাতে এক সমাজের লোক অপর সমাজকে মর্য্যাদায় ও আভিজাত্যে একটু হীন জ্ঞান করিতে লাগিলেন। ক্রমে আচার ও ধর্ম্মনিষ্ঠ ব্রাহ্মণশাসিত রাঢ়ীয় হিন্দুসমাজ বৌদ্ধ গৌড়সমাজ হইতে কতকটা পৃথক্ হইয়া পড়িলেন। এমন কি বৌদ্ধাচার হইতে দূরে রাঢ়ীয় সমাজের সম্পূর্ণ স্বাতন্ত্র্যরক্ষার জন্য বৈদিক-ব্রাহ্মণ-বংশধরগণ সাধ্যমত চেষ্টা করিতেছিলেন। শূরনরপতিগণও যাহাতে উচ্চজাতির মধ্যে শাস্ত্রানুমোদিত সদাচার রক্ষিত হয়, সেজন্য বিশেষ মনোযোগী ছিলেন।

রাঢ়াধিপ ভূশূর নিজ-রাজ্য ও মানসম্ভ্রমরক্ষার জন্য অনেকটা ব্যস্ত ছিলেন। যে সকল ব্রাহ্মণ তাঁহার সহিত আসিয়া রাঢ়বাসী হইয়াছিলেন, এখানে তাঁহাদিগকে স্থায়িভাবে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য তিনি তেমন সুযোগ পান নাই। তৎপুত্র ক্ষিতিশূর রাঢ়ের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত

ক্ষিতিশূর

হইয়া সামাজিক শৃঙ্খলাস্থাপন ও সাগ্নিক ব্রাহ্মণগণের নিষ্ঠা ও সদাচার রক্ষার জন্য তাঁহাদিগের প্রত্যেককে এক একখানি গ্রাম দান করিয়াছিলেন। কুলগ্রন্থে ৫৬ খানি গ্রামদানের বিবরণ দেখিতে পাওয়া যাইতেছে। কিন্তু নারায়ণভট্টের 'ছন্দোগপরিশিষ্টপ্রকাশ' ও ভবদেবভট্টের কুলপ্রশস্তি হইতে জানা যায় যে, আদিশূরের সময় হইতে শূরনৃপতিগণ রাঢ়দেশে বেদবিদ্ ব্রাহ্মণগণকে বহু শাসনগ্রাম দান

(৫১) বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস, ব্রাহ্মণকাণ্ড, ১মাংশ (২য় সংস্করণ) ১১৫ পৃঃ।

(৫২) পূর্ব্বে লেখা হইয়াছিল ভূশূর রাঢ়ে 'পুণ্ড্র' নামে নূতন রাজধানী পত্তন করিয়া তথায় রাজত্ব করিতে থাকেন। (ব্রাহ্মণকাণ্ড, ১মাংশ, ১১৫ পৃষ্ঠা) কিন্তু সম্প্রতি শূরনগর হইতে যে ধ্বংসাবশেষ ও অতীতকীর্ত্তির নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে এই স্থানেই শূরবংশের রাজধানী ছিল বলিয়া মনে হইতেছে। (সাহিত্য পরিষৎপত্রিকা, ১৩১৯, ৬১-৬২ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।)

করিয়াছিলেন। যাঁহাকে যে গ্রাম দেওয়া হইয়াছিল, তিনি সেই গ্রামের 'গ্রামীণ' বা গ্রামপতি হইয়াছিলেন। সেই গ্রামের ধর্ম্ম ও সমাজনৈতিক শাসনের ভার, দেওয়ানী ও ফৌজদারী সকল প্রকার বিচারের ভার ও করগ্রহণের অধিকার, শাসনগৃহীতা ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণবংশের উপর ন্যস্ত হইয়াছিল। সেই গ্রামপতিত্ব হইতেই তাঁহাদের বংশধরগণের গাঁঞি প্রচলিত হইয়াছে। বলিতে কি, শূররাজবংশ এতদূর ধর্ম্মনিষ্ঠ ও ব্রাহ্মণভক্ত ছিলেন যে, রাঢ়দেশের প্রায় অর্দ্ধাংশ ব্রাহ্মণগণকে দান করিয়াছিলেন। এই কারণেই রাঢ়দেশে অপ্রতিম ব্রাহ্মণপ্রভাব।

কেবল যে শূরনৃপতিগণ নানা শাসনগ্রাম দিয়া নিজ রাজ্যমধ্যে বৈদিক ব্রাহ্মণ প্রতিষ্ঠা করিতেছিলেন, তাহা নহে। সপ্তশতী-বংশোদ্ভব ব্রাহ্মণ-সামন্তরাজগণও বৈদিক বিপ্রবংশধরগণকে স্ব স্ব অধিকারে প্রতিষ্ঠা ও আত্মীয়তাসূত্রে আবদ্ধ করিবার উচ্চ আশায় বহুতর শাসনগ্রাম দান করিয়াছিলেন। শ্রীনারায়ণের ছন্দোগপরিশিষ্ট-প্রকাশে গ্রন্থকার নিজ পূর্ব্বপুরুষের পরিচয়দানকালে স্পষ্টই এ কথা স্বীকার করিয়া গিয়াছেন, আমরা পূর্ব্বেই তাহার উল্লেখ করিয়াছি।

সপ্তশতী ব্রাহ্মণের শাসনদান

ক্ষিতিশূরের রাজত্বের শেষাংশে গৌড়াধিপ ধর্ম্মপালের পুত্র দেবপাল রাঢ়দেশ দখল করেন। এই সময় কিছুকালের জন্য শূরবংশীয় নৃপতি[illegible]-অধীশ্বরগণের আনুগত্য স্বীকার করেন এবং মহাসামন্ত নৃপতি বলিয়া গণ্য হন। শূরবংশের [illegible]ধিপত্য কাড়িয়া লইয়া হয়ত দেবপাল আপন প্রিয়পুত্রের 'শূরপাল' নাম রাখিয়াছিলেন। শূরব[illegible] হস্ত হইতে দেবপাল যে রাঢ়ের আধিপত্য গ্রহণ করেন, রাঢ়ীয় কুলাচার্য্য হরিমিশ্রও নিজ-কারিকায় তাহার এইরূপ আভাস দিয়াছেন—'আদিশূর-বংশধরগণের পর শ্রীদেবপাল গৌড়ে ও রাষ্ট্রে বা রাঢ়ে রাজা হইয়াছিলেন, তিনি অতিশয় প্রবল, দৈববলসম্পন্ন, প্রজ্ঞা বাক্য-বিবেক-শীল ও বিনয় দ্বারা শুদ্ধাশয়, ধর্ম্মে মতি ও নিজ বংশীয়ের প্রতি নিয়ত অনুরক্ত ছিলেন।'[৫৩]

এখানে 'নিজবংশীয়' বলিবার কারণ এই যে, দেবপাল আপনার প্রিয়ভ্রাতা জয়পালকেই উত্তররাঢ়ে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। পূর্ব্বেই লিখিয়াছি যে, সেই জয়পালের নিকটই শ্রাদ্ধোপলক্ষে ছন্দোগ-পরিশিষ্টপ্রকাশরচয়িতা রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণপ্রবর নারায়ণের পিতামহ উমাপতি মহাদান গ্রহণ করিয়াছিলেন।

উত্তররাঢ়ে বৌদ্ধ পালনৃপতির শাসন প্রতিষ্ঠিত হইলে শূররাজ ক্ষিতিশূর, তৎপুত্র অবনীশূর এবং তাঁহাদের দক্ষিণহস্তস্বরূপ সাতশতী সামন্তরাজগণের আধিপত্য-হ্রাসের সহিত সাত্ত্বিক

(৫৩)　"শূরাপালপ্রতিভূর্ভুবঃ পতিরভূদ্‌গৌড়ে চ রাষ্ট্রে ততঃ
রাজাঽভূৎ প্রবলঃ সদৈব শরণঃ শ্রীদেবপালস্ততঃ।
প্রজ্ঞাবাক্যবিবেকশীলবিনয়ৈঃ শুদ্ধাশয়ঃ শ্রীযুতো
ধর্ম্মে চাস্ত মতিঃ সদৈব রমতে স স্বীয়বংশোদ্ভবে।"　(হরিমিশ্র)

ব্রাহ্মণ-বংশধরগণের মধ্যে রাঢ়ীয়সমাজে বৈদিকাচার প্রবর্ত্তনের আশা অনেকটা রুদ্ধ হইয়াছিল। এ সময়ে আচার্য্যগণ হিন্দু ও বৌদ্ধসাধারণের উপযোগী তান্ত্রিক ও পৌরাণিক ধর্ম্মানুষ্ঠানপ্রচারে উদ্যোগী হইয়াছিলেন, এই কারণে যাঁহারা সোমপীথী, সামগ ও মীমাংসক প্রভাকর-মতাবলম্বী ছিলেন, তাঁহাদের বংশধরগণ তন্ত্রে ও পুরাণে কৃতবিদ্য হইতেছিলেন, উক্ত নারায়ণের পিতা গোনের পরিচয়ে তাহার প্রসঙ্গ পাওয়া গিয়াছে।

অবনীশূর

গৌড়রাজমালাকার যথার্থই লিখিয়াছেন—"দেবপালের মৃত্যুর পর অর্দ্ধশতাব্দী কাল গৌড়-রাজ্য উন্নতিহীন হইয়া নিশ্চল অবস্থায় ছিল। কিন্তু তখন হইতেই ভিতরে ভিতরে ইহার অধঃপাতের সূত্রপাত হইতেছিল। দ্বিতীয় গোপালের পুত্র ও উত্তরাধিকারী দ্বিতীয় বিগ্রহ-পালের ভাগ্যে অখণ্ড গৌড়রাজ্যসম্ভোগ ঘটিয়া উঠে নাই।"[৫৪]

দেবপালের উত্তররাঢ়ে আধিপত্য-বিস্তারকালে শূরবংশ দক্ষিণরাঢ়ে সরিয়া আসেন। তাঁহারা যে স্ব স্ব পূর্ব্বগৌরব উদ্ধারের জন্য নিশ্চিন্ত ছিলেন, তাহা নহে। তাঁহারা প্রবল পরাক্রান্ত দেবপালের সময় মস্তকোত্তোলনের সুযোগ না পাইলেও তৎপুত্র ১ম শূরপালের সময় সুযোগ ও সুবিধা খুঁজিতেছিলেন। কিন্তু তাঁহার বিচক্ষণ মন্ত্রী কেদারমিশ্রের পরাক্রমে ও মন্ত্রণাগুণে সকলকেই অবনতমস্তকে থাকিতে হইয়াছিল। শূরপাল ও কেদারমিশ্রের মৃত্যুর পর ১ম বিগ্রহপালের সময় দক্ষিণপশ্চিম হইতে রাষ্ট্রকূটপতি ২য় কৃষ্ণ[৫৫] এবং উত্তরদিক্ হইতে হৈহয়রাজ গুণাম্ভোধিদেব গৌড় আক্রমণ করেন। গুণাম্ভোধির "আহৃতা গৌড়লক্ষ্মী"[৫৬] এইরূপ পরিচয় থাকায় মনে হয় যে, গৌড়ের কিয়দংশ তিনি অধিকার করিয়াছিলেন। এ সময় গৌড়পতি বিগ্রহপাল প্রবল শত্রুর আক্রমণ হইতে নিজ-রাজ্য-রক্ষায় ব্যস্ত হইয়া পড়েন, সেই সুযোগে অবনীশূরের পুত্র ধরণীশূর উত্তররাঢ় অধিকার করিয়া আবার স্বাধীনতা ঘোষণা করেন এবং 'আদিত্যশূর' নাম গ্রহণপূর্ব্বক উত্তররাঢ়ে সিংহেশ্বরে অধিষ্ঠিত হইলেন। এই সময় সিংহেশ্বর সমস্ত রাঢ়ের রাজধানী বলিয়া পরিচিত হইল। পূর্ব্বপুরুষ জয়ন্তের ন্যায় তাঁহারও সমাজসংস্কারে অভিলাষ ছিল। ব্রাহ্মণাভ্যুদয়ের সহায় বহু সামন্ত-নৃপতি তাঁহার অনুবর্ত্তী হইয়াছিলেন। সম্ভবতঃ এ সময়ে আদিত্যশূর রাষ্ট্রকূটনৃপতির সহিত কোন প্রকার সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হইয়াছিলেন, কারণ রাষ্ট্রকূটপতি গুর্জ্জর, লাট, গৌড়, অঙ্গ, কলিঙ্গ ও মগধ পর্য্যন্ত আক্রমণ করিলেও রাঢ়ের প্রতি বিদ্বেষভাব পোষণ করেন নাই। এ সময় কলিঙ্গেও ব্রাহ্মণ-অভ্যুদয় হইতেছিল[৫৭]। সম্ভবতঃ রাষ্ট্রকূটবংশের অথবা কলিঙ্গাধিপের সহায়তায় রাঢ়াধিপ আদিত্যশূর

আদিত্যশূর

(৫৪) শ্রীরমাপ্রসাদ চন্দ-রচিত গৌড়রাজমালা ৩৪ পৃষ্ঠা।

(৫৫) Epigraphia Indica, Vol. IV. p. 283.

(৫৬) Epigraphia Indica, Vol. VII. p. 85.

(৫৭) M. M. Haraprasad Shastri's 3rd Report on Sanskit Mss, p. 10

বৈদিকমার্গ-প্রবর্ত্তনের জন্য আবার বৈদিক ব্রাহ্মণ আনাইয়াছিলেন। উত্তররাঢ়ীয় কায়স্থ-কুলপঞ্জিকায় লিখিত আছে—

"রাঢ়দেশে মহারাজা আদিত্যশূর নাম।
গঙ্গার সমীপে বাস সিংহেশ্বর ধাম॥
আদর করিয়া আনে ঋষি পঞ্চজন।
সেই সঙ্গে পঞ্চগোত্র করিল গমন॥" (শ্যামদাসী ডাক

উত্তররাঢ়ীয় কুলপঞ্জিকায় উক্ত পঞ্চবীজী পুরুষের নাম থাকিলেও ব্রাহ্মণপঞ্চকের নাম নাই। কোন কোন আধুনিক কুলগ্রন্থকার তাঁহাদের স্থলে ১ম আদিশূরের সভায় সমাগত ক্ষিতীশাদি পঞ্চ সাগ্নিকের নাম উল্লেখ করিয়াছেন।

রাঢ়ে ব্রাহ্মণ ও কায়স্থাগমন

কিন্তু সেই পঞ্চবিপ্র ঐ সময়ের শতাধিক বর্ষ পূর্ব্বে আসিয়াছিলেন, গৌড়াধিপ জয়ন্তের প্রসঙ্গে পূর্ব্বেই তাহা লিখিত হইয়াছে। সংস্কৃতভাষায় লিখিত একখানি উত্তররাঢ়ীয় কুলপঞ্জিকায় লিখিত আছে, গৌড়দেশে ক্ষিতীশাদি পঞ্চবিপ্রের আগমনের কিছুকাল পরে বাৎস্য অনাদিবরসিংহ ও সৌকালিন সোম ঘোষ অযোধ্যা হইতে, মৌদ্গল্য পুরুষোত্তম মথুরা হইতে এবং বিশ্বামিত্র সুদর্শন ও কাশ্যপ দেবদত্ত মায়াপুর হইতে প্রথমে কান্যকুব্জে উপস্থিত হইয়াছিলেন। তৎকালে কান্যকুব্জে যিনি রাজা ছিলেন, তাঁহারও নাম আদিশূর। ইঁহার সভায় পঞ্চ কায়স্থ এবং সুশীল, মাধবাদি পঞ্চ [illegible]ক উপস্থিত হইয়াছিলেন। ইঁহারা পরে কান্যকুব্জ হইতে উত্তররাঢ়ে আদিত্যশূরের সভায় [illegible]মন করেন।[৫৮] এই ঘটনা স্মরণ করিয়া আধুনিক উত্তররাঢ়ীয় কুলাচার্য্যগণ বলিয়া থাকেন—

"বিপ্র পঞ্চ করণ পঞ্চ ভৃত্য পঞ্চ তায়।
ত্রিপঞ্চকে সমাগত আদিশূরের সভায়॥"

কায়স্থাগমন কাল

কুলাচার্য্য পঞ্চাননের কারিকায় লিখিত আছে—৮০৪ শকে ফাল্গুন মাসে উক্ত পঞ্চগোত্রের পঞ্চ কায়স্থ কোলাঞ্চ হইতে রাঢ়ে আগমন করেন।[৫৯]

(৫৮) "বাৎস্যগোত্রোঽনাদিবরঃ সোমঃ সৌকালিনেন চ। পুরুষোত্তমো মৌদ্গল্যো বিশ্বামিত্রঃ সুদর্শনঃ॥
কাশ্যপো দেবনামা চ ইতি তে কথিতং মুদা। ততোঽনাদিবরঃ সোমোঽযোধ্যায়ামুবাস চ॥
পুরুষোত্তম উবিত্বা বৈ মথুরাঞ্চ সদা সুখী। ততঃ সুদর্শনদেবো মায়াপুর্য্যাং তথাবসৎ॥ ...
কান্যকুব্জপ্রদেশেশ আদিশূরো মহামতিঃ। প্রাপয়ামাস পথিকান্ মাধবাদি-সুশীলকান্॥
ক্রতৌ দেয়ং সংপ্রদাতুং সাগ্নীনাং স্থানমুত্তমম্। ততশ্চ পথিকাঃ সর্ব্বে তানাহর্বদ্ধ্বি স্থিতং॥
ততশ্চ পঞ্চভির্ভৃত্যৈঃ পথিকৈশ্চ দ্বিজাতয়ঃ। আদিশূরসমীপং বৈ আগচ্ছন্তি চ তাপসাঃ॥"

(৫৯) আধুনিক কুলগ্রন্থকারগণ অনেক স্থলে আদিত্যশূরকে 'আদিশূর' রূপে পরিচিত করিয়াছেন। আবার তাঁহার সময়ে কান্যকুব্জের যিনি অধিপতি ছিলেন, তিনিও উত্তর-রাঢ়ীয় কুলগ্রন্থে 'আদিশূর' নামেই অভিহিত হইয়াছেন।

পূর্ব্বে অনেকবার লিখিয়াছি যে, বিভিন্ন সময়ে ভারতের বিভিন্ন স্থান হইতে গৌড় ও রাঢ়-দেশে কায়স্থ-সমাগম হইয়াছিল এবং রাজা কর্ণসেন, মহারাজ শশাঙ্ক এবং গৌড়পতি জয়ন্তের সময়েও রাজকার্য্য উপলক্ষে বহু কায়স্থ এই স্থান হইতে ভারতের নানাস্থানে প্রেরিত হইয়াছিলেন। এরূপ বহুবার বহুসংখ্যক কায়স্থের গমনাগমন ঘটিলেও এদেশীয় কুলগ্রন্থকারগণ তাঁহাদের সম্বন্ধে কিছু না লিখিয়া অনাদিবরসিংহ, সোমঘোষ প্রভৃতি পঞ্চ কায়স্থ সম্বন্ধে বিশেষ করিয়া বর্ণনা করিবার কারণ কি? ইহার প্রধান কারণ এই যে, উক্ত পঞ্চ মহাত্মা অতি উচ্চবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। যেমন সাগ্নিক ব্রাহ্মণের শুভাগমনে ১ম আদিশূর জয়ন্ত কৃতার্থ হইয়াছিলেন, সেইরূপ উক্ত পঞ্চ কায়স্থের আগমনেও রাঢ়াধিপ আদিত্যশূর আনন্দলাভ ও আপনাকে ধন্য মনে করিয়াছিলেন। পঞ্চাননের প্রাচীন কুলকারিকায় উক্ত পঞ্চ কায়স্থের এইরূপ আদি পরিচয় লিপিবদ্ধ হইয়াছে[৬০]—

উত্তররাঢ়ীয় পঞ্চবীজীর আদি বাসস্থান ও পরিচয়

'নর্ম্মদানদীর তীরে মনোহর কর্ণালী নামে একটি নগর আছে, এই নগর বিশ্বকর্ম্মকর্ত্তৃক নির্ম্মিত, মহৈশ্বর্য্যময় ও সূর্য্যোপাসকগণ সেবিত। সস্ত্রীক কর্ণ সেই পুরের অধীশ্বর হইয়াছিলেন এবং তিনি নিজ পুত্রকে সেই পুরী দিয়া যমালয়ে গমন করেন। তাঁহারই বংশে বসুমতীসিংহ নামে এক নরেশ্বর জন্মগ্রহণ করেন, তাঁহার বংশধরগণ ক্রমে ক্রমে নানাদেশে গিয়া বাস করেন। কেহ বা অযোধ্যাবাসী হইয়া কান্যকুব্জে গমন করেন। তন্মধ্যে) রাণা ভূপালের পুত্র রাণা গোপাল, তাঁহারই পুত্র খ্যাতি মহাবলী মহাবীর অনাদিবরসিংহ, তিনি ধার্ম্মিক, সত্যবাদী, জিতেন্দ্রিয়, সদাশয়, মহাধনুর্দ্ধর, বীর, কুলশ্রেষ্ঠ, কুলাধিপ, রাজকার্য্যপরিজ্ঞাতা ও সর্ব্বকার্য্যবিশারদ ছিলেন।'[৬১]

এইরূপ সোমঘোষের আদিপরিচয় প্রসঙ্গে উক্ত কুলগ্রন্থে লিখিত হইয়াছে—

'চিত্রগুপ্তের বংশে বিভাসু উপকর্ণ জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহারই বংশধর ঘোষবংশীয় নৃপতি সূর্য্যধ্বজ। তিনি সূর্য্যদেবপ্রসঙ্গে সূর্য্যনামক নগরে বাস করেন। তাঁহার বংশধরগণ ক্রমে

(৬০) "বেদোত্তরাষ্টশতাব্দে শাকে কুম্ভস্থভাস্করে। বাৎস্যঃ সৌকালীনশ্চৈব তথা মৌদ্গাল্য এব চ॥
কাশ্যপবিশ্বামিত্রৌ চ পঞ্চগোত্রক্রমেণ বৈ। অনাদিবরসিংহশ্চ সোমঘোষশ্চ সুধীরঃ॥
পুরুষোত্তমদাসশ্চ দেবদত্তো মহামতিঃ। সুধীরাগ্রগণ্যশ্চ মিত্রকুলে সুদর্শনঃ॥
অযোধ্যানিবাসী সিংহো ঘোষশ্চৈব তথা পুনঃ। মথুরানিবাসী দাসঃ কোলাঞ্চাদ্রাঢ়মাগতঃ॥
মায়াপুরীনিবাসিনৌ দত্তমিত্রৌ তথাগতৌ॥" (কুলাচার্য্য পঞ্চানন)

(৬১) "নর্ম্মদাজাহ্নবীতীরে পুরীং কর্ণালীতি মনোহরম্। মহৈশ্বর্য্যময়ং সৌরং বিশ্বকর্ম্মেণ নির্ম্মিতম্॥
তথা শ্রীকর্ণসস্ত্রীকমভবৎ তৎপুরীশ্বরঃ। তৎসুতেন পুরীং দত্বা ধর্ম্মরাজপুরং যযৌ॥
তদ্বংশজো বসুমতীসিংহাখ্যশ্চ নরেশ্বরঃ। তদ্বংশজাঃ ক্রমেণৈব নানাদেশান্তরং গতাঃ।
অযোধ্যাবসতিঃ কেচিৎ কান্যকুব্জসমাগতাঃ॥
রাণাভূপালপুত্রশ্চ রাণাগোপালসংজ্ঞকঃ। তস্যাত্মজোঽনাদিবরসিংহঃ খ্যাতো মহাবলী॥
ধার্ম্মিকঃ সত্যবাদী চ জিতেন্দ্রিয়ঃ সদাশয়ঃ। মহাধনুর্দ্ধরো বীরঃ কুলশ্রেষ্ঠঃ কুলাধিপঃ॥
রাজকার্য্যপরিজ্ঞাতা সর্ব্বকার্য্যবিশারদঃ।"

নানাদেশে ছড়াইয়া পড়েন। কেহ চন্দ্রহাসগিরিতে গিয়া চন্দ্রহাসগিরির অধীশ্বর হইয়াছিলেন। কেহ বা অযোধ্যা ও মধ্যপ্রদেশে গিয়াছিলেন। (উক্ত সূর্য্যের বংশে) চন্দ্র (এবং চন্দ্র হইতে) সূর্য্যপদের জন্ম। এই সূর্য্যপদের পুত্রই শ্রীসোমঘোষ, তিনি শ্রীকর্ণের কুলানুগামী।"[৬২]

আমরা উদ্ধৃত কুলপরিচয় হইতে জানিতে পারিতেছি যে, সিংহবংশের পূর্ব্বপুরুষ শ্রীকর্ণ নর্ম্মদানদী-তীরবর্ত্তী কর্ণালী নামক নগরে রাজত্ব করিতেন। তাঁহার বংশধরগণ 'রাণা' উপাধিতে ভূষিত ছিলেন। এইরূপ ঘোষবংশের পূর্ব্বপুরুষ সূর্য্যঘোষও সূর্য্যনগরে রাজত্ব করিতেন। তাঁহার বংশধরগণ কেহ কেহ দাক্ষিণাত্যে চন্দ্রহাসগিরিতেও আধিপত্য করিয়া গিয়াছেন, কেহ বা মধ্যপ্রদেশ হইতে অযোধ্যায় আগমন করেন। সিংহ ও ঘোষবংশের এই পরিচয় হইতে আমরা বেশ বুঝিতে পারিতেছি যে, শ্রীকর্ণ ও সূর্য্যঘোষ উভয়েই নর্ম্মদা-তীরে কিছুকাল রাজত্ব করিয়াছিলেন। নাগপুর যাদুঘরে সূর্য্যঘোষের শিলালিপি রক্ষিত আছে, তাহা হইতে জানা যায় যে, তিনি খৃষ্টীয় ৭ম শতাব্দে মধ্যপ্রদেশ শাসন করিতেন।[৬৩] সোমবংশী কেশরী রাজগণের হস্তে সূর্য্যঘোষের বংশধরগণ রাজ্য হারাইয়া কেহ দাক্ষিণাত্যের সুদূর পশ্চিমে চন্দ্রহাসগিরিতে (মলয়বার অঞ্চলে) গিয়া রাজত্ব করিতে থাকেন, কেহ মধ্যপ্রদেশবাসী হন, কেহ বা মধ্যপ্রদেশ হইতে অযোধ্যা অঞ্চলে আগমন করেন। মহারাজ সূর্য্যঘোষের বংশোদ্ভব [illegible]ঘোষকে "শ্রীকর্ণস্য কুলানুগ" বলা হইয়াছে। পূর্ব্বোক্ত কুলপঞ্জীর বচনে জানা গিয়াছে যে, শ্রীকর্ণ নর্ম্মদাতীরে রাজত্ব করিতেন। তাঁহার প্রভাব সম্ভবতঃ দাক্ষিণাত্যের বহু দূরদেশে প্রসারিত হইয়াছিল। কোঙ্কণে কর্ণাল[৬৪] এবং বিজাপুর জেলাস্থ সালোটগি গ্রাম হইতে আবিষ্কৃত শিলালিপি-বর্ণিত কর্ণপুরী-বিষয়[৬৫] যেন সেই কর্ণের নাম স্মরণ করাইতেছে। বরোদা রাজ্যের অন্তর্গত নৌসরি হইতে আবিষ্কৃত জয়ভটের তাম্রশাসনে লিখিত আছে যে, মহারাজ শ্রীকর্ণ তাঁহার পূর্ব্বপুরুষ, তাঁহা হইতেই এই বংশের খ্যাতি বিস্তৃত হয়। এই শ্রীকর্ণের উত্তরাধিকারী দদ্দ আর্য্যাবর্ত্তপতি শ্রীহর্ষদেবের আক্রমণ হইতে বলভীরাজকে রক্ষা করিয়াছিলেন।[৬৬]

(৬২) "চিত্রগুপ্তান্বয়ে জাতো নিভান্ন উপকর্ণকঃ। তস্যাত্মজঃ সূর্য্যধ্বজো ঘোষবংশমহীপতিঃ॥
সূর্য্যদেবপ্রসাদেন সূর্য্যাপানগরং বসেৎ। তদ্বংশজক্রমেণৈব নানাদেশান্তরং গতাঃ॥
চন্দ্রহাসগিরৌ কেচিৎ চন্দ্রহাসগিরীশ্বরঃ। মধ্যদেশাদযোধ্যায়াং চন্দ্রাৎ সূর্য্যপদোদ্ভবঃ॥
তদ্বংশজঃ শ্রীসোমঘোষঃ শ্রীকর্ণস্য কুলানুগঃ।" (পঞ্চাননের কারিকা)

(৬৩) এই পুস্তকের ৭৩ পৃষ্ঠা ও ৫৬ সংখ্যক পাদটীকা এবং Journal of the Royal Asiatic Society, 1905, p. 609 দ্রষ্টব্য।

(৬৪) Bombay Gazetteer, Vol. I. pt. ii. p. 25.

(৬৫) Fleet's Dynasties of the Kanarese Districts, in Bombay Gazetteer, Vol. I. pt. ii. p. 421.

(৬৬) Indian Antiquary, Vol. XIII. p. 77.

যে স্থান হইতে এই তাম্রশাসন প্রদত্ত হইয়াছে, সেই জয়স্কন্ধাবার উক্ত তাম্রশাসনে 'কায়াবতার' নামে কথিত।[৬৭] এই কায়াবতার শব্দ সম্ভবতঃ কায়স্থাবতার শব্দের অপভ্রংশ। এই স্থানে লাট কায়স্থগণের অভ্যুদয় হইয়াছিল বলিয়া 'কায়স্থাবতার', পরে তাহাই সংক্ষেপে 'কায়াবতার' নামে পরিচিত হইয়াছে। এই কায়াবতারের তাম্রশাসনে লিখিত আছে যে, শ্রীকর্ণকুলোৎপন্ন রাজা জয়ভট কোরিল্লাপাটকের অন্তর্গত সমীপদ্রক-গ্রাম ৪৫৩ চেদি সম্বতে (৭০৬ খৃষ্টাব্দে) ব্রাহ্মণকে দান করিতেছেন। কোরিল্লার বর্ত্তমান নাম 'কোরল' (ইহা ভারত হইতে ১৬ মাইল উত্তরপূর্ব্বে) নর্ম্মদানদীর উত্তর কূলে অবস্থিত।[৬৮] নর্ম্মদাতীরস্থ এই কোরিল্লাপাট উত্তররাঢ়ীর কুলগ্রন্থে সম্ভবতঃ কর্ণাল বা কর্ণালি নামে পরিচিত হইয়াছে।

যে সময়ে প্রাচ্যভারতে কর্ণসুবর্ণপ্রতিষ্ঠাতা রাজা কর্ণসেনের বংশধরগণ আধিপত্য-বিস্তার করিতেছিলেন, প্রতীচ্যভারতেও বা লাটের কায়স্থ-সমাজে সেই সময়ে মহারাজ শ্রীকর্ণের অভ্যুদয়। ইঁহার নাম ও বংশ পশ্চিমভারতে সমধিক প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছিল বলিয়াই তাঁহার আত্মীয় স্বজনগণ সকলেই শ্রীকর্ণশ্রেণী বলিয়া পরিচিত হন। তাঁহাদের সহিত মহারাজ সূর্য্যঘোষ-বংশধরগণ সম্বন্ধসূত্রে আবদ্ধ হইয়াছিলেন বলিয়াই সোমঘোষ 'শ্রীকর্ণস্য কুলানুগঃ' বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

যে নবসারিকা বা নৌসারি শ্রীকর্ণ-[illegible] একটী প্রধান শাসনকেন্দ্র বলিয়া গণ্য ছিল, সেই স্থান হইতে আবিষ্কৃত ৭৩৮ খৃষ্টাব্দে উৎকীর্ণ তাম্রশাসন হইতে জানিতে পারি যে, তাজিক বা আরবগণের আক্রমণে এখানকার গুর্জ্জর বংশধ্বংস হয়।[৬৯] এই সময়েই শ্রীকর্ণবংশীয়েরা নানা স্থানে ছড়াইয়া পড়েন।

জিনসেনের হরিবংশ উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছি যে ৭০৫ শকে (৭৮৩ খৃষ্টাব্দে) সৌর্য্যগণের অধিরাজ বীরবরাহ পশ্চিমভারত শাসন করিতেছিলেন[৭০]। শ্রীকর্ণ ও সূর্য্য-ঘোষের বংশধরগণও কুলগ্রন্থে সূর্য্যভক্ত বা সৌর বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

পশ্চিমভারতের পুরাতত্ত্ব আলোচনা করিলে জানা যায় যে, যে সকল স্থানে শ্রীকর্ণ ও তাঁহার বংশধরগণ এবং সূর্য্যঘোষ এক সময়ে শাসন বিস্তার করিয়াছিলেন, খৃষ্টীয় ৮ম শতাব্দী হইতে সেই সকল স্থান রাষ্ট্রকূট-নৃপতিগণের অধিকারভুক্ত হইতে থাকে। তাঁহাদের প্রভাব সুদূর উত্তরভারতেও পৌঁছিয়া ছিল, তাঁহাদের বাহুবল একাধিক-বার উত্তরভারতের প্রধানকেন্দ্র কান্যকুব্জজয়ে নিয়োজিত হইয়াছিল। রাষ্ট্রকূটপতি

(৬৭) Indian Autiquary, Vol. XVIII. p. 176.

(৬৮) Dr. Fleet's Kanarese Districts (in Bombay Gazetteer Vol. I. pt ii. p. 314.)

(৬৯) Dr. Fleet's Kanarese Districts, p. 316.

(৭০) এই পুস্তকের ১০৬ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

কৃষ্ণ অকালবর্ষ ৭৯৭ শকে সিংহাসনে অভিষিক্ত হন।"[11] তাঁহার অধিকারকালে বিরচিত জিনসেনের আদিপুরাণে লিখিত আছে, অকালবর্ষের অত্যুচ্চ গজরাজির মদস্রোতের সঙ্গমে গঙ্গাবারিও কলঙ্কিত হইয়াছিল, সেই কটু জল পান করিয়া তাহাদের তৃষ্ণা নিবারিত হয় নাই।[12] ইহাতে মনে হয় যে, গঙ্গাপ্রবাহিত উত্তর-ভারত জয় করিয়াও রাষ্ট্রকূটপতি অকালবর্ষের রণতৃষ্ণা দূর হয় নাই। গাঙ্গাপ্রদেশ-জয়কালে রাষ্ট্রকূটপতির সঙ্গে সিংহ ও ঘোষবংশীয় সামন্তগণও আসিয়া থাকিবেন। কুলগ্রন্থে অনাদিবরসিংহের পূর্ব্বপুরুষগণের 'রাণা' উপাধি হইতে এবং তাঁহাদের শৌর্য্যবীর্য্যপ্রকাশের পরিচয় হইতে আমরা ইহার আভাস পাইয়াছি। সম্ভবতঃ যে সময় উত্তরভারতে আয়ুধ, হৈহয়, রাষ্ট্রকূট ও গুর্জ্জর-প্রতিহার বংশে পরস্পর-প্রতিযোগিতায় প্রাধান্যরক্ষার জন্য দারুণ সমরানল জলিয়া উঠিয়াছিল, সেই সময়ে সৌভাগ্যান্বেষণে ঘোষ ও সিংহবংশ দাক্ষিণাত্য হইতে অযোধ্যা প্রভৃতি তীর্থকেন্দ্র হইয়া কান্যকুব্জে আগমন করেন। যে সময়ে তাঁহারা কান্যকুব্জে উপস্থিত হন, তৎকালে যিনি কান্যকুব্জের সিংহাসনে সমাসীন ছিলেন, কুলগ্রন্থে তিনিও আদিশূর নামে কীর্ত্তিত হইয়াছেন। বাস্তবিক তৎকালে গুর্জ্জরবংশাবতংশ 'আদিবরাহ' উপাধিধারী ভোজদেব কান্যকুব্জের সিংহাসন উজ্জ্বল করিতেছিলেন।"[13] এই 'আদিবরাহ'ই বহুপরবর্ত্তী কালে অথবা লিপিকর-প্রমাদে উত্তররাঢ়ীয় [illegible] 'আদিশূর' নামে লিপিবদ্ধ হইয়াছেন।

দত্ত, দাস ও মিত্রের পরিচয়

সিংহ ও ঘোষ ব্যতীত মৌদ্গল্য দাস, কাশ্যপ দত্ত [illegible] বিশ্বামিত্রগোত্রীয় মিত্রগণের বীজপুরুষের আদিবাস সম্বন্ধে শ্যামদাসের 'ডাক' বা ডাকরি নামক সুপ্রাচীন কারিকায় লিখিত আছে—

"বাৎস্য সৌকালীন দোঁহে অযোধ্যাগমন।
মথুরায় ঘর কৈল মৌদ্গল্যনন্দন॥
বটগ্রামে বিশ্বামিত্র করি নিকেতন।
হরিহর গ্রামে ছিল কাশ্যপনন্দন॥" (শ্যামদাসী)

উক্ত সুপ্রাচীন শ্যামদাসী ডাক হইতে মনে হয় যে, মৌদ্গল্য পুরুষোত্তম, বিশ্বামিত্র সুদর্শন ও কাশ্যপ দেব দত্ত বাৎস্য সিংহ ও সৌকালিন ঘোষবংশের ন্যায় উত্তরপশ্চিম ঘুরিয়া আসেন। তাঁহাদের যথাক্রমে মথুরা, বটগ্রাম ও হরিহর গ্রামে প্রথম বাস নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। সম্ভবতঃ পঞ্চজনকেই উত্তরপশ্চিমবাসী প্রতিপন্ন করিবার জন্য আধুনিক কুলগ্রন্থে শেষোক্ত মিত্র ও দত্তবংশকেও মায়াপুরী বা হরিদ্বারবাসী বলা হইয়াছে। এদিকে কুলাচার্য্য পঞ্চাননের সংস্কৃত কুলকারিকায় কোলাঞ্চ হইতে পঞ্চজনের রাঢ়াগমন নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

(৭১) Journal Bombay branch Royal Asiatic Society, Vol. X. p. 200.

(৭২) "যস্যোত্তুঙ্গমতঙ্গজা নিজমদস্রোতস্বিনীসঙ্গমা-
গাঙ্গং বারিকলঙ্কিতং কটু মুহুঃ পীত্বাপ্যগচ্ছন্তৃষঃ।" (জিনসেনের আদিপুরাণ)

(৭৩) Vincent A. Smith's Early History of India, 2nd ed. p. 351.

এদেশে কোলাঞ্চ বলিলে সাধারণতঃ সকলেই কান্যকুব্জ মনে করিয়া থাকেন, কিন্তু প্রাচীন কোন সাহিত্যে, কোষগ্রন্থে অথবা শিলালিপি বা তাম্রশাসনে কান্যকুব্জের নামান্তর যে কোলাঞ্চ সে প্রসঙ্গ আদৌ নাই। শব্দরত্নাবলী-অভিধানে কোলাঞ্চ দেশবিশেষ বলিয়া লিখিত আছে, অথচ কান্যকুব্জের স্বতন্ত্র উল্লেখ ও তাহার পর্য্যায় মহোদয়, কান্যকুব্জ, গাধিপুর, কৌশ ও কুশস্থলের উল্লেখ থাকিলেও ইহার মধ্যে কোলাঞ্চ শব্দই নাই। এরূপস্থলে কোলাঞ্চ বলিলে কিরূপে কান্যকুব্জ স্বীকার করা যায়? বামন-শিবরাম-আপ্তে তাঁহার সংস্কৃত অভিধানে কোলাঞ্চের Name of the country of the Kalingas এইরূপ অর্থ করিয়াছেন। মণিয়র উইলিয়ম তাঁহার বৃহৎ সংস্কৃত ইংরাজী অভিধানে a N of Kalinga, the Coromondal coast from Cuttack to Madras; but according to some, this place is in Gangetic Hindustan, with Kanauj for the Capital অর্থাৎ কোলাঞ্চ বলিলে কলিঙ্গদেশ, কটক হইতে মাদ্রাজ পর্য্যন্ত করমণ্ডল উপকূলভাগ, কিন্তু কাহারও কাহারও মতে কনৌজ-রাজধানী-সমন্বিত গঙ্গাপ্রবাহিত হিন্দুস্থানমধ্যে অবস্থিত।

কোলাঞ্চ

আমরা মনে করি, কোলাঞ্চল বা কোলাচল শব্দই সংক্ষেপে প্রাচীন কুলগ্রন্থসমূহে কোলাঞ্চ রূপে ব্যবহৃত হইয়াছে। যেথানে [illegible]গণের বাস, তাহাই কোলাঞ্চল। হরি-বংশে কোল জনপদ পাণ্ড্য, [illegible] চোলের সহিত উক্ত হইয়াছে[৭৪]। কাহারও মতে কোলমণ্ডলই এক্ষণে কর[illegible] নামে অভিহিত। কিন্তু প্রাচীন গ্রন্থে করমণ্ডল উপকূল কলিঙ্গ ও চোল নামেই পরিচিত। কোলাঞ্চ ভাগবতে কোল্লক (৫।১৯।১৬) এবং মহাভারতে কোল্লগিরি (২।৩১।৬৮) ও কোল্লগিরেয় (১৪।৮৩।১১) নামে উল্লিখিত হইয়াছে। অর্জ্জুন সমুদ্রতীরে দ্রাবিড়, আন্ধ্র ও মাহিষকগণকে পরাজয় করিয়া কোল্লগিরেয়-দিগের জনপদ আক্রমণ করেন। এই স্থান জয় করিয়া তিনি সুরাষ্ট্রে গমন করেন[৭৫]। এরূপ স্থলে কোল্লগিরেয় বা হরিবংশবর্ণিত কোল জনপদ সুরাষ্ট্রের দক্ষিণে হইতেছে। তামিলভাষায় কোল বা কোল্ল শব্দের অর্থ কুক্কুট। মহাভারতে কৌকুটক নামেও সৌরাষ্ট্রের সহিত এই কোল উক্ত হইয়াছে।[৭৬] সুপ্রসিদ্ধ টীকাকার মল্লিনাথ আপনাকে 'কোলাচল'

(৭৪) "পাণ্ড্যশ্চ কেরলশ্চৈব কোলশ্চোলশ্চ পার্থিব।
তেষাং জনপদাঃ স্ফীতাঃ পাণ্ড্যাশ্চোলাঃ সকেরলাঃ ॥" (হরিবংশ ৩২।১২৩)

(৭৫) "অর্চ্চিতঃ প্রযযৌ ভূয়ো দক্ষিণং সলিলার্ণবম্ ॥
তত্রাপি দ্রাবিড়ৈরান্ধ্রৈ রৌদ্রৈর্মাহিষকৈরপি।
তথা কোল্লগিরেয়শ্চ যুদ্ধমাসীৎ কিরীটিনঃ ॥
তাংশ্চাপি বিজয়ো জিত্বা নাতিতীব্রেণ কর্ম্মণা।
তুরঙ্গমবশেনাথ সুরাষ্ট্রানভিতো যযৌ ॥" (মহাভারত অশ্বমেধপর্ব্ব ৮৩।১০।১২)

(৭৬) "তিমিকাঃ কুন্তলাশ্চৈব সৌরাষ্ট্রা নলকাননাঃ।
কৌকুটকাস্তথা চোলাঃ কোকণা মালবা নরাঃ ॥" (মহাভারত ভীষ্ম ৯।৫৯)

বলিয়া পরিচিত করিয়াছেন। এদিকে মহাভারত-হরিবংশাদি হইতে বেশ জানা যাইতেছে যে, কোলাঞ্চল বা কোলগিরি জনপদ দাক্ষিণাত্যের পশ্চিমাংশে অবস্থিত ছিল। বলা বাহুল্য, ঐ স্থান কর্ণাটকপ্রদেশের অংশ। ঐ অঞ্চল হইতে রাষ্ট্রকূটবংশের অভ্যুদয় এবং তৎপরবর্ত্তী চালুক্য-রাজগণেরও তথায় প্রধান শাসনকেন্দ্র ছিল। এরূপস্থলে মনে হয়, রাষ্ট্রকূট বা চালুক্য রাজগণের সময় কর্ণাটক হইতে যাঁহারা গৌড় বা রাঢ়ে আগমন করেন, তাঁহারা আপনাদিগকে কোলাঞ্চল বা কোলাঞ্চ হইতে সমাগত বলিয়া পরিচিত করিয়া থাকিবেন। পরবর্ত্তী কুল-গ্রন্থকার তাঁহাদিগকে কান্যকুব্জের সহিত এক করিয়া গোল বাধাইয়াছেন, তাই কোলাঞ্চ বলিলে অনেকে কান্যকুব্জ বুঝিয়া থাকেন। তাই এড়ুমিশ্রের ন্যায় প্রাচীন কুলগ্রন্থকারও কোলাঞ্চ জনপদ কান্যকুব্জের অন্তর্গত বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। আদিশূর জয়ন্তের সময় যাঁহারা গৌড়ে আগমন করেন, তাঁহারাই প্রকৃত প্রস্তাবে কান্যকুব্জবাসী ছিলেন। আদিত্য-শূরের অভ্যুদয়কালে রাষ্ট্রকূটপতি কৃষ্ণ অকালবর্ষের সহিত যাঁহারা উত্তরভারতে আগমন করেন, তাঁহাদের মধ্যে যাঁহারা উত্তররাঢ়ে আসিয়া উপনিবেশী হন, তাঁহারাই সম্ভবতঃ কোলাঞ্চ হইতে আগত বলিয়া পরিচিত হইয়াছিলেন। তাঁহাদের কান্যকুব্জের সহিত কোনও সম্বন্ধ ছিল না; পরে তাঁহাদের সহিত কনোজাগত বংশধরগণের আত্মীয়তা স্থাপিত হইলেও সকলে এক সমাজভুক্ত হইয়া প[illegible] সম্ভবতঃ রাঢ়ীয় কুলগ্রন্থকারগণ সকলকেই একস্থানের অধিবাসী করিবার চেষ্টা করিয়াছেন।

যাহা হউক, সমসাময়িক ঐতিহাসিক ঘটনা ও পরবর্ত্তী নানা কুলগ্রন্থ আলোচনা করিয়া আমরা বুঝিতে পারিতেছি যে, আদিত্যশূরের সময় যে কয়জন কায়স্থ উত্তররাঢ়ে আগমন করেন, তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষগণের এক সময়ে দাক্ষিণাত্যে (কোলাঞ্চে) বাস ছিল। গুর্জ্জর ও রাষ্ট্রকূটগণের উত্তর-ভারতে প্রভাব-বিস্তারকালে যে তাঁহাদের মধ্যে অনেকে উত্তরভারতের প্রধান প্রধান নগরে রাজনৈতিক বা ধর্ম্মনৈতিক যে কোন কারণে হউক, কিছুকাল বাস করিয়া উত্তর-রাঢ়ে আগমন করিয়াছিলেন, তাহাতে সন্দেহ নাই।

উত্তর-রাঢ়ীয় কুলপঞ্জী হইতে বুঝা যায় যে, কোলাঞ্চ বা দাক্ষিণাত্য হইতে যে সময় কায়স্থ-গণ আগমন করেন, সে সময় বা তাহার অল্পপরে সিংহেশ্বরের রাজসভায় ব্রাহ্মণগণও আগমন করিয়াছিলেন। এ সময় যে সকল ব্রাহ্মণ রাঢ়সভায় আসিয়াছিলেন, তাঁহাদিগকে দাক্ষিণাত্য ব্রাহ্মণ বলিয়াই মনে হয়, কারণ তৎকালে উত্তরভারতে নানাপ্রকার রাষ্ট্রবিপ্লব ও ধর্ম্মবিপ্লবের সূচনা চলিতেছিল, কিন্তু তখনও শঙ্করাবতার শঙ্করাচার্য্য ও ভট্টকুমারিলের শিষ্যানুশিষ্যে দাক্ষিণাত্য পরিব্যাপ্ত ছিল। বৈদিক কর্ম্মানুষ্ঠানের জন্য ঐরূপ ব্রাহ্মণেরই প্রয়োজন হইত। উত্তররাঢ়ীয় কুলগ্রন্থে যে সুশীল মাধবাদির নামোল্লেখ আছে, তাঁহাদিগকেও আমরা ঐরূপ দাক্ষিণাত্য-ব্রাহ্মণ বলিয়া মনে করি। সত্য বটে, তখনকার প্রবলপরাক্রান্ত রাষ্ট্রকূট-নৃপতিগণ অনেকেই জৈনধর্ম্মানুরাগী ছিলেন, বহু শ্রেষ্ঠ জৈনাচার্য্য তাঁহাদের রাজসভা উজ্জ্বল করিয়া গিয়াছেন, কিন্তু তথাপি তাঁহারা যে বেদবিদ্ ব্রাহ্মণগণকে যথেষ্ট সমাদর ও সম্মান করিতেন।

রাষ্ট্রকূটরাজগণপ্রদত্ত বহুসংখ্যক তাম্রশাসন হইতে তাহার প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। এইরূপ স্থলে রাষ্ট্রকূটরাজগণও যাঁহাদিগকে সম্মান ও ভক্তিপ্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন, সেই ব্রাহ্মণের আত্মীয় স্বজন যে দেবদ্বিজভক্ত রাঢ়াধিপ আদিত্যশূরের নিকট সমধিক সম্মানলাভ করিবেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। দুঃখের বিষয় উত্তররাঢ়ে সমাগত দাক্ষিণাত্য-বিপ্রগণের পরিচয় উত্তররাঢ়ীয় কোন কুলগ্রন্থকার লিপিবদ্ধ করিয়া যান নাই। ইহার প্রধান কারণ, বহুশত বর্ষ পূর্ব্বে যে সকল কুলাচার্য্য উত্তররাঢ়ীয় সমাজের কুলপরিচয় লিপিবদ্ধ করেন, তাঁহারা হয় উত্তররাঢ়ীয় কায়স্থ, নতুবা রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ। সম্ভবতঃ রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ-কুলাচার্য্যগণই স্ব স্ব পূর্ব্বপুরুষগণের মাহাত্ম্যঘোষণা ও উত্তররাঢ়ীয় সমাজের সহিত নৈকট্যস্থাপনপ্রয়াসে দাক্ষিণাত্য-বিপ্রগণের নাম তুলিয়া ফেলিয়াছেন। এমন কি, কেহ কেহ তাঁহাদের কনোজাগত বীজপুরুষের সহিত উত্তররাঢ়ীয় কায়স্থ-বীজিগণের গৌড়াগমন লিপিবদ্ধ করিতে কুণ্ঠিত হন নাই। এই কারণেও অনেক ভ্রান্তমত ও অনৈতিহাসিক কথা ব্রাহ্মণরচিত উত্তররাঢ়ীয় কুলগ্রন্থসমূহে স্থানলাভ করিয়াছে। এদিকে উত্তররাঢ়ীয় কায়স্থকুলজ্ঞগণ অনাবশ্যক মনে করিয়া সেই সকল ব্রাহ্মণের কোন কথাই লিখিয়া রাখেন নাই।

রাঢ়াধিপের নিকট পঞ্চ কায়স্থের অধিকারলাভ

অনাদিবরসিংহ প্রভৃতি পাঁচজনই আদিত্যশূরের নিকট যথেষ্ট সম্মানিত ও বহু ভূ-সম্পত্তি লাভ করিয়া সামন্তস্বরূপ গণ্য হইয়াছিলেন। পঞ্চানন দেবশর্ম্মবিরচিত [illegible] রাঢ়ীয় কুলপঞ্জিকায় এইরূপ প্রসঙ্গ দেখিতে পাওয়া যায়—

'নৃপমণি আদিত্যশূর [illegible] অনাদিবরসিংহকে হৃষ্টান্তঃকরণে গঙ্গার পশ্চিমকূলে সিংহপুর হইতে কণ্টকনগর পর্য্যন্ত ভূমিদান করিয়া তাঁহাকে চারিশত গ্রামের অধিপতি করিয়া দিয়াছিলেন। এই অখণ্ড ভূমণ্ডলের মধ্যে তিনি সিংহপুরের সামন্তরাজ বলিয়া গণ্য হইয়াছিলেন। তাঁহাকে দ্বিসহস্র স্বর্ণমুদ্রা রাজকোষে দিতে হইত। তিনি ঐ সম্পত্তি পুত্রপৌত্রাদিক্রমে ভোগ করিতে পারিবেন, এইরূপ আদেশ পাইয়াছিলেন। গঙ্গার কূল হইতে পশ্চিমস্থ সিংহপুরেই রাজাদেশে তাঁহার প্রথম বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। এখানে তিনি বিষ্ণুমন্দির, শিবমন্দির, সিংহেশ্বর শিবলিঙ্গ, লক্ষ্মীনারায়ণশিলা ও অতিথিশালা প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন।'[১১]

(১১) "আদিত্যশূরনৃপেন্দ্রঃ হৃষ্টান্তঃকরণঃ শুচিঃ।
অনাদিবরসিংহায় দত্তাং ভূমিমখণ্ডিতাম্।
সিংহক্ষেত্রে সিংহেশ্বরাদৌ গঙ্গায়াঃ কূলপশ্চিমে।
চতুঃশতান্ গ্রামাধীশকণ্টকনগরাবধি।
এতন্মণ্ডলয়োর্মধ্যে সামন্তরাজ উচ্যতে।
দ্বিসহস্রস্বর্ণমুদ্রাং রাজকোষে প্রযচ্ছতে।
পুত্রপৌত্রাদিকান্ ভোগানাচর ত্বং মদাজ্ঞয়া।
এবংবিধং স্বজাতীনাং রাজ্যং সামন্তমুৎসৃজেৎ।

এইরূপে সোমঘোষের পরিচয়-প্রসঙ্গে লিখিত হইয়াছে—

'নরবর আদিত্যশূর পুত্রপৌত্রাদি সহ সোমঘোষকে বাসার্থ জয়যান নামক *গ্রাম দিয়াছিলেন।* উক্ত সোমঘোষ জয়যান হইতে একচক্রা পর্য্যন্ত চারিদিকে ২৭ শত খানি গ্রামের সামন্তরাজরূপে অধিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। এজন্য তাঁহাকে রাজকোষে পঞ্চদশসহস্র স্বর্ণমুদ্রা দিবার ব্যবস্থা হইয়াছিল। তিনি পুত্রপৌত্রাদিক্রমে ভোগদখল করিবার জন্য দানপত্রও পাইয়া জয়যানে গিয়া বাস করিলেন। এখানে সোমঘোষ বাসগৃহ, শিবমন্দির, সোমেশ্বর নামক শিবলিঙ্গ ও সর্ব্বমঙ্গলা প্রতিষ্ঠা করেন। রাজা সোমঘোষ তথায় গড়খাই কাটিয়া রাজধানী করেন এবং এখান হইতে প্রজাপালন করিতে থাকেন। তিনি অরবিন্দ নামক পুত্রকে রাজ্য দিয়া গঙ্গাবাসে তনুত্যাগ করেন। যেখানে তিনি কিছুকাল গঙ্গাবাস করিয়াছিলেন, সেই স্থান এক্ষণে সোমপাড়া নামে খ্যাত হইয়াছে।'[৭৮]

অপর তিনজনের পরিচয়-প্রসঙ্গে লিখিত আছে—

'পঞ্চ বিজ্ঞ মহাজনই শ্রীকর্ণবংশের শ্রেণিভুক্ত। ইঁহাদের মধ্যে অনাদিবরসিংহ ও সোম

সিংহোঽনাদিবরঃ স্বপত্নীসহিতঃ পুত্রস্তু সূর্য্যোবরঃ
বধ্বস্তে হরিণী-দৃশোঽথ সুখদা বিষরূপস্য পৌত্রঃ।
এতান্ সঙ্গনৃপ[illegible]ভাগীরথীসন্নিধৌ
ধ্যেয়ঃ সিংহপুরেনাম র[illegible]ব হর্ষং বসেৎ॥
তত্রৈব বাসভবনং কুর্য্যান্নৃপানুকম্পয়া[illegible]
বিষ্ণুমন্দিরং কৃতবান্ তত্রৈব শিবমন্দিরম্॥
লক্ষ্মীনারায়ণশিলা সিংহেশ্বরমহেশ্বরঃ।
স্থাপয়াম মার্গশীর্ষে গুরুদেবপ্রসাদতঃ॥
এবংবিধপ্রকারেণ সিংহপুরগৃহাগমঃ।
সরোবরস্থানে স্থানে স্থাপয়াতিথিশালক.॥" (পঞ্চাননের কুলকারিকা)

(৭৮) "তদ্বংশজঃ সোমঘোষঃ শ্রীকর্ণস্য কুলানুগঃ।
পুত্রস্তে অরবিন্দাখ্যঃ পৌত্রাণাং স্বয়মেব চ॥
আদিত্যশূর-নৃবরৈঃ দত্তাস্তে বাসমুত্তমম্।
জয়যানঃ গ্রামনাম্নো বাসার্থেন দদৌ নৃপঃ॥
ততশ্চতুর্দ্দিক্ষু গ্রামং সপ্তবিংশশতানি চ।
সামন্তরাজরূপেণ একচক্রাবধিং দদৌ॥
পঞ্চদশসহস্রাণাং স্বর্ণমুদ্রাং প্রযচ্ছতে।
পুত্রপৌত্রাদিভোগেন মহাজ্ঞয়া অধীশ্বরঃ॥
দানপত্রং সুসংপ্রাপ্তং যযৌ তে জয়যানকে।
তথা বাসগৃহাদীংশ্চ শিবসৌধস্য স্থাপনম্॥
সোমেশ্বরনামধেয়ং শিবলিঙ্গং প্রতিষ্ঠিতম্।
স্থাপয়াবাস দেবীঃ চ নাম্নাতাং সর্ব্বমঙ্গলাং॥

ঘোষের পরিচয় পূর্ব্বেই দেওয়া হইয়াছে। অপর মৌদগল্য পুরুষোত্তম ও কাশ্যপ দেবদত্ত, ইঁহারা উভয়েই *সূর্য্যবংশোদ্ভব এবং বিশ্বামিত্র সুদর্শনমিত্র চন্দ্রবংশীয় ক্ষত্রিয়, ইঁহারা* কুলজ্ঞগণের নিকট সমৌলিক কায়স্থ বলিয়া পরিচিত।"[৭৯]

অনাদিবরসিংহ ও সোমঘোষের যেরূপ উচ্চ পরিচয় পাওয়া গিয়াছে, অপর তিন জন সম্বন্ধে কুলগ্রন্থে সেরূপ কোন কথা নাই! ইহাতে মনে হয় যে, সিংহ ও ঘোষ উভয়ে দাক্ষিণাত্যের প্রসিদ্ধ রাজবংশে জন্মগ্রহণ করায় সম্ভবতঃ রাষ্ট্রকূটপতি কৃষ্ণ-অকালবর্ষ অথবা গুর্জ্জররাজবংশীয় কান্যকুব্জপতি আদিবরাহ ভোজদেবের সময়ে রাঢ়ে আগমন করায় রাঢ়াধিপের নিকট তাঁহারা বিশেষভাবে সম্মানিত হইয়াছিলেন, অপর তিনজন তাঁহাদের অভিব্যাহারে আগমন করায় আদিত্যশূর সভাসদ্ করিয়া তাঁহাদের কতকটা সম্মান রক্ষা করেন। শ্যামদাসী 'ডাক' হইতে জানা যায়—এই তিনজন সভাসদের মধ্যে—

"হরিতে ভকতি বড় মৌদ্গল্যনন্দন।
দাস বুলি ডাকে তারে শুন সর্ব্বজন॥
তার পরে বিশ্বামিত্র করি যে লিখন।
রাজার বৈঞা মন্ত্রী মৈত্র আচরণ॥
দানেতে নিপুণ বড় কাশ্যপন[illegible]
দত্ত বুলি খ্যাতি [illegible]েই বিচক্ষণ॥"

উক্ত কুলগ্রন্থানুসারে মনে হ[illegible], মৌদ্গল্য পুরুষোত্তম একজন পরম বৈষ্ণব ছিলেন, বিশ্বামিত্রগোত্র সুদর্শনমিত্র আদিত্যশূরের মন্ত্রিত্ব লাভ করিয়াছিলেন এবং কাশ্যপগোত্র দেবদত্ত অতিদাতা বলিয়া প্রসিদ্ধিলাভ করেন।

৮০৪ শকে বা ৮৮২ খৃষ্টাব্দে[৮০] এই পঞ্চ কায়স্থের আগমন রাঢ়বঙ্গের ইতিহাসে বিশেষ

রাজা সোমঘোষস্তত্র পরিখাকৃতবেষ্টিতে।
প্রজাদিপালনে দানে ততঃ সর্ব্বসুমঙ্গলম্॥
তৎপুত্র অরবিন্দাখ্যো দত্বা রাজ্যং সুবিস্তৃতম্।
গঙ্গাবাসে তনুত্যাগং সোমপাড়াং কিয়দ্বসেৎ॥"

(৭৯) "শ্রীকর্ণবংশশ্রেণিভুক্তা পঞ্চবিজ্ঞা মহাজনাঃ।
বাৎস্যগোত্রোঽনাদিবরঃ সোমঃ সৌকালিনস্তথা॥
পুরুষোত্তমো মৌদ্গল্যঃ বিশ্বামিত্রঃ সুদর্শনঃ।
কাশ্যপো দেবনামা চ ইতি তে কথিতং মুদা॥
সূর্য্যবংশোদ্ভবৌ ক্ষত্রৌ দত্তদাসৌ মহাকৃতী।
চন্দ্রবংশোদ্ভবঃ ক্ষত্রো মিত্রকুলে সুদর্শনঃ॥
এতে সমৌলিকাঃ প্রোক্তাঃ কায়স্থাঃ কুলবিজ্ঞকৈঃ॥" (পঞ্চাননের কুলকারিকা)

(৮০) উত্তররাঢ়ীয় কুলকারিকার ন্যায় দক্ষিণরাঢ়ীয় দত্তবংশমালামতেও "গৌড়ে সমাগতঃ শাকে স বেদাষ্ট-শতাব্দকে।" অর্থাৎ দত্তবংশের বীজী পুরুষোত্তম ৮০৪ শকে বা ৮৮২ খৃষ্টাব্দে গৌড়ে (এখানে রাঢ়ে) আগমন করেন

স্মরণীয় ঘটনা। যদিও তৎপূর্ব্ব হইতেই এদেশে কায়স্থশাসন ও বিস্তৃত কায়স্থসমাজ ছিল, কিন্তু ধর্ম্মশাসন ও সমাজসংস্কারে উক্ত পঞ্চ কায়স্থই আদিত্যশূরের দক্ষিণহস্তস্বরূপ হইয়াছিলেন। তাঁহাদের সময়ে দাক্ষিণাত্যবিপ্রগণ রাঢ়বাসী হইয়াছিলেন, তাঁহাদের যত্নে ও পঞ্চ কায়স্থের আচারানুষ্ঠানগুণে এখানে আবার বৈদিকধর্ম্মের আদর বৃদ্ধি পাইয়াছিল। তাহারই ফলে পূর্ব্বে যে বংশে পুরাণ ও তন্ত্রশাস্ত্রের আদর বাড়িতেছিল, কিছু পরেই সেই বংশে আবার বৈদিকক্রিয়া-কলাপের প্রয়োজন বিশেষরূপে উপলব্ধি হইয়াছিল, তাঁহারই ফলে নারায়ণভট্ট রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ-সমাজের জন্য 'ছন্দোগপরিশিষ্টপ্রকাশ' প্রচার করেন। যে সময়ের কথা লিখিত হইতেছে, তৎকালে রাজন্য ও শ্রেষ্ঠ কায়স্থসমাজে বৈদিক পুরোহিত লইয়া বৈদিক-কার্য্য নির্ব্বাহ হইত। কিন্তু এই সময় বৈদিকক্রিয়াদক্ষ ব্রাহ্মণের ক্রমেই অভাব হইয়া পড়িতেছিল। অল্পমাত্র কয়েকজন দাক্ষিণাত্য বিপ্র এদেশে আসিয়াছিলেন। সম্মানভাজন ও লাভবান্ হইবার আশায় এ সময়ে রাঢ়বাসী সাগ্নিক ব্রাহ্মণবংশধরগণের মধ্যে অনেকে বৈদিকাচার গ্রহণ করিয়া দাক্ষিণাত্যে বিপ্র-গণের সহিত মিলিত হইতেছিলেন, রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণগণের কুলগ্রন্থ হইতেই আমরা ইহার আভাস পাইতেছি।

রাজা আদিত্যশূরের চেষ্টায় ও নবাগত পঞ্চ কায়স্থের অনুবর্ত্তী হইয়া যখন রাঢ়ের নিষ্ঠাবান্ হিন্দুসমাজ শ্রাদ্ধাদি বৈদিক কার্য্যে তৎ[illegible]লেন, তখন ক্রিয়াদক্ষ লোকাভাবে ও সম্মানজনক বৃত্তি পাইবার আশায় রাঢ়ীয় বিপ্রগণ দাক্ষিণাত্য [illegible]গণের সহিত সম্মিলিত হইয়াছিলেন। মহেশ্বর মিশ্র তাঁহার (রাঢ়ীয়) নির্দ্দোষকুলপঞ্জিকায় ইহার [illegible] আভাস দিয়া গিয়াছেন, যে সাবর্ণগোত্রজ সুবিখ্যাত বেদগর্ভের পুত্র বিষ্ণু, তৎপুত্র শরণি, তৎপুত্র কোল, এই কোলের দুই পুত্র ধীর ও ধুরন্ধর। ধীর রাঢ়ীয় রহিলেন, ধুরন্ধর দাক্ষিণাত্য হইলেন।[৮১] সাবর্ণগোত্রের ন্যায় অপর গোত্রজ ব্রাহ্মণগণও যে ঐ সময় দাক্ষিণাত্য-সমাজে মিশিতেছিলেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। বাস্তবিক এই সময় হইতে কিছুকাল রাঢ়দেশে আবার বেদ, মীমাংসা, স্মৃতি ও ন্যায় শাস্ত্রের যথেষ্ট আলোচনা হইয়াছিল, নিজে গৌড়াধিপ আদিত্যশূর তাঁহাদের পৃষ্ঠপোষক ; আর ব্রাহ্মণ ও কায়স্থসামন্ত-রাজগণ তাঁহাদের উৎসাহদাতা ছিলেন।

পরাক্রম, নিষ্ঠা ও তেজস্বিতা লক্ষ্য করিয়া প্রাচীন কুলাচার্য্যগণ আদিত্যশূরকে তাঁহার নামানুসারে সূর্য্যবংশ ক্ষত্রিয় বলিতে কুণ্ঠিত হন নাই।[৮২]

(৮১) "বেদগর্ভতপো জাতস্তস্মাদ্বিষ্ণুরুদারধীঃ।
তস্মাৎ শারণিশর্ম্মা চ ততোহভূৎ কোলসংজ্ঞকঃ।
কোলপুত্রাবিমৌ জাতৌ নাম্না ধীরধুরন্ধরৌ।
ধীরস্তয়োর্মো রাঢ়ীয়ো দাক্ষিণাত্যো ধুরন্ধরঃ॥" (নির্দ্দোষকুলপঞ্জিকা)

(৮২) "সূর্য্যঃ ক্ষত্রবংশহংসসর্ব্বসহাধীশ্বরঃ।
গৌড়েন্দ্রিয়াদিত্যশূরঃ নৃপতির্ভাতি তেজসা॥"
কায়স্থ-কৌস্তুভ (৩য় সংখ্যা ৭৮ পৃষ্ঠা) ধৃত-কুলাচার্য্যবচন।

রাজা আদিত্যশূর কেন দাক্ষিণাত্য-বিপ্রদিগকে সম্মানিত করিয়াছিলেন? পূর্ব্বেই লিখিয়াছি, তৎকালে দাক্ষিণাত্যই বৈদিক ব্রাহ্মণদিগের প্রধান কেন্দ্র ছিল। দাক্ষিণাত্য হইতে আবিষ্কৃত বহু শিলালিপি ও তাম্রশাসন হইতে জানা গিয়াছে, পল্লব, চোল, চালুক্য, রাষ্ট্রকূট, এমন কি নিষাদরাজ পর্য্যন্ত বৈদিক যজ্ঞতৎপর হইয়াছিলেন, তাঁহারা সর্ব্বপ্রধান অশ্বমেধ-যজ্ঞেরও অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন।[৮৩] বিশেষতঃ নর্ম্মদাতীরস্থ যে লাটদেশে সিংহবংশের বীজী শ্রীকর্ণের রাজধানী ছিল, যেখানে অনাদিবর সিংহের পূর্ব্বপুরুষগণ বহু লীলা করিয়া গিয়াছেন, রাঢ়দেশে প্রভুত্ব-বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাদের যত্নে যে এখানে বেদবিদ্ লাটব্রাহ্মণ আনীত হইবেন, তাহাতে আর সন্দেহ কি? লাটদেশের রাষ্ট্রকূটনৃপতিগণের প্রভাব উত্তর ও পূর্ব্ব-ভারতে প্রসারিত হইয়াছিল, পূর্ব্বে বহুস্থলে সে কথা লিখিয়াছি। এমন কি আদিশূর অন্তের পর যখন ধর্ম্মপাল গৌড়ের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন, তাঁহার ৩২শ রাজ্যাঙ্কে উৎকীর্ণ খালিমপুরের তাম্রশাসন হইতে জানা যায় যে, তিনি পৌণ্ড্রবর্দ্ধন-ভুক্তির মধ্যে শুভস্থলী প্রভৃতি চারিখানি গণ্ডগ্রাম লাটব্রাহ্মণকে অর্পণ করিয়াছিলেন।[৮৪] তখন হইতেই গৌড়ে লাটব্রাহ্মণের সম্মানবৃদ্ধি হইতেছিল। আদিত্যশূরের অভ্যুদয় ও ক্ষমতা-বিস্তারের সহিত তিনিও পালরাজনীতির অনুসরণ করিয়া থাকিবেন। কায়স্থকৌস্তভধৃত কুলকারিকামতে ৮৯২ খৃষ্টাব্দ অর্থাৎ অনাদিবরসিংহ প্রভৃতি পঞ্চ কায়স্থের আগমনের দশবর্ষ পরে রাঢ়দেশে [illegible]মন হইয়াছিল। বলা বাহুল্য, এ সময় যে সকল ব্রাহ্মণ আসিয়াছিলেন, তাঁহাদিগকে লাটব্রাহ্মণ বলিয়াই মনে হয়।

এই লাটব্রাহ্মণেরাই স্থানীয় মৌর্য্যবর্গের বৈদিক কার্য্যে, বিশেষতঃ উক্ত পঞ্চ কায়স্থের পৌরোহিত্যে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। লাটের অপভ্রংশে 'লাঢ়' বা 'রাঢ়', সুতরাং রাঢ়দেশবাসী লাটব্রাহ্মণেরাও কিছুদিন পরে রাঢ়-ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচিত এবং তাঁহাদের বংশধরগণ অনেকে সহজেই রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণদিগের সহিত মিশিয়া গিয়া থাকিবেন। এই কারণে পরবর্ত্তী কালে কোন কোন কুলগ্রন্থকার তাঁহাদের প্রথমাগমন ও রাঢ়ীয় শ্রেণীর বীজপুরুষ পঞ্চ সাগ্নিকের আগমনকাল এক করিয়া ফেলিয়াছেন।

আদিত্যশূরের রাজধানী সিংহেশ্বরের বর্ত্তমান অবস্থান

এখন দেখা যাউক, উত্তররাঢ়ের কোন্ স্থানে আদিত্যশূরের রাজধানী সিংহেশ্বর ছিল ও পঞ্চ কায়স্থের কোথায় প্রথম আগমন হইয়াছিল? শ্যামদাসের ডাক ও পঞ্চাননের সংস্কৃত কুলকারিকা হইতে জানা গিয়াছে যে, আদিত্যশূরের রাজধানী সিংহেশ্বর উত্তররাঢ়ে গঙ্গার নিকট অবস্থিত ছিল। বর্ত্তমান মুর্শিদাবাদ জেলায় নশীপুরের ১॥০ দেড় মাইল উত্তরপূর্ব্বে এবং ভাগীরথীতট হইতে ১ মাইলের কিছু দূরে 'সিঙ্গা'

(৮৩) Vide R. G. Bhandarkar's Early History of Dekkan, 2nd ed. p. 49. and Dr. Fleet's Dynasties of the Kanarese districts (in Bombay Gazetteer, Vol. I. pt. ii. p. 320, 326.)

(৮৪) Epigraphia Indica, Vol. IV. p. 250.

নামে একটী প্রাচীন গ্রাম আছে, অক্ষরেখার ২১° ২৪´৩০″ উত্তরে এবং দ্রাঘিমারেখার ৮৮°১৪´ ৪৫″ পূর্ব্বে অবস্থিত। ইহার প্রাচীন কীর্ত্তিসকল ভাগীরথীর প্রবাহে ও মুসলমান-আক্রমণে নষ্ট হইয়াছে। সিঙ্গার ৪ মাইল দক্ষিণে অবস্থিত 'শূরুই' গ্রাম 'শূরপুরী'র অপভ্রংশ বলিয়া মনে হয়। এই সিঙ্গা হইতে শূরুই পর্য্যন্ত ৪ মাইলের মধ্যে প্রাচীন সিংহেশ্বর রাজধানী ছিল বলিয়া বোধ হয়। পাল রাজার আক্রমণে হটিয়া গিয়া প্রথমতঃ আদিত্যশূরের পৌত্র অনুশূর খুব সম্ভব ভাগীরথীর অপর পারে ৫ মাইল পশ্চিমে সিঙ্গী নামক স্থানে ছাউনী করিয়া কিছুকাল অবস্থান করেন, এই স্থানও তাঁহার অবস্থানকালে কিছুকাল 'সিংহেশ্বরপুরী' নামে খ্যাত হইয়া থাকিবে। এই সিংহেশ্বরীপুরীর অপভ্রংশে এক্ষণে 'সিঙ্গী' নাম হইয়াছে। এই সিঙ্গীর দক্ষিণপূর্ব্বে ১ ক্রোশের মধ্যে অবস্থিত 'অনুপুর' গ্রাম রাজা অনুশূরের স্মৃতি রক্ষা করিতেছে। রাজা অনুশূর এখানে অবস্থান-কালে যে সুবৃহৎ দীর্ঘিকা কাটাইয়া ছিলেন, অদ্যাপি অনুপুরের পার্শ্বে তাহা 'রমণা' দীঘী নামে পরিচিত। উত্তর-দক্ষিণে বিস্তৃত এত বড় পুষ্করিণী মুর্শিদাবাদ জেলায় আর দ্বিতীয় নাই। এই অনুপুরের ১ ক্রোশ উত্তরপূর্ব্বে এবং ভাগীরথী হইতে ৩ মাইল পশ্চিমে 'বিজয়পুর' নামক স্থান অদ্যাপি প্রবল প্রতাপশালী গৌড় বিজেতা বিজয়সেনের নাম ঘোষণা করিতেছে।(৮৫)

পঞ্চকায়স্থের বাসস্থান

ভাগীরথী-তীরের নিকটবর্ত্তী উক্ত প্রথম সিং[illegible] নামক স্থানেই পঞ্চকায়স্থ ও তৎপরে দাক্ষিণাত্য লাটব্রাহ্মণগণের [illegible] হইয়াছিল। রাঢ়াধিপ আদিত্যশূর রাজবংশোদ্ভব অনাদিবরসিংহকে সিংহপুর ও সোমঘোষকে জয়যান বাসস্থান নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছিলেন। সিংহপুর এক্ষণে সিংহপুরগড় বা সিঙ্গুরগড় নামে পরিচিত।

সিংহপুর

ইহা বর্ত্তমান কান্দিমহকুমা হইতে ৬ মাইল দক্ষিণ-পূর্ব্বে এবং ভরতপুরের দক্ষিণে অক্ষরেখার ২৩° ৫৩´ উত্তরে এবং দ্রাঘিমারেখার ৮৮°৭´ পূর্ব্বে অবস্থিত। এই সিংহপুরগড়ের পশ্চিম পার্শ্বে ময়ূরাক্ষী নদীর শাখা এবং পূর্ব্বে ১০ মাইল দূরে ভাগীরথী প্রবাহিত। কুলগ্রন্থে লিখিত হইয়াছে যে, এই সিংহপুর হইতে কণ্টকনগর পর্য্যন্ত অনাদিবরসিংহের অধিকারভুক্ত ছিল। সিংহপুর হইতে ১৭ মাইল দক্ষিণ-পূর্ব্বে বর্ত্তমান কাঁটোয়া; সুতরাং দেখা যাইতেছে, সিংহপ্রবর উত্তরে দ্বারকা নদী, পূর্ব্বে ভাগীরথী. দক্ষিণে অজয়নদ এবং পশ্চিমে ময়ূরাক্ষী এই চতুঃসীমাবচ্ছিন্ন প্রায় ২৮০ বর্গমাইল ভূখণ্ডের সামন্তরাজ বলিয়া গণ্য হইয়াছিলেন। উক্ত সিংহপুরগড়ের

জয়যান (জজান)

৩ মাইল উত্তরপশ্চিমে জয়যান বা জজান গ্রাম। সোমেশ্বর শিব ও সর্ব্বমঙ্গলার মন্দিরের জন্য এই স্থান উত্তররাঢ়ে সুপ্রসিদ্ধ। উক্ত মন্দিরের অনতিদূরে সোমঘোষের গড় এবং তাঁহার বহু কীর্ত্তি-চিহ্ন রহিয়াছে। পঞ্চাননের কুলকারিকায় লিখিত আছে যে, আদিত্যশূর সোমঘোষকে জয়যান হইতে একচক্রা পর্য্যন্ত ২৭০০

(৮৫) ষষ্ঠ অধ্যায়ে সেনবংশ-বিবরণে বিজয়পুরের প্রসঙ্গ দ্রষ্টব্য।

খানি গ্রামের সামন্তরাজ করিয়াছিলেন। তজ্জন্য পঞ্চদশসহস্র স্বর্ণমুদ্রা দিবার ব্যবস্থা হয়।[৮৬] একচক্রা বর্ত্তমান বীরভূম জেলায় সিউড়ী হইতে ৫ মাইল পূর্ব্বদক্ষিণে এবং বর্ত্তমান জয়ান গ্রাম হইতে ২৬ মাইল পশ্চিমে অবস্থিত। এই ঘোষবংশাধীন সামন্তরাজ্যের চতুঃসীমা ও আয়তন কত বড় ছিল, তাহা ঠিক জানা যায় নাই। তবে জয়যান হইতে একচক্রা পর্য্যন্ত মোটামুটী ১৩ ক্রোশের অধিক স্থান ঘোষরাজ্য ভুক্ত ছিল, তাহা বেশ বুঝা যাইতেছে।

এরূপ স্থলে সিংহবংশের অধিকার অপেক্ষা ঘোষবংশের অধিকার বেশী বিস্তৃত ছিল বলিয়াই মনে হইতেছে। জয়যান ও সিংহপুরগড়ের মধ্যবর্ত্তী ময়ূরাক্ষী নদীই উভয় বংশের রাজ্যসীমা নির্দ্দিষ্ট রাখিয়াছিল।

বাৎস্য সিংহ ও সৌকালীন ঘোষ যেরূপ বহু গ্রামের আধিপত্য লাভ করিয়াছিলেন, মৌদগল্য পুরুষোত্তম, কাশ্যপ দেবদত্ত ও বিশ্বামিত্র গোত্রজ সুদর্শনও সেইরূপ বহুস্থান পাইয়াছিলেন কি না, তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায় নাই। শ্যামদাসী ডাক হইতে এইরূপ প্রমাণ পাইতেছি—

"মথুরায় বাস কৈল মৌদগল্যনন্দন।
বটগ্রামে বিশ্বামিত্র করি নিকেতন ॥
হরিহর গ্রামে রৈল কাশ্যপনন্দন ॥"

এই বচনের প্রমাণে মৌদগল্য পুরুষোত্তমের আদিবাস মথুরা গ্রাম হইতেছে। এই স্থানের

মথুরা

মথুরা শব্দ দেখিয়া অনেকে পশ্চিম-প্রদেশীয় মথুরা তীর্থ মনে করেন। কিন্তু পরবর্ত্তী অংশে বিশ্বামিত্র ও কাশ্যপগোত্রের পরিচয়স্থলে ভিন্ন ভিন্ন গ্রামের উল্লেখ থাকায়, মৌদগল্য পুরুষোত্তমের বাসস্থান মথুরাকেও একটী স্বতন্ত্র গ্রাম বলিয়াই ধরিতে হইবে। শ্যামদাসী ডাক হইতে মনে হয় যে, রাজার নিকট হইতে অনাদিবরসিংহ যেরূপ বাসার্থ সিংহপুর ও সোমঘোষ যেরূপ জয়যান লাভ করেন, মৌদগল্য প্রভৃতি তিন গোত্রও যথাক্রমে প্রথমে সেইরূপ মথুরা, বটগ্রাম ও হরিহরগ্রাম বাসার্থ লাভ করিয়াছিলেন। যেখানে মহারাজ শশাঙ্কের রাজধানী রাঙ্গামাটী কাণসোণা, উত্তররাঢ়ে এই রাঙ্গামাটীর ৪ মাইল উত্তরপশ্চিমে এবং গোকর্ণ হইতে ১½ মাইল উত্তর-পূর্ব্বে প্রাচীন মথুরা গ্রাম অবস্থিত। অক্ষা° ২৪°৩' উঃ এবং দ্রাঘি° ৮৮°১২' ২৫" পূঃ।

বটগ্রাম

উত্তররাঢ়ে অজয়নদের পূর্ব্বকূলে মঙ্গলকোটের ৪ মাইল উত্তর-পূর্ব্বে প্রাচীন বটগ্রাম বিদ্যমান। এই গ্রাম সাধারণতঃ 'বড়গাঁ' এবং ইহার পার্শ্বে ইছাপুর গ্রাম থাকায় 'ইছেবড়গাঁ' নামেও পরিচিত। এই বড়গাঁর পার্শ্বে পূর্ব্ব-পশ্চিমে এক মাইলের উপর লম্বা এক দীঘী আছে, এত বড় দীঘী বর্দ্ধমান জেলায় আর নাই। এই সুবৃহৎ পুষ্করিণীই বটগ্রামের প্রাচীন সমৃদ্ধির পরিচয় দিতেছে।

(৮৬) "জয়যানগ্রামনামানং বাসার্থেন দদৌ নৃপঃ।
তত্তশ্চতুর্দ্দিশি গ্রামং সপ্তবিংশশতানি চ।
সামন্তরাজরূপেণ একচক্রাবধিং দদৌ ॥" (উত্তররাঢ়ীয় কুলকারিকা)

ভাগীরথীতীরস্থ বহরমপুর-গোরাবাজার হইতে ১০ মাইল পশ্চিমে এবং ভৈরবের পশ্চিম কূলে অক্ষা° ২৪°২´২৫´´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৮৮°২৮´ পূঃ মধ্যে হরিহর-গ্রাম অবস্থিত। এই স্থান এক্ষণে হরিহরপাড়া নামে খ্যাত।

হরিহর গ্রাম

মথুরা, বটগ্রাম ও হরিহর গ্রামের আর পূর্ব্ব সমৃদ্ধির কিছুই নাই। উত্তররাঢ়ে পালবংশের অধিকার পুনরায় বিস্তৃত হইলে এখানকার দাস, মিত্র ও দত্তবংশ নানা স্থানে ছড়াইয়া পড়েন।

আদিত্যশূরের পর[৮৭] ধরাশূর উত্তরাধিকার লাভ করেন। উত্তর-রাঢ়ীয় কুলপঞ্জিকা হইতে জানা যায় যে, এই রাঢ়াধিপের সময় আরও চারি ঘর কায়স্থ আসিয়া উক্ত [illegible] জনের সহিত সম্মিলিত হন। এই ৪ জনের পরিচয় এইরূপ পাওয়া যায়—

ধরাশূর

১ম শাণ্ডিল্য ঘোষ—চিত্রগুপ্তান্বয় ক্ষত্র বিভানুর বংশে জন্ম।

২য় কাশ্যপ দাস—চিত্রগুপ্তাত্মজ বিশ্বভানুর বংশে জন্ম।

৩য় মৌদ্গল্য কর—চিত্রগুপ্তাত্মজ শ্রীভানুর বংশে জন্ম।

৪র্থ ভরদ্বাজ সিংহ—চিত্রগুপ্তাত্মজ শ্রীবীর্য্যভানুর বংশে জন্ম।

এই চারি জন মৌলিক অর্থাৎ বিশুদ্ধ কায়স্থবংশ, মহাধনুর্দ্ধর, রাজকর্ম্মে সুদক্ষ এবং সকলেই শ্রীকর্ণজ শ্রেণীভুক্ত বলিয়া গণ্য হইয়াছিলেন।[৮৮]

রাজা ধরাশূরও রাঢ়বাসী ব্রাহ্মণদিগের [৮৯] ও ব্রাহ্মণ্যাদি বিচার করিয়া তাঁহাদিগকে কুলাচল ও সচ্ছোত্রিয় এই দুইটী অংশে বিভক্ত করেন।[৮৯] সমাজ-সংস্কারে ধরাশূরের যথেষ্ট মনোযোগ থাকিলেও শাসন-সংস্কার ও শক্তিবিস্তারে তাঁহার সেরূপ লক্ষ্য ছিল না। তাঁহার অংশ-বিভাগ লইয়াও রাঢ়বাসী ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে পরস্পর মতভেদ ও দলাদলি উপস্থিত হইয়াছিল।

(৮৭) আইন্-ই-অকবরীর কোন হস্তলিপিতে ইনি 'আদিংশূর', আবার কোন হস্তলিপিতে 'আদশূর' নামে পরিচিত হইয়াছেন।

(৮৮) "চিত্রগুপ্তান্বয়ে জাতঃ ক্ষত্রো বিভানুসংজ্ঞকঃ।
তদ্বংশসম্ভূতো ঘোষঃ শাণ্ডিল্যগোত্রজো ভবেৎ॥
চিত্রগুপ্তাত্মজঃ শ্রীমান্ কায়স্থো বিশ্বভানুকঃ।
তদ্বংশসম্ভূতো গোত্রঃ কাশ্যপো দাস এব চ॥
চিত্রগুপ্তসুতশ্চাসৌ ক্ষত্রঃ শ্রীভানুবংশজঃ।
তুর্য্যাংশো গণিতো জ্ঞেয়ঃ করো মৌদ্গল্য এব হি॥
শ্রীবীর্য্যবংশজশ্চাপি সিংহঃ সূর্য্যাংশগণিতঃ।
গোত্রো ভরদ্বাজশ্চাসৌ মৌলিকঃ খ্যাত এব হি॥
সর্ব্বে কর্ণজশ্রেণিভুক্তাঃ সুদক্ষাঃ রাজকর্ম্মণি।
মহাধনুর্দ্ধরা বীরাঃ সর্ব্বশাস্ত্রেষু পণ্ডিতাঃ॥"

(পঞ্চাননশর্ম্মরচিত কারিকা)

(৮৯) বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস, ব্রাহ্মণকাণ্ড, ১মাংশ, এবং গৌড়ে ব্রাহ্মণে বিস্তৃত বিবরণ দ্রষ্টব্য।

এই সময়ে গৌড়াধিপ নারায়ণপাল নষ্টরাজ্য উদ্ধারে মনোযোগী হইয়াছিলেন। তাঁহার মাতামহ হৈহয়রাজ এবং বৈবাহিক রাষ্ট্রকূটপতি জগত্তুঙ্গের সহায়তায় তিনি তাঁহার পিতৃপুরুষের স্বোপার্জ্জিত রাজ্যগুলি পুনরায় অধিকার করিলেন, সেই সঙ্গে ধরাশূরের পুত্র অনুশূরও[১০] উত্তররাঢ় হারাইয়া দক্ষিণরাঢ়ে আশ্রয় লইতে বাধ্য হইলেন। পূর্ব্বে রাঢ়দেশের নানা স্থানে যে সকল সামন্তরাজ শূরবংশের রাজচ্ছত্রাধীন ছিলেন, এখন সুযোগ পাইয়া ও নামমাত্র পালবংশের অধীনতা স্বীকার করিয়া তাঁহারা সকলেই প্রকৃত প্রস্তাবে স্বাধীন হইলেন। এ সময় জয়বান ও পাঁচথুপী অঞ্চলে সৌকালীন ঘোষবংশ, ফতেসিংহ অঞ্চলে বাৎস্য সিংহবংশ, বীরভূমে মিত্রভূমে মিত্রবংশ, দক্ষিণখণ্ড অঞ্চলে শাণ্ডিল্য ঘোষবংশ, কুসুম্বা অঞ্চলে কাশ্যপ দাসবংশ, দত্তবাটী অঞ্চলে দত্তবংশ এবং দক্ষিণরাঢ়ে ভুরসুট্ অঞ্চলে দাসবংশ, সিঙ্গুর বা সিংহপুর ও জগদ্দল অঞ্চলে কায়স্থ পালবংশ প্রভৃতি স্বাধীন ভাবে রাজত্ব করিতে থাকেন।

অনুশূর

অনুশূর দক্ষিণরাঢ়ে আসিয়া মন্দারনামক স্থানে রাজধানী করিয়াছিলেন, এই স্থান অপরমন্দার এবং অধুনা 'গড়-মন্দারন্' নামে পরিচিত।

শূরবংশের শেষ রাজধানী অপরমন্দারের বর্ত্তমান অবস্থান

হুগলী জেলায় জাহানাবাদ মহকুমা হইতে ৬ মাইল পশ্চিমে অক্ষা° ২২°৫১' উঃ এবং দ্রাঘি° ৮৭° ৪১'২৫" [illegible] 'ভিতরগড়' নামে যে প্রাচীন ধ্বংসাবশেষ রহিয়াছে, এই স্থানেই রামপালচরিত-বর্ণিত অপরমন্দারের রাজপ্রাসাদ এবং এই ভিতরগড় হইতে ৫ মাইল উত্তর-পশ্চিমে 'দেশূরা' ও পশ্চিমে পশ্চিমপাড়া এবং পূর্ব্বে 'গোঘাট' গ্রাম পর্য্যন্ত মন্দার রাজধানী বিস্তৃত ছিল। দেশূরা হইতে কাঁটাগড়িয়া ও ঢেকুরিয়া পর্য্যন্ত পূর্ব্বে দ্বারিকেশ্বর ও পশ্চিমে আমোদর নদের প্রায় ৭½ মাইল মধ্যবর্ত্তী স্থানে প্রাচীন ধ্বংসাবশেষ ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে। ভিতরগড়ের কিছু দূর পশ্চিমে পিণ্ডরা-গড়িয়া, সুশাগড়িয়া, ঈশাগড়িয়া, তারাহাট প্রভৃতি পুরাতন স্থান রহিয়াছে। ভিতরগড়ের দক্ষিণে সাইটার ১½ মাইল দক্ষিণপূর্ব্বে আমোদরের পশ্চিম নিকূলে লক্ষ্মীকুণ্ড গ্রাম আছে। দেশূরা দেবশূর ও লক্ষ্মীকুণ্ড লক্ষ্মীশূরের নাম রক্ষা করিতেছে। দেশূরার ৩ মাইল উত্তরপূর্ব্বে সামন্তখণ্ড, শুনা যায় এখানে আসিয়া রাঢ়াধিপের সামন্তগণ অবস্থান করিতেন। রাঢ়াধিপ অনুশূর এই অঞ্চলের যেখানে প্রথম আসিয়া ছাউনী করেন, সামন্তখণ্ড ও ভিতরগড়ের মধ্যে সেই স্থান অনুপুরের অপভ্রংশে এক্ষণে 'অনুর' নামে পরিচিত ও ভিতরগড় হইতে ৩॥০ মাইল উত্তরে অবস্থিত।

অনুশূরের বংশধরগণও কএক পুরুষ এখানেই দক্ষিণরাঢ়ের অধিরাজরূপে আধিপত্য করিয়া গিয়াছেন।

আবুল্ ফজলের আইন্-ই-অকবরীতে অনুশূর 'অনুরুধ্' নামে উক্ত হইয়াছেন। তৎপরে

(১০) বিশ্বকোষে "বঙ্গদেশ" শব্দে ভ্রমক্রমে "অনুশূর" স্থানে রণশূর লিখিত হইয়াছে। এখন কুলগ্রন্থ ও শিলালিপির প্রমাণে বুঝিতে পারিতেছি যে, অনুশূর ও রণশূর ভিন্ন ব্যক্তি।

কুলগ্রন্থে যামিনীশূরের নাম পাওয়া যায়। আইন্-ই-অকবরীতে ইঁহার নাম 'যামিনীভান।'

যামিনীশূর

তৎকালে দক্ষিণরাঢ়ে শৌর্য্যবীর্য্যে 'দাসবংশ' অতিশয় প্রবল হইয়া উঠিতেছিলেন। ভূরিশ্রেষ্ঠী বা বর্ত্তমান হাওড়া জেলার ভূরসুট নামক স্থানে তাঁহাদের রাজধানী ছিল। তাঁহাদের রাজধানীর ধ্বংসাবশেষ অদ্যাপি ভূরশুট গ্রামে নয়নগোচর হইয়া থাকে।

ভূরশুট গ্রামে বহুসংখ্যক ধনকুবের শ্রেষ্ঠীগণের বাস থাকায় এই স্থান 'ভূরিশ্রেষ্ঠী নগরী' নামে

রাজা পাণ্ডুদাস

পরিচিত হইয়াছিল। সুদূর উত্তরপশ্চিমপ্রদেশে চন্দেল্লরাজ-সভাতেও এই নগরীর খ্যাতি বিস্তৃত হইয়াছিল। তৎকালে রচিত চন্দেল্ল-রাজকবি কৃষ্ণমিশ্রের প্রবোধচন্দ্রোদয়নাটকে এই ভূরিশ্রেষ্ঠীর প্রশংসা দৃষ্ট হয়। চন্দেল্লরাজ যশোবর্ম্মা প্রায় ৯৫৪ খৃষ্টাব্দে গৌড় ও মিথিলা জয় করেন এবং এই সময়ে ভূরশুটের সহিত পরিচিত হন। বাস্তবিক এ সময়ে নালন্দা ও বিক্রমশিলা যেমন বৌদ্ধশাস্ত্রচর্চ্চার প্রধান কেন্দ্র বলিয়া পরিচিত ছিল, ভূরিশ্রেষ্ঠী নগরীও তদ্রূপ স্মৃতি ও ন্যায়শাস্ত্রচর্চ্চার প্রধান কেন্দ্র বলিয়া গণ্য হইয়াছিল। বলিতে কি, যে সময় মিথিলাতেও ন্যায়শাস্ত্রচর্চ্চার আভাস মাত্র পাওয়া যাইত না, তৎকালে ৯১৩ শকেও (৯৯১ খৃষ্টাব্দে) ভূরিশ্রেষ্ঠীপতি রাজা পাণ্ডুদাসের আশ্রয়ে সুপ্রসিদ্ধ প্রাচীন নৈয়ায়িক শ্রীধরাচার্য্য "ন্যায়কন্দলী" রচনা করেন।[২১] এই মহাসামন্ত কায়স্থ দাসবংশের খ্যাতিতে দক্ষিণরাঢ়ের অপর সকল নৃপতির গৌরব যেন মলিন হইয়াছিল। দক্ষিণরাঢ়পতি যামিনীভানু তাঁহার সহিত আত্মীয়তা স্থাপন করিয়া আপনাকে গৌরবান্বিত মনে করিয়াছিলেন। ভূরিশ্রেষ্ঠীপতি পাণ্ডুদাসের শাসনকালে দক্ষিণরাঢ়ে বহু পণ্ডিতের সমাগমের সহিত উত্তররাঢ় ও অপরাপর নানা স্থান হইতে বহু-সম্ভ্রান্ত কায়স্থেরও আগমন ঘটিয়াছিল।

যামিনীশূরের পর তিরুমলয়-শিলালিপি হইতে রণশূর, কুলগ্রন্থে প্রদ্যুম্নশূর ও বরেন্দ্রশূর এবং রামপালচরিতে লক্ষ্মীশূরের নাম পাওয়া যায়।

যখন ভূরিশ্রেষ্ঠীনগরে দাসবংশ ও অপরমন্দারে শূরবংশ প্রতিষ্ঠিত এবং যে সময়ে রাঢ়ের সমৃদ্ধির কথা দিগন্ত প্রসারিত হইয়াছিল, সেই সময় (প্রায় ১০০০ খৃঃ অব্দে) চন্দেল্লরাজ যশোবর্ম্মার পুত্র ধঙ্গদেব[২২] রাঢ় আক্রমণ করিয়া রাঢ়ের রাজা ও রাণীকে বন্দী করিয়া লইয়া গিয়াছিলেন। এ সংবাদ বুন্দেলখণ্ডের অন্তর্গত খজুরাহো গ্রাম হইতে আবিষ্কৃত শিলালিপি হইতে প্রকাশিত হইয়াছে।[২৩] এই খজুরাহোর ১০৫৯ সংবতে উৎকীর্ণ মরকতেশ্বর-প্রশস্তি হইতে আরও জানা

(২১) ন্যায়কন্দলীর সমাপ্তিপুষ্পিকায় এইরূপ লিখিত আছে—"ত্র্যধিকদশোত্তরনবশতশকাব্দে ন্যায়কন্দলী রচিতা। রাজশ্রীপাণ্ডুদাসকায়স্থযাচিত-ভট্টশ্রীধরেণেয়ং সমাপ্তেয়ং পদার্থ-প্রবেশন্যায়কন্দলীটীকা।"

(২২) Epigraphia Indica, Vol. I. p. 139.

(২৩) উক্ত শিলালিপিতে রাঢ়রাজপত্নী সম্বন্ধে এইরূপ শ্লোক দৃষ্ট হয়—

"কা ত্বং কাঞ্চীনৃপতিবনিতা কা স্বমন্ধ্রাধিপত্নী
কা ত্বং রাঢ়াপরিবৃঢ়বধূঃ কা স্বমঙ্গেন্দ্রপত্নী।

যায় যে, গৌড়ের কায়স্থ পালবংশ চন্দ্রাত্রেয় বা চন্দেল্লরাজসভায় বিশেষ সম্মানিত হইয়াছিলেন। এমন কি, গৌড়-কায়স্থ যশঃপাল উক্ত শিলালিপি লিখিয়া গিয়াছেন এবং রাজকবি তাঁহাকে 'প্রথিতকুলশীলোজ্জ্বল' 'ধীমান্' 'বিদিতপদবিন্ত' বলিয়া পরিচিত করিয়াছেন।[৯৪] ইহার শতাধিক বর্ষ পরে ১১৭৩ সংবতে যখন ঐ মন্দিরের পুনঃসংস্কার হয়, তখনও উক্ত যশঃপালের বংশধর গৌড়কায়স্থ জয়পাল উক্ত মন্দির-সংস্কারের সংবাদ লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, তিনিও এই প্রশস্তিতে 'সাহিত্যাম্বুধিবন্ধু' ও 'অনিন্দ্যদ্যুতি' বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।[৯৫] সুতরাং রাঢ় বা গৌড়বাসী কায়স্থগণ শূরবংশের প্রভাববিস্তারের সহিতই যে, ভারতে সকল প্রধান প্রধান ক্ষত্রিয়রাজসভায় সম্মান লাভ করিতেছিলেন, কেবল এই খজুরাহোর লিপি বলিয়া নহে, নানা স্থানের শিলালিপি ও তাম্রশাসন হইতে তাহার যথেষ্ট সন্ধান পাওয়া গিয়াছে, যথাস্থানে তাহার প্রসঙ্গ বিবৃত হইয়াছে।[৯৬]

যাহা হউক, চন্দ্রাত্রেয়রাজ ধঙ্গদেব শূররাজ কি তাঁহার কোন মহাসামন্তকে বন্দী করিয়া লইয়া গিয়াছিলেন, উক্ত শিলালিপি হইতে তাহা ঠিক বুঝা যাইতেছে না, কারণ তৎকালে রাঢ়ের মহাসামন্তগণও 'রাঢ়াধিপ' বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

কুলগ্রন্থে রণশূরের নাম না থাকিলেও সুদূর মান্দ্রাজপ্রদেশে তিরুমলয়-গিরিলিপি হইতে দক্ষিণরাঢ়াধিপ রণশূরের নাম পাওয়া গিয়াছে। দাক্ষিণাত্যপতি রাজেন্দ্রচোল দিগ্বিজয়োপলক্ষ্যে ১০২০ হইতে ১০৩০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে যখন গৌড়াদি আক্রমণ করেন, তৎকালে উত্তররাঢ়ে মহী-

রণশূর

পাল, দক্ষিণরাঢ়ে রণশূর, তন্দভুক্তিতে ধর্ম্মপাল এবং বঙ্গে গোবিন্দচন্দ্র রাজত্ব করিতেছিলেন। উক্ত শিলালিপিতে লিখিত আছে, 'পর-কেশরী বর্ম্মা শ্রীরাজেন্দ্রচোলদেবের (রাজ্যাঙ্কের) ১৩শ বৎসরে—যিনি বিপুল রণকুশল সৈন্যদ্বারা অধিকার করিয়াছিলেন—প্রবল যুদ্ধে দুর্গম ওড্ডবিষয় (উৎকল), মনোরম কোশল প্রদেশ

ইত্যালাপাঃ সমরজয়িনো যস্য বৈরিপ্রিয়াণাং
কারাগারে সজলনয়নেন্দীবরাণাং বভূবুঃ ॥"
Khajuraho Inscription, No. IV. in Epigraphia Indica, Vol. I. p. 145.

(৯৪) "কায়স্থেন প্রথিতকুলশীলোজ্জ্বলধিয়া।
যশঃপালেনায়ং বিদিতপদবিন্তেন লিখিতঃ
প্রশস্তে বিন্যাসঃ কৃতযুগসমাচারসদৃশঃ ॥" ঐ p. 146.

(৯৫) "বিদ্বদ্ভির্জয়পালশীতকিরণো মুক্তাফলাবলিতো
গৌড়ঃ প্রোল্লিখদক্ষরাণি কুমুদাকরোঽপি সর্বংকরঃ।
কায়স্থো জয়বর্ম্মদেবনৃপতেরীশস্য বিভ্রৎকলাঃ
সাহিত্যাম্বুধিবন্ধুরুদ্ধতমো রুদ্ধ্রনিন্দ্যদ্যুতিঃ ॥" ঐ p. 147.

(৯৬) এই পালবংশব্যতীত অপর গৌড়কায়স্থও চন্দ্রাত্রেয়-ক্ষত্রিয়রাজসভায় সংস্কৃতভাষাবিৎ ও সুপণ্ডিত বলিয়া সমাদৃত হইয়াছিলেন, ১০১১ সংবতে উৎকীর্ণ খজুরাহোর অপর শিলালিপি হইতেও প্রমাণিত হইয়াছে।
Epigraphia Indica, Vol I. p. 109.

যেখানে ব্রাহ্মণগণ মিলিত হইয়াছিলেন; মধুকরবৃন্দপূর্ণ উদ্যানবিশিষ্ট তন্দভুক্তি, ঘোরতর যুদ্ধে ধর্ম্মপালকে নিহত করিয়া তিনি যে প্রদেশ দখল করিয়াছিলেন। সর্ব্বত্র সুপ্রসিদ্ধ তক্কনলাড়ম্ (দক্ষিণরাঢ়) প্রবলবেগে রণশূরকে আক্রমণ করিয়া তিনি যে দেশ অধিকার করিয়াছিলেন; বঙ্গাল দেশে যেখানে ঝড়-জলের কখন বিরাম নাই, গজপৃষ্ঠ হইতে নামিয়া যেস্থান হইতে গোবিন্দচন্দ্র পলায়ন করিয়াছিলেন। কর্ণভূষণ, পাদুকা ও বলয়ভূষিত মহীপালকে অগ্নিময় রণক্ষেত্র হইতে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিতে বাধ্য করিয়া যিনি তাঁহার অসম্ভব বলশালী গজসমূহ আর রমণীরত্নসমূহ করায়ত্ত করিয়াছিলেন, সেই মুক্তাগর্ভ সাগরের ন্যায় রত্নসমৃদ্ধ উত্তিরলাড়ম্ (উত্তররাঢ়) এবং গঙ্গা, যাঁহার জলরাশি বালুকাগর্ভ তীর্থসমূহ চুম্বন করিতেছে।"[২৭]

উক্ত শিলালিপি হইতে বেশ বুঝিতেছি যে, খৃষ্টীয় ১১শ শতাব্দীর প্রথম ভাগে দক্ষিণরাঢ়ের অধিপতি রণশূরের খ্যাতি সুদূরকাঞ্চী ছাড়াইয়া বিস্তৃত হইয়াছিল। দক্ষিণ রাঢ়ীয় ঢাকুর হইতে জানিতে পারি যে, ঐ সময়ে ভরদ্বাজগোত্রজ পুরুষোত্তম দত্ত কাঞ্চীপুর হইতে এদেশে আগমন করেন, যথা—

"বীজী পুরুষোত্তম দত্ত,　　　　সদাশিব অনুরক্ত,
কাঞ্চীপুর হইতে বঙ্গদেশে।" ইত্যাদি

সম্ভবতঃ যে সময় কাঞ্চীপতি রাজেন্দ্রচোল রাঢ়বঙ্গ আক্রমণ করেন, সেই সময়েই ভরদ্বাজ পুরুষোত্তম দত্ত সেই দিগ্বিজয়ী মহাবীরের সহিত এদেশে আসিয়া পরে এখানেই ভূসম্পত্তি লাভ করিয়া গঙ্গাতীরে রহিয়া যান। দক্ষিণরাঢ়ীয় কুলকারিকায় এই পুরুষোত্তম-দত্তের গঙ্গাপৃষ্ঠে আগমন-সংবাদ বিবৃত হইয়াছে।[২৮] ইহা হইতে মনে হয় যে, তিনি সম্ভ্রান্ত বংশোদ্ভব ও একজন উচ্চ রাজকর্ম্মচারী ছিলেন। এ সময়ে তাঁহার সঙ্গে আরও কএকঘর কায়স্থের আগমন অসম্ভব নহে।

রাজেন্দ্রচোলের রাঢ়বঙ্গ-আক্রমণকালে উত্তররাঢ়পতি মহীপাল ও বঙ্গাধিপতি গোবিন্দ-চন্দ্রের ন্যায় রণশূর পৃষ্ঠ প্রদর্শন করেন নাই, ইহাতেও তাঁহার পরাক্রমের আভাস পাওয়া যাইতেছে। সম্ভবতঃ এই যুদ্ধে তাঁহার বীরত্বে ও প্রতাপে মুগ্ধ হইয়া দাক্ষিণাত্যপতি তাঁহার সহিত সখ্যতাস্থাপন করিয়াছিলেন. যখন রাজেন্দ্রচোল উত্তররাঢ়ে গমন করেন, তখন রণশূরও তাঁহার পথপ্রদর্শকরূপে গিয়া থাকিবেন। মহীপাল পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিলে হয়ত সেই সুযোগে তিনি বারেন্দ্রভূমি জয় করিয়া লইয়াছিলেন। এই সময়ে তাঁহার যে পুত্ররত্ন জন্ম গ্রহণ করেন, তিনিই হয়ত কুলগ্রন্থে 'বরেন্দ্রশূর' নামে পরিচিত হইয়াছেন। কেহ কেহ মনে করেন যে, এই বরেন্দ্রশূর হইতেই বরেন্দ্রভূমির নামকরণ হইয়াছে। কিন্তু এ সম্বন্ধে কোন ঐতিহ্য প্রমাণ এখনও আমাদের সমক্ষে উপস্থিত হয়

বরেন্দ্রশূর

(২৭) Dr. Hulzsch's South Indian Inscriptions, Vol. I. p. 98. এবং বিশ্বকোষ, ৪র্থ ভাগ, ৬১১ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

(২৮) "ততো দত্তঃ কুলশ্রেষ্ঠঃ গঙ্গাবাসে স্থিতঃ সুধীঃ।" (দক্ষিণরাঢ়ীয় কায়স্থকারিকা)

নাই। রণশূরের বরেন্দ্রের অধিকার অল্পকালস্থায়ী। কারণ রাজেন্দ্রচোলের প্রত্যাবর্ত্তনের সহিত মহীপাল আবার সমস্ত রাঢ়গৌড় অধিকার করিয়া বসিয়াছিলেন। এই সময়ে দক্ষিণ-রাঢ়ের পরাক্রান্ত শূরনরপতিগণও সম্ভবতঃ পরাক্রান্ত মহীপালের নিকট রাঢ়ের অনেকটা হারাইতে বাধ্য হইয়া থাকিবেন। কুলগ্রন্থে বরেন্দ্রশূরের পর প্রদ্যুম্নশূরের নাম পাই।

দক্ষিণরাঢ়ে প্রদ্যুম্নশূরের নামও বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। তিনি গঙ্গাবাস উপলক্ষে যেখানে বাস করিতেন, সেই স্থান তাঁহার নামানুসারে প্রদ্যুম্ননগর বলিয়া খ্যাত হইয়াছিল। স্মার্ত্ত রঘুনন্দন এই প্রদ্যুম্ননগরের উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন যে, 'প্রদ্যুম্ননগরের দক্ষিণ হইতে সরস্বতী নদীর উত্তরে গঙ্গাজল আসায় এই স্থান দক্ষিণ-প্রয়াগ নামে প্রসিদ্ধ। এখানে স্নান করিলে প্রয়াগের ন্যায় অক্ষয় পুণ্য লাভ হয়।'[১১] ইহাতে মনে হয় যে, গঙ্গাপ্রবাহিত এই স্থানও একটী শক্তিশালী স্মার্ত্তসম্প্রদায়ের নেতৃত্বাধীন ও পুণ্যস্থান বলিয়া গণ্য ছিল। নদীয়া জেলায় ভাগীরথীতীরস্থ বর্ত্তমান চাকদহ নামক থানাই এক সময় প্রদ্যুম্ননগর নামে প্রসিদ্ধ ছিল। ভাগীরথীর চক্রাকার দহ পড়িয়া এই প্রাচীন স্থানের অধিকাংশ গঙ্গাগর্ভশায়ী এবং সেই সময় হইতে প্রদ্যুম্ননগর চক্রদহ বা চাকদহ নামে খ্যাত হইয়াছে। এখনও এখানকার জমিদারী সাবেক কাগজপত্রে এইস্থান 'প্রদ্যুম্নসর' নামে লিখিত। এখনও চাকদহের একমাইল দূরে প্রদ্যুম্নেশ্বর শিবের ও দেবীর বৃহৎ ভগ্নমন্দির বিদ্যমান। মহামহোপাধ্যায় হর-প্রসাদশাস্ত্রী মহাশয় এই মন্দিরকে ৮।৯ শত বর্ষের প্রাচীন বলিয়া মনে করেন। ইহার কিছু দূরে প্রদ্যুম্নরাজপত্নী দময়ন্তীর নামানুসারে দময়ন্তীপুর, যেখানে রাজার গোশালা ছিল সেই স্থান উত্তর-গোগৃহ এবং তাহার পার্শ্বে যেখানে ঋগ্বেদী যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণগণ বাস করিতেন, সেই স্থান ঋগ্পুর বিদ্যমান। এইরূপ বর্ত্তমান চাকদহের চারিদিকে অনেক প্রাচীন স্মৃতি বিদ্যমান। যেখানে দহ পড়িয়া সমৃদ্ধ প্রদ্যুম্ননগর গঙ্গাগর্ভশায়ী হইয়াছে, এখন তাহার যে অংশটুকু সুপ্রাচীন বটবৃক্ষসমাচ্ছন্ন হইয়া জাগিয়া আছে, এখানকার সমস্ত পরগণার লোকের নিকট সেই স্থান অদ্যাপি অতি পবিত্র তীর্থভূমি বলিয়া গণ্য। এখানকার মৃত্তিকা লইয়াই স্থানীয় সকল লোকের দুর্গাপ্রতিমার কাঠামো প্রস্তুত হইয়া থাকে। আজও চাকদহ গঙ্গাবাসের উপযুক্ত স্থান বলিয়া বহুদূরদেশে পরিচিত। সুতরাং এই স্থানই যে এক সময় দক্ষিণরাঢ়াধিপ প্রদ্যুম্নশূরের বাসভবন হেতু প্রদ্যুম্ননগর নামে খ্যাত ছিল, সন্দেহ নাই। বর্ত্তমান চাকদহ-থানা 'পাঁজনৌর' পরগণার অন্তর্গত, এই পাঁজনৌর প্রদ্যুম্ননগরেরই অপভ্রংশ। এক সময় পাঁজনৌর পরগণায় বহু পণ্ডিতের বাস ও যথেষ্ট সংস্কৃতচর্চ্চা ছিল, তাহার অনেক প্রমাণ

(১১) "প্রদ্যুম্ননগরাদ্‌যাম্যে সরস্বত্যাস্তথোত্তরে।
তদ্দক্ষিণপ্রয়াগস্তু গঙ্গাতোয়মুপাগতা॥
স্নাত্বা তত্রাক্ষয়ং পুণ্যং প্রয়াগ ইব লভ্যতে।
দক্ষিণপ্রয়াগ উন্মুক্তবেণী সপ্তগ্রামাখ্যদক্ষিণদেশে॥" (রঘুনন্দনের প্রায়শ্চিত্ততত্ত্ব)

এখনও বিদ্যমান। রাজসাহী জেলায় গোদাগাড়ীর নিকট দেওপাড়া হইতে প্রাপ্ত বিজয়সেনের শিলালিপিতে 'প্রদ্যুম্নেশ্বর' নামধেয় শিবপ্রতিষ্ঠার কথা আছে। তদৃষ্টে কেহ কেহ মনে করেন যে, উক্ত শিবলিঙ্গ প্রদ্যুম্নশূরের নামানুসারেই প্রথম প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, কিন্তু প্রদ্যুম্নশূরের সময় উক্ত বারেন্দ্র-ভূভাগ পালবংশের শাসনাধীন ছিল; এ অবস্থায় সেখানে গিয়া প্রদ্যুম্নশূর কিরূপে শিবপ্রতিষ্ঠা করিলেন তাহা অনুসন্ধেয়।[১০০] নবাবিষ্কৃত বিজয়সেনের তাম্রশাসন হইতে জানা যায় যে, তিনি শূরবংশীয় এক রাজকন্যার পাণিগ্রহণ করেন। উক্ত তাম্রশাসনে শূরনৃপতির নামোল্লেখ নাই। যদি উক্ত শূরনৃপতি প্রদ্যুম্নশূর হন, তাহা হইলে মহারাজ বিজয়সেন মহিষীর অনুরোধে তাঁহার পিতার নামে প্রদ্যুম্নেশ্বর-শিবমন্দির প্রতিষ্ঠা করিতে পারেন।[১০১]

প্রদ্যুম্নশূরের পর রাজা লক্ষ্মীশূরের নাম পাওয়া যায়। সন্ধ্যাকর-নন্দীর রাম-চরিতের টীকায় লক্ষ্মীশূরকে 'অপরমন্দার-মধুসূদন' ও 'সমস্ত-আটবিক-সামন্ত-চক্রচূড়ামণি' বলা হইয়াছে, ইহাতে মনে হয় যে, অপরমন্দার বা

লক্ষ্মীশূর

হুগলী জেলাস্থ জাহানাবাদ মহকুমার অধীন ভিতরগড়ে তাঁহার রাজধানী ছিল। এই লক্ষ্মীশূরের নামানুসারে ভিতরগড়ের নিকট লক্ষ্মীকুণ্ড গ্রাম বিদ্যমান, পূর্ব্বেই ইহার পরিচয় দিয়াছি।

সম্ভবতঃ তৎকালে অপরমন্দার অরণ্যপরিবেষ্টিত ছিল, এই কারণে এই স্থান 'মন্দারারণ্য' এবং এই মন্দারারণ্যই অপভ্রংশে পরে গড়-মন্দারণ নামে খ্যাত হইয়াছে।[১০২] ইহার চারি-পার্শ্বে অরণ্য-প্রদেশে যে সকল সামন্তরাজ ছিলেন, রামচরিতে লক্ষ্মীশূর তাঁহাদের অধিরাজরূপে এবং গৌড়াধিপ রামপালের মিত্ররাজরূপেই পরিচিত হইয়াছেন।[১০৩] এ সময় সেনবংশীয় বিজয়সেন ক্রমে মাথা তুলিতেছিলেন। রামচরিতের টীকায় এই বিজয়সেনই নিদ্রাবলীয় বিজয়রাজ বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছেন। সম্ভবতঃ লক্ষ্মীশূরের পর শূরবংশের খ্যাতি ও প্রতিপত্তি অস্তাচলচূড়াবলম্বী হইয়াছিল। ক্রমে সেনবংশ সমস্ত রাঢ় ও গৌড় অধিকার করিয়া পাল ও শূরবংশের প্রভাব বিলুপ্ত করিয়াছিলেন।

পরে শূররাজগণের নাম, তত্তদ্রাজধানীর নাম ও আনুমানিক রাজ্যকাল প্রদত্ত হইল—

(১০০) রাজশাহী জেলাস্থ মাঁদা গ্রাম হইতে ৩য় গোপালদেবের আধিপত্যকালে (খৃঃ ১২শ শতাব্দীর অক্ষরে) 'দামশূর' নামক এক শূররাজের শিলালিপি পাওয়া গিয়াছে। এই দামশূরের সহিত প্রদ্যুম্নশূরের কি কোন সম্বন্ধ ছিল?

(১০১) কোন কোন বারেন্দ্র ঘটকমুখে এই শ্লোকটী শুনা যায়—

"প্রদ্যুম্নশ্চ বরেন্দ্রশ্চ দ্বৌ সুতৌ নিভুজস্য চ। প্রদ্যুম্নঃ যোগমার্গে চ বরেন্দ্রঃ রাজ্যশাসনে।"

অর্থাৎ নিভুজের দুই পুত্র প্রদ্যুম্ন ও বরেন্দ্র। প্রদ্যুম্ন যোগমার্গে ও বরেন্দ্র রাজ্যশাসনে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। এই শ্লোকটী হইতে মনে হয়—প্রদ্যুম্নশূর শেষাবস্থায় যোগাভ্যাসে দেহপাত করেন এবং বরেন্দ্র ও প্রদ্যুম্নের পিতার নাম নিভুজ, কিন্তু অপর কোথাও এই নিভুজের নাম পাওয়া যায় নাই। নিভুজ রণশূরের নামান্তরও হইতে পারে।

(১০২) মাণিকগাঙ্গুলি ও সীতারাম দাসের ধর্ম্মমঙ্গলে 'প্রদ্যুম্ননগর' স্থানে 'পছুয়া' নাম এবং মন্দারের 'গড়-মন্দারণ' ও 'ভিতরগড়' এই উভয় নাম পাইয়াছি। ইহাতে মনে হয় যে ৩।৪ শত বর্ষ পূর্ব্ব হইতেই মন্দার-রাজধানী অরণ্যময় ও ধ্বংসাবশিষ্ট গড়রূপে পরিণত এবং 'গড়মন্দারণ' নামে অভিহিত হইয়াছিল।

(১০৩) পরবর্ত্তী অধ্যায়ে রামপাল-প্রসঙ্গে বিস্তৃত বিবরণ দ্রষ্টব্য।

১।	কবিশূর (সামন্ত)		
২।	মাধবশূর (মহাসামন্ত)		
৩।	আদিশূর জয়ন্ত (রাজাধিরাজ)	পৌণ্ড্রবর্দ্ধন (গৌড়ে)	৭৩২—৭৮২ খৃষ্টাব্দ
৪।	ভূশূর (মহারাজ)	শূরপুর (রাঢ়ে)	৭৮৩—৮১০ „
৫।	ক্ষিতিশূর „	ঐ	৮১০—৮৪০ „
৬।	অবনীশূর „	ঐ	৮৪১—৮৭০ „
৭।	ধরণীশূর ওরফে আদিত্যশূর „	ঐ পরে সিংহেশ্বর	৮৭১—৯০৫ „
৮।	ধরাশূর „	সিংহেশ্বর	৯০৬—৯৩৫ „
৯।	অনুশূর „	সিংহেশ্বর	৯৩৬—৯৬৫ „
১০।	যামিনীশূর „	অপরমন্দার (গড়-মন্দারণ)	৯৬৬—৯৯৫ „
১১।	রণশূর „	ঐ	৯৯৬—১০২৫ „
১২।	বরেন্দ্রশূর „	ঐ	১০২৬—১০৪০ „
১৩।	প্রদ্যুম্নশূর „	ঐ পরে প্রদ্যুম্ননগর	১০৪১—১০৬০ „
১৪।	লক্ষ্মীশূর „	অপরমন্দার	১০৬১—১০৯০ „

দক্ষিণরাঢ়ীয় মৌলিক-কুলপঞ্জিকায় লক্ষ্মীশূর ও তাঁহার ভ্রাতা বংশধরশূর বাৎস্যগোত্র শূর-বংশের বীজপুরুষ বলিয়া কথিত হইয়াছেন। উক্ত কুলপরিচয়মতে—লক্ষ্মীশূরের সুত অমৃত-শূর, তৎসুত নন্দনশূর, তৎসুত কন্দর্পশূর এবং তৎসুত বিশ্বম্ভরশূর।

"রাঢ়ে প্রথম মুসলমান-আক্রমণকালে আমরা বিশ্বম্ভরশূর নামে আদিশূরবংশীয় এক রাজার নাম প্রাপ্ত হই। তাঁহাকে একজন প্রবল স্বাধীন রাজা বলিয়া স্বীকার না করিলেও একজন প্রধান সামন্তরাজ বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি। ভুলুয়ার ইতিহাস ও বঙ্গজকায়স্থকারিকায় এই বিশ্বম্ভরশূরের পরিচয় আছে। তিনি মুসলমানভয়ে স্বরাজ্য ছাড়িয়া চন্দ্রনাথতীর্থ-দর্শনে গমন করেন। প্রত্যাগমনকালে ভীমবাত্যায় পথভ্রষ্ট হইয়া ১১২৫ শকে (১২০৩ খৃষ্টাব্দে) তিনি নোয়াখালী জেলাস্থ ভুলুয়ায় আসিয়া উপস্থিত হন এবং বারাহীদেবীর প্রত্যাদেশে এখানেই স্বাধীনরাজ্য স্থাপন করেন। তাঁহার বংশধরগণ বহুকাল অপ্রতিহতপ্রভাবে ভুলুয়া রাজ্য শাসন করিয়া গিয়াছেন। বারভূঁঞার অন্যতম মহাবীর লক্ষ্মণমাণিক্য এই বিশ্বম্ভরশূরের বংশধর। এক সময়ে তিনিও এ অঞ্চলের কায়স্থ-গোষ্ঠীপতি হইয়াছিলেন। পূর্ব্বাপর শ্রেষ্ঠ কুলীনকায়স্থের সহিতই তাঁহার ও তদ্বংশধরগণের বৈবাহিক সম্বন্ধ চলিয়া আসিতেছে। নিম্নশ্রেণীর কায়স্থের ঘরে তাঁহারা পদার্পণ করিতেন না। ভুলুয়া পরগণার অন্তর্গত শ্রীরামপুর ও কল্যাণপুরে আজিও তাঁহাদের বংশধরগণ বিদ্যমান এবং দত্তপাড়া, বসুপাড়া ও খিলপাড়া প্রভৃতি স্থানে এখনও তাঁহাদের কায়স্থ আত্মীয় কুটুম্বের বাস রহিয়াছে।"[১০৪]

দক্ষিণরাঢ়ীয় কায়স্থসমাজে যে সকল সম্ভ্রান্ত শূরবংশ বিদ্যমান, তাঁহারা রাজা লক্ষ্মীশূরের অনুজ বংশধরশূরের বংশধর বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকেন।

(১০৪) বিশ্বকোষ, ১৮শ ভাগ, বঙ্গদেশ শব্দ ৫১৭ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য। বঙ্গজকায়স্থকাণ্ডে শূরবংশ-বিবরণে বিশ্বম্ভর-শূরের বংশধরগণের পরিচয় লিখিত হইয়াছে।

ষষ্ঠ অধ্যায়

পাল-রাজবংশ

পূর্ব্ব অধ্যায়ে লিখিয়াছি যে, রাজা ভূশূর পৌণ্ড্রবর্দ্ধন রাজধানী পরিত্যাগ করিয়া আসিলে গৌড়রাজ্যে অরাজকতা উপস্থিত হইয়াছিল। ধর্ম্মপালের তাম্রশাসনে সেই সময়ের অবস্থা "মাৎস্য-ন্যায়" বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছে। যেমন প্রবল মৎস্য দুর্ব্বল মৎস্যকে নাশ করিয়া থাকে, সেইরূপ গৌড়ের সর্ব্বত্র দুর্ব্বলের প্রতি প্রবলের অত্যাচারস্রোতঃ প্রবাহিত হইয়াছিল। এই সময়ে গৌড়মণ্ডল ও নিকটবর্ত্তী পাঁচটী প্রদেশেই প্রত্যেক রাজন্য, প্রত্যেক ব্রাহ্মণ ও প্রত্যেক বণিক্ স্ব স্ব প্রাধান্যস্থাপনে অগ্রসর হইয়াছিলেন।[১] গৌড়রাজ্যের এইরূপ অরাজকতা নিবারণ করিবার অভিপ্রায়ে প্রজাসাধারণ বপ্যটের পুত্র গোপালকে গৌড়-রাজলক্ষ্মী প্রদান করিয়াছিলেন[২] অর্থাৎ সকলে মিলিয়া তাঁহাকে রাজা নির্ব্বাচিত করিয়াছিলেন। প্রজাসাধারণ গোপালদেবকে কেন নির্ব্বাচিত করিয়াছিলেন? তাঁহার আভিজাত্য ও পদমর্য্যাদা কিরূপ ছিল? সাধারণের হৃদয়ে স্বতঃই এ প্রশ্ন উদিত হয়।

গোপালদেবের পুত্র ধর্ম্মপালের সমসাময়িক হরিভদ্রের অষ্টসাহস্রিকা-প্রজ্ঞাপারমিতা-টীকায় ধর্ম্মপালকে 'রাজভটবংশপতিত'[৩] এবং গরুড়স্তম্ভলিপিতে তাঁহাকে 'পূর্ব্বদিকের অধিপতি'[৪] বলা হইয়াছে। এদিকে প্রতিহাররাজ ভোজের দৌলতপুর-তাম্রলিপিতে ধর্ম্মপাল 'বঙ্গপতি' ও তাঁহার সেনাগণ 'বঙ্গাণ' অর্থাৎ বাঙ্গালী বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছেন।[৫] এই কয়টী প্রমাণ দ্বারা আমরা নিঃসন্দেহে বলিতে পারি যে, গোপাল ও ধর্ম্মপাল প্রথমতঃ গৌড়বাসী ছিলেন না, মূলতঃ বঙ্গবাসী ছিলেন এবং বঙ্গের রাজভটের বংশে উদ্ভূত হইয়াছিলেন। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, চীনপরিব্রাজক সেঙ্গচি ৬৫০ হইতে ৬৫৫ খৃষ্টাব্দ মধ্যে সমতট বা বঙ্গের সিংহাসনে রাজভটকে দেখিয়াছিলেন।[৬] তাম্রশাসনে ইনি রাজরাজভট নামেও পরিচিত হইয়াছেন।[৭]

(১) "মাৎস্য-ন্যায়মপোহিতুং প্রকৃতিভির্লক্ষ্ম্যা করং গ্রাহিতঃ
শ্রীগোপাল ইতি ক্ষিতীশ-শিরসাং চূড়ামণিস্তৎসুতঃ।"
ধর্ম্মপালের খালিমপুরলিপি ৪র্থ শ্লোক।

(২) Taranath—in Indian Antiquary, Vol. IV. p. 365.

(৩) M. M. Haraprasad Shastri's Ramacharita in Memoirs of the Asiatic Society of Bengal, Vol. III. no I. p. 3.

(৪) "শক্রঃ পুরোদিশি পতির্দিশঙ্করেষু তত্রাপি দৈত্যাপতিভির্জিত এব [সম্যঃ।]
ধর্ম্মঃ কৃতত্রণিপঙ্খিলাহ বিন্দু স্বামী ময়েতি বিজহাস বৃহস্পতিং বঃ।"
(বাদালের গরুড়স্তম্ভলিপি ২য় শ্লোক)

(৫) Epigraphia Indica, Vol. V. p. 208. (৬) ৭৭ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

(৭) কেহ কেহ এই রাজভটের পিতার তাম্রশাসন-লিপির আলোচনা করিয়া তাঁহাকে খৃষ্টীয় ১০ম শতাব্দীর লোক বলিতে চান। কিন্তু অক্ষর দেখিয়া ইঁহার কালনির্ণয় সমীচীন হয় নাই। বঙ্গাধিপ হরিবর্ম্মার মন্ত্রী ভবদেবের

এই রাজভটের ধর্ম্মানুরাগ ও প্রজাহিতৈষণার পরিচয় সুদূর চীনদেশেও খ্যাত হইয়াছিল। এরূপ মহাত্মার বংশে গোপালের জন্ম বলিয়াই হয় ত প্রজাসাধারণ গোপালকে পরম ভক্তি ও শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিতেন। দেবপালের তাম্রশাসনে গোপাল সম্বন্ধে লিখিত হইয়াছে—

'তিনি সমুদ্র পর্য্যন্ত ধরণীমণ্ডল জয় করিবার পর, আর প্রয়োজন নাই, মনে করিয়া মতঙ্গজগণকে মুক্তিদান করিলে তাহারা স্বাধীন ভাবে বনে গিয়া সবাষ্পনেত্রে বাষ্পনয়ন বন্ধুগণকে আবার দেখিতে পাইয়াছিল।'[৮]

আবার নারায়ণপালের তাম্রশাসনে লিখিত আছে—"তিনি করুণারত্নপ্রমুদিত হৃদয়ে মিত্রভাব ধারণ করিয়া সম্যক্‌সম্বোধিরূপ বিদ্যার অমল জলধারায় অজ্ঞানপঙ্ক ধুইয়া ফেলিয়া, কামকারিগণের প্রভাব জয় করিয়া শাশ্বতী শান্তি লাভ করিয়াছিলেন, সেই শ্রীমান্ দশবলান্বিত লোকনাথ গোপালদেবের জয় হউক।"[৯]

উক্ত উভয় তাম্রশাসন হইতেই গোপালদেবের বীরত্ব, ধর্ম্মানুরাগ ও প্রজাহিতৈষিতার পরিচয় পরিস্ফুট হইয়াছে। প্রথমতঃ বঙ্গাধিপ রাজভটের বংশে জন্ম, তৎপরে তাঁহার বীরত্ব, ধর্ম্মানুরাগ ও প্রজাবাৎসল্য এই কয়টী কারণেই তিনি জনসাধারণ কর্ত্তৃক গৌড়-সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইয়াছিলেন।

চীনপরিব্রাজকের বিবরণীতে রাজভট সমতটপতি বলিয়া প্রথিত হইয়াছেন। সমতট শব্দ 'সমুদ্রতট' শব্দের সংক্ষিপ্ত রূপ বলিয়াই মনে হয়। ঢাকা জেলার মেঘনা-পদ্মাসঙ্গম হইতে উত্তরে আসামসংলগ্ন শৈলমালা পর্য্যন্ত এক সময়ে সমুদ্র বিস্তৃত ছিল।[১০] এমন কি পাবনার

অনন্ত-বাসুদেব-প্রশস্তির লিপি দেখিয়া অধ্যাপক কিলহোর্ণের মত বিচক্ষণ লিপিবিৎ তাঁহাকে খৃষ্টীয় ১২শ শতাব্দীর সমকালীন বলিয়াই স্বীকার করিয়া গিয়াছেন, কিন্তু ভবদেব যে ১০ম শতাব্দীতে বিদ্যমান ছিলেন, তাহা প্রমাণিত হইয়াছে। এইরূপ নবাবিষ্কৃত বঙ্গাধিপ শ্রীচন্দ্রদেবের তাম্রলিপি দেখিলেই তাহা খৃষ্টীয় ১২শ শতাব্দীর পরবর্ত্তী বলিয়া মনে হইবে; কিন্তু তিনি যে তাঁহার শতাধিক বর্ষ পূর্ব্বে বিদ্যমান ছিলেন, তাহাতে কেহই আপত্তি করিবেন না।

(৮) "বিজিতা যেনাজলধের্বসুন্ধরাং বিমোচিতামোঘপরিগ্রহা ইতি।
সবাষ্পমুদ্বাষ্পবিলোচনান্ পুনর্বনেষু বন্ধূন্ দদৃশুর্মতঙ্গজাঃ॥"

(মুঙ্গের হইতে আবিষ্কৃত দেবপালের তাম্রশাসন ৩য় শ্লোক)

(৯) "মৈত্রীং কারুণ্যরত্নপ্রমুদিতহৃদয়ঃ প্রেয়সীং সন্দধানঃ
সম্যক্‌সম্বোধিবিদ্যাসরিদমলজলক্ষালিতাজ্ঞানপঙ্কঃ।
জিত্বা যঃ কামকারিপ্রভবমভিভবং শাশ্বতীং প্রাপ শান্তিং
স শ্রীমান্ লোকনাথো জয়তি দশবলোঽন্যশ্চ গোপালদেবঃ॥"

(ভাগলপুর হইতে প্রাপ্ত নারায়ণপালের তাম্রশাসন ১ম শ্লোক)

উক্ত শ্লোকে এক পক্ষে বুদ্ধ ও অপর পক্ষে গোপালদেবের পরিচয় সূচিত হইয়াছে। উপরে গোপাল-পক্ষেই শ্লোকার্থ দেওয়া হইল।

(১০) "Upon the east the area is bounded by a low-lying country which for six or more months of the year, is under water and where communication by boats of maundage varying with the stream and season is always possible. This country is

সিরাজগঞ্জ হইতে যে প্রবল স্রোতস্বতী বরাবর দক্ষিণ-পূর্ব্বে বহিয়া আসিয়া ধলেশ্বরী ও ব্রহ্মপুত্রের সঙ্গমস্থানে মিলিত হইয়াছে, তাহা অদ্যাপি হুর্‌সাগর বলিয়া পরিচিত। এ অঞ্চলে যে এক সময়ে সাগর ছিল, এখানকার রেলওয়ে জরিপের বিবরণী এবং উক্ত নদীও তাহার সাক্ষ্য দান করিতেছে। সমতটরাজ্যের উত্তর, পূর্ব্ব ও দক্ষিণ ভাগে প্রবাহিত এই সমুদ্র হইতেই পালরাজবংশ রামচরিতে 'সিন্ধুকুলজ' এবং ধর্ম্মমঙ্গলে 'সরিৎপতি'-সুত বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন। ধর্ম্মপালের তাম্রশাসনে "শ্রিয় ইব সুভগায়াঃ সম্ভবো বারিরাশিঃ"[১১] এবং দেবপালের তাম্রশাসনে "শ্লাঘ্যা শুক্তিব্রতাসৌ মুক্তারত্নং সমুদ্রশুক্তিরিব"[১২] ইত্যাদি শ্লোকে তাহারই ইঙ্গিত পাওয়া যাইতেছে। নারায়ণপালের তাম্রশাসনের 'সৎসমতটজন্মা' শব্দ ও 'সমুদ্রকুলজ' একার্থবাচী বলিয়াই মনে করি। বাস্তবিক সমুদ্র হইতে বা সমুদ্রের বংশে পালবংশের উদ্ভব হয় নাই।

বৈদ্যদেবের কমৌলি-লিপিতে লিখিত আছে, পালবংশীয় নৃপতি বিগ্রহপাল 'বংশে মিহিরস্য জাতবান্ পূর্ব্বং' অর্থাৎ মিহিরের বংশে পূর্ব্বকালে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। আবার পালবংশের চিরপ্রসিদ্ধ মন্ত্রী গুরবমিশ্রের গরুড়স্তম্ভলিপিতে তিনি জমদগ্নিকুলোৎপন্ন এবং নক্ষত্রচিন্তক (বংশের)-কণ্ঠহারস্বরূপ কীর্ত্তিত হইয়াছেন।[১৩]

পাল-বংশের জাতিনির্ণয়

নক্ষত্রচিন্তক জমদগ্নিগোত্র গৌড়বঙ্গের রাঢ়ীয়, বারেন্দ্র, বৈদিক ব্রাহ্মণগণমধ্যে সন্ধান পাওয়া যায় নাই। কেবলমাত্র বঙ্গের শাকদ্বীপী ব্রাহ্মণগণের মধ্যেই পাওয়া গিয়াছে। নদীয়া-বঙ্গসমাজের কুলপঞ্জিকা হইতে জানিতে পারি যে, মহারাজ শশাঙ্কদেব গ্রহবৈগুণ্যপ্রযুক্ত রোগপীড়িত হইয়াছিলেন, রোগশান্তির জন্য গ্রহযজ্ঞ করিবার অভিপ্রায়ে সরযূতীর হইতে তিনি

frequently spoken of as the "Sea". The coast line of this sea may be taken as line drawn through Bhairab Bazar, Bajitpur, Nikli-Dompara, Tarail and from thence by a line bearing north-east. Westwards of this coast the country is a land of dead and dying rivers thickly populated by a most industrious race."

Report on Bhairab-Baz. -Netrakona-Mymensing Railways (Reconnaissance Survey) p. I.

(১১) গৌড়লেখমালা ১১ পৃষ্ঠা।　　(১২) গৌড়লেখমালা, ৩৭ পৃষ্ঠা।

(১৩) "জমদগ্নিকুলোৎপন্নঃ সম্পন্নক্ষত্রচিন্তকঃ।
যঃ শ্রীগুরবমিশ্রাখ্যো রামো রাম ইবাপরঃ।" (গরুড়স্তম্ভলিপি ১৮শঃ শ্লোক)

উক্ত গরুড়স্তম্ভলিপির আদ্য শ্লোকে "শাণ্ডিল্যবংশেঽভূদ্বীরদেবস্তদন্বয়ে। পাঞ্চালো নাম তদ্গোত্রে গর্গস্তস্মাদজায়ত।" অর্থাৎ শাণ্ডিল্যবংশে (?), তাঁহার অন্বয়ে বীরদেব, তদ্গোত্রে পাঞ্চাল এবং এই পাঞ্চাল হইতে গর্গ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। এই আদ্য শ্লোকের প্রথমে শাণ্ডিল্য উল্লেখ থাকায় গর্গ হইতে তাঁহার বংশধর গুরবমিশ্র পর্য্যন্ত পালরাজমন্ত্রিগণকে অনেকেই কনৌজাগত সাগ্নিক বিপ্রসন্তান শাণ্ডিল্যগোত্রজ ভট্টনারায়ণের বংশধর বলিয়া স্থির করিয়াছিলেন। কিন্তু 'জমদগ্নিকুলোৎপন্ন' থাকায় এখন আর সে কথা খাটে না। বিশেষতঃ 'নক্ষত্রচিন্তক' এই বিশেষণ থাকায় এই বংশকে আমরা নিঃসন্দেহে শাকদ্বীপী ব্রাহ্মণ বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি।

১ । গ্রহবিপ্র আনাইয়া ছিলেন, এই ১২ জনের মতে জমদগ্নি গোত্রজ চতুর্ভুজ একজন। গ্রহযজ্ঞ সম্পন্ন হইলে রাজাদেশে সেই ব্রাহ্মণ সপরিবারে গৌড়মণ্ডলে বাস করিয়াছিলেন। তাঁহাদের জ্যোতিষশাস্ত্রপরায়ণ সন্তানগণ রাঢ়ে ও বঙ্গে সর্ব্বত্র ছড়াইয়া পড়িয়াছিলেন।[১৪]

মগব্যক্তি নামক গ্রন্থ হইতে আমরা জানিতে পারি যে, নানাদেশীয় ভূপতিগণ নক্ষত্রচিন্তকগণের পদকমলে প্রণত ছিলেন।[১৫] এই সকল প্রমাণে মনে হয়, পালবংশের অভ্যুদয়কালে মগব্রাহ্মণ-প্রভাব গৌড়রাজসভায় প্রসারিত হইয়াছিল। পালবংশ যখন সমসাময়িক তাম্রশাসনে মিহিরবংশ বলিয়া পরিচিত, তখন তাঁহাদিগকেও আমরা শাকদ্বীপী ও আদি সৌর বলিয়া মনে করি। যেমন শকরাজ কণিষ্ক পরে বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী হইলেও তাঁহার মুদ্রায় অগ্নিযজ্ঞের বেদী ও সূর্য্যপূজার পরিপোষক চিহ্নাদি দৃষ্ট হয়, পালবংশীয় বৌদ্ধধর্ম্মানুরক্ত বিগ্রহপালের মুদ্রায়ও আমরা সেইরূপ অগ্নিযজ্ঞের বেদী ও সূর্য্যপূজার যন্ত্র পাইতেছি। এই সকল প্রমাণে পালবংশকেও আদি শাকদ্বীপী-সমাজ-সম্ভূত বলিয়া গ্রহণ করিতে আপত্তি থাকিতেছে না। সৌরদিগের প্রধান পুরাণ ভবিষ্য ও শাম্বোপপুরাণ হইতে জানা যায় যে, শাকদ্বীপী সমাজে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চারিবর্ণই ছিল এবং এই চারিবর্ণই সূর্য্য হইতে উৎপন্ন বলিয়া পরিচিত।[১৬] আনন্দভট্টের বল্লালচরিতেও পালবংশ নিকৃষ্ট ক্ষত্রিয় বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।[১৭] এরূপস্থলে পালবংশকে শাকদ্বীপী ক্ষত্রিয় এবং নক্ষত্রচিন্তক জমদগ্নি-কুলোৎপন্ন তাঁহাদের মন্ত্রিবংশকে শাকদ্বীপী ব্রাহ্মণ বলিয়া অনায়াসে স্বীকার করা যায়। বিষ্ণুপুরাণে লিখিত আছে, শাকদ্বীপী সমাজে বিষ্ণুই সূর্য্যরূপধারী।[১৮] এই কারণেই বৈদ্যদেবের কমৌলিলিপির আদ্য শ্লোকে সূর্য্যদেবই বিষ্ণুরূপে স্তুত হইয়াছেন। গৌড়াধিপ পালরাজগণের ব্রাহ্মণ-মন্ত্রিবংশ যে শাকদ্বীপী ব্রাহ্মণ ছিলেন এবং দূরদেশবাসী শাকদ্বীপী ব্রাহ্মণবংশের সহিতই তাঁহাদের আত্মীয়তা ও কুটুম্বিতা ছিল, তাহারও প্রমাণ বাহির হইয়াছে। খৃষ্টীয় ১০ম শতাব্দে মগধে মানবংশ প্রবল হইয়া উঠিতেছিলেন। তাঁহাদের সভায় শাকদ্বীপী ব্রাহ্মণেরাই কেহ শাস্ত্রী, কেহ মন্ত্রী, কেহ সভাপণ্ডিত, কেহ প্রাড়্‌বিপাক প্রভৃতি উচ্চপদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। গয়াজেলার অন্তর্গত গোবিন্দপুর গ্রাম হইতে একখানি বৃহৎ শিলালিপি পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে মানরাজবংশ ও শাকদ্বীপীয় এক প্রসিদ্ধ পণ্ডিতবংশের পরিচয় পাওয়া যায়। তন্মধ্যে শাকদ্বীপী মগব্রাহ্মণবংশোদ্ভূত কবি কালিদাস বলিয়া পরিচিত মগধাধিপের সভাপণ্ডিত মনোরথ গৌড়াধিপতির প্রধান মন্ত্রী দেবশর্ম্মার কন্যার এবং তৎপুত্র সর্ব্বশাস্ত্রবিৎ গঙ্গাধর গৌড়াধিপতির প্রিয়পাত্র ও ধর্ম্মাধিকারপদে নিযুক্ত মাননীয় জয়পাণির কন্যা পাশলদেবীর পাণিগ্রহণ করেন।[১৯]

(১৪) বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস, ব্রাহ্মণকাণ্ড, ৪র্থ অংশ ৮৬-৮৭ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।
(১৫) ঐ ঐ ঐ ৬৮ পৃষ্ঠা।
(১৬) ঐ ৯ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য। (১৭) বল্লালচরিত, ১৮শ অধ্যায়।
(১৮) "শাকদ্বীপে তু তৈর্বিষ্ণুঃ সূর্য্যরূপধরো মুনে।" (বিষ্ণুপুরাণ ২।৪।৭১)
(১৯) বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস, ব্রাহ্মণকাণ্ড, ৪র্থ অংশ ৬৪ ও ৬৬ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য

গৌড়মন্ত্রিবংশের সহিত এই যৌনসম্বন্ধহেতুও তাঁহাদিগকে অনায়াসেই শাকদ্বীপীয় ব্রাহ্মণ বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে।[২০] এইরূপে পালবংশ ক্ষত্রিয় বলিয়া পরিচিত এবং ভারতপ্রসিদ্ধ রাষ্ট্রকূট, হৈহয়, চেদি প্রভৃতি রাজবংশের সহিত সম্বন্ধসূত্রে আবদ্ধ হইলেও বঙ্গাগত বহু ক্ষত্রিয়-রাজবংশের ন্যায় এই বংশও পরে কায়স্থসমাজভুক্ত ও কায়স্থ বলিয়াই পরিচিত হইয়াছিলেন।[২১] এই কারণেই আইন্-ই-অক্‌বরী প্রভৃতি প্রাচীন মুসলমান ঐতিহাসিক গ্রন্থে পালবংশ কায়স্থ বলিয়াই উল্লিখিত হইয়াছেন।[২২] তাই রাজন্যকাণ্ডে তাঁহাদের ইতিহাস লিখিত হইতেছে।

পালবংশের ইতিহাস জানিতে হইলে তাঁহাদের কুলপরিচয় এবং যাঁহাদের প্রভাবে তাঁহারা প্রভাবান্বিত সেই মন্ত্রিবংশেরও প্রকৃত আভিজাত্য নির্ণয় করা সর্ব্বাগ্রে কর্ত্তব্য মনে করিয়াই এতক্ষণ আমরা আলোচ্য বিষয়ের বাহিরে গিয়া পড়িয়াছিলাম। বাস্তবিক তৎকালে সৌর ও বৌদ্ধ প্রজাসাধারণের চেষ্টায় ও কৌশলেই গোপালদেব গৌড়ের সিংহাসনে অভিষিক্ত হইয়াছিলেন।[২৩]

সাধারণে গোপালকে পালবংশীয় প্রথম ভূপতি বলিয়া স্থির করিয়াছেন। তিনিই গৌড়ে পালবংশীয় প্রথম নৃপতি এবং তাঁহা হইতেই এই বংশের প্রতিষ্ঠা বটে, কিন্তু ধর্ম্মপালের তাম্রশাসন হইতে মনে হয় যে, গোপালের পিতা বপ্যট ও পিতামহ দয়িতবিষ্ণু সামান্য ব্যক্তি ছিলেন না। দয়িতবিষ্ণু 'অবনিপ,

গোপালদেব

(২০) গৌড়ধর্ম্মাধিকারীর জামাতা গঙ্গাধরই 'কাসার' নামক সরোবর-প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে ১০৫৯ শকে ১১৩৭ খৃষ্টাব্দে গোবিন্দপুরের শিলাপ্রশস্তি রচনা করেন, তৎকালে তাঁহার বয়স হইয়াছে, তাঁহার যশোরাশি সর্ব্বত্র বিকীর্ণ হইয়াছিল। এরূপস্থলে ১১১০ হইতে ১১১৭ খৃষ্টাব্দের মধ্যে তাঁহার বিবাহ হইয়া থাকিবে। অন্ততঃ তাহার ৩০ বর্ষ পূর্ব্বে প্রায় ১০৮০ খৃষ্টাব্দে তাঁহার পিতা মনোরথ গৌড়মন্ত্রিকন্যার পাণিগ্রহণ করেন। গঙ্গাধরের শ্বশুর জয়পাণিকে কেহ কেহ বল্লালসেনের ধর্ম্মাধিকারী বলিয়া মনে করেন। (ব্রাহ্মণকাণ্ড ৪র্থ অংশ ৬৬ পৃষ্ঠা) কিন্তু এখন আলোচনায় বুঝিতেছি, মনোরথ ও গঙ্গাধরের বিবাহকালে পালরাজ্য বিনষ্ট হয় নাই। এরূপস্থলে উভয় পিতা ও পুত্রের শ্বশুরকে যথাক্রমে পালরাজের মন্ত্রী ও ধর্ম্মাধিকারী বলিয়াই স্বীকার করিতে হইবে।

(২১) এখনও দক্ষিণরাঢ়ীয় ও বঙ্গজ-কায়স্থসমাজে পালরাজবংশধরগণ বিদ্যমান। কুলগ্রন্থে কায়স্থীভূত পালবংশ 'পালদেব' বলিয়া অভিহিত। কথা উঠিতে পারে যে, এখন গৌড়বঙ্গে শাকদ্বীপী ব্রাহ্মণগণ শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণসমাজে সকলেই হীন বলিয়া গণ্য। তবে কি পালবংশও হেয়? ব্রাহ্মণের পক্ষে চিকিৎসাবৃত্তি ও জ্যোতিষব্যবসা পাতিত্যজনক। শাকদ্বীপী ব্রাহ্মণের প্রধানতঃ জ্যোতিষব্যবসা এবং অনেকের চিকিৎসাবৃত্তিও ছিল, এই কারণেই গৌড়বঙ্গে ব্রাহ্মণপ্রাধান্যকালে ব্রাহ্মণসমাজ শাকদ্বীপী গ্রহবিপ্রগণকে হীন মনে করিতে থাকেন। কিন্তু ক্ষত্রিয় পালবংশের এরূপ চিকিৎসা বা জ্যোতিষের ব্যবসা না থাকায় তাঁহারা পতিত হন নাই। তাঁহারা বরাবর ক্ষত্রিয়োচিত সামাজিক সম্মান লাভ করিয়া আসিয়াছেন।

(২২) Col. Jarrett's Ain-i-Akbari, Vol. II. p. 145.

(২৩) পালরাজবংশের উপসংহারে তাঁহাদের সময়ে গৌড়ের সামাজিক ও ধর্ম্মনৈতিক অবস্থা আলোচিত হইয়াছে।

গণের প্রকৃতি ও সর্ব্ববিদ্যাবদাত এবং বপ্যট 'আসমুদ্র-পৃথিবীতে বিশাল কীর্ত্তিকলাপে কৃতী; শত্রুকুলের খণ্ডনকারী ও (পরম) শ্লাঘ্য ছিলেন।'[২৪]

গোপালদেবের প্রথম জীবন প্রজার স্বার্থরক্ষায়, দেশের কল্যাণসাধনে ও নিজের সৌভাগ্যের পথ উন্মুক্ত করিবার জন্যই ব্যয়িত হইয়াছিল। সম্ভবতঃ তিনি যখন গৌড়ের সিংহাসনে অভিষিক্ত হইয়াছিলেন, সে সময়ে তাঁহার বয়স অধিক হইয়াছিল। বৌদ্ধধর্ম্মের ইতিহাসলেখক তিব্বতীয় তারনাথের মতে তিনি ওদন্তপুরী (বর্ত্তমান বিহারের) অনতিদূরে নালন্দনামক স্থানে একটি দেবালয় নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। তাঁহাকে অধিকদিন গৌড়রাজ্য ভোগ করিতে হয় নাই। তিনি যে রাজলক্ষ্মী অর্জ্জন করিয়াছিলেন, তৎপুত্র দেদ্দদেবীর গর্ভজাত ধর্ম্মপালই তাহার ফলভাগী হইয়াছিলেন। তারনাথের মতে ধর্ম্মপাল প্রথমে বঙ্গে আধিপত্য করিতেন, পরে গৌড় প্রভৃতি অন্যান্য স্থানে তাঁহার আধিপত্য বিস্তৃত হয়। গরুড়স্তম্ভলিপিতেও লিখিত আছে যে, ধর্ম্মপাল প্রথমে পূর্ব্বদিকের অধিপতি ছিলেন, তৎপরে তাঁহার মন্ত্রী গর্গের কৌশলে সকল দিকের স্বামী হইয়াছিলেন।[২৫] একপস্থলে মনে হয়, যখন গোপাল পৌণ্ড্রবর্দ্ধনে গৌড়ের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন, তৎকালে ধর্ম্মপাল পৈতৃক বঙ্গরাজ্য বা সমতটপ্রদেশ শাসন করিতেছিলেন। প্রতিহাররাজ ভোজের শিলালিপিতেও ধর্ম্মপাল 'বঙ্গপতি' বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন, পূর্ব্বেই এ কথা বলিয়াছি। ... খৃষ্টাব্দে গৌড়মণ্ডল গুর্জ্জরপতি বৎসরাজের অধিকারভুক্ত ছিল, ৭৮৪ হইতে ৭৯০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে তিনি রাষ্ট্রকূটরাজ ধ্রুব কর্ত্তৃক রাজপুতানার মরুভূমিতে বিতাড়িত হইয়াছিলেন। ... সময়ে গৌড়মণ্ডলে গোপালদেবের এবং বঙ্গে তৎপুত্র ধর্ম্মপালের অভ্যুদয় ঘটে। অনুমান ৭৯৫ খৃষ্টাব্দে গোপালদেব ইহলোক পরিত্যাগ করেন এবং ধর্ম্মপাল গৌড়ের সিংহাসনে অভিষিক্ত হন।

ধর্ম্মপাল

তাঁহার খালিমপুরলিপিতে বিবৃত হইয়াছে, 'তিনি ইঙ্গিতমাত্রে ভোজ, মৎস্য, মদ্র, কুরু, যদু, যবন, অবন্তী, গান্ধার ও কীর প্রভৃতি জনপদের প্রণতিপরায়ণ অবনতশির নৃপতিগণকে তাঁহার সাধুবাদ দান করাইতে করাইতে হর্ষোৎফুল্ল বৃদ্ধ পাঞ্চাল কর্ত্তৃক মস্তকোপরি নিজ অভিষেকের স্বর্ণকলস তুলিয়া ধরাইয়া কান্যকুব্জকে রাজশ্রী প্রদান করিয়াছিলেন।'[২৬] তাঁহার বংশধর

(২৪) "প্রকৃতিরবনিপানাং সন্ততেরুত্তমায়া অজনি দয়িতবিষ্ণুঃ সর্ব্ববিদ্যাবদাতঃ।
অসীমাসাগরায়ুর্ব্বীং গুর্ব্বীভিঃ কীর্ত্তিভিঃ কৃতী। মণ্ডন্ খণ্ডিতারাতিঃ শ্লাঘ্যঃ শ্রীবপ্যটস্ততঃ।"
(ধর্ম্মপালের খালিমপুরলিপি ২য় ও ৩য় শ্লোক)

(২৫) গৌড়লেখমালা ৭৭ পৃষ্ঠা।

(২৬) "ভোজৈর্ম্মৎস্যৈঃ সমদ্রৈঃ কুরুযদুযবনাবন্তিগন্ধারকীরৈ-
র্ভূপৈর্ব্যালোলমৌলি-প্রণতি-পরিণতৈঃ সাধু-সঙ্গীর্য্যমাণঃ।
হৃষ্যৎ পঞ্চালবৃদ্ধোদ্ধৃত-কনকময়স্বাভিষেকোদকুম্ভো
দত্তঃ শ্রীকান্যকুব্জসলিলিত-চলিত-ভ্রূলতালক্ষ্ম যেন।" (গৌড়লেখমালা ১৪ পৃষ্ঠা।)

নারায়ণপালের তাম্রশাসনেও লিখিত আছে, 'সেই বলবান্ নৃপতি (ধর্ম্মপাল) ইন্দ্ররাজ প্রভৃতি অরাতিবর্গকে জয় করিয়া কান্যকুব্জের রাজশ্রী লাভ করিয়াছিলেন এবং চরণে প্রণত বামনরূপী চক্রায়ুধ নামক (ইন্দ্ররাজের) পিতাকে সেই রাজশ্রী অর্পণ করিয়াছিলেন।'২৬ জিনসেনের হরিবংশের প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া পূর্ব্বেই লিখিত হইয়াছে, ইন্দ্রায়ুধ বা ইন্দ্ররাজ ৭৮৩ খৃষ্টাব্দে উত্তরাপথের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন,২৭ সুতরাং চক্রায়ুধ তাঁহারই পিতা হইতেছেন।

উদ্ধৃত প্রমাণ অনুসারে বলিতে হইবে যে, গৌড়পতি ধর্ম্মপাল একজন অসাধারণ বীরপুরুষ ও দিগ্বিজয়ী নরপতি ছিলেন, তিনি ভোজ ও মৎস্য অর্থাৎ রাজপুতানা, মদ্র বা উত্তরপঞ্জাব, কুরু-যদু-বংশাধিকৃত উত্তরপূর্ব্বপঞ্জাব ও তৎসন্নিহিত হিমালয়প্রদেশ, যবন ও গন্ধারদিগের অধিকৃত সিন্ধু, পশ্চিম পঞ্জাব ও পশ্চিম সীমান্তপ্রদেশ, অবন্তি বা মালব, কীর বা বর্ত্তমান কাঙ্গড়াপ্রদেশ পর্য্যন্ত অধিকার করিয়াছিলেন। এ সময়ে তাঁহার প্রিয় মন্ত্রী ও সেনাপতি গর্গের পিতা বৃদ্ধপঞ্চাল জীবিত ছিলেন। অভিষেককালে তিনিই পৌরোহিত্য করিয়াছিলেন।

তৎকালে গুর্জ্জরপ্রতিহারপতি বৎসরাজের উপযুক্ত পুত্র ২য় নাগভট চিত্রকূট-গিরিদুর্গ হইতে পিতার প্রণষ্টগৌরব উদ্ধারের আয়োজন করিতেছিলেন। কান্যকুব্জের প্রতিই তাঁহার প্রখর দৃষ্টি পতিত হইয়াছিল। ২য় নাগভটের পৌত্র মিহিরভোজের শিলালিপি হইতে এইরূপ পরিচয় পাইয়াছি—

'ত্রয়ীর আস্পদ্ সুকৃতের সমৃদ্ধি ইচ্ছা করিয়া (নাগভট) ক্ষাত্র-নিয়মানুসারে বলির ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। পরাশ্রয়হেতু যাঁহার নীচভাব স্পষ্টীকৃত হইয়াছিল, সেই চক্রায়ুধকে জয় করিয়াও (যিনি) বিনয়-নম্র-দেহে বিরাজ করিতেন। দুর্দ্ধর্ষ বৈরীর উত্তম হস্তী, অশ্ব ও রথসমূহের একত্র সমাবেশে ঘোর ঘনান্ধকারের ন্যায় প্রতীয়মান বঙ্গপতিকে বিশেষরূপে পরাজিত করিয়া ত্রিভুবনের একমাত্র বিকাশবীজ উদীয়মান সূর্য্যের ন্যায় যিনি আবির্ভূত হইয়াছিলেন, সেই তিনিই আনর্ত্ত, মালব, কিরাত, তুরুষ্ক, বৎস ও মৎস্যাদি রাজগণের গিরিদুর্গ বলপূর্ব্বক অধিকার করিয়া কুমারকাল হইতেই অতীন্দ্রিয়-আত্মবৈভব লইয়া বিশ্ববাসিগণের হিতের জন্য পৃথিবীতে আবির্ভূত হইয়াছিলেন।'২৮

(২৬) "জিত্বেন্দ্ররাজপ্রভৃতীনরাতীনুপার্জ্জিতা যেন মহোদয়শ্রীঃ ।
দত্তা পুনঃ সা বলিনাথ পিত্রে চক্রায়ুধায়ানতিবামনায় ॥"
(নারায়ণপালের ভাগলপুর-লিপি)

(২৭) ১০৫ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

(২৮) "ত্রয্যাস্পদস্য সুকৃতস্য সমৃদ্ধিমিচ্ছুর্যঃ ক্ষত্রধাম-বিধিবদ্ধ-বলি-প্রবন্ধঃ ।
জিত্বা পরাশ্রয়কৃত-স্ফুটনীচভাবং চক্রায়ুধং বিনয়নম্র-বপুর্ব্ব্যরাজৎ ॥
দুর্ব্বার-বৈরি (?) বরবারণ-বাজিবারযানৌঘ-সংঘটন-ঘোর-ঘনান্ধকারং ।
নির্জ্জিত্য বঙ্গপতিমাবিরভূদ্বিবস্বানুদ্যন্নিব ত্রিজগদেক-বিকাশ-কোষঃ ॥
আনর্ত্ত-মালব-কিরাত-তুরুষ্ক-বৎস-মৎস্যাদিরাজ-গিরিদুর্গ-হঠাপহারৈঃ ।
যস্যাত্ম-বৈভব-মতীন্দ্রিয়-মাকুমার-মাবির্ব্বভূব ভুবি বিশ্বজনীন-বৃত্তেঃ ॥" (৮-১১ শ্লোক)

সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, গুর্জ্জরপতি নাগভটের সহিত ধর্ম্মপালের সংঘর্ষ হইয়াছিল এবং সেই যুদ্ধে চক্রায়ুধ ও বঙ্গপতি ধর্ম্মপাল উভয়েই ২য় নাগভটের নিকট পরাজিত হইয়াছিলেন। এ সময়ে রাষ্ট্রকূটপতি ৩য় গোবিন্দ দাক্ষিণাত্যের সম্রাট্, তিনি নাগভটের পিতা বৎসরাজকে তাঁহার নবজয়-লব্ধ অধিকার হইতে তাড়াইয়া রাজপুতানার মরুভূমিতে আশ্রয় লইতে বাধ্য করিয়াছিলেন এবং যাহাতে বৎসরাজ আর মাথা তুলিতে না পারেন, সেই অভিপ্রায়ে তিনি অনুজ ইন্দ্ররাজকে লাটদেশের মহাসামন্তাধিপদে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। নাগভটের নিকট পরাজিত হইয়া ধর্ম্মপাল বৎসরাজবিজেতা দাক্ষিণাত্যপতি ৩য় গোবিন্দের সাহায্য প্রার্থনা করেন। রাষ্ট্রকূট, গৌড় ও কনৌজ এই সমবেত শক্তিপ্রভাবে ২য় নাগভট সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হইলেন। রাষ্ট্রকূটপতি ৩য় গোবিন্দের নিকট পরাজিত হইয়া কিছুকাল নাগভট আর মাথা তুলিতে পারেন নাই। তৎকালে গৌড়াধিপ ধর্ম্মপাল ও কনৌজপতি চক্রায়ুধ উভয়েই রাষ্ট্রকূট পতির নিকট নম্রতাস্বীকার করিয়াছিলেন। সেই ঘটনা লক্ষ্য করিয়াই রাষ্ট্রকূটরাজ অমোঘবর্ষের তাম্রশাসনে লিখিত আছে, 'অমোঘবর্ষের পিতা ৩য় গোবিন্দ উত্তরাপথ আক্রমণ করিলে ধর্ম্মপাল এবং চক্রায়ুধ উভয়ে স্বয়ং আসিয়া তাঁহার নিকট নতশির হইয়াছিলেন'।[২৯] সম্ভবতঃ এই সময়ে রাষ্ট্রকূটরাজকন্যা রণ্ণাদেবীর সহিত ধর্ম্মপালের বিবাহ হয়।

'কেদারে, গঙ্গাসাগরসঙ্গমে এবং গোকর্ণাদি তীর্থে বিধিপূর্ব্বক উপযুক্ত জলে ধর্ম্মাকর্ম্মের অনুষ্ঠান যাঁহার ভৃত্যগণের সুখকর এবং সকল দুষ্ট দলন করিয়া ইহলোক পালনপূর্ব্বক পারলৌকিক সিদ্ধির হেতু হইয়াছিল। স্বর্গভ্রষ্ট জাতিস্মরগণের স্বগৃহগমনের ন্যায় দিগ্বিজয়াবসানকালে গৃহমুখে ধাবিত নৃপতিগণকে সংকার দ্বারা তাঁহাদের সকল খেদ দূর করিয়া সেই নরপতি তাঁহাদের হৃদয় আনন্দে উৎফুল্ল করিয়াছিলেন। গৃহমেধী (অর্থাৎ গৃহে গিয়া গার্হস্থ্য ধর্ম্মপালনে অভিলাষী সেই) নরপতি রাষ্ট্রকূটতিলক শ্রীপরবলের কন্যা রণ্ণাদেবীর পাণিগ্রহণ করেন।'[৩০] এই পরিচয় হইতেই কতকটা বুঝা যাইতেছে যে, উত্তরাপথ ও দক্ষিণাপথ উভয়

(২৯) "স্বয়মেবোপনতৌ স যস্য মহতস্তৌ ধর্ম্মচক্রায়ুধৌ।"

(অমোঘবর্ষের তাম্রশাসন Bombay branch R. A. S. 1906, p. 116)

(৩০) "কেদারে বিধিনোপযুক্তপয়সাং গঙ্গাসমেতাম্বুধৌ
গোকর্ণাদিষু চাপ্যনুষ্ঠিতবতাং তীর্থেষু ধর্ম্যাঃ ক্রিয়াঃ।
ভৃত্যানাং সুখমেব যস্য সকলানুদ্ধৃত্য দুষ্টানিমান্
লোকান্ সাধয়তোনুষঙ্গজনিতা সিদ্ধিঃ পরত্রাপ্যভূৎ॥
তৈস্তৈর্দ্দিগ্বিজয়াবসানসময়ে সম্প্রেষিতানাং পরৈঃ
সংকারৈরপনীয় খেদমখিলং স্বাং স্বাং গতানাং ভুবম্।
কৃত্যাভাবরতাং যদীয়মুচিতং শ্রীত্যা নৃপাণামভূৎ
সোৎকণ্ঠং হৃদয়ং দিবশ্চ্যুতবতাং জাতিস্মরাণামিব॥
শ্রীপরবলস্য দুহিতুঃ ক্ষিতিপতিনা রাষ্ট্রকূটতিলকস্য।
রণ্ণাদেব্যাঃ পাণির্জগৃহে গৃহমেধিনা তেন॥"

(দেবপালের মুঙ্গের-লিপি ৭ম হইতে ৯ম শ্লোক)

স্থানেই তিনি সসৈন্যে উপস্থিত ছিলেন। রাষ্ট্রকূটপতির সাহায্যে তিনি ২য় নাগভটকে পরাজিত করিয়া যথেষ্ট ধনরত্ন লাভ করিয়াছিলেন, সমরাবসান ও বিবাহোৎসবে উৎফুল্ল হইয়া তিনি তাঁহার দলভুক্ত সহচর সামন্তনৃপতিগণকে সেই ধনরত্ন দিয়া বিশেষভাবে সৎকৃত করিয়াছিলেন। সম্ভবতঃ রাষ্ট্রকূটরাজধানী মান্যখেটেই তাঁহার সহিত রাষ্ট্রকূটরাজবালার পরিণয়ব্যাপার সুসম্পন্ন হইয়াছিল[৩১] এবং তদুপলক্ষে তাঁহার সমভিব্যাহারী ভৃত্যবর্গের পারস্যোপসাগরতীরস্থ পশ্চিম দাক্ষিণাত্যের প্রধান তীর্থ গোকর্ণ দর্শনের সুবিধা হইয়াছিল।

রাষ্ট্রকূটপতি ৩য় গোবিন্দ ৭৯৪ হইতে ৮১৪ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। এদিকে ২য় নাগভটের বুচকলা-লিপি হইতে জানা যায় যে, তিনি ৮৭২ সংবতে বা ৮১৫ খৃষ্টাব্দে বিদ্যমান ছিলেন। এই সময়ের মধ্যে ধর্ম্মপালের উত্তরাপথ কান্যকুব্জ অধিকার, তৎকর্ত্তৃক চক্রায়ুধের কান্যকুব্জ-রাজ্যপ্রাপ্তি, নাগভটের নিকট পরাজয়, তৎপরে ধর্ম্ম ও চক্রায়ুধ উভয়ে রাষ্ট্রকূটপতির নিকট আনুগত্যস্বীকার এবং পরে নাগভটের পরাভব ধরিয়া লইতে হয়।

জয়ন্ত আদিশূরের ন্যায় ধর্ম্মপালেরও সার্ব্বভৌম পদবীলাভের চেষ্টা ছিল এবং অনেকটা সফলকাম হইয়াছিলেন। তাই তাঁহার সহিত উত্তর ও দক্ষিণ-ভারতের প্রধান প্রধান নৃপতিগণের অতি ভীষণ সমর হইয়াছিল। তাঁহার প্রতিপক্ষ রাজগণের প্রশস্তিকার কোন কোন স্থলে যদিও ধর্ম্মপালের পরাজয়ের আভাস দিতে কুণ্ঠিত হন নাই, তথাপি ধর্ম্মপাল ও তৎপুত্র দেবপালের প্রশস্তিকার তাঁহার যেরূপ পরিচয় দিয়া গিয়াছেন, তাহাতে এক সময়ে যে, সমস্ত ভারতে তাঁহার প্রভাব ও প্রাধান্য স্বীকৃত হইয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই।

যখন এই দিগ্বিজয়ী নরপতির প্রশংসাগীতি 'সীমান্তদেশে গোপগণকর্ত্তৃক, বনে বনচরগণকর্ত্তৃক, গ্রামসমীপে জনসাধারণকর্ত্তৃক, প্রত্যেক ক্রয়বিক্রয়-স্থানে বণিক্‌সমূহকর্ত্তৃক এবং বিলাসগৃহের পিঞ্জরস্থিত শুকমুখে'[৩২] গীত হইতেছিল, সেই প্রৌঢ়বয়সে তাঁহার চরম সৌভাগ্য-বিকাশের সময় তিনি রাষ্ট্রকূটপতি পরবলের কন্যা রণ্ণাদেবীর পাণিগ্রহণ করেন, তাঁহারই গর্ভে সুপ্রসিদ্ধ দেবপালের জন্ম হয়।

বিক্রমশিলার সুপ্রসিদ্ধ বিশ্ববিদ্যালয় এই ধর্ম্মপালেরই কীর্ত্তি। এখানে ১০৮ জন বৌদ্ধাচার্য্য

(৩১) পাথরির এক বিষ্ণু-মন্দির হইতে লাটাধিপ কর্করাজপুত্র পরবলের ৮৬১ খৃষ্টাব্দে উৎকীর্ণ এক শিলালিপি পাওয়া গিয়াছে। (Epigraphia Indica, Vol. IX, p. 148). অনেকের মতে ধর্ম্মপালরাজমহিষী রণ্ণাদেবী এই পরবলের কন্যা। উপরে লিখিয়াছি, রাষ্ট্রকূটসম্রাট্ ৩য় গোবিন্দ অনুজ ইন্দ্ররাজকে লাটের আধিপত্য প্রদান করেন। কর্করাজ সেই ইন্দ্ররাজের পুত্র, সুতরাং রণ্ণাদেবী হইতেছেন, রাষ্ট্রকূটসম্রাট্ ৩য় গোবিন্দের ভ্রাতুষ্পুত্রের পৌত্রী অর্থাৎ রাষ্ট্রকূটসম্রাটের ৪র্থ পুরুষ অধস্তন। এদিকে ধর্ম্মপাল ৩য় গোবিন্দের সমসাময়িক। এরূপ স্থলে তাঁহার সহিত কর্করাজের পৌত্রীর বিবাহ কখনই সম্ভবপর নহে। ডাক্তার ফ্লিট্ পরবল ৩য় গোবিন্দেরই একটী বিরুদ পাইয়াছেন। তাঁহার মতে, এই ৩য় গোবিন্দই রণ্ণাদেবীর পিতা, সুতরাং ধর্ম্মপালের শ্বশুর। (Dynasties of the Kanarese Districts, p. 394 in Bom. Gaz. Vol. I. pt. II.) এই মতই সমীচীন।

(৩২) ধর্ম্মপালের খালিমপুর-লিপি।

নিযুক্ত হইয়াছিলেন এবং চারিসম্প্রদায়ের ২০০ ভিক্ষু ব্যাকরণ, দর্শন ও বলিকর্ম্ম শিক্ষা পাইতেন।[৩৩] তাঁহারই যত্নে মহাযান বৌদ্ধধর্ম্মের পুনঃসংস্কার আরম্ভ হইয়াছিল। এই সময়ে নাগার্জ্জুন ও মৈত্রেয় এই দুই মহাযানমতের সমীকরণ করিয়া ত্রৈকূটকবিহারের আচার্য্য হরিভদ্র অষ্টসাহসিকা-প্রজ্ঞাপারমিতার ভাষ্য প্রকাশ করিয়াছিলেন।[৩৪] ধর্ম্মপাল নিজে একজন ধর্ম্মনিষ্ঠ বৌদ্ধ হইলেও তিনি বর্ণাশ্রমধর্ম্মের পক্ষপাতী ছিলেন। তিনি শাস্ত্রার্থ দ্বারা অনুশাসনযোগ্য ব্রাহ্মণাদি বর্ণসমূহকে স্ব স্ব ধর্ম্মে প্রতিষ্ঠাপিত করিয়াছিলেন।[৩৫] তাঁহার মহাসামন্ত নারায়ণবর্ম্মা পৌণ্ড্রবর্দ্ধনভুক্তির অন্তর্গত শুভস্থলী নামক স্থানে 'নন্নারায়ণ'[৩৬] নামক এক বৃহৎ বিষ্ণুমন্দির প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন এবং ধর্ম্মপালের রাজত্বের ২৬শ বর্ষে জগদ্বিখ্যাত বৌদ্ধতীর্থ গয়ার মহাবোধিতে উজ্জ্বল নামক ভাস্করের পুত্র কেশব তিন হাজার দ্রম্ম ব্যয়ে পুষ্করিণী কাটাইয়া তাহার তীরে চতুর্ম্মুখ মহাদেব প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন।[৩৭] উক্ত মহাসামন্ত নারায়ণবর্ম্মার অনুরোধে গৌড়াধিপ তাঁহার প্রিয়পুত্র যুবরাজ ত্রিভুবনপালকে দূতক করিয়া পৌণ্ড্রবর্দ্ধনভুক্তির অন্তর্গত ৪ খানি গ্রাম নন্নারায়ণদেবের পূজক লাটব্রাহ্মণদিগকে দান করিয়াছিলেন, গৌড়ের নিকটবর্ত্তী খালিমপুর হইতে আবিষ্কৃত ধর্ম্মপালদেবের তাম্রশাসনখানি উক্ত লাটব্রাহ্মণদিগের উদ্দেশ্যে প্রদত্ত হইয়াছিল।[৩৮] তাঁহার এই তাম্রশাসন হইতেই আমরা বেশ বুঝিতে পারিতেছি যে, তখনও পৌণ্ড্রবর্দ্ধনে যথেষ্ট কায়স্থপ্রভাব ছিল, বয়োবৃদ্ধ কায়স্থগণই প্রধান বিষয়াধিকার, মহামহত্তর, মহত্তর ও দশগ্রামিক পদে কর্ত্তৃত্ব করিতেছিলেন। পালনৃপতিগণ ব্রাহ্মণগণের সহিত সেই সকল কায়স্থের প্রতিও সম্মান দেখাইয়া গিয়াছেন।[৩৯] তাঁহার লেখনাধিকারের প্রধান অধ্যক্ষ ছিলেন কায়স্থ টঙ্কদাস[৪০]। বারেন্দ্রকুলপঞ্জীমতে, ধর্ম্মপাল ভট্টনারায়ণের পুত্র আদিগাঞি ওঝাকে গঙ্গাতীরে ধামসার নামক গ্রাম প্রদান করেন।[৪১]

(৩৩) Journal of the Buddhist Text Society, Vol I. pt I. p. 11.

(৩৪) Memoirs A. S. B. Vol III, No 1. p. 5.

(৩৫) "শাস্ত্রার্থভাজা চলতোঽনুশাস্য বর্ণান্ প্রতিষ্ঠাপয়তা স্বধর্ম্মে।" (দেবপালের মুঙ্গের-লিপি ৫ম শ্লোক)

(৩৬) 'নন্নারায়ণ' নাম লইয়া নানাজনে নানা গবেষণা করিয়াছেন, কিন্তু আমাদের মনে হয়, নারায়ণবর্ম্মা নিজ মাতামহের পারলৌকিক মঙ্গলেচ্ছায় উক্ত মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। 'নন্ন' এখন হিন্দীভাষায় 'নানা' অর্থাৎ মাতামহ।

(৩৭) J. A. S. B. (New Series) Vol. IV. p. 101-102.

(৩৮) Epigraphia Indica, Vol. IV, p. 245 ff,

(৩৯) "যথাকালাধ্যাসীনো জ্যেষ্ঠকায়স্থ-মহামহত্তর-মহত্তর-দাশগ্রামিকাদি-বিষয়ব্যবহারিণঃ সকরণান্ প্রতিবাসিনো ক্ষেত্রকরাংশ্চ ব্রাহ্মণমাননাপূর্ব্বকং যথার্হং মানয়তি।" ৩২শ রাজ্যাঙ্কে উৎকীর্ণ ধর্ম্মপালের খালিমপুরলিপি।

(৪০) সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকা, ১৩১৩, ১৫৪ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

(৪১) "রাজা শ্রীধর্ম্মপালঃ সুখময়সুধুনীতীরদেশে বিধাতুং
নাম্নাদিগাঞিবিপ্রং গুণযুতভনয়ং ভট্টনারায়ণস্য।
যজ্ঞান্তে দক্ষিণার্থং সকলকরযুতৈর্ধামসারাভিধানং
গ্রামং তস্মৈ বিচিত্রং সুরপুরসদৃশং প্রাদদৎ পুণ্যকামঃ।"
গৌড়ে-ব্রাহ্মণ (১১৭ পৃষ্ঠা)-ধৃত বারেন্দ্রকুলপঞ্জিকা।

রামানুজ লক্ষ্মণের ন্যায় বাক্‌পাল নামে ধর্ম্মপালের এক কনিষ্ঠ ভ্রাতা ছিলেন। তাঁহার শাসনরীতি ও বিক্রমবলে ধর্ম্মপালের অখণ্ডরাজ্য শত্রুশূন্য[৪২] হইয়াছিল এবং পাঞ্চালপুত্র মন্ত্রিবর গর্গের নীতিকৌশলে তাঁহার রাজ্য বহু বিস্তৃতি লাভ করিয়াছিল।[৪৩]

রাষ্ট্রকূট-সম্রাটের হস্তে পরাজয়ের পর যদিও নাগভট কিছুদিন মাথা তুলিতে সাহসী হন নাই, কিন্তু ৮১৩ খৃষ্টাব্দে রাষ্ট্রকূটপতি ৩য় গোবিন্দের মৃত্যু এবং সেই সঙ্গে লাটের রাষ্ট্রকূট মহাসামন্তগণের মধ্যে পরস্পর গৃহবিবাদ উপস্থিত হইলে, সেই সুযোগে নাগভট আবার বলসঞ্চয় করিয়া উত্তরাপথ অধিকারে অগ্রসর হইলেন। তৎকালে চালুক্য ও প্রতিহারমহাসামন্তগণ অনেকেই নাগভটের ছত্রতলে সমবেত হইয়াছিলেন। এই সময়ে ধর্ম্মপাল দূরদেশে অবস্থান করিতেছিলেন। এবার চক্রায়ুধ প্রতিহাররাজের গতিরোধ করিতে সমর্থ হইলেন না। উত্তরাপথ বিজয়ী নাগভটের করতলগত হইল।

দীর্ঘকাল রাজ্যভোগ ও নানা ধর্ম্মকর্ম্মে লিপ্ত থাকিয়াও ধর্ম্মপালের দিগ্বিজয়ের আশা ও রাজ্য-বৃদ্ধিবাসনা নিবৃত্ত হয় নাই। দিগ্বিজয়ী ললিতাদিত্যের মত তিনিও বৃদ্ধবয়সে প্রবলশত্রু হস্তে প্রতিহাররাজকে শাসন করিতে গিয়া হয়ত প্রতিহাররাজ নাগভটের মহাসামন্ত বাহুক-ধবলের বিধ্বস্ত হইয়াছিলেন।[৪৪]

ধর্ম্মপাল ৩২শ বর্ষ রাজ্যভোগকালে প্রিয়পুত্র ত্রিভুবনপালকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু কিছুকাল রাজ্যভোগের[৪৫] পর তাঁহার মৃত্যু হইলে যুবরাজ ত্রিভুবনপাল সিংহাসনলাভে সমর্থ হন নাই। অনেকের মতে পিতার জীবিতকালেই তিনি মানবলীলা সম্বরণ করেন। হয় তিনি পিতার জীবিতকালে ইহলোক পরিত্যাগ করেন, নয় দেবপালের পক্ষ প্রবল হইয়া তাঁহাকেই রাজ্যাভিষিক্ত করিয়া থাকিবে। ধর্ম্মপাল প্রৌঢ়কালে রাষ্ট্রকূট-রাজ-কন্যা রণ্ণাদেবীকে বিবাহ করেন,

দেবপাল

(৪২) নারায়ণপালের ভাগলপুরলিপি ৪র্থ শ্লোক।

(৪৩) গরুড়স্তম্ভলিপি ২য় শ্লোক।

(৪৪) পালরাজগণের প্রশস্তিলেখকগণ কেহ এ সংবাদ দেন নাই বটে, কিন্তু ৫৭৪ বলভী সংবতে (৮৯৩ খৃষ্টাব্দে) উৎকীর্ণ মহাসামন্ত অবনীবর্ম্মার তাম্রশাসনে ধর্ম্মপালের এই পতনকাহিনী এইরূপে বিবৃত হইয়াছে—"অজনি ততোঽপি শ্রীমান্ বাহুকধবলো মহানুভবো যঃ।

ধর্ম্ম ভবন্নপি নিত্যং রণোদ্যতো নিজঘান ধর্ম্মং॥" (Epigraphia Indica, Vol. IX. p. 5).

অর্থাৎ তার পরে শ্রীমান্ মহানুভব বাহুকধবল জন্মগ্রহণ করেন। তিনি নিত্য ধর্ম্মপরায়ণ হইলেও রণোদ্যত হইয়া ধর্ম্ম(পাল)কে নিপাত করিয়াছিলেন।

(৪৫) তিব্বতীয় তারনাথের মতে ধর্ম্মপাল ৬৪ বর্ষ রাজত্ব করেন। এরূপ অতিদীর্ঘকাল রাজত্বের নিদর্শন আর কোথাও পাওয়া যায় না। সমসাময়িক লিপিতে তাঁহার ৩২শ পর্য্যন্ত পাওয়া গিয়াছে। বেশী দিন রাজ্য-ভোগের আশা নাই মনে করিয়া তখনই তিনি ত্রিভুবনপালকে যুবরাজ করিয়াছিলেন, এরূপ স্থলে তাঁহার রাজ্য-কাল মোটামুটি ৪০ বর্ষ ধরিয়া লওয়া অসঙ্গত হইবে না।

তাঁহারই গর্ভে দেবপালের জন্ম। কিন্তু ত্রিভুবনপাল ধর্ম্মপালের পূর্ব্ব মহিষীর গর্ভজাত। সম্ভবতঃ ধর্ম্মপালের শেষাবস্থায় গৌড়-রাজধানীতে তাঁহার আত্মীয় রাষ্ট্রকূটগণের প্রভাব বাড়িয়াছিল। তাঁহাদের চেষ্টাতেই রাষ্ট্রকূটরাজদৌহিত্র দেবপাল গৌড়সিংহাসন লাভে সমর্থ হইয়াছিলেন। দেবপাল পিতার প্রৌঢ়বয়সের সন্তান,—যৌবনপ্রারম্ভেই তিনি পিতৃসিংহাসনে অভিষিক্ত হইয়াছিলেন। তিনি পিতৃকুল ও মাতৃকুল উভয় কুলের সদ্‌গুণাবলির ও ধর্ম্মবিশ্বাসের অংশাধিকারী হইয়াছিলেন, এ সংবাদ পূর্ব্ব অধ্যায়েই লিখিয়াছি।[৪৬]

পিতৃ-সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইয়া দেবপাল তাঁহার প্রধান কর্ত্তব্য পিতৃবৈরী নিপাতের আয়োজনে অগ্রসর হইতে পারে নাই। তখন তাঁহার বয়স বেশী হয় নাই। তাঁহার পদমর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য গৃহশত্রুর আক্রমণ হইতে অনেকটা সতর্ক থাকিতে হইয়াছিল। উপযুক্ত মন্ত্রী দর্ভপাণির সাহায্যে কিছুকাল তিনি গৌড়রাজ্যের আভ্যন্তরীণ উন্নতি সাধনে মনোযোগী ছিলেন। নির্ম্মলচরিত্র, উদারতা, ধর্ম্মনিষ্ঠা ও শৌর্য্যবীর্য্যগুণে অল্প কালমধ্যেই তিনি আত্মীয় স্বজন ও প্রকৃতিপুঞ্জের হৃদয় অধিকার করিয়া বসিলেন। রাজ্যপ্রাপ্তিকালে যাঁহারা তাঁহার বিরোধী ছিলেন, ক্রমে তাঁহারাও তাঁহার অনুরক্ত হইয়া পড়িলেন। তৎকালে তাঁহার মাতুল ১ম অমোঘবর্ষ দাক্ষিণাত্যের সম্রাট্‌রূপে মান্যখেটের রাষ্ট্রকূট-সিংহাসনে বিরাজ করিতেছিলেন। এ সময়ে প্রতিহারবীর ২য় নাগভটও ইহলোক পরিত্যাগ করিয়াছেন এবং কান্যকুব্জের সিংহাসনে তৎপুত্র রামভদ্র সমাসীন। গৌড়াধিপ রীতিমত শক্তি সঞ্চয় করিয়া প্রতিশোধ লইবার জন্য বিজয়যাত্রা করিলেন। এই সময়ে পরাক্রান্ত রাষ্ট্রকূট-সৈন্যও তাঁহার বিজয়বাহিনীর দলপুষ্ট করিয়া থাকিবে[৪৭] এবং নর্ম্মদার উপত্যকা বিন্ধ্যাচল হইতে হিমালয় পর্য্যন্ত প্রতিহাররাজ নাগভটের পুত্র রামভদ্রের অধিকারভুক্ত হইতেছিল, সেই দিকেই দেবপালের অগ্রদৃষ্টি পতিত হইয়াছিল। গরুড়স্তম্ভলিপিতে এই যুদ্ধযাত্রার প্রসঙ্গে এইরূপ লিখিত হইয়াছে—

'মত্তজজ-মদসিক্ত-শিলারাশিভূষিত রেবানদীর জনক (বিন্ধ্যাচল) হইতে মহেশ্বর-(শিরোভূষা) চন্দ্রকিরণদ্বারা শুভ্রীকৃত গৌরীপিতা (হিমালয়) পর্ব্বত পর্য্যন্ত এবং সূর্য্যের উদয়াস্ত-

(৪৬) ১২৩ পৃষ্ঠায় কুলাচার্য্য হরিমিশ্রের কারিকা হইতে তাহার প্রমাণ উদ্ধৃত করা হইয়াছে। দুঃখের বিষয় কোন কোন কুলশাস্ত্রানভিজ্ঞ নবীন ঐতিহাসিক হরিমিশ্রের বচন প্রক্ষিপ্ত বলিয়া উড়াইয়া দিতে চাহেন। কিন্তু বিশ্বকোষ-কার্য্যালয়ে রক্ষিত সেই প্রাচীন পুথির দুই শত বর্ষের হস্তলিপি দর্শন করিলে তাহার প্রামাণিকতা সম্বন্ধে কাহারও সন্দেহ থাকিবে না।

(৪৭) "অরিনৃপতিমুকুট-ঘট্টিতচরণঃ সকলভুবনবন্দিতশৌর্য্যঃ।
বঙ্গাঙ্গমগধ-মালব-বেঙ্গীশৈরর্চ্চিতোঽতিশয়ধবলঃ॥"

১ম অমোঘবর্ষের নীলগুণ্ডলিপির ১১শ শ্লোকে এরূপ পরিচয় থাকায় কেহ কেহ মনে করেন, অমোঘবর্ষের নিকট দেবপাল পরাজয় স্বীকার করেন। কিন্তু উপরে লিখিয়াছি ১ম অমোঘবর্ষ দেবপালের মাতুল ও পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। ভাগিনেয় কর্তৃক মাতুলের অর্চ্চনা স্বাভাবিক, ইহা খর্ব্বতাপ্রকাশক নহে।

কালে অরুণজলরাশি (অর্থাৎ পূর্ব্ব ও পশ্চিমসমুদ্র) পর্য্যন্ত যাঁহার নীতিকৌশলে দেবপাল করদ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন'।[৪৮] ইহাদ্বারা আমরা গৌড়াধিপ দেবপাল ও তাঁহার মন্ত্রী দর্ভপাণির শক্তিসামর্থ্য ও বীর্য্যবত্তার পরিচয় পাইতেছি। বলা বাহুল্য, সমস্ত আর্য্যাবর্ত্তের নৃপতি—গৌড়, মালব, খশ, হূণ, কুলিক, কর্ণাট ও লাট প্রভৃতি[৪৯] তাঁহার অধীনতা স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। রামভদ্র পরাজিত এবং পশ্চিমসীমান্ত কাম্বোজপ্রদেশ পর্য্যন্ত তাঁহার অধিকারভুক্ত হইয়াছিল।[৫০]

কেবল দর্ভপাণির নীতিকৌশল নহে, বাক্‌পালের পুত্র মহাবীর জয়পালও দেবপালের শত্রুদলনে ও রাজ্যবিস্তারে প্রধান সহায় হইয়াছিলেন। তিনি 'উপেন্দ্রের ন্যায় চরিত-মাহাত্ম্যে জগৎকে পবিত্র করিয়া ও ধর্ম্মদ্বেষিগণকে যুদ্ধে শাসন করিয়া পূর্ব্বজ দেবপালকে ভুবনরাজ্য-সুখের অধিকারী করিয়াছিলেন। ভ্রাতার নির্দ্দেশক্রমে সেই মহাবীর দিগ্বিজয়ের আশায় চতুর্দ্দিকে ধাবিত হইলে দূর হইতে তাঁহার নাম শুনিয়াই উৎকলাধিপতি ব্যাকুল হইয়া রাজধানী পরিত্যাগ করেন এবং তাঁহার আজ্ঞা শিরে ধারণ করিয়া প্রাগ্‌জ্যোতিষের অধিপতি যুদ্ধসংক্রান্ত বাদানুবাদ শান্ত হওয়ায় প্রিয়জনপরিবৃত হইয়া চিরসুখী হইয়াছিলেন'[৫১]। এই জয়পালই ছন্দোগপরিশিষ্টপ্রকাশকার নারায়ণভট্ট কর্ত্তৃক উত্তররাঢ়ের অধিপতিরূপে পরিচিত হইয়াছেন। তাঁহার পিতৃদেবের মহাশ্রাদ্ধ উপলক্ষে উক্ত কাঞ্জিবিল্লীয় নারায়ণের পূর্ব্বপুরুষ মহাপণ্ডিত উমাপতি মহাদান গ্রহণ করিয়াছিলেন।[৫২]

(৪৮) "আরেবাজনকান্মতঙ্গজমদস্তিম্যচ্ছিলাসংহতে-
রাগৌরীপিতুরীশ্বরেন্দুকিরণৈঃ পুষ্যৎ সিতিম্নো গিরেঃ।
মার্ত্তণ্ডাস্তময়োদয়ারুণজলাদাবারিরাশিদ্বয়াৎ
নীত্যা যস্য ভুবং চকার করদাং শ্রীদেবপালো নৃপঃ॥" (গরুড়স্তম্ভলিপি ৫ম শ্লোক)

(৪৯) দেবপালের মুঙ্গের-লিপিতে গৌড়, মালবাদি তাঁহার সেবক বলিয়া পরিচিত হইয়াছে।

(৫০) "কম্বোজেষু চ যাজিযুগ্বভিধস্তাগুরাজৌরসো।
হ্রেষামিশ্রিতহারি-হ্রেষিতরবাঃ কান্তা শ্চিরং বীক্ষিতাঃ॥"
(দেবপালের মুঙ্গেরলিপি ১৩শ শ্লোক)

(৫১) "তস্মাদুপেন্দ্রচরিতৈর্জ্জগতীং পুনানঃ পুত্রো বভূব বিজয়ী জয়পালনামা।
ধর্ম্মদ্বিষাং শময়িতা যুধি দেবপালো যঃ পূর্ব্বজে ভুবনরাজ্যসুখান্যনৈষীৎ।
যস্মিন্ ভ্রাতুর্নিদেশাদ্বলবতি পরিতঃ প্রস্থিতে জেতুমাশাঃ
সীদন্নাম্নৈব দূরান্নিজপুরমজহাদুৎকলানামধীশঃ।
আসাঞ্চক্রে চিরায় প্রণয়িপরিবৃতো বিভ্রদুচ্চেন মূর্দ্ধ্না
রাজা প্রাগ্‌জ্যোতিষাণামুপশমিত-সমিৎ সংকথাং যস্য চাজ্ঞাং।"
(নারায়ণপালের ভাগলপুরলিপি ৫ম ও ৬ষ্ঠ শ্লোক)

(৫২) তস্মাদভূবিতসাক্ষিভূমিবলয়ঃ শিষ্যোপশিষ্যব্রজৈ-
র্বিদ্বন্মৌলিরভূদুমাপতিরিতি প্রত্যাকরগ্রামণীঃ।

খালিমপুর-লিপি হইতে মনে হয়, পাটলিপুত্রে ধর্ম্মপালের রাজধানী ছিল। কিন্তু দেবপাল মুদ্গগিরিতে (বর্ত্তমান মুঙ্গেরে) রাজধানী পরিবর্ত্তন করেন। তিনি একজন পরম সৌগত বলিয়া পরিচিত হইলেও ব্রাহ্মণ ও শ্রমণগণের প্রতি তাঁহার সমান ভক্তি ও অনুরক্তি ছিল। তাঁহার নিষ্ঠা ও সদ্ধর্ম্মাচরণের পরিচয় ভারতের সুদূর পশ্চিমপ্রান্তে পেশাবরের নিকটবর্ত্তী জালালাবাদ উপত্যকাস্থিত নগরহারে পঁহুছিয়াছিল। সম্ভবতঃ এই পশ্চিমপ্রান্ত পর্য্যন্ত দেবপালের শাসনাধীন হইয়াছিল। নগরহারবাসী সর্ব্বশাস্ত্রবিৎ ব্রাহ্মণপ্রবর বীরদেব সমস্ত বেদ অধ্যয়ন করিয়া কণিষ্কবিহারে আচার্য্যপ্রবর সর্ব্বজ্ঞশান্তির নিকট বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া তপশ্চরণে নিরত হইয়াছিলেন, পরে গয়ায় মহাবোধি দর্শন করিয়া যশোবর্ম্মপুর-বিহারে[৫৩] আগমন করেন। তৎকালে এখানকার বিহারে সহদেশী ভিক্ষুগণ বাস করিতেন। বীরদেব এখানে আসিলে গৌড়াধিপ দেবপাল স্বয়ং আসিয়া তাঁহার পূজা করিয়াছিলেন এবং তাঁহাকে সুপ্রসিদ্ধ নালন্দার পরিপালনভার অর্পণ করিয়াছিলেন। বীরদেব ইন্দ্রশিলাপর্ব্বতের উপর সুবৃহৎ চৈত্য এবং যশোবর্ম্মপুরে 'বজ্রাসন' প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন।[৫৪]

দেবপাল যেমন বৌদ্ধাচার্য্য বীরদেবের পূজা করিয়া তাঁহাকে অভিনন্দিত করিয়াছিলেন, বেদবিদ্ ব্রাহ্মণের মর্য্যাদা-রক্ষায়ও তিনি সেইরূপ উদারতা দেখাইয়া গিয়াছেন। যখন সেই বৌদ্ধনৃপতি ত্রিশবর্ষ রাজ্যভোগের পর কতকটা ত্যাগপথের পথিক[৫৫] হইয়াছেন, সে সময়েও তিনি উপমন্যুগোত্রজ বেদার্থবিদ্ যাজ্ঞিক ভট্ট বিশ্বরাতের পৌত্র পদবাক্যপ্রমাণবিদ্যাপারদর্শী বীহেকরাতমিশ্রকে শ্রীনগরভুক্তির ক্রিমিল বিষয়ান্তর্গত মেষিকাগ্রাম নিজ পিতামাতার পুণ্য ও যশোবৃদ্ধির জন্য তাম্রশাসন দ্বারা প্রদান করিয়াছিলেন।[৫৬] এই তাম্রশাসন হইতেই জানিতে পারি, 'গুণজ্ঞ নৃপতি মাতাপিতার উভয়কুলের বিশুদ্ধিভাক্, তাঁহার নিজের মত গুণ ও অনুরূপ চরিত্রবান্, যৌবরাজ্যে প্রতিষ্ঠিত আত্মপুত্র শ্রীরাজ্যপালকে' এই দানের দূতক করিয়াছিলেন।[৫৭]

স্মাপালাজ্ঞয়াপালতঃ স হি মহাশ্রাদ্ধং প্রভূতং মহা-
দানং চার্থিগণার্হণার্দ্রহৃদয়ঃ প্রত্যগ্রহীৎ পুণ্যবান্ ।" (নারায়ণের ছন্দোগপরিশিষ্টপ্রকাশ)

(৫৩) বেহারপ্রদেশের অন্তর্গত বর্ত্তমান 'বেহার" নামক মহকুমা ও তাহার নিকটস্থ ঘোষরাঁবা তৎকালে যশোবর্ম্মপুর নামে খ্যাত ছিল।

(৫৪) এই বজ্রাসনপ্রতিষ্ঠা উপলক্ষে শিলাফলকে যে প্রশস্তি উৎকীর্ণ হইয়াছিল, সেই শিলালিপি হইতেই বীরদেবের পরিচয় উদ্ধৃত হইল। ইহার সম্পূর্ণ পাঠ Indian Antiquary Vol XVII. pp. 307-312 এবং গৌড়লেখমালা ৪৬-৫০ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হইয়াছে।

(৫৫) "বিচ্ছিন্নঃ কলিনা শকান্তিবি গতে কালেন লোকোত্তরং
যেন ত্যাগপথঃ স এব হি পুনর্বিস্পষ্টমুন্মীলিতঃ ।" (দেবপালের মুঙ্গেরলিপি ১৪ শ্লোক)

(৫৬) এই তাম্রশাসনই দেবপালের মুঙ্গেরলিপি বলিয়া পরিচিত।

(৫৭) "শ্রেয়োবিধাবুভয়বংশবিশুদ্ধিভাজং রাজা বয়োদধিগতাত্মগুণং গুণজ্ঞঃ ।
আত্মানুরূপচরিতং স্থিরযৌবরাজ্যং শ্রীরাজ্যপালমিহ দূতকমাত্মপুত্রং ।"
(দেবপালের মুঙ্গেরলিপি শেষ শ্লোক)

দেবপালের প্রথম আধিপত্যকালে তাঁহার খুল্লতাতপুত্র জয়পাল যেমন উত্তররাঢ় শাসন করিতেছিলেন ও রাজা বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিলেন, সেইরূপ দেবপালের শেষাবস্থায় রাজ্যপাল যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত হইয়া গৌড়ের কোন প্রদেশ শাসন করিতেছিলেন, কিন্তু তাঁহার জ্যেষ্ঠতাতপুত্র যুবরাজ ত্রিভুবনপালের ন্যায় তিনিও পিতার জীবদ্দশায় হয় ইহলোক পরিত্যাগ করেন, নয় দলপুষ্ট অপর ভ্রাতৃ-কৌশলে সিংহাসনলাভে সমর্থ হন নাই। দেবপাল ত্যাগপথের পথিক হইলেও ধর্ম্মপালের ন্যায় তাঁহারও জীবনের শেষকাল পর্য্যন্ত দিগ্বিজয়েচ্ছা প্রবল ছিল। এই কারণে প্রতীহার, চন্দেল, কলচুরি, চোল ও চালুক্যরাজগণের সহিত জীবনব্যাপী সংগ্রামে তাঁহাকে লিপ্ত থাকিতে হইয়াছিল। তিনি কেবল উত্তরভারতে নিজ সার্ব্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠা করিয়া ক্ষান্ত ছিলেন না, তাঁহার দিগ্বিজয়ী চতুরঙ্গসেনার পদভরে দক্ষিণ-ভারতও প্রকম্পিত হইয়াছিল। তাঁহার মুঙ্গেরলিপিতে ঘোষিত হইয়াছে যে, 'গঙ্গার উৎপত্তিস্থান হইতে রাবণারির কীর্ত্তি সেতুবন্ধ পর্য্যন্ত, (পশ্চিমদিকে) বরুণালয় (সমুদ্র) হইতে (পূর্ব্বদিকে) লক্ষ্মীজন্মগৃহ (সমুদ্র) পর্য্যন্ত (যিনি) সপত্নীশূন্যা পৃথিবী উপভোগ করিয়াছিলেন।'[৫৮] যদিও ইহা প্রশস্তিকারের অত্যুক্তি বলিয়া গণ্য হইতে পারে, কিন্তু 'উৎকলকুলকে উৎকীলিত করিয়া, হূণগর্ব্ব হরণ করিয়া এবং দ্রবিড় ও গুর্জ্জরনাথের দর্প খর্ব্ব করিয়া গৌড়েশ্বর সাগরমেখলা পৃথিবী উপভোগ করিয়াছিলেন'[৫৯] গরুড়স্তম্ভলিপির এই উক্তি একেবারে মিথ্যা বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া যায় না।

বলিতে কি ধর্ম্মপাল ও দেবপালের সময় গৌড়বঙ্গে স্বর্ণযুগ উপস্থিত হইয়াছিল, মহারাজ শশাঙ্ক-দেব অথবা গৌড়পতি জয়ন্তের পক্ষে যাহা দুঃসাধ্য ছিল, ধর্ম্মপাল ও দেবপালের পক্ষে তাহাই সুসাধ্য হইয়াছিল। এ সময় কিছুদিনের জন্যও হয়ত গৌড়পতি ভারতসম্রাট্ বলিয়া পূজিত হইয়াছিলেন, ভারতের নানাদিগ্দেশে তাঁহাদের আধিপত্য-বিস্তার ও কুটুম্বিতা-স্থাপনের সহিত গৌড়বঙ্গবাসী প্রজাসাধারণও গৌড়বঙ্গের সঙ্কীর্ণ সীমামধ্যে আবদ্ধ না থাকিয়া ভারতের সমৃদ্ধিশালী প্রত্যেক জনপদে ও নগরে ধর্ম্ম, সমাজ ও রাজনীতিক কার্য্যহেতু বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছিলেন,—তাঁহাদের অধীশ্বরগণের আদর্শে তাঁহারাও সমস্ত ভারতবাসী স্বজাতির সহিত আত্মীয়তাস্থাপনে অগ্রসর হইয়াছিলেন। বলিতে কি, পালসম্রাট্ ও তাঁহাদের বিচক্ষণ মন্ত্রিগণের প্রভাবে গৌড়বঙ্গবাসী এক মহাজাতিতে পরিণত হইয়াছিলেন, এবং সেই সঙ্গে তাঁহারা যে আসেতুবন্ধ-হিমালয় সমগ্র ভারতের একচ্ছত্র আধিপত্য বিস্তারে মনোযোগী হইয়াছিলেন, ধর্ম্মপাল ও দেবপালের সমসাময়িক উৎকীর্ণ প্রশস্তিসমূহে তাহার যথেষ্ট আভাস রহিয়াছে। কিন্তু

(৫৮) "আগঙ্গাগমমহিতাৎ সপত্নশূন্যামাসেতোঃ প্রথিতদশাস্যকেতুকীর্ত্তেঃ।
উর্ব্বীমাবরুণনিকেতনাচ্চ সিন্ধোরালক্ষ্মীকুলভবনাচ্চ যো বুভোজ ॥" (মুঙ্গের-লিপি ১৫শ শ্লোক)

(৫৯) "উৎকীলিতোৎকলকুলং হৃত-হূণগর্ব্বং খর্ব্বীকৃতদ্রবিড়গুর্জ্জরনাথদর্পং।
ভূপীঠমব্ধিরশনাভরণং বুভোজ গৌড়েশ্বরশ্চিরমুপাস্য ধিয়ং যদীয়াং ॥" (গরুড়স্তম্ভলিপি ১৩শ শ্লোক)

গৌড়বঙ্গবাসীর নিতান্ত দুর্ভাগ্য বলিতে হইবে, তাঁহাদের সেই উচ্চাভিলাষ স্থায়ী ফল প্রদান করিতে পারে নাই।

প্রায় ৮৪০ খৃষ্টাব্দে প্রতিহাররাজ রামভদ্র ইহলোক পরিত্যাগ করেন। তৎপুত্র মিহির ভোজ চিত্রকূটগিরিদুর্গ হইতে পিতার প্রণষ্টগৌরব উদ্ধারে মনোযোগী হইলেন। প্রায় ৮৪৩ খৃষ্টাব্দে তিনি কান্যকুব্জ জয় করেন। কিন্তু এ সময়ও তিনি স্থায়ী প্রভুত্ববিস্তারে কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। প্রায় ৮৭০ খৃষ্টাব্দে সমস্ত কান্যকুব্জ প্রদেশে তাঁহার আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। ভগবান্ বিষ্ণু যেমন বরাহ অবতারে জল হইতে পৃথিবী উদ্ধার করেন, ভোজদেবও সেইরূপ পৈতৃক সাম্রাজ্য উদ্ধার করিয়া 'আদিবরাহ' উপাধি ধারণ করেন। উত্তররাঢ়ীয়-কায়স্থকুলগ্রন্থে ইনিই কান্যকুব্জাধিপ 'আদিশূর' বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন। এ সময় দেবপাল রাজ্যপালের উপর যৌবরাজ্য প্রদান করিয়া অনেকটা ধর্ম্মচর্চ্চায় কালাতিপাত করিতেন।

দেবপালের মৃত্যুর সহিত গৌড়রাজ্যের আন্তর্জাতিক উন্নতির পথ রুদ্ধ হইতে চলিল। দেবপালের একাধিক পুত্র জন্মিয়াছিল। তাঁহার দীর্ঘকাল রাজ্য, বহু দূরদেশে রাজ্যবিস্তার ও পরাক্রান্ত প্রতিপক্ষনৃপতিগণের সহিত নিয়তই যুদ্ধবিগ্রহ চলিতে থাকায়, তাঁহার পুত্র ও পরমাত্মীয়গণকে অনেক সময়ে গৌড়েশ্বরের প্রতিনিধি বা সামন্তনৃপতিরূপে নানা স্থানের শাসন-কর্তৃত্ব বা সৈন্যাধিপত্য গ্রহণ করিতে হইয়াছিল। সম্ভবতঃ দেবপালের মৃত্যুর পর প্রভুত্ব লইয়া তাঁহাদের মধ্যেও পরস্পর প্রতিদ্বন্দ্বিতা উপস্থিত হইয়াছিল। এই আন্তর্গণিক-প্রতিদ্বন্দ্বিতার ফলে অধিক দূরবর্ত্তী অধিকারসমূহে দূরদেশীয় সামন্তগণ ক্রমেই স্বাধীনতা অবলম্বন করিতেছিলেন। এই সুযোগে ভোজদেবও উত্তর-ভারতের অধিকাংশ অধিকার করিয়া বসিলেন।

দেবপালের তাম্রশাসনে যুবরাজ রাজ্যপাল ও গরুড়স্তম্ভলিপিতে শূরপালের নামোল্লেখ আছে। রাজ্যপাল যৌবরাজ্যে অধিষ্ঠিত হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু তিনি পিতার উত্তরাধিকার-লাভ করিয়াছিলেন কি না, তাহার কোন প্রমাণ এ পর্য্যন্ত বাহির হয় নাই। অনেকে আবার শূরপাল ও বিগ্রহপালকে অভিন্ন ব্যক্তি বলিয়াই স্থির করিয়াছেন, কিন্তু ইহা তাঁহাদের অনুমানমাত্র, বরং মদনপালের তাম্রশাসনে শূরপাল ও বিগ্রহপাল এই দুইটী নামই একাধিক ও বিভিন্ন ব্যক্তির নাম বলিয়া বর্ণিত থাকায় শূরপাল ও বিগ্রহপালকে ভিন্ন নৃপতি বলিয়াই ধরিতে হইবে।

শূরপাল

দেবপালের মৃত্যুর পর মন্ত্রিবর কেদারমিশ্রের যত্নে শূরপালই পিতৃসিংহাসনে অভিষিক্ত হইয়াছিলেন। কেবল এই সময়ে বলিয়া নহে,—ধর্ম্মপালের সময় হইতে এই মন্ত্রিবংশই গৌড়রাজ্যের একপ্রকার সর্ব্বেসর্ব্বা ছিলেন। এই মন্ত্রিবংশপ্রতিষ্ঠাতা পঞ্চালের কৌশলেই সম্ভবতঃ গোপালদেব প্রকৃতিপুঞ্জকর্ত্তৃক গৌড়-সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। এই বৃদ্ধপঞ্চালই অভিষেকবারি দ্বারা ধর্ম্মপালকে অভিষিক্ত করিয়াছিলেন।[৮০] তৎপুত্র গর্গ, গর্গপুত্র দর্ভপাণি ও দর্ভপাণিপৌত্র কেদারমিশ্র—ইঁহারা

(৮০) "কহ্যৎ-পঞ্চালবৃদ্ধোদ্ধৃতকনককলস-বাস্তিষেকোদকুম্ভো" (ধর্ম্মপালের খালিমপুরলিপি ১২শ শ্লোক)

সকলেই বংশানুক্রমে পালবংশের মন্ত্রিত্ব এবং দর্ভপাণিপুত্র ও কেদারমিশ্রের পিতা সোমেশ্বর পালবংশের সৈন্যাধিপত্য করিয়া গিয়াছেন।[৬১]

মন্ত্রী কেদারমিশ্র বৃদ্ধবয়সে যাজ্ঞিক হইয়া পড়িয়াছিলেন। তিনি বহু যজ্ঞ করিয়াছিলেন। তাঁহার যজ্ঞস্থলে রাজ্যের নিয়ত কল্যাণকামী রাজা শূরপাল নতশিরে সর্ব্বদাই উপস্থিত থাকিতেন এবং বহুবার তাঁহার নিকট শান্তিবারি গ্রহণ করিয়াছিলেন।[৬২]

এই শূরপালের সময়েই দাক্ষিণাত্যে চালুক্য, গঙ্গ ও যাদববংশ, মধ্য ও উত্তরভারতে পরমার, চাহমান ও প্রতিহারগণ প্রবল হইয়া পালাধিকার গ্রাস করিতে থাকেন। প্রতিহাররাজ ভোজ এই সময়ে মগধ পর্য্যন্ত অধিকার করিয়া বসিলেন। গৌড়বঙ্গাধিপ তাঁহাকে বাধা দিতে সমর্থ হইলেন না।[৬৩] এমন কি পাল রাজধানী মুদ্গগিরি পর্য্যন্ত আক্রান্ত হইয়াছিল। বৃদ্ধ মন্ত্রী কেদারমিশ্র এ সময়ে যাগযজ্ঞ লইয়াই ব্যস্ত ছিলেন, গৌড়েশ্বর শূরপাল সম্ভবতঃ গৃহবিবাদে বিজড়িত, সুতরাং পালরাজ্যের সীমা ক্রমেই খর্ব্ব হইতে খর্ব্বতর হইতেছিল।

শূরপাল পিতা বা পিতামহের ন্যায় দীর্ঘকাল আধিপত্য করিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয় না, তাঁহার পরে বিগ্রহপাল নামে তাঁহার এক ভ্রাতাকে গৌড়ের সিংহাসন অলঙ্কৃত করিতে দেখি। ১ম বিগ্রহপাল শূরপালের ভ্রাতা ছিলেন বটে, কিন্তু সহোদর ছিলেন না। তিনি জয়পালের উপযুক্ত পুত্র।[৬৪]

১ম বিগ্রহপাল

(৬১) গরুড়স্তম্ভলিপিতে এই মন্ত্রিবংশের পরিচয় বিবৃত হইয়াছে।

(৬২) "যস্যেজ্যাসু বৃহস্পতিপ্রতিকৃতেঃ শ্রীশূরপালো নৃপঃ
সাক্ষাদিন্দ্র ইব ক্ষতাপ্রিয়বলো গত্বৈব ভূয়ঃ স্বয়ং।
নানাম্ভোনিধিমেখলস্য জগতঃ কল্যাণসঙ্গী চিরং
শ্রদ্ধাম্ভঃপ্লুত-মানসো নতশিরা জগ্রাহ পূতম্পয়ঃ॥" (গরুড়স্তম্ভলিপি ১৫শ শ্লোক)

(৬৩) "যস্য বৈরি বৃহদঙ্গান্ দহতঃ কোপবহ্নিনা।
প্রতাপার্দ্দ্রসাং রাশান্ পাতুং কৈতৃকমাবভৌ॥" (ভোজদেবের গোয়ালিয়র লিপি ১১শ শ্লোক)

(৬৪) ডাক্তার হোর্ণ্লি ও শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় প্রভৃতি ১ম বিগ্রহপালকে দেবপালের পুত্র বলিয়াই স্থির করিয়াছেন। নারায়ণপালের ভাগলপুরলিপি, ১ম মহীপালের বাণগড়লিপি, ৩য় বিগ্রহপালের আমগাছিলিপি ও মদনপালের মনহলিলিপি এই সমস্ত তাম্রলেখের মধ্যে বিগ্রহপালের পূর্ব্বপুরুষ ও তাঁহার জন্মপরিচয়সূচক এইরূপ শ্লোক দৃষ্ট হয়—

"যস্মিন্ ভ্রাতুর্নিদেশাদ্বলবতি পরিতঃ প্রস্থিতে জেতুমাশাঃ
সীদন্নাম্নৈব দূরান্নিজপুরমজহাদুৎকলানামধীশঃ।
আসাঞ্চক্রে চিরায় প্রণয়িপরিবৃতো বিভ্রদুচ্চেন মূর্দ্ধ্না
রাজা প্রাগ্জ্যোতিষাণামুপশমিতসমিৎসংকথাং যস্য চাজ্ঞাং॥
শ্রীমান্ বিগ্রহপালস্তৎসূনুরজাতশত্রুরিব জাতঃ।
শত্রুবনিতাপ্রসাধনবিলোপিবিমলাসিজলধারঃ॥" (৬ষ্ঠ ও ৭ম শ্লোক)

পূর্ব্বেই লিখিয়াছি, মহাবীর জয়পাল উত্তররাঢ়ে রাজত্ব করিতেন। এখানেই বিগ্রহপালের অভ্যুদয়। তিনি পিতার সহিত বহু রণক্ষেত্রে বীর্য্যবত্তা ও শক্তিসামর্থ্যের পরিচয় দিয়া খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন। তাম্রশাসনে তাঁহাকে 'অজাতশত্রু' অর্থাৎ যুধিষ্ঠিরের ন্যায় বলা হইয়াছে। যুধিষ্ঠির যেরূপ বহু কষ্ট সহ্য করিয়া জ্যেষ্ঠতাত-পুত্রদিগের নিকট হইতে রাজ্যলক্ষ্মী উদ্ধার করিয়াছিলেন, সম্ভবতঃ ১ম বিগ্রহপালও সেইরূপ জ্যেষ্ঠতাত দেবপালের পুত্রদিগকে বিনাশ করিয়া গৌড়রাজ্য অধিকার করিয়াছিলেন। যে সময়ে ভোজদেবের প্রধান সামন্ত

পূর্ব্বেই ৬ষ্ঠ শ্লোকের অনুবাদ দেওয়া হইয়াছে, [১৫৯ পৃষ্ঠা] এখানে পুনরুল্লেখ অনাবশ্যক। ৭ম শ্লোকের অর্থ— 'তৎপুত্র শ্রীমান্ বিগ্রহপাল অজাতশত্রুর ন্যায় জন্মগ্রহণ করেন। জলধারার ন্যায় তাঁহার বিমল অসিধারায় শত্রুবনিতাগণের (সধবার চিহ্ন) অঙ্গরাগাদি বিলুপ্ত হইয়াছিল।' এই পরিচয় পাইয়া ডাক্তার হোর্ণ্‌লি সাহেব লিখিয়াছেন, "It seems clear from this grant that Vigrahapala was not a nephew, but a son of Devapala ; for the pronoun his son (*tat-sunuh*) must refer to the nearest preceding noun which is Devapala." (Centenary Review of A.S.B. Appendix, II. p. 206.) তৎপরে শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহাশয়ও লিখিয়াছেন—"রচনারীতির প্রতি লক্ষ্য করিলে, প্রথম বিগ্রহপালদেবকে দেবপালের পুত্র বলিয়াই স্বীকার করিতে হয়। দেবপালদেবও অপুত্রক ছিলেন না। তাঁহার [মুঙ্গেরে আবিষ্কৃত] তাম্রশাসনে [৫১ ৫২ পংক্তিতে] রাজ্যপাল নামক তদীয় পুত্র যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত থাকিবার পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। তিনি যে পিতার জীবিতকালেই পরলোকগমন করিয়াছিলেন, তাহার প্রমাণাভাব। গরুড়-স্তম্ভলিপিতে [১৬শ শ্লোকে] দেবপালের পরবর্ত্তী নরপাল শূরপাল নামে উল্লিখিত। সকলেই তাঁহাকে প্রথম বিগ্রহপাল বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। প্রথম বিগ্রহপালের একাধিকনামের এইরূপ পরিচয় প্রাপ্ত হইয়া যুবরাজ রাজ্যপালকে, শূরপালকে এবং প্রথম বিগ্রহপালকে অভিন্ন ব্যক্তি বলিয়াই গ্রহণ করিতে ইচ্ছা হয়।" (গৌড়-লেখমালা ৬৭ পৃষ্ঠা) আমরা কিন্তু উক্ত মহাত্মার মতানুবর্ত্তী হইতে পারিলাম না। ১ম বিগ্রহপালের অপর নাম কি কোন উপাধি ছিল কি না তাহা এ পর্য্যন্ত কোন সাময়িকলিপি বা প্রাচীন ঐতিহাসিক গ্রন্থে বাহির হয় নাই। এমন কি উক্ত তাম্রশাসনগুলি আলোচনা করিলেও বিগ্রহপালকে দেবপালের পুত্র বলিয়া ধরা যায় না। যে শ্লোকে বিগ্রহপালের পরিচয় আছে, তৎপূর্ব্ববর্ত্তী দুইটি শ্লোকই জয়পালের পরিচায়ক। উক্ত তাম্রশাসনগুলি আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, ১ম শ্লোকে ভগবান্ বুদ্ধ ও ১ম গোপালদেব, ২টী শ্লোকে ধর্ম্মপাল, ১টী শ্লোকে তাঁহার অনুজ বাক্‌পাল, ২টী শ্লোকে তৎপুত্র জয়পাল, এবং তৎপরে ২টী শ্লোকে বিগ্রহপাল ও তৎপত্নী হৈহয়রাজকন্যা লজ্জার এবং ৮টী শ্লোকে তৎপুত্র নারায়ণপালের পরিচয় রহিয়াছে। সুপ্রসিদ্ধ সম্রাট্‌বর দেবপালের পরিচয়ের জন্য পুরা ১টী শ্লোকও লিপিবদ্ধ হয় নাই। ৫ম শ্লোকের শেষ চরণে মাত্র দেবপালের প্রসঙ্গ আছে। এরূপ স্থলে ৭ম শ্লোকের বিগ্রহপালকে কিরূপে আমরা দেবপালের পুত্র বলিয়া স্বীকার করি? ধর্ম্মপালের পুত্র যুবরাজ ত্রিভুবন-পাল ও দেবপালের পুত্র যুবরাজ রাজ্যপাল সামান্য লোক ছিলেন না, অথচ নারায়ণপালের প্রশস্তিকার তাঁহাদের নামগন্ধ করিলেন না কেন? ধর্ম্মপালের অনুজ বাক্‌পালের ধারায় বিগ্রহপালাদির জন্ম হইয়াছিল, বলিয়াই তাঁহার ও তদ্বংশের কীর্ত্তিঘোষণা কর্ত্তব্যমধ্যেই গণ্য হইয়াছিল, কিন্তু যুবরাজ ত্রিভুবনপাল বা রাজ্যপাল এই ধারা হইতে পৃথক্ ছিলেন, বলিয়াই তাঁহাদের কোনরূপ প্রসঙ্গ উক্ত তাম্রশাসনসমূহে প্রকাশিত হয় নাই। এক ধারায় জন্ম হইলে নিশ্চয়ই তাঁহাদের কীর্ত্তিপ্রসঙ্গ বিবৃত দেখিতাম।—ইত্যাদি কারণে ১ম বিগ্রহপালকে বাক্‌পালের পৌত্র ও জয়পালের পুত্র বলিয়াই ধরিয়াছি।

কক্ক শূরপালের রাজধানী মুদ্গগিরি আক্রমণ করিয়া তাঁহাকে বিপর্য্যস্ত করিয়াছিলেন[৬৫], সেই সময়ই সম্ভবতঃ ১ম বিগ্রহপাল আপনার সৌভাগ্যপথ পরিষ্কার করিতে অগ্রসর হইয়াছিলেন। কনোজপতির আক্রমণে শূরপাল হীনবল হইয়া পড়িয়াছিলেন। প্রজাবৃন্দ সম্ভবতঃ বীরপুত্র বিগ্রহপালের পক্ষ অবলম্বন করিয়া থাকিবে। সেই কুরুক্ষেত্রের সময়ে বিগ্রহপালের হৈহয়রাজ এবং হয়ত শূরবংশও বিগ্রহপালের পক্ষাবলম্বন করিয়াছিলেন, তাহারই ফলে হৈহয়রাজ গুণাম্ভোধিদেব মিথিলাসংলিপ্ত গৌড়রাজ্যাংশ এবং আদিত্যপুর উত্তররাঢ় লাভ করিয়া থাকিবেন।[৬৬] তাই তৎপুত্র নারায়ণপালের তাম্রশাসনে ১ম বিগ্রহপাল 'সুহৃদ্গণের পুরুষায়ুবদীর্ঘসম্পদ্'-দাতা বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।[৬৭] কোন কোন ঐতিহাসিক মনে করেন যে, 'ধর্ম্মপাল ও দেবপালের প্রতিভা ও উচ্চাভিলাষ—উভয় হইতেই বিগ্রহপাল বঞ্চিত ছিলেন।'[৬৮] তাই কি? যে ব্যক্তি যুধিষ্ঠিরের ন্যায় কঠোর জীবনসংগ্রামে 'শত্রুবর্গকে গুরুতর বিপদ্ভোগের পাত্র'[৬৯] করিয়া গৌড়রাজলক্ষ্মীলাভরূপ সৌভাগ্য অর্জ্জন করিয়াছিলেন,—তাঁহার উচ্চাভিলাষ ও প্রতিভা কি কম ছিল? 'তিনি শত্রুগণকে গুরুতর বিপদ্ভোগের আস্পদ করিয়াছিলেন।' বাস্তবিক তিনি নিজ রাজ্যপদ সুদৃঢ় করিয়া প্রবল শত্রু ভোজদেবকেও বিপদাপন্ন করিয়াছিলেন। এমন কি ভোজদেব নিজ পূর্ব্বদিকের সমস্ত অধিকার হারাইয়া স্বীয় রাজধানীতে আবদ্ধ থাকিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। প্রায় ৮৯০ খৃষ্টাব্দে ভোজদেবের মৃত্যুর সঙ্গে কান্যকুব্জপ্রদেশেও বিগ্রহপালের অধিকার প্রসারিত হইয়াছিল। তিনি নিজনামে 'বিগ্রহপালদ্রম্ম' প্রচার করিয়া সর্ব্বজনসমক্ষে নিজ প্রভুত্ব রক্ষা করিয়াছিলেন। ৯৬৫ সংবৎ (৯০৮ খৃষ্টাব্দ) পর্য্যন্ত সুদূর কান্যকুব্জ অঞ্চলে রাষ্ট্রকূটপ্রভাবজ্ঞাপক 'তুঙ্গদ্রম্ম' এবং বিগ্রহপালের জয়চিহ্ন 'বিগ্রহপালদ্রম্ম' প্রচলিত ছিল।[৭০] ৯৬৯ সংবতে (৯১২ খৃষ্টাব্দে ভোজদেবের পুত্র মহেন্দ্রপালের চেষ্টায় ভোজদেবের "আদিবরাহদ্রম্ম" বিগ্রহতুঙ্গীয় দ্রম্মের স্থান অধিকার করিতেছিল, কনোজাধিকারভুক্ত সীয়-

(৬৫) "ততোঽপি শ্রীযুত কক্ক পুত্রো জাতো মহামতিঃ।
যশো মুদ্গগিরিলব্ধং যেন গৌড়ে সমং রণে॥"
(কক্কপুত্র বৌকের ৯১৮ সংবতে উৎকীর্ণ যশোধলিপি ২৪শ শ্লোক J. Royal Asiatic Society, 1894, p. 3.)
উক্ত শিলালিপি-বর্ণিত কক্ক সম্ভবতঃ ভোজদেবের সমভিব্যাহারী কোন সামন্তাধিপতি ছিলেন, তিনিই মুদ্গগিরি আক্রমণ করেন।

(৬৬) ১২৪ পৃষ্ঠায় গুণাম্ভোধি ও আদিত্যপুরই আক্রমণকারী বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছেন। কিন্তু এখন আনুষঙ্গিক ঘটনানিচয় আলোচনা করিয়া বুঝিতেছি যে, তাঁহারা বিগ্রহপালের বিপক্ষ না হইয়া বরং তাঁহার পক্ষাবলম্বী ছিলেন। নচেৎ বিগ্রহপালের পক্ষে গৌড়রাজ্যলাভ সহজসাধ্য হইত না।

(৬৭) "পুরুষায়ুর্দীর্ঘাণাং সুহৃদঃ সম্পদামপি॥" (নারায়ণপালের ভাগলপুরলিপি ৮ম শ্লোক)

(৬৮) গৌড়রাজমালা ৩৩ পৃষ্ঠা।

(৬৯) "রিপবো যেন গুর্ব্বীণাং বিপদামাস্পদীকৃতাঃ॥" (নারায়ণপালের লিপি ৮ম শ্লোক)

(৭০) Epigraphia Indica, Vol. I. p. 174.

ভোনি হইতে আবিষ্কৃত শিলালিপি হইতে তাহার সন্ধান পাওয়া গিয়াছে।[১১] মহেন্দ্রপালের অভ্যুদয়ে পালাধিকার হইতে কান্যকুব্জ বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে। প্রায় ৮৯০ হইতে ৯০০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে এই ঘটনা ঘটে। তাহার পরও কএকবর্ষ এখানে 'বিগ্রহপালদ্রম্ম' প্রচলিত ছিল। বর্ত্তমান বিহারের ৭ মাইল দক্ষিণপশ্চিমে অবস্থিত ঘোষরাঁবা গ্রামের ধ্বংসাবশেষ হইতে বিগ্রহপালের বহু রৌপ্যমুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই মুদ্রাগুলি শাসনীয় বা শাকমুদ্রার অনুরূপ। মুদ্রার দক্ষিণপার্শ্বে সম্মুখভাগে অস্পষ্ট রাজমুণ্ড, তাহার সহিত "শ্রী" এবং নিম্নে "বিগ্রহ" এই কয়টী অক্ষর আছে। এই সমস্ত অংশ যেন মুক্তার মালা দিয়া ঘেরা। পশ্চাদ্ভাগে সূর্য্য বা অগ্নিপূজার বেদী, ইহার উভয়পার্শ্বে হোতা ও অধ্বর্য্যুর মূর্ত্তি, মধ্যস্থলে "ম" অক্ষর, সম্ভবতঃ বিগ্রহপালের আচার্য্য মগব্রাহ্মণ-প্রভাবপ্রকাশক অথবা তাঁহার মগধরাজ্যনির্দ্দেশক। এই 'বিগ্রহপালদ্রম্ম' মুদ্রায় তাঁহার জাতি, ধর্ম্মানুষ্ঠান ও বিশ্বাসের অস্পষ্ট পরিচয় সূচিত হইয়াছে।

পালবংশের অভ্যুদয়কাল হইতে, যে মন্ত্রিবংশ পুরুষানুক্রমে এই বংশের মন্ত্রিত্ব করিয়া আসিয়াছেন, বিগ্রহপালের অভ্যুদয়কালে তাঁহারা দেবপালের বংশধরগণের পক্ষাবলম্বন করায় সম্ভবতঃ বিগ্রহপাল তাঁহাদিগকে প্রথমতঃ মন্ত্রিত্ব প্রদান করিতে সুবিধাবোধ করেন নাই, কিন্তু সেই সুচতুর ও সুবিদ্বান্ মন্ত্রিবংশ স্ব স্ব পূর্ব্বাধিকার ও পদমর্য্যাদা রক্ষা করিবার জন্য কখনই নিশ্চেষ্ট ছিলেন না। বিগ্রহপাল যেমন প্রতিভাশালী, মহাবীর ও সুহৃদ্জনপ্রিয় ছিলেন, সেইরূপ বয়োবৃদ্ধির সহিত তাঁহার ধর্ম্মপিপাসাও বাড়িয়া উঠিয়াছিল। দীর্ঘকাল রাজত্ব করিয়া তিনি হৈহয়-

নারায়ণপাল

রাজকন্যা লজ্জাদেবীর গর্ভজাত প্রিয়পুত্র নারায়ণপালকে সিংহাসন অর্পণ করিয়া বানপ্রস্থ অবলম্বন করেন।[১৩] এই সময় ভূতপূর্ব্ব মন্ত্রী কেদারমিশ্রের পুত্র গরুড়স্তম্ভপ্রতিষ্ঠাতা গুরবমিশ্র নারায়ণপালের মন্ত্রী হইলেন। এদিকে বিগ্রহপালের সংসারবৈরাগ্য ও রাজ্যত্যাগের সংবাদ পাইয়া কনোজপতি মহেন্দ্রপাল পালরাজ্য-জয়ে অগ্রসর হইলেন। এমন কি, অল্প দিনমধ্যে মগধের অনেকটা তাঁহার করতলগত হইয়াছিল। মহেন্দ্রপালের অধিকারবিস্তৃতিজ্ঞাপক অনেকগুলি শিলালিপি গয়া হইতে আবিষ্কৃত হইয়াছে। ঐ সকল শিলালিপি হইতে তাঁহাকে পরম বৈষ্ণব বলিয়াই মনে হইবে। কিন্তু মগধে তাঁহার অধিকার বেশী দিন স্থায়ী হইয়াছিল বলিয়া মনে হয় না। অল্প দিনমধ্যেই নারায়ণপাল নষ্টরাজ্য

(১১) Epigraphia Indica, Vol. I. p. 175.

(১২) Cunningham's Arch. Sur. Reports, Vol. XV. p. 152.

(১৩) "তপো মমাস্তু রাজ্যং তে দ্বাভ্যামুক্তমিদং দ্বয়োঃ।
যস্মিন্ বিগ্রহপালেন সগরেণ ভগীরথে॥"

(নারায়ণপালের ভাগলপুরলিপি ১৭ শ্লোক)

আমার পক্ষে তপস্যা ও তোমার পক্ষে রাজ্য—সগর যেরূপ ভগীরথকে বলিয়াছিলেন, বিগ্রহপাল কর্ত্তৃকও সেইরূপ উক্ত হইয়াছিল।

এই শ্লোকে নারায়ণপালকে রাজ্যদানপূর্ব্বক বিগ্রহপালের তপস্যার আভাস পাওয়া যাইতেছে।

উদ্ধার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।"[১৪] 'বহু নৃপতির শিরোমণি-প্রভায় যাঁহার সিংহাসনের পাদপীঠ উজ্জ্বল হইয়াছিল, ন্যায়োপার্জ্জিত সেই ধর্ম্মাসন তিনি নিজ সুকৃতিবলে অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। পুরাণবর্ণিত পবিত্রকথার ন্যায় নরপতিগণ চতুর্ব্বর্গনিধির আস্পদ তাঁহার পবিত্র চরিত্র সর্ব্বদা অভিলাষ করিতেন। সুজনমনোহারিণী সাতবাহনরাজ-সম্বন্ধীয় সদুক্তি এবং অঙ্গরাজ কর্ণের উজ্জ্বল স্বার্থত্যাগের কথা, যাঁহা হইতে সত্য বলিয়াই স্বীকৃত হইয়াছিল।'[১৫] 'যিনি প্রজ্ঞা ও ধনুর্বিদ্যাপ্রভাবে জগদ্বাসিগণকে অবনমিত করিয়া অনাকুল আত্মধর্ম্মে অভিনিবিষ্ট ছিলেন। অর্থিগণ যাঁহার নিকট একবার আসিলে এরূপ কৃতার্থ হইয়া যাইত যে, অপরের নিকট প্রার্থনা করিবার আর দরকারই হইত না।'[১৬] এইরূপ সদ্‌গুণসম্পন্ন বীর নৃপতি কখনও একজন সামান্য ব্যক্তি ছিলেন না। তিনি ধর্ম্মের গোঁড়ামি জানিতেন না। সকল ধর্ম্ম-সম্প্রদায় তাঁহার অধিকারে সমান পূজা পাইতেন। একদিকে মগধে তাঁহার নাম স্মরণ করিয়া সুদূর দক্ষিণাপথাগত আন্ধ্রবৈষয়িক শাক্যভিক্ষু স্থবির ধর্ম্মমিত্র তাঁহার ৫ম রাজ্যাঙ্কে যেরূপ বুদ্ধমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়া[১৭] বৌদ্ধগণের ভক্তিভাজন হইয়াছিলেন, অপরদিকে নারায়ণপাল নিজে শিবকে স্মরণ করিয়া মিথিলাবাসী পাশুপত আচার্য্য-পরিষদ্‌কে তীরভুক্তির মধ্যে তাম্রশাসনদ্বারা কলশপোত নামক গ্রাম দান করিয়াছিলেন। এ সময় তাঁহার ১৭শ বর্ষ রাজ্যকাল অতীত হইয়াছে। মুদ্গগিরি-রাজধানী হইতেই উক্ত তাম্রশাসনখানি প্রদত্ত হয়। এই তাম্রশাসন হইতেই আমরা জানিতে পারিতেছি যে, কেবল মগধে নহে, মিথিলা পর্য্যন্ত তাঁহার অধিকারভুক্ত ছিল। তাঁহার মন্ত্রী পুণ্যকীর্ত্তি গুরবমিশ্রই বরেন্দ্রীমণ্ডলে বগুড়ার সীমায় দিনাজপুর জেলায় বাদালের নিকট এক সমুচ্চ গরুড়স্তম্ভ প্রতিষ্ঠা করেন, তাহার গাত্রে যে পালবংশ ও মন্ত্রিবংশের পরিচয় আছে, সেই লিপিই গরুড়স্তম্ভলিপি নামে প্রসিদ্ধ। এই নারায়ণপালের সময়েই ১ম অমোঘবর্ষের পুত্র রাষ্ট্রকূটপতি ২য় কৃষ্ণ কান্যকুব্জ

(১৪) গয়ার বিষ্ণুপদমন্দির হইতে নারায়ণপালের ৭ম রাজ্যাঙ্কে উৎকীর্ণ শিলালিপি বাহির হইয়াছে। (Cunningham's Arch. Sur. Reports, Vol. III. p. 120.)

(১৫) "যঃ ক্ষৌণীপতিভিঃ শিরোমণিরুচাশ্লিষ্টাঙ্ঘ্রিপীঠোপলং
ন্যায়োপাত্তমলঞ্চকার চরিতৈঃ স্বৈরেব ধর্ম্মাসনম্।
চেতঃ পুরাণলেখ্যানি চতুর্ব্বর্গনিধীনি চ।
আশিশঙ্কে যতস্তানি চরিতানি মহীভৃতঃ॥
স্বীকৃত-সুজন-মনোভিঃ সত্যাপিত-সাতিবাহনঃ সূক্তৈঃ।
ত্যাগেন যো ব্যধত্ত প্রত্যেয়ামঙ্গরাজকথাং॥"
(নারায়ণপালের ভাগলপুরলিপি ১০ম হইতে ১২শ শ্লোক)

(১৬) "যঃ প্রজ্ঞয়া চ ধনুষা চ জগদ্বিনীয় নিত্যং ন্যবীবিশদনাকুলমাত্মধর্ম্মে।
যস্যার্থিনো সবিদমেত্য কৃপাঃ কৃতার্থা নৈবার্থিতাং প্রতি পুনর্ব্বিদধুর্ম্মনীষাং॥"
(ঐ ভাগলপুরলিপি ১৩শ শ্লোক)

(১৭) সাহিত্যপরিষৎপত্রিকা ১৬শ ভাগে উক্ত প্রতিমাপাদে উৎকীর্ণ লিপির পাঠ প্রকাশিত হইয়াছে।

আক্রমণ করেন। সেই যুদ্ধে গুর্জ্জরপতি মহেন্দ্রপালের পুত্র ২য় ভোজ পরাজিত হন। সম্ভবতঃ তৎকালে গৌড়াধিপ রাষ্ট্রকূটপতির আনুগত্য স্বীকার করিয়া তাঁহার সহিত সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হইয়াছিলেন। মনে হয়, এই সময়েই রাষ্ট্রকূটপতি শুভতুঙ্গ নারায়ণপালের প্রিয়পুত্র রাজ্যপালের সহিত নিজ প্রিয় দুহিতার বিবাহ দিয়া পূর্ব্বাত্মীয়তা সুদৃঢ় করিয়াছিলেন।[৭৮]

রাজ্যপাল

নারায়ণপাল একজন ন্যায়পর, দানশীল ও সাধু নৃপতি বলিয়া গণ্য ছিলেন। তাঁহার পর তৎপুত্র রাজ্যপাল পিতৃসিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি 'সাগরের ন্যায় বৃহৎ ও অতি গভীর বহু জলাশয় এবং কুলাচলের ন্যায় সমুচ্চ বহু কক্ষবিশিষ্ট দেবালয় সকল'[৭৯] নির্ম্মাণ করিয়া প্রথিত হইয়াছিলেন।

কনোজপতি ২য় ভোজের পরাজয়ের সহিত কিছু দিনের জন্য কনোজরাজ্য রাষ্ট্রকূট-বংশের অধিকারভুক্ত হইয়াছিল। এ সময়ে জেজাভুক্তি (বর্ত্তমান বুন্দেলখণ্ড অঞ্চলে) চন্দ্রাত্রেয় বা চন্দেল্লবংশ প্রবল হইয়া উঠিতেছিলেন। কনোজপতি আদিবরাহ ভোজদেবের শাসনকালে তাঁহার পুত্র বা বংশধরগণ কনোজাধিকারের নানাস্থানে মহাসামন্তাধিপতিরূপে অধিষ্ঠিত হইয়াছিলেন, ২য় ভোজের পরাজয়, রাষ্ট্রকূট-প্রভাব-বিস্তার এবং চন্দ্রাত্রেয়বংশের অভ্যুদয়ে তাঁহাদের উত্তরাধিকারিগণও স্বাধীন হইয়া জাতীয় গৌরব উদ্ধারে অগ্রসর হইয়াছিলেন। এই সময়ে কনোজাধিকারে ক্ষিতিপাল নামে এক নৃপতির নাম পাওয়া যায়। চন্দ্রাত্রেয়রাজ হর্ষদেব প্রথমে তাঁহাকে পরাজয় করেন, পরে হর্ষদেবের সাহায্যেই ক্ষিতিপাল কনোজরাজ্য উদ্ধার করেন। কিন্তু তাঁহার অদৃষ্টেও কনোজসিংহাসন বেশী দিন স্থায়ী হইল না। তাঁহার পরই প্রতিহার মহীপালকে কনোজের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত দেখিতে পাই। তিনি ২য় ভোজদেবের কনিষ্ঠ বলিয়াই পরিচিত।

(৭৮) কেহ কেহ মনে করেন যে, মহাবোধি হইতে তুঙ্গ-ধর্ম্মালোক নামক যে এক নৃপতির শিলালিপি বাহির হইয়াছে (Rajendralal Mitra's Buddha Gaya), সেই তুঙ্গ-ধর্ম্মাবলোকের কন্যার সহিতই রাজ্যপালের বিবাহ হয়। কিন্তু মহীপালের বাণগড়লিপিতে রাজ্যপালের শ্বশুর তুঙ্গকে "রাষ্ট্রকূটান্বয়েন্দু" "উত্তুঙ্গমৌলি" বলা হইয়াছে। এ অবস্থায় তাঁহাকে আমরা রাষ্ট্রকূটপতি শুভতুঙ্গ ২য় কৃষ্ণ বলিয়াই মনে করি। এই বিবাহকালেই অঙ্গকলিঙ্গ-গাঙ্গ ও মগধ সামন্তগণ রাষ্ট্রকূটপতির দ্বারস্থ হইয়া থাকিবেন।

"তস্মাদূর্জ্জিতগুর্জ্জরো হৃতহটলাটোদ্ভট শ্রীমদো
গৌড়ানাং বিনয়ব্রতার্পণগুরুঃ সামুদ্রনিদ্রাহরঃ।
দ্বারস্থাঙ্গকলিঙ্গগাঙ্গমগধৈরভ্যর্চ্চিতাজ্ঞশ্চিরঃ
সূনুঃসূনৃতবাগ্ভুবঃ পরিবৃঢ়ঃ শ্রীকৃষ্ণরাজো ভবেৎ।"

(৩য় কৃষ্ণের দেউলী-লিপি ১৩শ ও করহাড়লিপি ১৫শ শ্লোক)

(৭৯) "তোয়াশয়ৈর্জ্জলধিমূলগভীরগর্ভৈর্দেবালয়ৈশ্চ কুলভূধরতুল্যকক্ষৈঃ।
বিখ্যাতকীর্ত্তিরভবত্তনয়শ্চ তস্য শ্রীরাজ্যপাল ইতি মধ্যমলোকপালঃ।"

(১ম মহীপালের বাণগড়লিপি ৭ম শ্লোক)

রাজ্যপালের সময় রাষ্ট্রকূটপতি ২য় কৃষ্ণ শুভতুঙ্গের পুত্র ৩য় ইন্দ্র উক্ত মহীপালকে আক্রমণ করেন। এ সময় রাষ্ট্রকূটপতির মহাসামন্ত নরসিংহ গঙ্গাসাগরসঙ্গম পর্য্যন্ত কনোজপতির অনুসরণ করিয়াছিলেন, ভট্ট অকলঙ্কদেবের কর্ণাটক-শব্দানুশাসনে নরসিংহের সেই বীরকীর্ত্তি কীর্ত্তিত হইয়াছে। গঙ্গাসাগরসঙ্গম পর্য্যন্ত কনোজপতির পশ্চাদ্ধাবনের প্রসঙ্গ থাকায়, কেহ কেহ মনে করেন যে, তৎকালে কান্যকুব্জরাজ্য গঙ্গাসাগরসঙ্গম পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল, নচেৎ গৌড়পতির সহিত যুদ্ধের কোন উল্লেখ নাই কেন? পূর্ব্বেই লিখিয়াছি, রাজ্যপাল রাষ্ট্রকূটপতি ৩য় ইন্দ্রের ভগিনীকে বিবাহ করেন; সুতরাং তখন গৌড় ও রাষ্ট্রকূট-পতি কুটুম্বিতাসূত্রে আবদ্ধ, কাজেই নরসিংহ গৌড়পতিকে কেন আক্রমণ করিবেন? হয় ত কনোজপতি মহীপাল যুদ্ধে পরাজিত হইয়া প্রথমে গৌড়াধিকারে হটিয়া আসেন, রাজ্যপাল তাঁহার গতিরোধ করিতে সমর্থ হন নাই। তাঁহাকে বন্দী করিয়া আনিবার ভার সামন্ত নরসিংহের উপর অর্পিত হইয়াছিল। এই সময়ে রাষ্ট্রকূটপতির সহিত গৌড়পতির আত্মীয়তা থাকায় রাষ্ট্রকূটলিপিসমূহে গৌড়জয় বা গৌড়াক্রমণের কোন কথাও নাই।

রাজ্যপালের পর তৎপুত্র রাষ্ট্রকূটরাজকন্যা ভাগ্যদেবীর গর্ভে গোপালদেব জন্মগ্রহণ করেন।

২য় গোপাল

রাজ্যপালের যেরূপ বীরত্ব বা রাজ্যরক্ষার কোন পরিচয় নাই, পালরাজগণের প্রশস্তি-লেখকগণ এই ২য় গোপালদেব সম্বন্ধেও সেরূপ গৌরবজনক কিছু লিখিয়া যান নাই। যদিও এই গোপালদেবের রাজ্যারম্ভকালে উৎকীর্ণ শিলা-লিপি হইতে নালন্দার বাগীশ্বরীমূর্ত্তি এবং গয়ার মহাবোধিতে সিংহলজ শকসেনবংশীয় ধার্ম্ম-ভীম কর্ত্তৃক বুদ্ধমূর্ত্তি-প্রতিষ্ঠা[৮০] প্রসঙ্গে গয়া পর্য্যন্ত তাঁহার অধিকারভুক্ত থাকিবার পরিচয় পাওয়া যায়, কিন্তু অল্প দিনমধ্যেই তিনি অধিকার হারাইয়া ছিলেন। এই সময়ে একদিকে চন্দেল্ল হর্ষ-দেবের পুত্র পরাক্রান্ত যশোবর্ম্মা ও অপরদিকে কাম্বোজবংশের অধিকারবিস্তারে গোপাল ব্যতি-ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। এই সময়ে মিথিলা ও মগধ পর্য্যন্ত চন্দেল্ল যশোবর্ম্মার[৮১] এবং গৌড় বা উত্তরবঙ্গ কাম্বোজবংশের অধীন হইয়াছিল। চন্দেল্ল যশোবর্ম্মা গৌড়মণ্ডলে কোন স্থায়ী চিহ্ন রাখিতে না পারিলেও দিনাজপুর অঞ্চলে কাম্বোজ প্রভাবের নিদর্শন অদ্যাপি বিরাজ করিতেছে। কাম্বোজবংশীয় কোন্ নৃপতি গৌড় অধিকার করেন এবং এই বংশের কে কে কতদিন রাজত্ব

(৮০) Journal and Proceeding A. S. Bengal, Vol. IV. (New Series) p. 105.

(৮১) খাজুরাহোর বৈকুণ্ঠনাথের মন্দিরে উৎকীর্ণ চন্দেল্ল যশোবর্ম্মার শিলালিপিতে এইরূপ লিখিত আছে—

"গৌড়ক্রীড়ালতাসিস্তুলিতখসবলঃ কোশলঃ কোশলানাং
নশ্যৎকশ্মীরবীরঃ শিথিলিতমিথিলঃ কালবন্মালবানাং।
সীদৎসাবদ্যচেদিঃ কুরুতরুষু মরুৎসংজ্বরো গুর্জ্জরাণাং
তস্মাজ্জাতঃ স জজ্ঞে নৃপকুলতিলকঃ শ্রীযশোবর্ম্মরাজঃ॥"

(খাজুরাহোলিপি নং ২, ২৩ শ্লোক) Ep. Ind. Vol. I. p. 126.

উক্ত শ্লোকে যশোবর্ম্মা গৌড়, কোশল, কশ্মীর, মিথিলা, চেদি, কুরু ও গুর্জ্জরপতিকে জয় করিয়াছিলেন, তাহারই আভাস পাওয়া যাইতেছে।

করেন, তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ এখনও বাহির হয় নাই। তবে ২য় গোপাল ও তৎপুত্র ২য় বিগ্রহপালের সময়[৮২] পর্য্যন্ত উত্তরবঙ্গ যে কাম্বোজবংশের অধিকারভুক্ত ছিল, তাহা একপ্রকার স্থির হইয়া গিয়াছে। কিন্তু এই কাম্বোজবংশের আদি বাসস্থান ও জাতি লইয়া যথেষ্ট বাদবিতণ্ডা চলিতেছে। একদল নবীন ঐতিহাসিক বলিতে চান যে, এই কাম্বোজগণ মোঙ্গলীয় বংশসম্ভূত, "তিব্বত বা পার্শ্ববর্ত্তী কোন প্রদেশ হইতে আসিয়া, বরেন্দ্র জয় করিয়া, বরেন্দ্রী বা বরেন্দ্রের নামান্তর গৌড়ের নামানুসারে, গৌড়পতি উপাধি গ্রহণ করিয়াছিলেন।"[৮৩] "উত্তরবঙ্গবাসী কোচ, মেচ ও পলিয়াগণ উক্ত কাম্বোজবংশের বর্ত্তমান নিদর্শন।" বাস্তবিক নবীন ঐতিহাসিকগণের এই অপূর্ব্ব যুক্তির সমর্থন করা আদৌ চলে না। তিব্বত কোন দিনও কাম্বোজ বলিয়া পরিচিত হয় নাই। বিশেষতঃ কাম্বোজান্বয় গৌড়পতি শৈব ছিলেন।

গৌড়ে কাম্বোজ-অধিকার

তিব্বতে কিন্তু শৈব নৃপতির প্রসঙ্গ কখনও শুনা যায় নাই। নেপালে শৈবপ্রভাব থাকিলেও তথায় কোন রাজবংশ কাম্বোজ বলিয়া আপনার পরিচয় দেন নাই। গৌড়পতি-প্রতিষ্ঠিত শিবমন্দিরের একখণ্ড প্রস্তরস্তম্ভ অদ্যাপি দিনাজপুর রাজবাটীর সম্মুখস্থ উদ্যানে রক্ষিত আছে। সেই প্রস্তরস্তম্ভে এইরূপ লেখা আছে,—'যাঁহার দুর্ব্বার শত্রুসৈন্যবিনাশ ও দানের কথা এবং ধনুর্গুণ আকর্ষণের দক্ষতা বিদ্যাধরগণ কর্ত্তৃক আনন্দের সহিত স্বর্গলোকে গীত হইতেছে, কাম্বোজান্বয়জ সেই গৌড়পতি কুঞ্জরঘটা (৮৮৮) বর্ষে ইন্দুমৌলির (শিবের) ভুবনভূষণ এই মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন।'[৮৪]

(৮২) ১ম মহীপালের বাণগড়লিপি, ৩য় বিগ্রহপালের আমগাছিলিপি এবং মদনপালের মনহলিলিপিতে এই ২য় বিগ্রহপালের এইরূপ পরিচয় আছে—

"তস্মাদভূৎ সবিতুর্বসুকোটিবর্ষী কালেন চন্দ্র ইব বিগ্রহপালদেবঃ
নেত্রপ্রিয়েণ বিমলেন কলাময়েন যেনোদিতেন দলিতো ভুবনস্য তাপঃ ॥
দেশে প্রাচি প্রচুর পয়সি স্বচ্ছমাপীয় তোয়ং স্বৈরং ভ্রান্ত্বা তদনুমলয়োপত্যকাচন্দনেষু।
কৃত্বা সান্দ্রৈস্তরুষু জড়তাং শীকরৈরভ্রতুল্যাঃ প্রালেয়াদ্রেঃ কটকমভজন্ যস্য সেনা গজেন্দ্রাঃ ॥"

(১০ম ও ১১শ শ্লোক)

সবিতা হইতে কিরণকোটিবর্ষী চন্দ্রের ন্যায় তাঁহা হইতে বিগ্রহপালদেব জন্মগ্রহণ করেন। নেত্রপ্রিয় বিমল কলাময়চন্দ্রস্বরূপ যাঁহার উদয়ে ভুবনের তাপ দূর হইয়াছিল। প্রচুর জলযুক্ত পূর্ব্বদেশে স্বচ্ছজল পান করিয়া, তৎপরে মলয়োপত্যকার চন্দনবনে স্বেচ্ছায় ঘুরিয়া ফিরিয়া বিন্দু বিন্দু বারিপাতে তরুসমূহে জড়তা উৎপাদন করিয়া যাঁহার অভ্রতুল্য সেনাগজেন্দ্রগণ হিমালয়ের কটক পর্য্যন্ত ভোগ করিয়াছিল।

উক্ত পরিচয়-শ্লোকে বিগ্রহপালের পিতাকে সূর্য্যসদৃশ এবং তাঁহাকে কলাময় চন্দ্রস্বরূপ বলা হইয়াছে। ইহাতে মনে হয় যে, বিগ্রহপাল পিতার ন্যায় পূর্ণরাজ্য লাভ করিতে পারেন নাই, চন্দ্রের কলার যেমন হ্রাসবৃদ্ধি আছে, তাঁহার প্রভাব এবং রাজ্যের সেইরূপ হ্রাসবৃদ্ধি হইতেছিল। এমন কি গৌড়মণ্ডল হারাইয়া প্রথমে তিনি পূর্ব্বদেশে বা পূর্ব্ববঙ্গে, তৎপরে নানাস্থানে গিয়া সসৈন্যে আশ্রয় লইতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

(৮৩) গৌড়রাজমালা ৩৭ পৃষ্ঠা।

(৮৪) মূলশিলালিপি এইরূপ—

"দুর্ব্বারারিবরূথিনী-প্রমথনে দানে চ বিদ্যাধরৈঃ
সানন্দং দিবি যস্য মার্গণগুণগ্রামগ্রহো গীয়তে।

বাণগড়ে এই শিব-মন্দির এখন লুপ্তপ্রায়। দিনাজপুর প্রাসাদ-সম্মুখস্থ উদ্যানে সেই মন্দিরের খণ্ডাংশ প্রস্তরস্তম্ভ আনীত হইয়াছে। উক্ত প্রস্তরস্তম্ভ আলোচনা করিলেও তাহাকে তিব্বতীয় বা মোঙ্গলীয় শিল্পের আদর্শ বা নিদর্শন বলিয়া কখনই স্বীকার করা যায় না। তাহার ভাস্কর্য্য ও নিখুত কারিগরী দেখিলে তাহাকে দাক্ষিণাত্য বা গৌড়ীয় শিল্পের সহিত তুলনা করা যাইতে পারে। তিব্বত ও আসাম প্রভৃতি স্থানে মোঙ্গলীয় স্থাপত্য বা ভাস্কর্য্যের যে সকল নিদর্শন আছে, তাহার সহিতও ইহার সৌসাদৃশ্য নাই। ইত্যাদি নানা কারণে কাম্বোজান্বয় গৌড়পতিকে আমরা মোঙ্গলীয় বলিয়া গ্রহণ করিতে পারিলাম না। তবে এই গৌড়পতি কোন্ কাম্বোজ-বংশসম্ভূত? ঐতিহাসিকগণের নিকট দুইটী কাম্বোজ প্রসিদ্ধ,—একটী পুরাণপ্রসিদ্ধ উত্তরপশ্চিমপ্রান্তে কাশ্মীরের নিকট অবস্থিত, অপরটী চীনসমুদ্রকূলে অধুনা কাম্বোডিয়া নামে খ্যাত। এই উভয়স্থানেই শৈব-প্রভাবের নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে, কিন্তু যে সময়ের কথা লিখিত হইতেছে, অর্থাৎ খৃষ্টীয় ১০ম শতাব্দে উত্তরপশ্চিমপ্রান্তে বা চীনসমুদ্রকূল হইতে কাম্বোজগণের গৌড়াক্রমণের সংবাদ সমসাময়িক শিলালিপি বা সাময়িক গ্রন্থে বাহির হয় নাই, এই কারণে এই দুই কাম্বোজ হইতে যে কোন নৃপতি আসিয়া গৌড়াধিপ হইয়া বসিয়াছিলেন, তাহা সহসা মনে করিতেই পারি না। উক্ত দুইটী কম্বোজ ছাড়া পুরাণ হইতে আমরা আর একটী কাম্বোজের সন্ধান পাইতেছি—

"পুলিন্দাশ্মকজীমূত-নররাষ্ট্রনিবাসিনঃ।
কর্ণাটাঃ কম্বোজঘণ্টা দক্ষিণাপথবাসিনঃ।
অম্বষ্ঠা দ্রবিড়া লাটাঃ কাম্বোজাঃ স্ত্রীমুখাঃ শকাঃ।
আনর্ত্তবাসিনশ্চৈব জ্ঞেয়া দক্ষিণপশ্চিমে॥" (গরুড়পুরাণ ৫৫।১৪-১৫)

গরুড়পুরাণের উদ্ধৃত শ্লোক হইতেও বুঝা যাইতেছে যে, দক্ষিণপশ্চিম-ভারতে লাটের পার্শ্বে কাম্বোজগণের বাসহেতু সেই স্থান 'কাম্বোজ' জনপদ বলিয়াও প্রসিদ্ধ হইয়াছিল। উক্ত শ্লোকে 'শক'জাতিরও উল্লেখ আছে। ইহাতে মনে হয়, যে সময় দক্ষিণপশ্চিমভারতে শকাধিপত্য ছিল, গরুড়পুরাণের উক্ত অংশ সেই সময়ে অর্থাৎ খৃষ্টীয় ১ম ও ২য় শতাব্দে সঙ্কলিত হইয়াছিল। এরূপস্থলে খৃষ্টীয় ১ম ও ২য় শতাব্দে লাট বা গুজরাতের নিকট কাম্বোজজাতি ও কাম্বোজজনপদ ছিল স্বীকার করিতে হইবে। ৯৪৩ হইতে ৯৬৮ খৃষ্টাব্দের মধ্যে অল্ ইস্তখ্‌রি ও ইব্‌ন্‌হৌকল নামক দুইজন মুসলমান ঐতিহাসিক 'বল্‌হরা' বা রাষ্ট্রকূটরাজ্যের উত্তরসীমা 'কম্বায়' নামে উল্লেখ করিয়াছেন।[৮৫] আইন-ই-অকবরীতে এই স্থান 'কম্বায়ৎ' নামে পরিচিত।[৮৬] উত্তর-কম্বোজ মুসলমান ঐতিহাসিকগণের নিকট 'কম্বো' নামে পরিচিত, সুতরাং রাষ্ট্রকূট-

কাম্বোজান্বয়জেন গৌড়পতিনা তেনেন্দুমৌলেরয়ং
প্রাসাদো নিরমায়ি কুঞ্জরঘটাবর্ষেণ ভূভূষণঃ।"

(৮৫) Sir H. M. Elliot's History of India, Vol. I. p. 27. and p. 34.
(৮৬) Col. Jarrett's Ain-i-Akbari, Vol II. p. 241.

রাজ্যের সীমানির্দ্দেশক 'কম্বায়' বা 'কম্বায়ৎ' উত্তরকম্বোজ হইতে ভিন্ন। অতএব লাটের পার্শ্বে, অথচ রাষ্ট্রকূটরাজ্যের উত্তরসীমা ধরিলে দক্ষিণপশ্চিমভারতে, অধুনা 'কাম্বে' নামে পরিচিত স্থানই গরুড়পুরাণোক্ত 'কাম্বোজ' বলিয়া স্থির করিতে হয়।[৮৭] কাম্বে পূর্ব্ব হইতেই শৈবতীর্থ বলিয়া সর্ব্বত্র খ্যাতিলাভ করিয়াছে। বলা বাহুল্য, শৈবতীর্থে বাস হেতু এখানকার অধিবাসী অধিকাংশই শৈব ছিলেন। এখানকার শৈবকাম্বোজগণের গৌড়দেশে আসিয়া প্রভাববিস্তার কিছু অসম্ভব নহে। পূর্ব্বেই লিখিয়াছি যে, কর্ণাট, লাট ও রাষ্ট্রকূটগণ একাধিকবার গৌড় আক্রমণ করেন। যে সময়ের কথা লিখিত হইতেছে, তৎকালে কাম্বে (কাম্বোজ) পর্য্যন্ত রাষ্ট্রকূট অধিকারভুক্ত ছিল। রাষ্ট্রকূটপতি ৩য় ইন্দ্রের মহাসামন্ত নরসিংহ গঙ্গাসাগর পর্য্যন্ত কনোজপতি মহীপালকে তাড়াইয়া আসিয়াছিলেন। এই সময়ে গৌড়মণ্ডল অল্পদিনের জন্য রাষ্ট্রকূট শাসনাধীন হওয়া কিছু বিচিত্র নহে। রাষ্ট্রকূটপতি নিজ অধিকারভুক্ত উক্ত কাম্বোজের কোন সামন্তরাজকে এই অল্পসময়ের জন্য গৌড়ের শাসনশৃঙ্খলা স্থাপনের জন্য রাখিয়া গিয়া থাকিবেন। সেই কাম্বোজসামন্তই গৌড়াধিপত্য লাভ করিয়া 'কাম্বোজান্বয়-গৌড়পতি' বলিয়া পরিচিত হইয়া থাকিবেন। ৮৮৮ শকে বা ৯৬৬ খৃষ্টাব্দে তিনি দিনাজপুর জেলাস্থ বাণগড় বা বাণনগরে যে শিবমন্দির প্রতিষ্ঠা করেন, অনুসন্ধান করিলে হয় ত, সেই মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ বাহির হইতে পারে। যে সময়ে গৌড়মণ্ডল কাম্বোজবংশের শাসনাধীন, পালনৃপতি গৌড় ত্যাগ করিয়া প্রথমে উত্তররাঢ়, তৎপরে নানা স্থানে আশ্রয় লইয়া হিমালয়ের উপত্যকায় চির-বিশ্রাম লাভ করেন, এই

২য় বিগ্রহপাল

সময়ে তৎপুত্র ২য় বিগ্রহপাল সম্ভবতঃ পিতৃসৈন্যের অধিনায়ক হইয়া পিতার লুপ্তগৌরব উদ্ধার করিবার জন্য আবার গৌড়রাজ্যে দেখা দিলেন, তখন গৌড় বা উত্তরবঙ্গে কাম্বোজবংশের রাজধানী হইয়াছিল। এই কারণে তিনি প্রথমে রাঢ়দেশে উপস্থিত হইলেন। রাঢ়বাসী সাদরে ন্যায্য অধিকারীকে গ্রহণ করিলেন। কাম্বোজের কবল হইতে রাঢ়দেশ উদ্ধার হইল বটে, কিন্তু আবার এক প্রবল শত্রু আসিয়া পালাধিকার বিপর্য্যস্ত করিলেন। সেই প্রবল শত্রু অপর কেহ নহেন, —চন্দেল্লরাজ যশোবর্ম্মার পুত্র ধঙ্গদেব। সমস্ত প্রাচ্যভারত কিছুদিনের জন্য চন্দেল্লাধিকারভুক্ত হইয়াছিল। রাষ্ট্রকূট-আক্রমণ ও ২য় বিগ্রহপালের ভয়ে শূরবংশ অটবীসমাচ্ছন্ন অপরমন্দার আশ্রয় করিয়াছিলেন। এদিকে রাঢ়দেশে সমরে পরাজিত হইয়া হয়ত বিগ্রহপাল ধঙ্গদেবের হস্তে বন্দী হইয়াছিলেন এবং হয়ত কিছুদিনের জন্য তাঁহাকে সস্ত্রীক চন্দেল্ল-কারাগারে বাস করিতে হইয়াছিল।[৮৮]

(৮৭) কাহারও মতে এই স্থান পূর্ব্বকালে 'স্তম্ভতীর্থ' নামে পরিচিত ছিল, তাহাই প্রাকৃতভাবে 'খম্বাৎ' নামে পরিচিত হয়, তাহাই আবার 'কাম্বে' নামে পরিচিত হইয়াছিল, কিন্তু কোনও প্রাচীন মহাপুরাণে "স্তম্ভতীর্থের" নাম নাই, অথচ অতি পূর্ব্ব হইতেই এই স্থানের "কাম্বোজ"ও "কম্বায়" নাম পাইতেছি। স্তম্ভতীর্থ কাম্বোজ নাম হইবার পরে হইয়াছে সন্দেহ নাই।

(৮৮) Epigraphia Indica, Vol. I. p. 145.

সেই দুর্দ্দিনের সময় ২য় বিগ্রহপালের পুত্র ১ম মহীপাল পিতৃপদে অভিষিক্ত হইলেন; বিলাসপুর নামক স্থানে তাঁহার রাজধানী প্রতিষ্ঠিত হইল। পিতৃ-সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইয়া তাঁহার প্রথম ও প্রধান লক্ষ্য ছিল—কাম্বোজবংশের হস্ত হইতে গৌড়শাসন উদ্ধার। অল্প দিনমধ্যেই তাঁহার বাসনা ফলবতী হইয়াছিল। যে বাণগড়ে কাম্বোজবংশ আধিপত্য করিতেছিলেন, মহীপাল সেই কোটীবর্ষবিষয় (বর্ত্তমান দিনাজপুর জেলা) অধিকার করিয়া সেই বাণগড়ের নিকটেই গোকলিকামণ্ডলান্তর্গত কুরটপল্লিকাগ্রাম পরাশর পৌত্র ভট্টপুত্র কৃষ্ণাদিত্যশর্ম্মাকে বিষুবসংক্রান্তির শুভদিনে দান করিয়াছিলেন, সেই দানপত্রই ১ম মহীপালের বাণগড়লিপি নামে পরিচিত। এই তাম্রশাসন হইতেই আমরা জানিতে পারি,—'শ্রীমহীপালদেব যুদ্ধস্থলে বাহুদর্পে সকল বিপক্ষপক্ষ নিহত করিয়া অনধিকৃত-বিলুপ্ত পিতৃরাজ্যের উদ্ধারপূর্ব্বক ভূপালগণের মস্তকে পদকমল স্থাপিত করিয়া অবনিপাল হইয়াছিলেন।'[৮৯]

১ম মহীপাল

উক্ত তাম্রশাসনে 'অনধিকৃত-বিলুপ্ত' প্রয়োগ থাকায় জানা যাইতেছে যে, অনধিকারীর হস্তে পালাধিকার লুপ্ত হইয়াছিল। সম্ভবতঃ রাষ্ট্রকূটসম্রাট্ ৩য় ইন্দ্র তাঁহার কাম্বোজসামন্তকে গৌড়রাজ্যের শাসনশৃঙ্খলা-স্থাপনের জন্য রাখিয়া গিয়াছিলেন, তাঁহার পরমাত্মীয় গৌড়পতির অধিকারলোপের ইচ্ছা ছিল না, কিন্তু রাষ্ট্রকূটনৃপতির নিজ রাজধানী সুদূর মান্যখেটে প্রস্থানের পর সেই কাম্বোজসামন্ত স্থানীয় সামন্তগণের সহিত ষড়যন্ত্র করিয়া গৌড়মণ্ডল অধিকার করেন, তাই অনধিকারীর হস্তে পালাধিকারলোপের সন্ধান পাইতেছি। মহীপালের অভ্যুদয়কালে যে গৌড়বঙ্গ নানা খণ্ডরাজ্যে বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছিল, কাঞ্চীপতি রাজেন্দ্র-চোলের তামিলভাষায় উৎকীর্ণ তিরুমলয় গিরিলিপি হইতে তাহার স্পষ্ট আভাস পাইয়াছি। রাজেন্দ্রচোল ১০২০ হইতে ১০২৪ খৃষ্টাব্দের মধ্যে গৌড়বঙ্গ আক্রমণ করেন, এ সময়ে উত্তর-রাঢ়ে মহীপাল, দক্ষিণরাঢ়ে রণশূর, দন্তভুক্তিতে[৯০] ধর্ম্মপাল এবং বঙ্গালদেশে গোবিন্দচন্দ্র রাজত্ব

(৮৯) "হতসকলবিপক্ষঃ সঙ্গরে বাহুদর্পাদনধিকৃতবিলুপ্তং রাজ্যমাসাদ্য পিত্র্যং।
নিহিতচরণপদ্মো ভূভৃতাং মূর্দ্ধ্নি, তস্মাদভবদবনিপালঃ শ্রীমহীপালদেবঃ॥"
(১ম মহীপালের বাণগড়লিপি ১২শ শ্লোক)

(৯০) মূলে 'তণ্ড' আছে, পাঠোদ্ধারকারী হল্‌ৎস্ সাহেব 'দণ্ড' অনুবাদ করিয়াছেন, কিন্তু এখানে 'দন্ত' অনুবাদ করিলেই যেন ঠিক হয়। মূলে ওড্ডবিষয় বা উড়িষ্যা ও কোশলনাড়্ বা দক্ষিণ কোশলের (সম্বলপুর ও উড়িষ্যার গড়জাত) পরই দণ্ডভুক্তি, তৎপরে যথাক্রমে তক্কণলাড়ম্ বা দক্ষিণরাঢ়, বঙ্গালদেশ ও শেষে উত্তিরলাড়ম্ বা উত্তররাঢ়ের উল্লেখ আছে। রাজেন্দ্রচোল দক্ষিণ হইতে উত্তরে আসিয়াছিলেন। উড়িষ্যা ও উড়িষ্যার গড়জাত হইয়া তাঁহাকে মেদিনীপুরে আসিতে হইয়াছিল। মেদিনীপুর জেলায় দাতন বা দাঁতনগড় নামে এক অতি প্রাচীন স্থান আছে, ঐ স্থানই সম্ভবতঃ প্রাচীন দন্তভুক্তির রাজধানী দন্তপুরীর স্মৃতিরক্ষা করিতেছে। মগধের অন্তর্গত বিহার উদন্তপুর ও উদ্দণ্ডপুর নামে পরিচিত ছিল। এক সময় দণ্ডভুক্তি পাঠ স্বীকার করিয়া আমরা দণ্ডভুক্তি ও উদ্দণ্ডপুর অভিন্ন মনে করিয়াছিলাম। কিন্তু এখন দেখিতেছি যে, উদন্তপুরের সহিত দন্তভুক্তির কোন

করিতেছিলেন।[৩১] উক্ত তিরুমলয়লিপি হইতে জানা যায় যে, রাজেন্দ্রচোলের আক্রমণকালে সাগরকূলবর্ত্তী সঙ্গকোট্ট বা সঙ্ঘকোটে মহীপালের একটী রাজধানী ছিল।[৩২] এতদ্বারা মনে হয় যে, তৎকালে সাগরকূল পর্য্যন্ত মহীপালের শাসনাধীন হইয়াছিল। উক্ত তিরুমলয়লিপি ব্যতীত আমরা দিগ্বিজয়প্রকাশ হইতেও দক্ষিণবঙ্গে নানা খণ্ড-রাজ্যের সন্ধান পাই। 'তৎকালে ভাগীরথীর পশ্চিমতটে কুলপাল ও দেশপাল নামে দুইজন নরপতি ছিলেন। কুলপালের পুত্র হরিপাল ও অহিপাল। হরিপাল সিঙ্গুরের পশ্চিমে নিজনামে হট্টবাপিসমন্বিত একটী মহাগ্রাম স্থাপন করিয়া তথায় তন্তুরায় ও শাকলব্রাহ্মণদিগের রাজা হন। অহিপাল মাহেশ হইতে ত্রিবেণীর নিকট চক্রদ্বীপ অঞ্চলে কিছুদিন রাজ্য করেন। বৈশ্যজাতীয়া পত্নীগণের গর্ভে অহিপালের কৃতধ্বজ, বিভাণ্ড ও কেশিধ্বজ নামে তিন পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। কৃতধ্বজ সপ্তগ্রামে রাজা হন এবং বৈশ্য-জাতিকে পালন করিতে থাকেন। তৎপুত্র বিরল সুগন্ধাগ্রামে আসিয়া বাস করেন। বিভাণ্ড পূর্ব্বপারে বাণরাজার মন্ত্রী হইয়াছিলেন। তাঁহার বংশধরগণ জগদ্দল অঞ্চলে থাকিতেন। কেশিধ্বজ চান্দোলে রাজত্ব করিতেন এবং নানাস্থান হইতে কায়স্থ আনাইয়া এখানে স্থাপন করিয়াছিলেন'।[৩৩]

রাঢ়ে ক্ষুদ্র সামন্ত-রাজ্য

দিগ্বিজয়প্রকাশের উক্ত বিবরণ ঐতিহাসিকের নিকট কতটা বিশ্বাসযোগ্য, তাহা বলিতে পারি না, তবে মহীপালের পূর্ব্বেও অভ্যুদয়কালে যে রাঢ়দেশ নানা ক্ষুদ্ররাজ্যে বিভক্ত ছিল, উক্ত বিবরণ হইতে তাহার আভাস পাইতেছি।

মহীপাল নানা বাধাবিপত্তির মধ্যে পৈতৃকরাজ্য উদ্ধারে সমর্থ হইয়াছিলেন। প্রথমতঃ চন্দেল্লপতি ধঙ্গদেব যখন রাঢ় আক্রমণ করিয়া ফিরিয়া যান, সেই সময় মহীপাল দলবল সংগ্রহ করিয়া প্রথমতঃ উত্তররাঢ় উদ্ধার করেন। মুর্শিদাবাদ জেলায় গয়সাবাদের নিকট 'মহীপাল' নামে স্তূপসমাচ্ছন্ন ও ধ্বস্তকীর্ত্তিনির্দ্দেশক একটী প্রাচীন গ্রাম রহিয়াছে, সম্ভবতঃ এই স্থানেই প্রথমতঃ তাঁহার রাজধানী প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। এখানকার সাগরদীঘীও মহীপালের কীর্ত্তি। এইজন্যই বোধ হয় রাজেন্দ্রচোলের তিরুমলয়-গিরিলিপিতে মহীপাল উত্তররাঢ়ের অধিপতি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন। এখান হইতেই তিনি গৌড় উদ্ধারের আয়োজন করেন। প্রায় ৯৮০ হইতে ৯৯০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে কাম্বোজদলন করিয়া তিনি সমস্ত উত্তরবঙ্গ উদ্ধারে সমর্থ হন।

সম্বন্ধ নাই। তিরুমলয়লিপি আলোচনা করিলে মনে হইবে যে, রাজেন্দ্রচোল উত্তররাঢ়ে গঙ্গাতীর পর্য্যন্ত গিয়াছিলেন, গঙ্গার অপর পারে যান নাই।

হল্‌চজ্ সাহেব তক্কণলাড়ম্ ও উত্তিরলাড়ম্‌কে গুজরাতের দক্ষিণলাট ও উত্তরলাট বলিয়া স্থির করিয়াছেন, কিন্তু আমরা ২৩ বর্ষ পূর্ব্বে তাঁহার ভ্রম সংশোধন করিয়া দেখাইয়াছি যে, ঐ দুই জনপদ আমাদের দক্ষিণরাঢ় ও উত্তররাঢ়। [বিশ্বকোষ ৫ম ভাগ, গৌড়শব্দ ৩১১ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।]

(৩১) ১৪২-১৪৩ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

(৩২) Dr. E. Hultzsch's South Indian Inscriptions, Vol. I. p. 99.

(৩৩) দিগ্বিজয়প্রকাশ সঙ্কলন বিবরণ।

দিনাজপুর জেলার সুবৃহৎ মহীপালদীঘী, ও মহীসন্তোষ এবং বগুড়া জেলার মহীপুর গ্রাম এখনও মহীপালের উত্তরবঙ্গ অধিকারের স্মৃতিরক্ষা করিতেছে। কেবল গৌড় বা উত্তরবঙ্গ অধিকার করিয়াই মহীপাল নিশ্চিন্ত ছিলেন না। অল্প দিনমধ্যেই তিনি পশ্চিমে মগধ বারাণসী পর্য্যন্ত এবং উত্তরে মিথিলা পর্য্যন্ত উদ্ধার করিয়াছিলেন। নালন্দা হইতে তাঁহার ১১শ রাজ্যাঙ্কযুক্ত বালাদিত্যলিপি[১৪], বারাণসীর পার্শ্ববর্ত্তী সাবনাথ হইতে তাঁহার ১০৮৩ সংবৎ (১০২৬ খৃষ্টাব্দে) উৎকীর্ণ শিলালিপি[১৫] এবং মিথিলা হইতে তাঁহার ৪৮শ রাজ্যাঙ্কযুক্ত এক-খানি পিত্তলের মূর্ত্তি[১৬] আবিষ্কৃত হইয়াছে। তিরুমলয়গিরিলিপিতে রাজেন্দ্রচোলের আক্রমণ-কালে মহীপালদেবের পলায়নকথা বিবৃত হইয়াছে, কিন্তু আমরা মনে করি যে সময়ে রাজেন্দ্র-চোল উত্তররাঢ় আক্রমণ করেন, তৎকালে মহীপাল সুদূর উত্তরপশ্চিমাঞ্চলে যুদ্ধবিগ্রহে ব্যস্ত ছিলেন। তাঁহার প্রতিনিধি বা সামন্তগণ দিগ্বিজয়ী চোলরাজের আক্রমণ রোধ করিতে সমর্থ হন নাই, তাই নারায়ণপালের পলায়নসংবাদ ঘোষিত হইয়াছে। বাস্তবিক মহীপালদেব দূরদেশে অবস্থানকালে রাজেন্দ্রচোলের রাঢ়াক্রমণসংবাদ পাইয়া কখনই নিশ্চেষ্ট ছিলেন না। তিনি অবিলম্বে সদলবলে গৌড়ে ফিরিয়া আসিয়াছিলেন এবং তাঁহার পরাক্রম ও শক্তির পরি-চয় পাইয়া চোলরাজ গঙ্গাপার হইতে আর সাহসী হন নাই, উত্তররাঢ় হইতেই তাঁহাকে ফিরিয়া আসিতে হয়।

মহীপালদেবের অভ্যুদয়কালে সুলতান মামুদ ভারত আক্রমণ করেন। পঞ্চনদ, কাশ্মীর, কালঞ্জর প্রভৃতি উত্তরাপথের প্রধান প্রধান প্রায় সকল-নৃপতিই মিলিত হইয়া মুসলমান আক্র-মণ নিবারণের যথেষ্ট আয়োজন করেন। গৌড়াধিপ মহীপাল তাঁহাদের সহিত যোগদান করিতে পারেন নাই। মহীপালের এই অমনোযোগ লক্ষ্য করিয়া কোন কোন ঐতিহাসিক লিখিয়াছেন,—

"মামুদের আক্রমণ সম্বন্ধে গৌড়াধিপ মহীপালের ঔদাসীন্যের আলোচনা করিলে মনে হয়, কলিঙ্গজয়ের পর, মৌর্য্য-অশোকের ন্যায় [কাম্বোজান্বয়জ গৌড়পতির কবল হইতে] বরেন্দ্র উদ্ধার করিয়া, মহীপালেরও বৈরাগ্য উপস্থিত হইয়াছিল এবং অশোকের ন্যায় মহীপালও যুদ্ধবিগ্রহ পরিত্যাগ করিয়া, পরহিতকর এবং পারত্রিক কল্যাণকর কর্ম্মানুষ্ঠানে জীবন উৎসর্গ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছিলেন।" "সুলতানমামুদের অভিযাননিচয় সম্বন্ধে গৌড়াধিপ মহী-পালের এই প্রকার ঔদাসীন্য উত্তরাপথের সর্ব্বনাশের অন্যতম কারণ। যদি মহীপাল গৌড়-রাষ্ট্রের সেনাবল লইয়া সাহি-জয়পাল, আনন্দপাল, বা ত্রিলোচনপালের সাহায্যার্থ অগ্রসর হইতেন, তবে হয়ত ভারতবর্ষের ইতিহাস স্বতন্ত্র আকার ধারণ করিত।"[১৭]

(১৪) Journal Proc, A. S. B. Vol. IV. (New Series) p. 109-107.
(১৫) Indian Antiquary, Vol, XIV. p. 167 ; Arch. Sur. Reports, 1903-4, p. 222.
(১৬) বিশ্বকোষ, ১১শ ভাগ, ৩১৫ পৃষ্ঠা।
(১৭) গৌড়রাজমালা ৪১ ও ৪০ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

কিন্তু আমরা এরূপ মনে করি না। বাস্তবিক তখন মহীপালের বৈরাগ্যের উপযুক্ত কাল উপস্থিত হয় নাই। তখনও রাজেন্দ্রচোল রাঢ়দেশে পদার্পণ করেন নাই, তখনও মহীপাল আপন পৈতৃকসম্পদ্ উদ্ধারে ব্রতী ছিলেন, তখনও তিনি নানাবিধ উপায়ে নিজের গৌড়রাজ্য রক্ষায় মনোযোগী ছিলেন, বিশেষতঃ যে কালঞ্জরপতি তাঁহার পিতামাতাকে বন্দী করিয়া লইয়া গিয়াছিলেন, তাঁহার সহিত মিত্রতা ও একতা স্থাপন করিয়া বৈদেশিক শত্রুর আক্রমণ হইতে উত্তরাপথ রক্ষা করিতে যাওয়া কখনই তিনি উপযুক্ত মনে করেন নাই। বরং সুলতান মামুদের আক্রমণের পর যখন কান্যকুব্জের প্রতিহাররাজ ও কালঞ্জরের চন্দেল্লরাজ হীনবল হইয়া পড়িয়াছিলেন, সেই সুযোগে তিনিও আপনার অধিকারবিস্তারে মনোযোগী হইয়াছিলেন, সন্দেহ নাই। প্রায় ১০১৮ খৃষ্টাব্দে সুলতানমামুদ মথুরা ও কান্যকুব্জের সুবিশাল দেবকীর্ত্তি ধ্বংস করিয়া ফিরিবার পরই মহীপাল বারাণসী প্রদেশ অধিকার করেন। এ সময়ে কনোজাধিকারেরও কতকটা তাঁহার অধিকারভুক্ত হওয়া অসম্ভব নহে। তিনি ঐ সকল স্থানে কেবল আধিপত্যবিস্তার করিয়া ক্ষান্ত ছিলেন না। তিনি যে যে স্থান অধিকার করিয়াছিলেন, সেই সেই স্থানের লুপ্ত বা জীর্ণ কীর্ত্তিসমূহ উদ্ধারেও বিশেষ মনোযোগী ছিলেন। তাঁহার সারনাথলিপিতে স্পষ্ট লিখিত আছে, 'শ্রীবামরাশি নামক গুরুদেবের পাদপদ্ম আরাধনা করিয়া গৌড়াধিপ মহীপাল যে দুইজনদ্বারা ঈশান চিত্রঘণ্টাদির শত শত কীর্ত্তিরত্ন কাশীধামে নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। বোধিমার্গ হইতে যাঁহারা কখন প্রতিনিবৃত্ত হন নাই, সেই অনুজ শ্রীমান্ স্থিরপাল ও শ্রীমান্ বসন্তপাল ধর্ম্মরাজির ও সাঙ্গধর্ম্মচক্রের জীর্ণ সংস্কার এবং অষ্টমহাস্থান-শৈলগন্ধকুটী নূতন করিয়া নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন।'[১৮]

উক্ত শিলালিপিতে স্থিরপাল ও বসন্তপালের যে সামান্য পরিচয় পাইতেছি, তাহাতে মনে হয় যে, উক্ত উভয় ভ্রাতাই মহীপালদেবের অনুজ ছিলেন। তাঁহারা সাধনপথ আশ্রয় করিয়া সম্বোধিলাভের আশায় আর গার্হস্থ্যধর্ম্ম গ্রহণ করেন নাই। এই জন্যই লিপিরচয়িতা লিখিয়াছেন যে, তাঁহাদের পাণ্ডিত্য 'সফলীকৃত' হইয়াছিল। বাঙ্গালী রাজকুমারদ্বয়ের চিরপ্রব্রজ্যা অবশ্য প্রশংসার্হ ও গৌরবজনক সন্দেহ নাই। তবে পালবংশে এ প্রথা বিরল নহে, পূর্ব্বেই তাহার আভাস দিয়াছি এবং পরেও পরিচয় পাওয়া যাইবে।

(১৮) "বারাণসীসরস্যাং গুরব শ্রীবামরাশিপাদাব্জং।
আরাধ্য নমিতভূপতি-শিরোরুহৈঃ শৈবলাধীশং ॥
ঈশানচিত্রঘণ্টাদিকীর্ত্তিরত্নশতানি যৌ।
গৌড়াধিপো মহীপালঃ কাশ্যাং শ্রীমানকারয়ৎ ॥
সফলীকৃতপাণ্ডিত্যৌ বোধাববিনিবর্ত্তিনৌ।
তৌ ধর্ম্মরাজিকাঃ সাঙ্গং ধর্ম্মচক্রং পুনর্নবং ॥
কৃতবন্তৌ চ নবীনামষ্টমহাস্থানশৈলগন্ধকুটীং।
এতাং শ্রীস্থিরপালো বসন্তপালোঽনুজঃ শ্রীমান্ ॥" (১ম মহীপালের সারনাথলিপি।)

তারিখ-ই-বাইহকী নামক মুসলমান ইতিহাস হইতে জানা যায় যে (মহীপালদেবের অধিকার কালেই) সুলতান মামুদের পুত্র মসুদের রাজত্বকালে (১০৩৩ খৃষ্টাব্দে) লাহোরের শাসনকর্ত্তা আহম্মদ নিয়ালতিগীন্ আসিয়া কাশী লুট করেন। তিনি সঙ্গে মুসলমান লস্কর আনিয়াছিলেন। লস্করেরা প্রাতঃকালে পঁহছিয়া দ্বিতীয় নমাজের বা মধ্যাহ্নের পরেই বিপদের আশঙ্কা করিয়া লুট-তরাজ করিয়া যায়। কাপড়ের বাজার, আতর-গোলাপের বাজার ও মণি-মুক্তার বাজার লুণ্ঠিত হইয়াছিল। এই অল্প সময় মধ্যেই মুসলমান সেনাগণ আশাতিরিক্ত সোণা, রূপা, আতর ও মণি-মুক্তা পাইয়াছিল।[৯৯] গৌড়সৈন্য আসিয়া পড়ায় তাহারা পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিতে বাধ্য হইয়াছিল। এইরূপে মুসলমানগণের হস্ত হইতে বারাণসীধাম রক্ষা করিয়া মহীপাল সর্ব্বত্র গৌরবাস্পদ হইয়াছিলেন। সম্ভবতঃ তাঁহার উদীয়মান শক্তির পরিচয় পাইয়া সুলতান মামুদও বারাণসী অধিকারে সাহসী হন নাই।

আর্য্যক্ষেমীশ্বররচিত চণ্ডকৌশিক নাটকে গৌড়াধিপ মহীপাল চন্দ্রগুপ্ত-স্বরূপ এবং কর্ণাটকগণ নবনন্দের তুল্য বলিয়া বিবৃত হইয়াছে।[১০০] চণ্ডকৌশিকের এই ইঙ্গিত হইতে বেশ মনে হইতেছে যে, কাম্বোজদিগের ন্যায় কর্ণাটকেরাও গৌড়াধিকার কতকটা গ্রাস করিয়াছিল এবং তাহাদিগকে যুদ্ধে বিনাশ করিয়া মহীপাল রাজ্যবিস্তারে সফলকাম হইয়াছিলেন। এই কর্ণাটকগণকে কেহ কেহ কাঞ্চীপতি রাজেন্দ্রচোলের সমভিব্যাহারী দাক্ষিণাত্যবীরগণ বলিয়া মনে করেন। কিন্তু আমরা এরূপ মনে করি না। দিনাজপুরলিপিতে যে বংশ 'কাম্বোজান্বয়' বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন, অথবা কর্ণাটের অধিপতি রাষ্ট্রকূটপতি যে সকল কর্ণাট সামন্তকে গৌড়ের শাসনশৃঙ্খলা স্থাপনের জন্য এখানে রাখিয়া গিয়াছিলেন, যাঁহারা রক্ষক হইয়া পরে ভক্ষক হইয়াছিলেন, তাঁহারাই সমসাময়িক চণ্ডকৌশিক-নাটকে নন্দানুরূপ 'কর্ণাটক' বলিয়াই পরিচিত হইয়া থাকিবেন। সম্ভবতঃ এই সময়েই কর্ণাটকদিগের মধ্যে কেহ কেহ মিথিলার উত্তরে পার্ব্বত্যপ্রদেশে গিয়া আশ্রয় লইয়াছিলেন। সম্ভবতঃ কর্ণাটকদিগের হস্ত হইতে মহীপাল মিথিলারাজ্য উদ্ধার করিয়াছিলেন। মজঃফরপুর জেলাস্থ ইমাদপুর গ্রাম হইতে মহীপালদেবের ৪৮শ রাজ্যাঙ্কে প্রতিষ্ঠিত একটী ধাতবপ্রতিমা আবিষ্কৃত হইয়াছে।[১০১] এরূপস্থলে মহীপালদেবের রাজ্যাবসানকাল পর্য্যন্ত মিথিলা তাঁহার সাম্রাজ্যভুক্ত ছিল বলিয়া মনে হয়।

কেবল বারাণসী বলিয়া নহে, তাঁহার অভ্যুদয়কালে বোধগয়া[১০২] ও নালন্দা[১০৩] প্রভৃতি

(৯৯) Elliot's Muhammadan Historians of India, Vol. II. pp. 123-24.

(১০০) মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় ১৩৩১ খৃষ্টাব্দের সময়ের নকল একখানা চণ্ডকৌশিক নাটক হইতে উক্ত ঐতিহাসিক তথ্যটী সর্ব্বপ্রথম বাহির করিয়াছেন। (Journal Asiatic Society of Bengal, 1893, p. 250.)

(১০১) Indian Antiquary, Vol. XIV, p. 165.

(১০২) Cunninghams' Arch. Surv. Rept. Vol. III, p. 122. plate XXXVII. no 5.

(১০৩) J. A. S. B. (New Series) Vol. IV. p. 126 ff.

স্থানেও গন্ধকুটী, মহাবিহার, বুদ্ধপ্রতিমপ্রতিষ্ঠা বা জীর্ণোদ্ধার কার্য্য চলিতেছিল। এই সময়ে বৌদ্ধধর্ম্মও নবীনসাজে ও নব অনুরাগে গৌড়বঙ্গবাসীর হৃদয় অধিকার করিতেছিল। এ সময় গৌড়বঙ্গবাসী বাহুবল পরীক্ষার সহিত বৌদ্ধশাস্ত্রচর্চ্চায়ও যে বিশেষ মনোযোগী হইয়াছিলেন, নেপাল হইতে আবিষ্কৃত মহীপালদেবের রাজ্যাঙ্কে অভিলিখিত বহুতর বৌদ্ধশাস্ত্রগ্রন্থ হইতে তাহা প্রমাণিত হইয়াছে।[১০৪] মহীপালই অতীশকে বিক্রমশিলায় আহ্বান ও প্রধান আচার্য্যপদ প্রদান করেন। রাজ্যাবসানকালে বা অব্যবহিত পরে রামাই পণ্ডিত ও লাউসেনের অভ্যুদয় এবং তাঁহাদেরই যত্নে সাধারণের উপযোগী বৌদ্ধধর্ম্মেরই একাঙ্গ ধর্ম্মপূজাপদ্ধতি প্রচারিত হয়।

আধুনিক কোন কোন ঐতিহাসিক ধর্ম্মপূজার নায়ক লাউসেনের অস্তিত্বেই সন্দিহান। যে সকল ধর্ম্মমঙ্গলে লাউসেনের বিবরণ বর্ণিত আছে, সে গুলির ঐতিহাসিকতা তাঁহারা এককালেই বিশ্বাস করিতে পরাঙ্মুখ। লাউসেনের প্রাচীন আখ্যায়িকা নানা কবির হস্তে

লাউসেন

তাঁহার বহু পরবর্ত্তীকালে নানা বিকৃতি ঘটিলেও লাউসেনের কথা এককালে উড়াইয়া দেওয়া যায় না। ধর্ম্মপূজার বহু প্রাচীন গ্রন্থে 'লবসেন' নাম পাইয়াছি। এই লবসেন ও লাউসেন অভিন্ন ব্যক্তি। বাঙ্গালীর পঞ্জিকাসমূহে বহুকাল হইতে রাজচক্রবর্ত্তীদিগের মধ্যে লাউসেনের নাম চলিয়া আসিতেছে। লাউসেন রাজচক্রবর্ত্তী হউন বা না হউন, এক সময়ে তিনি এদেশে এমন কিছু কাজ করিয়াছিলেন, যাহাতে তিনি রাজচক্রবর্ত্তীদিগের সমকক্ষ বলিয়া প্রাচীন পঞ্জিকাকারদিগের নিকট পরিচিত হইয়াছিলেন। এদেশের বর্ষপঞ্জিকা লিখিবার ভার অতি পূর্ব্বকাল হইতেই শাকদ্বীপী বা দৈবজ্ঞ ব্রাহ্মণদিগের হস্তেই ন্যস্ত। পালবংশের অভ্যুদয়-প্রসঙ্গে প্রথমেই লিখিয়াছি যে, শাকদ্বীপী ব্রাহ্মণেরাই পালাধিকারে সর্ব্বেসর্ব্বা ছিলেন। এই শাকদ্বীপী গ্রহবিপ্রগণই এক সময়ে ধর্ম্মপূজার পাণ্ডা ছিলেন। পালবংশের প্রভাবলোপ ও ধর্ম্মপণ্ডিত নামক স্বতন্ত্র ধর্ম্মপূজক সম্প্রদায়ের বিস্তৃতির সহিত গ্রহবিপ্রগণ ধর্ম্মপূজা ছাড়িয়া দেন, তথাপি এককালে তাঁহাদের মধ্য হইতে এই প্রথা লুপ্ত হইয়াছিল বলিয়া মনে হয় না। গ্রহবিপ্রগণের মধ্যে যাঁহারা ধর্ম্মপূজা করিতেন তাঁহাদিগকে কটাক্ষ করিয়াই ময়নাপুরের যাত্রাসিদ্ধির পদ্ধতিতে লিখিত হইয়াছে—

"অন্য জাতি পণ্ডিত হবে ধর্ম্ম মানে নাই।
গ্রহকাজে রত হয় ফেটে মরে তাই॥"[১০৫]

ধর্ম্মপূজাপদ্ধতির উদ্ধৃত বচন হইতে মনে হয় যে গ্রহবিপ্রগণের মধ্যেই সর্ব্বাগ্রে ধর্ম্মপূজা

(১০৪) Bendall's Catalogue of Buddhist Sanskirt Mss. in the Cambridge University Library, p. 101, and Proc. A. S. Bengal, 1899, p. 69,

(১০৫) মৎসম্পাদিত শূন্যপুরাণ ১/০ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

একচেটিয়া ছিল, যখন অপরে ধর্ম্মপণ্ডিত হইতে লাগিল, তখন তাঁহারা বিদ্বিষ্ট হইয়াছিলেন, সন্দেহ নাই।

যাহা হউক, গ্রহবিপ্রগণ ধর্ম্মপূজক ছিলেন বলিয়াই ধর্ম্মপূজার নায়ক লাউসেনের নাম বরাবর বাঙ্গালার পত্রিকাসমূহে স্থানলাভ করিয়াছে। বাস্তবিক সৌর-ব্রাহ্মণ ময়ূরভট্টই সর্ব্বপ্রথম লাউসেনের চরিতাখ্যানযুক্ত ধর্ম্মমঙ্গল রচনা করেন। কায়স্থ সীতারামদাসের ধর্ম্মমঙ্গলে স্পষ্টই লিখিত হইয়াছে যে তাঁহার সময়ে (খৃষ্টীয় ১৫শ শতাব্দে) ময়ূরভট্টের ধর্ম্মমঙ্গল প্রায় লুপ্ত হইয়া আসিয়াছিল।[১০৩] এরূপস্থলে প্রায় খৃষ্টীয় ১২শ বা ১৩শ শতাব্দীতে ময়ূরভট্টের গ্রন্থ রচিত হইয়া থাকিবে এবং তখনও পর্য্যন্ত সৌর বা শাকদ্বীপী ব্রাহ্মণদিগের মধ্যেই লাউসেনের চরিতাখ্যান আদৃত ছিল, মনে হইতেছে।

রূপরাম ও সীতারামদাসের ধর্ম্মমঙ্গল হইতে জানা যায় যে, ধর্ম্মপালের রাজত্বকালে তাঁহার মহাসামন্তরূপে কর্ণসেন সেনভূম ও গোপভূম অঞ্চলে রাজত্ব করিতেন। সোম ঘোষের বেটা ইছাই ঘোষ কালিকাদেবীর বরে শক্তিশালী হইয়া কর্ণসেনের ছয় পুত্রকে বিনাশ ও কর্ণসেনকে পরাজয় করিয়া সেনভূম ও গোপভূম অধিকার করেন। পুত্রশোকে কর্ণসেনের রাণী বিষপান করিয়া প্রাণত্যাগ করেন। কর্ণসেন প্রাণভয়ে ধর্ম্মপালের আশ্রয় লইতে বাধ্য হন। ধর্ম্মপালের শ্যালিকা রঞ্জাবতী এ সময়ে বিবাহযোগ্যা ছিলেন। ধর্ম্মপাল তাঁহারই সহিত কর্ণসেনের বিবাহ দিয়া তাঁহাকে কতকটা সান্ত্বনা করিলেন। ধর্ম্মপাল একজন কৃষ্ণভক্ত ও ব্রাহ্মণভক্ত ছিলেন, তিনি প্রতিদিন ভারত-পুরাণ শুনিতেন ও ব্রাহ্মণভোজন করাইয়া তবে জলগ্রহণ করিতেন। তাঁহার মহিষী রঞ্জাবতীর বড় ভগিনী সাফুলার সেরূপ মতিগতি ছিল না। এই কারণে রাজা বিরক্ত হইয়া তাঁহাকে নির্ব্বাসিত করেন। ঘটনাক্রমে সমুদ্রতীরে তাঁহার গর্ভে এক পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। (সম্ভবতঃ তাহা হইতেই ধর্ম্মপালপুত্র সমুদ্রের ঔরসজাত বলিয়া প্রবাদ প্রচলিত হইয়া থাকিবে।)

যে সময়ে উত্তররাঢ় ও বরেন্দ্রে মহীপাল সৌভাগ্যার্জ্জনে ব্যস্ত ছিলেন, সেই সময়ে তাঁহারই

২য় ধর্ম্মপাল

কোন আত্মীয় ২য় ধর্ম্মপালও পূর্ব্ববঙ্গে আধিপত্য বিস্তারে মনোযোগী ছিলেন। এখনও রঙ্গপুর অঞ্চলে 'ধর্ম্মপালের গড়' ও ডিমলা থানায় "ধর্ম্মপুর" তাঁহার উত্তর-পূর্ব্ববঙ্গে প্রভাব বিস্তারের স্মৃতিরক্ষা করিতেছে। কবিবর চতুর্ভুজের হরিচরিতকাব্যে লিখিত আছে—

'বরেন্দ্রীতে করঞ্জ নামে এক শ্রেষ্ঠ গ্রাম আছে, এখানে শ্রুতি-স্মৃতি-পুরাণ-প্রবীণ ও সচ্ছাস্ত্র-কাব্যকুশল ব্রাহ্মণগণ বাস করিতেন। তাঁহাদের মধ্যে প্রজাপতি ব্রহ্মার ন্যায় গুণসম্পন্ন ও সফলকাম স্বর্ণরেখ নামে এক বিপ্রবর অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। তিনিই সেই (করঞ্জ নামক)

(১০৩) অল্পদিন হইল ময়ূরভট্টের খণ্ডিত পুথি আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহা হইতে ময়ূরভট্টের সামান্য পরিচয় পাওয়া গিয়াছে।

অগ্রগণ্য সমগ্র গ্রামখানি শাসনস্বরূপ ধর্ম্মপাল নামক রাজার নিকট হইতে লাভ করিয়াছিলেন।[১০৭] বারেন্দ্র-ব্রাহ্মণসমাজে স্বর্ণরেখের বংশধর মধ্যে অদ্যাপি করঞ্জ গাঞি রহিয়াছে। এই স্বর্ণরেখ কাশ্যপগোত্রের বীজী সুষেণ হইতে ৮ম পুরুষ অধস্তন।[১০৮] সুষেণের পিতা বীতরাগ ৭৩২ খৃষ্টাব্দে আদিশূর জয়ন্তের সভায় আগমন করেন, সুতরাং তাঁহার ৯ম পুরুষ অধস্তন করঞ্জগ্রামগৃহীতা জ্ঞানবৃদ্ধ ও বয়োবৃদ্ধ স্বর্ণরেখ উক্ত সময়ের প্রায় তিন শত বর্ষ পরে বা প্রায় ১০১২ খৃষ্টাব্দে বিদ্যমান ছিলেন, তাহা ধরিয়া লইতে পারি। পূর্ব্বেই লিখিয়াছি যে, কাঞ্চীপতি রাজেন্দ্রচোল প্রায় ১০২৪ খৃষ্টাব্দে রাঢ়দেশ আক্রমণ করেন, এ সময়ে দণ্ডভুক্তি বা মেদিনীপুর জেলায় ২য় ধর্ম্মপাল রাজত্ব করিতেছিলেন এবং রাজেন্দ্রচোলের হস্তেই তিনি নিহত হন। রঙ্গপুর অঞ্চলে প্রবাদ প্রচলিত আছে যে, রঙ্গপুর জেলার ডিমলা থানায় ধর্ম্মপুর নামক স্থানে ধর্ম্মপাল রাজত্ব করিতেন। এখনও সাধারণে সেই ধর্ম্মপালের পুরাকীর্ত্তির ধ্বংসাবশেষ দেখাইয়া থাকে। রাজা মাণিকচন্দ্রের শ্যালী ও রাণী ময়নামতীর ভগিনী বনমালার সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। মাণিকচন্দ্রের মৃত্যুর পর ধর্ম্মপাল তাঁহার রাজ্য দখল করিয়া বসেন। এই মাণিকচন্দ্রের পুত্র গোবিন্দচন্দ্র (সাধারণের নিকট গোপীচাঁদ নামে পরিচিত), গোবিন্দচন্দ্রকে পিতৃ-সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য রাণী ময়নামতী মন্ত্রিগণের সহিত ষড়যন্ত্র করিয়া ধর্ম্মপালের বিরুদ্ধে যুদ্ধঘোষণা করিয়াছিলেন। তিস্তানদীতীরে উভয় পক্ষে ঘোরতর যুদ্ধ হয়। এই যুদ্ধে ধর্ম্মপাল পরাস্ত হইয়াছিলেন। এইরূপে রাণী ময়নামতী পতিরাজ্য উদ্ধার করিয়া প্রিয়পুত্র গোবিন্দচন্দ্রকে অভিষিক্ত করিয়াছিলেন। যে সময় ধর্ম্মপাল উত্তরবঙ্গ অধিকার করিয়া বসিয়াছিলেন, সম্ভবতঃ সেই সময়েই তিনি বারেন্দ্র স্বর্ণরেখকে করঞ্জ গ্রাম দান করিয়া থাকিবেন। রাণী ময়নামতীর নিকট পরাজিত হইয়া সম্ভবতঃ ধর্ম্মপাল মধ্যরাঢ়ের পূর্ব্বাংশে মেদিনীপুর অঞ্চলে আসিয়া আশ্রয় গ্রহণ করেন। সম্ভবতঃ ময়নামতীও সসৈন্যে তাঁহার অনুসরণ করিয়াছিলেন। যে যে স্থলে রাণী কিছুকাল অবস্থান করেন, সেই সেই স্থান অদ্যাপি 'ময়নাপুর' ও 'ময়নাগড়' নামে প্রসিদ্ধ। ২য় ধর্ম্মপাল কৃষ্ণভক্ত বৈষ্ণব, আর ময়নামতী একজন একনিষ্ঠা ধর্ম্মের সেবিকা ছিলেন। ময়নাপুর ও ময়নাগড় এখনও ধর্ম্মপূজার প্রধান পীঠস্থান বলিয়া পরিচিত। বাঁকুড়া জেলায় বিষ্ণুপুর হইতে ১২ মাইল পূর্ব্বে ৮৭° ৩৭´ পূর্ব্ব দ্রাঘিমাংশে এবং ২৩° ১´ উত্তর অক্ষাংশে ময়নাপুর অবস্থিত। এই ময়নাপুরে যাত্রাসিদ্ধি-রায় নামে এক ধর্ম্মঠাকুর আছেন, গৌড়বঙ্গে যত ধর্ম্মঠাকুর আছেন, সর্ব্বাপেক্ষা যাত্রাসিদ্ধি

(১০৭) "গ্রামোত্তমোঽস্ত্যমলমঙ্গুণৈকপুঞ্জঃ শ্রীমান্ করঞ্জ ইতি বন্দ্যতমো বরেন্দ্র্যাম্।
যত্র শ্রুতিস্মৃতিপুরাণপদপ্রবীণাঃ সচ্ছাস্ত্রকাব্যনিপুণা বসন্তি বিপ্রাঃ॥
কীর্ণঃ প্রজাপতিগুণৈঃ পরিপূর্ণকামঃ শ্রীস্বর্ণরেখ ইতি বিপ্রবরোঽবতীর্ণঃ।
তং গ্রামমগ্রগণনীয়গুণং সমগ্রং জগ্রাহ শাসনবরং নৃপধর্ম্মপালাৎ॥" (হরিচরিতকাব্য ১০ম সর্গ)
M. M. Haraprasad Shastri's Nepal Catalogue.

(১০৮) বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস, ব্রাহ্মণকাণ্ড, ২য় অংশ, বারেন্দ্রব্রাহ্মণ-বিবরণ ২০ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

রায়ের সম্মান অধিক, ধর্ম্মপূজাপ্রবর্ত্তক রামাইপণ্ডিতই ইঁহার প্রতিষ্ঠাতা।[১০৯] ধর্ম্মঠাকুরের বর্ত্তমান পুরোহিতগণ রামাইপণ্ডিতের সাক্ষাৎ বংশধর বলিয়া গৌরব করিয়া থাকেন। উক্ত ময়নাপুরের ৩॥০ ক্রোশ উত্তরে দ্বারিকেশ্বর নদীর তীরে (অক্ষা ২৩° ৬´ ৫০´´ উঃ এবং দ্রাঘি০ ৮৭° ৩১´ পূঃ মধ্যে) 'চাঁপাতলার ঘাট' বিদ্যমান। ধর্ম্মমঙ্গলসমূহে এই স্থান 'চাঁপায়ের ঘাট' এবং নারদ-কপিলাদির তপস্যার স্থান মহাপুণ্যতীর্থ 'গুপ্তবারাণসী' বলিয়া পরিচিত।[১১০] স্বচ্ছ-সলিলা দ্বারিকেশ্বরনদী তীরস্থ এই সুপ্রাচীন স্থান হইতেই ধর্ম্মপূজাপদ্ধতি সর্ব্বপ্রথম প্রচারিত

(১০৯) মৎসম্পাদিত শূন্যপুরাণের মুখবন্ধে শূন্যপুরাণের বচন উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছি যে রামাইপণ্ডিত ব্রাহ্মণজাতীয় ছিলেন। (বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ হইতে প্রকাশিত শূন্যপুরাণ, (১৩১৪), ৵০ পৃঃ।) শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় তাহা স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহেন। যে যাত্রাসিদ্ধি রায়ের পদ্ধতিতে তাঁহাকে ব্রাহ্মণ বলা হইয়াছে, সেই পদ্ধতির রচনা সেরূপ প্রাচীন না হওয়ায় সেন মহাশয় বলিতে চান যে অল্প দিন হইতে অনেক নীচজাতি আপনাদিগকে উচ্চ জাতি বলিয়া পরিচিত করিবার চেষ্টা করিতেছে, বিশেষতঃ রামাই পণ্ডিতের বংশধরগণ এক্ষণে ডোমপণ্ডিত বলিয়া পরিচিত। এরূপ স্থলে আধুনিক গল্পের উপর নির্ভর করিয়া ধর্ম্মপূজার প্রধান পাণ্ডা রামাই পণ্ডিতকে কখনই ব্রাহ্মণ বলিয়া স্বীকার করা যায় না। (Bengali Language & Literature, p. 30) কিন্তু মূল শূন্যপুরাণে বহু স্থানে ভনিতায় রামাইপণ্ডিত আপনাকে 'দ্বিজ' বলিয়া পরিচিত করিয়াছেন, সকল স্থান প্রক্ষিপ্ত বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া যায় না। রামাইপণ্ডিতের বংশধরগণ কেহই ডোমপণ্ডিত বলিয়া পরিচয় দেন না, তাঁহারা 'ধর্ম্মপণ্ডিত' বলিয়াই পরিচিত। ধর্ম্মপণ্ডিত ও ডোমপণ্ডিত এক নহে। ধর্ম্মপণ্ডিতেরা কখন শূদ্রের হস্তে, এমন কি, ডোমপণ্ডিতদিগের হস্তেও অন্নাহার করেন না। এরূপ স্থলে ধর্ম্মপণ্ডিত ও ডোমপণ্ডিতকে কখনই এক জাতি বলা চলে না। যে সময়ে পালাধিকারে রামাইপণ্ডিতের অভ্যুদয়, তৎকালে পালরাজ-দরবারে ধর্ম্মনৈতিক অধিকারে শাকদ্বীপী গ্রহবিপ্রগণই সর্ব্বেসর্ব্বা ছিলেন, এইরূপ কোন ব্রাহ্মণবংশে রামাইপণ্ডিতের জন্ম। সামান্য নীচবংশে জন্ম হইলে পালরাজগণের সহিত সম্বন্ধসূত্রে আবদ্ধ সেনভূমের রাজবংশের উপর কখনই তিনি প্রতিপত্তি বিস্তারে সমর্থ হইতেন না। যেরূপে পাল-বংশের অধিকারলোপের সহিত শাকদ্বীপী গ্রহবিপ্রসমাজের পরিণাম ঘটিয়াছে, ধর্ম্মপণ্ডিতদিগেরও সেইরূপ অবস্থান্তর ঘটিয়াছে। গ্রহবিপ্রসমাজে দ্বিজোচিত সংস্কার প্রচলিত থাকায় তাঁহাদের ব্রাহ্মণত্বের কেহ সন্দেহ করিতে পারেন নাই। কিন্তু রামাইপণ্ডিত ব্রাহ্মণের প্রধান চিহ্ন যজ্ঞসূত্র ধারণ না করায় এবং তাঁহার বংশধরগণ সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র সমাজভুক্ত হইয়া পড়ায় উচ্চ হিন্দুগণের চোখে অতি হীনজাতি বলিয়া অবজ্ঞাত হইবে, তাহাতে সন্দেহ কি? রামাইপণ্ডিত ব্রাহ্মণ না হইলে সে সময়ে তাঁহার পদ্ধতি কখনই প্রচলিত হইতে পারিত না এবং ময়ূরভট্ট প্রভৃতি সুপ্রাচীন ব্রাহ্মণকবিগণও তাঁহার ভক্ত হইয়া তাঁহার মাহাত্ম্যপ্রচারে অগ্রসর হইতেন না।

(১১০) "ব্রহ্মদহ রাখি দূরে, ঝুমঝুমি দ্বারিকেশ্বরে,
বেয়ে পাইল চাঁপায়ের ঘাট।
নারদ কপিল তপে, কত কাল ছিল জপে,
মহামুনি দুর্ব্বাসার পাট॥"
... ...
"এই গুপ্তবারাণসী, সুরঙ্গে সলিল আসি,
ভাগীরথী উপনীত হেথা।" (ঘনরামের শ্রীধর্ম্মমঙ্গল)

হইয়াছিল। এই চাঁপাতলা ও পূর্ব্বোক্ত ময়নাপুরের মধ্যেই রামাইপণ্ডিতের সমাধিস্থান ও লাউসেনের অপূর্ব্ব প্রতিষ্ঠাস্থান 'হাকন্দ' গ্রাম অবস্থিত।১১১ এই অঞ্চলে ধর্ম্মপালপত্নী সাফুলা বা সামুলা ধর্ম্মের উদ্দেশে আপন দুই স্তন কাটিয়া ফেলিয়াছিলেন। উক্ত ময়নাপুর হইতে পূর্ব্বে ময়নাগড় পর্য্যন্ত সর্ব্বত্রই লাউসেনের প্রভাবের কথা ও ধর্ম্মপূজার যথেষ্ট প্রচারের সন্ধান পাওয়া যায়। এই সকল ভূভাগ একসময়ে যে ২য় ধর্ম্মপালের অধিকারভুক্ত ছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু তাঁহার সময়ে রামাইপণ্ডিতের অভ্যুদয় হইলেও তৎপ্রবর্ত্তিত অভিনব ধর্ম্ম-পূজাপদ্ধতি তৎকালে প্রচলিত হইয়াছিল বলিয়া মনে হয় না। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ২য় ধর্ম্মপাল নিজে একজন কৃষ্ণভক্ত ছিলেন, তাঁহার মতানুসারে না চলায় তাঁহার মহিষী সাফুলা নির্ব্বাসিত হইয়াছিলেন। কাঞ্চীপতি রাজেন্দ্রচোলের আক্রমণকালে ২য় ধর্ম্মপাল কালগ্রাসে পতিত হইলে তাঁহার অধিকৃত রাজ্যে অরাজকতা উপস্থিত হইয়াছিল। মাণিকগাঙ্গুলির ধর্ম্মমঙ্গলে সময়ের আখ্যায়িকা এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে—

"ধর্ম্মপাল রাজা ম'ল অরাজক দেশ।
পাত্রমিত্র প্রজালোক পায় বড় ক্লেশ॥
পাটহস্তী রাজার আছিল পুরঞ্জন।
পুণ্যযোগ পেয়ে হস্তী প্রবেশিল বন॥
সাফুলার সদনসমীপে দরশন।
গজপৃষ্ঠে গৌড়েশ্বর গউড় গমন॥
আনন্দের সীমা নাই অনুদিন পরে।
উপনীত হ'ল সবে গউড় নগরে॥"

উদ্ধৃত বচন হইতে মনে হয় নির্ব্বাসিতা মহিষীর গর্ভজাত গৌড়েশ্বরের রাজ্যপ্রাপ্তির কোন আশাই ছিল না। সম্ভবতঃ ধর্ম্মভক্ত প্রজাসাধারণের চেষ্টায় এবং তাঁহার মাসী রাণী রঞ্জাবতী বা ময়নামতীর কৌশলে সাফুলার পুত্র গৌড়েশ্বর পিতৃরাজ্য লাভ করিয়াছিলেন। ধর্ম্মমঙ্গলকার তাঁহাকে গৌড়ের রাজধানীতে উপস্থিত ও 'গৌড়েশ্বর' বলিয়া পরিচিত করিলেও তাঁহাকে প্রকৃতপ্রস্তাবে আমরা গৌড়ের অধীশ্বর বলিতে প্রস্তুত নহি। তৎকালে মহীপালদেব গৌড়ের অধীশ্বর ছিলেন। মিথিলাধিপ শিবসিংহ মৈথিল কবিদিগের নিকট যেরূপ 'পঞ্চগৌড়েশ্বর' নামে পরিচিত হইয়াছেন, সেইরূপ পালসম্রাট্‌গণের সহিত জ্ঞাতিত্ব বা আত্মীয়তাসূত্রে আবদ্ধ জানিয়া অনুগত কবিগণ ধর্ম্মপালপুত্রকে সেইরূপ 'গৌড়েশ্বর' আখ্যা প্রদান করিয়া থাকিবেন। বাস্তবিক তৎকালে মধ্যরাঢ়ের কতকটা ও তাম্রলিপ্তের কতকটা এই গৌড়েশ্বরের অধিকারভুক্ত ছিল। লাউসেন তাঁহার মাসতুতো ভাই। ধর্ম্মপালপুত্রের প্রকৃত নামটী ধর্ম্মমঙ্গলে নাই, সম্ভবতঃ তিনি বেশী দিন রাজত্ব করিতে সমর্থ হন নাই অথবা তাঁহার সময়ে লাউসেনের অভ্যুদয়ে তাঁহার নাম চাপা পড়িয়াছিল, তাই তিনি কেবল

'গৌড়েশ্বর' নামেই পরিচিত হইয়াছেন।[১১১] বলিতে কি এই ধর্ম্মপালপুত্রের একদিনও শান্তি ছিল না, তাঁহার চারিদিকেই শত্রু ছিল। লাউসেন সেই সকল শত্রু জয় করিয়া ও সেই সঙ্গে ধর্ম্মের মাহাত্ম্য প্রতিষ্ঠা করিয়া যশস্বী হইয়াছিলেন। তিনি অজয়তীরস্থ ঢেকুরের অধিপতি ইছাইঘোষকে জয় করিয়া আপন পৈতৃক রাজ্য সেনভূম উদ্ধার করিয়াছিলেন। মহাযুদ্ধে হরিপালকে সন্ত্রস্ত করিয়া তাঁহার বীরবালা কাণেড়ার পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন। ধর্ম্মমঙ্গলকার কাণেড়ার যেরূপ বীরত্বের পরিচয় দিয়াছেন, তাহাতে এক সময়ে এই বঙ্গদেশেও যে জোয়ান্ অফ্ আর্কের ন্যায় বীররমণী আবির্ভূতা হইয়াছিলেন, তাহাতে সন্দেহ নাই।

কেবল রাঢ়দেশ বলিয়া নহে, সুদূর কামরূপেও লাউসেনের শৌর্য্যবীর্য্য প্রকাশিত হইয়াছিল। কামরূপের মহাসামন্ত কর্পূরধল তাঁহার নিকট পরাজয় স্বীকার করিয়াছিলেন। ধর্ম্মমঙ্গলে রাঢ়ের নানা স্থানে ও কামরূপে লাউসেনের বীরকীর্ত্তি ও ধর্ম্মপ্রভাবের পরিচয় প্রকটিত হইলেও বঙ্গ-রাজ্যআক্রমণের কোন কথা নাই। তৎকালে বঙ্গে ধর্ম্মভক্ত ময়নামতীর পুত্র গোবিন্দচন্দ্র রাজত্ব করিতেছিলেন। রাঢ়ের ধর্ম্মমঙ্গলে যেমন লাউসেন ও তাঁহার মাতা রঞ্জাবতীর অসাধারণ ধর্ম্মভক্তির পরিচয় রহিয়াছে, পূর্ব্ব ও উত্তরবঙ্গের মাণিকচাঁদ ও গোপীচাঁদের গানেও আমরা সেইরূপ গোবিন্দচন্দ্রের ধর্ম্মের উদ্দেশে অসাধারণ স্বার্থত্যাগ ও তাঁহার মাতা ময়নামতীর অসাধারণ প্রভাবের পরিচয় পাইতেছি।[১১২] উভয়কুলে আত্মীয়তা ও একপ্রকার ধর্ম্মনিষ্ঠা থাকায় উভয় বংশের মধ্যে বিরোধের পরিচয় পাওয়া যায় নাই।

লাউসেন বৌদ্ধধর্ম্মের ভিতর দিয়া অভিনব ধর্ম্মমার্গ প্রচার দ্বারা সমগ্র রাঢ়ে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন বলিয়া ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির ও পালসম্রাট্ মহীপালের সহিত তিনিও রাঢ়ীয় পঞ্জিকা-সমূহে রাজচক্রবর্ত্তী মধ্যে গণ্য হইয়াছেন, সে কথা পূর্ব্বেই লিখিয়াছি। বীরভূম হইতে তমলুকের অন্তর্গত ময়নাগড় পর্য্যন্ত লাউসেনের অধিকারভুক্ত হইয়াছিল। তিনি পৈতৃকরাজ্য সেনভূম (বর্ত্তমান বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত) উদ্ধার করিয়া শ্যামরূপার গড়ে রাজধানী করিয়াছিলেন। অদ্যাপি বীরভূম ও বর্দ্ধমান জেলার লোকেরা এই শ্যামরূপার-গড়কে লাউসেনের গড় বলিয়াও অভিহিত করিয়া থাকে। কাল-সহকারে তদীয় বংশধরগণ তাঁহার রাঢ়াধিকার হইতে বঞ্চিত হইলে লাউসেনের বংশধরগণ তমলুকজেলাস্থ ময়নাগড়ে আসিয়া কিছুদিন রাজত্ব করিতে থাকেন। ময়নাগড়ে এখনও সেই রাজবংশের কীর্ত্তিনিদর্শন পড়িয়া রহিয়াছে। এখানে রঙ্কিণী নামে কালী ও লোকেশ্বর নামে শিবমন্দির বিদ্যমান, তাহা লাউ-সেনের প্রতিষ্ঠিত বলিয়া সাধারণের বিশ্বাস। এখানকার বৃন্দাবনচকে এক ধর্ম্মঠাকুর আছেন, তাহা অনেকে লাউসেনের প্রতিষ্ঠিত বলিয়া মনে করেন। লাউসেনের বংশধরগণের আর

(১১১) ২য় ধর্ম্মপাল ও তৎপুত্র উভয়েই 'গৌড়েশ্বর' বলিয়া পরিচিত থাকায় আধুনিক ধর্ম্মমঙ্গলসমূহে লাউসেনের পরিচয়ে গোলযোগ ঘটিয়াছে, তাই লাউসেনকে কেহ ২য় ধর্ম্মপালের মহিষী সামুলার ভাগিনেয়, কেহবা গৌড়েশ্বরের শালিকাপুত্র বলিয়াছেন।

(১১২) পরবর্ত্তী অধ্যায়ে চন্দ্রবংশপ্রসঙ্গে গোবিন্দচন্দ্রের বিবরণ দ্রষ্টব্য।

কোন পরিচয় পাওয়া যায় না। তাঁহার ইহলোক পরিত্যাগের পর পঞ্চকোটের শেখর-রাজবংশ প্রবল হইয়া সেনভূম অধিকার করেন এবং তৈলকম্প (বর্ত্তমান তেলকুপী) নামক স্থানে তাঁহাদের রাজধানী প্রতিষ্ঠিত হয়।[১১২]

পালসম্রাট্ ১ম মহীপাল ও লাউসেন সমসাময়িক ছিলেন। আশ্চর্য্যের বিষয় রাঢ়ীয় পঞ্জিকাসমূহে বহুকাল হইতে মহীপাল ও লাউসেনের নাম একত্র উক্ত হইয়া আসিতেছে।

তিব্বতীয় তারনাথের মতে মহীপাল ৫২ বর্ষ রাজত্ব করেন। ইমাদপুরের ধাতব-প্রতিমায় যখন মহীপালের ৪৮শ রাজ্যাঙ্ক পাওয়া গিয়াছে, তখন যে তিনি অন্ততঃ অর্দ্ধ শতাব্দী রাজত্ব করিয়াছিলেন, তাহা অস্বীকার করা যায় না। তাঁহার প্রধান মন্ত্রী ও তাঁহার বাণগড়-তাম্রশাসনের দূতক ছিলেন বামনভট্ট।

১ম মহীপালের পর তৎপুত্র নয়পাল পিতৃসিংহাসন লাভ করেন। পালরাজলিপিতে তাঁহার এইরূপ পরিচয় আছে—'দোষাসঙ্গ পরিত্যাগপূর্ব্বক ক্ষিতিভৃৎগণের মস্তকে পদন্যাস ও সকল দিকে প্রভাব বিস্তার করিয়া উদয়াচল হইতে উদিত সূর্য্যের ন্যায় তমোবিনাশী স্নিগ্ধপ্রকৃতি ও প্রজারঞ্জক নয়পাল নরপতি ধন্য, তিনি (মহীপাল) নরপালের পুণ্যে জন্মলাভ করিয়াছিলেন।'[১১৩]

নয়পাল।

উদ্ধৃত পরিচয় হইতে মনে হয় যে, নয়পালও একজন সামান্য নৃপতি ছিলেন না। তাঁহার পিতৃদেব মহীপালের ন্যায় তিনিও বহু নৃপতির উপর বহু দিকে আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিলেন। তিনি যেমন প্রজারঞ্জক, তেমনি নির্দ্দোষ ও ধর্ম্মানুরক্ত ছিলেন। ১ম মহীপালের সময় যেমন বৌদ্ধধর্ম্মশাস্ত্রের আলোচনা ও রামাইপণ্ডিতপ্রমুখ আচার্য্যগণের চেষ্টায় বৌদ্ধধর্ম্মের অভিনব সংস্কার চলিতেছিল, নয়পালের সময়ও তাহার বিরাম হয় নাই। নয়পালের অধিকারকালে লিখিত ও নেপাল হইতে আবিষ্কৃত বহুতর বৌদ্ধধর্ম্মগ্রন্থ তাহার সাক্ষ্যদান করিতেছে।[১১৪] তিনি নিজে একজন নিষ্ঠাবান্ বৌদ্ধ হইলেও অপর ধর্ম্মসম্প্রদায়ের উপর কখন অসদ্ব্যবহার করেন নাই, বরং তাঁহারই ১৫শ রাজ্যাঙ্কে গয়াধামে মহাদ্বিজবংশোদ্ভব শূদ্রকের পুত্র ও পরিতোষের পৌত্র বিশ্বাদিত্য কর্ত্তৃক জনার্দ্দনের মন্দির[১১৫] এবং বিষ্ণুপদমন্দির-

(১১২) এখন মানভূমজেলার কাশীপুর নামক স্থানে এই সুপ্রাচীন শেখররাজবংশ বিরাজমান।

(১১৩) "ত্যজন্ দোষাসঙ্গং শিরসি কৃতপাদঃ ক্ষিতিভৃতাং বিতন্বন্ সর্ব্বাশাঃ প্রসভমুদয়াদ্রেরিব রবিঃ।
হতধ্বান্ত-স্নিগ্ধপ্রকৃতিরনুরাগৈকবসতিস্ততো ধন্যঃ পুণ্যৈরজনি নয়পালো নরপতিঃ॥"

(৩য় বিগ্রহপালের আমগাছীলিপি ও মদনপালের মনহলিলিপি)

উক্ত শ্লোকটীর দ্ব্যর্থ আছে। 'দোষাসঙ্গ' শব্দের অর্থ সূর্য্যপক্ষে রজনীর সঙ্গ এবং নয়পালপক্ষে দোষাসক্তি, 'ক্ষিতিভৃৎ' শব্দের অর্থ সূর্য্যপক্ষে পর্ব্বত এবং নয়পাল পক্ষে সামন্ত নরপাল।

(১১৪) Bendall's Cambridge Catalogue, p. 175, Ms. no. 1688.

(১১৫) এই মন্দিরপ্রতিষ্ঠা উপলক্ষে বাজিবৈদ্য সহদেব যে প্রশস্তি রচনা করেন, তাহাই 'কৃষ্ণদ্বারিকামন্দির-লিপি' বলিয়া খ্যাত। Vide Journal of the Asiatic Society of Bengal, 1900, pt. I. pp. 190-195.

চত্বরে নরসিংহমূর্ত্তিপ্রতিষ্ঠার পরিচয় পাওয়া যাইতেছে।[১১৬] এমন কি নয়পালদেবের শাসন-কালে গয়াক্ষেত্রে বহু বৈদিক যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হইত এবং এরূপ বেশী লোকে বেদ পাঠ করিতেন যে বেদপারক দ্বিজগণের 'উদ্গীর্ণোগ্র-পাঠক্রমে' অপরে অপরের বাক্যালাপ শুনিতেও অসুবিধা বোধ করিতেন।[১১৭] মহীপালের রাজ্যকালেই সুপ্রসিদ্ধ দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান অতীশের অভ্যুদয়। তৎকালীন পূর্ব্ববঙ্গের বৌদ্ধকেন্দ্র বিক্রমপুরের রাজবংশে অতীশের জন্ম ও তত্রত্য বজ্রাসন (বর্ত্তমান বাজাসন) নামক স্থানেই তাঁহার দীক্ষাশিক্ষা পরিসমাপ্তি হয়।

অতীশ দীপঙ্কর

তিনি বিক্রমশিলা-মহাবিহারে আসিয়া কিছুকাল প্রধান আচার্য্যরূপে অধিষ্ঠিত হইয়াছিলেন এবং প্রথমে গৌড়াধিপ মহীপাল ও তৎপরে নয়পাল তাঁহাকে প্রধান ইষ্টদেব ভাবিয়া অনেক সময় বিক্রমশিলায় গিয়া তাঁহার পদতলে বসিয়া পরমার্থ উপদেশ শ্রবণ করিতেন। শ্রীজ্ঞান রাজা নয়পালকে যে ধর্ম্মোপদেশ দিয়াছিলেন, তাহা তদ্বিরচিত 'বিমলরত্নলেখন' নামক গ্রন্থে বিবৃত হইয়াছে।[১১৮]

নয়পালের উৎসাহে ও শ্রীজ্ঞানের যত্নে এই সময়ে গৌড়ের সর্ব্বত্র তান্ত্রিকমত প্রচলিত হইয়াছিল। তিব্বত প্রভৃতি বহুদূরদেশ হইতে শত শত পণ্ডিত তান্ত্রিক উপদেশ লাভ করিবার জন্য বিক্রমশিলায় আগমন করিতেন। এ সময়ে কি হিন্দু কি বৌদ্ধ সকলেই তান্ত্রিক তারাদেবীর উপাসনা ও তান্ত্রিক কুলসাধনে আগ্রহ প্রকাশ করিতে থাকেন। শ্রীজ্ঞানের শিষ্য ও তাঁহার জীবনীলেখক বুস্তন লিখিয়া গিয়াছেন—

'শ্রীজ্ঞান যৎকালে বজ্রাসনে অবস্থান করিতেছিলেন, সেই সময়ে পশ্চিমদেশের কর্ণরাজের সহিত মগধাধিপ নয়পালের ঘোরতর সংগ্রাম উপস্থিত হইয়াছিল।[১১৯] মগধনগরী জয় করিতে না পারিয়া কর্ণরাজের সৈন্যগণ কতকগুলি পবিত্র বৌদ্ধবিহার ধ্বংস করে এবং পাঁচজন বৌদ্ধকে নিহত করে।......অবশেষে নয়পালই জয়লাভ করেন। মগধবাহিনীর হস্তে কর্ণ-রাজের সৈন্যদল অধিকাংশই বিনষ্ট হয়। কর্ণরাজ ও দলবল অতীশের আশ্রয় গ্রহণ করেন। অতীশের মধ্যস্থতায় উভয় নৃপতির মধ্যে সন্ধি স্থাপিত হয়। খাদ্যদ্রব্য ভিন্ন যুদ্ধকালে যে সকল সামগ্রী নষ্ট হইয়া যায় এবং যে সকল দ্রব্য উভয়পক্ষের হস্তে পতিত হইয়াছিল, তাহা পরস্পরে ক্ষতিপূরণ করিয়া দেন অথবা প্রত্যর্পণ করেন।'[১২০]

(১১৬) J. A. S. B. 1900, pt. I. p. 191 note and Proceedings A. S. B. 1902, p. 66-67.

(১১৭) "বেদাভ্যাসপরায়ণদ্বিজগণোদ্গীর্ণোগ্রপাঠক্রমাদুচ্চৈরুচ্চরিতধ্বনিব্যতিকরৈর্বদ্ধাবধার্য্যা গিরঃ।
কিঞ্চাজস্রিতহোমধূমপটলধ্বান্তাবৃতো সাম্প্রতং ধর্ম্মো যত্র মহাভয়াদিব কলেঃ কালস্য সংতিষ্ঠতে।"
(কৃষ্ণদ্বারিকামন্দিরলিপি ৩য় শ্লোক)

(১১৮) এই গ্রন্থ তিব্বতীয় ভাষায় অনুবাদিত হইয়াছে।

(১১৯) কর্ণরাজের সহিত নয়পালের যুদ্ধবার্ত্তা ১৩০৬ সালে (১৮৯৮ খৃষ্টাব্দে) প্রথম বিশ্বকোষে প্রকাশিত হয়। (বিশ্বকোষ, ১১শ ভাগ, ৩১৫ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য) তৎপরে শ্রীযুক্ত মনোমোহন চক্রবর্ত্তী মহাশয় পাশ্চাত্য পুরাবিদ্‌গণের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। (J. A. S. B. 1900, pt. I. p. 192.)

(১২০) Journal of the Buddhist Text Society, Vol. I. p. 9 note.

কর্ণদেবের সহিত গোলযোগ মিটাইয়া তিব্বতনৃপতির একান্ত আহ্বানে অতীশ তিব্বতে যাত্রা করেন। তিব্বতনৃপতি ও রাজপরিবারবর্গ সকলেই তাঁহার নিকট তান্ত্রিক ধর্মে দীক্ষিত হন। তিব্বতের রাজধানী লাসার নিকটবর্ত্তী নেথান নামক স্থানে ১০৫৩ খৃষ্টাব্দে তিনি দেহত্যাগ করেন। তাঁহার দেহাবসানের পর হইতে অদ্যাপি তিনি তিব্বতে অবলোকিতেশ্বর-স্বরূপ পূজিত হইতেছেন।

কর্ণদেব

চেদিরাজবংশে কর্ণদেব একজন অদ্বিতীয় মহাবীর ও দিগ্বিজয়ী নরপতি বলিয়া পরিচিত ছিলেন। কর্ণদেবের পিতা গাঙ্গেয়দেবের অভ্যুদয়কালে সুলতান মামুদ কয়েকবার ভারত লুণ্ঠন করেন। কনোজপতি রাজ্যপাল গজনীপতির আনুগত্য স্বীকার করায় চন্দেল্লরাজ গণ্ডের পুত্র ও উত্তরাধিকারী বিদ্যাধর তাঁহার প্রিয় সামন্ত অর্জ্জুনের দ্বারা রাজ্যপালের বিনাশসাধন করেন। রাজ্যপালের পর তৎপুত্র ত্রিলোচনপালের নাম পাওয়া যায়, তিনিও পৈতৃক সম্মান রক্ষা করিতে সমর্থ হন নাই। এই দুর্ব্বল কনোজরাজের সময়ে গাঙ্গেয়দেব গঙ্গাপার হইয়া যমুনা পর্য্যন্ত অধিকার করেন। বুন্দেলখণ্ড হইতে পশ্চিমে কনোজের সীমা পর্য্যন্ত তাঁহার শাসনাধীন হইয়াছিল। তাঁহারই আধিপত্যকালে তাঁহার প্রিয়পুত্র মহাবীর কর্ণদেব প্রথমে মগধ আক্রমণ করিয়াছিলেন। দীপঙ্কর অতীশের যত্নে উভয়পক্ষে সন্ধি হইলেও এই সন্ধি স্থায়ী হইয়াছিল বলিয়া মনে হয় না। ১০৪০ খৃষ্টাব্দে প্রয়াগের সুপ্রসিদ্ধ অক্ষয়বটমূলে গাঙ্গেয়দেব প্রাণত্যাগ করেন।[১২১] তৎপরেই কর্ণদেব সুবিস্তৃত পৈতৃকরাজ্য লাভ করিয়া দিগ্বিজয়ের উচ্চাশায় বাহির হইলেন। বারাণসী হইতে এই কর্ণদেবের ৭৯৪ চেদিসংবতে উৎকীর্ণ তাম্রশাসন পাওয়া গিয়াছে। তাহা হইতে জানা যায় যে, কর্ণদেব ১০৪৩ খৃঃ অব্দে তথায় রাজত্ব করিতেছেন। নানাস্থান হইতে আবিষ্কৃত তাঁহার এবং তদ্বংশধরগণের শিলালিপি হইতে জানা যায় যে, কর্ণদেব পাণ্ড্য, মুরল, কুঙ্গ, বঙ্গ, কীর ও হূণদিগকে বশে আনিয়াছিলেন[১২২] এবং চোড়, কুঙ্গ, হূণ, গৌড় ও গুর্জ্জর-নৃপতিগণ তাঁহার

(১২১) Memoirs, A. S. B. Vol. III. no. 1. p. 11.

(১২২) "পাণ্ড্যশ্চণ্ডিমতাং মুমোচ মুরলস্তত্যাজ গর্ব্ব গ্রহং
কুঙ্গঃ সদ্গতিমাজগাম চকপে বঙ্গঃ কলিঙ্গৈঃ সহ।
কীরাঃ কীরবদাসপঞ্জরগৃহে হূণঃ প্রহর্ষং জহৌ
যস্মিন্ রাজনি শৌর্য্যবিভ্রমভরং বিভ্রত্যপূর্ব্বপ্রভে॥"

(অল্হনাদেবীর ভেরাঘাটলিপি ১২শ শ্লোক—Ep. Ind. Vol. II. p. 11)

(১২৩) "স্রৈতঃ সকর চোড়-কুঙ্গ-কিমিনং কল্প ভয়া বল্গতে
হূণৈবং রণিতুং ন যুক্তমিহ তে ত্বং গৌড় গর্ব্বং ত্যজ।
নৈবং গুর্জ্জর গর্জ্জ কীর নিভৃতো বর্ত্তস্ব সেবাগতান্
ইত্থং যস্য মিথো বিরোধি-নৃপতিং দ্বাঃস্থো বিনিন্তে জনাঃ॥"

(জয়সিংহদেবের করণবেলালিপি ১১-১২শ শ্লোক Ind. Ant. Vol. XVIII. p. 217.)

নিকট মস্তক অবনত করিয়াছিলেন।১২৩ মালবপতি উদয়াদিত্যের নাগপুর-প্রশস্তি হইতে বুঝা যায় যে, কর্ণদেব কর্ণাটগণের সহিত মিলিত হইয়া নানাস্থান জয় করিয়াছিলেন।১২৪

কৃষ্ণমিশ্রের প্রবোধ-চন্দ্রোদয়-নাটকের প্রস্তাবনা হইতে জানিতে পারি যে, চন্দেল্লরাজ কীর্ত্তিবর্ম্মার সেনাপতি গোপাল চেদিপতি কর্ণদেবকে পরাজয় করিয়াছিলেন, তদুপলক্ষে গোপালের অভ্যর্থনার জন্যই প্রবোধচন্দ্রোদয়নাটক অভিনীত হয়। কীর্ত্তিবর্ম্মা ১০৫০ খৃষ্টাব্দে বিদ্যমান ছিলেন।১২৫ এদিকে বিহ্লণের বিক্রমাঙ্কচরিতে (১ম সর্গ ১০২ শ্লোকে) লিখিত আছে, চালুক্যরাজ ২য় আহবমল্ল (প্রায় ১০৪২ হইতে ১০৬৪ খৃঃ অঃ) দাহলপতি কর্ণকে পরাজয় করিয়াছিলেন।১২৬ কবি বিহ্লণ নিজে কর্ণদেবের সভায় উপস্থিত হইয়াছিলেন, তিনি কিন্তু আবার কর্ণকে 'কালঞ্জর-গিরিপতি-বিমর্দ্দন' (১৮।৯৩) বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। এ অবস্থায় আবার চন্দেল্লরাজ কীর্ত্তিবর্ম্মাই বরং কর্ণদেবের হস্তে পরাজিত হইয়াছিলেন,—তাহারই আভাস পাওয়া যাইতেছে। মেরুতুঙ্গের প্রবন্ধচিন্তামণি, উদেপুর-প্রশস্তির ২০শ শ্লোক এবং নাগপুর-প্রশস্তি একত্র পাঠ করিলে মনে হয়, চেদিপতি কর্ণ ও গুজরাতপতি ভীম একত্র মিলিত হইয়া মালবের ভোজরাজকে আক্রমণ করেন, সেই আক্রমণে বা তৎকালে ভোজ কালগ্রাসে পতিত হন। ভোজদেবের ১০৭৮ বিক্রম-সংবতে (বা ১০২১-২২ খৃষ্টাব্দে) উৎকীর্ণ তাম্রশাসন পাওয়া গিয়াছে, আবার তাঁহার "রাজমৃগাঙ্ককরণ" নামক জ্যোতির্গ্রন্থ "শাকো বেদর্ত্তুনন্দো" অর্থাৎ ৯৬৪ শকাব্দে বা ১০৪২-৪৩ খৃষ্টাব্দে রচিত হয়। সম্প্রতি নর্ম্মদাতীরস্থ ঘণ্টেশ্বর হইতে ১১০০ সংবতে (১০৪৩ খৃঃ অব্দে) প্রদত্ত ভোজদেবের একখানি তাম্রশাসন পাওয়া গিয়াছে। ইহারই কিছুপরে তাঁহার মৃত্যুকাল অবধারিত হইয়াছে। এদিকে ভোজদেবের পুত্র উদয়াদিত্যের ১১৩৭ বিক্রম-সংবতে (১০৮০ খৃষ্টাব্দে) উৎকীর্ণ উদেপুর-প্রশস্তিতে লিখিত আছে যে, তিনি কর্ণের অধিকার হইতে পিতৃরাজ্য মুক্ত করিয়াছিলেন।১২৭ কীর্ত্তিবর্ম্মার ১১৫৪ বিক্রম-সংবতে (১০৯৮ খৃষ্টাব্দে) খোদিত লিপিও পাওয়া গিয়াছে।১২৮

এদিকে ভেরাঘাট হইতে সংগৃহীত কর্ণের পৌত্রবধূ অহ্লনা দেবীর শিলাফলকে উৎকীর্ণ হইয়াছে যে, কর্ণের ভয়ে কলিঙ্গের সহিত বঙ্গ কম্পিত হইত।১২৯ আবার অহ্লনা দেবীর

(১২৪) "তস্মিন্ বাসববন্ধুতামুপগতে রাজ্যে চ কুল্যাকুলে
মগ্নস্বামিনি তস্য বন্ধুরুদয়াদিত্যোঽভবদ্ভূপতিঃ।
যেনোদ্ধৃত্য মহার্ণবোপমমিলৎ কর্ণাটকর্ণপ্রভু-
মুর্ব্বীপালকদর্থিতাং ভুবমিমাং শ্রীমদ্বরাহায়িতম্।"
(উদয়াদিত্যের নাগপুরপ্রশস্তি ৩২ শ্লোক—Ep. Ind. Vol. II. p. 185)

(১২৫) Indian Antiquary, Vol. XVI. p. 204.

(১২৬) Epigraphia Indica, Vol. I. p. 220.

(১২৭) Indian Antiquary, Vol. XX. p. 83, Epigraphia Indica, Vol. I. p. 233, Vol. II. p 181, Vol. IV. p. 47-48.

(১২৮) Indian Antiquary, Vol. XVII. p. 234.

(১২৯) Epigraphia Indica, Vol. VIII. Appendix I.

পুত্র জয়সিংহের করণবেল্ শিলালিপিতে পাওয়া যায়, গৌড়পতি গর্ব্ব ছাড়িয়া কর্ণের আদেশ পালন করিতেন।১৩০ মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় প্রকাশ করিয়াছেন যে, প্রবল পরাক্রান্ত চেদিপতি কর্ণদেব প্রায় ৬০ বর্ষ রাজত্ব করেন।১৩১

তাঁহার পিতার সাংবাৎসরিক শ্রাদ্ধোপলক্ষে (৭৯৩ চেদিসংবতে) প্রয়াগ হইতে কর্ণদেব যে তাম্রশাসন দান করেন, তাহাতে লিখিত আছে যে, তিনি কর্ণাবতী নামে নগরী এবং কাশীধামে কর্ণমেরু নামে একটী সুবৃহৎ মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন।১৩২

উদ্ধৃত বিবরণী হইতে বেশ জানা যাইতেছে, পালাধিকারভুক্ত বারাণসী এমন কি মগধের পশ্চিম অংশ কিছুদিনের জন্য চেদিপতি কর্ণদেবের অধিকারভুক্ত হইয়াছিল, তিনি একাধিকবার গৌড়বঙ্গ আক্রমণ করিয়াছিলেন এবং গৌড়পতি নয়পাল কিছুদিন তাঁহার বশ্যতা স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। চেদিপতি যৎকালে অঙ্গ, বঙ্গ ও কামরূপ আক্রমণ করেন, তৎকালে তাঁহার বীরজামাতা শ্যামলবর্ম্মার পিতা জাতবর্ম্মা সেনাধিপ ছিলেন।১৩৩

নয়পালের প্রভাব হ্রাস, বৈদেশিক আক্রমণ ও নানা ধর্ম্মসম্প্রদায়ের অভ্যুদয়ের সহিত পালবংশের চিরহিতৈষী ব্রাহ্মণমন্ত্রিবংশও অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছিলেন। বামনভট্টের পর পালবংশের আর কোন ব্রাহ্মণমন্ত্রীর পরিচয় পাওয়া যায় না। সম্ভবতঃ তৎপরে রাজসুহৃদ্ কায়স্থবংশই মন্ত্রিত্বলাভ করেন। নয়পালের সময়ে গৌড়বঙ্গে বৈদ্যকশাস্ত্রেরও যথেষ্ট আলোচনা চলিয়াছিল; এই সময় সুপ্রসিদ্ধ চিকিৎসক ও নানা বৈদ্যকগ্রন্থপ্রণেতা চক্রপাণিদত্ত আবির্ভূত হন। তাঁহার পিতৃব্য গৌড়াধিপ নয়পালের রন্ধনশালার অধ্যক্ষ ছিলেন।১৩৪

৩য় বিগ্রহপাল

নয়পালের পর ৩য় বিগ্রহপাল গৌড়াধিপত্য লাভ করেন। 'তিনি সজ্জনগণের লোচনানন্দদায়ক, নিয়ত স্মররিপুর পূজানুরক্ত, হরি অপেক্ষাও সংগ্রামে অধিক চতুর, ও চারিবর্ণের আশ্রয়স্থল ছিলেন এবং সুবিমল যশোরাশিতে জগৎ সুরঞ্জিত করিয়াছিলেন।'১৩৫

(১৩০) Epigraphia Indica, Vol. II. p. 11.

(১৩১) Memoirs of the Asiatic Society of Bengal, Vol. III. p. 11.

(১৩২) Epigraphia Indica, Vol. II. p. 305 ও বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদ্ হইতে প্রকাশিত কাশী-পরিক্রমা, ২৫৭ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

(১৩৩) পরে বর্ম্মবংশের বিবরণ দ্রষ্টব্য।

(১৩৪) নয়পালের ১৫শ বর্ষে গয়ায় বিষ্ণুপদমন্দিরে শূদ্রকপুত্র বিশ্বরূপকর্ত্তৃক নৃসিংহমূর্ত্তিপ্রতিষ্ঠা উপলক্ষে যে শিলাপ্রশস্তি রচিত হয়, তাহার রচয়িতার নাম বৈদ্য শ্রীবজ্রপাণি। (Proc. A. S. B. 1902, p. 67) এবং তৎপরে ৩য় বিগ্রহপালের রাজত্বকালে বিশ্বরূপ গয়ায় আর একটী মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন, তদুপলক্ষে বৈদ্য শ্রীধর্ম্মপাণি তাঁহার প্রশস্তি রচনা করিয়াছিলেন, উক্ত বজ্রপাণির ও ধর্ম্মপাণির সহিত চক্রপাণির কোন সম্বন্ধ আছে কিনা তাহা অনুসন্ধেয়।

(১৩৫) "পীতঃ সজ্জন-লোচনৈঃ স্মররিপোঃ পূজানুরক্তঃ সদা
সংগ্রামে চতুরোঽধিকঞ্চ হরিতঃ কালঃ কুলে বিদ্বিষাং।

বাস্তবিক ১ম মহীপালের পর এই ৩য় বিগ্রহপালের ন্যায় মহাবীর, ধীর ও বিচক্ষণ নৃপতি পালবংশে আর কেহ জন্মগ্রহণ করেন নাই। যে সময়ে কর্ণদেবের পুনঃ পুনঃ আক্রমণে গৌড়বঙ্গ ভীত চকিত, যাদববীরগণের পদভরে অঙ্গ বঙ্গ প্রকম্পিত, সেই সঙ্কটময় আপৎকালে ৩য় বিগ্রহপাল পিতৃসিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইলেন; পিতৃশত্রুদলন ও রাজ্যে শান্তিরক্ষা তাঁহার প্রধান ও প্রথম লক্ষ্য ছিল। তাঁহার কায়স্থমন্ত্রী যোগদেবের[১৩৬] সুমন্ত্রণাগুণে এবং স্বীয় বুদ্ধিমত্তা ও শৌর্য্যবীর্য্যপ্রভাবে তিনি দিগ্বিজয়ী চেদিপতি কর্ণদেবকে পরাজয় করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। সন্ধ্যাকরনন্দীর রামচরিতে তাঁহার এইরূপ পরিচয় আছে—

'সিংহের অপেক্ষা মহাবিক্রমশালী রত্নাকর বা সমুদ্রের গোত্রে বিগ্রহপাল রাজা হইয়াছিলেন, নতনৃপালগণ যাঁহার রথস্বরূপ ছিলেন, যিনি বাহুবলে সংগ্রামে কর্ণকে পরাজয় করিয়া আবার তাঁহাকে রক্ষা করিয়াছিলেন এবং তাঁহার কন্যা যৌবনশ্রীর সহিত পৃথিবীরও পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন। অতিশয় দানসামগ্রী অবিশ্রান্ত বিতরণ করিয়া যিনি বৃষানুচর (সাক্ষাৎ ধর্ম্মাবতার) বলিয়া গণ্য হইয়াছিলেন।'[১৩৭]

এই ৩য় বিগ্রহপালের সহিত কর্ণরাজকন্যা যৌবনশ্রীর বিবাহে দুই পরাক্রান্ত নৃপতির মধ্যে একতা স্থাপিত হইয়াছিল। বীর বীরের পূজা ও শ্রদ্ধার পাত্র, তাই কর্ণদেব যাদববীর জাতবর্ম্মার ন্যায় ৩য় বিগ্রহপালকে কন্যাদান করিয়া আপনাকে সম্মানিত জ্ঞান করিয়াছিলেন।

কর্ণদেবের সহিত আত্মীয়তা-স্থাপনের পর ৩য় বিগ্রহপাল অধিককালে নিশ্চিন্ত হইতে পারেন নাই। যে কর্ণাটগণের দৌরাত্ম্যে গৌড়মণ্ডল বহুদিন হইতে পুনঃ পুনঃ ব্যতিব্যস্ত হইয়াছিল, আবার বিগ্রহপালের সময় তাঁহাদেরই তীব্রদৃষ্টি গৌড়রাজ্যের উপর নিপতিত হইয়াছিল।

চাতুর্ব্বর্ণ্যসমাশ্রয়ঃ সিতযশঃপূরৈর্জগল্লম্ভয়ন্
তস্মাদ্বিগ্রহপালদেবনৃপতিঃ পুণ্যৈর্জনানামভূৎ॥"
(৩য় বিগ্রহপালের আমগাছীলিপি ও মদনপালের মনহলিলিপি)

(১৩৬) যোগদেবের পৌত্র বৈদ্যদেবের কমৌলিলিপিতে এইরূপ বর্ণিত আছে—
"বিগ্রহপালো নৃপতিঃ সর্ব্বাকারর্দ্ধিসংসিদ্ধঃ।
যস্য বংশক্রমেণাভূৎ সচিবঃ শাস্ত্রবিত্তমঃ।
যোগদেব ইতি খ্যাতঃ স্ফুরদ্দোর্দ্দণ্ডবিক্রমঃ।" (কমৌলি-লিপি ২য় ও ৩য় শ্লোক)
বিগ্রহপাল নৃপতি সর্ব্বপ্রকার সমৃদ্ধিসম্পন্ন ও সকল বিষয়ে সিদ্ধকাম ছিলেন। দোর্দ্দণ্ড প্রতাপে উদ্ভাসিত শাস্ত্রবিত্তম যোগদেব নামে খ্যাত (এক ব্যক্তি) যাঁহার বংশানুক্রমে মন্ত্রী হইয়াছিলেন।
যোগদেব যে কায়স্থ ছিলেন তাহার পরিচয় বৈদ্যদেবপ্রসঙ্গে পরে বিবৃত হইয়াছে।

(১৩৭) "হরিণোপাসিতধামা বিগ্রহপালঃ কিলাভবদ্রাজা।
নতভূভৃৎপত্তিরথো গোত্রে রত্নাকরেঽমুষ্মিন্॥
সহসাবিতরণজিতকর্ণঃ ক্ষৌণীং যৌবনশ্রিয়োদূহে।
অশ্রান্তদানবারাতিশয়ো যোভূদ্বৃষানুচরঃ॥" (রামচরিত ১ম পরি ৮ম ও ৯ম শ্লোক)

তাঁহাদের অধিনায়ক ছিলেন কল্যাণের চালুক্যরাজ ১ম সোমেশ্বর আহবমল্লের পুত্র ২য় বিক্রমাদিত্য। তিনি পিতার আদেশ লইয়া দিগ্বিজয়যাত্রায় বাহির হইয়া গৌড় ও কামরূপ আক্রমণ করিয়াছিলেন। মহাকবি বিহ্লণের বিক্রমাঙ্কচরিতে তাঁহার গৌড়বিজয়কাহিনী এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে—

'তাঁহার সংগ্রামে গৌড়জয়চিহ্নস্বরূপ গজরাজিগ্রহণ ও কামরূপ-নৃপতির প্রবলপ্রতাপ-উন্মূলনকারী তুষারধবল যশোরাশি সূর্য্যরথচক্রনির্ঘোষে নিদ্রাভঙ্গ হইলে সিদ্ধবনিতাগণ পূর্ব্বাদ্রির কটকদেশে গান করিতেন।'১৩৯

বিহ্লণের উক্তি অনুসারে কেহ কেহ বলিতে চান যে "কুমার বিক্রমাদিত্য গৌড়াধিপকে পরাজিত করিয়া রাঢ়দেশ গৌড়রাষ্ট্র হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়াছিলেন। নবজিত রাঢ়শাসনার্থ কর্ণাটরাজ যে রাজপুত বা ক্ষত্রিয়-সেনানায়ককে নিয়োগ করিয়াছিলেন, সামন্তসেন তাঁহারই বংশধর।"১৪০ কিন্তু বিহ্লনের বর্ণনা হইতে এমন প্রমাণ পাওয়া যায় না যে কর্ণাটরাজ রাঢ়-দেশে কোন প্রকার স্থায়ী আধিপত্য লাভ করিয়াছিলেন। তিনি রাজেন্দ্রচোলের ন্যায় কেবল দিগ্বিজয় উপলক্ষে এ অঞ্চলে আসিয়াছিলেন এবং কতকগুলি হস্তী লইয়া ফিরিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। এখানে তিনি কোন স্থায়ী চিহ্ন রাখিয়া যাইতে পারেন নাই। সেনবংশের সহিত তাঁহার কোনরূপ সম্বন্ধ ছিল বলিয়া মনে হয় না। তাঁহার গৌড়াক্রমণের বহুপূর্ব্বে সামন্তসেনের অভ্যুদয়।১৪১

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, তৎকালে পরাক্রান্ত চেদি ও যাদববংশের সহিত মহাবীর বিগ্রহপাল সম্বন্ধসূত্রে আবদ্ধ ছিলেন; এ সময় অপর কোন নৃপতির গৌড়ের কোন অংশে অধিকার-বিস্তার সহজসাধ্য ছিল না।

৩য় বিগ্রহপালের আমগাছী-লিপি হইতে জানা যায় যে তাঁহার ১৩শ বর্ষে তিনি খদ্যোত-দেবশর্ম্মাকে পৌণ্ড্রবর্দ্ধন-ভুক্তির অন্তর্গত কোটিবর্ষবিষয়ে ব্রাহ্মণীগ্রাম দান করেন।১৪২ তাঁহার ৫ম বর্ষে গয়ার অক্ষয়বটে মহাযজ্ঞ বিশ্বরূপ বটেশ ও প্রাপিতামহেশ্বর নামক দুইটী লিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। তাঁহার ১২শ বর্ষে নালন্দাবিহারে বুদ্ধপ্রতিমা প্রতিষ্ঠার সন্ধান পাওয়া গিয়াছে।১৪৩

(১৩৯) "পারম্পির্য গৃহীতঃ গৌড়-বিজয়-স্তম্বেরমস্যাহবে
তস্যোন্মূলিত-কামরূপ-নৃপতি-প্রাজ্য-প্রতাপশ্রিয়ঃ।
ভানু-স্যন্দন-চক্রঘোষমুষিতপ্রত্যূষনিদ্রারসাঃ
পূর্ব্বাদ্রেঃ কটকেষু সিদ্ধবনিতাঃ প্রালেয়শুভ্রং যশঃ।" (বিক্রমাঙ্কচরিত ৩।৭৪)

(১৪০) গৌড়রাজমালা ৪৭ পৃষ্ঠা।

(১৪১) পরে সেনবংশ-বিবরণ দ্রষ্টব্য।

(১৪২) Indian Antiquary, Vol. XIV. p. 168.

(১৪৩) Cunningham's Arch. Sur. Rept., Vol. III. p. 121.

৩য় বিগ্রহপাল ২য় মহীপাল, ২য় শূরপাল ও রামপাল এই তিন পুত্র রাখিয়া দেহত্যাগ করেন। প্রথমে ২য় মহীপালই গৌড়সিংহাসনে অভিষিক্ত হইয়াছিলেন। মদনপালের মনহলি-লিপিতে ২য় মহীপালের এইরূপ পরিচয় আছে—

২য় মহীপাল

"চন্দনবারিহারী কীর্ত্তিপ্রভায় আনন্দিত বিশ্ববাসিগণ কর্ত্তৃক পরিগীত শ্রীমান্ মহীপাল মহাদেবের ন্যায় দ্বিজেশমৌলি হইয়াছিলেন।"১৪৪

উক্ত পরিচয় হইতে বলা যাইতে পারে ২য় মহীপালও একজন কীর্ত্তিমান্ পুরুষ ছিলেন, প্রজাসাধারণে তাঁহার মহিমাগান করিত, তিনি শিবের ন্যায় চন্দ্রমৌলি হইয়া বৈরাগ্য অবলম্বন করিয়াছিলেন, সম্ভবতঃ তাঁহার বৈরাগ্যগাথাই 'মহীপালের গান' নামে সর্ব্বত্র পরিচিত হইয়াছিল।১৪৫

আশ্চর্য্যের বিষয়, এরূপ কীর্ত্তিমান্ নৃপতি সম্বন্ধে সমসাময়িক কবি সন্ধ্যাকর ভিন্নরূপ বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। রামচরিতে লিখিত আছে, ২য় মহীপাল অন্যায়পূর্ব্বক তাঁহার কনিষ্ঠ শূরপাল ও রামপালকে বন্দী করিয়াছিলেন, তাঁহার আচরণে প্রজাগণ বিরক্ত হইয়াছিলেন।১৪৬ সেই সময়ে কৈবর্ত্তপতি দিব্য বা দিব্বোক মহীপালকে পরাজয় করিয়া 'জনকভূ' বা তাঁহার পিতৃরাজ্য বরেন্দ্রী অধিকার করেন১৪৭ এবং দিব্বোকের অনুজ রূদোকের পুত্র ভীম বরেন্দ্রীর রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন।১৪৮ মহীপাল মন্ত্রিগণের পরামর্শ না শুনিয়া সহসা চতুরঙ্গ সৈন্য লইয়া কৈবর্ত্তপতিকে আক্রমণ করেন এবং তাঁহার নিকট পরাজিত হন।১৪৯

(১৪৪) "তস্মন্দনশ্চন্দনবারিহারিকীর্ত্তিপ্রভানন্দিতবিশ্বগীতঃ।
শ্রীমান্ মহীপাল ইতি দ্বিতীয়ো দ্বিজেশমৌলিঃ শিববদ্বভূব॥"
(মদনপালের মনহলিলিপি ১৩শ শ্লোক।)

(১৪৫) এ দেশে প্রচলিত 'ধান ভান্‌তে শিবের গীত' ও 'ধান ভান্‌তে মহীপালের গীত' এই প্রবচন হইতেও মনে হয় যে মহীপাল শিবের তুল্য কিছু হইয়া ছিলেন, তাই শিবের গান ও মহীপালের গান এক আকার ধারণ করিয়াছিল।

(১৪৬) "প্রথমমুপরতে পিতরি মহীপালে ভ্রাতরি কমাতায়াম্।
বিগ্রতানীতিকারম্ভরতে রামাধিকারিতাং দধতি॥৩১
অপরভ্রাত্রাধিবসতি কষ্টাগারং মহাবনং ঘোরম্।
হতবিধিবশেন বারসকূশীলতাভেদ্যকুচজানী॥৩১" (রামচরিত ১ম পরি°)

(১৪৭) "মাংসভুজোচ্চৈর্দর্শকেন জনকভূর্দস্যনোপধিব্রতিনা।
দিব্যাহ্বয়েন সীতা বাসালকৃতিরহারি কান্তাস্য॥৩৮"

(১৪৮) "ভ্রাতানুজতনুজস্য চ ভীমস্য বিবরগ্রহরকৃতঃ।
সান্নিধ্যায় বরেন্দ্রী ক্রিয়াক্ষমস্য পুন বক্ষণীয়াভূৎ॥৩৭"

(১৪৯) "মহীপালঃ বাড়্গুণ্যশল্যস্য মন্ত্রিণো ভণিতমবগণয্য উপস্থিতার্টীমাত্রাণীবৎগ্রহণেন মিলিতানন্তনামন্তচক্রচতুরচতুরঙ্গবলবলাৎিতবহলমদকগকরিতুরগতরণিচরণচারকটচমূসম্ভারসংরম্ভ-নির্ভর-ভরভীতরিক্তমুক্তভূতল-

সন্ধ্যাকরনন্দী রামপালের সান্ধিবিগ্রহিকের পুত্র ছিলেন। সম্ভবতঃ রামপালকে বাড়াইবার জন্য তিনি মহীপালের চরিত্রে দোষারোপ করিয়াছেন। মনে হয় শূরপাল ও রামপাল উভয়েই ২য় মহীপালের বৈমাত্রেয় ভ্রাতা ছিলেন। ৩য় বিগ্রহপালের মৃত্যুর পর তাঁহারা উভয়ে হয়ত পিতৃ-সিংহাসন অধিকারে অগ্রসর হইয়াছিলেন, তজ্জন্য প্রকৃত অধিকারী ২য় মহীপাল তাঁহাদিগকে বন্দী করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। অবশেষে তিনি কৈবর্ত্তপতির হস্তে পরাজিত হইয়া ও গৃহ-বিবাদে বিরক্ত হইয়া সংসার পরিত্যাগ করেন। এই সুযোগে শূরপাল ও রামপাল মুক্তিলাভ করেন। মহীপালের সংসার-পরিত্যাগের কথা তাঁহার বিরুদ্ধ পক্ষীয় কবি লিখিতে পরাঙ্মুখ হইয়াছেন, সন্দেহ নাই। যাহা হউক সন্ধ্যাকর নন্দীর সমসাময়িক মদনপালের লিপি হইতে আমরা মহীপালের যে প্রকৃত পরিচয় পাইয়াছি তাহা পূর্ব্বেই উদ্ধৃত করিয়াছি। শিবপথ সন্ন্যাসধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াও ২য় মহীপাল নিষ্কৃতিলাভ করিতে পারেন নাই। ভাবী রাজপদ নিষ্কণ্টক করিবার জন্য কিছুকাল পরে রামপাল তাঁহার হত্যাসাধন করেন।[১৫০]

২য় শূরপাল

২য় মহীপালের পর ২য় শূরপাল রাজা হইয়াছিলেন। তাঁহার রাজ্যপ্রাপ্তি সম্বন্ধে রামচরিত-কার নির্ব্বাক্ থাকিলেও মদনপালের তাম্রশাসনে সে কথা বর্ণিত হইয়াছে। মদনপালের লিপিতে শূরপালের এইরূপ পরিচয় আছে—

'মহেন্দ্রসদৃশ মহিমাযুক্ত, (দেবসেনাপতি) কার্ত্তিকেয়ের ন্যায় প্রতাপশ্রীসম্পন্ন, সারথ্যে মূর্ত্তিমান্ সাহস, ও নীতিগুণসম্পন্ন শূরপাল তাঁহার (মহীপালের) অনুজ ছিলেন। শত্রুবর্গের স্বচ্ছন্দ ও স্বাভাবিক বিনয়যুক্ত যে যাঁহার সকল আয়ুধের প্রাগল্ভ্যে সদ্য বিস্ময় ও ভয় উৎপাদন করিত।"[১৫১]

উক্ত পরিচয় হইতে মনে হয় যে শূরপালও একজন সামান্য ব্যক্তি ছিলেন না। তিনি একজন অদ্বিতীয় বীর ছিলেন, বহু যুদ্ধে তিনি শত্রুগণকে পরাজিত করিয়াছিলেন। সম্ভবতঃ কৈবর্ত্তপতির বিরুদ্ধে সমরানল প্রজ্বলিত হইলে যথেষ্ট তিনি বীরত্ব প্রদর্শন করিয়া সম্মুখ সমরে প্রাণ বিসর্জ্জন করিয়াছিলেন।

পলায়মান-বিকল-সকলসৈন্যেন যতঃ কথাতিশয়মাপেদুষা সহ সহসৈব বলদ্বিপর্যয়কোটিকষ্টতরসমরমারত্য নির-মজ্জত।' (রামচরিতটীকা ১।৩১।)

(১৫০) "হত্বা রাজপ্রবরং ভূয়ো ভূমণ্ডলং গৃহীতবতঃ।
স নিগাহ্নদজ্রকলয়া সহস্রশোর্ব্বিদ্বিষঃ স্বাধাম্।" (রামচরিত ১।২৯)
'স রামপালোঽজ্রকলয়া সহস্রশোঃ সহস্রবাহুঃ রাজপ্রবরং নৃপতিশ্রেষ্ঠং মহীপালং হত্বা ভূয়ঃ প্রচুরং ভূমণ্ডলং গৃহীতবতঃ' (রামচরিতটীকা।)

(১৫১) "তস্যানুজন্মুজো মহেন্দ্রমহিমাস্কন্দঃ প্রতাপশ্রিয়া-
মেকঃ সাহসসারথির্গুণনয়ঃ শ্রীশূরপালো নৃপঃ।
যঃ স্বচ্ছন্দং সর্গবিভ্রমর্ণরম্যান্ বিভ্রৎস্ব সর্ব্বায়ুধ-
প্রাগল্ভ্যেন জনঃস্ব বিস্ময়ভয়ং সদ্যস্তদানবিরাৎ।" (মদনপালের মনহলিলিপি ১০ম শ্লোক।)

পূর্ব্বেই লিখিয়াছি যে, রামচরিতকার শূরপালের রাজত্বের কথা লেখেন নাই, অথচ শূর-পাল যে রামপালের জ্যেষ্ঠ ছিলেন, রামচরিত হইতে তাহার প্রমাণ পাইতেছি। ইহাতে মনে হয় যে, মহীপালের সন্ন্যাসগ্রহণের পর ও বরেন্দ্রী কৈবর্ত্তাধিকারে নিপতিত হইলে অবশিষ্ট পালাধিকার দুই ভ্রাতায় ভাগাভাগী করিয়া লইয়াছিলেন। শূরপালের ভাগ্যে বেশীদিন রাজ্য-ভোগ ঘটে নাই। শূরপাল সম্ভবতঃ মগধ অঞ্চলে এবং রামপাল প্রথমতঃ রাঢ়ের পালাধিকারে রাজত্ব করিতেন। শূরপালের ২য় রাজ্যাঙ্কে উৎকীর্ণ দুইখানি শিলালিপি পাওয়া গিয়াছে, তৎপাঠে জানা যায় যে, পূর্ণদাস নামে এক বৌদ্ধভিক্ষু উদ্দণ্ডপুরীতে (বর্ত্তমান বিহারে) বুদ্ধপ্রতিমা প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন।[১৫২]

২য় মহীপালকে পরাজয় করিয়া কৈবর্ত্তনায়ক ক্রমে ক্রমে সমস্ত বরেন্দ্রভূমি বা উত্তরবঙ্গ অধিকার করেন। পালরাজবংশধরগণের মধ্যে অন্তর্বিবাদহেতু অধিকার বিস্তারে তাঁহাদের যথেষ্ট সুবিধা হইয়াছিল। কৈবর্ত্তনায়ক আধিপত্যলাভের সহিত এতদুর শক্তিশালী হইয়া উঠিয়াছিলেন যে, শূরপাল ও রামপাল এই উভয় ভ্রাতা মিলিত হইয়াও তাঁহার অভ্যুদয় রোধ করিতে সমর্থ হন নাই। এই সময়ে কৈবর্ত্তশক্তি ধ্বংস করিবার জন্য সমবেত বিরাট শক্তির প্রয়োজন হইয়াছিল।

বরেন্দ্রে কৈবর্ত্তাধিকার

যে সময়ের কথা লিখিত হইয়াছে, তৎকালে নদীমাতৃক বরেন্দ্র-অঞ্চলে কৈবর্ত্তগণের যথেষ্ট প্রভাব ও প্রতিপত্তি ছিল। সংখ্যায়ও তাঁহারা কম ছিলেন না। সমস্ত নৌকা বা নৌবল তাঁহাদেরই কর্তৃত্বাধীন ছিল, পূর্ব্বতন পালরাজগণ তাঁহাদিগকে জলপথের রক্ষক বলিয়াই সমাদর করিতেন। খৃষ্টীয় ৯ম শতাব্দে ধর্ম্মপাল ও দেবপালের রাজত্বকালে মহাযান-ধর্ম্মের সংস্কারের সহিত অনেকগুলি বৌদ্ধধর্ম্মশাস্ত্র রচিত হইয়াছিল, পূর্ব্বেই তাহার আভাস দিয়াছি। এই সময়ে 'আদিকর্ম্মবিধি' নামে একখানি বৌদ্ধধর্ম্মগ্রন্থ রচিত হয়, তাহাতে বৌদ্ধসমাজের বিভিন্ন স্তরের ধর্ম্মিগণের নিত্যাহ্নিকাচার ও কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য নির্দ্দিষ্ট হইয়া-ছিল। এই গ্রন্থে মৎস্যঘাতী কৈবর্ত্তগণ কখনও বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করিতে পারিবে না, যাহারা বংশানুক্রমে মৎস্য-পশুহিংসাদি পরিত্যাগ করিবে, কেবল তাহারাই বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করিতে পারিবে[১৫৩] এই প্রকার ব্যবস্থা হয়। প্রথম প্রথম পালনৃপতিগণ স্ব স্ব আধিপত্যপ্রতিষ্ঠায় ব্যস্ত ছিলেন—আপামর সাধারণের ধর্ম্মকর্ম্মে কখনই হস্তক্ষেপ করিতেন না, সুতরাং কৈবর্ত্তসমাজের উপর বৌদ্ধশাস্ত্রকার যে কঠোর ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন, সে দিকে

(১৫২) Journal and Proc A S. B (New Series) Vol IV p 108

(১৫৩) "প্রব্রজ্যে ক্রিয়মাণং অসম্বর ইত্যুচ্যতে। যামকুক্ষ্যাশ্রিতক বর্ত্তি। তদযোগাদসম্বরিণঃ কৈবর্ত্ত-ঘাটিকা-খেটিকাদয়ঃ নপুংসকাশ্চ স্বভাবেনৈব সম্বরার্হা ভবন্তি। অমীষান্তু সম্বরো ন দেয়ঃ। কিন্তু কৈবর্ত্তাদয়স্ত যদা প্রাণাতিপাতাদিক্রিয়া জীবিকাং ত্যজন্তি তদা সম্বরো দেয় ইত্যাগমঃ।"

(নেপাল হইতে মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রি-মহাশয়-সংগৃহীত ও তৎপ্রদত্ত তত্ত্বকরগুপ্ত-রচিত আদিকর্ম্মক বিধি)

সাধারণের তেমন লক্ষ্যই ছিল না। কিন্তু ১ম মহীপাল ও নয়পালের সময়ে অভিনব বৌদ্ধধর্ম্মের অভ্যুদয়কালে দীপঙ্করাদির শাস্ত্রালোচনার ফলে পূর্ব্ব-প্রচারিত বিধিনিষেধ কার্য্যে পরিণত হইতে থাকে এবং কৈবর্ত্তজাতির কঠোর অনুশাসনের প্রতি সাধারণের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। বুদ্ধদেবের সাম্যবাদ যে ধর্ম্মের মূলসূত্র, তাহার মধ্যে একটী জাতির উপর এরূপ কঠোর ধর্ম্মানুশাসন অবশ্যই কৈবর্ত্তজাতির মর্ম্মপীড়াদায়ী হইয়াছিল। এ সময়ে 'আদিকর্ম্মবিধি'-প্রচারের ফলে বৌদ্ধমাত্রেই কৈবর্ত্তজাতিকে পূর্ব্বাপেক্ষা ঘৃণার চক্ষে দেখিতে লাগিলেন। এদিকে পরাক্রান্ত কৈবর্ত্তজাতি দেখিলেন যে, বরেন্দ্রের অপর অনেক জাতিই মাছ ধরিয়া খায়, অথচ তাহারা সকলেই বৌদ্ধধর্ম্ম অথবা তৎকালীন ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করিতে পারে, তাহাতে কোন আপত্তি নাই, কেবল তাঁহাদের জন্যই এরূপ অন্যায় শাস্ত্রীয় ব্যবস্থা! তাঁহারা সকলেই মনে মনে বৌদ্ধধর্ম্মের শত্রু হইয়া দাঁড়াইলেন। প্রথম পালাধিকারকালে জনসাধারণের অধিকাংশই বৌদ্ধ ও সৌরধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন, তবে শৈবধর্ম্মাবলম্বীও নিতান্ত কম ছিলেন না। এই সময়ে কৈবর্ত্তগণও পূর্ব্বোক্ত কোন ধর্ম্মাবলম্বীর অধীন ছিলেন, সন্দেহ নাই। বৌদ্ধশাস্ত্রকারগণ তাঁহাদের উপর বিশেষ বিধি প্রচলিত করায় তাঁহারা উত্তেজিত হইবেন ও আপনাদিগকে অপমানিত জ্ঞান করিবেন, ইহা স্বাভাবিক। বৌদ্ধপ্রভাব ধ্বংস করিবার জন্য তাঁহারা তলে তলে শৈবশাক্তাদি ধর্ম্মসম্প্রদায়কে উত্তেজিত করিতে লাগিলেন। প্রজামণ্ডলীর চেষ্টাতেই ১ম গোপাল গৌড়াধিপত্য লাভ করেন, প্রজাগণের যত্নেই পালবংশের সৌভাগ্যরবি সমুদিত হয়, এই কারণে পালসম্রাট্‌গণের উপর প্রজাসাধারণের বরাবরই কিছু কর্ত্তৃত্ব ছিল। ৩য় বিগ্রহপালের মৃত্যুর পর গৌড়সিংহাসন লইয়া তিন ভ্রাতার গৃহবিবাদের ফলে, যখন ২য় শূরপাল ও রামপাল বন্দী হন, তখন এই দুই ভ্রাতার পক্ষাবলম্বিগণ প্রজাবৃন্দের শরণ গ্রহণ করিয়া থাকিবেন। বৌদ্ধশাসনের উপর কৈবর্ত্তসমাজ বীতশ্রদ্ধ ছিলেন—এখন তাঁহারা স্ব স্ব নৌবল লইয়া প্রজামণ্ডলীর পক্ষ হইয়া ২য় মহীপালকে আক্রমণ করিলেন। ২য় মহীপালের পরাজয় ও সন্ন্যাসগ্রহণের কথা পূর্ব্বেই লিখিয়াছি। এই সময়ে প্রজাগণের চেষ্টায় ২য় শূরপাল ও রামপাল কারামুক্ত হইলেও তাঁহারা আর গৌড়সিংহাসনে স্থান পাইলেন না। কৈবর্ত্তনায়ক দিব্য বা দিব্বোক কিছুদিনের জন্য মিথিলা হইতে বরেন্দ্রী পর্য্যন্ত অধিকার করিয়া বসিলেন। তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র ভীম গৌড় বা বরেন্দ্রীর সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইলেন।[১৫৪]

কেবল যে কৈবর্ত্তনায়ক পালসাম্রাজ্যগ্রাসে অগ্রসর হইয়াছিলেন, তাহা নহে। ২য়

(১৫৪) "মাংসভুজোচ্চৈর্দশকেন জনকভূর্দ্দশনোপাধিনা।
দিব্যাহ্বয়েন গীতা যাসালঙ্কৃতিরহারি কান্তাস্য।
ভ্রাতানুজভনুজস্য চ ভীমস্য বিষয়প্রহরকৃতঃ।
সাক্ষিথায় বরেন্দ্রী ক্রিয়াকমস্য খলু রক্ষণীয়াভূৎ।"
(রামচরিত ১।৩৮-৩৯)

শূরপালের পতনের পর পীঠীপতি দেবরক্ষিত মগধ অধিকার করিয়া বসিয়াছিলেন। সারনাথ হইতে নবাবিষ্কৃত সম-সাময়িক শিলালিপির সাহায্যে জানা গিয়াছে যে, 'গৌড়ে অদ্বিতীয় যোদ্ধা, সকাণ্ডপটিক, ক্ষত্রকুলের চূড়ামণি অঙ্গরাজ মহন নামে প্রখ্যাত (পাল)-রাজগণের এক মাননীয় মাতুল ছিলেন। তিনি যুদ্ধে দেবরক্ষিতকে জয় করিয়া নির্জ্জিত-শত্রুর বাধা হইতে মুক্ত-হইয়া-অধিকতর-দেদীপ্যমানা শ্রীরামপালের রাজলক্ষ্মী ধারণ করিয়াছিলেন।'[১৫৫]

সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, মাতুল মহনের যত্নেই রামপাল দেবরক্ষিতের কবল হইতে মগধাধিকার উদ্ধার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। কিন্তু দিব্য ও ভীমের হস্ত হইতে পিতৃরাজ্য উদ্ধার তাঁহার পক্ষে সহজসাধ্য হয় নাই।

এক সময়ে বরেন্দ্রের ঘরে ঘরে দিব্য ও ভীম সুপরিচিত ছিলেন। বরেন্দ্রের প্রান্তভাগে 'দিব্যের জাঙ্গাল', 'ভীমের ডাইঙ্গ' ও 'ভীমের জাঙ্গাল' এখনও কৈবর্ত্তনায়ক দিব্বোক ও ভীমের স্মৃতিরক্ষা করিতেছে।[১৫৬]

ভীমের রাজধানী

রামচরিতে লিখিত আছে, ভীম নিজ-রাজধানী সুদৃঢ় করিবার জন্য রাজধানীর উপকণ্ঠস্বরূপ একটী সুদৃঢ় 'ডমর' নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। বর্ত্তমান বগুড়া সহরের উত্তর হইতে মহাস্থানগড় ছাড়াইয়া কতকটা উত্তর পর্য্যন্ত দুর্গ-প্রাকারের ন্যায় একটী সমুচ্চ ও বিস্তৃত স্থান রহিয়াছে, অনেকেই উহাকে "ভীমের জাঙ্গালের অংশ" বলিয়া মনে করেন। ইংরাজ ঐতিহাসিক ঐ স্থান পরিদর্শন করিয়া লিখিয়াছেন—যে, এই স্থান ইতালীর গোলদুর্গের মত, কেবল নিকটবর্ত্তী সহরবাসী বলিয়া নহে, যাহাতে রাজ্যের চারিদিকের অধিবাসিগণ আপৎকালে আশ্রয়লাভ করিতে পারে, এই অভিপ্রায়েই এই সুবিশাল মৃৎপ্রাচীর নির্ম্মিত হইয়াছিল।[১৫৭]

উক্ত সুদৃঢ় ও বিশাল দুর্গপ্রাকার ও তন্মধ্যবর্ত্তী স্থানই রামচরিতে ভীমের 'ডমর' বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। রামপালের আক্রমণে ও প্রায় আটশত বর্ষের নৈসর্গিকবিপ্লবে উক্ত 'ডমর'

(১৫৫) "গৌড়েঽদ্বৈতভটঃ সকাণ্ডপটিকঃ ক্ষত্রৈকচূড়ামণিঃ
প্রখ্যাতো মহনাঙ্গপঃ ক্ষিতিভুজামাপ্তোঽভবন্মাতুলঃ।
তং জিত্বা যুধি দেবরক্ষিতমধাৎ শ্রীরামপালস্য যো
লক্ষ্মীং নির্জ্জিত-বৈরি-রোধনতয়া দেদীপ্যমানোদয়াম্।"
(বৌদ্ধবিহার-প্রতিষ্ঠা-উপলক্ষে গোবিন্দচন্দ্রমহিষী কুমরদেবীর সারনাথ-লিপি)
(Epigraphia Indica, Vol. IX. p. 325.)

(১৫৬) গৌড়রাজমালা, উপক্রমণিকা ১০ পৃষ্ঠা।

(১৫৭) "I am led to think that the enclosure was like the ring-fort of Italy, a place of temporary refuge, not only for the people of neighbouring town, but of country round, in times of danger" (W. W. Hunter's Statistical Account of Bengal (Bogra) p. 193.

ক্রমশঃ বিধ্বস্ত হইলেও এখনও যাহা আছে, তাহাতে পাশ্চাত্য ঐতিহাসিকগণের বিস্ময়োৎপাদন করিতে সমর্থ হইয়াছে, সন্দেহ নাই। সুতরাং উক্ত ডমরের পার্শ্বে যে কৈবর্ত্তনায়ক ভীমের রাজধানী ছিল, তাহাতে আর সন্দেহ থাকিতেছে না। ভীম কেবল নিজ-রাজধানী সুরক্ষার ব্যবস্থা করিয়া ক্ষান্ত ছিলেন না, তাঁহার অধিকৃত বরেন্দ্রীরাজ্যের দক্ষিণসীমা পাবনাজেলার সিরাজগঞ্জ হইতে রাজ্যের উত্তর সীমা ধুবড়ী পর্য্যন্ত এক সুবিস্তৃত জাঙ্গাল প্রস্তুত করাইয়াছিলেন, তাহা অদ্যাপি 'ভীমের জাঙ্গাল' নামেই পরিচিত।[১৫৮]

উভয় কৈবর্ত্তনায়ক তাঁহাদের আধিপত্যকালে বরেন্দ্রের নানাস্থানে প্রজাহিতকর নানাপ্রকার সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। রাজকবি সন্ধ্যাকর নন্দী রামপালকে রঘুকুলতিলক রামচন্দ্রের সহিত ও কৈবর্ত্তপতি ভীমকে রাবণের সহিত তুলনা করিলেও তাঁহার বর্ণনায় ভীমের চিত্র উজ্জ্বল ভাবেই বর্ণিত হইয়াছে। সন্ধ্যাকর নন্দী ভীম সম্বন্ধে লিখিয়াছেন,—

'বহুতর রত্নরাজির আশ্রয়ে সরস্বতীও স্বয়ং লক্ষ্মী হইয়া যাঁহাতে অধিষ্ঠিত হইয়াছিলেন, সেই সঙ্গে পরাজিত শত্রুলব্ধ শ্রেষ্ঠ অশ্ব, হস্তী ও বীরগণ পর্য্যন্ত তাঁহার অধীন হইয়াছিল। যে রাজাকে পাইয়া বিশ্ব অতিশয় সম্পদ্ লাভ করেন, সজ্জনগণও তাঁহার অযাচিত দানে কল্যাণভূমি লাভ করিয়াছিলেন। যাঁহার কল্পতরুর ন্যায় স্বভাবের গুণে যাচকগণ অবিরত অস্খলিতপদে জগতে বাস করিয়াছিল। সর্পালঙ্কৃত স্বয়ং চন্দ্রশেখর মহাদেব ভবানীর সহিত যাঁহার পাপ বিদূরিত করিয়া বিরাজিত ছিলেন। যে (ভীম) অতিশয় কীর্ত্তিদ্বারা উদ্দীপ্ত হইয়া দিঙ্মণ্ডলের মর্য্যাদা অক্ষুন্ন রাখিয়াছিলেন এবং ধর্ম্মমার্গে উৎসাহিত হইয়া মহাশয়পদবী লাভ করিয়াছিলেন।'[১৫৯]

উক্ত পরিচয় হইতে বেশ বুঝা যাইতেছে যে, কৈবর্ত্তপতি ভীম শিবশক্তির উপাসক ছিলেন; বিদ্যাবুদ্ধি, সম্পদ্, বদান্যতা, ধর্ম্মশীলতা ও প্রজাপ্রিয়তায় একদিন বরেন্দ্রভূমে তিনি যশস্বী

(১৫৮) শ্রীযুক্ত প্রভাসচন্দ্রসেনের বগুড়ার ইতিহাস ৩৪-৩৭ পৃষ্ঠায় ভীমের জাঙ্গালের বিস্তৃত বিবরণ আছে।

(১৫৯) "অস্মিন্ রত্নানামাশ্রয়ে সরস্বত্যপি স্বয়ং লক্ষ্মীঃ।
তে পারিজাতবাজিপ্রবরকরীন্দ্রাদয়োঽপ্যাসন্॥
বিশ্বম্ভরেণ লক্ষ্মীলেভেঽমৃতমপ্যলম্ভি সুমনোভিঃ।
কিঞ্চ লভতে স্ম শম্ভুরাজানং যং সমাসাদ্য॥
অজীজিবন্ জগদখিলং দধতঃ পারার্থ্যমর্থিনো ঘনাঃ।
অচ্যুতপদমধিরুহ্য যস্য চ কল্পদ্রুমপ্রকৃতেঃ॥
স ভবানীসমুপেতো ভুজঙ্গমণিভূষিতঃ স্বয়ং দেবঃ।
দ্বিজরাজকেতুরাসীন্মুক্তাপুণ্যস্য যস্যাত্বঃ॥
যোঽত্যন্ততো যশোভী রাজিতদিগ্ভিত্তিরহতমর্যাদঃ।
স্বীকৃতপদব্যালোভেন কৃতোৎসাহো বহন্ মহাশয়তাং॥"
(রামচরিত ২।২৩-২৭)

হইয়াছিলেন। প্রজাপ্রিয় এরূপ বুদ্ধিমান্ ও শক্তিশালী নৃপতিকে পরাজয় করা সহজসাধ্য ছিল না। সুতরাং পিতৃ-প্রজাগণের উপর নির্ভর না করিয়া রামপালকে অন্যত্র শক্তিসঞ্চয়ে মনোযোগী হইতে হইয়াছিল।

রামপাল

রামপাল ও তৎপুত্র রাজ্যপাল মিত্র ও সামন্তরাজগণকে একত্র করিবার জন্য রাঢ়, অঙ্গ, মগধাদি নানাস্থানে এমন কি বহু দূরদেশে ভ্রমণ করিয়াছিলেন। তাঁহাদের কৌশলে মিত্র ও সামন্তরাজগণ সমবেত হইয়াছিলেন। যে সকল পরাক্রান্ত সামন্তরাজ রামপালের পক্ষাবলম্বন করিয়াছিলেন, রামচরিতের টীকায় তাঁহাদের এইরূপ নাম পাওয়া যায়—

কান্যকুব্জরাজের সেনাপরাভবকারী মগধাধিপতি পীঠীপতি ভীমযশা, কোটাটবীর দক্ষিণ রাজচক্রবর্ত্তী বীরগুণ, উৎকলাধিপ কর্ণকেশরীর সেনাধ্বংসকারী দণ্ডভুক্তিপতি জয়সিংহ, দেবগ্রাম-প্রতিবদ্ধ বালবলভীপতি বিক্রমরাজ, অপরমন্দারপতি সমস্ত-আটবিকসামন্তচক্র-চূড়ামণি লক্ষ্মীশূর, কুজবটীর প্রতিপক্ষ-নৃপতিবিজয়ী শূরপাল, তৈলকম্পীয়-কল্পতরু রুদ্রশিখর, উচ্ছালপতি ভাস্কর ময়গলসিংহ, ঢেক্করীয়রাজ প্রতাপসিংহ, কযঙ্গলীয় মণ্ডলাধিপতি নরসিংহার্জ্জুন, সঙ্কটগ্রামীয় চণ্ডার্জ্জুন, নিদ্রাবলীয় বিজয়রাজ, কৌশাম্বীপতি বর্দ্ধন বা গোবর্দ্ধন ও পদুবন্বাপতি সোম এবং রামপালের অনুগত প্রতাপশালী মাতুলপুত্রদ্বয়।১৬০

(১৬০) "বন্দ্যগুণসিংহবিক্রমশূরশিখরভাস্করপ্রতাপৈস্তৈঃ
স মহাবলৈরুপেতো জেতুং জগতীচলত্তুঙ্গঃ॥"৫

'কান্যকুব্জরাজবাজিনী গঠনভুজঙ্গো ভীমযশোঽভিধানো মগধাধিপতিঃ পীঠীপতিঃ, গুণ ইতি নানাকুটকুট্টিম-বিকটকোটাটবীকণ্ঠীরবো দক্ষিণসিংহাসনচক্রবর্ত্তী বীরগুণো নাম, সিংহ ইতি দণ্ডভুক্তিভূপতিরদ্ভুতপ্রতাপাকর-কমলযুগল-তুলিতোৎকলেশকর্ণকেশরীসরিদ্বরদকুম্ভসম্ভবো জয়সিংহঃ, বিক্রম ইতি দেবগ্রামপ্রতিবদ্ধবসুধাচক্রবাল-বালবলভী-তরঙ্গবহল-গলহস্তপ্রশস্তহস্তবিক্রমো বিক্রমরাজঃ, শূর ইতি অপরমন্দার-মধুসূদনঃ সমস্তাটবিকসামন্ত-চক্রচূড়ামণিলক্ষ্মীশূরঃ, কুজবটীয়-প্রতিভটকরিকূটকমণকেশরী শূরপালশ্চ। শিখর ইতি স[illegible]রাজ-রাজি-গণ্ডগর্ব্বগহনদাবানলঃ তৈলকম্পীয়-কল্পতরুরুদ্রশিখরঃ। ভাস্কর [illegible]রতরবাললীলানিস্তৃণবৈরিবাহিনী-রুধিরপ্রবাহবিহিতাপরলোহিতার্ণবলয়িতোচ্ছালভূপালো ময়গলসিংহঃ প্রতাপ ইতি প্রতাপসিংহঃ প্রতিপক্ষ-কক্ষোণিভৃদক্ষৌহিণীদারুণপ্রবণক্রণবিভ্রংসভীষণপ্রয়াণ-ঢক্কারবো ঢেক্করীয়রাজঃ এভির্মহাবলৈরুপেতো রামপালঃ।

"প্রাপ্তপ্রবর্দ্ধিতার্জ্জুনবিজয়োঽর্থিতবর্দ্ধনঃ সোমমুখশ্চ।
অনুগতমাতুলসূনু-প্রবলভুজালম্বনো রামঃ॥"৬ (রামচরি

'প্রাপ্তো মিলিতঃ প্রবর্দ্ধিতো দেশকোষাদি-প্রসাদেন স্ফীতীকৃতঃ অর্জ্জুন ইতি [illegible] নর-সিংহার্জ্জুনঃ সঙ্কটগ্রামীয় চণ্ডার্জ্জুনশ্চ বিজয় ইতি নিদ্রাবলীয়-বিজয়রাজো যেন। বর্দ্ধন ইতি কৌশাম্বী[illegible](র)-প্রবর্দ্ধনঃ বর্দ্ধনঃ, সোম ইতি পদুবন্বাপ্রতিবদ্ধমণ্ডলাপ্রতিবদ্ধঃ সোমঃ, তৎমুখা অপরে চ সামন্তাঃ তৈঃ সহিতোঽনু-গতানাং মাতুলপুত্রাণাং রাষ্ট্রকূটানাং বক্ষ্যমাণানাং ভুজাবলম্বং যস্য' (রামচরিতটীকা)

উপরে যে সকল সামন্তরাজের সংশ্লিষ্ট রাজ্যসমূহের উল্লেখ করিলাম, তাঁহার বর্ত্তমান অব-স্থান জানিবার জন্য অনেকেই উৎসুক, কারণ এখন পর্য্যন্তও কেহই ঐ সকল রাজ্যের বর্ত্তমান অবস্থান-নির্ণয়ের আদৌ চেষ্টা করেন নাই, এজন্য পর পৃষ্ঠায় সংক্ষেপে তাহার বিবরণ দিতেছি:—

এই সঙ্কটকালে তাঁহার মাতুল মহণের পুত্র মহামাণ্ডলিক কাহ্নুরদেব ও সুবর্ণদেব এবং মহাপ্রতীহার শিবরাজ রামপালের দক্ষিণহস্তস্বরূপ কার্য্য করিয়াছিলেন। কাহ্নুরদেবের পিতা

১। পীঠী—রামচরিতটীকা হইতে মনে হয় যে, পীঠীপতি মগধ জয় করিয়া কতকটা মগধের অধিপতি হইয়াছিলেন, পীঠী মগধেরই সন্নিহিত, গোণ্ডয়ানা নামে খ্যাত প্রদেশের রাজধানী পূর্ব্বতন গড়-কটঙ্কের পার্শ্বেই পীঠন নামে প্রাচীন নগরী বিদ্যমান ছিল, (Terry's Voyage)। এই পীঠনকেই পীঠীনগরীর অপভ্রংশ বলিয়া মনে হয়। পীঠী-নগরী যে বিস্তীর্ণ ভূভাগের রাজধানী ছিল, তাহা প্রাচীন মুসলমান-ঐতিহাসিকগণের নিকট এক সময়ে ভিটী, ভিটা ও ভাটী নামে পরিচিত ছিল। মুসলমান-ঐতিহাসিকগণের গ্রন্থ আলোচনা করিয়া রেভার্টি সাহেব স্থির করিয়াছেন—'বেহারের দক্ষিণাংশ সংলগ্ন ও বাঙ্গালার পশ্চিমে সংলগ্ন ভূভাগই ভাটা বা ভাটী, এই ভূভাগের পশ্চিমাংশ সম্ভবতঃ পালামৌ, ছোটনাগপুর ও গাঙ্গপুর।' (Vide Major H. G. Raverty's, Tabakat-i-Nasiri, p. 588n and p. 593n.)

পীঠীপতি ভীমযশার নাম হইতে 'যশপুর' রাজ্যের নামকরণ হইয়া থাকিবে।

২। কোটাটবী—পীঠীরাজ্যের পূর্ব্বদিকে অবস্থিত বিশাল অরণ্যানীবেষ্টিত উড়িষ্যার গড়জাতপ্রদেশ। আইন্-ই-অকবরীতে এই স্থান কটক সরকারের অন্তর্গত 'কোটদেশ' বলিয়াই অভিহিত হইয়াছে।

৩। দণ্ডভুক্তি—পূর্ব্বে ১ম মহীপালের প্রসঙ্গে লিখিয়াছিলাম যে, দণ্ডভুক্তি স্থানে দন্তভুক্তি হইবে, [১৭৩ পৃষ্ঠায় ৯০ পাদটীকা দ্রষ্টব্য।] কিন্তু এখন রামচরিতে স্পষ্টই দণ্ডভুক্তি উল্লেখ দেখিয়া এই নামই প্রকৃত বলিয়া বোধ হইতেছে। বর্ত্তমান বিহার নামক স্থান পালরাজগণের সময় উদ্দণ্ডপুর ও প্রথম মুসলমান আমলে অদ্দণ্ড-বিহার নামেই পরিচিত ছিল; এক সময়ে এই উদ্দণ্ডপুরকেই দণ্ডভুক্তি বলিয়া মনে করিয়াছিলাম, কিন্তু যখন সমসাময়িক লিপিতেই উদ্দণ্ডপুর ও দণ্ডভুক্তির স্বতন্ত্র উল্লেখ পাইতেছি, তখন অভিন্ন বলিয়া ধরা যায় না। এই স্থান পরবর্ত্তী কালে বল্লালচরিতে 'উদন্তপুর' নামে পরিচিত হইয়াছে, এইরূপে দণ্ডভুক্তি 'দন্তপুর' বা 'দন্তপুর' এবং পরে দন্তন বা দাঁতনে পরিণত হওয়া কিছু বিচিত্র নহে। মুসলমান আমলে গঞ্জাম ব[illegible] উত্তরাংশ যেরূপ 'কলিঙ্গ-দণ্ডপৎ' নামে পরিচিত ছিল, সেইরূপ বর্ত্তমান উড়িষ্যার উত্তরাংশস্থিত গড়[illegible]প্রদেশ ও মেদিনীপুর জেলার দক্ষিণাংশ পালরাজগণের সময়ে 'দণ্ডভুক্তি' নামে অভিহিত হইত।

৪। দেবগ্রাম-প্রতিবদ্ধ বালবলভী—এই ভূভাগের প্রধান স্থান ছিল দেবগ্রাম। এখনও এই স্থান নদীয়া জেলার মধ্যে দেবগ্রাম নামেই প্রসিদ্ধ। রাণাঘাট হইতে ৫৷৹ মাইল পূর্ব্বে অক্ষা' ২৩° [illegible]" উঃ এবং দ্রাঘি° ৮৮° ৪৩' ৩০" পূঃ মধ্যে অবস্থিত। পুরাতন গড় ও পুষ্ক[illegible] কিছু ধ্বংসাবশেষ এখনও এই অঞ্চলে দৃষ্ট হয়। যেখানে বিক্রমরাজ রাজ[illegible] সেই স্থান 'বিক্রমপুর' নামে উক্ত দেবগ্রামের ৪ মাইল পূর্ব্বদক্ষিণে অবস্থিত। দেবগ্রামের চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী যে ভূভাগকে ভাগীরথী ও ইছামতীনদী চক্রবালের ন্যায় বেষ্টন করিয়া আছে, সেই স্থানই বালবলভী নামে পরিচিত ছিল।

৫। অপর-মন্দার—দক্ষিণরাঢ়ের পশ্চিমাংশ। ১ম মহীপালের সময় রণশূর সমস্ত দক্ষিণ-রাঢ়ের অধিপতি বলিয়া পরিচিত ছিলেন। কিন্তু রামপালের সময় শূরবংশের অধিকার অনেকটা কমিয়া কেবল অপর-মন্দার তাঁহাদের অধিকারভুক্ত থাকে। অকবরের সময়ে এই স্থান 'সরকার-মদারন্' নামে পরিচিত এবং ইহার পূর্ব্ব রাজধানী গড়-মন্দারণ নামেই বহুদিন

মথন বা মহন রাষ্ট্রকূটকুলতিলক বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন। তিনি মগধের পীঠীপতি

প্রসিদ্ধ ছিল। [১৪০ পৃষ্ঠায় বিবরণ দ্রষ্টব্য।] আইন্ ই-অক্‌বরীতে এই স্থান বাঙ্গালার দক্ষিণপ্রান্ত-ভূভাগ বলিয়া পরিচিত হইয়াছে।

৬। কুজবটী—বর্ত্তমান সাঁওতাল পরগণার দক্ষিণাংশ, এই ভূভাগের পূর্ব্বতন শাসনকেন্দ্র এখন কুজ্‌বড়ী বা কুবড়ী নামক গণ্ডগ্রামে পরিণত। এই স্থান নয়া-দুম্‌কা হইতে ১৪ মাইল উত্তরপূর্ব্বে দ্রাঘি° ৮৭° ২৫´ [illegible]″ পূঃ ও অক্ষা° ২৪° ২৭´ উঃ মধ্যে অবস্থিত। কুজ্‌বড়ী হইতে ৩ মাইল পশ্চিমে 'শূরুহা' নামে একটী ক্ষুদ্র শৈল আছে। 'শূরুহা' নাম এখানকার পরাক্রান্ত সামন্তরাজ 'শূরপালের' নামে শূরপাল-পাহাড়ের বিকৃতি হইতে পারে।

৭। তৈলকম্পী—মানভূম জেলায় শিখরভূম নামে খ্যাত। এখানে পূর্ব্বকাল হইতে শিখর-বংশের রাজত্ব। যেখানে এই শিখরবংশের পূর্ব্বতন রাজধানী 'তৈলকম্পী' অবস্থিত ছিল, অদ্যাপি সেই স্থান 'তেলকুপী' নামে পরিচিত। এই স্থান দামোদরের ধারে অক্ষা° ২৩° ৪০´ উঃ ও দ্রাঘি° ৮৬° ৩৯´ পূঃ মধ্যে শিখরভূমের অপর প্রাচীন রাজধানী পঞ্চকোটগড় হইতে ১০½ মাইল পশ্চিমোত্তরে অবস্থিত। এই শিখরবংশই এখন 'পঞ্চকোট' বা 'পাঁচেটের রাজবংশ' বলিয়া অভিহিত। পঞ্চকোট-রাজবংশমালার মধ্যেও 'রুদ্রশিখর' নাম বাহির হইয়াছে। তাহাতে এই রুদ্রশিখরের আবির্ভাব-কাল ১০২০ শক বা ১০৯৮ খৃষ্টাব্দ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

৮। উচ্ছাল—বর্ত্তমান বীরভূম জেলার কতকাংশ, শালতরুসমাকীর্ণ শালনদীর উত্তরে থাকায় এই স্থান 'উচ্ছাল' নামে পরিচিত ছিল, বীরবর সিংহবংশের রাজ্য হেতু পরবর্ত্তী কালে 'বীরভূম' নামে খ্যাত হইয়াছে। যেখানে এই সামন্তরাজ্যের শাসনকেন্দ্র ময়গলপুর ছিল, সেই স্থান এখন 'মহলপুর' বা 'মোলপুর' নামে অভিহিত। ইহা অক্ষা° ২৩° ৫৮´ ৪৫″ উঃ এবং দ্রাঘি° ৮৭° ৩৭´ পূঃ মধ্যে শিউড়ী হইতে ৪ মাইল উত্তরপূর্ব্বে ময়ূরাক্ষীনদীর উত্তরকূলে অবস্থিত। ইহার ১ পোয়া পশ্চিমে 'রাজনগর' গ্রাম, এখানে ভাস্করসিংহের রাজধানী ছিল বলিয়া প্রবাদ আছে। শালনদীর উত্তরবর্ত্তী 'জৈন্-উঝিয়াল্ পরগণা' প্রাচীন উচ্ছাল নাম রক্ষা করিতেছে।

৯। ঢেক্করী—বর্ত্তমান বর্দ্ধমান জেলাস্থ অজয়নদের উভয় তীরবর্ত্তী সেনভূম। লাউসেনের বংশধরগণের হস্ত হইতে এই স্থান কিছুদিন সিংহবংশের অধিকারভুক্ত হয়। ইহার প্রধান নগর 'ঢেকুর' হইতে 'ঢেক্করীয়' সামন্তরাজ্যের নামকরণ হইয়া থাকিবে। সামন্তরাজ প্রতাপ-সিংহের যেখানে রাজধানী ছিল, সেই স্থান কেন্দুলী হইতে ৬ মাইল দক্ষিণপূর্ব্বে অজয়নদের তীরে অক্ষা° ২৩° ৩৬´ ৩০″ উঃ এবং দ্রাঘি° ৮৭° ৩১´ ৩০″ পূঃ মধ্যে অদ্যাপি প্রতাপপুর নামে খ্যাত রহিয়াছে।

১০। কয়ঙ্গল—বর্ত্তমান নাম কাঁকজোল, বর্ত্তমান সাঁওতালপরগণার উত্তরাংশ ও পূর্ণিয়া জেলার দক্ষিণাংশ। [৬৭ পৃষ্ঠায় পূর্ব্ব পরিচয় দ্রষ্টব্য।]

১১। সঙ্কটগ্রাম—এই স্থানের সামন্তরাজ্য কয়ঙ্গলের পার্শ্বে থাকাই সম্ভবপর, কয়ঙ্গলের ন্যায় এই স্থানও 'অর্জ্জুন' উপাধিধারী চণ্ড নামক সামন্তরাজের শাসনাধীন ছিল। বর্ত্তমান পূর্ণিয়া ও মালদহজেলার মধ্যবর্ত্তী কোন স্থানে সঙ্কটগ্রাম থাকিতে পারে।

১২। নিদ্রাবলী—বারেন্দ্র-ব্রাহ্মণদিগের কুলগ্রন্থসমূহে 'নিদ্রালী' নামে পরিচিত। বর্ত্তমান রাজশাহী জেলার গোদাগাড়ী থানা হইতে ৮ মাইল পূর্ব্বদক্ষিণে এবং বোয়ালিয়া হইতে ৯ মাইল

কীর্ত্তির দেবরক্ষিতকে পরাজিত করিয়া কীর্ত্তি অর্জ্জন করেন। এই মহনের ভ্রাতুষ্পুত্র হইতেছেন শিবরাজ।[১৬১]

উক্ত পরিচয় হইতে প্রতিপন্ন হইতেছে যে, রামপাল রাষ্ট্রকূটরাজকন্যার গর্ভজাত এবং রামপালের সময় পর্য্যন্ত রাষ্ট্রকূটপ্রভাব গৌড়মগধ হইতে তিরোহিত হয় নাই। এ সময়েও অঙ্গ ও মগধ অঞ্চলে রাষ্ট্রকূটশাসন চলিতেছিল। এখনও মগধের প্রধান তীর্থ গয়াধামের অধিবাসী 'রাষ্ট্রকূট' নাম বিস্মৃত হন নাই। গয়া হইতে বুদ্ধ-গয়া যাইবার পথে বামভাগে ফল্গুনদী, তাহারই অপর পারে একটী গণ্ডশৈল 'রাষ্ট্রকূট' নামে অভিহিত হইয়া থাকে। এই শৈলোপরি প্রাচীন ধ্বংসাবশেষ দৃষ্ট হয়। সম্ভবতঃ এই স্থানে কিছুকাল রাষ্ট্রকূটবংশ অবস্থান করিতেন। অধুনা 'রাষ্ট্রকূট' নাম সেই রাষ্ট্রকূটসংশ্রবই সূচনা করিতেছে।[১৬২]

রামপাল মিত্র ও সামন্তরাজগণের সুবিশাল বাহিনী সংগ্রহ করিয়া গঙ্গাতীরে উপস্থিত হইলেন। রাষ্ট্রকূটবীর শিবরাজ রামপালের আদেশে পঞ্চাঙ্গপ্রসাদে প্রথমতঃ দুর্লঙ্ঘ্য গঙ্গোর্ম্মি-

পশ্চিমে, অক্ষা° ২৪° ২৩´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৮৮° ২৯´ ৪৫´´ পূঃ মধ্যে বিজয়নগর নামে একটী প্রাচীন গ্রাম আছে, তাহারই দেড় মাইল দক্ষিণে 'নিদ্রালী' গ্রাম ছিল,—এখানকার পুরাতন জমিদারী কাগজপত্র হইতে তাহার সন্ধান পাওয়া গিয়াছে, এখন তাহা পদ্মার গর্ভ মধ্যে। এখনও বিজয়নগর নিদ্রাবলীয় ধ্বংসস্তূপ বিজয়রাজের ক্ষীণ স্মৃতি বহন করিতেছে।

১৩। কৌশাম্বী—বর্ত্তমান রাজশাহী জেলায় 'কুশুম্বী' নামে এবং সরকারী জরিপের মানচিত্রে Kusamba নামে পরিচিত। রাজশাহীর প্রসিদ্ধ প্রাচীন স্থান মান্দা হইতে ৩ মাইল দক্ষিণপূর্ব্বে এবং বর্ত্তমান আত্রেয়ী নদীকূল হইতে ৩ মাইল পশ্চিমে অবস্থিত। এক সময়ে ইহার নিকট দিয়াই আত্রেয়ী প্রবাহিত হইত। মান্দা হইতে কুশুম্বী পর্য্যন্ত বহু প্রাচীন ধ্বংসাবশেষ দৃষ্ট হয়। এই অঞ্চল হইতেই শূরবংশীয় এক নৃপতির শিলালিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে।

১৪। পদুবন্বা—মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের মতে, এক্ষণে পাবনা নামে সুপ্রসিদ্ধ।

উক্ত স্থানগুলির বর্ত্তমান অবস্থান আলোচনা করিলে বেশ বুঝা যাইবে যে, রামপালের সময় গৌড়রাজ্য বহু সামন্তরাজ্যে বিভক্ত ছিল। পীঠী ও কোটাটবী ব্যতীত অপর দ্বাদশটী সামন্তরাজ্য লইয়া বোধ হয় দ্বাদশ ভৌমিক বা বারভূঁঞার সৃষ্টি। এই বারভূঞা যে পালরাজগণের দক্ষিণহস্তস্বরূপ ছিলেন, বিভিন্ন ধর্ম্মমঙ্গলে তাহার পূর্ব্ব পরিচয় রহিয়াছে। উক্ত স্থানগুলির পরিচয় হইতেও বুঝিতেছি যে, নিদ্রাবলি, কৌশাম্বী ও পদুবন্বা এই তিনটী স্থান বরেন্দ্রীর অন্তর্গত অর্থাৎ তৎকালীন কৈবর্ত্ত-রাজের অধীন থাকিলেও এখানকার সামন্তরাজগণ রামপালের পক্ষাবলম্বন করিয়াছিলেন।

(১৬১) 'সিন্ধুরাজঃ পীঠীপতির্দেবরক্ষিতো নাম যেন তেন মথনেন মথননাম্না মহন ইতি প্রসিদ্ধাভিধানেন রাষ্ট্রকূটকুলতিলকেন উপলক্ষিতং যদ্গোত্রং কুলং তৎপ্রভবং তদীয়-নন্দন-মহামাণ্ডলিক-কাহ্নুরদেবসুবর্ণদেবভ্রাতৃজ-মহাপ্রতীহারশিবরাজদেবপ্রভৃতিমুখ্যভুজদণ্ডবৃৎকৃষ্টরাষ্ট্রকূটসুভটং নিজং বন্ধুং মাতুলসন্তানং জেতারমজগণৎ।'

(রামচরিতটীকা ২।৮)

(১৬২) গয়াধামের মধ্যে 'রামসাগর' নামক সুবৃহৎ জলাশয় ও তাহার তীরে 'রামেশ্বর' নামে যে শিবলিঙ্গ দৃষ্ট হয়, তাহাও পালনৃপতি রামপালের কীর্ত্তি বলিয়াই মনে হয়।

ভেদ করিয়া অতি দ্রুতগতি ভীম-রক্ষিত বরেন্দ্রীবিষয়ে উপস্থিত হইলেন, প্রত্যেক বিষয়ের অনুসন্ধান লইলেন এবং প্রত্যেক গ্রামবাসীকে দেবব্রাহ্মণাদির ভূমিরক্ষা সম্বন্ধে অভয়দান করিয়া আসিলেন।[১৬৩]

তৎপরে রামপালের সৈন্য-সকল নৌসেতু প্রস্তুত করিয়া গুপ্তভাবে মহাবাহিনী (বড় গঙ্গা) পার হইল। রামপালের বিপুল-সেনায় বরেন্দ্রী সমাচ্ছন্ন করিল।[১৬৪] তাঁহার বীরপুত্র রাজ্যপাল চতুরঙ্গব্যূহ রচনা করিয়া তুমুল সমরের জন্য প্রস্তুত হইলেন।[১৬৫] কৈবর্ত্তপতি ভীমও নিশ্চিন্ত ছিলেন না, তিনিও সসৈন্যে যুদ্ধার্থ উপস্থিত হইলেন। তুমুল যুদ্ধ হইল। বরেন্দ্র-ভূমে এরূপ ভীষণ যুদ্ধ বোধ হয় আর কখনও হয় নাই। যে ধর্ম্মদ্রোহের উত্তেজনায় কৈবর্ত্ত-নায়ক দিব্য বরেন্দ্রবাসী জনসাধারণকে স্বপক্ষভুক্ত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, শিবরাজের আশ্বাসবাক্যে সেই জনসাধারণের মতিগতি পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল। এবার ভীম জনসাধারণের নিকট উপযুক্ত সাহায্যলাভে বঞ্চিত হইলেন। সুতরাং যথাসাধ্য যুদ্ধের পর বিপুল বাহিনীর সহিত ভীমকে সংগ্রামে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করিতে হইল। পূর্ব্বেই লিখিয়াছি, ভীম তাঁহার রাজধানী সুদৃঢ় করিবার জন্য নগরের উপকণ্ঠ-স্বরূপ একটী 'ডমর' নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। সেই ডমর ধ্বংস করিয়া রামপালসৈন্য ভীমের রাজধানী আক্রমণ করিল।[১৬৬] রামপালের হস্তে কৈবর্ত্তপতি বন্দী হইলেন। রামপাল তাঁহাকে বিত্তপালের তত্ত্বাবধানে রাখিয়া দিলেন। বিত্তপাল কৈবর্ত্তপতির পদোপযুক্ত আতিথ্য দেখাইয়াছিলেন।[১৬৭]

(১৬৩) "অথ তরসা শিবরাজেনাস্য হিতাম্বেষিণাজ্ঞয়া ভর্ত্তুঃ।
আশুগজেন বলবতা বাজিবরগ্যাতধাম্না চ॥
উদলঙ্ঘি মহাতটিনী শোভাবীতেন দুস্তরমহোর্ম্মিঃ॥
আপন্নভীমরক্ষঃ বিষয়গ্রামাঃ স্থলমদুষ্টা যা।
ত্রস্তানুস্যূতাবস্থমত্যমুনা নীতেন তেজসাভাক্তি।" (রামচরিত ১।৪৬-৪৮)

(১৬৪) "তস্য মহাবাহিন্যাঃ গুপ্তায়াং তরণিসম্ভবেনাভূৎ।
দ্বিষমহিসেনয়াতো মুখরিতদিক্কোলাহলঃ সমুত্তারঃ॥
আবাসয়ন্ স বিষমীচারছৈন্দমূরমূরিরচয়ন্।
উত্তরকূলং পরিতস্তরে তরস্বী মহাসিন্ধোঃ॥" (২।১০-১১)

(১৬৫) "অপি চণ্ডধামনন্দন বরচিহ্নরিপুস্তরবৃন্দঃ।
তুমুলমতুলরণরঙ্গচতুরঙ্গব্যূহবান্ বলং কলয়ন্॥" (২।৭)

(১৬৬) "অপি চাপমডমরমপ্রতিমপ্রদিপেহবধূনি ধনুপম্।
স ভবস্তাবিতজনকঃ করপল্লবলীলয়াগ্রবীৎ॥"
"স রামপালো ভবস্য সংসারস্যাপদঃ বিপদঃ ডমরনুপাংবং শক্রকৃতমলাবীৎ।"
(রামচরিতটীকা ১।২৭)

(১৬৭) "অথ বহুতরসা ধৃত্যা যুক্তো রামেণ বিত্তপালস্য।
সুনোরভ্যাসে সহসা সৌরেশিতব্যঃ প্রৈরি॥৩৬

ভীম বন্দী হইলে তাঁহার প্রিয়সুহৃদ্ হরি কৌশলে বিক্ষিপ্ত কৈবর্ত্তসৈন্য একত্র করিয়া মহোৎসাহে রামপালকে আক্রমণ করিলেন।১৬৮ আবার তুমুল যুদ্ধ উপস্থিত হইল। প্রথমতঃ অতর্কিত আক্রমণে পালপক্ষ ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। এইরূপে হরির বিশ্ববিজয়িনী শক্তিপ্রভাবে রামপালের পুত্র রাজ্যপাল রণস্থলে মূর্চ্ছিত হইয়াছিলেন। সংজ্ঞালাভের পর মহৌষধির গুণে শক্তিলাভ করিয়া তিনি কৈবর্ত্তসেনাপতিকে যমালয়ে পাঠাইলেন। এদিকে আর রাজ্যপ্রাপ্তির আশা নাই বুঝিয়া ভীম আত্মহত্যা করেন। রামপালের তীক্ষ্ণ চন্দ্রহাসের আঘাতে হরির মস্তকও দ্বিখণ্ডিত হইল।১৬৯

কৈবর্ত্তপতিকে বধ করিয়া রামপাল পিতৃরাজ্য বরেন্দ্রভূমি উদ্ধার করিলেন। রামপালের অপর পুত্র মদনপালের তাম্রশাসনে লিখিত আছে—

'সেই নরপতির (শূরপালের) সহোদর শ্রীরামপাল নামক নৃপতিও সেইরূপ দিব্য-প্রজার অর্থাৎ দিব্যনামক কৈবর্ত্তপতির অনুগত প্রজাগণের আক্রমণে ক্ষোভাহূত এবং বিধূত হইয়াও (অসুরের আক্রমণে) বাসবের ন্যায় ধৈর্য্যাবলম্বন করিয়াছিলেন। তাঁহার জনকের দীর্ঘ-শাসনসময়েই তিনি তেজোবীর্য্য প্রকাশ করিয়া শত্রুগণের চিত্তে বিস্ময় উৎপাদন করিয়াছিলেন।'১৭০

বৈদ্যদেবের লিপিতেও প্রকাশ—'সেই উর্জ্জস্বল-পৌরুষ (বিগ্রহপাল) নৃপতির পুত্র

(খ)

অয়মাতিথ্যকৃতার্থো লভতাভিমতং ন পুণ্যজনতোঽস্মাৎ।
সপরিণতিরঙ্গদোরীহিতমস্তন্ কমবহদর্কভুবঃ ॥৩৭

(১৬৮) "অথ ভীমানীকং তেন মহাতরসাশনৈরমেয়বলম্।
সমচীরত হরিসুহৃদা সুবিহতপরমণ্ডলাবরোধেন ॥৩৮
ক্ষিপ্তবিপক্ষাবনিনা কৌশবলেনোৎসৈন্যং মহোৎসাহাৎ।
উম্ম লিতেরিতপরম্পরকৃতসজ্যট্টনাগচয়ম্ ॥৩৯

(১৬৯) শক্তির্জগদ্বিজয়িনী বৃষয়িনস্তস্য সুমুমপাসগত।
স মূর্চ্ছিতোঽয়মনয়া ধাম ধরায়াং নিবেশয়ামাস ॥৪৪
তেন প্রতিহতমোহেন কম্প্রণেনারিরাকলিতমায়ঃ।
নিন্যে মৃত্যুস্থানং জেতা স পরাক্রমেণ হবেঃ ॥৪৬
রামেণো'চণ্ডরূপা হ্যপি দশাস্তোপহিতা বিপক্ষোরা।
যশিরশ্ছেদব্যতিকরমর্দ্দনের স্বয়ং হি বৃথা ॥৪৭
নিহতকটুঘস্য পুরো দারুণমাক্রন্দনং কিমপি দধতঃ।
ধৃতচন্দ্রহাসধারালঙ্কারাজঃ কৃতোঽস্য বধঃ।"৪৯ (রামচরিত ২য় পরিচ্ছেদ)

(১৭০) "এতস্যাপি সহোদরো নরপতির্দিব্যপ্রজানির্ভরক্ষোভাহূত-বিধূত-বাসববৃতিঃ শ্রীরামপালোঽভবৎ।
শাসত্যেব চিরং জগন্তি জনকে যঃ শৈশবে বিস্ফুরৎতেজোভিঃ পরচক্রচেতসি চমৎকারং চকার স্থিরং।"
(মদনপালের মদনলিপি ১৫শ শ্লোক)

হইয়াছিলেন রামপাল। তিনিও পালকুলাব্ধিজাত চন্দ্রের স্থায় সাম্রাজ্য উদ্ধারপূর্ব্বক খ্যাতি-লাভ করিয়াছিলেন। রামচন্দ্র যেরূপ অর্ণব লঙ্ঘন করিয়া রাবণবধান্তে জনকভূ অর্থাৎ সীতাকে উদ্ধার করিয়াছিলেন, রামপালও সেইরূপ যুদ্ধার্ণব লঙ্ঘন করিয়া পৃথিবীনায়ক ভীমরূপী রাবণবধান্তে জনকভূ অর্থাৎ পিতৃরাজ্য উদ্ধার করিয়া ত্রিজগতে যশস্বী হইয়াছিলেন।'[১৭১]

রামপাল বহু আয়াসে বহু অর্থব্যয়ে পিতৃরাজ্য উদ্ধার করিলেন। তাঁহার ভয়ে কৈবর্ত্ত-রাজের আত্মীয়স্বজন ও সামন্তরাজবংশীয়গণ কামরূপ ও কুচবিহারের জঙ্গলে গিয়া আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। আজও তথায় রাজবংশীগণের মধ্যে রামভীতি-প্রবাদ প্রচলিত রহিয়াছে। কিংবদন্তীর কুজ্ঝটিকায় রামপালের প্রসঙ্গ পরশুরামের নামে এখনও চলিয়া যাইতেছে। বগুড়া, রঙ্গপুর ও কুচবিহারে এখনও রাজা পরশুরামের প্রতাপের কথা ঘরে ঘরে উপকথায় পরিণত হইয়াছে। বলা বাহুল্য যে, এই উপকথা বা প্রবাদের নায়ক পরশুরামই গৌড়াধিপ রামপাল।

রামপাল পূর্ব্বতন কৈবর্ত্ত রাজধানীতে আর নিজ-সাম্রাজ্যের কেন্দ্র রাখা সুবিধাজনক বোধ করিলেন না, তাহারই কিছু দূরে গঙ্গা ও করতোয়া এই দুইটী স্রোতস্বতীর ব্যবধান-ভূভাগে "রামাবতী" বা রামপুর নামে নূতন রাজধানী প্রতিষ্ঠা করিলেন।[১৭২] রাজধানীর গৌরব বৃদ্ধির জন্য তাহার কিছু দূরে বহু অর্থ ব্যয়ে শংশদেব, শ্রীহেত্বীশ্বর চণ্ডেশ্বর ও ক্ষেমেশ্বরের সহযোগে অতি উচ্চ শিবমূর্ত্তি, অতি উচ্চ মন্দিরসহ দ্বাদশটী সূর্য্যমূর্ত্তি, সেই সঙ্গে স্কন্দ ও বিনায়কমূর্ত্তি, চেদিপ্রাসাদ তুল্য একাদশ রুদ্রের সমুচ্চ মন্দির, দেব আশাপালের উদ্দেশে বহুতর দেব ও সশিষ্য শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ স্থাপন, সুবিশাল জাগদ্দল-মহাবিহার নির্ম্মাণ করিয়া তন্মধ্যে লোকেশ (অবলোকিতেশ্বর) ও মহত্তারা নামে (বৌদ্ধ দেবীর) মূর্ত্তি, স্থানপ্রতিষ্ঠা করেন। এই বিপুল পুণ্যকীর্ত্তি-নিবন্ধন এই স্থান অপরিমিত পুণ্যভূমি বলিয়া পরিচিত হইল।[১৭৩] এ দিকে ব্রহ্মদেবকুল হইতে স্কন্দপুর পর্য্যন্ত শোণিতপুরের পার্শ্ব দিয়া গঙ্গা ও করতোয়া নাম্নী নদীসঙ্গমে অপুনর্ভব নামক মহাতীর্থ এবং তাহার কিছু দূরে কালীক্ষুত্তোখান

(১৭১) "তস্মোর্জ্জিত-পৌরুষস্য নৃপতেঃ শ্রীরামপালোঽভবৎ
পুত্রঃ পালকুলাব্ধি-শীতকিরণঃ সাম্রাজ্যবিখ্যাতিভাক্।
তেনে যেন জগত্রয়ে জনকভূলাভাদ্‌যথাবদ্বধঃ
ক্ষোণীনায়ক-ভীমরাবণবধাদ্‌যুদ্ধার্ণবোল্লঙ্ঘনাৎ॥" (কমৌলিলিপি ৪র্থ শ্লোক)

(১৭২) "অপ্যভিতো গঙ্গাকরতোয়ানর্ঘপ্রবাহপুণ্যতমাম্।
অপুনর্ভবাহ্বয়মহাতীর্থখিন্নলুঘোজ্জ্বলামস্থঃ॥" (রামচরিত ৩।১০)

(১৭৩) "কর্ব্বন্ ধনগ্রাগ্রা শুচিমংযোনিজা প্রগাজননীম্।
স চিরায় চরিতরক্ষোভুবমিষ্টামাপুরীচক্রে॥১
কুর্ব্বদ্ভিঃ শংশ দেবেন শ্রীহেত্বীশ্বরেণ দেবেন।
চণ্ডেশ্বরাভিধানেন কিল ক্ষেমেশ্বরেণ চ সনাথৈঃ॥২
'কুলরুদ্রদেবমুখ্যৈঃ সঙ্কেতপ্রাবণাদিভিস্তৈঃ।
সাক্ষাৎসংপ্রত্যয়বিধিপরমাধিষ্ঠানমাজনৈঃ॥৩

প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল।[১৭৪] বরেন্দ্রভূমির মধ্যে রামপালের রামপুর বা রামাবতী সর্ব্বাপেক্ষা মনোরম, মহাদ্রবিণ-বেষ্টিত সাধু ও পুণ্য জনের প্রিয়াবাস, প্রতিষ্ঠিত হরিহরমূর্ত্তি-শোভিত এবং কনকময় অত্যুচ্চ লেখাধিকরণের জন্যই সর্ব্বত্র পরিচিত হইয়াছিল।[১৭৫] এতদ্ভিন্ন রামপাল তিনটী সুবৃহৎ শিবালয় নির্ম্মাণ করাইয়া তৎপার্শ্বেই সাগরসদৃশ পুষ্করিণীও খনন করাইয়াছিলেন।[১৭৬] এইরূপে তিনি রাজধানীর সমৃদ্ধি ও সমস্ত চক্রবর্ত্ত-অধিকারে নিজ শাসন বিস্তার করিয়াছিলেন।

রামচরিতের উদ্ধৃত পরিচয় হইতে বুঝিতেছি যে, করতোয়া ও গঙ্গা নাম্নী নদীর মধ্যবর্ত্তী

স্কান্দেন তেন সবিনায়কেন নিচিতৈঃ প্রকাশরূপৈস্তৈঃ।
রুদ্রৈরেকাদশভির্বহুভিবিতভাম্পদৈর্দিব্যৈঃ ॥৪
অক্রূতভয়সপ্তপুরপ্রাংশুপ্রাসাদবেদীবাস্তব্যৈঃ।
উপনমদাশাপালৈর্দৈবৈঃ সম্ভাবিতাকলুষভাবাম্ ॥৫
ভগবদ্ভিরপি বিপ্রবরৈরপি প্রশান্ততমৈরপি চানূচানৈঃ।
..................পরমর্ষিভিরুপপাদিতব্রতোৎকর্ষাম্ ॥৬
মল্লাণাং স্থিতিমূঢ়াং জগদ্দলমহাবিহারচিতরাগাম্।
দধতী লোকেশমপি মহত্তারোদীরিতোরুমহিমানম্ ॥৭
অপরিমিতপুণ্যভূমিং সত্যাচারৈককেতনমভেদ্যাম্।
বিপুলতরপুণ্যকীর্ত্তিভিরভিহিতশুচিভাবমুপজাতাম্ ॥৮

(১৭৪) "ব্রহ্মকুলোদ্ভবাং স্কন্দনগরেণ মূর্চ্ছিতামিতাপচিতিম্।
ত্রৈরতিগুরুৎপলাবাসৈরশ্বৈর্গৈর্দ্ধিরিতশোণিতপুরাঙ্ক ॥৯
অত্যবিত্রা গঙ্গাকরতোয়ানঘপ্রবাহপুণ্যতমাম্।
অপুনর্ভবাহ্বয়মহাতীর্থবিপুলোজ্জ্বলামস্তঃ ॥১০
অপি পৃথুকচ্ছবসতীকৃশতরকালীকৃতোত্থানম্।"

(১৭৫) "অরবিন্দেন্দীবরময়সলিলতরঙ্গশীতলশ্বসনাম্।
অপি ধবলধামলেখাশশ্রীভাবাভিরামপুরলীলাম্ ॥২৩
অমরাবতীসমানানেকবারেন্দ্রীকৃতারম্ভাম্।
সুমনোভিরভিব্যাপ্তা নিষ্প্রত্যূহামৃতস্য পরিপূর্ণৈঃ ॥২৯
পুণ্যজনানাং বসতিমসাধুব্যবহারসঙ্কথাশূন্যাম্।
স কথাবিপুলমানবাভরদামুদগ্রদেবকুলজাতাম্ ॥৩০
দধতী রত্নানাং পটলপৃথুলং কামিতাং সুরেশ্বরপুরীম্।
রামাবতীমভিগুপ্তাং সবিভীষণশাসনামূহস্রাতাম্ ॥৩১
অকুরুত মহাদ্রবিণবেষ্টিতপ্রতিষ্ঠাধিরোপিতহরীশঃ।
কনকময়ধামলেখাধিকরণমপি মেরুশিখরমিব ॥৩২

(১৭৬) রোচিষ্ণুনামুনোপরি ধরণিভৃদালেঃ শিবালয়ত্রিতয়ে ॥৪১
স বিশালশৈলমালিতালীবন্ধমপুঙ্খিং সাক্ষাৎ।
অপি পূর্ত্তং পুষ্করিণীভূতং রত্নাকরভুব ভূপালঃ ॥৪২

ভূভাগে ও তাহার অদূরে শৈব, সৌর, শাক্ত, বৈষ্ণব, কৌমার ও বৌদ্ধ প্রভৃতি ধর্ম্মসম্প্রদায়ের চিত্তবিনোদন নয়নাভিরাম দেবমূর্ত্তি ও তাঁহাদের সুবৃহৎ মন্দির-সমূহ প্রতিষ্ঠা এবং নিজ-রাজধানীর নিকট বহুতর সাধুসজ্জন ও ব্রাহ্মণপণ্ডিতকে স্থাপন করিয়া রামপাল প্রজাসাধারণের যথেষ্ট ভক্তিশ্রদ্ধা আকর্ষণ করিয়াছিলেন। এরূপ সর্ব্বসাধারণের প্রীতিপ্রদ কার্য্য কখনও সম্পূর্ণরূপে বিস্মৃতি-সলিলে নিমজ্জিত হইবার নহে। পূর্ব্বেই আভাস দিয়াছি যে, বহুতর রাজন্যবর্গকে নিহত ও পরাজিত করিয়া রামপাল পরবর্ত্তীকালে সাধারণের নিকট দ্বিতীয় পরশুরামরূপে পরিচিত হইয়াছিলেন। বলা বাহুল্য, তাঁহারই সুবিশাল দেবকীর্ত্তির মাহাত্ম্য ঘোষণা করিবার জন্য পরবর্ত্তী কালে 'করতোয়ামাহাত্ম্য' সঙ্কলিত হইয়াছিল। রামচরিত ও করতোয়া-মাহাত্ম্য একত্র আলোচনা করিলে সহজেই হৃদয়ঙ্গম হইবে যে, বর্ত্তমান বগুড়া সহরের তিন ক্রোশ উত্তরবর্ত্তী করতোয়াতীরস্থ স্কন্দমন্দির-স্মৃতিভূষিত গোকুল নামক স্থান হইতে উত্তরে করতোয়াতীরস্থ ঘোড়াঘাট পর্য্যন্ত বিস্তীর্ণ ভূখণ্ডমধ্যে বহুশত কীর্ত্তি রক্ষা করিয়া রামপাল চিরস্মরণীয় হইয়াছিলেন। বহুশতাব্দী-ব্যাপী মুসলমান-প্রাধান্য ও অধিকাংশ কীর্ত্তিরাজি স্থানীয় মুসলমান-অধিবাসীর ভোগ ও অত্যাচারনিবন্ধন এককালে বিলুপ্ত হইলেও অদ্যাপি শত শত দীর্ঘিকা ও সরোবর এবং শত শত দেবমন্দিরের বিধ্বস্ত স্তূপ ও ভগ্ন ইষ্টকরাশি অতীত দেবকীর্ত্তির স্মৃতি রক্ষা করিতেছে।

রামপালের কীর্ত্তি ও তাহার নিদর্শন

পৌণ্ড্রবর্দ্ধন-রাজধানীর পার্শ্ববর্ত্তী কার্ত্তিকেয় বা স্কন্দমন্দিরের খ্যাতি খৃষ্টীয় ৮ম শতাব্দী হইতেই সর্ব্বত্র পরিচিত ছিল। নানা নৈসর্গিক ও রাষ্ট্রীয় বিপ্লবে রামপালের অভ্যুদয়ের পূর্ব্বেই সেই প্রসিদ্ধ মন্দির ধ্বংসমুখে পতিত হইয়াছিল, সম্ভবতঃ রামপাল প্রথমেই তাহার সংস্কার বা পুনঃ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। সুপ্রাচীন পৌণ্ড্রবর্দ্ধনপুর বা মহাস্থানগড়ের[১১৭] পার্শ্বেই রামপ্রতিষ্ঠিত সেই স্কন্দমন্দির বহুকাল বিদ্যমান ছিল, এখন তাহা করতোয়ার গর্ভশায়ী, পার্শ্ববর্ত্তী গোকুল নামক গ্রামে এখনও তাহার স্মৃতি-নিদর্শন বিদ্যমান। রামপাল যে দ্বাদশাদিত্য প্রতিষ্ঠা করেন, মহাস্থানগড়ের মধ্যে ও তৎপার্শ্বে তন্মন্দির এক সময় বিদ্যমান ছিল—এই স্থান মুসলমান অধিকার-ভুক্ত হইবার পর মুসলমান-হস্তে সেই সকল মন্দির বিধ্বস্ত হইয়াছিল, তাহারই একটীর উপকরণে মহাস্থানের বর্ত্তমান মুসলমান-মস্‌জিদ্ নির্ম্মিত হইয়াছে। এখানকার ধ্বংসাবশেষের মধ্য হইতেই শিল্পনৈপুণ্যের সুন্দর পরিচায়ক বৃহৎ সূর্য্যমূর্ত্তি বাহির হইয়াছে। যেখানে রামপাল কিছুকাল অবস্থান করিয়া পুণ্যক্ষেত্রের পত্তন করেন, মহাস্থানের দেড়ক্রোশ পশ্চিমে সেই স্থান 'চকরামপুর' নামে অদ্যাপি অভিহিত, এই চকরামপুরে এখনও স্তূপ ও বহু ইষ্টকখণ্ড দৃষ্ট হয়। এই গ্রামের পূর্ব্বপার্শ্বে ক্ষেত্রপালের নামানুসারে সুবৃহৎ 'খেতার দীঘী', তাহার কিছু দূরে হেত্বীশ্বরের নামানুসারে 'হেতার দীঘী' এবং তাহার একক্রোশ

(১১৭) করতোয়ামাহাত্ম্যেও এই স্থান পৌণ্ড্রবর্দ্ধনপুর ও মহাস্থান উভয় নামেই পরিচিত হইয়াছে। করতোয়া-মাহাত্ম্য ২৩শ ও ৫০ম শ্লোক দ্রষ্টব্য।

মধ্যে শংশদেবের নামনির্দ্দেশক সুবৃহৎ শংশার দীঘী বর্ত্তমান।[১৭৮] সুবৃহৎ খেতার দীঘীর পার্শ্বেই 'মঙ্গলনাথ ঠাকুরের ধাপ' নামে এক সমুচ্চ স্তূপ বিদ্যমান, এখানে পূর্ব্বে রামপাল-প্রতিষ্ঠিত ক্ষেত্রপাল অথবা কোন শিবমন্দির বিদ্যমান ছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই।

চকরামপুরের এক ক্রোশ মধ্যে পীড়াপাট গ্রাম, সম্ভবতঃ এখানে রাজপাটে রামপাল অভিষিক্ত হইয়াছিলেন। এই গ্রামের উত্তরে 'ভেকাদীঘী' নামে এক অতিবৃহৎ দীর্ঘিকা বর্ত্তমান, সম্ভবতঃ ভিক্ষুসঙ্ঘের নাম হইতে ভিক্ষুদীঘীর নাম হইয়া থাকিবে। এই সরোবরের দক্ষিণপার্শ্বে সঙ্ঘারামের ধ্বংসনির্দ্দেশক একটী বৃহৎ ভগ্ন ইষ্টকস্তূপও বিদ্যমান আছে।

পীড়াপাটের উত্তরপূর্ব্বে ধ্বস্ত মন্দিরস্তূপ-ভূষিত অজাকপুর নামক গ্রাম। রামপাল যে একাদশ রুদ্রের মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন, সেই একাদশ রুদ্রের একতম অজৈকপাদের নামানুসারে 'অজাকপুর' নাম হইয়া থাকিবে। রামপালের প্রতিষ্ঠিত জাগদ্দল অর্থাৎ দুর্গ-পরিখা-বেষ্টিত মহাবিহার অদ্যাপি বিহার নামে পরিচিত রহিয়াছে। বর্ত্তমান বিহার নামক গ্রামের পূর্ব্ব ও দক্ষিণে নাগর নদী, উত্তরে ভাসুবিহার ও শংশার দীঘী ও পশ্চিমভাগে গড়খাই বিদ্যমান। এক মাইল ভূভাগ লইয়া এই বিহার গ্রাম। গ্রামের দক্ষিণপূর্ব্বে 'বিহারী রাজার বাড়ী' এবং গ্রামের মধ্যে ১০।১২টী প্রাচীন পুষ্করিণী বিদ্যমান। 'বিহারী রাজার বাড়ী' নামে পরিচিত স্তূপাবশেষটী জাগদ্দল-মহাবিহার-নির্ম্মাতা নৃপতিরই স্মারক। এখন এখানে স্থানীয় মুসলমান-জমিদারের কাছারি, একটী অপ্রাচীন ও দুইটী প্রাচীন ভগ্ন মস্‌জিদ্ বিদ্যমান। এই গ্রামের সর্ব্বত্রই পুষ্করিণীর পার্শ্বে প্রাচীন ধ্বংসাবশেষের বিশাল নিদর্শন দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার উত্তরে অবস্থিত ভাসুবিহারে চীন-পরিব্রাজক খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে আগমন করিয়াছিলেন। তৎপূর্ব্ব হইতেই এই স্থান বৌদ্ধজগতে একটী অতি পুণ্যস্থান বলিয়া পরিচিত ছিল। ইহারই পার্শ্বে চীন-পরিব্রাজক যে অশোকস্তূপ দর্শন করিয়াছিলেন, তাহা এক্ষণে নরপতির ধাপ[১৭৯]নামেই পরিচিত। এই ভাসুবিহারের সমুচ্চ ধ্বংসাবশেষ এখনও বহুদূর হইতে সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছে। ইহার চারি পার্শ্বে অদ্যাপি গড়খাই বিদ্যমান। ভাসুবিহার কিছুদিন পূর্ব্বে ভীষণ জঙ্গলে পরিণত ছিল, অল্পদিন হইতে ইহার জঙ্গল কাটা হইতেছে। রামচরিতে যে স্থান অভেদ্য ও অপরিমিত পুণ্যভূমি বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে, সেই স্থান অদ্যাপি 'পুণ্যহট্ট' বা 'পুণট' নামে ভাসুবিহারের দুই ক্রোশ উত্তরে বিদ্যমান। এখানে বিশাল ধ্বংসাবশেষ ও ত্রিশতাধিক পুষ্করিণী রহিয়াছে। এই পুণটের উত্তরপশ্চিমে 'নান্দীয়াল' দীঘী অবস্থিত। এই দীঘী দৈর্ঘ্যে এক মাইলেরও অধিক, এত বড় দীঘী আর এ অঞ্চলে নাই।

রামচরিতকার রামপালের সকল কীর্ত্তির বিস্তারিত পরিচয় দিবার অবকাশ পান নাই।

(১৭৮) ঐ সকল দীর্ঘিকার অনতিদূরে আরও বহুসংখ্যক পুষ্করিণী বিদ্যমান, স্থানীয় মুসলমান কৃষকগণ তাহাদের পূর্ব্বনাম বলিতে পারে না।

(১৭৯) এ অঞ্চলে ধ্বংসাবশিষ্ট সমুচ্চ প্রাচীন স্তূপগুলি 'ধাপ' ও নাতি উচ্চ স্তূপগুলি 'ঢিপ' নামে পরিচিত।

করতোয়া-মাহাত্ম্যে তাহার অনেকটা পরিচয় পাইতেছি। যদিও মহাভারতের সময় হইতে করতোয়া পুণ্যতীর্থ বলিয়া প্রসিদ্ধ হইয়াছে, যদিও মৌর্য্য-সম্রাট্ অশোকের সময় হইতে চীন-পরিব্রাজকের সময় পর্য্যন্ত এই স্থানের বৌদ্ধক্ষেত্রের পরিচয় রহিয়াছে, যদিও গৌড়াধিপ জয়ন্তের সময় হইতে এখানকার কার্ত্তিকেয়-মন্দির সুপ্রসিদ্ধ ছিল, কিন্তু রামপালের যত্নেই যে এখানকার বিস্তীর্ণ জনপদ হিন্দু বৌদ্ধ সকলের নিকট মহাপুণ্যস্থান বলিয়া বিশেষভাবে সর্ব্বত্র পরিচিত হইয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। এই কারণেই করতোয়ামাহাত্ম্য "পরশুরাম-বিরচিতং" বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। এই বিস্তীর্ণ পুণ্যভূমি পৌণ্ড্র বা বরেন্দ্রভূমির উত্তর-পূর্ব্বাংশে অবস্থিত বলিয়া করতোয়া-মাহাত্ম্যে বর্ণিত সমুদায়স্থান একত্র উত্তর-পৌণ্ড্রখণ্ড বলিয়া পরিচিত হইয়াছে।

রামাবতীর বর্ত্তমান অবস্থান লইয়া নানা মত প্রচলিত রহিয়াছে। কেহ কেহ মনে করেন যে, আইন্-ই-অকবরী-বর্ণিত সরকার জিন্নতাবাদের মধ্যে যে 'রমৌতী' নামক বর্দ্ধিষ্ণু গ্রামের উল্লেখ রহিয়াছে, বর্ত্তমান মালদহজেলার যে স্থান এক্ষণে 'অমৃতী' নামে পরিচিত, তাহাই রামপালের প্রতিষ্ঠিত রামাবতী।

রামাবতীর বর্ত্তমান স্মৃতি-নিদর্শন

কিন্তু আমরা এই স্থানকে রামাবতী বলিয়া গ্রহণ করিতে পারিলাম না। এই স্থান রামাবতী-প্রতিষ্ঠার পূর্ব্ব হইতেই রমাবতী ও তাহারই অপভ্রংশে প্রাচীন ধর্ম্মমঙ্গলসমূহে 'রমতী' নামে আখ্যাত হইয়াছে। এই স্থানের সহিত পূর্ব্বতন পালরাজগণের সংস্রব ছিল বটে, কিন্তু এখানে রামপাল রাজধানী পত্তন করেন নাই। রামচরিত পাঠ করিলে মনে হইবে, করতোয়া ও গঙ্গানদী প্রবাহিত ভূভাগের মধ্যেই পূর্ব্বোক্ত রামপালের কীর্ত্তিরাজির কিছু দূরে রামপালের রামাবতী অবস্থিত ছিল।

পূর্ব্বোক্ত দেবকীর্ত্তির ধ্বংসাবশেষ ছাড়াইয়া উত্তরে বরাবর গাঙ্গনইর কূলে কৈবর্ত্ত-নায়ক ভীমের লীলা ও কীর্ত্তিনিকেতনের বিগতস্মৃতি জাজ্বল্যমান রহিয়াছে। পূর্ব্ববর্ণিত মহাবিহারের তিন ক্রোশ উত্তরে ভীমের জাঙ্গালের উভয়পার্শ্বে 'কীচক' নামক গ্রাম।* প্রবাদ এই যে, এখানকার মহাশ্মশানে গাঙ্গনদীর কূলে কীচকের সঙ্গে লক্ষ লোকের শবদাহ হইয়াছিল। সম্ভবতঃ রামপালের হস্তে ভীম পরাজিত ও মৃত্যুমুখে পতিত হইলে এখানে তাঁহার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া এবং সেই সঙ্গে রণস্থলে নিহত তাঁহার আত্মীয়-স্বজন ও সেনামণ্ডলীরও শব দাহ হইয়া থাকিবে;—সেই স্মৃতি লোকপরম্পরায় এখনও চলিয়া আসিতেছে। এখানকার গাঙ্গনদীর ঠিক অপর পারে হরিপুর গ্রাম ভীমসুহৃদ্ হরির ক্ষীণস্মৃতি রক্ষা করিতেছে। এ ছাড়া কীচকের উত্তরপশ্চিমে দুই মাইল দূরে ভীমের পিতা রুদোকের স্মৃতিজ্ঞাপক রুদাইপুর গ্রাম রহিয়াছে। কিছুদিন পূর্ব্ব পর্য্যন্ত এই স্থান ভীষণ জঙ্গলে আবৃত ছিল, অল্প দিন হইল নিকটবর্ত্তী গ্রামবাসী মুসলমান-কৃষাণগণের যত্নে বিশাল মাঠ ও কৃষিক্ষেত্রে পরিণত হইয়াছে। এখনও এখানে ১৫।১৬টী পুষ্করিণী, ধ্বংসাবশেষ মধ্যে বহুস্থানব্যাপী খণ্ড ইষ্টকরাশি ও পূর্ব্বতন প্রাসাদ বা মন্দিরসংলগ্ন প্রস্তরখণ্ড দৃষ্ট হয়।

কদাইপুরের নিকটে সোনাগাড়ী, খরপা, সালদহ ও বট্টা গ্রাম। এই চারিটী সংলগ্ন গ্রাম লইয়া ভীমের রাজধানী ছিল বলিয়া প্রবাদ আছে। এখনও এখানে বহুসংখ্যক দীর্ঘিকা, সরোবর ও মন্দিরসমূহের ধ্বংসনির্দ্দেশক বহু ইষ্টকস্তূপ চারিদিকেই বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে। বিশেষতঃ সালদহ গ্রামের মধ্যে এখনও পর্য্যন্ত নিরক্ষর মুসলমানকৃষকগণ ভীমরাজের বাড়ী নির্দ্দেশ করিয়া থাকে। ঐ নির্দ্দিষ্ট ভূখণ্ডের চারিদিকে গড়খাই ও মধ্যভাগে সমুচ্চ ভগ্ন ইষ্টকস্তূপ ও ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত ইষ্টকখণ্ড এখনও দেখিতে পাওয়া যায়। সকল স্থানে এখন আর লোকালয় নাই, কেবল রাজবাড়ীর নিকট এক মুসলমানের সুপ্রাচীন ভগ্ন দরগা ও তন্মধ্যে আরব্যভাষায় উৎকীর্ণ এক খণ্ড প্রস্তরফলক দৃষ্ট হয়। ভীমরাজার বাড়ীর উত্তরপশ্চিমে এক বৃহৎ দীর্ঘিকা রহিয়াছে, হিন্দুরা তাহাকে 'ভীমসাগর' এবং মুসলমানেরা 'সাহেব পুখুর' বলিয়া অভিহিত করিতেছে। সাধারণের বিশ্বাস এই যে, এই সরোবরের জল অতলস্পর্শী, এই পুষ্করিণীতে কুম্ভীর থাকায় ভয়ে কেহ ইহার জল স্পর্শ করে না। বগুড়ার সহরের উত্তরে সুবিল হইতে অঙ্গুরীয়াকারে ভীমের জাঙ্গাল আরম্ভ এবং উক্ত সালদহ গ্রামে সেই জাঙ্গাল শেষ হইয়াছে।

সালদহ-বট্টাগ্রামের উত্তর পার্শ্বে গাঙ্গনদী এবং দামুকদহবিলের সঙ্গম, এই সঙ্গম অতি বিস্তৃত, এপার ওপার লক্ষ্য হয় না। বর্ষাকালে এই দামুকদহবিল ও দুই ক্রোশ উত্তরবর্ত্তী কাতলামারীর বিল এক হইয়া সুবিস্তীর্ণা স্রোতস্বতীর আকার ধারণ করে, এই উভয় বিলকেই সাধারণে করতোয়ার প্রাচীন খাদ বলিয়া মনে করেন, পূর্ব্বকালে এইস্থান দিয়াই খরস্রোতা করতোয়া প্রবাহিত হইত। গাঙ্গনদী ও দামুকদহ সঙ্গমের উত্তর পার্শ্ব হইতে রামাইপুরা বা রামাপুরার কাঁঠাল বা সুবিশাল জঙ্গল আরম্ভ। এখান হইতে উত্তরে গোবিন্দগঞ্জের দক্ষিণ করতোয়াতীরবর্ত্তী সাহেবগঞ্জ পর্য্যন্ত প্রায় ৪ ক্রোশ ব্যাপী ভূভাগ 'রামাপুরার কাঁঠাল' বলিয়া পরিচিত। দশবর্ষ পূর্ব্বেও এখানে এরূপ ভীষণ জঙ্গল ছিল, যে হস্তিপৃষ্ঠে ইহার মধ্যে প্রবেশ করাও কষ্টসাধ্য হইত, এখনও স্থানে স্থানে ভীষণ দুর্ভেদ্য জঙ্গল বিদ্যমান। অল্প দিন হইতে এই জঙ্গলমধ্যে স্থানে স্থানে সাঁওতালেরা উপনিবেশ ও চাষআবাদ করিয়া অনেক জঙ্গল পরিষ্কার করিয়াছে। এই বিশাল রামাপুরার কাঁঠালমধ্যে এখনও শত শত পুষ্করিণী ও বহুসংখ্যক বিশাল দীঘিকা এবং তাহাদের তীরে প্রাচীন অট্টালিকাদির ধ্বংসনিদর্শন অপরিমিত ভগ্ন ইষ্টকরাশি ও মধ্যে মধ্যে দুই একখানি প্রস্তরখণ্ড বিরাজ করিতেছে। দেখিলেই মনে হইবে যে, একটী বহুজনাকীর্ণ বিলুপ্ত রাজধানীর বিশাল ধ্বংসাবশেষ বক্ষে ধারণ করিয়া এই জনমানবহীন অরণ্যভূভাগ অবস্থিত রহিয়াছে। এই ভূভাগের ভূসংস্থান অনুসন্ধান দ্বারা স্থিরীকৃত হইয়াছে যে, এক সময়ে ইহার পূর্ব্বে ও উত্তরে করতোয়া, দক্ষিণে গঙ্গানদী বা লোকপ্রচলিত গাঙ্গনই এবং পশ্চিমে দুর্জ্জয় গড়খাই দ্বারা সুরক্ষিত ছিল, বলা বাহুল্য অতীত কীর্ত্তির মহাশ্মশান এই রামপুরার কাঁঠালই এক সময়ে প্রাচ্য ভারতের গৌরবস্পর্দ্ধী রাজধানী রামাবতী বলিয়া পরিচিত ছিল।

এই রামপুরা কাঁঠালের ঠিক মধ্যস্থলে ৭৬৯ বিঘা পরিমিত স্থান এখনও 'রামপুর মৌজা'

নামে পরিচিত। এই স্থানের মধ্যেই রামপালের বিলুপ্ত প্রাসাদের চিহ্ন এবং তিনটী শিবমন্দির সংলগ্ন রামচরিত-বর্ণিত 'বিশাল শৈলমালিতালীবদ্ধ' 'সাক্ষাৎ অম্বুধি সদৃশ পুষ্করিণী' এখনও বিদ্যমান, তন্মধ্যে সর্ব্ববৃহৎ সরোবরটী অদ্যাপি জমিদারের চিঠায় 'রামসাগর' এবং আধুনিক সাঁওতালদিগের নিকট 'বড়-পুখুর' নামে পরিচিত। রামচরিতেও রামাবতীর মধ্যবর্ত্তী রমণীয় স্থানটী 'রামপুরি' বলিয়াই অভিহিত হইয়াছে। কালের কি অপূর্ব্ব পরিণাম! এক সময় যে স্থান কনকময়-লেখাধিকরণ ও গগনচুম্বী সহস্র সহস্র হর্ম্ম্য শোভিত, লক্ষ লক্ষ লোকের সমারোহে মুখরিত এবং দিগন্ত-বিশ্রুত ছিল, এখন সেই স্থান জনমানবহীন হিংস্র ব্যাঘ্র-ভল্লুক-সমাকীর্ণ অতি ভীষণ অরণ্যানীতে পরিণত!

রামপালের সময় নাগবংশ উত্তর-বঙ্গের কোথাও কোথাও প্রাধান্য-বিস্তার করিয়াছিলেন। স্থানীয় নাগরনদী এই নাগবংশের স্মৃতি বলিয়াই মনে হয়। মহাবনে নাগবংশের শাসনকেন্দ্র ছিল। তাঁহারা মগধের রাষ্ট্রকূটবংশীয় তুঙ্গগণের প্রভাব অনেকটা খর্ব্ব করিয়াছিলেন। সেই নাগদিগকেও রামপাল শাসন করেন।[১৮০] বর্ম্মবংশীয় পূর্ব্বদিকের অধিপতিকে আত্মরক্ষার্থ উৎকৃষ্ট হস্তী ও আপনার রথ দান করিয়া রামপালের তুষ্টিবিধান করিতে হইয়াছিল।[১৮১] তৎকালে রামপাল উৎকলের ভবভূষণসন্ততি অর্থাৎ গাঙ্গেয়-বংশকেও অনুগ্রহ বা তাঁহাদের পক্ষাবলম্বন এবং নিশাচরদিগকে নিহত করিয়া সমস্ত গৌড়রাজ্য রক্ষা করিয়াছিলেন।[১৮২] তাঁহার আধিপত্যকালে মায়ন নামক তাঁহার এক সামন্ত-নৃপতি প্রজারক্ষার জন্য কামরূপপতিকে জয় করিয়াছিলেন।[১৮৩]

এইরূপে পূর্ব্বে কামরূপ, পশ্চিমে মগধ, উত্তরে মিথিলা এবং দক্ষিণে কলিঙ্গ এই বিস্তীর্ণ জনপদের উপর আধিপত্য বিস্তার করিয়া রামপাল প্রিয় পুত্র রাজ্যপালের উপর রাজ্যশাসনভার অর্পণ করিলেন এবং নিজে প্রিয়বন্ধুবান্ধবসহ পরম সুখে কালাতিবাহিত করিতে লাগিলেন। রাজ্যপালের সুশাসনে গৌড়সাম্রাজ্যের যথেষ্ট

রাজ্যপাল

(১৮০) "তুঙ্গমহাস্তোগালিধ রালযিমশাক্ মহাবনবায়ঃ।
তেন বাধাবা নাগা নাকস্থাহেলয়া তত্রভূৎ ॥৪৩

(১৮১) স্বপরিত্রাণনিমিত্তং পত্যা যঃ প্রাগ্দিশীয়েন।
বরবারণেন চ নিজস্যন্দনদানেন বর্ম্মণারাধে ॥৪৪

(১৮২) ভবভূষণসন্ততিভুবমনুজগ্রাহজিতমুৎকলত্রং যঃ।
জগদবতিস্ম সমস্তং কলিঙ্গতস্তান্ নিশাচরান্ নিঘ্নন্ ॥৪৫
যো বাজিনামধিভুবা মাগাবলিসংঘট্টেরিতস্কন্ধঃ।
কৃতসাহায়কবিধিনা দেবঃ প্রিয়কারিণাপ্রীণি ॥৪৬

(১৮৩) তস্য জিতকামরূপাদিবিষয়বিনিযুক্তঃ মানসম্পাত্তঃ।
মহিমানমায়ননৃপো যতমানস্ত প্রজাভিরকার্ষীৎ ॥৪৭
ইতি রাজরাজতোগ্যায়লকাদিব বিবিধসেবধিভরসমৃদ্ধাং।
রামাবতীং গৃহীতানুযোধ্যায়সৌ পুরীং তামমৎ ॥"৪৮ (রামচরিত ৩য় পরি০)

সুখসমৃদ্ধি বৃদ্ধি পাইয়াছিল, তাহাতে রামপাল অতিশয় সন্তুষ্ট ছিলেন। এইরূপ আনন্দে কিছুকাল অতিবাহিত হইলে প্রজাবৃন্দকে কাঁদাইয়া রাজ্যপাল ইহলোক পরিত্যাগ করিলেন। এই সময়ে রামপাল মুদ্গগিরিতে অবস্থান করিতেছিলেন। এই নিদারুণ শোকসংবাদ পৌঁছিবার পূর্ব্বেই তিনি শুনিলেন, তাঁহার চিরহিতৈষী পরম ধার্ম্মিক মথন ইহলোক পরিত্যাগ করিয়াছেন। বৃদ্ধ নৃপতি তাঁহার বিরহে এতই মুহ্যমান হইয়াছিলেন যে, সেই বিরহব্যথা দূর করিবার জন্য তিনি গঙ্গায় প্রবেশ করিলেন।[১৮৪] এইরূপে পালবংশীয় এক মহাপ্রাণের জীবনাবসান হইল এবং তৎপুত্র কুমারপাল পিতৃসিংহাসনে অভিষিক্ত হইলেন।

রামপালের উপযুক্ত পুত্র কুমারপাল বরেন্দ্রভূমির উদ্ধারসাধন-কালে জ্যেষ্ঠ রাজ্যপালের ন্যায় একজন সেনানায়ক ছিলেন, তাঁহার বীর্য্যবত্তা ও সৎসাহসের অভাব ছিল না। কিন্তু রামপাল যেরূপ কৌশল, সৎসাহস, বীর্য্যবত্তা ও সর্ব্বধর্ম্মের প্রতি সমান অনুরাগ দেখাইয়া পিতৃরাজ্য উদ্ধার ও রাজ্যবিস্তারে সমর্থ হইয়াছিলেন, দেহাবসানের পর শাসননীতি-সংরক্ষণে তাঁহার উত্তরাধিকারিগণ সেইরূপ কার্য্য করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন বলিয়া মনে হয় না। তাঁহার মৃত্যু-

কুমারপাল

(১৮৪) "তত্র স রাজা নিবসন্নানাবিষয়সন্নিবেশেন।
সূনুসমর্পিতরাজ্যো রামঃ কান্তাসখশ্চিরং রেমে॥১
অমুনা সতী বরেন্দ্রী যাতাথদিব্যবিষয়োপভোগসুখং।
কচিদপি কদাপি দুর্জ্জনদূষিতচর্য্যা ন সা সেহে॥২
কৃচ্ছ্রেণ রক্তগর্ভাস্সূনুস্তস্যাজ্ঞয়াশু চাতুর্য্যাৎ।
জনকভুবমনুমন্যাশ্রিতসৌতবিধিস্ততো বনং নিন্যে॥৩
নৃপশাসনশ্রুতিশ্রিতমূর্চ্ছাপ্রতিপত্তিমিয়মবাপ্য ততঃ।
(অন্তঃ) স্থিতপ্রণয়া ঘননেত্রাগতযন্ত্রভরাভিদধে॥৪
অভয়দমনা বিলাপোদিতমন্যুকৃতসমস্তলোকাবিগ্রহনির্জ্জিতকামরূপভূৎ॥৫
তং গীতরামচরিতং সহজেন সমং প্রতীতসুতভাবং।
পরমবনন্তমসেচনকরামো রাজ্যপালমনৈষীৎ॥৬
উন্মুদ্রয়তা কুমুদং বিভাবয়তা শিলান্তরং গোভিঃ।
জনারাতিমর্দ্দ চ কলাদিনা ভুবনাধিপোঽমুনা মুমুদে॥৭
প্রাপ্তে কালে সন্নিভি দুর্ব্বাসসা দিতাশ্রবসেতুঃ।
বৃষজিন্মথনোঽস্তুতমুনিঃশ্রেণিকয়াত্রিস্মৃতপুরান্তরয়া॥৮
ইত্যধিমুদ্গিরি কলয়ন্ ব্রহ্মভুবঃ বং বহপ্রদাতাঽসৌ।
কৃতনিশ্চয়ঃ কৃতার্থঃ প্রাপ্তিতপৃথ্বীপতির্হাসয়িতৈ॥৯
জনজাতে রুদতি শুচা সাযমবগাহ্য জহ্নুজং পুণ্যং।
বিরহসহপরিজনৈস্থ্রিদিবং রামো জগাম স বভূবং॥"১০
(রামচরিত ৪র্থ পরিঃ)

সংবাদ ঘোষিত হইবার পর তাঁহার অধীন সামন্তবর্গ অনেকেই স্বাধীনতা-অবলম্বনে প্রয়াসী হইয়াছিলেন, তন্মধ্যে কামরূপপতি তিগ্ম্যদেব ও দক্ষিণবঙ্গপতি প্রধান। এই উভয়ে পালাধীন সমস্ত পূর্ব্ববিভাগে বিদ্রোহবহ্নি জ্বালাইয়াছিলেন। গৌড়েশ্বর কুমারপাল প্রিয়বয়স্য, প্রধান মন্ত্রী ও সেনাপতি বৈদ্যদেবকে সেই বিদ্রোহদমনে নিযুক্ত করেন। বৈদ্যদেবের তাম্রশাসনে সেই ঘটনা এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে—

'প্রাগ্জ্যোতিষপ্রদেশে সংকৃত তিগ্ম্যদেব-নৃপতির বিকৃতি অবগত হইয়া গৌড়েশ্বর সেই নরেশ্বরের পদে কীর্ত্তিমান্ বৈদ্যদেবকে নিযুক্ত করিয়াছিলেন।'১৮৫

কুমারপাল বেশী দিন রাজ্যভোগে সমর্থ হইয়াছিলেন বলিয়া মনে হয় না। তবে যত দিন তিনি ও তাঁহার প্রিয় মন্ত্রী বৈদ্যদেব গৌড়মণ্ডলে বিরাজমান ছিলেন, তত দিন পালরাজ্যের অধঃপতন কিছু দিনের জন্য যেন বন্ধ ছিল। মনহলি তাম্রলিপিতে বর্ণিত হইয়াছে, 'কুমারপাল নিজ আয়ত বাহুবীর্য্যে প্রবল অরাতিকুলের কীর্ত্তি-সমুদ্র পান করিয়াছিলেন এবং দেবেন্দ্র-বধূ-কর্ত্তৃক কপালে প্রদত্ত কর্পূর-পত্র-লেখায় যশস্বী হইয়াছিলেন।'১৮৬ রণক্ষেত্রে প্রাণ বিসর্জ্জন করিলে দেববালারা স্বর্গলোকে মৃতের অভিনন্দন করিয়া থাকেন, এ বিশ্বাস ভারতের সর্ব্বত্র প্রচলিত। সুতরাং মনহলি-তাম্রলিপির প্রচ্ছন্ন উক্তি হইতে মনে হয় যে, কুমারপাল শত্রুকুল নিঃশেষ করিয়া রণস্থলেই প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন।

কুমারপালের মৃত্যুর পর তৎপুত্র ৩য় গোপাল পিতৃসিংহাসনে অভিষিক্ত হইলেন। খুব সম্ভব, বাল্যকালেই তিনি পিতৃরাজ্য প্রাপ্ত হন। তাঁহার অদৃষ্টে বেশী দিন রাজ্য-সুখ-ভোগ ঘটে নাই। রামচরিতকার লিখিয়াছেন যে, 'শত্রুনাশের উপায় অবলম্বন করিয়া তিনি স্বর্গগমন করিয়াছিলেন।'১৮৭ এই উক্তি হইতে মনে হয় যে, ৩য় গোপাল যুদ্ধে, অথবা ঘাতুকের হস্তে মানবলীলা সম্বরণ করেন। মাঁদা হইতে এক গোপালদেবের শিলালিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে। কেহ কেহ উক্ত গোপালদেবকেই ৩য় গোপাল বলিয়া মনে করেন, কিন্তু সেই লিপির অক্ষরকাল আলোচনা করিলে তাঁহাকে আমরা ২য় গোপাল বলিয়াই মনে করি।

৩য় গোপাল

(১৮৫) "এতাদৃশো হরিহরিদ্ভুবি সংকৃতস্য শ্রীতিগ্ম্যদেবনৃপতের্বিকৃতিং নিশম্য।
গৌড়েশ্বরেণ ভুবি তস্য নরেশ্বরত্বে শ্রীবৈদ্যদেব উরুকীর্ত্তিরয়ং নিযুক্তঃ॥"
(বৈদ্যদেবের কমৌলি হইতে আবিষ্কৃত তাম্রলিপি ১৩শ শ্লোঃ)

(১৮৬) "তস্মাদজায়ত নিজায়তবাহুবীর্য্যনিষ্পীতপীবরবিরোধিযশঃপয়োধিঃ।
দেবর্ষি-কীর্ত্তিরমরেন্দ্র-বধূকপোলকর্পূরপত্রমকরী স কুমারপালঃ॥"
(মদনপালের মনহলি-তাম্রলিপি ১৬শ শ্লোক)

(১৮৭) "অথ রক্ষতা কুমারোদিতপৃথুপরিপন্থিপার্থিবপ্রবলঃ।
রাজ্যমুপভুজ্য তনয় স্বপুরগমদিবং তনূত্যাগাৎ॥১১
অপি শত্রুয়োপায়াদ্গোপালঃ স্বর্গগাম তৎসূনুঃ।
হন্তুঃ কুতীকতাকমন্ত্রৈরাক্ত সামরিকমেতৎ॥"১২ (রামচরিত ৪র্থ পরিচ্ছেদ)

তৎপরে রামপালের অপর পুত্র মদনদেবীর গর্ভজাত মদনপাল গৌড়সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইলেন। রামপালের পিতা যেমন রাষ্ট্রকূটবংশীয় রাজকন্যার পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন, রামপালও সেইরূপ রাষ্ট্রকূটবংশেরই এক শাখা কনোজের গাহড়বাড়-বংশের সহিত আত্মীয়তা স্থাপন করিয়াছিলেন।

মদনপাল

সারনাথ হইতে আবিষ্কৃত কুমরদেবীর শিলালিপিতে রামপাল যে ভাবে গৃহীত হইয়াছেন, তাহাতে কান্যকুব্জরাজ-বংশ যে রামপালকে বিশেষ আত্মীয় ভাবে দেখিতেন, তাহারই আভাস পাওয়া যাইতেছে। সম্ভবতঃ কনোজপতি মদনচন্দ্রের ভগিনী মদনদেবীই গৌড়াধিপ মদনপালের জননী ছিলেন। এই আত্মীয়তা-নিবন্ধনই মদনপাল কিছু দিনের জন্য গৌড়াধিপত্য অক্ষুণ্ণ রাখিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। দিনাজপুর-জেলাস্থ মনহলি হইতে আবিষ্কৃত মদনপালের তাম্রশাসন হইতে পাওয়া যায় যে, রামাবতী-নগরীতেই মদনপালের রাজধানী ছিল। নিজ-তাম্রশাসনে তিনি 'পরম-সৌগত' বলিয়া পরিচিত হইলেও তাঁহার সমসাময়িক কবিবর সন্ধ্যাকর তাঁহাকে 'চণ্ডীচরণ-সরোজ-প্রসাদসম্পন্ন-বিগ্রহশ্রী' 'দ্বিজপরিকর-পরিপালনরুচি' এবং 'উচ্চমণ্ডলাধিপতি' বলিয়াই পরিচিত করিয়াছেন। 'রূপেও তিনি সাক্ষাৎ মদন-সদৃশ ছিলেন। মদন ঈশ কর্ত্তৃক অনঙ্গ হইয়াছিলেন, কিন্তু মদনপাল অঙ্গাধিপ ঈশ কর্ত্তৃক জগদ্বিজয়-লক্ষ্মী লাভ করিয়াছিলেন।'[১৮৮] সন্ধ্যাকর তাঁহার সদ্‌গুণ, ধর্ম্মপ্রাণতা, উদারতা, বীর্য্যবত্তা ও বিপক্ষজয়-শীলতা মুক্ত কণ্ঠে ঘোষণা করিয়া অবশেষে লিখিয়াছেন, নাগবাহিনীর নেতা তাঁহার আশ্রিত, এদিকে কলিঙ্গের নাগবর্গ তাঁহার নিকট পরাজিত, এবং রাজা গোবর্দ্ধন উৎক্ষিপ্ত হইয়াছিলেন।[১৮৯] তাঁহার মনহলি-তাম্রলিপি হইতে জানা যায় যে, তাঁহার প্রধানা মহিষী চিত্রমতিকা-দেবী মহাভারত পাঠ দিয়াছিলেন। তদুপলক্ষে মদনপাল মহাভারত-পাঠক বটেশ্বর-শর্ম্মাকে তাঁহার ৮ম রাজ্যাঙ্কে পৌণ্ড্রবর্দ্ধন-ভুক্তির অন্তর্গত কোটীবর্ষাবিষয়ে হলাবর্ত্তমণ্ডলে কোষ্ঠগিরিসম্বদ্ধ কতকটা ভূমি চম্পাহিট্টিবাস্তব্য কৌৎস গোত্র বটেশ্বর-স্বামীকে দান করেন।[১৯০] লক্ষ্মী-সরাই-ষ্টেশনের অনতিদূরবর্ত্তী জয়নগর-গ্রাম হইতে মদনপালের ১৪শ রাজ্যাঙ্কে উৎকীর্ণ শিলালিপি পাওয়া গিয়াছে।[১৯১] সমসাময়িক উক্ত উভয় প্রমাণ হইতে প্রতিপন্ন হইতেছে

(১৮৮) "চণ্ডীচরণসরোজপ্রসাদসম্পন্নবিগ্রহশ্রীকং।
স খলু মদনং সাঙ্গেশমীশমগাদ্ জগদ্বিজয়লক্ষ্মীঃ॥" (রামচরিত ৪।২১)

(১৮৯) "পাতালক্ষেত্রো মিলিতঃ স মহানাগবাহিনীনেতা।
স বিভর্ত্তি ভূতধাত্রীমধিশেতে তং হরিঃ প্রিয়া সহিতঃ॥৩৭

... ...

অমুনোৎক্ষিপ্তো রামবদ্‌ গোবর্দ্ধনো ধরিত্রীভূৎ।
প্রাপ্য কলিঙ্গফণভুজমপি কং স জীবয়েত্রায়ম্॥ ৪১" (রামচরিত ৪র্থ পরিচ্ছেদ)

(১৯০) Journal Asiatic Society of Bengal, Vol. LXIX. pt I. p. 58.

(১৯১) Cunningham's Archæological Survey Reports, Vol. III. Plate XLIV. no. [illegible]

যে, বরেন্দ্র হইতে মগধ পর্য্যন্ত মদনপালের অধিকারভুক্ত ছিল। মদনপালের দেহান্তরের সহিত পালবংশের প্রভাব খর্ব্ব হইয়া পড়ে। তৎপরে পালবংশ বরেন্দ্রভূমি হারাইয়া মগধের পশ্চিমাংশে আধিপত্য করিতে থাকেন।

কনোজপতি গোবিন্দচন্দ্রের ১২০২ বিক্রম-সংবৎ বা ১১৪৬ খৃষ্টাব্দে উৎকীর্ণ একখানি তাম্রশাসন পাওয়া গিয়াছে, তাহা মুদ্গগিরি বা মুঙ্গের হইতে প্রদত্ত হইয়াছিল।[১২২] এই সমসাময়িক লিপি হইতে মনে হয় যে, সেনবংশীয় প্রাচ্য নৃপতির আক্রমণ হইতে পাল-নৃপতিকে রক্ষা করিবার জন্য কনোজপতি এখানে আগমন করিয়াছিলেন, অথবা নিজে মগধের পালাধিকার গ্রাস করিয়া কিছুদিনের জন্য মুদ্গগিরিতে অধিষ্ঠিত হইয়াছিলেন।

গয়া হইতে গোবিন্দপাল নামক পালবংশীয় শেষ নৃপতির শিলালিপি ও নেপাল হইতে আবিষ্কৃত নানা বৌদ্ধ পুথিতে এই নৃপতির সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। ইঁহার সহিত মদনপালের কি সম্পর্ক ছিল, তাহার কোন প্রমাণ এখনও পাওয়া যায় নাই। গয়া হইতে আবিষ্কৃত এক চতুর্ভুজা দেবীর পাদপীঠে লিখিত আছে, 'ব্রহ্মার দ্বিতীয় পরার্দ্ধে বরাহকল্পে বৈবস্বত-মন্বন্তরে অষ্টা-বিংশতি-যুগে কলির পূর্ব্বসন্ধ্যায় সংবৎ ১২৩২ বিকারি-সংবৎসরে, শ্রীগোবিন্দপালদেবের গত রাজ্যে ১৪ সংবৎসরে, গয়াতে'[১২৩] এই মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত হইল। পূর্ব্বোক্ত প্রমাণ-অনুসারে ১২১৮ সংবৎ বা ১১৬১ খৃষ্টাব্দে গোবিন্দপালের রাজ্যাবসান হইয়াছিল এবং ঐ বর্ষ হইতেই কিছুকাল মগধে জৈন ও বৌদ্ধসমাজে গোবিন্দপালের অতীতাব্দ প্রচলিত ছিল।

গোবিন্দপাল

ঐ সময়ে মগধমণ্ডলে যে সকল শাস্ত্রগ্রন্থ লিখিত হয়, তাহাতে উক্ত অতীতাব্দের উল্লেখ আছে।[১২৪] নেপাল হইতে সংগৃহীত ঐ সময়কার বহু পুথি হইতে জানা যায় যে, প্রায় ১১৯৯ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত মগধমণ্ডলে গৌড়েশ্বর গোবিন্দপালের অতীত-রাজ্যাব্দ ব্যবহৃত ছিল।[১২৫]

গোবিন্দপালের অতীতাব্দ

গোবিন্দপালের সহিত পালবংশের গৌরবরবি অস্তমিত হইল। গোবিন্দপালের আবির্ভাবের পূর্ব্বেই বরেন্দ্রভূমি সেনবংশের শাসনাধীন হইয়াছিল, তাঁহার তিরোভাবের সহিত

(১২২) Epigraphia Indica, Vol. VII. p. 99.

(১২৩) "ওঁ স্বস্তি নমো ভগবতে বাসুদেবায় ব্রহ্মণো দ্বিতীয়পরার্দ্ধে বরাহকল্পে বৈবস্বতমন্বন্তরে অষ্টাবিংশতিমে যুগে কলৌ পূর্ব্বসন্ধ্যায়াং সম্বৎ ১২৩২ বিকারিসম্বৎসরে। শ্রীগোবিন্দপালদেবগতরাজ্যে চতুর্দ্দশ-সম্বৎসরে গয়ায়াং।" (Cunningham's Archæological Survey Reports, Vol. III, plate XXXVIII.)

(১২৪) দৃষ্টান্তস্বরূপ জৈনাচার্য্য কমলপাণির হস্তলিখিত অষ্টসাহস্রিকা-প্রজ্ঞাপারমিতার সমাপ্তিপুষ্পিকা উদ্ধৃত হইল—"পরমেশ্বরেত্যাদি রাজাবলী পূর্ব্ববৎ গৌড়েশ্বরশ্রীগোবিন্দপালস্য গতাষ্টাত্রিংশৎ সম্বৎসরে কার্ত্তিক-শুক্ল সপ্তম্যাং যথাদৃষ্টগ্রন্থাদ্ লিখিতমিদং জৈনাচার্য্য-শ্রীকমল-পাণিনেতি। মগধমণ্ডলে শ্রীমল্লানন্দনগরে রাজ্ঞী মেকুল্লদেবীয় প্রতিবন্ধস্বহিতে লিখিতা প্রজ্ঞাপারমিতা ইতি।"

(১২৫) Memoirs, A. S. Bengal, Vol. III. p. 16.

মগধে সেনবংশের আধিপত্য বিস্তৃত হইল। উত্তর-রাঢ়ীয় কুলপঞ্জিকায় লিখিত আছে যে, গৌড়াধিপ বল্লালসেন বটেশ্বর-মিত্রকে মগধের অধিপতি করিয়া পাঠাইয়াছিলেন।[১২৬]

পালাধিকারে গৌড়বঙ্গের অবস্থা

পালবংশের আধিপত্যকালে গৌড়-রাজ্যের স্বর্ণযুগ উপস্থিত হইয়াছিল। মহারাজ শশাঙ্ক-দেবের সময় তাহার সূত্রপাত, আদিশূর জয়ন্তের অভ্যুদয়কালে তাহার বিকাশ এবং পালাধি-পত্য-বিস্তারের সহিত তাহার পরিপুষ্টি সাধিত হয়। ধর্ম্মপাল ও দেবপালের সময় ভারতের সুদূর পশ্চিম প্রান্ত পর্য্যন্ত রাজ্যবিস্তার এবং দাক্ষিণাত্যের সুদূর পশ্চিমপ্রান্তে রাষ্ট্রকূট নৃপতিগণের সহিত সম্বন্ধ স্থাপনের সহিত গৌড়বাসী ও স্ব স্ব জন্মভূমির সঙ্কীর্ণ গণ্ডী ছাড়াইয়া 'বসুধৈব কুটুম্বকং' এই মহানীতির অনুসরণ করিতেছিলেন। তৎকালে জ্ঞানে বিজ্ঞানে, অস্ত্রে শাস্ত্রে, শিল্পে সাহিত্যে এবং সৎ-সাহস ও বীর্য্যবত্তায় গৌড়বাসী ভারতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মহাজাতি বলিয়া পরিগণিত হইতেছিলেন। এ সময় গৌড়বাসীর বাহুবল সমস্ত ভারতবাসীকে চমৎকৃত করিয়াছিল। এ সময় গৌড়ীয় শিল্পিগণ যেরূপ শিল্পনৈপুণ্যের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়া দৈবশক্তি ও কলাবিদ্যার অসাধারণ প্রতিভার পরিচয় দিয়াছিলেন, তাহার অধিকাংশ এখন বিলুপ্ত হইলেও যৎসামান্য যাহা কিছু ধ্বংসমুখ হইতে রক্ষা পাইয়াছে, তদ্দৃষ্টেও অধুনা সভ্য-জগৎ বিস্মিত ও চমৎকৃত হইতেছেন। এ সময় গৌড়রাজ্য হিন্দু বৌদ্ধ, আর্য্য অনার্য্য, প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের এক অপূর্ব্ব মিলন-ক্ষেত্ররূপে পরিণত হইয়াছিল। দেশ, কাল, পাত্র ও অবস্থাভেদে বর্ণধর্ম্ম ও জাতিগত অধিকারের সামান্য তারতম্য থাকিলেও তখন গৌড়ের সর্ব্বত্র সাম্যবাদ ও উদারনীতি ঘোষিত হইতেছিল। এ সময় জ্ঞানী, গুণী ও প্রেমীর নিকট উচ্চনীচ ভাব বিদূরিত হইয়াছিল। উচ্চ বর্ণ নিম্ন-বর্ণের মন্ত্র শিষ্য হইতেও ইতস্ততঃ করেন নাই। কর্ম্ম, জ্ঞান ও ভক্তিমার্গের মধ্যে ভাবরাজ্যে বিভোর হইয়া গৌড়বাসী এক অভিনব ও অপূর্ব্ব দৃষ্টিশক্তি লাভ করিয়াছিলেন, তাহাই আমরা দৈবশক্তি বলিয়া মনে করি। এই শক্তি প্রভাবে কর্ম্মের মধ্যে জ্ঞানের, জ্ঞানের মধ্যে ভক্তির, ভক্তির মধ্যে প্রেমের এবং প্রেমের মধ্যে নির্ব্বাণমুক্তি অনুধাবন করিয়াছিলেন। এই সময়ে নানা জ্ঞানী, ভক্ত বা প্রেমিক রচিত যে সকল নানা শাস্ত্রগ্রন্থ বাহির হইয়াছে, তাহাতেই গৌড়ীয় জনসাধারণের মানসিক চিত্র পরিস্ফুট রহিয়াছে। লোকশিক্ষার জন্য মহাপ্রভু চৈতন্যদেবের আবির্ভাবের পর যেরূপ দেশ-প্রচলিত ভাষায় অধিকারিভেদে সময়োপযোগী নানা বৈষ্ণব-গ্রন্থ রচিত হইয়াছে, সেইরূপ পালাধিকারকালেও লোকশিক্ষার জন্য তৎকাল-প্রচলিত গৌড়ীয় ভাষায় বহুতর গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল।[১২৭] মহাপ্রভুর সময়ে যে কীর্ত্তনের তরঙ্গে গৌড়বঙ্গ মাতোয়ারা হইয়াছিল, পালবংশের সময় হইতেই তাহার সূত্রপাত। লুই, কুক্কুরী, বিরুআ, গুণ্ড, চাটিল, ভুসুকু, কাহ্নু, ডোম্বি, মহিত্ত, শবহ, ঢেণ্ঢণ, শান্তি, ভাদে, তাণ্ডক, কঙ্কণ, জয়নন্দী, ধর্ম্ম ও শবর

(১২৬) "বল্লালপূজিতো ভূত্বা বটোঽভূন্মগধেশ্বরঃ।" (উত্তররাঢ়ীয় কুলপঞ্জিকা)

(১২৭) মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের যত্নে ঐরূপ কতকগুলি গ্রন্থ নেপাল হইতে আবিষ্কৃত হইয়াছে। ঐ সময়ের বহু বাঙ্গালাগ্রন্থ তিব্বতীয় ভাষায় অনুদিত হইবার সন্ধান পাওয়া গিয়াছে।

প্রভৃতি শত শত ভক্ত সময়োপযোগী কীর্ত্তন-পদ প্রচার করিয়া সাধারণের হৃদয় অধিকার করিয়াছিলেন। বলিতে কি পালবংশের আধিপত্য-কালেই লোকরঞ্জন কীর্ত্তন-গানের সূত্রপাত। মহাপ্রভুর যত্নেই তাহার পরিপুষ্টি। পালাধিকারে রচিত অনেক বৈরাগ্যগীতি ও মঙ্গল-গান কেবল গৌড় রাজ্যমধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না, পালরাজবংশের সহিত যেমন সমস্ত ভারতের সম্রান্ত রাজবংশের সম্বন্ধ হইয়াছিল, সেইরূপ সঙ্গে সঙ্গে উক্ত বৈরাগ্য ও মঙ্গলগীতিসমূহও সমস্ত ভারতে প্রচারিত হইয়াছিল। তন্মধ্যে অদ্যাপি বঙ্গাধিপ গোবিন্দচন্দ্রের বৈরাগ্যগীতি ও মনসার মঙ্গল-গীতি ভারতের নানা স্থানে প্রচলিত দেখা যায়। মহাপ্রভু চৈতন্যদেবের অভ্যুদয়কাল পর্য্যন্ত গৌড়বঙ্গের জনসাধারণ আত্মহারা হইয়া সেই সকল গানই শুনিতেন।[১৯৮] বৈষ্ণব-পদাবলি বহুল প্রচারের সহিত সেই সকল প্রাচীন গীতিকা ক্রমেই বিরলপ্রচার হইয়া বিলুপ্তপ্রায় হইয়াছে। উক্ত বৈরাগ্য-গীত বা মঙ্গল-গীত ব্যতীত পালরাজগণের কুলদেবতা সূর্য্যদেবের পাঁচালীও ঐ সময় সর্ব্বত্র গীত হইত। সূর্য্যের পাঁচালী হইতে আমরা জানিতে পারি যে শিব ও বিষ্ণু উভয়ের লীলাই সূর্য্যদেবে আরোপিত হইয়াছে! তাই প্রাচীন সূর্য্যের পাঁচালী মধ্যে কোথাও সূর্য্যদেব গোপীদিগের সহিত বৃন্দাবন-লীলা করিতেছেন, আবার কোথাও গৌরীর সহিত তাঁহার নানা কেলিরঙ্গ চলিতেছে। পরবর্ত্তী সূর্য্যের পাঁচালী মধ্যে হাড়ী জাতির প্রতি যথেষ্ট নিগ্রহের কথা পাওয়া যায়। ইহাতে ধর্ম্মসেবক হাড়ী জাতির সহিত সৌরগণের সংঘর্ষ উপস্থিত হইয়াছিল বলিয়াই মনে হয়। সৌগত হইলেও শেষোক্ত পালনৃপতিগণ শিব ও শক্তির উপাসক হইয়া পড়িয়াছিলেন, ঐ সময়ে অবলোকিতেশ্বর শিবরূপে এবং মহত্তারা চণ্ডীরূপে পরিচিত হইয়াছিলেন। কালে বৌদ্ধ-জনসাধারণও পালরাজগণের অনুবর্ত্তী হইয়াছিলেন। এই সময় সর্ব্বত্র শিবের গান ও চণ্ডীর মঙ্গল-গীত প্রচারিত হইতে থাকে। এক সময়ে নির্জ্জন পল্লীবাসী কৃষকগণও 'ধান্ ভানতে শিবের গীত' করিত ও বৌদ্ধ প্রভাবের সময় ঐ সকল গীত প্রচারিত হইয়াছিল বলিয়াই আদি শিবায়ন বা শিবের গাজন ও মঙ্গলচণ্ডীর পুঁথিসমূহে বৌদ্ধপ্রভাবের ক্ষীণ রেখা অঙ্কিত রহিয়াছে।

পরপৃষ্ঠায় পালবংশলতা ও প্রত্যেক নৃপতির আনুমানিক রাজ্যকাল প্রদত্ত হইল।

(১৯৮) "যোগীপাল মহীপাল গোপীপাল গীত।
তাহা শুনিতে সবে লোক আনন্দিত।
মঙ্গল চণ্ডীর গীত করে জাগরণে।
দম্ভ করি বিষহরী পূজে কোন জনে।" ইত্যাদি। চৈতন্যভাগবত আদি০।

- ১। গোপালদেব (১ম) (৭৯০—৭৯৫ খৃঃ অঃ)
  - ২। ধর্ম্মপাল (৭৯৫—৮৩৪ খৃঃ অঃ)
    - যুবরাজ ত্রিভুবনপাল
    - ৩। দেবপাল (৮৩৪—৮৭৪ খৃঃ অঃ)
      - যুবরাজ রাজ্যপাল
      - ৪। শূরপাল (৮৭৪—৮৭৯ খৃঃ)
  - বাক্‌পাল
    - জয়পাল (উত্তররাঢ়)
      - ৫। বিগ্রহপাল (১ম) (৮৭৯—৯০৮ খৃঃ অঃ)
        - ৬। নারায়ণপাল (৯০৯—৯২৫ খৃঃ অঃ)
          - ৭। রাজ্যপাল (১ম) (৯২৫—৯৫০ খৃঃ অঃ)
            - ৮। গোপাল (২য়) (৯৫০—৯৬০ খৃঃ অঃ)
              - ৯। বিগ্রহপাল (২য়) (৯৬০—৯৭৫ খৃঃ অঃ)
                - ১০। মহীপাল (১ম) (৯৭৫—১০২৫ খৃঃ অঃ)
                  - ১১। নয়পাল (১০২৫—১০৪১ খৃঃ অঃ)
                    - ১২। বিগ্রহপাল (৩য়) (১০৪১—১০৫৫ খৃঃ অঃ)
                      - ১৩। মহীপাল (২য়) (১০৫৫-৫৬ খৃঃ অঃ)
                      - ১৪। শূরপাল (২য়) (১০৫৭ খৃঃ অঃ)
                      - ১৫। রামপাল (১০৫৭—১০৮৭ খৃঃ অঃ)
                        - ১৬। কুমারপাল (১০৮৭—১১০৭ খৃঃ অঃ)
                          - ১৭। গোপাল (৩য়) (১১০৭—১১১২ খৃঃ অঃ)
                        - ১৮। মদনপাল (১১১২—১১৩২ খৃঃ অঃ)
                          - ১৯। গোবিন্দপাল (১১৬১ খৃঃ অব্দে গত)
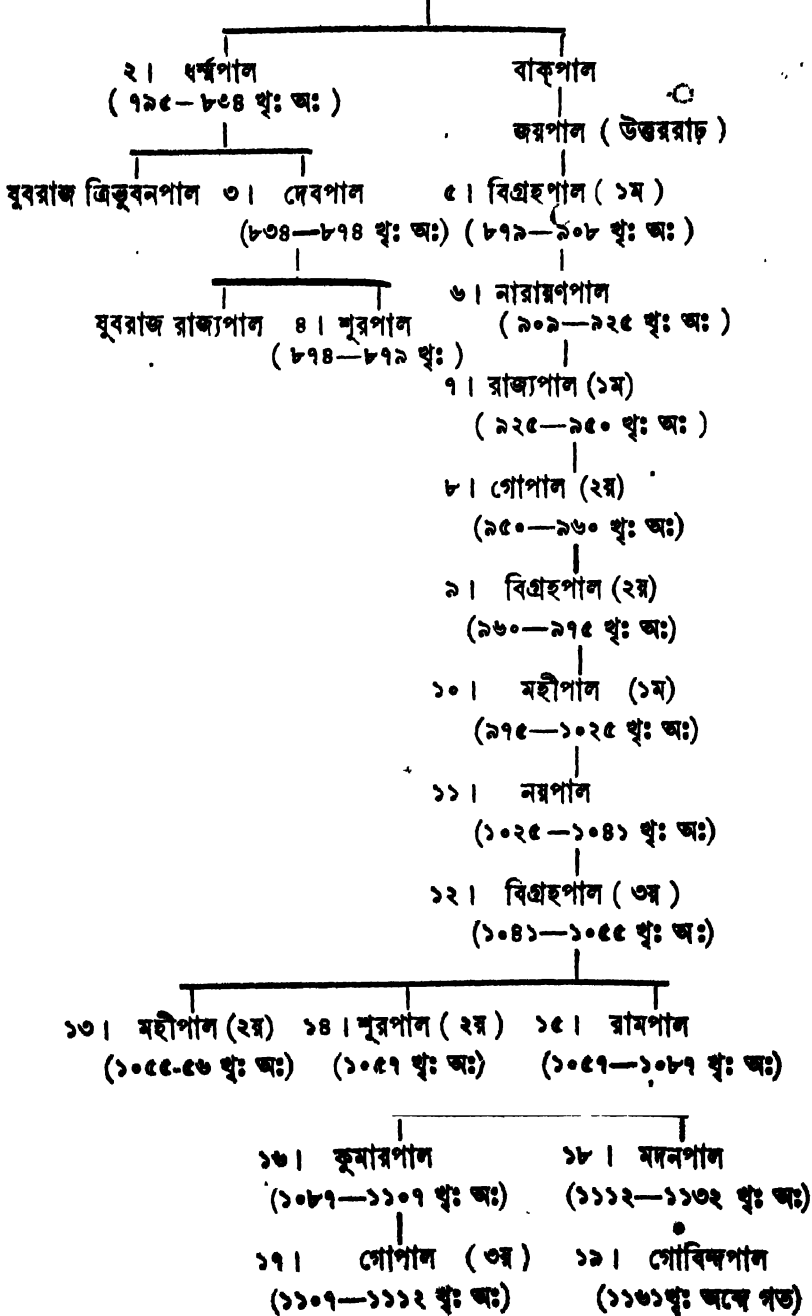
পালাধিকারে কায়স্থ-প্রভাব

শূররাজ-বংশের ইতিহাস-প্রসঙ্গে দেখাইয়াছি যে, আদিশূর জয়ন্তের সময় সমস্ত প্রাচ্যভারতে কায়স্থ-প্রভাব অপ্রতিহত ছিল। পালবংশের অভ্যুদয়কালেও তাঁহাদের পূর্ব্ব প্রতিপত্তির সম্পূর্ণ হ্রাস ঘটে নাই। আমরা ধর্ম্মপালের খালিমপুর-তাম্রফলক হইতে জানিতে পারি যে, তাঁহার সময়েও 'জ্যেষ্ঠকায়স্থ' 'মহামহত্তর' 'মহত্তর' প্রভৃতি পদে করণ বা কায়স্থগণই নিযুক্ত হইতেন। ধর্ম্মপাল তাম্রশাসন দিবার সময়েও "সকরণান্ প্রতিবাসিনঃ ক্ষেত্রকরাংশ্চ ব্রাহ্মণমাননাপূর্ব্বকং" অর্থাৎ সর্ব্বাগ্রে করণ বা কায়স্থগণের উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু ধর্ম্মপালের পর কায়স্থসমাজ রাজসংসারে কিছুকাল পূর্ব্বসম্মানলাভে বঞ্চিত হইয়া ছিলেন। গুরবমিশ্রের গরুড়স্তম্ভলিপি হইতে প্রতিপন্ন হইয়াছে যে, ধর্ম্মপালের সময় হইতেই গৌড়াধিকারে শাকদ্বীপী ব্রাহ্মণ-প্রভাব বিস্তৃত হয়, দেবপালের সময় তাঁহারাই সর্ব্বেসর্ব্বা হইয়া পড়িয়াছিলেন। তাঁহাদের রাজকীয় ক্ষমতাবৃদ্ধির সহিত তাঁহারা কায়স্থগণের শ্রেষ্ঠ রাজকীয় অধিকার লোপ করিতে লাগিলেন। এই কারণে ধর্ম্মপালের তাম্রশাসনে যে সকল কায়স্থ-কর্ম্মচারীর পদোল্লেখ পাইয়াছি, তৎপুত্র দেবপালের তাম্রশাসনে সেই সকল পদ অর্থাৎ 'জ্যেষ্ঠকায়স্থ' 'মহামহত্তর' 'করণ' ইত্যাদি শব্দই পরিত্যক্ত হইয়াছে। এমন কি মহাসান্ধিবিগ্রহিক পদ যাহা কায়স্থজাতির এক প্রকার নিজস্ব ছিল, দেবপাল সেই পদ উঠাইয়া দিয়া শাকদ্বীপীয় ব্রাহ্মণমন্ত্রীর পরামর্শে 'মহাকার্ত্তাকৃতিক' অর্থাৎ সর্ব্বপ্রধান জ্যোতির্বিদধ্যক্ষের পদ সৃষ্টি করিয়াছিলেন। বলা বাহুল্য, জ্যোতিঃশাস্ত্রচর্চ্চার জন্যই শাকদ্বীপীয় ব্রাহ্মণ-সমাজের খ্যাতি ও প্রতিপত্তি। বলিতে কি, দেবপাল হইতে নারায়ণপালের সময় পর্য্যন্ত 'কার্ত্তাকৃতিক' বা দৈবজ্ঞ-ব্রাহ্মণেরাই পালাধিকারে সর্ব্বে-সর্ব্বা হইয়া বসিয়াছিলেন,—গরুড়স্তম্ভলিপি ও নারায়ণপালের তাম্রশাসন হইতেই তাহা স্পষ্টতঃ বুঝিতে পারিতেছি। গুরবমিশ্রের পরলোক, রাজ্যপালের সময় দাক্ষিণাত্য-প্রভাব-বিস্তার ও পুনঃ পুনঃ বহিরাক্রমণকালে কায়স্থগণ ধীরে ধীরে স্ব স্ব পূর্ব্বশক্তি উদ্ধার করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইয়াছিলেন। কেবল গৌড়রাজ্য বলিয়া নহে, তৎকালে রাঢ়, উৎকল, এমন কি সুদূর মধ্যপ্রদেশেও কায়স্থসমাজ বিদ্যা, বুদ্ধি ও রাজনৈতিক কৌশলে রাজকীয় শ্রেষ্ঠ পদসমূহে অধিষ্ঠিত ছিলেন।

পালবংশের অভ্যুদয় ও তাঁহাদের সভায় শাকদ্বীপীয় ব্রাহ্মণগণের প্রভাব-বিস্তারের সহিত গৌড়াধিকারে কায়স্থগণ কতকটা মর্য্যাদাহীন হইয়া পড়িলেও রাঢ় ও কলিঙ্গে তখনও তাঁহাদের পূর্ব্বসম্মান অক্ষুণ্ণ ছিল। পূর্ব্বেই লিখিয়াছি যে, রাঢ়াধিপ শশাঙ্কদেবের সময় হইতে কলিঙ্গ ও মধ্যপ্রদেশ পর্য্যন্ত কায়স্থপ্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। শশাঙ্কদেবের মৃত্যু ও তাঁহার আত্মীয়-স্বজনের আধিপত্য-বিলোপের পরেও তথায় কায়স্থ-সমাজ কিরূপ সম্মানিত ছিলেন, তাহারও কিছু কিছু আভাস দিয়াছি। গৌড়ের সর্ব্বত্র পালাধিকারকালেও খৃষ্টীয় ৯ম,

১০ম ও ১১শ শতাব্দীতে কলিঙ্গ ও দক্ষিণকোশলের সোমবংশীয় রাজগণের সভায় কায়স্থগণ বিশেষভাবে সম্মানিত ছিলেন, সমসাময়িক খোদিত লিপি হইতেই তাহার যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া গিয়াছে।

পটনা হইতে আবিষ্কৃত ত্রিকলিঙ্গাধিপতি মহারাজাধিরাজ শিবগুপ্তের পুত্র মহাভবগুপ্তের ৬ষ্ঠ রাজ্যাঙ্কে উৎকীর্ণ তাম্রশাসন হইতে জানা যায় যে, কায়স্থপ্রবর ধারদত্ত, ও তৎপুত্র মল্লদত্ত উক্ত নৃপতির অধীন রাণক বা একজন সামন্ত-নৃপতি ও তাঁহার মহাসান্ধিবিগ্রহিক ছিলেন। কায়স্থ শ্রীমাহুকের পুত্র প্রিয়ঙ্করাদিত্য১৯৯ এবং কায়স্থ কোইঘোষের পুত্র বল্লভঘোষ২০০ উক্ত পিতাপুত্রের দক্ষিণহস্তস্বরূপ সান্ধিবিগ্রহিকের কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন। ত্রিকলিঙ্গাধিপের সান্ধিবিগ্রহিক কিরূপ শক্তিসম্পন্ন ও উচ্চপদাভিষিক্ত ছিলেন, মহাভবগুপ্তের পুত্র যযাতি-মহাশিবগুপ্তের ৯ম রাজ্যাঙ্কে উৎকীর্ণ (কটক হইতে প্রাপ্ত) তাম্রশাসনে তাহার এই প্রকার পরিচয় লিপিবদ্ধ হইয়াছে -

'যিনি দেবগুরু বৃহস্পতি ও অসুর-গুরু শুক্রাচার্য্যের তুল্য প্রজ্ঞা ও সম্মানে জয়শীল ছিলেন, যিনি অবলীলাক্রমে নৃপতিপ্রদত্ত অতুল রাজ্যভার বহন করিতেন, রাজনীতি ও বিক্রম এই উভয় গুণে যিনি রাজার প্রিয়সখা বলিয়া সর্ব্বদা আদৃত হইতেন, সেই কৃতী পুরুষই সান্ধিবিগ্রহিক পদ লাভ করিয়া খ্যাত হইয়াছিলেন।'২০১

সুতরাং বুঝিতে হইবে যে, কায়স্থ সান্ধিবিগ্রহিকগণ সামান্য ব্যক্তি ছিলেন না। উক্ত মহাশিবগুপ্তের পুত্র ২য় মহাভবগুপ্তের তাম্রশাসনেও দেখা যায় যে, সিংহদত্ত তাঁহার সান্ধিবিগ্রহিক ছিলেন, তাঁহার আত্মীয় কায়স্থ মঙ্গলদত্তই তাম্রশাসনের শ্লোকাবলি রচনা করেন২০২।

সম্বলপুর জেলার সতল্মা নামক স্থান হইতে আবিষ্কৃত জনমেজয় মহাভবগুপ্তের তাম্রশাসনে বল্লভঘোষের পিতা কৈলাসঘোষকেও উক্ত নৃপতির সন্ধিবিগ্রহাধিকারে নিযুক্ত দেখি।২০৩

ত্রিকলিঙ্গাধিপতি মহারাজাধিরাজ সোমবংশীয় যযাতিরাজদেবের তাম্রশাসনেও পাওয়া যায়

(১৯৯) "লিখিতমিদং ত্রিকলীতাম্রশাসনং মহাসান্ধিবিগ্রহী-রাণক-শ্রীমল্লদত্ত-প্রতিবদ্ধ-কায়স্থ-শ্রীমাহুকেন প্রিয়ঙ্করাদিত্যসুতেনেতি।" (১ম মহাভবগুপ্তের কটকে আবিষ্কৃত তাম্রশাসন)

(২০০) "লিখিতমিদং শাসনং মহাসন্ধিবিগ্রহিশ্রীমন্নঃ ধারদত্তসুত-প্রতিবদ্ধকোইঘোষেণ বল্লভঘোষসুতেনেতি।"
(ঐ মহাভবগুপ্তের পটনা হইতে আবিষ্কৃত তাম্রশাসন)

(২০১) "যেনাত্যস্তসুরাসুরাধিপগুরুঃ প্রজ্ঞাভিমানৈর্জ্জিতো
রাজ্ঞারোপিতরাজ্যভারমতুলং যশ্চাবহল্লীলয়া।
যস্তাসীন্নয়বিক্রমদ্বয়মপি প্রেয়ান্ সখা সর্ব্বদা
যঃ খ্যাতো ধৃতসন্ধিবিগ্রহপদঃ শ্রীচ্ছিচ্ছটেশঃ কৃতী॥" (মহাশিবগুপ্তের তাম্রশাসন)

(২০২) "স প্রেয়ান্ ধৃতসন্ধিবিগ্রহপদঃ শ্রীসিংহদত্তঃ কৃতী॥
নাম্না মঙ্গলদত্তেন কায়স্থেন * * স অলেখি শাসনং * * সং যাবচ্চন্দ্রার্কতারকঃ॥"
Epigraphia Indica, Vol. III. p. 835.

(২০৩) Epigraphia Indica, Vol. VIII. p. 143.

যে 'তাঁহার মহাসান্ধিবিগ্রহিক রাণক শ্রীচারুদত্ত, তাঁহাকে জানাইয়া মহাক্ষপটলিক অর্ণবনাগের পুত্র শ্রীউচ্ছব নাগ কর্ত্তৃক তাম্রশাসন লিখিত হইয়াছে।'[২০৪]

উক্ত নৃপতিগণের আধিপত্য উৎকল হইতে সম্বলপুর পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। কেবল সন্ধি-বিগ্রহরূপ উচ্চ মন্ত্রিত্বপদ বলিয়া নহে, মহাক্ষপটলিক বা আইন ও দলিল বিভাগের সর্ব্ব-শ্রেষ্ঠপদেও কায়স্থগণই নিযুক্ত হইতেন। তাঁহাদের উপাধি ও তাম্রফলীর অক্ষরভঙ্গী হইতেও তাঁহাদিগকে মূলতঃ ওড্র বা কলিঙ্গের অধিবাসী না বলিয়া তাঁহাদিগকে আমরা বাঙ্গালী কায়স্থ বলিয়াই মনে করি। রাঢ়বাসী ব্রাহ্মণ-কায়স্থের প্রভাব মহারাজ শশাঙ্কদেবের সময় হইতেই কলিঙ্গ ও দক্ষিণ-কোশল পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল, যথাস্থানে তাহার উল্লেখ করিয়াছি। তাহার বহু পরে খৃষ্টীয় ১০ম শতাব্দীতে উৎকীর্ণ মহাভবগুপ্তের তাম্রশাসনে 'রাঢ়ায় বল্লিকন্দরবিনির্গতায়'[২০৫] এবং ভুবনেশ্বরের অনন্ত-বাসুদেবের মন্দিরে সংলগ্ন ভবদেবভট্টের প্রশস্তিফলক হইতেও উৎকলে রাঢ়বাসীর প্রভাবের সন্ধান পাওয়া যাইতেছে। পূর্ব্বকালে অধিকাংশ তাম্রশাসন ও শিলালিপিই কায়স্থে' হস্তলিখিত। বলা বাহুল্য খৃষ্টীয় ৮ম হইতে ১২শ শতাব্দী পর্য্যন্ত কলিঙ্গ, দক্ষিণ-কোশল, এমন কি চেদিরাজ্য হইতেও সে সকল শিলালিপি ও তাম্রশাসন আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহাতে বঙ্গীয় লিপির নিদর্শনই রহিয়াছে,—দাক্ষিণাত্য বা ওড্রলিপির আদৌ নিদর্শন পাওয়া যায় না। সোমবংশীয় ত্রিকলিঙ্গাধিপতিগণের তাম্রশাসন-বর্ণিত কায়স্থবর্গের উপাধি-দৃষ্টেও ঐতিহাসিকগণ তাঁহাদিগকে রাঢ়ীয় বা বাঙ্গালী কায়স্থ বলিতে কুণ্ঠিত হন নাই।[২০৬]

যাহা হউক, গৌড়রাজসভায় কিছু কাল পর্য্যন্ত তাঁহারা উচ্চাধিকারলাভে বঞ্চিত হইলেও তাঁহারা এককালে সকল অধিকার হইতে বঞ্চিত হইয়াছিলেন বলিয়া বোধ হয় না। স্ব স্ব পূর্ব্ব গৌরব উদ্ধার করিবার জন্য তাঁহারা যে এক কালে নিশ্চিন্ত ছিলেন, তাহাও সম্ভবপর নহে। দাক্ষিণাত্য ও পাশ্চাত্য নৃপতিগণের পুনঃ পুনঃ আক্রমণ-কালে তাঁহাদের সঙ্গে এ দেশে যে সকল কায়স্থ আগমন করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগের মধ্যেও কেহ কেহ সহায়-সম্পত্তি লাভ করিয়া গৌড়ে বাস করিতে থাকেন এবং আত্মীয়তা-সূত্রে এখানকার কায়স্থসমাজের অন্তর্ভুক্ত হইয়া পড়েন। এই কারণেই গৌড়বঙ্গের বিভিন্ন শ্রেণির কায়স্থকুলগ্রন্থসমূহে ভিন্ন ভিন্ন

(২০৪) "লিখিতমিদং শাসনং মহাসান্ধিবিগ্রহিক-রাণক-শ্রীচারুদত্তস্যাবগতেন মহাক্ষপটলিক শ্রীউচ্ছব-নাগেনার্ণবনাগসুতেন।" (যযাতিরাজের নিবিন্ন-তাম্রলিপি।)

(২০৫) ১ম মহাভবগুপ্তের বক্রতেন্তলি-তাম্রলিপি।

(২০৬) "King Janamejaya and his successors had many Bengali Kâyasthas for their court-officers * * * None but Bengali Kâyasthas bear Datta, Ghosha, Nâga, etc, as surnames. The words Datta, Ghosha, etc, as inseparable parts of the names of men, were in use in other parts of Northern India ; and such names could be borne by persons of any and every caste. But as those words are surnames here of Kâyasthas, there can be on doubt that the kings had Bengali officers under them."

Vide B. C. Mazumdar's Sonpur, p. 115. and Epigraphia Indica, Vol. XI.

সময়ে সমাগত কায়স্থ-বীজীগণের দাক্ষিণাত্য বা পশ্চিম হইতে আগত বলিয়া তাঁহাদের বংশধরগণ-মধ্যে প্রবাদ প্রচলিত রহিয়াছে। শূরবংশীয় ভূশূর-নৃপতির পর যে সকল কায়স্থ সন্তান যে স্থানে বাস করিয়াছিলেন এবং মধ্যে মধ্যে যে ভূভাগে আসিয়া বাস করিতেছিলেন, তাঁহারা বাসস্থান-অনুসারে রাঢ়ীয় বা বারেন্দ্র নামেই পরিচিত হইতেন।

বারেন্দ্র কায়স্থ প্রাদুর্ভাব

এইরূপে পালাধিকার গৌড় বা বরেন্দ্র-ভূমে যে সকল কায়স্থ বাস করিতেছিলেন, তাঁহারা এবং তাঁহাদের বংশধরগণই 'বারেন্দ্র-কায়স্থ' নামে পরিচিত হইয়াছেন। সুতরাং পালাধিকারে কায়স্থপ্রভাব জানিতে হইলে আমাদিগকে বারেন্দ্র-কায়স্থ-সমাজের কুলেতিহাসের অনুসরণ করিতে হইবে। তিব্বতীয় বৌদ্ধগ্রন্থে ধর্ম্মপালের সভাসদ কায়স্থ টঙ্কদাস ও বৌদ্ধপণ্ডিত কায়স্থ চাকাদাসের উল্লেখ পাই।[২০৭] দেখা যাউক বারেন্দ্র-কুলগ্রন্থে ঐ দুই মহাত্মার কোনরূপ পরিচয় পাওয়া যায় কিনা? কাশীদাসের 'বারেন্দ্রকরণবর্ণন' নামক গ্রন্থে দাসবংশের পরিচয় এইরূপ বিবৃত হইয়াছে—

"শুন কহি দাসবংশ অবনীতলে সুপ্রশংস
রাঢ়ে বঙ্গে বারেন্দ্রে বিখ্যাত।
অত্রিগোত্র সুপবিত্র শুদ্ধমূল কুলসূত্র
পশ্চিমে পূর্ব্বেত পরিচিত॥
গঙ্গাজুষ্ট পূর্ব্ববাস রাঢ়া ধন্য সুপ্রকাশ
মহত্তমপদে অধিষ্ঠান।
নন্দী সেন গুহ সনে ছিল সবে সানন্দ মনে
স্বজাতিসমাজে বহু মান॥
দাসবংশে মন্মথ নাম রাঢ়া ভরি যশোগান
তার পুত্র নাম টঙ্কপাণি।
ব্রাহ্মণের চক্রান্তে পড়ি পিতৃবাস পরিহরি
উপনীত পাটলী-রাজধানী॥
মহারাজ চক্রবর্ত্তী তাঁহাকে করিলা ভক্তি
নিজস্থানে রাখিলা হরষে।
রাজার হইল সখ্য দিলা পদ প্রধান লেখ্য
উচ্চভাবি সবে পরিতোষে॥
তাহার পুত্র চক্রপাণি দেবের প্রধান গণি
মহামানী রাজকার্য্য পাই।

(২০৭) মহামহোপাধ্যায় ডাক্তার সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের 'কায়স্থ চাকাদাস' প্রবন্ধ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা। ১০শ ভাগ (১৩১০), ২৫৪ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

বিদ্যাবুদ্ধে বৃহস্পতি   ব্রাহ্মণ শ্রবণে* ভক্তি
মহাকবি বলি যশ গাই ॥
ধীর আর শূর দুই পুত্র   রাজার হইলা প্রিয়পাত্র
ভাগ্যদোষে ব্রাহ্মণের রোষ।
ছাড়ি গৌড়রাজপাশ   বারেন্দ্রে করিলা বাস
ধনরত্ন আনিল বিশেষ ॥
সমাজে হইলা খ্যাতি   পুত্র শ্রীধর মহামতি
তার পুত্র ভূধর গদাধর।
ভূধর হইল রাঢ়বাসী   কাশীপুরী অধিবাসী
গদাধর রহিল নিজঘর ॥
তাহার পুত্র রাজ্যধর   গৌড়ে বিপ্লব অতঃপর
পলাইয়া গেল উত্তর দেশে।
কামাখ্যা মাতার দয়াগুণে   কুবচে বাস সগণে
রাজ্যলাভ দেবীর আদেশে ॥
তার পুত্র বীর শ্রীধরাই   কাণ্ডুর রাজার ঠাঁই
পূজা পাইল সামন্তপ্রধান।
বহু যশ উপার্জয়   কাণড়ার পরাজয়
ধরাধর তাহার সন্তান ॥
তার পুত্র শূলপাণি   পূজিয়া পিনাকপাণি
কুবচেতে হইল সুখ্যাত।
পুত্র তার মহামানী   পিণাক আর চক্রপাণি
যদুবীরে কৈল উপেক্ষিত ॥
পুত্র তার টঙ্কপাণি   শ্রেষ্ঠ বীরমধ্যে গণি
গৌড়রাজে করিয়া সহায়।
মহারণে লভি যশ   রাঢ়ে গৌড়ে সুপ্রকাশ
মন্ত্রিকন্যা কৈল পরিণয় ॥
দেবদাসে করণ হৈল   সমাজে সাড়া পড়িল
উত্তর দক্ষিণে হৈল মিল।
রত্নপাণি তার সুত   অশেষ মহিমাযুত
ম্লেচ্ছহাতে রাজ্য হারাইল ॥

* গ্রন্থকারের ভ্রমক্রমে অথবা লিপিকরপ্রমাদে 'শ্রমণ' স্থানে 'শ্রবণ' হইয়া থাকিবে।

"তার পুত্র নরসিংহ সমাজে বহুত সম্ভ্রম
বাঁকি গ্রামে করিলা আগমন।
নরদাসের দুই পুত্র বটু পটু কুলসূত্র
বটু করিল বঙ্গসংগঠন॥
যত ছিল জ্ঞাতি গোষ্ঠী নরদাসে* পরিতুষ্টি
ইষ্ট বন্ধু সমাজ গঠন।
ভৃগু মুরহরে লয়ে উত্তরেতে নাগালয়ে
বল্লালেরে করিল বর্জ্জন॥
বটু গেল বল্লালপক্ষ তেই সে পিতার উপেক্ষ
বঙ্গমাঝে হইল আগুসর।
গৌড়াধিপ পূজা কৈল সামন্ত-অগ্রগণ্য হইল
পুত্র তার শ্রীহরি শ্রীধর॥
পটুদাস সমাজে পটু সেই হইল বারেন্দ্র বটু
সভামাঝে খ্যাতি বহুতর।
ভুবনাদি অনুজ লয়ে বহুকীর্ত্তি প্রকাশিয়ে
অপুত্রক মৈল কুলবর॥"†

উদ্ধৃত কুল পরিচয় হইতে জানা যায় যে রাঢ়দেশে মন্মথদাস নামে একব্যক্তি বাস করিতেন, তিনি যে বংশে জন্ম গ্রহণ করেন, সেই বংশ পশ্চিম ও পূর্ব্বভারতে প্রসিদ্ধ ছিলেন। মন্মথদাসের পুত্র টঙ্কদাস ব্রাহ্মণের চক্রান্তে নিজ পিতৃবাসস্থান রাঢ়ভূমি পরিত্যাগ করিয়া পাটলী রাজধানী বা পাটলিপুত্র নগরে উপনীত হইয়াছিলেন। কুলগ্রন্থকার যাঁহাকে মহারাজ চক্রবর্ত্তী বলিয়া পরিচিত করিয়াছেন, বলা বাহুল্য তিনিই গৌড়াধিপ ধর্ম্মপাল। টঙ্কদাসকে তিনি প্রধান লেখ্যাধিকারে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। তৎপুত্র মহাকবি চক্রপাণিদাসই তিব্বতীয় বৌদ্ধ গ্রন্থে 'চাকাদাস' নামে পরিচিত হইয়াছেন।[২০৮] এই চাকাদাসের সময়েই পালরাজ-সভায় ব্রাহ্মণ-প্রতিপত্তির সূচনা এবং তাঁহাদের চেষ্টাতেই

বারেন্দ্র দাসবংশ

* সংক্ষিপ্ত বারেন্দ্র-ঢাকুর-রচয়িতা যদুনন্দন এই নরদাস ঠাকুর হইতেই কুল-পরিচয় আরম্ভ করিয়াছেন, তৎপূর্ব্ব পরিচয় দেন নাই; যাঁহাদের বংশলোপ বা সমাজান্তর ঘটিয়াছে, যদুনন্দন তাঁহাদের নাম আদৌ উল্লেখ করেন নাই। তিনি স্পষ্টই লিখিয়াছেন—

"সাড়ে তিন শত পাত করণ বর্ণন।
লিখিতে অসাধ্য হয় শুন সাধুজন।"

† এই 'করণ-বর্ণন' বা আদি ঢাকুর-রচয়িতা কাশীদাস বা কাশীশ্বর দাস নরদাসেরই জ্ঞাতিবংশোদ্ভব ছিলেন।

(২০৮) এই স্থান যোগিনীতন্ত্রে ও আসামের প্রাচীন বুরুঞ্জীসমূহে 'কুবাচ' ও তবকাৎ-ই-নাসিরি প্রভৃতি প্রাচীন মুসলমান ইতিহাসে 'কুচ' নামে উক্ত হইয়াছে।

রাজার (সম্ভবতঃ দেবপালের) প্রিয়পাত্র ধীরদাস ও শূরদাস তৎকালীন পালরাজধানী পাটলিপুত্র অথবা মুদগগিরি পরিত্যাগ করিয়া বরেন্দ্রে আসিয়া বাস করেন। শূরদাসের পুত্র শ্রীধর, তৎপুত্র গদাধর, তৎপুত্র রাজ্যধর, রাজ্যধর কুবচ[২০৯] বা কুচবিহারে গিয়া বাস করেন। তৎপুত্র শ্রীধর কামরূপাধিপতির অধীনে 'কাণড়া' বা কর্ণাটসৈন্যগণকে পরাজয় করিয়া কুচবিহারে সামন্ত-প্রধান বা মহাসামন্ত হইয়াছিলেন। তৎপুত্র শূলপাণি। শূলপাণির পুত্র পিনাকপাণি ও চক্রপাণি। চক্রপাণি যদুবীরকে উপেক্ষা করিয়াছিলেন। এই যদুবীরের নামোল্লেখ নাই। সম্ভবতঃ ইনি বঙ্গাধিপ হরিবর্ম্মা বা শ্যামলবর্ম্মার পিতা জাতবর্ম্মা হইবেন। চক্রপাণির পুত্র টঙ্কপাণি। ইনি একজন মহাযোদ্ধা ছিলেন। যুদ্ধে গৌড়াধিপকে সাহায্য করিয়া ইনি যশস্বী হইয়াছিলেন, তাহারই ফলে গৌড়রাজমন্ত্রী ইঁহাকে কন্যাদান করেন। কাশীদাস লিখিয়াছেন, এই বিবাহে দেব ও দাসবংশে করণ হইল এবং উত্তর ও দক্ষিণে মিল হইয়াছিল। কাশীদাসের উক্তি হইতেই বুঝা যাইতেছে, গৌড়রাজমন্ত্রী 'দেব' উপাধিধারী কায়স্থ ছিলেন। নবাবিষ্কৃত ভোজবর্ম্মার বেলাবো তাম্রলিপি হইতে জানা যায় যে তাঁহার পিতামহ যাদববংশীয় জাতবর্ম্মা কামরূপ আক্রমণ করিয়াছিলেন। পূর্ব্বেই লিখিয়াছি যে, গৌড়াধিপ ৩য় বিগ্রহপাল জাতবর্ম্মার শ্বশুর চেদিরাজ কর্ণদেবকে পরাজয় করিয়া তাঁহার কন্যা যৌবনশ্রীর পাণিগ্রহণ করেন, এই গৌড়াধিপের প্রধান মন্ত্রীর নাম যোগদেব। সমরজয়াবসানে যখন বিগ্রহপাল নিজে চেদিরাজকন্যার পাণি-গ্রহণ করেন, সেই উৎসবের সময় সম্ভবতঃ তিনিও মন্ত্রী যোগদেবের কন্যার সহিত কুবচের মহাসামন্ত টঙ্কপাণির পরিণয়কার্য্য সম্পন্ন করাইয়া ছিলেন। এই পরিণয়োৎসবে উত্তর ও দক্ষিণ বঙ্গের সকল সামাজিক কায়স্থ সমবেত হইয়াছিলেন।

টঙ্কপাণির পুত্র রত্নপাণি। তিনি ম্লেচ্ছহস্তে কুচবিহাররাজ্য হারাইয়া ছিলেন। আসামের তেজপুর ও নওগাঁও হইতে আবিষ্কৃত তাম্রশাসনে ম্লেচ্ছবংশীয় সালস্তম্ভ, বিগ্রহস্তম্ভ প্রভৃতি নৃপতির উল্লেখ আছে; তাঁহারা ভগদত্ত-রাজবংশীয় বলিয়াও পরিচিত হইয়াছেন। বর্ত্তমানকালে ঐ ম্লেচ্ছবংশধরগণই মেচ, কোচ বা কাছাড়ী নামে প্রসিদ্ধ। রত্নপাণির পুত্র নরসিংহ-দাস। ইনি বারেন্দ্র কায়স্থ-সমাজে নরদাস ঠাকুর নামে সুপরিচিত। যদুনন্দনের মুদ্রিত ঢাকুর-গ্রন্থে ইনি 'কুবঞ্চের' নৃপতি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।[২১০] ভারতের নানাস্থানে সামন্ত-রাজ-বংশধরগণ অদ্যাপি 'ঠাকুর' নামে পরিচিত। এইরূপে সামন্ত-রাজপুত্র নরসিংহদাসও নরদাস-ঠাকুর নামে অভিহিত হইয়াছেন। নরদাস নিজ পৈতৃক রাজ্য কুচবিহার পরিত্যাগ করিয়া

(২০৯) তবকাত্-ই-নাসিরি নামক সমসাময়িক ইতিহাস হইতে জানা যায় যে আলী মেচ নামক এক মেচ-সর্দার মহম্মদ্-ই-বখ্তিয়ারকে কামরূপ আক্রমণকালে সাহায্য করিয়াছিলেন। (Raverty's Tabakat-i-Nasiri, p. 561.) এই প্রমাণেও বলা যাইতে পারে যে বখতিয়ারের অভ্যুদয়ের পূর্ব্বেই কুচবিহার ম্লেচ্ছ বা মেচ-জাতির অধিকারভুক্ত হইয়াছিল।

(২১০) "নরদাস ঠাকুর নাম, কুবঞ্চ নগর ধাম, আছিলেন বরাজ্য আশ্রয়ে।
মাতামহ গৌরব, পৃথিবীতে যার যশ, অদ্যাবধি মহিমা ঘোষয়ে।"
(যদুনন্দনের ঢাকুর ৩৩ পৃষ্ঠা, শ্রীকৃষ্ণচরণ মজুমদার মহাশয় কর্ত্তৃক ১৮১৩ শকে প্রকাশিত)

বারেন্দ্রভূমে বাঁকিগ্রামে আসিয়া বাস বাস করেন। এ সময় বরেন্দ্রভূমে গৌড়াধিপ রামপালের বঙ্গে মহাস্থান প্রধান তীর্থ বলিয়া পরিচিত হইয়াছিল। এখানে আসিয়া নরদাসঠাকুর কিছু দিন অবস্থান করেন। মহাস্থানগড়ে শাহ-সুলতানের দরগার চৌকাটের উপরিভাগে দুই ছত্রে তাঁহার নাম এইরূপ খোদিত আছে—

"শ্রীনরসিংহদাসস্য।"

সাধারণে খোদিত-লিপির নরসিংহকে রাজা নরসিংহ বলিয়াই জানেন।[২১১] সম্ভবতঃ নরদাস-ঠাকুর রাজপুত্র ছিলেন বলিয়াই এরূপ প্রবাদ প্রচলিত হইয়া থাকিবে। বৃদ্ধ নরদাস পালরাজ-পক্ষ ছিলেন বলিয়া তিনি বল্লালের অধীনতা স্বীকার করেন নাই। তাঁহার পুত্র বটুদাস বল্লালের পক্ষাবলম্বন করেন, সেজন্য নরদাসঠাকুর বটুকে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। কিন্তু বল্লালসেন তাঁহাকে পূর্ব্ববঙ্গে মহাসামন্ত পদ দিয়া সম্মানিত করেন। তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীধরদাস 'সূক্তি-কর্ণামৃত' নামক সংস্কৃত কবিতাসংগ্রহ সঙ্কলন করিয়া যশস্বী হইয়াছেন।

পূর্ব্বেই লিখিয়াছি,—৩য় বিগ্রহপালের সময় দাস ও দেববংশে মিলন হইয়াছিল। এখন

বারেন্দ্র-দেববংশ

দেখা যাউক, কুলগ্রন্থে দেববংশের কিরূপ কুলপরিচয় পাওয়া যায়। কাশীদাস এইরূপ লিখিয়াছেন—

"দেব বংশ মহাবংশ কাণসোণায় অবতংস
খ্যাতি ভাতি সর্ব্বলোকে কয়।
কতই রাজা মন্ত্রী পাত্র কতবা কুল সুপবিত্র
সপ্তগোত্র গৌড়ে প্রচরয়॥
মৌদগল্য শাণ্ডিল্যরাজ পরাশর ভরদ্বাজ
বাচ্ছ ঘৃতকৌশিক আলমান।
কি কব কুলের কীর্ত্তি যাবচ্চন্দ্র বসুমতী
করণে শ্রীকরণ অভিধান॥
রাঢ়ী মধ্যে সবে গণ্য আলমান বারেন্দ্রে ধন্য
রাজসভায় বহুত সম্মান।
রাজার দক্ষিণ হস্ত জ্ঞানে গুণে সুপ্রশস্ত
দাতা ভোক্তা গৌড়ে গরীয়ান্॥
শিখিধ্বজ অগ্রগণ্য সর্ব্বত্র অশেষ মান্য
শ্রীকেশব তান বংশধর।
অঙ্গে বঙ্গে তার ছত্র ধরেছিল কুলছত্র
কিবা কব মহিমা অপার॥

(২১১) শ্রীপ্রভাসচন্দ্র সেনের বগুড়ার ইতিহাস ২য় খণ্ড, ৭১ পৃষ্ঠা।

পূর্ব্ব বাস ছাড়ি অঙ্গে　　একদেব আইলা বঙ্গে
তাহার বংশে যোগদেব নাম।
বিদ্যাবুদ্ধে বৃহস্পতি　　মহামন্ত্রী মহামতি
রাজবশ সর্ব্বত্র সুনাম॥
তাহার নন্দন চারি,　　সবে অস্ত্র-শাস্ত্রধারী
বোধি, জ্ঞান, মধু, শ্রীধর।
বোধিদেব সর্ব্বজ্যেষ্ঠ পুত্র　　সেই হইল মহাপাত্র
পিতৃনাম করিলা উজ্জ্বল॥
জ্ঞানের সুজ্ঞান কথা　　আছে রাষ্ট্র যথা তথা
মধুকর দেবকুলহর।
শ্রীধর স্বভাবে খাটো　　কুলে শীলে বড় আঁটো
ধনদৌলত করিল বিস্তর॥
বোধির সন্তান তিন　　কেহ আঁট কেহ হীন
বুধ বৈধ শ্রীকুল সুধীর।
জ্যেষ্ঠ বৈধ নৃপমান্য　　কাণ্ডুরে হইল ধন্য
স্থানত্যাগে খাট হইল বীর॥
বুধদেবের এক ধারা　　সমাজে রহিল তারা
আর ধারা উত্তরে মিশিল।
কুলদেব কুলশ্রেষ্ঠ　　কনিষ্ঠ মান্যেতে জ্যেষ্ঠ
কুলসভায় পূজিত হইল॥
ধ্রুবদেব কুলপতি　　পুত্র তাহার মহাখ্যাতি
বল্লালসেনের মতে না চলিল।
শুনিয়া তাহার কীর্ত্তি　　ভৃগুনন্দী মহাপ্রীতি
সাধ্যভাবে আনিয়া সাধিল॥
বাণকোটে তাহার পুত্র　　পাইল কুলরাজচ্ছত্র
গুণনিধি গুণাকর নাম।
শুদ্ধাচার সুপ্রতিষ্ঠ　　সদা তেঁহ কুলে হৃষ্ট
কিবা কব মহিমা বাখান॥"[২১২]

(২১২) রঘুনন্দন তাঁহার সংক্ষিপ্ত ঢাকুরে দেববংশের এইরূপ আদিপরিচয় দিয়াছেন—
"শুন সবে দেববংশ করি নিবেদন।
কাণসোণায় দেব হইল রাজেন্দ্রে গণন।

কাশীদাসের উদ্ধৃত ঢাকুর হইতে পাওয়া যাইতেছে যে, অঙ্গ হইতে দেববংশ বঙ্গে আগমন করেন। দেববংশ বহু পূর্ব্বকাল হইতেই অঙ্গে বা ভাগলপুর অঞ্চলে বাস করিতেন।[২১৩] বলা বাহুল্য, দেবপাল হইতে নারায়ণপাল পর্য্যন্ত পালনৃপতিগণের বর্ত্তমান ভাগলপুরবিভাগের অন্তর্গত মুদ্গগিরি বা মুঙ্গেরেই রাজধানী ছিল[২১৪]। তৎপরে রাজ্যপাল, ২য় গোপাল ও ২য় বিগ্রহপালের রাজাধানী কোথায় ছিল, তাহা ঠিক জানা যায় নাই, সম্ভবতঃ গুর্জ্জর, প্রতিহার, কর্ণাট, চোল ও চন্দেল্ল প্রভৃতির পুনঃ পুনঃ আক্রমণে ব্যতিব্যস্ত থাকায় তাঁহারা স্থায়িভাবে একস্থানে অবস্থান করিতে সমর্থ হন নাই। প্রথম মহীপালই বরেন্দ্রভূমে বিলাসপুরনামক স্থানে রাজধানী করিয়া বাস করিতে থাকেন। সম্ভবতঃ তাঁহার সময়ে একদেব বরেন্দ্রে আসিয়া বাস করেন।

গরুড়স্তম্ভলিপি হইতে জানিতে পারি যে, নারায়ণপাল পর্য্যন্ত নৃপতিগণ শাকদ্বীপীয় মিশ্র-ব্রাহ্মণবংশের অনুগত ও তাঁহাদেরই অভিপ্রায়ে পরিচালিত হইতেন। রাজ্যপালের সময় গুরবমিশ্রের মৃত্যু এবং গৌড়ে রাষ্ট্রকূট-প্রভাব বিস্তৃত হয়। এই সময় উত্তরভারতে রাষ্ট্রকূট, গুর্জ্জর ও চন্দেল্ল প্রভৃতির সহিত রাজনীতিক সম্বন্ধ হেতু সান্ধিবিগ্রহিক কায়স্থগণ আবার ধীরে ধীরে প্রতিপত্তিলাভ করিতেছিলেন। সম্ভবতঃ প্রথম মহীপালের সময় হইতেই আবার কায়স্থগণ পূর্ব্বপদে প্রতিষ্ঠিত হন। প্রথম মহীপালের বাণগড়-তাম্রলেখ হইতে জানিতে পারি যে, তিনি মহাকার্ত্তাকৃতিক বা জ্যোতির্ব্বিদধ্যক্ষের পদ তুলিয়া দেন,—তৎ-পূর্ব্ববর্ত্তী নৃপতিগণের শাসনপত্রে ঐ পদের স্পষ্ট উল্লেখ থাকিলেও তাঁহার তাম্রশাসনে আদৌ উক্ত পদের উল্লেখ নাই। ইহাদ্বারাও পালসভাস্থ দৈবজ্ঞ ব্রাহ্মণগণের পূর্ব্বপ্রভাব-লোপেরই আভাস পাওয়া যাইতেছে। বোধ হয়, একদেবই এই দেববংশের মধ্যে সর্ব্বপ্রথম পাল-রাজসভায় সম্মানিত হইয়াছিলেন। যে সময় প্রথম মহীপাল রাজেন্দ্রচোলকে বিতাড়িত করিয়া উত্তররাঢ়ের প্রাচীন রাজধানী কর্ণসুবর্ণে অবস্থান করিতেছিলেন, তৎকালে একদেবও

সাধ্যমধ্যে খ্যাত হইল একদেব নাম।
তাহার সন্তান তিন অতি অনুপাম॥
শ্রীধর মধুদেব জ্ঞানদেব নাম।
দেব করণ হইল অন্ত যত মান॥
বুধদেব কুলদেব বারেন্দ্রে রহিলা।
সাধ্যমধ্যে দুই ধারা প্রসিদ্ধ হইলা॥"

এখানে যদুনন্দন পূর্ব্বোক্ত দাসবংশের মত এই দেববংশের আদিবৃত্তান্ত অনেকটা ছাড়িয়া গিয়াছেন, বংশ-পরিচয়েও তাই গোল ঘটিয়াছে। একদেবের ধারায় যাঁহারা ভিন্ন সমাজে মিশিয়াছেন, যদুনন্দন তাঁহাদের নামই উল্লেখ করেন নাই।

(২১৩) ৫৭ ও ৫৮ পৃষ্ঠায় সবিশেষ দ্রষ্টব্য।

(২১৪) ১৬০ ও ১৬৭ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

এখানে কিছুকাল বাস করিয়া থাকিবেন। প্রথম মহীপাল যে এখানে কিছুকাল অবস্থান করিয়াছিলেন, কাণসোণার নিকট 'মহীপাল' নামক স্থান আজও তাহার স্মৃতিরক্ষা করিতেছে। বলা বাহুল্য, তৎপূর্ব্ব হইতেই কাণসোণা দেববংশের সমাজ বলিয়া গণ্য ছিল। একদেবের জ্ঞাতিগোষ্ঠী সম্ভবতঃ পূর্ব্ব হইতেই এখানে বাস করিতেন, তজ্জন্য তাঁহার ধারাও কাণসোণার দেব বলিয়াই পরিচিত হইয়াছেন। তাঁহার বংশধর (সম্ভবতঃ পৌত্র) যোগদেব ৩য় বিগ্রহপালের প্রধান মন্ত্রী ও দক্ষিণহস্তস্বরূপ ছিলেন। যোগদেবের পৌত্র বৈদ্যদেবের তাম্রশাসনে লিখিত আছে, 'দোর্দ্দণ্ডবিক্রম শাস্ত্রবিত্তম যোগদেব বংশানুক্রমে এই বংশের মন্ত্রী ছিলেন।'[২১৫] এই বংশক্রম-নির্দ্দেশহেতু মনে হয় যে, প্রথম মহীপালের সময় হইতেই এই দেববংশ মন্ত্রিত্ব করিয়া আসিতেছেন। এই যোগদেবের পুত্র বোধিদেব সম্রাট্ রামপালের একজন প্রধান মন্ত্রী ছিলেন। তৎপুত্র বৈদ্যদেবের তাম্রশাসনে এই দেববংশের এইরূপ পরিচয় বর্ণিত হইয়াছে—

'সেই রামপালদেবের তত্ত্বজ্ঞানমূর্ত্তি বোধিদেব নামে সর্ব্বত্র সুপ্রসিদ্ধ বিশুদ্ধস্বভাব মন্ত্রী ছিলেন। যিনি অদ্ভুতগুণগৌরবে বিশ্বমধ্যে আত্মসদৃশ (অপরাপর মন্ত্রিগণকেও) অতিক্রম করিয়াছিলেন। ইঁহার পত্নী ছিলেন প্রতাপদেবী। ইনি ধর্ম্ম, ঋদ্ধি ও কীর্ত্তির বিশ্রামভূমি, অসীমকান্তি বা অসাধারণ-সুন্দরী এবং পতিপ্রীতির মূর্ত্তিমতী প্রতিমা ছিলেন। ইঁহার গর্ভে এই বোধিদেবের তনয় হইতেছেন সুপ্রসিদ্ধ ও পরমশ্রীযুক্ত শ্রীবৈদ্যদেব। যাঁহার উচ্ছ্বলিত কীর্ত্তিসরোবরে শিবভূধরও পদ্মাঙ্কুরের আভা (অতিক্ষুদ্র) বলিয়া প্রতিভাত হইত। তাঁহার জন্মকালে দৈবজ্ঞ ও তার্কিকগণের মধ্যে হর্ষকোলাহল শ্রুত হইয়া শত্রুসেনাগণ অন্ন ও নিদ্রা ভুলিয়া সহসা মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়াছিল। এমন কি তাঁহার বন্ধুবর্গের নয়ন-জাত হর্ষধারায় সামর্থ্যযুক্ত শত্রুসেনার প্রতাপানলও নির্ব্বাপিত হইয়াছিল।[২১৬]

(২১৫) "যস্য বংশক্রমেণাভূৎ সচিবঃ শাস্ত্রবিত্তমঃ।
যোগদেব ইতি খ্যাতঃ স্ফুরদ্দোর্দ্দণ্ডবিক্রমঃ॥"
(বৈদ্যদেবের কমৌলিতাম্রলেখ ৩য় শ্লোক)

(২১৬) "তস্যোর্জ্জিবল-পৌরুষস্য নৃপতেঃ শ্রীরামপালোঽভবৎ
পুত্রঃ পালকুলাব্ধিশীতকিরণঃ সাম্রাজ্যবিখ্যাতিভাক্।
তেনে যেন জগত্রয়ে জনকভূলাভাদ্যথাবদ্যশঃ
ক্ষৌণীনায়ক-ভীম-রাবণবধাদুত্তার্ণবোল্লঙ্ঘনাৎ॥ ৪
যস্য শুদ্ধসচিবঃ পুরা ভবদ্বোধিদেব ইতি তত্ত্ববোধভূঃ।
বিশ্বমেব বিদিতোঽদ্ভুতৈর্গুণৈরুজ্‌ঝিতাত্মসদৃশঃ ক্ষিতাবয়ং॥ ৫
অস্য প্রতাপদেবী পত্নী ধর্ম্মর্দ্ধিকীর্ত্তি-বিশ্রান্তিঃ
আসীদসীমকান্তিঃ সন্তোষস্যাকৃতিঃ পত্যুঃ॥ ৬
অজনয়দ্যাত্তনয়োঽস্য বিশ্রুতঃ শ্রীবৈদ্যদেবঃ পরয়া শ্রিয়া যুতঃ।
যদুচ্ছলৎ-কীর্ত্তিসরোবরোদরে পদ্মাঙ্কুরাভঃ শিব-ভূধরোঽভবৎ॥ ৭

'সেই বৈদ্যদেবই সাম্রাজ্যলক্ষ্মীজুষ্ট প্রসিদ্ধ রামরাজের পুত্র কুমারপাল নৃপতির মনের মতন সচিব হইয়াছিলেন। অরাতি প্রভৃতির কিরীটের স্বর্ণে নির্ম্মিত সিংহমূর্ত্তি যাঁহার প্রাসাদের অগ্রভাগ অলঙ্কৃত করিতেছে, যাঁহার গ্রাস-ত্রাসে ভীত হইয়া চন্দ্রমধ্যস্থ বিম্বাকৃরূপী মৃগও পলায়নপর। সচিবসমাজরূপ সরোজের তিগ্মভানু ও সুবিস্তৃত যশঃসাগর-সদৃশ এই বৈদ্যদেব স্বাভাবিক বদান্যতায় চম্পাধিপ কর্ণ এবং সুজনগণের চিত্ত-কুমুদের শীতলরশ্মি বা চন্দ্রস্বরূপ প্রতিভাত হইয়াছিলেন।২১৭ যাঁহার দক্ষিণবঙ্গের সমর-জয়কালে নৌবাহিনীর বিজয়োল্লাসে দিক্করিগণও ত্রস্ত হইয়া গম্যস্থান খুঁজিয়া না পাইয়া আর চলিতে পারে নাই। এমন কি, যাঁহার নৌকাসমূহের উৎপতনশীল অরিত্রে উৎক্ষিপ্ত জলকণাসমূহ আকাশেই স্থিরতা প্রাপ্ত হইয়া যেন নিষ্কলঙ্ক চন্দ্রের ন্যায় উদিত হইয়াছিল। বাহুবীর্য্য-প্রভাকর ত্রৈলোক্যের সর্ব্বত্র পূর্ণযশা প্রজ্ঞানবাচস্পতি সেই উগ্রধীসম্পন্ন প্রধানামাত্য বৈদ্যদেব গৌড়-রাজ-কুমারপাল-নৃপতির রাজ্যের সপ্তাঙ্গ নিয়ত চিন্তা করিতেন বলিয়া সর্ব্বত্র তাঁহার প্রাণাপেক্ষা অধিক প্রিয় বন্ধু ছিলেন, এইরূপ (গুণসম্পন্ন) প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরে সংকৃত শ্রীতিগ্মদেব নৃপতির বিদ্রোহবিকার অবগত হইয়া তাঁহার রাজ্যের নরেশ্বরপদে গৌড়েশ্বর কর্ত্তৃক বহুকীর্ত্তিমান্ শ্রীবৈদ্যদেব নিযুক্ত হইয়াছিলেন। প্রভুর আজ্ঞা বরমাল্যের ন্যায় মস্তকে লইয়া সেই তেজস্বী সাক্ষাৎ সূর্য্যপরাক্রম বৈদ্যদেব দ্রুতগতি রণযাত্রায় কিছুদিন কাটাইয়া যুদ্ধে সেই ভূপতিকে জয় করিয়া নিজভুজবলেই ভূমিপতি হইয়াছিলেন।২১৮

দৈবজ্ঞেষু চ তর্ককেষু চ জনুর্দ্দিষ্টস্য দিষ্টিক্রতে-
রত্ন-স্বপ্ন-ধূর্ত্তার্ঘটিত্যরি-ভটৈরুগ্র চ্য সমুচ্ছিতং।
কিংকৈতন্মিত্র-বন্ধুবৃন্দ-নয়ন-প্রোদ্ভূতহর্ষাম্বুভিঃ
পারক্য-প্রসর-প্রতাপ-দহনস্তাভূদ্বিনির্ব্বাপণং ॥ ৮

(২১৭) সোঽয়ং রাম-নরেন্দ্রজস্য সচিবঃ সাম্রাজ্যলক্ষ্মীজুষঃ
প্রখ্যাতস্য কুমারপাল-নৃপতেশ্চিত্তানুরূপোঽভবৎ।
যস্যারাতি-কিরীট-হাটক-কৃত-প্রাসাদ-কণ্ঠীরব-
গ্রাস-ত্রাস-বশাদপৈত্যতি বিধোর্ব্বিম্বাঙ্করূপী মৃগঃ ॥ ৯
সচিবসমাজসরোজ-তিগ্মভানুঃ প্রসরযশোঽম্বুধিরেব বৈদ্যদেবঃ।
সহজ-বদান্যতয়ৈব চম্পকেশঃ সুজনমনঃ-কুমুদেষু শীতরশ্মিঃ ॥ ১০

(২১৮) যস্যানুত্তর-বঙ্গ-সঙ্গরজয়ে নৌবাটহীহীরব-
ত্রস্তৈর্দ্দিক্করিভিশ্চ যন্ন চলিতং চেন্নাস্তি তদ্গম্যভূঃ।
কিঞ্চোৎপাতুক-কেনিপাত-পতন-প্রোৎসর্পিতৈঃ শীকরৈ-
রাকাশে স্থিরতা কৃতা যদি ভবেৎ স্যান্নিষ্কলঙ্কঃ শশী ॥ ১১
গৌড়েশস্য কুমারপালনৃপতের্দ্দোর্বীর্য্য-তেজস্পতেঃ
ত্রৈলোক্যোদর-পূরি-ভূরি-যশসঃ প্রজ্ঞান-বাচস্পতেঃ।
সপ্তাঙ্গ-ক্ষিতিপাধিপত্যমজিতং সঞ্চিন্তয়ন্ন প্রধীঃ
প্রাণেভ্যোঽপ্যতিবল্লভস্য সচিবঃ সোঽভূদ্‌গুণিগ্রামণীঃ ॥ ১২

ইঁহারই বঙ্গীয় যুদ্ধযাত্রাকালে ব্যোমতল ধূলিকণায় বজ্রস্থলের অবস্থা প্রাপ্ত হইলে সূর্য্যের সপ্তাশ্বেরও যেন পদস্থাস-ভ্রম উপস্থিত হইত। এমন কি স্বয়ং ইন্দ্রদেবও অন্য কার্য্য করিতে অক্ষম হইয়া নয়নের অনিমীলনকর স্বকর্ম্মেরও নিন্দা করিতেন। বাহুদণ্ডরূপ অরণিঘর্ষণজাত হোমাগ্নিমধ্যে শত্রুসেনাবীররূপ ইন্ধনে রণযজ্ঞপূজায় শত্রুমস্তক-মালারূপ শ্রীফলদ্বারা হোমবিধির অনুষ্ঠান করিয়া পরনৃপতিগণের পূর্ণাহুতি প্রদানপূর্ব্বক এই বৈদ্যদেব অত্যুচ্চ যশোরূপ মহৎফললাভ করিয়াছিলেন। সেই ঘোরতর সমরক্ষেত্রের মধ্য হইতে খড়্গাঘাতে উৎপতিত শত্রুবীরগণের শিরোমালায় ব্যোমমার্গ সমাকীর্ণ নিরীক্ষণ করিয়া সহসা রাহুব্যূহের প্রসার মনে করিয়া সূর্য্যদেবও ভীত হইয়া ধূলিপটলে যেন নিজস্বরূপ গোপন করিয়াছিলেন। বৈদ্যদেব জ্ঞানে বৃহস্পতি, তেজে দিনপতি, সৎপৌরুষে শ্রীপতি, ধৈর্য্যে অম্বুপতি, ধনে ধনপতি এবং দানে চম্পাপতি ছিলেন, ভাষায় এই সকল উপমার বিষয় বলিয়াই এরূপ বলা হইল, বাস্তবিক তিনি সকল গুণসম্পন্ন বলিয়া আপনিই আপনার উপমাস্থল।২১। শ্রীরামচন্দ্রের অনুজ যেমন লক্ষ্মণ, তাঁহারও অনুজ সেইরূপ বুধদেব। নিখিল নির্ম্মলগুণে ধর্ম্মর্দ্ধি ও শীলর্দ্ধির নিকেতন বলিয়া প্রখ্যাত ও সৎফলপ্রসূ দানস্বরূপ দ্বিজগণের

এতাদৃশো হরি-হরিভুবি সংবৃতস্য শ্রীতিগ্ম্যদেব-নৃপতের্ব্বিকৃতিং বিশম্য,
গৌড়েশ্বরেণ ভুবি তস্য নরেশ্বরত্বে শ্রীবৈদ্যদেব উরুকার্য্যিরয়ং নিযুক্তঃ॥ ১৩
প্রণমিব শিরস্যাদায়াজ্ঞাং প্রভোরুরুতেজসঃ
কতিপয়দিনৈর্দ্দিগ্ধা জিষ্ণুঃ প্রয়াণমসৌ ক্রতং।
তমবনিপতিং জিত্বা যুদ্ধে বভূব মহীপতি-
র্নিজভুজপরিস্পন্দৈঃ সাক্ষাদ্দিবস্পতিবিক্রমঃ॥ ১৪
(২১৯) এতস্য প্রবরপ্রয়াণ সময়ে পাংশূৎকরৈঃ স্থণ্ডিল-
প্রায়ে ব্যোমতলেঽর্কসপ্তিকগণৈর্জ্জাতোঽপ্যুবাসভ্রমঃ।
কিঞ্চাক্ষিদ্বয়গোপনেন করয়োরস্তক্রিয়াক্ষমঃ
সুত্রামা নয়না-নিমীলনকরং কর্ম্ম স্বকং নিন্দতি॥ ১৫
দোর্দ্দণ্ডারণিজে হবি-র্ভুজি ভটব্রাতেন্ধনৈরেধিতে
সংগ্রামাধ্বর-পূজিতে রিপুশিরঃ-শ্রেণীলসৎ-শ্রীফলৈঃ।
কৃত্বা হোমবিধিং পরক্ষিতিভুজাং দত্বাথ পূর্ণাহুতিং
লব্ধোদগ্রযশো মহৎফলমসৌ শ্রীবৈদ্যদেবো বভৌ॥ ১৬
ঘোর-সমরমধ্যাৎ খড়্গঘাতোৎপতদ্ভিঃ পর-ভটশিরোভির্ব্যোমকীর্ণং নিরীক্ষ্য।
ঝটিতি বিসর-রাহু-ব্যূহধী-বিভ্যদর্কঃ স্বরূপমপি রজোভিঃ প্রোজ্ঝন্ খং জুগোপ॥ ১৭
জ্ঞানৈর্গীষ্পতিরজিতৈর্দ্দিনপতিঃ সৎপৌরুষৈঃ শ্রীপতি-
র্ধৈর্য্যৈরম্বুপতির্ধনৈর্দ্ধনপতির্দ্দানৈঃ স চম্পাপতিঃ।
কিঙ্কেতেঽপি গিরোপমান-বিষয়াঃ প্রায়ঃ প্রসিদ্ধের্ব্বলাদ্-
রূপঃ কিন্তু বয়ং স্বয়ং স্বসদৃশঃ সর্ব্বৈর্গুণানাং গণৈঃ॥ ১৮

প্রীতিদান করিয়া বাহুবলখ্যাত সেই কনিষ্ঠ ভ্রাতা কল্পতরুর প্রতিমূর্ত্তি বলিয়া সুপ্রসিদ্ধ হইয়াছেন।'২২০

উপরে যে বৈদ্যদেবের প্রশস্তি উদ্ধৃত হইল, তাহা রাজগুরু-পুত্র মনোরথের রচিত। ঐ প্রশস্তি এবং কাশীদাসের করণ-বর্ণনোক্ত দেববংশের আদিপরিচয় হইতে বেশ বুঝা যাইতেছে যে, ঐ দেববংশ পূর্ব্ব হইতেই জ্ঞানে, গুণে ও বার্য্যবত্তায় প্রসিদ্ধ ছিলেন। আমাদের সংগৃহীত কাশীদাসের পুঁথিতে বৈদ্যদেবই 'বৈধদেব' নামে প্রযুক্ত হইয়াছিলেন। সম্ভবতঃ ইনি বারেন্দ্র-সমাজের বাহিরে কামরূপের আধিপত্য লাভ করিয়া তথায় বাস করায় পরবর্ত্তীকালে তাঁহাদের বংশধরগণের সহিত বারেন্দ্র-সমাজের সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হয়, এই কারণে যদুনন্দন বৈদ্যদেবের অনুজ বুধদেবের নাম গ্রহণ করিলেও বৈদ্যদেবের প্রসঙ্গ ছাড়িয়া দিয়াছেন। বুধদেবও এক জন অতি ধার্ম্মিক, মহাবীর ও অতিশয় দাতা ছিলেন। বৈদ্যদেবের তাম্রশাসন হইতেই ইহা জানা গিয়াছে। এই বুধদেবের পরামর্শেই প্রাগ্‌জ্যোতিষপতি বৈদ্যদেব বারেন্দ্রবাসী কৌশিক গোত্র শ্রুতিস্মৃতিতত্ত্ববিদ্ শ্রীধর নামক ব্রাহ্মণ-প্রবরকে বৈশাখ মাসে বিষুবসংক্রান্তি একাদশী তিথিতে তাঁহার ৪র্থ রাজ্যাঙ্কে স্বর্গ-কামনায় প্রাগ্‌জ্যোতিষভুক্তির অন্তর্গত কামরূপমণ্ডলে বাড়া বিষয়ে সন্তিবড়া ও মন্দরা নামক গ্রামের কতকটা উক্ত তাম্রশাসন দ্বারা দান করেন। এ সময়ে হংসাকোঞ্চী নামক স্থানে বৈদ্যদেবের রাজধানী ছিল। জ্যোতিষিক-গণনা দ্বারা জানা যায় যে, ১০৭৭, ১০৯৬, ১১২৩ ও ১১৪২ ও ১১৬১ খৃষ্টাব্দে বৈশাখে বিষুবসংক্রান্তিতে একাদশী তিথি হইয়াছিল। উক্ত তাম্রশাসনের পাঠোদ্ধারকারী মাননীয় ভিনিস সাহেব ঐ কয়টী অব্দের মধ্যে ১১৪২ খৃষ্টাব্দই তাম্রশাসন-দানের কাল বলিয়া অবধারণ করিয়াছেন।২২১ কিন্তু কুমারপাল বা বৈদ্যদেবের অভ্যুদয় তাহার পূর্ব্বেই হইয়াছিল। মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের মতে ১১০৪ খৃষ্টাব্দের অল্পকাল পরেই মদনপাল দেবের অভ্যুদয়।২২২ সুতরাং তৎপূর্ব্বেই যে কুমারপাল ও বৈদ্যদেবের অভ্যুদয় ঘটিয়াছিল, তাহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। এরূপ স্থলে ১০৯৬ খৃষ্টাব্দই তাম্রশাসন-প্রদানের কাল ধরিয়া লইতে হইবে। তৎকালে বৈদ্যদেবের ৪র্থ বর্ষ চলিতেছিল। এই তাম্রশাসনে তিনি পরমভট্টারক মহারাজাধিরাজ উপাধি ব্যবহার করায় কেহ কেহ মনে করেন যে, বৈদ্যদেব গৌড়াধিপ কুমারপাল কর্ত্তৃক রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হইলেও কুমারপালের মৃত্যুর পরই স্বাধীন হইয়াছিলেন। কিন্তু আমাদের মনে হয় যে,

(২২০) "যস্য শ্রীবুধদেব ইত্যনুজভূঃ শ্রীরামভদ্রানুজ-
প্রারব্ধব্রতসীম-নির্ম্মলগুণৈর্যশ্চক্রিণীলঙ্কৃতঃ।
দানৈঃ সৎফল-পল্লবৈদ্বিজকুল-প্রীতি-প্রদানৈরপি
খ্যাতঃ কল্পমহীরুহ-প্রতিকৃতির্দোর্বীর্য্য-চক্ষ্মাশাঃ॥"২০

(বৈদ্যদেবের কমৌলিতাম্রলিপি)

(২২১) Epigraphia Indica, Vol. II. p. 359.

(২২২) Memoirs of the Asiatic Society of Bengal, Vol. III. p. 16.

ঐ তাম্রশাসন-দানকালে কুমারপাল জীবিত ছিলেন এবং তাম্রশাসনে তিনি বৈদ্যদেবের 'প্রভু' বলিয়াই পরিচিত হইয়াছেন। এরূপস্থলে ইহাও মনে হয় যে, গৌড়াধিপ কুমারপাল প্রিয়বয়স্ক বৈদ্যদেবকে আপনার ন্যায় শ্রেষ্ঠ উপাধি-গ্রহণের অধিকার দান করিয়াছিলেন।

সংক্ষিপ্ত ঢাকুর-রচয়িতা যদুনন্দন বৈদ্যদেবের অনুজ বুধদেব ও কুলদেবের উল্লেখ করিয়াছেন। যে ভ্রাতা বারেন্দ্র-সমাজে আসিয়া বাস করেন ও পিতার কনিষ্ঠ হইলেও কুলমর্য্যাদায় শ্রেষ্ঠ হইয়াছিলেন, তিনিই সম্ভবতঃ 'কুলদেব' খ্যাতি লাভ করেন।[২২৩] বারেন্দ্র-কুল-মধ্যে ইঁহার বংশধর গুণাকর বাণকোটে কুলরাজচ্ছত্রলাভ করেন, কাশীদাস ও যদুনন্দন উভয়েই তাহা ঘোষণা করিয়া গিয়াছেন।[২২৪]

বারেন্দ্র-সমাজে নন্দীবংশ বহুকাল হইতে প্রথিত। রামচরিতকার কলিকাল-বাল্মীকি সন্ধ্যাকর এই নন্দীবংশই উজ্জ্বল করিয়াছিলেন। এখন দেখা যাউক, কাশীদাস ঐ নন্দীবংশের কিরূপ আদিপরিচয় দিয়াছেন—

নন্দীবংশ

"কহিব নন্দীর কুল আদি হৈতে শুদ্ধ মূল
কাশ্যপগোত্রেব বংশসার।
সর্ব্বনামে করে পূজা কবেণ্‌ অমিততেজা
মহামান্য বদান্য প্রচার ॥
তমসার তীরবন্দী আছিল মাণিক্যনন্দী,
তার পুত্র শিবনন্দী মানী।
অশেস পুণ্যের ফলে পূজিত রাজার কুলে,
পুত্র তার শঙ্কর ভবানী ॥
পাইয়া রাজার আহ্বান ত্যজি পুণ্য পিতৃস্থান
আইলেন গৌড়রাজস্থানে।
তার বংশে কত মান, নাহি তার পরিমাণ,
রাজকার্য্যে দক্ষ সর্ব্বজনে ॥

(২২৩) যদুনন্দনরচিত ঢাকুরের কোন কোন পুথিতে বুধদেবের এক ভ্রাতা শ্রীধরের নামোল্লেখ আছে—
"শ্রীধর বুধদেব কুলদেব আর।
দেবতুল্য কয়ণ হইল তা সবার।"
সম্ভবতঃ তাম্রশাসনে শ্রীধর ও কুলদেবের নাম একত্র উল্লেখ থাকায় কোন কোন প্রাচীন কুলপঞ্জী-লেখক গোল করিয়াছিলেন, যদুনন্দন পরে তাহারই অনুবর্ত্তী হইয়াছেন।

(২২৪) এ সম্বন্ধে কাশীদাসের উক্তি পূর্ব্বেই উদ্ধৃত হইয়াছে। যদুনন্দন এইরূপ লিখিয়াছেন—
"সেই বংশে বাণাধিপতি গুণাকর নাম।
শুদ্ধাচার সুপ্রতিষ্ঠ অতিগুণধাম।
সেই সে দেবের আদি গুণক বিস্তার।
তারাগুণা বাস কৈল মহিমা অপার।"
শ্রীকৃষ্ণচরণ মজুমদার প্রকাশিত মূল ঢাকুর ৫৯ পৃষ্ঠা।

করতোয়া-কূলে বাস, নন্দীগ্রাম সুপ্রকাশ,
নিবাস পুরুষ সপ্তদশ।
সেই কুলে কীর্ত্তিমান্ মৈনাক রাজপ্রধান
বারেন্দ্র-সমাজ যার বশ॥
তার পুত্র প্রজাপতি জ্ঞানে গুণে ধনে খ্যাতি
গৌড়েন্দ্র যাহার অনুব্রতী।
তার পুত্র মহেশ্বর আর পুত্র সন্ধ্যাকর,
কালিদাস সম কবি খ্যাতি॥
তার হইল দুই পুত্র জানিহ কুলের সূত্র
বিধি নিধি কুলের প্রধান।
ভৃগুরাম কুলমণি কুলের প্রধান গণি
সপ্ত পুত্র হইল তাহান॥
শ্রীকণ্ঠ শিব শঙ্কর কৌতুক বাল্মীকি পর
কানু মাধু এই কয়জন।
বাল্মীকির না হৈল সুত কানু মাধু কুলযুথ
যাহা লইয়া বারেন্দ্র গণন॥
পাণ্ডববর্জ্জিত দেশে শ্রীকণ্ঠ যাইল শেষে
এহি হেতু সমাজে নিন্দিত।
রাজার আদেশ পাই শিব শঙ্কর দুই ভাই,
কামাখ্যায় হৈল উপনীত॥
কাণ্ডুরে দোঁহার বংশ কুলশীলে অবতংশ
মহিমায় নাহিক তুলনা।
বিষ্ণুভক্ত অনুরক্ত পাইল রাজার তক্ত
দাসখ্যাতি হইল গণনা॥
কানাই মাধাই ভাই রহিল সমাজ ঠাঁই
বড়-বলি বড় হৈল দোঁহে।
আদরে চন্দন পাইল শ্রেষ্ঠ বলি খ্যাতি হৈল
সর্ব্বজন-পূজ্য হৈয়া রহে॥
যবন-বিপ্লব-ভয়ে ধনজন প্রাণ লয়ে
নানাস্থানে সন্তান দুহার।
কেহ গেল পোতাজিয়া কেহ বা কালাইদীয়া
কেহ গঙ্গাবাস কৈল সার॥

কাশীদাস পরিচয় দিয়াছেন যে, নন্দীবংশ সুদূর পশ্চিম তমসার তীর হইতে এদেশে আসিয়া বাস করেন। এই নন্দীবংশের বীজপুরুষের নাম মাণিক্যনন্দী, তৎপুত্র শিবনন্দী, শিবের পুত্র শঙ্কর ও ভবানী উভয়ে রাজাহ্বানে গৌড়দেশে আগমন করেন। ১ম অধ্যায়ে আদিকায়স্থ-সমাজ-প্রসঙ্গে লিখিত হইয়াছে যে, ব্রাহ্মণ-মহারাজ সর্ব্বনাথ (খৃষ্টীয় ৬ষ্ঠ শতাব্দীর ১ম ভাগে) বিষ্ণু-মন্দিরের সংস্কার ও বিষ্ণুর নিত্যসেবা, বলি, চরু, সত্র, গন্ধ, ধূপ, মাল্য, দীপাদি পুরুষানুক্রমে নির্ব্বাহ করিবার জন্য শিবনন্দী, শক্তিনাগ, কুমারনাগ ও স্কন্দনাগকে তমসানদীতীরস্থ আশ্রমক নামক গ্রাম ভাগ করিয়া দিয়াছিলেন।[২২৫] উক্ত মহারাজ সর্ব্বনাথই কাশীদাসের ঢাকুরে সম্ভবতঃ 'সর্ব্বনাম' অভিধা লাভ করিয়াছেন এবং সন্ধ্যাকর নন্দী নিজ-রামচরিতে যেরূপ "করণ্যানামগ্রণী" [২২৬] অর্থাৎ করণ্য বা কায়স্থগণের অগ্রগণ্য বলিয়া নিজ পূর্ব্বপুরুষের পরিচয় দিয়াছেন, কাশীদাসের গ্রন্থে বিকৃতভাবে তাহাই 'করেণু অমিততেজা' রূপে বিবৃত হইয়া থাকিবে। যে সময় সম্রাট্ যশোধর্ম্মা লৌহিত্য-তীর পর্য্যন্ত আপনার শাসন বিস্তার করেন, সম্ভবতঃ সেই সময়ে শিবনন্দীর অপর পুত্রদ্বয় শঙ্কর ও ভবানী সৌভাগ্যান্বেষণে পৌণ্ড্রদেশে আগমন করেন, এখানে পৌণ্ড্র বা বরেন্দ্র-নৃপতি কর্ত্তৃক তাঁহারা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। তৎকালে বরেন্দ্রপতি ধর্ম্মাদিত্যপ্রমুখ নৃপতিগণ এ অঞ্চলে বহু কায়স্থ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। তাঁহাদের তাম্রশাসন হইতে তাহার প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। নন্দীবংশ করতোয়াকূলে যেখানে প্রথম প্রতিষ্ঠিত হন, সেই স্থান নন্দীগ্রাম নামেই পরিচিত হইয়াছিল। কাশীদাসের বর্ণনা হইতেও মনে হইতেছে যে, খৃষ্টীয় ৬ষ্ঠ শতাব্দীর মধ্যে কোন সময়ে নন্দীবংশ বরেন্দ্রভূমে করতোয়াতীরে আসিয়া বাস করেন। সংক্ষিপ্ত বারেন্দ্র-ঢাকুর-রচয়িতা যদুনন্দনও লিখিয়াছেন—

"চতুর্বিংশতি পুরুষ ভৃগু অবধি করিয়া।
উত্তম মধ্যম কার্য্য যাইছে চলিয়া॥"

এদিকে কাশীদাস লিখিয়াছেন যে, শঙ্করনন্দী ও ভবানীনন্দীর পর অধস্তন সপ্তদশ পুরুষ গত হইলে এই বংশে মৈনাক নামক এক ব্যক্তি রাজপ্রধান বা গৌড়াধিপের মন্ত্রী হইয়াছিলেন। ইঁহার পুত্র প্রজাপতি নন্দী, গৌড়াধিপ এই প্রজাপতির অনুরক্ত ছিলেন। এই প্রজাপতির পুত্র মহেশ্বর ও সন্ধ্যাকর। এই সন্ধ্যাকরই রামচরিত রচনা করেন ও 'কলিকাল-বাল্মীকি' নামে পরিচিত হন। সন্ধ্যাকর নিজেও লিখিয়াছেন যে, তাঁহার পিতামহের নাম পিনাকনন্দী ও পিতার নাম প্রজাপতিনন্দী। প্রজাপতি গৌড়াধিপের সান্ধিবিগ্রহিক ছিলেন।[২২৭] সম্ভবতঃ

(২২৫) ৩৬ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

(২২৬) রামচরিত—কবিপ্রশস্তি ৩য় শ্লোক

(২২৭) ৫৭ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

কাশীদাসের গ্রন্থে 'পিনাক' স্থানে 'মৈনাক' পাঠ গৃহীত হইয়াছে। অদ্যাপি বারেন্দ্র নন্দীবংশের একশাখা 'পিনাকনন্দীর ধারা' বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকেন।

রামচরিতপাঠে জানা যায় যে, সন্ধ্যাকরনন্দী গৌড়াধিপ রামপাল ও তৎপুত্র মদনপালের সময় এবং বারেন্দ্র-ঢাকুর-অনুসারে ভৃগুনন্দী বল্লালসেনের সময় বিদ্যমান ছিলেন। কাশীদাসের ঢাকুর-অনুসারে শিবনন্দী হইতে সন্ধ্যাকরনন্দী পর্য্যন্ত ২২ পুরুষ এবং ভৃগুনন্দী পর্য্যন্ত ২৪ পুরুষ হইতেছে। এদিকে যদুনন্দন অন্যত্রও লিখিয়াছেন—

"যাঁহার বিংশতি লোকে বল্লাল-মর্য্যাদা।
নয়শ চৌরানই শকে না ছিল একদা॥"

এই প্রমাণে ৯৯৪ শকে বা ১০৭২ খৃষ্টাব্দে নন্দীবংশে বিংশতি পুরুষ হইয়াছিল, তৎকালে বল্লালীমর্য্যাদা প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। এক্ষণে সমসাময়িক তাম্রলিপি, রামচরিত ও পরবর্ত্তী কুলগ্রন্থ আলোচনা দ্বারা বুঝিতেছি যে, খৃষ্টীয় ৬ষ্ঠ শতাব্দীতেই নন্দীবংশের অভ্যুদয় এবং পালাধিকারে এই বংশ ধনে মানে বিশেষভাবে সম্মানিত হইয়াছিলেন। সন্ধ্যাকরনন্দীর রামচরিত হইতে জানা যায় যে, পালাধিকারকালে এই বংশ পূর্ব্বোক্ত নন্দীগ্রাম হইতে উঠিয়া পৌণ্ড্রবর্দ্ধনপুর-প্রতিবদ্ধ 'বৃহৎবটু' গ্রামে আসিয়া বাস করেন।[২২৮]

বারেন্দ্র চাকি-বংশ

উক্ত দাস, দেব ও নন্দীবংশ ব্যতীত বর্ত্তমান বারেন্দ্র কায়স্থ-সমাজে চাকি ও নাগ এই দুই ঘরও অতি সম্মানিত এবং কুলগ্রন্থেও এই দুই বংশের যথেষ্ট খ্যাতি ও প্রশংসার আভাস রহিয়াছে। বলিতে কি, প্রধানতঃ এই দুই বংশের আনুকূল্যলাভ করিয়া ভৃগুনন্দী গৌড়াধিপ বল্লালসেনের প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও স্বতন্ত্র ভাবে বারেন্দ্র-সমাজ গঠন করিতে সাহসী হইয়াছিলেন। এই দুই বংশের সহিত গৌড়াধিপ পাল-বংশেরও যে নানা প্রকার রাজনৈতিক সম্বন্ধ ছিল, তাহারও আভাস পাওয়া গিয়াছে। প্রথমে আমরা 'চাকি'-বংশের পরিচয় দিতেছি। কাশীদাস এইরূপে গৌতম গোত্রজ দেব বা চাকি-বংশের পরিচয় দিয়াছেন—

(২২৮) "বসুধাশিরো বরেন্দ্রীমণ্ডলচূড়ামণিঃ কুলস্থানং।
শ্রীপৌণ্ড্রবর্দ্ধনপুরপ্রতিবদ্ধঃ পুণ্যভূঃ বৃহদ্বটুঃ॥
তত্র বিদিতে বিদ্যোতনি নন্দিরত্নসন্থানে।
সমজনি পিনাকনন্দী নন্দীব নিখিল পৌরুষস্য॥
তস্য তনয়ো মতনয়ঃ করণানামগ্রণীরনর্ঘগুণঃ।
সান্ধিবিগ্রহপদসম্ভাবিতাভিধানতঃ প্রজাপতির্জাতঃ॥
নন্দিকুল-কুমুদ-কানন-পূর্ণেন্দুর্নন্দনোঽভবত্তস্য।
শ্রীসন্ধ্যাকরনন্দী পিশুনাকন্দী সদা নান্দী॥"
(রামচরিত কবিপ্রশস্তি ১ম হইতে ৪র্থ শ্লোক)

"আর কহি চক্রীবংশ বিখ্যাতি ধরাধাজন।
গৌতম গোত্রের সার　　অশেষ প্রভাব বিস্তার
বাস্তবতা[২২৯] সর্ব্বত্র বাথানে॥
ঋষিকুল্যা শক্তিমতী　　সঙ্গম হইল তথি
আদিবাস পরিচয়ে দিব।
বীজী নাম গণপতি　　গাণপত্য-মন্ত্রে প্রীতি
পুত্র তার মহামতি দেব॥
পিতা পুত্রে দোঁহে মিলে　　আপ্ত-মিত্র দল-বলে
তামলিপ্ত কৈলা আগমন।
ধনলাভ সাগর-তীরে　　খ্যাতি হইল ঘরে ঘরে
ভূমি সখ্য হইল উপার্জ্জন॥
পুত্র তার মহামতি　　আচারে বিশুদ্ধ অতি
বিশুদ্ধাচার দেব হৈল নাম।
অশেষ পিতৃ-পুণ্য-ফলে　　রাজ্য-লাভ সাগরকূলে
দেব-সদাচার পুত্র তান॥
গরিষ্ঠ বণিক্ সহায়　　উত্তর করিল জয়
চক্রবর্ত্তী নৃপতিপ্রধান।
খ্যাতি হইল চক্রমূল　　তেজে বীর্য্যে নাহি তুল
চক্রীবংশ তেঁহ গরীয়ান্॥
তান পুত্র ভিক্ষাচার　　লইয়া ভিক্ষুর আচার
রাজ্যত্যাগী বৈরাগী হইল।
শত্রুপক্ষ বলবান্　　কাড়ি লইল রাজ্যমান,
শিশু পুত্র বিপিনে প্রবেশিল॥
নাম তার বিনয়াচার　　বিনয়ের অবতার
নাগরাজ তারে রক্ষা কৈলা।
তার সুত প্রচারদেবা　　নাগরাজে কৈল সেবা
সেই হেতু গ্রাম লাভ পাইলা॥

(২২৯) দক্ষিণরাঢ়ীয় ও বঙ্গজ বসুবংশেরও গৌতম গোত্র এবং প্রাচীন কুলগ্রন্থে এই বংশ 'বাস্তব্য' বা 'শ্রীবাস্তব' বলিয়া অভিহিত। কালীদাস তাহা লক্ষ্য করিয়াই কি গৌতম দেব বা চাকীবংশের 'বাস্তবতা' ঘোষণা করিয়াছেন। ঐতিহাসিক কাশীপ্রসাদ জয়সবাল্ বলেন যে, মধ্যপ্রদেশের সুপ্রাচীন বাকাটক-রাজবংশই পরে বাস্তব্য বা শ্রীবাস্তব নামে পরিচিত হইয়াছেন।

চক্রবর্ত্তী বংশহেতু গ্রামের নাম চক্রবর্ত্ত
তেঁহ চাকি প্রসিদ্ধি হইলা।
কমলপাণি তার সুত তার পুত মহিমাযুত
দণ্ডপাণি আখ্যাতি লভিলা॥
তৎপুত্র হেরম্বদেবা বিপ্রভক্ত দেবসেবা
ভক্তিগুণে বহুকীর্ত্তি তার।
সপ্ত পুরুষ তার গত ধনে জনে প্রিয়ব্রত
তার পর জন্মিল লম্বোদর॥
অশেষ বাহুর বলে পূজা দিলা গৌড়েশ্বরে
জটাধর তাহার নন্দন।
তার পুত্র ক্ষেমেশ্বর রাজার প্রিয় সহচর
কীর্ত্তি তার না যায় বর্ণন॥
পুত্র তাহার পশুপতি ধনে মানে কুলে খ্যাতি
ত্রৈলোক্যদেব তাহার কুমার।
পূজি দেব গজতুণ্ড পুত্র তার সুপ্রচণ্ড
মুরহর যশের আধার॥"

উদ্ধৃত পরিচয় হইতে প্রতিপন্ন হইতেছে যে, চক্রী বা চাকিবংশের পূর্ব্বপুরুষ দাক্ষিণাত্যে ঋষি-কুল্যা ও শুক্তিমতীর সঙ্গম-স্থানে বাস করিতেন। যে সময়ে নন্দীবংশের পূর্ব্বপুরুষ সুদূর পশ্চিম হইতে এ দেশে আগমন করেন, প্রায় সেই সময়ে গণপতিদেব পুত্র মহামতি দেব সহ তাম্রলিপ্ত নগরে আসিয়া বাস করেন। এখানে সাগরতীরে সৌভাগ্যবলে তাঁহার ধন, জন ও ভূমি লাভ ঘটে। মহামতি-দেবের পুত্র বিশুদ্ধাচার ক্রমে সাগরকূলে রাজা হইয়া বসেন। তৎকালে তাম্রলিপ্তের ধনকুবের বণিক্‌গণের প্রভাব সমস্ত এসিয়ায় পরিব্যাপ্ত ছিল।[২০০] তাঁহাদের সাহায্যে বিশুদ্ধাচার দেবের পুত্র সদাচারদেব উত্তর দিক্ জয় করিয়া রাজচক্রবর্ত্তী হইয়া বসেন। এই সদাচারদেব ও ফরিদপুর জেলাস্থ গাগ্‌রাহাটী গ্রাম হইতে আবিষ্কৃত তাম্রশাসন-বর্ণিত সমাচার-দেব উভয়ে এক ব্যক্তি কি না তাহা প্রণিধান-যোগ্য। উভয়েই এক সময়ের লোক বটে, সদাচারদেব রাজচক্রবর্ত্তী হইয়াছিলেন, এবং 'চক্রমূল' উপাধি লাভ করেন। সমাচারদেবের তাম্রফলকের মুদ্রায় 'পরাক্রমমুলস্ত' লিখিত আছে। চক্রমূল ও পরাক্রমমূল এই উপাধি দুইটিও প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণের আলোচ্য।

সদাচারদেবের পুত্র ভিক্ষাচারদেব সাম্রাজ্য ত্যাগ করিয়া বৈরাগী ভিক্ষু হইয়াছিলেন। এই সুযোগে তাঁহার শত্রুপক্ষ প্রবল হইয়া তাঁহার রাজ্য অধিকার করেন। তাঁহার আত্মীয়-

(২০০) বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস, বৈশ্যকাণ্ড, প্রথমাংশে এ সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করা হইয়াছে।

যখন তাঁহার শিশু পুত্রকে লইয়া বনে গিয়া আত্মরক্ষা করিতে বাধ্য হন। যে সময়ের কথা লিখিত হইতেছে, তৎকালে কর্ণসুবর্ণে মহারাজ শশাঙ্কদেবের অভ্যুদয় হইতেছিল। সম্ভবতঃ তিনি (অথবা অপর কোন নৃপতি ?) শিশু বিনয়াচারদেবের রাজ্য অধিকার করেন। নাগবংশীয় কোন এক নৃপতি সেই শিশু রাজপুত্রকে রক্ষা করিয়াছিলেন। বিনয়াচারের পুত্র প্রচারদেব নাগরাজের কার্য্য করিয়া তাঁহাকে পরিতুষ্ট করেন, সেই জন্য নাগরাজ তাঁহাকে একখানি গ্রাম দান করিয়া সম্মানিত করিয়াছিলেন। চক্রবর্ত্তী-নৃপবংশধরের বাস হেতু সেই গ্রাম চক্রবর্ত্ত নামে খ্যাত হয়। এই গ্রামে প্রচারদেবের বংশধরগণ পুরুষানুক্রমে বাস করিয়াছিলেন। তাঁহার অধস্তন দশম পুরুষে লম্বোদরদেব জন্মগ্রহণ করেন। তিনি আপনার বাহুবলের পরিচয় দিয়া গৌড়েশ্বরের নিকট উপযুক্ত সম্মান লাভ করিয়াছিলেন। লম্বোদরের পৌত্র ক্ষেমেশ্বর গৌড়াধিপের প্রিয় সহচর ও বহুকীর্ত্তিমান্ বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।[২৩১] ক্ষেমেশ্বরের পৌত্র ত্রৈলোক্যদেব। যদুনন্দন ত্রৈলোক্যদেবকে সিদ্ধবংশের প্রধান বলিয়া পরিচিত করিয়াছেন।[২৩২]

নাগবংশ

পূর্ব্বে বারেন্দ্রসমাজ-প্রতিষ্ঠাতা যে সকল মহাত্মার পূর্ব্ববংশাবলি লিখিলাম, তাঁহাদের মধ্যে নন্দী, চাকী ও দাস এই তিন সিদ্ধবংশই নাগবংশের প্রতিষ্ঠিত বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন, সুতরাং নাগবংশ যে অতি পরাক্রান্ত ও প্রসিদ্ধ বংশ, তাহাতে সন্দেহ নাই। আমরা সন্ধ্যাকরের রামচরিত হইতেও দেখিতে পাই যে, গৌড়াধিপ রামপাল ও তৎপুত্র মদনপালের সময় এই নাগবংশ অতি প্রবল ছিলেন, তাঁহারা কখন পালবংশের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিয়াছেন,[২৩৩] কখন বা তাঁহাদের বশ্যতাস্বীকার করিয়া তাঁহাদের দক্ষিণহস্তস্বরূপ কার্য্য করিয়া গিয়াছেন।[২৩৪] এখন দেখা যাউক, কাশীদাস এই নাগবংশের কিরূপ পরিচয় দিয়াছেন—

(২৩১) সন্ধ্যাকর রামচরিতে রামপালের সহচর এক ক্ষেমেশ্বরের উল্লেখ করিয়াছেন—

"কুর্ব্বদ্ভিঃ শংশদেবেন হেন্দীশ্বরেণ যেনেন।
চণ্ডেশ্বরাভিধানেন কিল ক্ষেমেশ্বরেণ চ সনাথৈঃ॥"

রামপালের দেবকীর্ত্তি-প্রতিষ্ঠায় যে সকল মহাত্মা তাঁহার পরামর্শদাতা ছিলেন, তন্মধ্যে ক্ষেমেশ্বর একজন এই ক্ষেমেশ্বর ও কাশীদাস বর্ণিত 'রাজার প্রিয় সহচর' ক্ষেমেশ্বর উভয়ে অভিন্ন ব্যক্তি বলিয়াই মনে হয়।

(২৩২) "সিদ্ধ মধ্যে সুপ্রধান, ত্রৈলোক্যদেব চাকি নাম,
চক্রবর্ত্ত গ্রামেতে বসতি।
গৌতম গোত্রের সার লিখে পঞ্চ প্রবর
কায়স্থ প্রধান উৎপত্তি॥" (যদুনন্দনের ঢাকুর)

(২৩৩) রামচরিত ৩।৪৩, ৩।৪৫ দ্রষ্টব্য।

(২৩৪) রামচরিত ৪।৩৭।

"অষ্টনাগের অষ্টবংশ ভূভারতে সুপ্রশংস
নাগপূজা চিত্রের সন্তান।
চিরদিন ধনী মানী সর্ব্বত্রেত রাজস্থানী
কিবা কহিব যশের বাখান॥
পুরাণে পুরাণ কথা লিখিয়াছে ব্যাস যথা
শুনিয়াছ পুরাণ প্রবীর।
আর্য্যাবর্ত্ত কৈলা জয় নাগপুরে রাজ্য হয়
মায়াপুরী মথুরা কাশ্মীর॥
সুশাসনে বসুমতী ভোগ কৈল কত পতি
চিরদিন সমান না যায়।
কর্কোটনাগের ধারা হৈয়া নিজ রাজ্যহারা
হিমালয় করিল আশ্রয়॥
সৌপায়ন ঋষি স্থানে সমাদর পুণ্যধামে
তেঁহ সৌপায়ন গোত্র সার।
সৌপায়ন আঙ্গিরস বার্হস্পত্য অপসার
নৈঞ্রুব প্রবর পঞ্চ তার॥
তাঁদের ছিল এক জ্ঞাতি অশ্বপতি মহামতি
সমাদরে কাশ্মীর নৃপতি।
বিধিলিপি সুপ্রসন্ন কাশ্মীরে হইল ধন্য
রাজ্যলাভ ঐশ্বর্য্য সম্প্রীতি॥
যবে সেই রাজবংশ কান্যকুব্জ করিল ধ্বংস
সেই কালে হিমালয় ছাড়ি।
কর্কোটনাগের ধারা কীর্ত্তিনাগ বিদিত ধরা
গৌড়দেশে আসি কৈলা বাড়ী॥
শুনিয়া রাজার জ্ঞাতি পূজা কৈল গৌড়পতি
আদিশূর নাম মহামতি।
তেঁহ হ'তে পাইল স্থান হইল সামন্তপ্রধান
কিরাতশৈলের অধিপতি॥
পূজিয়া বৃষভধ্বজ পুত্র পাইল নাগধ্বজ
সুবৃষ আর জয়বৃষ নাম।
সুবৃষ কিরাত সঙ্গে বঞ্চিল অনঙ্গরঙ্গে
সেই হেতু না হৈল সম্মান॥

আশ্চর্য্য কলির ধারা সুবৃষের সন্তানেরা
পাহাড়ীয়া নাগা নামে খ্যাত।
কিরাতের সঙ্গে মিলি কিরাত রীতিতে চলি
কিরাত জাতিতে হইল গত ॥
জয়বৃষ ধন্য হইল সবে দিল জয়মাল্য
সেই হইল সমাজের পতি।
জয়বৃষের দুই পুত্র ফণি মণি কুলসূত্র
মণিনাগ নেপালেতে গতি ॥
ফণীন্দ্র করণে ধন্য শ্রীকরণে কৈল মান্য
বহু জনস্থান কৈল জয়।
তার পুত্র সর্ব্বনাগ আর পুত্র দর্পনাগ
বোধিধর্ম্ম করিল আশ্রয় ॥
দর্পনাগের বংশধর অভয়াকর ভিক্ষাকর
দেবকন্যা কৈল পরিণয়।
অভয়ের দুই সুত জয়ধর গুণযুত
আর পুত্র রক্ষাকর হয় ॥
উত্তরে দক্ষিণে রণ রক্ষা কৈল পলায়ন
মহাবনে বাস কৈল সার।
জয়ধর জয়যুত নাগরাজ্যে অধিষ্ঠিত
বহুকীর্ত্তি করিল বিস্তার ॥
চক্রীবংশে কন্যা দিল অশেষ সুযশ হইল
তার পুত্র শ্রীধর হরিহর।
যুদ্ধ করি শ্রীধর মৈল হরিহর কুবচে গেল
রাজকার্য্যে খ্যাতি বহুতর ॥
হেরুক বাসুকীনাগ পুত্র হৈল মহাভাগ
কোটীদেশ করিল বিজয়।
বাসুকী গেল কলিঙ্গেতে হেরুক রৈল নাগকোটে
বাণকোট বলিয়া খ্যাতি হয় ॥
এক পুত্র হৈল ভূপতি আর পুত্র পশুপতি
ভূপতির পশ্চিমে প্রবাস।
নাগকোটে পশুপতি কীর্ত্তিমান্ নরপতি
বাণরাজ বলিয়া প্রকাশ ॥

গণপতি তার বেটা কুলে তার ছিল খোঁটা
পালদেবের তনয়া লইলা।
তার পুত্র শঙ্করনাগ কুলে শীলে অনুরাগ
কুবচেতে অধিকারী হইলা॥
দেবদত্ত তার সুত অশেষ মহিমাযুত,
মহাবনে কৈল রাজধানী।
পাল সনে কৈল সখ্য অশেষ সমরদক্ষ
পুত্র তার রুদ্র আর শিবানী॥
ধনে পুত্রে লক্ষ্মীমান কেহ নহে তৎসমান
বাহুবলে বহু অধিকার।
কত নরপতি হটে ভয়ে কেহ নাহি আঁটে
লক্ষসংখ্য যাহার যুঝার॥
উত্তরেতে বহু রাগ শিবতুল্য শিবনাগ
তার পুত্র কর্কোট জটাধর।
কি কব তাদের পুণ্য সর্ব্বলোকে ধন্য ধন্য
প্রতিজ্ঞায় কল্পতরু-পর॥
দোঁহার আশ্রয় করি ভৃগুনন্দী নরহরি
মুরহর দেব তিন জন।
বল্লালের রাজ্য ছাড়ি উত্তরেতে কৈল বাড়ী
যাঁহা হ'তে বারেন্দ্র গণন॥"

উদ্ধৃত পরিচয় হইতে বেশ বুঝা যাইতেছে, যে নাগবংশের খ্যাতি পুরাণেও বিবৃত হইয়াছে, একসময় নাগপুর, অযোধ্যা, মথুরা এবং মায়াপুরী পর্য্যন্তও যাঁহাদের আধিপত্য প্রসারিত হইয়াছিল—যাঁহাদিগকে পরাজিত করিয়া গুপ্তবংশের অভ্যুদয়, সেই প্রথিত রাজবংশ হইতেই বারেন্দ্রকায়স্থসমাজের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতার জন্ম। সম্ভবতঃ গুপ্তসম্রাট্গণের আধিপত্যকালে নাগবংশ হিমালয়-প্রদেশে আশ্রয়গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহাদেরই এক ধারায় কাশ্মীরের কায়স্থ-রাজবংশের অভ্যুদয়। কহ্লণের রাজতরঙ্গিণীতে যিনি অশ্বঘোষ বা অশ্বধাস নামে পরিচিত, তিনিই সম্ভবতঃ কাশীদাসের 'করণবর্ণন' বা আদিঢাকুরে অশ্বপতি নামে আখ্যাত হইয়াছেন। খৃষ্টীয় ৭ম শতাব্দে যে সময় কাশ্মীরে কর্কোটক-নাগবংশীয় কায়স্থগণ আধিপত্য বিস্তার করিতেছিলেন, সেই সময়ে উত্তরবঙ্গেও নাগরাজবংশ পার্ব্বত্যপ্রদেশে ধীরে ধীরে মস্তকোত্তোলন করিতেছিলেন, কাশীদাস চক্রী বা চাকিবংশের পরিচয়-প্রসঙ্গে সেই প্রাচীন নাগবংশেরই আভাস দিয়াছেন। কিন্তু এই নাগবংশের সহিত কাশ্মীরের কায়স্থনাগবংশের কোন সম্বন্ধ ছিল কি না, তাহা ঠিক বুঝিতে পারা যায় নাই। তবে গৌড়াধিপ আদিশূরের সময় যে কর্কোটক-

নাগবংশ এ দেশে আসিয়াছিলেন, এবং তাঁহারা যে কাশ্মীরের কায়স্থরাজবংশেরই জ্ঞাতি বা দায়াদ ছিলেন, কাশীদাসের বর্ণনা হইতেই তাহার সন্ধান পাওয়া যাইতেছে। সম্ভবতঃ কর্কোটকনাগবংশীয় কাশ্মীরপতি জয়াপীড়ের সহিত গৌড়াধিপ আদিশূরের আত্মীয়তা সুদৃঢ় হইলে অনেক নাগসন্তান শস্যশ্যামল গৌড়মণ্ডলে বাস সুবিধাজনক মনে করিয়াছিলেন। আদিশূরের সময় কর্কোটক-নাগবংশ ব্যতীত বাসুকীনাগবংশও রাঢ়দেশে অধিষ্ঠিত হইয়াছিলেন, মহেশঠাকুরের বাসুকী-কুলগাথা হইতে তাহার এইরূপ পরিচয় পাই—

"বাসুকী ঋষির শিষ্য পৌলব হইল।
তেঁই সেই বাসুকীগোত্র পৌলব পাইল॥
পৌলবের বংশে জন্ম নৈল বিশ্বনাথ।
সেনাপতি কর্ম্মে তিনি ছিল বড় খ্যাত॥
কান্যকুব্জ রাজার হইল সেনাপতি।
বিশ্বনাথ বহু যুদ্ধে লভিল সুখ্যাতি॥
তাহে তিনি হইলেন বিশ্বনাথ সেন।
তার অংশে মহীপতি সেন জন্মিলেন॥
সেই বংশে রমানাথ উদ্ভব হইল।
কনোজ হইতে তিনি গৌড়ে আইল॥"

বাসুকীকুলগাথারচয়িতা বলিতে চান যে, বাসুকীগোত্রজ সেনবংশের বীজপুরুষ রমানাথ আদিশূরের সময় গৌড়ে আগমন করিয়াছিলেন। কিন্তু বাসুকীগোত্রের ডাক বা প্রাচীন কুলগাথা পাঠ করিয়া আমাদের মনে হইতেছে যে, রমানাথের পূর্ব্বপুরুষ আদিশূরের সময়ে এদেশে আসিয়া থাকিবেন। তাঁহারা বাসুকীনাগের উপাসক এবং সেন বা যোদ্ধা ছিলেন বলিয়া বাসুকীসেন বলিয়া পরিচিত হন।

আসামে যে তৎপূর্ব্বেই নাগবংশের প্রভাব প্রসারিত হইয়াছিল, আসাম-বুরুঞ্জী হইতে তাহার কিছু কিছু আভাস পাওয়া যায়। আসাম-বুরুঞ্জীতে লিখিত আছে যে, নাগশঙ্কর বা শঙ্করনাগ খৃষ্টীয় ৪র্থ শতাব্দীতে আসামের দরঙ্গ জেলায় রাজত্ব করিতেন। করতোয়ার চরে তাঁহার জন্ম। তাঁহার বংশ চারিশত বর্ষ রাজত্ব করেন।

যাহা হউক, বারেন্দ্রসমাজের নাগবংশের বীজী কীর্ত্তিনাগ যে খৃষ্টীয় ৮ম শতাব্দীতে গৌড়দেশে আগমন করেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। কাশীদাস লিখিয়াছেন, যে সময় কাশ্মীরপতি কান্যকুব্জ আক্রমণ করেন, সেই সময় কীর্ত্তিনাগ হিমালয় পরিত্যাগ করিয়া কাশ্মীরপতির সহিত সম্মিলিত হন। কাশ্মীরের কায়স্থ-রাজবংশের ইতিহাসপ্রসঙ্গে লিখিয়াছি যে, কাশ্মীরপতি জয়াপীড় দুইবার কনোজ জয় করেন, একবার গৌড়ে আসিবার পূর্ব্বে, আর একবার গৌড়রাজকন্যা কমলা-দেবীকে বিবাহ করিয়া স্বরাজ্যে প্রস্থান-কালে।

সম্ভবতঃ ইহারই কোন সময় কর্কোটক কীর্ত্তিনাগ ও বাসুকী বিশ্বনাথ প্রথমে কনৌজ হইয়া অদৃষ্ট-পরীক্ষার জন্য সদলে গৌড়দেশে আগমন করেন। গৌড়াধিপ জয়ন্ত বা ১ম আদিশূর কীর্ত্তিনাগের দক্ষতার পরিচয় পাইয়া তাঁহাকে কিরাতশৈলের মহাসামন্তপদে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। আসাম ও চট্টগ্রামের পার্ব্বত্যপ্রদেশ পুরাণে 'কিরাত' জনপদ বলিয়া উক্ত হইয়াছে। সম্ভবতঃ আদিশূর আপনার সাম্রাজ্যের পূর্ব্বসীমা রক্ষা করিবার জন্য পূর্ব্বোক্ত নাগবংশের স্থানে কায়স্থবীর কীর্ত্তিনাগকে স্থাপন করিয়াছিলেন। কীর্ত্তিনাগের দুই পুত্র সুবৃষ ও জয়বৃষ। সুবৃষ কিরাতরমণীতে অনুরক্ত হইয়া কিরাতসমাজে মিশিয়া যান। এই হীনাচারনিবন্ধন তিনি পিতৃ অধিকার মহাসামন্তপদ লাভ করিতে পারেন নাই। সম্ভবতঃ তাঁহাকে পদচ্যুত ও সমাজচ্যুত করিয়া তাঁহার কনিষ্ঠ জয়বৃষ পিতৃপদ অধিকার করেন। এই উপলক্ষে উভয় ভ্রাতায় যুদ্ধ হইয়াছিল এবং জয়বৃষই জয়মাল্য অর্জ্জন করেন। সুবৃষের সন্তানেরা পাহাড়ীয়া-নাগা নামে পরিচিত হন।

মহাসামন্ত জয়বৃষের পুত্র মণিনাগ নেপালে গমন করেন, অপর পুত্র ফণী বা ফণীন্দ্রনাগ অনেক শ্রেষ্ঠ কায়স্থবংশের সহিত করণ ও নানাস্থান জয় করিয়া যশস্বী হইয়াছিলেন। তাঁহার দুই পুত্র সর্ব্বনাগ ও দর্পনাগ, উভয়ে বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করেন। দর্পনাগের পুত্র অভয়াকর ও ভিক্ষাকর,—দেববংশীয় কায়স্থকন্যার সহিত তাঁহাদের বিবাহ হয়। অভয়াকরের পুত্র জয়ধর ও রক্ষাকর। ইঁহাদের সময় (প্রায় খৃষ্টীয় ১০ম শতাব্দীর প্রথম ভাগে) উত্তর ও দক্ষিণবাসীর মধ্যে ঘোরতর যুদ্ধ চলিয়াছিল, এই সময় রক্ষাকর পৈতৃক শাসনকেন্দ্র পরিত্যাগ করিয়া মহাবনে গিয়া বাস করিয়াছিলেন। জয়ধর পরে সেই মহারণে জয়লাভ করিয়া নাগরাজ্যে অধিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। তিনি চাকিবংশে কন্যাদান করেন। তাঁহার দুই পুত্র শ্রীধর ও হরিহর। শ্রীধর যুদ্ধে প্রাণবিসর্জ্জন করেন। হরিহর কুবচে পলাইয়া যান, তথায় রাজকার্য্যে নৈপুণ্য-প্রদর্শন করিয়া তিনি খ্যাতিলাভ করেন। হরিহরের দুই পুত্র, হেরুক ও বাসুকীনাগ। উভয়ে কোটীদেশ জয় করেন। বাসুকী কলিঙ্গের অধিবাসী হইলেন। হেরুক বাণকোটে আধিপত্য করেন। এই নাগবংশের অধিষ্ঠানহেতু ঐ স্থান নাগকোট নামেও পরিচিত হইয়াছিল।[২৩৫] হেরুকের দুই পুত্র ভূপতি ও পশুপতি। ভূপতি পশ্চিমপ্রবাসী হন। পশুপতি বাণকোটে রাজা হইয়াছিলেন এবং বাণরাজ বলিয়া খ্যাতিলাভ করেন। তৎপুত্র গণপতিনাগ, পালরাজকন্যার সহিত তাঁহার বিবাহ হয়, তাহাতে পালরাজের নিকট তিনি মর্য্যাদা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু সমাজে গণপতির অপযশ হইয়াছিল। সম্ভবতঃ পালনৃপতির সাহায্যে তৎপুত্র শঙ্করনাগ কুবচের অধিপতি হইয়াছিলেন। তিনি শ্রেষ্ঠ কায়স্থকুলে সম্বন্ধ করিয়া

(২৩৫) কাশীদাসের বর্ণনা হইতে মনে হয় যে, নাগকোট বা বাণকোট কোটীদেশের অন্তর্গত। পালরাজগণের সময়ে এই কোটীদেশ 'কোটীবর্ষ' নামে পরিচিত ছিল। মুসলমান আমলে এই স্থান 'পরগণা দেওকোট' নামে খ্যাত হয়, অদ্যাপি এই স্থান দিনাজপুর জেলায় 'দেওকোট-পরগণা' নামে প্রসিদ্ধ। বাণকোট বা বাণগড় ইহার অন্তর্গত বটে। ইহার অপর নাম উমাবন।

সম্মানিত হইয়াছিলেন। তাঁহার প্রিয়পুত্র অশেষ সমরদক্ষ দেবদত্তনাগ মহাবনে রাজধানী করিয়াছিলেন।[২৩৬] পালনৃপতির সহিত তাঁহার মিত্রতা ছিল। দেবদত্তের দুই পুত্র—রুদ্রনাগ ও শিবনাগ বাহুবলে বহুস্থান অধিকার করেন। তাঁহাদের লক্ষ সৈন্য ছিল। উত্তরবঙ্গে শিবনাগের নামে সকলেই সন্ত্রস্ত হইত। রাজা শিবনাগের পুত্র কর্কোট ও জটাধর। দুই ভাই পুণ্যবান্, দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ও মহাদাতা বলিয়া পরিচিত ছিলেন। এই দুই জনের উৎসাহে ভৃগুনন্দী, নরহরি ও মুরহরদেব গৌড়েশ্বর বল্লালসেনকে উপেক্ষা করিয়া স্বতন্ত্রভাবে বারেন্দ্রসমাজ গঠন করিতে সাহসী হইয়াছিলেন।

আসাম-অঞ্চলে আধিপত্য বিস্তার ব্যতীত অপরাপর রাজবংশের নিকটও কায়স্থগণ সম্মানিত ও উচ্চ রাজকীয় কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছিলেন, এমন কি ভগদত্তবংশীয় নৃপতিগণও কায়স্থগণকে বিচার বিভাগের উচ্চপদে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। খৃষ্টীয় ১০ম শতাব্দীর শেষ ভাগে উৎকীর্ণ প্রাগ্‌জ্যোতিষপতি বলবর্ম্মার তাম্রশাসনে কায়স্থ রাজপুরুষ 'করণব্যবহারিক' নামে অভিহিত হইয়াছেন।[২৩৭]

কামরূপ জেলায় বেটনার নিকট বৈদরগড় নামে এক গড়ের ধ্বংসাবশেষ আছে। এই গড়টী কায়স্থবীর বৈদ্যদেবের নির্ম্মিত বলিয়া মনে হয়। আসামবুরুঞ্জীর মতে এই স্থানে আরিমত্ত নামে এক রাজা রাজত্ব করিতেন। তিনি দক্ষিণপশ্চিমাগত ছত্রী জিতারিরাজের পৌত্র ও রামচন্দ্রের পুত্র বলিয়া খ্যাত। রামচন্দ্র কমলকুমারী বা চন্দ্রপ্রভা নামে এক 'কায়েত'-রাজকন্যার পাণিগ্রহণ করেন।[২৩৮] আসাম বুরঞ্জীমতে এই রাজকন্যা নাগাখ্যবংশীয়া।[২৩৯] আরিমত্ত ১৬০ শাকে (১২৩৮ খৃষ্টাব্দে) রাজত্ব করিতেন। বলা বাহুল্য ঐ সময়েও আসাম-অঞ্চলে কায়স্থ নাগবংশ রাজত্ব করিতেছিলেন, আরিমত্ত তাঁহাদের দৌহিত্র সন্তান।

আদি পরিচয়ের সুবিধার জন্য পর পৃষ্ঠায় দাস, নন্দী, দেব, চাকি ও নাগবংশের আদি-বংশলতা উদ্ধৃত হইল :—

(২৩৬) সন্ধ্যাকরনন্দীর রামচরিত হইতেও জানা যায় যে, গৌড়াধিপ রামপালের সময়ে মহাবনে নাগবংশ অতিশয় প্রবল হইয়াছিলেন। রাষ্ট্রকূট তুঙ্গবংশকে তাঁহারা তাড়াইয়া দিয়াছিলেন, অবশেষে রামপাল তাঁহাদিগকে শাসন করেন। (রামচরিত ৩।৪৩)

(২৩৭) Journal of the Asiatic Society of Bengal, 1897, p 202.

(২৩৮) Captain Westmacott in Journal Asiatic Society of Bengal, 1835, p. 191.

(২৩৯) রায় গুণাভিরাম বড়ুয়ার আসামবুরুঞ্জী।

পালাধিকারে কায়স্থপ্রভাবের পৌর্ব্বাপর্য্যনির্দ্দেশক-বংশলতা

গৌতম-গোত্র চাকিবংশ
গণপতিদেব
মহামন্তিদেব
বিশুদ্ধাচারদেব (তাম্রলিপ্তে রাজ্যলাভ)
রাজচক্রবর্ত্তী সদাচারদেব
ভিক্ষাচার (বৈরাগী)
বিনয়াচার (নাগরাজরক্ষিত)
প্রচারদেব
(নাগরাজ কর্ত্তৃক চক্রবর্ত্তী-গ্রামলাভ)
কমলপাণি
দণ্ডপাণি
হেরম্বদেব
৭ পুরুষ পরে
লম্বোদর (গৌড়াধিপ-সম্মানিত)
জটাধর
ক্ষেমেশ্বর
পশুপতি
ত্রৈলোক্যদেব
মুরহরদেব (বল্লালের সমকালীন)
সৌপায়ন-গোত্র নাগবংশ
মহাসামন্ত কীর্ত্তিনাগ
সুবৃষ
জয়বৃষ
ফণিনাগ
মণিনাগ
সর্ব্বনাগ
দর্পনাগ
অভয়াকর
ভিক্ষাকর
রাজা জয়ধর
রক্ষাকর
শ্রীধর
হরিহর
হেরুক
(কোটীদেশজেতা)
বাসুকীনাগ
ভূপতি
পশুপতি বাণরাজ
শঙ্করনাগ
দেবদত্তনাগ
রুদ্রনাগ
শিবনাগ
কর্কোট
জটাধর
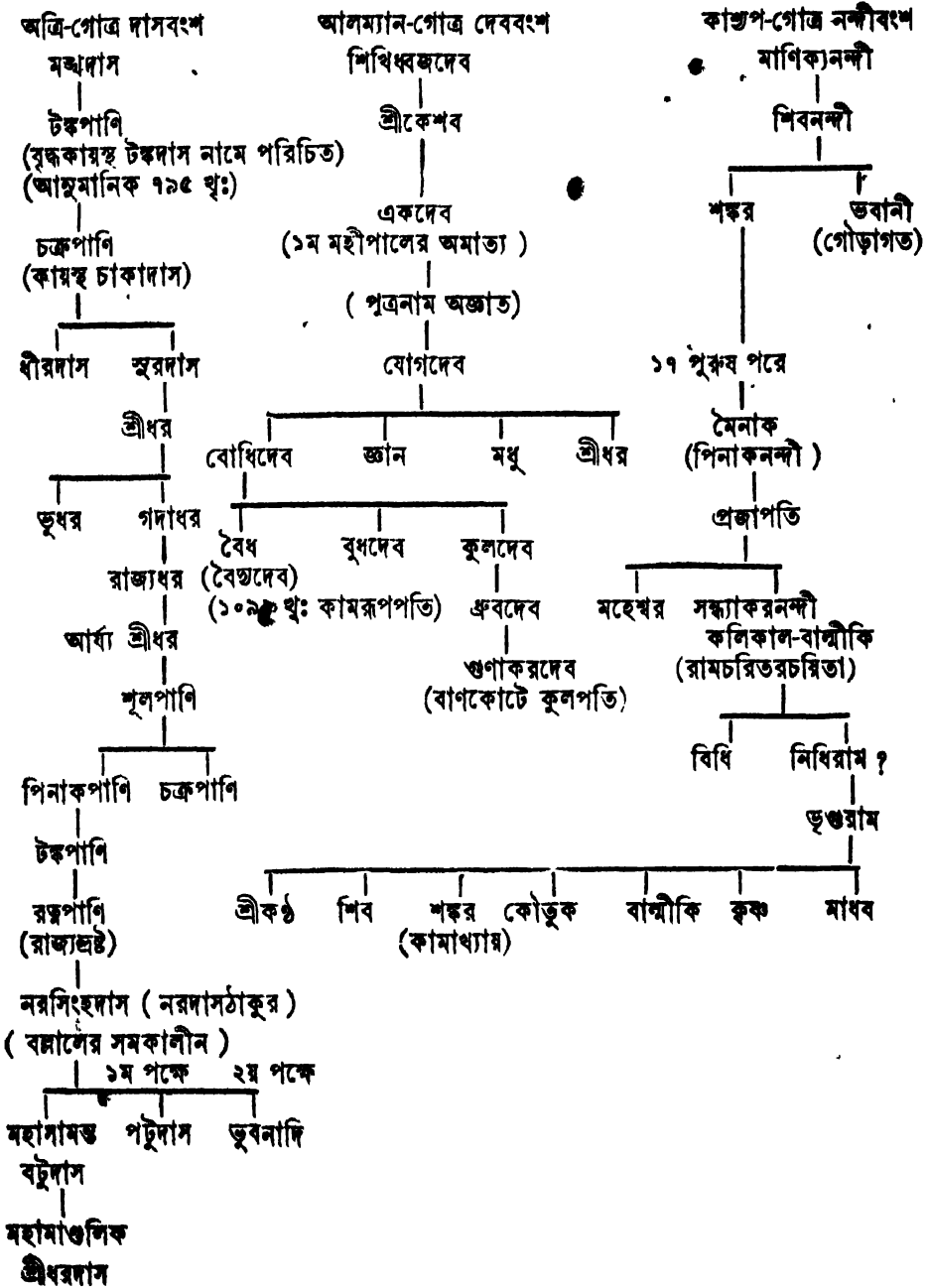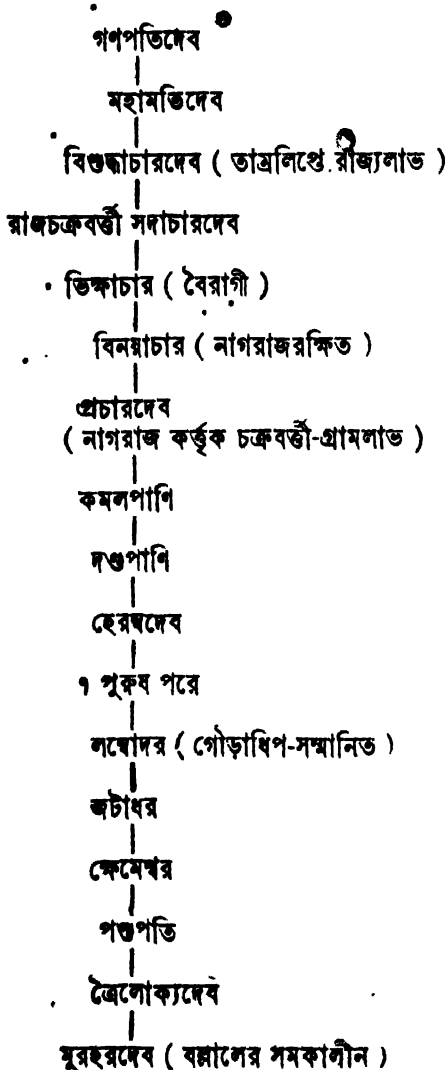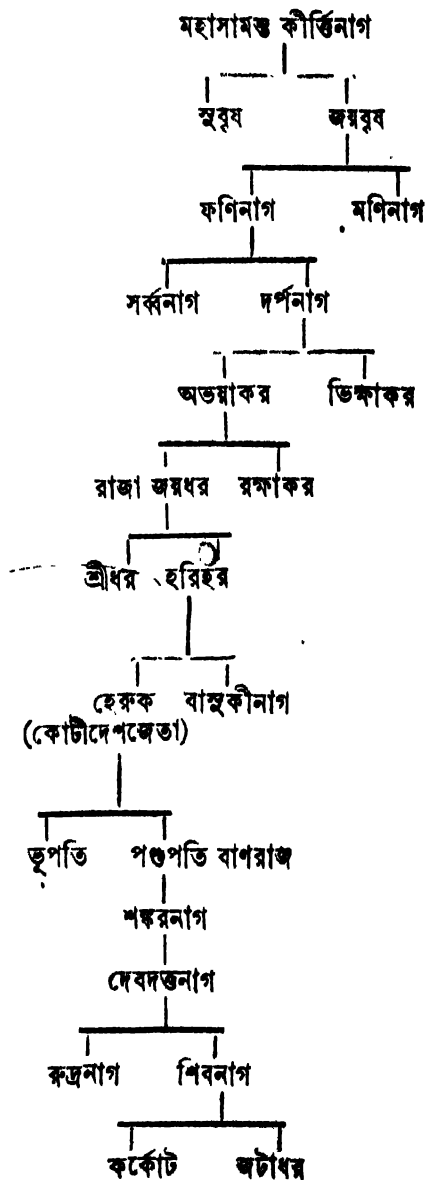
পালবংশের আধিপত্যকালে বারেন্দ্র-কায়স্থ-সমাজ-প্রতিষ্ঠাতৃগণের পূর্ব্বপুরুষগণ কিরূপ সম্মানিত ও উচ্চপদস্থ ছিলেন, তাহার পরিচয় দিয়াছি। এই সকল বারেন্দ্র-কায়স্থ ব্যতীত অনেক রাঢ়ীয় কায়স্থও যে পালাধিকারে যথেষ্ট প্রতিপত্তি ও আধিপত্য বিস্তারে সমর্থ হইয়াছিলেন, তাহারও সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। পূর্ব্বেই লিখিয়াছি যে, খৃষ্টীয় ৬ষ্ঠ শতাব্দীতে বারকমণ্ডলে (অধুনা ফরিদপুর জেলায়) ঘোষবংশ উচ্চ রাজকীয় পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। খৃষ্টীয় ৯ম শতাব্দীর শেষভাগে সৌকালীন গোত্রজ ঘোষবংশ আদিত্যশূর নৃপতির উৎসাহে রাঢ়দেশে মহাসামন্তনৃপতি বলিয়া পরিচিত হইয়াছিলেন।[২৪০] উত্তররাঢ়ে পালবংশের আধিপত্য বিস্তৃত হইলে সম্ভবতঃ এই ঘোষবংশের কোন কোন মহাত্মা গৌড়রাজ্যের সুদূর উত্তরপূর্ব্ব-প্রান্তে আসিয়া আধিপত্য বিস্তার করিতে উদ্যোগী হইয়াছিলেন। অল্পদিন হইল, এই ঘোষ-বংশোদ্ভব মহামাণ্ডলিক ঈশ্বরঘোষের একখানি তাম্রশাসন প্রকাশিত হইয়াছে। এই তাম্র-শাসনখানি দিনাজপুর জেলায় বর্ত্তমান মালদোয়ারষ্টেটের দপ্তরখানায় বহুদিন হইতে রক্ষিত আছে। মহামাণ্ডলিক ঈশ্বরঘোষ এই তাম্রশাসন দ্বারা ভার্গবগোত্রজ নিব্বোকশর্ম্মাকে একখানি গ্রাম দান করেন। মালদোয়ারে জনশ্রুতি আছে, 'নিব্বোকশর্ম্মা ঈশ্বরঘোষের গুরুদেব ছিলেন। তিনি দান গ্রহণ করিয়া তাম্রশাসনসহ গ্রামখানি তাঁহার গুরুদেবের চরণে উৎসর্গ করিয়াছিলেন। এই গুরুবংশই মালদোয়ারের রাজবংশ। এই জনশ্রুতি মালদোয়ার-রাজবংশে পুরুষানুক্রমে প্রচলিত আছে।'[২৪১]

ঘোষবংশ

উক্ত তাম্রলেখ হইতে এইরূপ পরিচয় পাইতেছি যে, 'রাঢ়াধিপ হইতে যিনি জন্মলাভ করিয়াছেন, তিনি সূর্য্যের ন্যায় প্রচণ্ড প্রতাপশালী ছিলেন বলিয়া নৃপবংশকেতু হইয়াছিলেন। সেই ধূর্ত্তঘোষের সুশাণিত অসিধারায় শত্রুকুলের গর্ব্বলেশ নির্ব্বাপিত হইয়াছিল। তাঁহা হইতে রণনীতিকুশলতায় দক্ষ, বিস্ফূর্জ্জিত তরবারিরূপ বজ্রাঘাতে বৈরিবর্গনিধনকারী, শ্রীবালঘোষ ঘোষ-কুলকমলে জন্মগ্রহণ করিয়া মার্ত্তণ্ডমণ্ডলস্বরূপ প্রথিত হইয়াছিলেন। তাঁহার ধবলঘোষ নামে এক পুত্র জন্মে, তাঁহার শাসনদণ্ড প্রচণ্ড ছিল বলিয়া জগতে তাঁহার মহাপ্রতাপ গীত হইয়াছিল। ইহলোকে যোদ্ধৃবর্গরূপ-রণতিমির-বিনাশে সূর্য্যতুল্য এবং বৈরিকুলাচলের পক্ষে বজ্রতুল্য যাঁহার কার্য্য ঘোষিত হইত, তাঁহার ভবানীর অভিন্না-মূর্ত্তি, সীতার ন্যায় পতিব্রতা এবং বিষ্ণুর লক্ষ্মীর ন্যায় সদ্ভাবানাম্নী এক ভার্য্যা ছিলেন। তাঁহার পুত্র ঈশ্বরঘোষ সপ্তাংশুর আলয় অর্থাৎ অগ্নির ন্যায় জয়শীল ছিলেন। ঈশ্বরের দুর্দ্ধর্ষ সাহস, অধিক কি, কান্তিপ্রভায় ইন্দ্রদ্যুতিও তাঁহার নিকট পরাজিত ছিল। যাঁহার শৌর্য্যপ্রভাবে অতি পরাক্রান্ত রিপুগণ পরাজিত হইয়াছিল—

(২৪০) ১৩০ ও ১৩১ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

(২৪১) সাহিত্য, ১৩২০ সাল, ৩৭ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

যাঁহার পূর্ণপ্রভাবের কথা শুনিয়া মুখমণ্ডল বাষ্পজলধারায় মলিন করিয়া শত্রুরমণীগণেরও ভয়োৎপাদন করিত।'২৪২

উদ্ধৃত সমসাময়িক লিপিপ্রমাণ হইতেই বুঝিতেছি যে, যে ঘোষ-রাজবংশে ঈশ্বরঘোষ জন্মগ্রহণ করেন, সেই বংশ সামান্য নহে। এক সময়ে সেই বংশ রাঢ় শাসন করিয়াছিলেন, আবার ভুজবীর্য্য-প্রভাবে ভিন্ন দেশেও তাঁহাদের আধিপত্য এবং প্রতিপত্তি প্রসারিত হইয়াছিল।

ঈশ্বরঘোষের উক্ত তাম্রলেখ হইতে আরও জানা যায় যে, তিনি মহামাণ্ডলিক ছিলেন। এই পদমর্য্যাদা বড় অল্প ছিল না। "তাঁহার আজ্ঞা অশেষ রাজরাজন্যকগণকে পালন করিতে হইত। তাঁহারও সামন্তসহচর ছিল, তাঁহার অধীনেও 'বিষয়পতি' ও 'ভুক্তিপতি' ছিল;—তাঁহারও কোট্ট (দুর্গ) ছিল; সেনাপতি-কোট্টপতি ছিল। একজন রাজাধিরাজের প্রবল-প্রতাপবিজ্ঞাপক যে সকল 'রাজপাদোপজীবী' থাকিত, মহামাণ্ডলিক ঈশ্বরঘোষেরও সেই সকল 'রাজপাদোপজীবী' ছিল।"২৪৩

মণ্ডলশব্দের আভিধানিক অর্থ 'দ্বাদশরাজক'২৪৪ অর্থাৎ দ্বাদশটী সামন্তরাজ বা বারভূঁয়ার উপর যিনি কর্ত্তৃত্ব করেন, তিনিই মণ্ডল বা মাণ্ডলিক। মাণ্ডলিকের উপরও যিনি কর্ত্তৃত্ব করিতেন, তিনি মহামাণ্ডলিক। তাঁহার অধিকার সাধারণ রাজপদবাচ্য ব্যক্তির অধিকার অপেক্ষা শতগুণ অধিক ছিল।২৪৫ সে কালের শাসনব্যবস্থায় রাজাধিরাজ 'পরম ভট্টারক' ছিলেন, তাঁহার পরেই মণ্ডলাধিপতির স্থান নির্দ্দিষ্ট ছিল।

(২৪২) "বভূব রাঢ়াধিপ-লব্ধজন্মা তিগ্মাংশুচণ্ডো নৃপবংশকেতুঃ।
শ্রীধূর্ত্তঘোষো নিশিতাসিধারো নির্ব্বাপিতারিব্রজগর্ব্বশেষঃ ॥১
আসীত্ততোপি সমরব্যবসায়সার-বিস্ফূর্জ্জিতাসিকুলিশক্ষতবৈরিবর্গঃ।
শ্রীবালঘোষ ইতি ঘোষকুলাব্জভানো মার্ত্তণ্ডমণ্ডলমিব পথিতঃ পৃথিব্যাং ॥২
তস্মাদভবদ্ধবলঘোষ ইতি প্রচণ্ডদণ্ডঃ সুতো জগতি গীতমহাপ্রতাপঃ।
যেনেহ ঘোষতিমিরৈকদিবাকরেণ বদ্ধাস্থিতং প্রবলবৈরিকুলাচলেষু ॥৩
ভবানীবাপরা মূর্ত্ত্যা সীতেব চ পতিব্রতা।
সদ্ভাবা নাম তস্যাভূদ্ভার্য্যা পদ্মেব শার্ঙ্গিণঃ ॥৪
তস্যা ঈশ্বরঘোষ এষ তনয়ঃ সম্পাংশুধামা জগ-
ত্যেকো দুর্দ্ধরসাহসঃ স্মিতপরঃ কান্ত্যা জিতেন্দ্রদ্যুতি।
যস্য প্রোজ্জিত-শৌর্য্যনির্জ্জিতরিপোঃ প্রৌঢ়প্রতাপশ্রুতে-
রাস্তবাষ্পজলপ্রণালমলিনং শত্রুস্ত্রিয়ো বিভ্রতি ॥"৫ (ঈশ্বরঘোষের তাম্রলেখ)

(২৪৩) সাহিত্য, ১৩২০, ২৯ পৃষ্ঠায় শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়ের 'মহামাণ্ডলিক ঈশ্বরঘোষের তাম্রশাসন' প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

(২৪৪)　"মণ্ডলে দ্বাদশরাজকে চ" ইতি বিশ্বপ্রকাশ।

(২৪৫)　"চতুর্যোজনপর্য্যন্তমধিকারং নৃপস্য চ।
যো রাজা তচ্ছতগুণঃ স এব মণ্ডলেশ্বরঃ ॥" (ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ড ৮৬ অঃ।)

মহামাণ্ডলিক ঈশ্বরঘোষের তাম্রশাসনের পাঠোদ্ধারকারী শ্রীযুক্ত মৈত্রেয় মহাশয় লিখিয়াছেন—"খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীতে 'মাৎস্যন্যায়' প্রচলিত হইয়াছিল। তারানাথ লিখিয়া গিয়াছেন যে, সমগ্র দেশের একচ্ছত্র অধিপতি না থাকায়, সকলেই স্ব-স্ব-প্রধান হইয়া, অরাজকতার প্রশ্রয় দিতেছিল। ইহাতে বাহুবলই প্রাধান্যলাভ করিয়াছিল। সবলকবলে দুর্ব্বলদল নিপীড়িত হইতেছিল।…সেই মাৎস্যন্যায় দূর করিবার উদ্দেশ্যে প্রকৃতিপুঞ্জ গোপালদেবকে রাজা নির্ব্বাচিত করিয়াছিল। এইরূপে পালরাজগণের গৌড়ীয় সাম্রাজ্য সংস্থাপিত হইয়াছিল। এই সকল ঐতিহাসিক বিবরণ স্মরণ করিলে মনে হয় যে, যিনি 'মাৎস্যন্যায়ের' বিপ্লবযুগে 'রাঢ়াধিপ' ছিলেন, তিনি বা তাঁহার 'নৃপবংশকেতু' পুত্র, গোপালদেবের নির্ব্বাচন-সময়ে, [দেশের কল্যাণকামনায়] স্বাতন্ত্র্য পরিত্যাগ করিয়া 'মহামাণ্ডলিক' হইয়া 'সামন্ত' শ্রেণীভুক্ত হইয়াছিলেন।"[২৪৬]

কিন্তু আমরা পূর্ব্বেই দেখাইয়াছি যে, মাৎস্যন্যায়ের বিপ্লব দূরীভূত হইবার পর খৃষ্টীয় ৯ম শতাব্দীতে উত্তররাঢ়ে ঘোষবংশের অভ্যুদয়। দেবপাল ও জয়পালের তিরোধানের পর যখন বিশাল সাম্রাজ্য লইয়া গৌড়ের পালনৃপতিগণ ভারাক্রান্ত এবং সেই সঙ্গে নানা বৈদেশিক আক্রমণে ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন, সেই শুভ অবসরে মহামাণ্ডলিক ঈশ্বরঘোষের প্রপিতামহ ধূর্ত্তঘোষ রাঢ় পরিত্যাগ করিয়া সদলবলে আসিয়া উত্তরবঙ্গের প্রান্তসীমায় আধিপত্য বিস্তার করিয়া থাকিবেন। পূর্ব্বেই দেখাইয়াছি যে, আদিশূরের সময়ে নাগবংশীয় কীর্ত্তিনাগ হইতেই কিরাত বা আসামের পার্ব্বত্যপ্রদেশে কায়স্থসামন্তাধিপত্য বা মাণ্ডলিক পদের সৃষ্টি ঘটিয়াছিল। পালবংশের আধিপত্য-বিস্তারের সহিত এই বংশ মধ্যে হীনবল হইয়া পড়িয়াছিলেন, সেই সময়েই ঘোষবংশ গৌড় ও প্রাগ্‌জ্যোতিষের সীমায় শাসনবিস্তার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। ঈশ্বরঘোষের উক্ত তাম্রলেখে স্পষ্ট লিখিত আছে যে, তিনি মার্গসংক্রান্তি উপলক্ষে জটোদায় স্নান করিয়া 'ঢেক্করী' হইতে উক্ত তাম্রশাসন প্রদান করিয়াছেন।[২৪৭] সম্ভবতঃ এই 'ঢেক্করীতেই' ঈশ্বরঘোষের তৎকালীন রাজধানী ছিল। ঢেক্করী নাম পাইয়া কেহ কেহ এই স্থান ও ইছাইঘোষের রাজধানী 'ঢেকুর' অভিন্ন বলিয়া মনে করেন এবং জটোদাস্থানে 'জটোদয়া' পাঠ ধরিয়া উহা গঙ্গার নামান্তর বলিয়া অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন।[২৪৮] আমরাও রামপালের সামন্তরাজগণের প্রসঙ্গে ঢেক্করীয় প্রতাপসিংহের পরিচয় দিয়াছি। ঢেকর বা

(২৪৬) সাহিত্য, ১৩২০ সাল, ৪১ পৃষ্ঠা।

(২৪৭) "স খলু ঢেক্করীতঃ। মহামাণ্ডলিকঃ শ্রীমদীশ্বরঘোষঃ কুশলী। * * ভট্টশ্রীবাসুদেবপুত্রায় ভট্টশ্রীনিবোকশর্ম্মণে ভার্গবসগোত্রায় জমদগ্নি-ঔর্ব্ব-আপ্নুবান্-প্রবরায় আপ্নুবান্-ঔর্ব্ব-জামদগ্ন্যচ্যবন ভা…… যজুর্ব্বেদাধ্যায়িনে মার্গসংক্রান্তৌ জটোদায়াং স্নাত্বা তিলদর্ভপবিত্রপূর্ব্বকং ভগবন্তং শঙ্করভট্টারকমুদ্দিশ্য মাতাপিত্রোরাত্মনশ্চ পুণ্যযশোভিবৃদ্ধয়ে তাম্রশাসনীকৃত্য প্রদত্তোঽস্মাভিঃ।"

(ঈশ্বরঘোষের রামগঞ্জ-তাম্রলেখ—সাহিত্য, ১৩২০, ১৭৩ পৃষ্ঠা।)

(২৪৮) সাহিত্য, ১৩২০, ৩৯ পৃষ্ঠা।

ঢেকুরের রাজা থাকায় তিনি 'ঢেকরীয়' বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন, কিন্তু ঢেকর ও ঢেকরী এক বলিয়া মনে হয় না। ঢেকুর অজয়নদের তীরবর্ত্তী, এ অঞ্চলে জটোদা বলিয়া কোন নদী নাই। তাম্রশাসনোক্ত ঢেকরীর নিকট জটোদানদী প্রবাহিত ছিল।[২৪৯] কালিকাপুরাণে জটোদা-নদীর মাহাত্ম্য বর্ণিত হইয়াছে। এই পুরাণের বর্ণনানুসারে জটোদা কামরূপের অন্তর্গত।[২৫০] এই নদীতে স্নান করিলে যে বহু পুণ্যলাভ হইয়া থাকে, সে কথাও কালিকাপুরাণে লিখিত আছে। সুতরাং জটোদা-প্রবাহিত কামরূপ অঞ্চল হইতেই প্রাচীন ঢেকরীর অবস্থান

(২৪৯) মূল তাম্রলেখমধ্যে 'জটোদা' পাঠই আছে, 'জটোদয়া' পাঠ নাই।

(২৫০) এই জটোদার প্রকৃত অবস্থিতি স্থির করিবার জন্য কালিকাপুরাণ হইতে জটোদামাহাত্ম্যনির্দ্দেশক পূর্ব্ব ও পরবর্ত্তী শ্লোকাবলি উদ্ধৃত হইল—

"কামরূপস্য সকলং পীঠং দেবময়স্তথা।
প্রত্যেকং বর্ণয়ামাস ক্রমতস্ত্রিপুরান্তকঃ॥
প্রথমং করতোয়াখ্যাং মহাগঙ্গাং সদাশিবাম্।
পুণ্যতোয়ময়ীং শুদ্ধাং দক্ষিণাকৈকগামিনীম্॥
হুতস্তু কামরূপস্য বারুণ্যাং ত্রিপুরান্তকঃ।
আত্মনো লিঙ্গমতুলং জল্পীশাখ্যং ব্যবর্ণয়ৎ॥
যত্র নন্দী সমারাধ্য মহাদেবং জগৎপতিম্।
অভিন্নেন শরীরেণ গণেশত্বমবাপ্তবান্॥
নন্দিকুণ্ডং মহাকুণ্ডং যত্র নন্দী পুরাঽকরোৎ।
অভিষেকং শঙ্করস্য পুণ্যতোয়মনুত্তমম্॥
যত্র স্নাত্বা চ পীত্বা চ কৃতকৃত্যো নরোত্তমঃ।
হরস্য সদনং যাতি নন্দিনোঽপি মহাপ্রিয়ঃ॥
যস্তাসস্তৌ মহাদেবীং নাতিদূরে ব্যবস্থিতাম্।
সিদ্ধেশ্বরীং যোনিরূপাং মহামায়াং জগন্ময়ীম্॥
ত্র্যম্বকো বর্ণয়ামাস ভৈরবায় মহাত্মনে।
যত্র নন্দী মহামায়ামাজ্ঞয়া শশিধারিণঃ॥
স্তুতিভিস্তিভিঃ পূজ্যো গাণপত্যমবাপ্তবান্।
সুবর্ণমানসস্তত্র নদমুখ্যো মনোহরঃ॥
নন্দিনোঽনুগ্রহায়াশু মানসাখ্যং সরস্তু তৎ।
আগতকাজ্ঞয়া শম্ভোঃ পূর্ব্বমেব তপস্যতঃ॥
জটোদ্ভবা তত্র নদী হিমবৎপ্রভবা শুভা।
যস্যাং স্নাত্বা নরঃ পুণ্যমাপ্নোতি জাহ্নবীসমম্॥
গৌরীবিবাহসময়ে সর্ব্বৈর্মাতৃগণৈঃ কৃতঃ।
জলাভিষেককর্ম্মস্য জটাজূটে বৃষঃ পুরা॥
তেভ্যোহরজটাবদ্ধাজ্জটোদাখ্যা নদী শুভঃ।
চৈত্রে মাসি সিতাষ্টম্যাং যস্যাং স্নাত্বা নরো ব্রজেৎ॥

নির্ণয় করিতে হইবে। প্রাচীন ডাকার্ণবতন্ত্রে কামরূপ ও ঢেক্করীর উল্লেখ আছে। সৌমার বা উপর-আসামের লোকেরা কামরূপ ও গোয়ালপাড়া জেলার অধিবাসী এবং তাঁহাদের ভাষাকেও 'ঢেক্করী' বা 'ঢেক্‌রী' বলিয়া অভিহিত করিয়া থাকেন। মোগলবাদশাহদিগের সময়ে এবং ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানীর প্রথম আমলেও তাঁহাদের অধিকারভুক্ত আসামপ্রদেশ 'সরকার বাঙ্গালভূম', 'সরকার ঢেক্‌রী', 'সরকার কামরূপ' ও 'সরকার দরঙ্গ',—এই কয় বিভাগে বিভক্ত ছিল। মুসলমান-আমলে বর্ত্তমান রঙ্গপুর জেলা ও দিনাজপুর জেলার পূর্ব্বপ্রান্ত লইয়া 'সরকার বাঙ্গালভূম' এবং তাহার পার্শ্বেই বর্ত্তমান গোয়ালপাড়া জেলা 'সরকার ঢেক্‌রী' বলিয়া পরিচিত হইত। গোয়ালপাড়া জেলার অধীন গৌরীপুররাজের জমিদারী অদ্যাপি 'ঢেক্‌রী' নামে অভিহিত হইতেছে। বর্ত্তমান গোয়ালপাড়া সহরের উত্তরপূর্ব্বে যেখানে মানস ও জয়া (পৌরাণিক জটোদা) মিলিত হইয়াছে, সেই স্থান অদ্যাপি পুণ্য তীর্থ বলিয়া পরিচিত। এ অঞ্চলে বহুতর শৈবকীর্ত্তির নিদর্শন বিদ্যমান। ইহারই নিকটে মহামাণ্ডলিক ঈশ্বরঘোষের শাসনকেন্দ্র ঢেক্করী থাকা সম্ভব। অনুসন্ধান করিলে এই অঞ্চল হইতে সেই প্রাচীন স্থান বাহির হইতে পারে।

ঢেক্করীর অবস্থান

সম্ভবতঃ তাম্রশাসনোক্ত শাসনকেন্দ্র ঢেক্করী হইতেই বর্ত্তমান গোয়ালপাড়া ও কামরূপ জেলা এক সময়ে 'ঢেক্করী' নামে পরিচিত হয়। এখানকার প্রচলিত ভাষাও কালে 'ঢেক্‌রী' বা 'ঢেকুরী' নামে চলিয়া গিয়াছে।(২৫১) আধুনিক আসামবুরুঞ্জীলেখকের মতে – উপর-আসাম হইতে অহোমেরা আসিয়া কামরূপ অধিকার করিবার পর এখানকার ভাষার সহিত তাঁহাদের

পূর্ণায়াশ্চা নরশ্রেষ্ঠ শিবস্থ সদনং প্রতি।
যা নিস্তু তু যা গঙ্গা ত্রিস্রোতাখ্যা সরিদ্বরা॥
হিমবৎপ্রভবা শুদ্ধা চন্দ্রবিম্বাদ্বিনির্গতা।" (কালিকাপুরাণ ৭৩ অঃ)

উক্ত প্রমাণ অনুসারে কামরূপের বায়বে বা উত্তরপশ্চিমাংশে করতোয়া, ত্রিস্রোতা (বর্ত্তমান তিস্তা), স্বর্ণ-মানস (বর্ত্তমান মানস) ও জটোদা এই কয়টি নদীই হইতেছে। ইহার মধ্যে বর্ত্তমান গোয়ালপাড়া জেলার পূর্ব্বসীমায় মানসনদীর সহিত যে জিয়া বা জয়ানদী মিলিত হইয়াছে, তাহাই কালিকাপুরাণোক্ত জটোদা বলিয়া মনে হয়।

(২৫১) "The Assamese spoken in the district of Kamrup and Goalpara, which are the most western on the north side of the Brahmaputra Valley, is not exactly the same as the standard language of Upper and Central Assam, being influenced by the RajLangsi Bengali spoken immediately to the west, in west Goalpara and the Bengal district of Rangpur. This form of Assamese is sometimes called Dhekeri, which is however, considered more or less as a term of opprobrium, having been first used when the portion of Assam now known as the Kamrup and Goalpara districts was conquered by the Ahoms. The Ahom Raja gave the name of Sarkar Dhekeri or Dhekuri to this tract. According to Rai Gunabhiram Barua's Burunji, this name was given to this portion of Assam by the Ahoms to denote that it had been conquered and consequently the people hated the name."

(Sir G. A. Grierson's Linguistic Survey of India, Vol. V. Pt. I. p. 414.)

ভাবার পার্থক্য দেখিয়া পরাজিত অধিবাসীর প্রতি 'ঢেক্‌রী' এই অবজ্ঞাসূচক শব্দ প্রয়োগ করিতেন, তাহা হইতেই 'ঢেক্‌রী' শব্দ অবজ্ঞার চক্ষে আসাম অঞ্চলে চলিয়া আসিতেছে।[২৫২] কিন্তু বুরুঞ্জী-লেখকের ঐ উক্তির কিছুমাত্র মূল্য আছে বলিয়া মনে হয় না। কামরূপে অহোম-আগমনের বহু পূর্ব্ব হইতেই যে 'ঢেকরী' আখ্যা প্রচলিত ছিল, তাহা ঈশ্বরঘোষের তাম্রশাসন হইতেই প্রমাণিত হইয়াছে। পশ্চিমবঙ্গবাসিগণের নিকট যে ভাবে পূর্ব্ববঙ্গের অধিবাসী ও ভাষা 'বাঙ্গাল' নাম পাইয়াছে, পূর্ব্ব-আসামবাসিগণের নিকট পশ্চিম-আসামের অধিবাসী এবং ভাষাও সেই ভাবেই 'ঢেক্‌রী' আখ্যা লাভ করিয়াছে। 'ঢেকরী' বা 'ঢেকুরী' ভাষায় মূল আসামী-প্রভাব অপেক্ষা বঙ্গভাষার প্রভাবই অধিক, ইহার স্বরোচ্চারণ ঠিক বঙ্গভাষারই মত, আদর্শ আসামী ভাষার মত নহে।[২৫৩] সুতরাং বাঙ্গালীর প্রভাবেই 'ঢেকরী' বা 'ঢেকুরী' ভাষার উৎপত্তি ঘটিয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। আমাদের মনে হয় যে, পশ্চিমরাঢ়ের অজয়নদের তীরস্থ 'ঢেকুর' (প্রাচীন নাম 'ঢেকর') হইতেই ধূর্ত্তঘোষ প্রভৃতি আসামে আগমন করেন। যেরূপ নন্দীবংশ সুদূর পশ্চিমাঞ্চল হইতে গৌড়ে আসিয়া করতোয়াকূলে যে স্থানে প্রথম বাস করেন, সেই স্থান নন্দীগ্রাম নামে অভিহিত হয়, সেইরূপ রাঢ়ের 'ঢেকর' অঞ্চলের অধিবাসীর অবস্থানহেতু জটোদানদীতীরবর্ত্তী তাঁহাদের অধিষ্ঠানকেন্দ্র 'ঢেকরী' নামে পরিচিত হইয়াছিল। বলা বাহুল্য, আদিত্যশূরের সময় রাঢ়ের পশ্চিমাংশস্থিত ঢেকুর ঘোষবংশের সামন্ত-রাজ্যভুক্ত ছিল, তৎপরে সেনবংশ কিছুদিনের জন্য এই স্থান অধিকার করেন, পরে ইছাইঘোষ প্রবল হইয়া অল্পদিন এখানে রাজা হইয়াছিলেন। তিনি লাউসেনের হস্তে পরাজিত হইলে আবার এই পশ্চিমরাঢ়াংশ কিছুদিন সেনবংশের শাসনাধীন হইয়াছিল। কিন্তু বেশী দিন তাঁহাদেরও অধিকারে ছিল না। রামপালের সময় এই স্থান সিংহবংশের অধিকারভুক্ত হইয়াছিল, তাহা সন্ধ্যাকরনন্দীর রামচরিত হইতেই অবগত হইতেছি।

ঈশ্বরঘোষ রাঢ়ের প্রসিদ্ধ কায়স্থঘোষরাজবংশসম্ভূত হইলেও ইঁহার প্রকৃত জাতি লইয়া নানা লোকে নানা কল্পনার অবতারণা করিতেছেন। ইঁহার তাম্রশাসন হইতেই এমন আভ্যন্তরীণ

ঈশ্বরঘোষের জাতি ও কাল-নির্ণয়

প্রমাণ বাহির হইয়াছে, যদ্দ্বারা ইঁহাকে আমরা কায়স্থ বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি। পূর্ব্বেই লিখিয়াছি যে, গৌড় বা রাঢ়দেশে পালাধিকারের পূর্ব্বে যখন সর্ব্বত্র কায়স্থ-আধিপত্য বিস্তৃত ছিল, তৎকালে রাজবল্লভ বা রাজ-কুটুম্বগণই রাজ্যের শাসনবিভাগে সর্ব্বেসর্ব্বা ছিলেন। পালাধিকারের প্রথম অবস্থায় গৌড়াধিপ ধর্ম্মপালের রাজ্যকাল পর্য্যন্ত কায়স্থগণ পূর্ব্বাধিকার কতকটা রক্ষা করিতে পারিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই তাঁহারা ক্রমশঃ পূর্ব্বাধিকার হারাইতে থাকেন। ব্রাহ্মণ-

(২৫২) রায় গুণাভিরাম বড়ুয়া রায় আসামবুরুঞ্জী দ্রষ্টব্য।

(২৫৩) "The pronunciation of the vowels appears to approach more nearly to that of Bengali than does standard Assamese."

(Linguistic Survey of India, V. Pt. I. p. 414.)

প্রভাব-বিস্তারের সহিত বরেন্দ্র হইতে কায়স্থশক্তি হীন হইয়া পড়িলেও রাঢ়দেশে কায়স্থপ্রভাব অক্ষুণ্ণই ছিল। রাঢ়ীয় কায়স্থ-ঘোষবংশ ঢেক্করী বা পূর্ব্ব আসামে আধিপত্যলাভ করিলে তাঁহারা এখানে রাজকীয় শ্রেষ্ঠপদসমূহে কায়স্থগণকেই নিযুক্ত করিয়াছিলেন এবং বঙ্গীয় রাজনীতিরই অনুসরণ করিতে থাকেন। তাই ঈশ্বরঘোষের উক্ত তাম্রশাসনে মহাসান্ধিবিগ্রহিক, মহাকরণাধ্যক্ষ, মহামুদ্রাধিকৃত, মহাক্ষপটলিক, মহাকায়স্থ, মহাঠক্কুর প্রভৃতি রাজপুরুষগণের উল্লেখ পাই। বলা বাহুল্য, তৎকালে ঐ সকল পদে অধিকাংশস্থলেই কায়স্থগণ নিযুক্ত হইতেন, এমন কি, বহু পরবর্ত্তী কালেও আসাম অঞ্চলে কায়স্থগণই উক্ত রাজপুরুষের পদসমূহে অধিষ্ঠিত হইতেন। আসামের প্রাচীন বুরুঞ্জী এবং তত্রত্য সম্ভ্রান্ত ভৌমিক কায়স্থগণের প্রাচীন কুলপরিচয় হইতেও ইহার প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। অল্পদিন পূর্ব্বেও এই রাঢ়দেশের কায়স্থসমাজে সম্ভ্রান্ত ঘরে কোন জাতীয়-সভা আহূত হইলে এবং তথায় ব্রাহ্মণ-কায়স্থ উভয় জাতি উপস্থিত থাকিলে কায়স্থদিগের মধ্যে 'কায়স্থবিপ্রচরণে' ইত্যাদি সম্মানজনক পাঠ উচ্চারণ করিবার পদ্ধতি ছিল। মহামাণ্ডলিক ঈশ্বরঘোষের তাম্রশাসনেও সেই কারণেই বোধ হয় 'সকরণব্রাহ্মণ-মাননাপূর্ব্বকং' পাঠ গৃহীত হইয়াছে।[২৫৪] ইহাতে ঈশ্বরঘোষের করণত্ব বা কায়স্থত্বই সূচিত হইতেছে। কেবল সুদূর কামরূপ বলিয়া নহে, কলিঙ্গ ও দক্ষিণকোশলেও তৎকালে রাঢ়ীয় কায়স্থঘোষবংশ তত্রত্য রাজকীয় উচ্চপদে নিযুক্ত ছিলেন, পূর্ব্বে তাহার উল্লেখ করিয়াছি।

এ ছাড়া ফরিদপুর জেলা হইতে আবিষ্কৃত ধর্ম্মাদিত্যদেব, গোপচন্দ্রদেব ও সমাচারদেবের তাম্রশাসনের উপর পরিচিহ্নিত রাজমুদ্রায় যেরূপ 'পরাক্রমমূলস্য' উৎকীর্ণ আছে,[২৫৫] আশ্চর্য্যের বিষয়, ঈশ্বরঘোষের তাম্রশাসনের রাজমুদ্রোপরিও সেইরূপ 'পরাক্রমমূলস্য' খোদিত রহিয়াছে। এমন কি খৃষ্টীয় ৬ষ্ঠ শতাব্দীতে উৎকীর্ণ উক্ত বঙ্গাধিপগণের তাম্রশাসন হইতে যেরূপ মহাপ্রতিহারোপরিক, মূলক্রিয়ামাত্য, জ্যেষ্ঠকায়স্থ, জ্যেষ্ঠাধিকরণিক ও পরবর্ত্তী বঙ্গীয় শাসনলিপিসমূহে যেরূপ শ্রীকরণিক বা করণিকঠক্কুর প্রভৃতি রাজপুরুষগণের উল্লেখ পাইয়াছি,[২৫৬] (উক্ত তাম্রলেখত্রয়ের প্রায় পঞ্চশতাব্দীপরে উৎকীর্ণ) মহামাণ্ডলিক ঈশ্বর-ঘোষের তাম্রশাসনেও সেই সকল রাজপুরুষই যথাক্রমে মহাপ্রতীহার, কুমারামাত্য, মহাকায়স্থ, মহাকরণাধ্যক্ষ বা মহাবলাধিকরণিক ও মহাঠক্কুর ইত্যাদি আখ্যালাভ করিয়াছেন। ফরিদপুর জেলার উক্ত সুপ্রাচীন তাম্রশাসনমধ্যেও আমরা 'ঘোষ' উপাধিধারী কায়স্থরাজপুরুষগণের সন্ধান পাইয়াছি। তাঁহাদের মধ্যেও যে কেহ কেহ উপযুক্ত সহায়শক্তি লাভ করিয়া পরবর্ত্তী কালে রাঢ়দেশে আধিপত্য বিস্তার করিয়া থাকিবেন, তাহাও অসম্ভব নহে।

(২৫৪) শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহাশয় লিখিয়াছেন, "ধর্ম্মপালের [খালিমপুরে আবিষ্কৃত] তাম্রশাসনে 'ব্রাহ্মণমাননাপূর্ব্বক' আছে, পরবর্ত্তী পালনরপালগণের শাসনে তাহা নাই। 'সকরণব্রাহ্মণমাননাপূর্ব্বকং' পাঠ যুক্তিযুক্ত হইলে ঈশ্বরঘোষ জাতিতে 'করণ' ছিলেন বলিয়াই প্রতিভাত হয়।" (সাহিত্য, ১৩২০ সাল, ১৭৫ পৃষ্ঠা।)

(২৫৫) ৫৭ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

(২৫৬) ১৭৮ পৃষ্ঠার বিস্তৃত বিবরণ দ্রষ্টব্য।

ঈশ্বরঘোষ কোন্ সময়ে ঢেক্করী বা কামরূপ অঞ্চলে আধিপত্য করিয়াছিলেন, তাহার ঠিক সন-তারিখ এখনও বাহির হয় নাই। তাঁহার তাম্রশাসনের লিপিবিন্যাস হইতে অনেকে তাঁহাকে খৃষ্টীয় ১০ম বা ১১শ শতাব্দীর লোক বলিয়া অবধারণ করিয়াছেন। পূর্ব্বেই লিখিয়াছি যে, কাঞ্চীপতি রাজেন্দ্রচোলের রাঢ়বিজয়ের অত্যল্পকাল পরে প্রায় ১০৩০ খৃষ্টাব্দে গৌড়াধিপ ১ম মহীপালের সময় লাউসেনের অভ্যুদয়। ঈশ্বরঘোষের তাম্রলেখের লিপিকাল ও লাউসেনের অভ্যুদয়কাল প্রায় একই সময়ে গিয়া পড়ে। ধর্ম্মমঙ্গলসমূহে লিখিত আছে যে, লাউসেন কামরূপপতি কর্পূরধবলকে পরাজয় করেন। এই কর্পূরধবল ও ঢেক্করীপতি ঈশ্বরঘোষের পিতা ধবলঘোষ অভিন্ন বলিয়াই বোধ হয়। এরূপস্থলে মনে হয়, যে সময় চন্দেল্ল ও কাম্বোজবংশ পালাধিকার গ্রাস করিতেছিলেন[২৫৭], সেই সুযোগে রাঢ়-রাজকুমার ধূর্ত্তঘোষ বাহুবলে কামরূপ অধিকার করিয়া স্বাধীন নৃপতি হইয়া বসেন। এখানে এই বংশ তিন পুরুষ স্বাধীনভাবেই প্রবল প্রতাপে রাজ্য চালাইয়াছিলেন। অবশেষে ১ম মহীপালের অভ্যুদয়ে তৎকর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া লাউসেন কামরূপপতি ধবলঘোষ বা কর্পূরধবলকে পরাজয় করিয়া গৌড়েশ্বরের অধীন করেন। তৎপরে ধবলঘোষ বা তৎপুত্র ঈশ্বরঘোষ পরমভট্টারক মহারাজাধিরাজ ১ম মহীপালের আনুগত্য স্বীকার করিয়া মহামাণ্ডলিক হইয়াছিলেন। বারেন্দ্রবীজী কীর্ত্তিনাগ সর্ব্বপ্রথম আসামের পার্ব্বত্যপ্রদেশে মহাসামন্তপদে বরিত হইলেও রাঢ়রাজকুমার ধূর্ত্তঘোষের সময় হইতেই প্রকৃতপ্রস্তাবে আসাম-প্রদেশে রাঢ়ীয়-কায়স্থগণ প্রতিপত্তি বিস্তার করিতে থাকেন, এমন কি প্রাগ্জ্যোতিষের পূর্ব্বতন ভগদত্তবংশও ক্রমে ক্রমে কায়স্থবংশের হস্তে রাজ্য হারাইতে বাধ্য হইয়াছিলেন। ঈশ্বরঘোষের উক্ত তাম্রশাসন হইতে জানিতে পারি যে (খৃষ্টীয় ১১শ শতাব্দীতে) বর্ত্তমান আসামপ্রদেশের পূর্ব্বপ্রান্ত সোদিয়া পর্য্যন্ত তাঁহার শাসনাধীন হইয়াছিল। তিনি এই সোদিয়া গ্রামই নিব্বোকশর্ম্মাকে দান করিয়াছিলেন।[২৫৮] যাহা হউক, খৃষ্টীয় ১১শ শতাব্দী হইতে কুচবিহার-রাজ্যে বিশ্বসিংহের অভ্যুদয়কাল পর্য্যন্ত সমগ্র আসামপ্রদেশে কায়স্থশাসন অব্যাহত ছিল, এমন কি, সুলতান হোসেন শাহ যখন আসামের কামতারাজ্য ধ্বংস করিতে গমন করেন, সে সময়েও এখানকার কায়স্থ ভৌমিকগণ অস্ত্রধারণ করিয়াছিলেন। এখনও আসামের নানাস্থানে গৌড়রাঢ়াগত কায়স্থভূঁয়াগণের বংশধরগণ বিদ্যমান এবং তাঁহারাই এখানকার কায়স্থসমাজে সর্ব্বপ্রধান মর্য্যাদালাভ করিয়া আসিতেছেন। তাঁহাদের করণীয় ঘর ব্যতীত স্থানীয় অন্য শ্রেণীর কায়স্থকে তাঁহারা কায়স্থ বলিয়াই স্বীকার করেন না।[২৫৯]

(২৫৭) ১৬৯ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।
(২৫৮) তাঁহার তাম্রশাসনে এইরূপ লিখিত আছে—
"পিপ্পোর-মণ্ডলান্তঃপাতি পারিটিপ্যকবিষয়সম্ভোগবিষ্কা সোদিবাগ্রামে"—(সাহিত্য, ১৩২০ সাল, ১৭৮ পৃষ্ঠা)
সোদিবা একণে সোদিয়া এবং পারিটিষক এখন পানিহিপা নামে সোদিয়ারই কিছুদূরে প্রাচীন স্মৃতিরক্ষা করিতেছে।
(২৫৯) আসামের কায়স্থসমাজের ইতিহাসে এ সম্বন্ধে বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করিবার ইচ্ছা আছে।

পালাধিকারে কায়স্থগণের প্রভাব-বিস্তারের সহিত তাঁহাদের মধ্যে বহুসংখ্যক ধর্ম্মাচার্য্য ও ধর্ম্মগ্রন্থ রচয়িতার আবির্ভাব হইয়াছিল। দাসবংশপরিচয়ে ধর্ম্মপালের লেখ্য প্রধান টঙ্কদাসের উল্লেখ করিয়াছি। তিনি বৃদ্ধবয়সে ভিক্ষুধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া 'মহাসিদ্ধাচার্য্য' উপাধিলাভ এবং এই সময় তিনি সংস্কৃতভাষায় কতকগুলি প্রাচীন তন্ত্রের টীকা ও তান্ত্রিকগ্রন্থ রচনা করেন। তিব্বতের টেঙ্গুরগ্রন্থে যে সকল তান্ত্রিকগ্রন্থের অনুবাদ আছে, তন্মধ্যে 'মহাসিদ্ধাচার্য্য বৃদ্ধকায়স্থ টঙ্কদাস'-রচিত 'সুবিদসম্পুট' নামে শ্রীহেবজ্র-তন্ত্ররাজের টীকা দৃষ্ট হয়।[২৬০] এ ছাড়া উক্ত তিব্বতীয় শাস্ত্ররত্নাকরমধ্যে আমরা বহুসংখ্যক কায়স্থ-ধর্ম্মাচার্য্য ও বৌদ্ধতান্ত্রিকগ্রন্থরচয়িতা কায়স্থপণ্ডিতের সন্ধান পাইয়াছি, তন্মধ্যে মহামহোপাধ্যায় উপাধিধারী কায়স্থ গয়াধর, মহাচার্য্য তথাগতরক্ষিত, শাব্দিক-ভদন্ত সূর্য্যধ্বজ শ্রীভদ্র, বিনয়শ্রীমিত্র, মহামণ্ডলাচার্য্য শ্রীরাহুলঘোষ, কায়স্থ বিদ্যাকরসিংহ, পণ্ডিত পুণ্যশ্রীমিত্র, পণ্ডিত দানশীল, গগনঘোষ ও তৎপুত্র, মহাশাব্দিক সূর্য্যধ্বজ জেতকর্ণ, দিবাকরচন্দ্র, বিভূতিচন্দ্র, মহাযোগাচার্য্য জগৎমিত্র, উমাপতি দত্ত প্রভৃতির নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ইঁহাদের মধ্যে কায়স্থ গয়াধর প্রায় ৫০খানি তান্ত্রিকগ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। গয়াধরের শ্রীহেবজ্রবলিক্রম নামক গ্রন্থে তিনি 'সিদ্ধকায়স্থ', নৈরাত্মযোগিনীসাধন নামক গ্রন্থে 'উপাধ্যায়', তদীয় বজ্রডাক-তন্ত্রের তত্ত্বসুস্থিরা নাম্নী পঞ্জিকায় ও বজ্রডাকবিবৃত্তিনিবন্ধে 'কায়স্থোপাধ্যায়', তৎকৃত ভগবচ্ছ্রী-চক্রশম্বর-মণ্ডলবিধির শোধনগ্রন্থে 'মহাপণ্ডিত' এবং চতুঃপীঠতন্ত্ররাজের মণ্ডলোপায়িকা-বিধি-সারসমুচ্চয় নামক টীকায় 'মহামহোপাধ্যায়' উপাধিতে ভূষিত হইয়াছেন।[২৬১] এইরূপ সূর্য্যধ্বজ শ্রীভদ্র, রাহুলঘোষ ও বিদ্যাকরসিংহও বহু তান্ত্রিকগ্রন্থ ও তন্ত্রের টীকা লিখিয়া গিয়াছেন। গৌড়েশ্বর রামপাল জাগদ্দলমহাবিহার প্রতিষ্ঠা করিলে এখানে বহু প্রসিদ্ধ বৌদ্ধাচার্য্য আসিয়া বাস করেন এবং তাঁহারা বহু তান্ত্রিকগ্রন্থ রচনা করিয়া যশস্বী হইয়াছিলেন, তন্মধ্যে কায়স্থাচার্য্যের অভাব ছিল না। তাঁহাদের রচিত গ্রন্থসমূহের অনুবাদ তিব্বতের টেঙ্গুরগ্রন্থে আজও রক্ষিত আছে। এই সকল কায়স্থাচার্য্যের মধ্যে কেহ কেহ চিকিৎসাকার্য্য করিয়া বৈদ্য বলিয়াও পরিচিত হইয়াছিলেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ এখানে কায়স্থ তথাগতরক্ষিতের নাম করিতে পারি। কায়স্থ-প্রবর তথাগতরক্ষিত তদ্রচিত শ্রীহেরুকাভ্যুদয়-মহাযোগিনী-তন্ত্ররাজ-কতিপয়াক্ষর-পঞ্জিকা নাম্নী গ্রন্থে 'উপাধ্যায়' উপাধিতে ভূষিত ও বৈদ্যবংশোদ্ভব বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।[২৬২]

পূর্ব্বেই লিখিয়াছি, পালনৃপতিগণ প্রতীচ্যরাজগণের তাম্রশাসন ও শিলালিপিতে 'বঙ্গপতি' বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন। এই বঙ্গপতিগণের যত্নে বঙ্গসাহিত্যেরও প্রথম পুষ্টি সাধিত

কায়স্থধর্ম্মাচার্য্য

(২৬০) মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় এই গ্রন্থকারের পরিচয় দেখাইয়া দিয়া আমাকে কৃতজ্ঞতা-পাশে আবদ্ধ করিয়াছেন। Vide Cordier's Catalogue du fonds Tibetan de la Bibliotheque Nationale, p. 67.

(২৬১) Cordier, p. 99.

(২৬২) Cordier, p. 32.

হইয়াছিল। তৎকালে যেমন সংস্কৃতভাষায় তান্ত্রিকগ্রন্থসমূহ রচিত হইতেছিল, সেইরূপ বঙ্গভাষাতেও বহুতর তন্ত্রতত্ত্ব ও সাধনভজনমূলক গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল।[২৬৩] এই মাতৃভাষার পুষ্টিকল্পে যে বহু কায়স্থাচার্য্যেরও হাত ছিল, তাহা বলাই বাহুল্য।

পূর্ব্বোক্ত বংশবিবরণ, বৈদ্যদেবের তাম্রলেখ ও কায়স্থধর্ম্মাচার্য্যগণের সংক্ষিপ্ত পরিচয় হইতে পালাধিকারে কায়স্থ-প্রভাবের যথেষ্ট নিদর্শন পাইতেছি। এমন কি, পালনৃপতিগণ কোন কোন সম্ভ্রান্ত কায়স্থবংশের সহিত আদান-প্রদান করিতেও কুণ্ঠিত হন নাই। রামচরিত-বর্ণিত

পালবংশের কায়স্থত্ব

রামপালস্থাপিত 'কনকময়লেখাধিকরণ'ও তৎকালীন কায়স্থ-প্রভাবের একটী অন্যতম নিদর্শন। পালবংশের জাতিনির্ণয়প্রসঙ্গে প্রথমেই লিখিয়াছি যে, বৈদ্যদেবের তাম্রশাসনে এই বংশ 'সূর্য্য-বংশীয়' বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন। সূর্য্যবংশীয় নিগমকুলের সন্ধান প্রাচীন শিলালিপিতে বাহির হইয়াছে।[২৬৪] পূর্ব্বকাল হইতেই নিগমেরা 'নৈগমান্বয়কায়স্থ' বলিয়া পরিচিত।[২৬৫] এখনও উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে কায়স্থজাতিমধ্যে নিগমশাখা রহিয়াছে। সম্ভবতঃ পালরাজবংশ এইরূপ সূর্য্যবংশোদ্ভব নৈগমান্বয়-কায়স্থ ছিলেন, তাই আবুলফজল তাঁহার সুবিখ্যাত আইন-ই-অকবরীগ্রন্থে 'পালরাজগণকে' কায়স্থ বলিয়াই স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। তাই আমরা লখ্নৌ যাদুঘরে রক্ষিত ১১৬৭ বিক্রম সংবতে (১১১১ খৃষ্টাব্দে) উৎকীর্ণ মহাসমুদ্রপতি কীর্ত্তিপালের তাম্রশাসনে 'পাল' উপাধিধারী কায়স্থ-রাজাদিগের সন্ধান পাইতেছি। সেনবংশ গৌড় অধিকার করিয়া বসিলে পালরাজ মগধে পলায়ন করেন, সে কথা পূর্ব্বেই লিখিয়াছি। এই সময়ে তাঁহাদের আত্মীয়স্বজন কেহ কেহ সেনবংশের আনুগত্য স্বীকার করিয়া পূর্ব্ববঙ্গের নানাস্থানে ছড়াইয়া পড়েন। আবার কেহ কেহ অদৃষ্ট পরীক্ষার জন্য দলবল সহ উত্তরভারতে অগ্রসর হইয়াছিলেন; তন্মধ্যে ভুবনপালের পুত্র ও উক্ত কীর্ত্তিপালের পিতা বিক্রমপাল অন্যতম। উক্ত তাম্রশাসনে লিখিত আছে যে, "তীব্রকর সূর্য্যবংশে সমুদ্ভব ভুবনপালের পুত্র বিক্রমপাল নিজ ভুজবলে জয় করিয়া সৌম্য-সিন্ধুরাজাধিপত্য অর্জ্জন করিয়াছিলেন। তাঁহারই সৎপুত্র কীর্ত্তিপাল সূর্য্য হইতে সমুৎপন্ন মনুর ন্যায় ধর্ম্মী এবং রূপেও যিনি মন্মথকে পরাজয় করিয়াছেন, তিনি শ্রীবাস্তব্য বিষয়ে ডবিরামকুল গ্রামের গৌতমগোত্রীয় প্রহসিতশর্ম্মাকে ফাল্গুনমাসে দ্বিতীয়া তিথি বৃহস্পতিসংক্রান্তি রবিবারে ১১৬৭ সংবৎসরে দরদগণ্ডকীদেশে বিক্রমগ্রাম দান করিতেছেন।"[২৬৬] যে সকল

(২৬৩) মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদশাস্ত্রী মহাশয় এইরূপ কতকগুলি গ্রন্থ সংস্কৃত টীকাসহ নেপাল হইতে সংগ্রহ করিয়াছেন, এবং সেই সকল গ্রন্থ-প্রকাশে মনোযোগী হইয়াছেন।

(২৬৪) Cunningham's Archæological Survey Reports, Vol. IV. p 435.

(২৬৫) Sir R. G. Bhándárkar's Report of Sanskrit Mss. Bombay, 1880 81.

(২৬৬) "আসীৎ সমস্তভুবনপ্রতিপালনদক্ষঃ
শক্রোপমো ভুবনপালনৃপঃ প্রসিদ্ধঃ।

পাত্রকে জানাইয়া কীর্ত্তিপাল এই তাম্রশাসন দান করেন, তন্মধ্যে তাঁহার গুরুপুরোহিত, ধর্ম্মাধিকরণিক প্রভৃতি ব্রাহ্মণপণ্ডিত ব্যতীত 'ঠক্কুর শ্রীদেবপাল', 'করণকায়স্থ শ্রীকর্ণপাল', 'মহোখাসনিক শ্রীমহীপাল', ও 'মহাসাধনিক শ্রীহরিপাল', পাল-উপাধিধারী এই চারিজন পাত্রের উল্লেখ আছে।[২৬৭] বলা বাহুল্য যে, ব্রাহ্মণ ব্যতীত রাজবংশীয় বা রাজসম্বন্ধিগণই মুসলমান-শাসনের পূর্ব্বে 'ঠক্কুর' উপাধি পাইতেন। গৌড়বঙ্গের প্রাচীন তাম্রশাসনাদিতে এই উপাধি 'মহাঠক্কুর' বা 'কায়স্থ-ঠক্কুর' নামেও পরিচিত হইয়াছে। ফরিদপুর জেলা হইতে খৃষ্টীয় ৬ষ্ঠ শতাব্দীতে উৎকীর্ণ তাম্রশাসনে ও ধর্ম্মপালের তাম্রশাসনে 'জ্যেষ্ঠ-কায়স্থ' এবং ঈশ্বরঘোষের তাম্রশাসনে 'মহাকায়স্থ' নামে যে অমাত্য পরিচিত, কীর্ত্তিপালের উক্ত তাম্রশাসনে তিনিই 'করণকায়স্থ' নামে পরিচিত হইয়াছেন। কীর্ত্তিপালের পরিচয় ও ব্রাহ্মণেতর অপর সকল পাত্রের পাল-উপাধি দেখিয়া মনে হয় যে, সুবর্ণকার ব্যতীত ব্রাহ্মণেতর পাল-উপাধিধারী সকলেই রাজার স্বজাতি বা আত্মীয় কুটুম্ব ছিলেন। তাঁহারা সূর্য্যবংশীয় হইলেও সম্ভবতঃ নৈগম-কায়স্থ বলিয়া পরিচিত হইতেছিলেন। কীর্ত্তিপালের ন্যায় গৌড়ের পাল-রাজবংশ সূর্য্যবংশোদ্ভব বলিয়া পরিচিত হইলেও তাঁহারা 'সমুদ্রবংশ', 'সমুদ্রগোত্র', 'সিন্ধুকুলজ' বলিয়াও অভিহিত হইয়াছেন, পালবংশের জাতিনির্ণয়-প্রসঙ্গে প্রথমেই সে কথা লিখিয়াছি। কীর্ত্তিপালের তাম্রশাসনেও তিনি এবং তৎপিতা 'সৌম্যসিন্ধুরাজ' বা 'উত্তরসমুদ্রপতি' বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছেন। এরূপ স্থলে মনে হয় যে, রাজা কীর্ত্তিপাল পূর্ব্বতন সমুদ্রবংশকে

যস্তীব্রভানুসমবাপ্তশরীরযষ্টিঃ
সাগরিবংশবহুধেশ্বরশেখরশ্রীঃ ॥
তস্যাত্মজো নিজভুজার্জ্জিতসৌম্যসিন্ধু-
রাজাধিপত্য ইহ বিক্রমপালনামা।
যদ্বিক্রমেণ পরিপালিতভূমিচক্র-
মর্কার্কবোধিতমিব প্রতিবুদ্ধমাসীৎ ॥
তস্মাদজনি সৎপুত্রঃ কীর্ত্তিঃ পালঃ প্রতাপবান্।
সূর্য্যাদিব মনুর্ধন্বী মূর্ত্তিঃ শ্রীজিতমন্মথঃ ॥... ...

"শ্রীবাস্তব্যবিষয়ে ভবিরামকুলগ্রামে ভট্টগ্রামোৎপন্নায় গৌতমগোত্রায়...ঠক্কুরশ্রীপ্রহসিতশর্ম্মণে ব্রাহ্মণায়... ফাল্গুনে মাসে শুক্লপক্ষ দ্বিতীয়ায়াং বৃহস্পতিসংক্রান্তৌ সৌরিদিনে সপ্তষষ্ট্যধিকে একাদশসংবৎসরে শ্রীদরদণ্ডকী-দেশে সবোরদিগ্বপ্রতিবদ্ধঃ ভবউলিগ্রাম বোবিসাপ্রতিবদ্ধগ্রাম শ্রীমৎকীর্ত্তিপালদেবো দত্তৌ।"

(কীর্ত্তিপালের তাম্রশাসন—Epigraphia Indica, Vol VII. p. 66.)

(২৬৭) "মহাপুরোহিতঠক্কুর শ্রীবাসুদেবঃ। মহাপুরোহিত শ্রীধরঃ। ধর্ম্মাধিকরণিক শ্রীমাণ্ডিবরঃ। দৈবা-গারিক শ্রীকেশবপট্টমা। শংখধারি শ্রীবামহরিঃ। পণ্ডিত শ্রীবাহ্লুকঃ। উপাধ্যায় শ্রীরিশিকেশঃ। উপাধ্যায় শ্রীআলুকঃ। উপাধ্যায় শ্রীসিহড়ঃ। পণ্ডিত শ্রীসাংখাকঃ। দৈবজ্ঞ শ্রীরতিকরঃ। ঠক্কুর শ্রীদেবপালঃ। মহাক্ষপটলিক শ্রীমহিচন্দ্রঃ। আভিবর্গিক শ্রীজাগুকঃ। করণকায়স্থ শ্রীকর্ণপালঃ। মহোথাসনিক শ্রীমহীপালঃ। মহাসাধনিক শ্রীহরিপালঃ। সর্ব্বপাত্রপরিজ্ঞানাদস্তং তাম্রস্ত পট্টকম্।" (কীর্ত্তিপালের উক্ত তাম্রশাসন)

দক্ষিণসমুদ্র-ধারা স্থির করিয়া আপনাদিগকে উত্তর-ধারা ধরিয়া 'উত্তরসমুদ্রপতি' বলিয়া পরিচিত করিয়াছেন। দরদগণ্ডকী বা বর্ত্তমান বড় গণ্ডকনদের উত্তরাংশ লইয়াই বিক্রম-পাল অভিনব উত্তরসমুদ্ররাজ্য প্রতিষ্ঠা করিয়া থাকিবেন। প্রকৃত প্রস্তাবে বিক্রমপাল ও কীর্ত্তিপাল বর্ত্তমান গোরখপুর জেলায় সামান্য ভূখণ্ডের অধিপতি হইলেও গৌড়ের পূর্ব্বতম পালরাজবংশের পরাক্রম ও আধিপত্যনির্দ্দেশক 'পরমেশ্বর পরমভট্টারক মহারাজাধিরাজ' উপাধি ব্যবহার করিয়াছেন। নারায়ণপালের ভাগলপুর-তাম্রলিপি, সন্ধ্যাকরের রামচরিত ও মদনপালের মনহলি-তাম্রলেখ হইতে বেশ বুঝা যায় যে, পরবর্ত্তী পালবংশ সৌগত বলিয়া পরিচিত হইলেও পাশুপত শিব বা বিষ্ণুর উপাসক এবং ব্রাহ্মণভক্ত হইয়া পড়িয়া ছিলেন। তাহাদের অধস্তন যে শাখা উত্তরে দরদগণ্ডকীদেশে আসিয়াছিলেন, তাঁহারাও ব্রাহ্মণভক্ত ও পরম-মাহেশ্বর বলিয়া অভিহিত হইয়াছিলেন। পূর্ব্ব হইতেই গোরখপুর অঞ্চলে বাস্তব্য বা শ্রীবাস্তব কায়স্থের বাস ছিল,[২৬৮] সেই স্থানই কীর্ত্তিপালের তাম্রশাসনে শ্রীবাস্তব্যবিষয় বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকিবে। পূর্ব্বতন পালরাজসভায় যেরূপ অমাত্যের মধ্যে দৈবজ্ঞ বা জ্যোতির্ব্বিদধ্যক্ষের উল্লেখ পাইয়াছি, কীর্ত্তিপালের তাম্রশাসনেও সেইরূপ দেবাগারিক শ্রীকেশব ও দৈবজ্ঞ শ্রীরতিকরের নাম পাইতেছি। ইত্যাদি কারণে উত্তরসমুদ্রপতি পালবংশকে গৌড়ের পালরাজবংশেরই উত্তর শাখা বলিয়া মনে করিতেছি।

(২৬৮) Indian Antiquary, Vol. XVII, p. 62 and Colebrooke's Miscellaneous Essays, Vol. II, p. 247.

সপ্তম অধ্যায়

চন্দ্রবংশ ও বর্ম্মবংশ

অল্পদিন হইল, বঙ্গাধিপ শ্রীচন্দ্রদেব ও ভোজবর্ম্মদেবের তাম্রলিপি প্রকাশিত হইয়াছে, তদ্দ্বারা আমরা নিঃসন্দেহে জানিতে পারিয়াছি, যে সময়ে গৌড়মগধে পালবংশ সাম্রাজ্যভোগ করিতেছিলেন, তৎকালে পূর্ব্ববঙ্গে চন্দ্র ও বর্ম্মবংশের খ্যাতি ও প্রতিষ্ঠা ঘটিয়াছিল।

এই দুই বংশের মধ্যে চন্দ্রবংশ অতি প্রাচীন। ভারতীয় বৌদ্ধধর্ম্মের ইতিহাসলেখক তিব্বতীয় পণ্ডিত তারনাথ লিখিয়াছেন যে, প্রাচ্যভারতে চন্দ্র, পাল ও সেনবংশের অভ্যুদয় হইয়াছিল, এই বংশত্রয়ের মধ্যে একটির পর অপরটি যথাক্রমে রাজত্ব করিয়া গিয়াছেন। এই বিবরণী অনুসারে বলিতে হয় যে, পাল ও সেনবংশের অভ্যুদয়ের পূর্ব্বেই চন্দ্রবংশের অভ্যুদয়। তিব্বতীয় তারনাথ পর পর ১৯ জন চন্দ্র-নৃপতির উল্লেখ করিয়াছেন। যথা—

চন্দ্ররাজগণের নাম

১	হরিচন্দ্র	৮	শ্রীচন্দ্র	১৫	সিংহচন্দ্র
২	অক্ষয়চন্দ্র	৯	ধর্ম্মচন্দ্র	১৬	বলচন্দ্র
৩	জয়চন্দ্র	১০	কনকচন্দ্র	১৭	বিমলচন্দ্র
৪	নেমচন্দ্র	১১	কর্ম্মচন্দ্র	১৮	গোবিচন্দ্র
৫	পণিচন্দ্র	১২	বৃক্ষচন্দ্র	১৯	ললিতচন্দ্র
৬	ভীমচন্দ্র	১৩	কামচন্দ্র		
৭	সলচন্দ্র	১৪	বিগম (বিক্রম)চন্দ্র		

তারনাথের মতে, 'চন্দ্রবংশীয় প্রথম সাতজনই 'সপ্তচন্দ্র' বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিলেন এবং পূর্ব্বদেশে এই সাতজনই বৌদ্ধধর্ম্মের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। নেমচন্দ্র রাজা হইবার অল্পকাল পরেই পুষ্যমিত্র বা পুষ্যগুপ্ত নামে তাঁহার এক মন্ত্রী কিছুদিনের জন্য রাজা অধিকার করিয়া বসেন। পাঁচ বর্ষ রাজ্য করিয়া পুষ্য উত্তরদেশে কালগ্রাসে পতিত হন। এই সময়ে কিছুদিন ম্লেচ্ছমত চলিয়াছিল। শূলিকদেশাগত মাঠর নামে এক বৌদ্ধভিক্ষু ঐ মত প্রচার করেন। পুষ্যের মৃত্যু হইলে পণিচন্দ্র পৈতৃকরাজ্য প্রাপ্ত হইলেন। সলচন্দ্রের সময়ে চন্দ্রগুপ্তের অভ্যুদয়। এই সময় চাণক্য নামে এক সামন্তাধিপতি বহু জনপদ অধিকার করিয়া বসেন। শ্রীচন্দ্র ও তৎপুত্র ধর্ম্মচন্দ্র কেবলমাত্র পূর্ব্ববঙ্গে আধিপত্য করিয়া গিয়াছেন। ধর্ম্মচন্দ্রের সভায় স্থবির বসুবন্ধু বিদ্যমান ছিলেন। ধর্ম্মচন্দ্রের পর তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র কনকচন্দ্র রাজা হন, তাঁহার সম্পর্কীয় এক বড় ভাই তৎকালে বারাণসী শাসন করিতেছিলেন। কর্ম্মচন্দ্রের পুত্র বৃক্ষ (বা মহীরুহ)

চন্দ্রের সময় উড়িষ্যার অধিপতি জালেরুহ সমস্ত পূর্ব্বদেশ অধিকার করেন। রামচন্দ্র উৎকল-পতি নাগরাজের অধীনতা স্বীকার করিয়াছিলেন। বলচন্দ্র সিংহ নামক এক নৃপতির হস্তে বঙ্গরাজ্য হারাইয়া ত্রিহুতে গিয়া আশ্রয় লয়েন এবং তথায় কিছুদিন সামন্তভাবে ভূমিভোগ করেন। বিমলচন্দ্র অমরসিংহের আশ্রয়দাতা ও একজন মহাবীর ছিলেন। তিনি পৈতৃক বঙ্গ-রাজ্য উদ্ধার করেন, কামরূপ পর্য্যন্ত তাঁহার আধিপত্য বিস্তৃত হয়। তিনি রাজা ভর্ত্তৃহরির ভগিনীকে বিবাহ করেন, তাঁহারই গর্ভে গোবিচন্দ্রের জন্ম। গোবিচন্দ্রের পুত্র ললিতচন্দ্রের সহিত চন্দ্ররাজবংশের অবসান হয়। কিছুদিন অরাজকতা চলিতে থাকে। রাজবংশীয়দিগের মধ্যে যাঁহাকেই নির্ব্বাচন করা হয়, তিনিই চন্দ্রবংশের এক রাণীর কৌশলে রাত্রিকালে নিহত হইতে লাগিলেন, অবশেষে রাণীর করালকবল হইতে নিষ্কৃতিলাভ করিয়া গোপাল প্রজা-সাধারণকর্ত্তৃক নৃপতিপদে অধিষ্ঠিত হইলেন।"[1]

তারনাথের বিবরণী হইতে অনেকগুলি চন্দ্রনৃপতির নাম পাওয়া যায় বটে, কিন্তু যে ভাবে তাঁহাদের পরিচয় লিপিবদ্ধ হইয়াছে, তাহাতে ঐ বংশলতার উপর নির্ভর করিয়া ধারাবাহিক ইতিহাস বাহির করিবার উপায় নাই। তারনাথের বিবরণী প্রবাদমূলক, সুতরাং তাঁহার গৃহীত নামগুলি প্রকৃত হইলেও পৌর্ব্বাপর্য্য ঠিক নাই, ইহা বলাই বাহুল্য। তারনাথ লিখিয়াছেন যে, সিংহচন্দ্রের সময় সুপ্রসিদ্ধ চান্দ্রব্যাকরণরচয়িতা চন্দ্রগোমীর আবির্ভাব হইয়া-ছিল। আবার তাঁহার পূর্ব্বপুরুষ কনকচন্দ্রের সময় তুরুষ্কপ্রভাব বিস্তৃত হয়। কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে উত্তরভারতে খৃষ্টীয় ১২শ শতাব্দীতে তুরুষ্কপ্রভাবের সূত্রপাত এবং চন্দ্রগোমী তাহার বহপূর্ব্বে খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে বিদ্যমান ছিলেন। নালন্দার প্রসিদ্ধ বৌদ্ধাচার্য্য চন্দ্রকীর্ত্তির প্রতিদ্বন্দ্বী আচার্য্য চন্দ্রগোমী ৬৩০ হইতে ৬৪০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে বিদ্যমান ছিলেন।[2] পূর্ব্বেই লিখিয়াছি যে, ঐ সময়েই পূর্ব্ববঙ্গে খড়্গবংশের অভ্যুদয়।

এদিকে কাঞ্চীপতি রাজেন্দ্রচোলের রাঢ়বঙ্গ-আক্রমণকালে প্রায় ১০২২ খৃষ্টাব্দে পূর্ব্ববঙ্গে গোবিন্দচন্দ্রকে অধিপতিরূপে দেখিতে পাই। দুর্লভমল্লিকের গোবিন্দচন্দ্রগীতে লিখিত আছে—

"সুবর্ণচন্দ্র মহারাজা ধাড়িচন্দ্র পিতা।
তার পুত্র মাণিকচন্দ্র শুন তার কথা॥"

এদিকে নবাবিষ্কৃত শ্রীচন্দ্রদেবের তাম্রশাসনে লিখিত আছে,—

'এই পৃথিবীতে বিখ্যাত রোহিতাগিরিভোগী বিশাল-শ্রীসম্পন্ন চন্দ্রদিগের বংশে পূর্ণচন্দ্রসদৃশ পূর্ণচন্দ্র জন্মগ্রহণ করেন। প্রতিমার পাদপীঠিকায়, সন্তানিগণের অগ্রভাগে, টঙ্কোৎকীর্ণ নবপ্রশস্তি, জয়স্তম্ভ ও তাম্রসমূহে তাঁহার নাম পঠিত হইত। যে ভগবান্ সুধাংশু বুদ্ধের

(১) Wassiliff's Buddhismus, 207.

(২) Dr. Kern's Indian Buddhism, p. 130.

শশকজাতক অঙ্কে ধারণ করিতেছেন,[৩] সেই চন্দ্রের কুলজাত বলিয়াই যেন তাঁহার পুত্র সুবর্ণচন্দ্র বৌদ্ধ বলিয়া প্রসিদ্ধ হইয়াছিলেন। এক অমানিশায় তাঁহার মাতা গর্ভাবস্থায় সাধ করিয়া উদরী চন্দ্রবিম্বদর্শনের বাসনা প্রকাশ করিলে সোণার চাঁদ পাইয়া তৃপ্ত হইয়াছিলেন বলিয়াই (তৎপুত্র) সুবর্ণচন্দ্র নামে উদাহৃত হইয়াছিলেন। তাঁহার (সুবর্ণের) পুত্র উভয়কুল পবিত্র করিয়াছিলেন ও তাঁহার গুণাবলী লোকবাদভয়ে অতিথিরূপে চারিদিকে ধাবিত হইত বলিয়া ত্রৈলোক্যে তিনি ত্রৈলোক্যচন্দ্রনামে খ্যাত হইয়াছিলেন। হরিকেল অর্থাৎ বঙ্গরাজের রাজচিহ্ন-শোভিত ছত্র যাঁহাকে দেখিয়া স্মিত হইত, সেই রাজ্যশ্রীর আধার চন্দ্র-উপপদযুক্ত দ্বীপে (অর্থাৎ চন্দ্রদ্বীপে) দিলীপের ন্যায় রাজা হইয়াছিলেন। চন্দ্রের জ্যোৎস্না, ইন্দ্রের শচী, হরের গৌরী এবং হরির লক্ষ্মীর ন্যায় সেই বিহিতশাসন (ত্রৈলোক্যচন্দ্রের) শ্রীকাঞ্চনানাম্নী কাঞ্চনকান্তি প্রিয়া ছিলেন। সেই ইন্দ্রসদৃশ তেজস্বী নীতিবিৎ (রাজা) রাজযোগযুক্ত শুভমুহূর্তে কাঞ্চনার গর্ভে দৈবজ্ঞগণ-সূচিত রাজচিহ্নধারী চন্দ্রের ন্যায় শ্রীচন্দ্রনামে এক পুত্র লাভ করিয়াছিলেন। যে (পুত্র) বসুন্ধরাকে একচ্ছত্রে অলঙ্কৃত করিয়া ও অজ্ঞলোকের অনুপযুক্ত (অর্থাৎ বিদ্বৎলোকবেষ্টিত) হইয়া শত্রুগণকে কারায় নিবেশিত করিয়া যশঃসুগন্ধে দশ দিক্ আমোদিত করিয়াছিলেন।"[৪]

(৩) আর্য্যশূররচিত জাতকমালার ৬ষ্ঠ স্তবক শশজাতকে বুদ্ধদেবের শশকরূপে জন্মবিবরণ আছে। অবশেষে শশরূপে বুদ্ধের চন্দ্রে অবস্থান সম্বন্ধে লিখিত আছে—

"সংপূর্ণেঽদ্যাপি তদিদং শশবিম্বং নিশাকরে।
ছায়াময়মিবাদর্শে রাজতে দিবি রাজতে॥
ততঃ প্রভৃতি লোকেন কুমুদাকরহাসনঃ।
ক্ষণদাতিলকশ্চন্দ্রঃ শশাঙ্ক ইতি কীর্ত্যতে॥" (জাতকমালা ৬।৩৭-৩৮)

(৪) "চন্দ্রাণামিহ রোহিতাগিভুজাম্বংশে বিশালশ্রিয়া-
ম্বিখ্যাতো ভুবি পূর্ণচন্দ্রসদৃশঃ শ্রীপূর্ণচন্দ্রোঽভবৎ।
অর্চ্চানাস্পদপীঠিকাসু পঠিতঃ সত্যানিনামশ্রুত-
ষ্টঙ্কোৎকীর্ণনবপ্রশস্তিষু জয়স্তম্ভেষু তাম্রেষু চ॥
বুদ্ধস্য যঃ শশকজাতকমঙ্কসংস্থং ভক্ত্যা বিভর্ত্তি ভগবানমৃতাকরাংশুঃ।
চন্দ্রসা তস্য কুলজাত ইতীব বৌদ্ধঃ পুত্রঃ শ্রুতো জগতি তস্য সুবর্ণচন্দ্রঃ॥
দর্শেঽস্য মাতা কিল দোহদেন দিদৃক্ষমাণোদরিচন্দ্রবিম্বং।
সুবর্ণচন্দ্রেণ হি তোষিতেতি সুবর্ণচন্দ্রং সমুদাহরন্তি॥
পুত্রস্তস্য পবিত্রিতোভয়কুলঃ কৌলীনভীতাশয়ৈ-
স্ত্রৈলোক্যে বিহিতো দিশামতিথিভিস্ত্রৈলোক্যচন্দ্রো গুণৈঃ।
আধারো হরিকেলরাজককুদচ্ছত্রস্মিতানাং শ্রিয়াং
যশ্চন্দ্রোপপদে বভূব নৃপতির্দ্বীপে দিলীপোপমঃ॥
জ্যোৎস্নেব চন্দ্রস্য শচীব জিষ্ণোর্গৌরী হরস্যেব হরেরিব শ্রীঃ।
তস্য প্রিয়া কাঞ্চনকান্তিরাসীচ্ছ্রীকাঞ্চনেত্যপ্রতিমাসনস্য॥

উদ্ধৃত প্রমাণ হইতে শ্রীচন্দ্র ও গোবিন্দচন্দ্রের এইরূপ বংশলতা পাইতেছি—
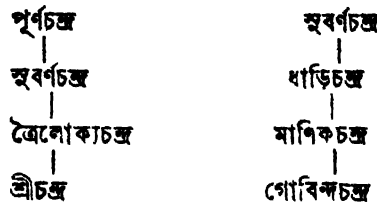
উদ্ধৃত বংশলতা হইতে শ্রীচন্দ্র ও গোবিন্দচন্দ্রকে একই বংশোদ্ভব বলিয়া মনে হয়। যদি ত্রৈলোক্যচন্দ্রের ডাক নাম ধাড়িচন্দ্র হয়, তাহা হইলে শ্রীচন্দ্রকে সম্পর্কে গোবিন্দচন্দ্রের জ্যেষ্ঠ-তাত বা খুল্লতাত বলিয়া ধরা যায়। কিন্তু উত্তরবঙ্গে ও দক্ষিণভাবতে প্রচলিত ময়নামতীর গানে গোবিন্দচন্দ্রের মাতা ময়নামতী রাজা ত্রৈলোক্যচন্দ্র বা তিলোকচাঁদের কন্যা বলিয়াই পরিচিত হইয়াছেন। উভয় ত্রৈলোক্যচন্দ্রকে যদি অভিন্ন বলিয়া ধরা যায়, তাহা হইলে ত্রৈলোক্যচন্দ্র মাণিকচন্দ্রের পিতা না হইয়া শ্বশুর হইয়া পড়েন। ১ম মহীপালের বাণগড়-তাম্রলেখ, ঈশ্বর-ঘোষের মালদোয়ার-তাম্রলেখ এবং শ্রীচন্দ্রদেবের রামপাল-তাম্রলেখ ঠিক একই অক্ষরে উৎকীর্ণ, এই লিপিত্রয় মনোযোগপূর্ব্বক আলোচনা করিলে একই শতাব্দীর বর্ণলিপি বলিয়া গ্রহণ করিতে কাহারও আপত্তি থাকিবে না। পূর্ব্ব অধ্যায়ে লিখিয়াছি যে, গৌড়াধিপ মহীপাল ও লাউসেন একই সময়ে বিদ্যমান ছিলেন।[৫] তিরুমলয় শৈললিপি ও উপরি উক্ত গানে গোবিন্দচন্দ্র বঙ্গাধিপ বলিয়াই প্রখ্যাত হইয়াছেন। তিনি রাজেন্দ্রচোলের বঙ্গাক্রমণকালে প্রায় ১০২২ খৃষ্টাব্দে বিদ্যমান ছিলেন, তৎপূর্ব্বে গোবিন্দচন্দ্রের পিতা মাণিকচন্দ্র বঙ্গাধিপ বলিয়া

স রাজযোগেন শুভে মুহূর্ত্তে মৌহূর্ত্তিকৈঃ সূচিতমার্কচন্দ্রং।
অবাপ তস্যাং তনয়ং নরেন্দ্রঃ শ্রীচন্দ্রমিন্দুপ্রতিমপ্রভাবঃ॥
একাতপত্রাভরণাং ভুবং যো বিধায় বৈধেয় জনাবিধেয়ঃ।
চকার কারাসু নিবেশিতারির্যশঃ সুগন্ধীনি দিশাং মুখানি॥"
(শ্রীচন্দ্রদেবের রামপাল-তাম্রলেখ ৫-৮ শ্লোক। সাহিত্য, ১৩২০ সাল, ৪০১-৪০২ পৃষ্ঠা।)

(৫) লাউসেনকে তিব্বতীয় তারনাথ সূর্য্যবংশীয় লবসেন নামে পরিচিত করিয়াছেন। তারনাথের মতে সেন-রাজবংশের অভ্যুদয়ের পূর্ব্বে লবসেন আবির্ভূত হন। (Indian Antiquary, Vol. IV. p 366.) ধর্ম্মমঙ্গল-সমূহে ধর্ম্মপালের মৃত্যুর পরেই লাউসেনের অভ্যুদয়ের কথা বর্ণিত হইয়াছে। লাউসেন যে গৌড়েশ্বরের আদেশে কামরূপাধিপতি কর্পূরধবল বা ধবলঘোষকে পরাজয় করেন, তিনি ধর্ম্মমঙ্গলে কেবল 'গৌড়েশ্বর' আখ্যা লাভ করিয়াছেন। গৌড়মহীপাল ও গৌড়েশ্বর শব্দ একার্থবাচী। পরবর্ত্তী ধর্ম্মমঙ্গল রচয়িতৃগণ 'মহীপাল' যে একজন রাজার নাম তাহা বুঝিতে না পারিয়া তাঁহাকে গৌড়েশ্বর নামেই পরিচিত করিয়া থাকিবেন। সম্ভবতঃ কাকীপতি রাজেন্দ্রচোলের হস্তে দণ্ডভুক্তি বা মেদিনীপুর অঞ্চলের অধিপতি ধর্ম্মপাল নিহত হইলে ও রাজেন্দ্রচোল স্বরাজ্যে প্রস্থান করিলে মহীপাল ধর্ম্মপালের রাজ্য অধিকার করেন। মহীপাল যে ময়নামতীর সমসাময়িক, তাহা ময়না-মতীর গানেও পাওয়া যায়।

পরিচিত ছিলেন।[৬] সম্ভবতঃ মাণিকচন্দ্রের পর শ্রীচন্দ্র কিছুদিন বঙ্গরাজ্যের অধীশ্বর হইয়াছিলেন। শ্রীচন্দ্রদেবের তাম্রলেখ হইতে বেশ বুঝা যাইতেছে যে, তাঁহার পিতা পিতামহ প্রভৃতি পূর্ব্বপুরুষগণ চন্দ্রদ্বীপের নৃপতি বলিয়া আখ্যাত হইয়াছেন। ত্রৈলোক্যচন্দ্রই 'হরিকেল' বা বঙ্গরাজ্যের 'আধার' অর্থাৎ তাঁহার পুত্র শ্রীচন্দ্র হইতেই বঙ্গাধিপত্যের সূচনা।

শ্রীচন্দ্রদেবের তাম্রলেখ-পাঠোদ্ধারকারী যথার্থই লিখিয়াছেন, "এই লিপির কাল যেন বর্ম্মরাজগণের লিপিকালের অব্যবহিত পরে এবং সেনরাজগণের লিপিকালের অব্যবহিত পূর্ব্বে। বর্ম্মরাজ হরিবর্ম্মদেবের পুত্রের রাজ্যনাশের পরেই কোন সুযোগে চন্দ্রদ্বীপাধিপতি ত্রৈলোক্যচন্দ্রের পুত্র শ্রীচন্দ্র বিক্রমপুরে স্বাতন্ত্র্য অবলম্বনপূর্ব্বক কিছুকালের জন্য এক অভিনব বৌদ্ধ রাজ্য সংস্থাপিত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।"[৭]

চন্দ্রদ্বীপের রাজবংশ

বলা বাহুল্য, সমুদ্র-পরিবেষ্টিত চন্দ্ররাজবংশের অধিষ্ঠান-ভূমিই 'চন্দ্রদ্বীপ' আখ্যা লাভ করিয়াছিল। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, খৃষ্টীয় ৭ম শতাব্দীতে চন্দ্রগোমী আবির্ভূত হন। তিব্বতের জ্ঞানভাণ্ডার টেঙ্গুর গ্রন্থে লিখিত আছে, 'বরেন্দ্রের ক্ষত্রিয়বংশে চন্দ্রগোমীর জন্ম। আচার্য্য স্থিরমতির নিকট ইনি সূত্র ও অভিধর্ম্মপিটক অধ্যয়ন করেন এবং বিদ্যাধরাচার্য্য অশোকের নিকট বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিত হন। তিনি অবলোকিতেশ্বর ও তারার বড় ভক্ত ছিলেন। তৎকালে বরেন্দ্র হর্ষের উত্তরাধিকারী শিলের সাম্রাজ্যান্তর্গত ছিল এবং সিংহ নামক এক লিচ্ছবি এই প্রদেশ শাসন করিতে-

(৬) অলঙ্কারশেখর-রচয়িতা কেশবমিশ্র মাণিক্যচন্দ্র নামে এক চন্দ্রবংশীয় নৃপতির পরিচয় দিয়াছেন, এই মাণিক্যচন্দ্রের পিতার নাম ধর্ম্মচন্দ্র ও পিতামহের নাম রামচন্দ্র। কেশব রামচন্দ্রের এইরূপ পরিচয় দিয়াছেন—

"সুত্রামোদ্দামডিল্লীপরিবৃঢবিলসৎকাবিলক্ষোণীভর্ত্ত
... ... স্তে প্রোঢ়যুদ্ধে সমদলয়সৌ কোটিশো বৈরিবীরান্।'

অর্থাৎ 'স্বতন্ত্র ইন্দ্ররূপে যিনি (দিল্লী)-পতি হইয়া বিরাজ করিতেছিলেন, সেই কাবিলের (কাবুল) অধিপতিকেও যিনি কোটী বৈরিগণের সহিত দমন করিয়াছিলেন।' এই প্রমাণ অনুসারে গোবিন্দচন্দ্রের পিতা মাণিকচন্দ্র হইতে রামচন্দ্রের বংশধর মাণিক্যচন্দ্রকে ভিন্ন বংশীয় বলিয়া মনে হয়। তারনাথ ধর্ম্মচন্দ্রের ভ্রাতুষ্পুত্র কনকচন্দ্রকে তুরুষ্কের অধীন বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। সম্ভবতঃ অলঙ্কারশেখর-বর্ণিত মাণিক্যচন্দ্রের পিতা ধর্ম্মচন্দ্র ও তারনাথের ধর্ম্মচন্দ্র অভিন্ন হইতে পারেন। শৌদ্ধোদনিরচিত অলঙ্কারসূত্রের টীকাই অলঙ্কারশেখর।

"বেদান্তন্যায়বিদ্যাপরিচিতিচতুরং কেশবং সন্নিযোজ্য
শ্রীমন্মাণিক্যচন্দ্রঃ ক্ষিতিপতিতিলকো গ্রন্থমেতং বিধত্তে।" ৯

এই বচনানুসারে মাণিক্যচন্দ্রের আদেশেই 'অলঙ্কারশেখর' রচিত হয়। গ্রন্থারম্ভে লিখিত আছে, "অলঙ্কারবিদ্যাসূত্রকারো ভগবাংচ্ছৌদ্ধোদনিঃ পরমকারুণিকঃ স্বশাস্ত্রে প্রবর্ত্তয়িষ্যৎ" এতদ্দ্বারা পরম দয়ালু বুদ্ধদেবকেই নির্দ্দেশ করিতেছে। ইহাতে বোধ হয়, উপরোক্ত চন্দ্ররাজগণের ন্যায় কেশবের পৃষ্ঠপোষক মাণিক্যচন্দ্রও বুদ্ধভক্ত ছিলেন।

(৭) শ্রীযুক্ত রাধাগোবিন্দ বসাক মহাশয়ের 'শ্রীচন্দ্রদেবের নবাবিষ্কৃত তাম্রশাসন' প্রবন্ধ সাহিত্য, ১৩২০ সাল, ২৯ পৃষ্ঠা।

ছিলেন। সম্রাট্ শিল নিজ কন্যার সহিত চন্দ্রগোমীর বিবাহ দিবেন ইচ্ছা করিয়া বরেন্দ্ররাজের নিকট সংবাদ প্রেরণ করেন, চন্দ্রগোমীও প্রথমে তাঁহার প্রস্তাবে সম্মত হইয়াছিলেন, কিন্তু পরে সেই রাজকন্যার তারা নাম শুনিয়া তাঁহার আরাধ্যা দেবী তারার নামের সহিত মিল হওয়ায় আর বিবাহ করিতে সম্মত হইলেন না। বরেন্দ্ররাজ তৎপ্রতি নিতান্ত ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাকে একটী সম্পুটে আবদ্ধ করিয়া গঙ্গায় নিক্ষেপ করিলেন। পেটিকাটি ভাসিতে ভাসিতে গঙ্গা ও সমুদ্র-সঙ্গমের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলে তথায় একটি দ্বীপ উৎপন্ন হইল। চন্দ্রগোমীর নামানুসারে এই ভূভাগ চন্দ্রদ্বীপ নামে পরিচিত হইয়াছিল। ক্রমে চন্দ্রদ্বীপে লোকসমাগম হইলে এই দ্বীপে চন্দ্রবংশের রাজ্য হইল।

মনোহরকল্প-লোকনাথস্তোত্র নামক নিজ গ্রন্থে চন্দ্রগোমী আচার্য্য-মহাপণ্ডিত ও বারেন্দ্র বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন। সুতরাং প্রথমে তিনি বরেন্দ্র-প্রদেশেরই অধিবাসী ছিলেন এবং বরেন্দ্র হইতেই চন্দ্রদ্বীপে আসিয়া পড়েন। তিব্বতীয় গ্রন্থে যে হর্ষের উত্তরাধিকারী শিলরাজের উল্লেখ আছে, তাঁহাকে আমরা সৌবর্ণপুত্র পৌণ্ড্রজিৎ শৈলোদ্ভব-রাজকুমার বলিয়া মনে করি।[৮] তৎপূর্ব্ববর্ত্তী পৌণ্ড্রাধিপ হর্ষদেব নেপালের লিচ্ছবিরাজ জয়দেবের মাতামহ বলিয়া তাঁহার শিলালিপিতে পরিচিত আছেন। এরূপ স্থলে মনে হয় যে, আত্মীয়তাসূত্রে কোন কোন লিচ্ছবিরাজ-কুমার হর্ষদেবের অধীনে বরেন্দ্র-শাসন করিতেছিলেন। সম্ভবতঃ তিনি শৈলোদ্ভব বা শিলরাজের আধিপত্যকালেও তাঁহার অধীনতা স্বীকার করিয়া মহাসামন্তরূপে পরিগণিত হইয়াছিলেন। গৌড়াধিপ ধর্ম্মপালের খালিমপুর-তাম্রলেখ-বর্ণিত মহাসামন্ত নারায়ণবর্ম্মা ঐরূপ কোন রাজবংশধর ও প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তা ছিলেন বলিয়াই মনে হয়।

যাহাই হউক, এখন দেখিতেছি যে, খৃষ্টীয় ৭ম শতাব্দীতে চন্দ্রদ্বীপ ও এখানকার চন্দ্রবংশের উদ্ভব।[৯] কিন্তু খৃষ্টীয় ৭ম হইতে ৯ম শতাব্দী পর্য্যন্ত এখানে কে কোন্ সময়ে রাজত্ব করেন, তাহা ঠিক জানিবার উপযুক্ত উপকরণ এখনও বাহির হয় নাই। তারনাথ যে সকল চন্দ্রনৃপতির উল্লেখ করিয়াছেন, তন্মধ্যে কেহ কেহ ঐ সময়-মধ্যেই বিদ্যমান থাকা সম্ভব, কিন্তু তাঁহার প্রবাদমূলক নামমালার উপর নির্ভর করিয়া উক্ত তিন শতাব্দীর সংক্ষিপ্ত ইতিহাস রচিত হইতে

(৮) ৭৮ পৃষ্ঠার বিস্তৃত বিবরণ দ্রষ্টব্য।

(৯) বিশ্বকোষে চন্দ্রদ্বীপ শব্দে ৺ব্রজসুন্দর মিত্র মহাশয়ের 'চন্দ্রদ্বীপরাজবংশ' গ্রন্থের প্রমাণে লিখিত হইয়াছে যে, রাজা দনুজমর্দ্দনের গুরু চন্দ্রশেখরের নামানুসারে চন্দ্রদ্বীপের নামকরণ হইয়াছে, এখন তাহা অপ্রামাণিক বলিয়া প্রতিপন্ন হইতেছে। রাজা দনুজমর্দ্দনের অভ্যুদয়ের বহুশত পূর্ব্বেই যে চন্দ্রদ্বীপ খ্যাত ছিল, তাহা চন্দ্রগোমীর বিবরণ ও শ্রীচন্দ্রদেবের তাম্রলেখ হইতে জানা যাইতেছে। সম্ভবতঃ তারাভক্ত আচার্য্য চন্দ্রগোমী প্রথমে চন্দ্রদ্বীপ-পতির গুরু ছিলেন, সেই প্রাচীন প্রবাদ পরবর্ত্তী কালে রূপান্তরিত হইয়া রাজা দনুজমর্দ্দনের গুরুদেবের স্কন্ধে আরোপিত হইয়াছে।

পারে না। শ্রীচন্দ্রের তাম্রশাসন-বর্ণিত পূর্ণচন্দ্র হইতেই এই বংশের ধারাবাহিক রাজমালা কতকটা স্থির হইতেছে।

শ্রীচন্দ্রের তাম্রশাসনে পালবংশের নির্দ্দিষ্ট ধর্ম্মচক্রমুদ্রা ব্যবহৃত হইয়াছে। এদিকে ধর্ম্ম-চন্দ্রের পরিচয়প্রসঙ্গে তারনাথ লিখিয়াছেন, যে তাঁহার জ্যেষ্ঠ জ্ঞাতি-ভাই বুদ্ধপক্ষ বারাণসী শাসন করিতেন। বলা বাহুল্য, চন্দ্রবংশের বিদ্যমানকালে বারাণসী পর্য্যন্ত বৌদ্ধ পালবংশের অধিকারে ছিল। এদিকে ললিতচন্দ্রের মহিষীর কৌশলে মহানিশায় রাজবংশীয়গণের হত্যা-শেষে গোপালের মুক্তি ও নির্ব্বাচন হইতে মনে হয় যে, পাল ও আদি চন্দ্রবংশ একই বংশ হইতে সমুদ্ভূত। এক এক রাজবংশের এক এক প্রকার রাজমুদ্রা প্রচলিত ছিল। সম্ভবতঃ শ্রীচন্দ্র ভগিনীপতি মাণিকচন্দ্রের রাজ্য অধিকার করিয়া তাঁহার রাজচিহ্ন বা বঙ্গরাজমুদ্রা ব্যবহার করিয়াছিলেন, শ্রীচন্দ্রের তাম্রলেখ হইতেও তাহার আভাস পাইতেছি। এরূপ স্থলে পালবংশের ন্যায় চন্দ্রবংশের তাম্রশাসনে ধর্ম্মচক্রমুদ্রার ব্যবহার হইতেও চন্দ্র ও পালকে এক বংশ বলিয়াই মনে হয়। সম্ভবতঃ সমতটের প্রাচীন খড়্গাবংশের উত্তরশাখা পালবংশ শাকদ্বীপী সৌরব্রাহ্মণগণের শিষ্যত্ব স্বীকার করিয়া তাঁহাদের নিকট সূর্য্যবংশোদ্ভব এবং দক্ষিণশাখা আচার্য্য চন্দ্রগোমীর শিষ্যত্বস্বীকার করিয়া হয়ত চন্দ্রবংশীয় বলিয়া পরিচিত হইয়া থাকিবেন। দুর্লভ মল্লিকের গোবিন্দচন্দ্রগীতে এই বংশ "বাণিয়া জাতি ক্ষত্রীকুল" (৫৩ শ্লোক) বলিয়া উক্ত হইয়াছে। প্রাচীন শিলালিপিতে সূর্য্যবংশীয় নিগমশ্রেষ্ঠীর পরিচয় বাহির হইয়াছে।[১০] সম্ভবতঃ এই চন্দ্রবংশও আদিতে ঐরূপ কোন ক্ষত্র শ্রেষ্ঠীবংশ হইতে উদ্ভূত হইয়াছিলেন।

শ্রীচন্দ্রদেবের তাম্রশাসনে পূর্ণচন্দ্র হইতে শ্রীচন্দ্র পর্য্যন্ত চারিপুরুষের যেরূপ পরিচয় আছে, তাহা উদ্ধৃত হইয়াছে। এখন মাণিকচন্দ্র ও তৎপুত্র গোবিন্দচন্দ্রের পরিচয় দিতেছি।

রঙ্গপুর জেলায় প্রচলিত ময়নামতীর গানে ও গোপীচাঁদের গানে তাঁহাদের এইরূপ পরিচয় আছে—

বঙ্গাধিপ মাণিকচন্দ্র ও গোবিন্দচন্দ্রের পরিচয়

'বঙ্গে মাণিকচন্দ্র নামে এক "সতী" অর্থাৎ ধার্ম্মিক রাজা ছিলেন। তিলকচাঁদের কন্যা ময়নামতী তাঁহার রাণী, কিন্তু তিনি একমাত্র রাণী নহেন। রাজার ময়নামতীতে তৃপ্তি জন্মিল না, আনন্দ-মহলে "নও বুড়ী" রাণী সত্ত্বেও তিনি পুনরায় বাসনা-তৃপ্তির জন্য দেবপুরের পাঁচ কন্যা বিবাহ করিলেন। ইহার অবশ্যম্ভাবী ফল ফলিল। "দেবপুরের পাঁচ কন্যা ডাহিনী মএনা কোন্দল লাগিল"। রাজা তখন বর্ষীয়সী ময়নামতীকে পৃথক্ করিয়া ফেরুসানগরে তাঁহার বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিলেন। মাণিকচাঁদের রাজ্যে প্রজার সুখের ইয়ত্তা ছিল না। প্রত্যেক হালে দেড় বুড়ী মাত্র খাজনা, একজনের বাড়ীর পথ দিয়া অপরে হাঁটে না, একজনের পুষ্করিণীর জল অপরে

(১০) Cunningham's Archæological Survey Reports, Vol. IV. p. 435 এবং শ্রীশিবচন্দ্র শীল-সম্পাদিত দুর্লভ মল্লিকের গোবিন্দচন্দ্র-গীত, ৫০ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

ব্যবহার করে না, এমন কি যে বেতনভোগী ভৃত্যের দুয়ারেও ঘোড়া বাঁধা, বন্দী পর্য্যন্ত সোনার পাটের পাছড়া পরিতে অনিচ্ছুক। কিন্তু প্রজার অদৃষ্টে এ সুখ অধিক দিন টিকিল না। এক বৈদেশিক আসিয়া সমস্ত নষ্ট করিল। তখন কাজেই—চাষা খাজনা দিবার জন্য হাল গরু, সদাগরেরা নৌকা পর্য্যন্ত বিক্রয় করিল, ফকির ঝোলা-কাঁথা পর্য্যন্ত বেচিয়া ফেলিল। নিরীহ বঙ্গপ্রজা এ ঘোর দুরবস্থায় কি করিবে ? সকলে পরামর্শ করিয়া গ্রামের মহত্তর বা প্রধানের বাড়ীতে উপস্থিত হইল। অবশেষে নদীতীরে ধর্ম্মপূজা করিয়া রাজাকে অভিশাপ দেওয়া সাব্যস্ত হইল।

প্রজারা ধূপ, ধুনা, ঘৃত, কলা, ধবল কৈতোর, ধবল (মতান্তরে কালা ধলা) পাঁঠা এবং একটা করিয়া 'বিন্নার খোপ' লইয়া যথাসময়ে "পরাণী গঙ্গা" অর্থাৎ তিস্তা নদীর তীরে উপস্থিত হইল। যথারীতি ধর্ম্মপূজা হইল, বালির পিণ্ডে 'বিন্নার খোপ' পুঁতিয়া দেওয়া হইল, পাঁঠাগুলি নদীতে নিক্ষিপ্ত হইল। এই অব্যর্থ অভিচারের ফল হাতে হাতে ফলিল, রাজার আঠার বৎসরের পরমায়ু ছয় মাসে পরিণত হইল, "চিত্রগুপ্ত" দপ্তর খুলিল, বিধাতা তলপচিটি লিখিয়া গোদা যমকে রাজার "জীউ" আনিবার হুকুম দিলেন। কিন্তু এ জীউ যার তার নহে, ময়নামতীর স্বামীর,—যমকে বিলক্ষণ বেগ পাইতে হইল। কেরুণাগড়ের রাজার পাত্র হেমাই নেঙ্গা সশরীরে উপস্থিত হইয়া ময়নামতীকে পীড়ার সংবাদ দিল। ময়না সুসজ্জিত হইয়া রাজধানীতে চলিলেন। ময়নামতী তাঁহার নিজের জ্ঞান বা তাঁহার কিয়দংশ গ্রহণ করিতে রাজাকে অনুরোধ করিলেন, তাহা হইলে রাজা যমের শক্তির অতীত হইবেন। কিন্তু মাণিকচন্দ্র তেজস্বী রাজা, তিনি স্ত্রীর নিকট জ্ঞানশিক্ষা অপমানজনক মনে করিলেন—রাজার জ্ঞানলাভ হইল না। অগত্যা ময়নামতী—

"চাইট্টা মোমের বাতি দিলা ধরাইআ। দিবা রাতি ঘর রাখিলে জালাইআ॥
জেই রোগের জেই দাওআ আনিলে ধরিআ। রাজার পইথানত বসিল ধেআন করিআ॥"

যমগণ বড়ই বিপদে পড়িল। ময়নামতী কখন নির্জ্জীব কখনও সজীব পদার্থ দ্বারা তাহাদিগকে ফিরাইতে লাগিলেন। যমদিগকে যে অনেক বার ফিরিতে হইল, তাহার কারণ উপঢৌকনের পশ্চাতে "ডাহিন" ময়নার জ্ঞানের তেজ। একবার চণ্ডীকালীর রূপ ধারণ করিয়া "তৈলপাটের খাঁড়া" হস্তে লইয়া ময়নামতী যমদিগকে "মার মার" বলিয়া অনেক দূর পর্য্যন্ত তাড়াইয়া দিলেন। অবশেষে সকল যম মিলিয়া এক পরামর্শ আঁটিল। এক যম ইন্দুর সাজিয়া "সেত-কুয়া"র জল চুষিয়া ফেলিল, এক যম 'বদাওয়ুরি' অর্থাৎ ঘূর্ণীবায়ু হইয়া রাজার গৃহের দীপ নিবাইয়া দিল এবং স্ফটিকপাত্রের জল ঢালিয়া ফেলিল। সুবিধামত অলক্ষ্য ভাবে রাজাকে পরামর্শ দিল—"তুমি আর কোন রাণীর হস্তের জল গ্রহণ করিবে না, ময়নামতী নিজ হাতে জল দেওয়া চাই"। মাণিকচাঁদ "জল জল" বলিয়া কান্দিতে লাগিলেন। ময়নামতী রাজার নিকটে থাকিতে চাহিলেন, কিন্তু তাঁহার বিনতি ব্যর্থ হইল, মাণিকচাঁদ আর কাহারও হস্তে জল খাইবেন না। ময়নামতী অগত্যা সোণার ঝারি লইয়া জল আনিতে

চলিলেন। কিন্তু জল কোথায়? ময়নামতী নানা স্থান অন্বেষণ করিয়া অবশেষে নদীতে গেলেন। যম স্বর্ণভ্রমররূপে রাজার জীবন লইয়া উড়িয়া গেলেন, তখন ময়নামতী নদী হইতে জল তুলিতেছিলেন। গঙ্গাদেবী মূর্ত্তিমতী হইয়া ময়নাকে রাজার অবস্থা জানাইলেন। ময়নামতী আপনার কপালে আঘাত করিয়া সোণার ঝারী ভাঙ্গিয়া ফেলিলেন। তাঁহার সিঁতির সিন্দুর ও হাতের শাঁখা মলিন হইল, একটী আম্রপল্লব হস্তে লইয়া গৃহে চলিলেন। তারপর জ্ঞাতি-দিগকে সমবেত করিয়া তাহাদের উপর রাজার শরীররক্ষার ভার দিলেন এবং স্বয়ং যমপুরী যাত্রা করিলেন। গোপুচ্ছের সাহায্য ব্যতিরেকেও ভীষণ বৈতরণী নদী পার হইতে তাঁহার কষ্ট হইল না, সোণার ভোমরা হইয়া অনায়াসেই উড়িয়া গেলেন। ক্রমে যমেরা তাঁহাকে চিনিতে পারিল এবং পৃষ্ঠভঙ্গ দিতে আরম্ভ করিল। ময়নামতী লুক্কায়িত যমকে বাহির করিলেন। ইন্দুর, পায়রা, সরিষা, ইচলা মাছ প্রভৃতি বহুবিধ রূপ ধারণ করিয়াও গোদা যম বিড়াল, বাজ, ঘুঘু, মহিষ প্রভৃতি বহুবিধ-রূপধারিণী ময়নামতীর হস্তে নিস্তার পাইল না। অশেষ লাঞ্ছনার পর—গোদা যম মাণিকচন্দ্র রাজার 'জীউ' বিধাতার নিকট হাজির করিয়া দিল। এদিকে দেবগণের মধ্যে মহাভীতির সঞ্চার হইল। যদি ময়নামতী এইরূপে নিজের স্বামীর প্রাণ বলপূর্ব্বক লইয়া যায়, তবে আর বিধাতার বিধান থাকে কৈ? তখন আশীর্ব্বাদ-লিপি লেখাইয়া ময়নামতীকে পুত্রবর দেওয়া হইল। কিন্তু ময়নামতীকে সন্তুষ্ট করা ততটা সহজ হইল না। ময়নামতী দেখিলেন আশীর্ব্বাদানুসারে পুত্রের বয়স অষ্টাদশ বৎসর মাত্র, ঊনবিংশ বৎসরে তাঁহার মৃত্যু। বন্দোবস্ত হইল যে হাড়ীসিদ্ধার চরণ ভজনা করিলে ময়নামতীর উদরে একেবারে আড়াই মাসিয়া গর্ভ এবং আঠার মাসে পুত্রের জন্ম হইবে। তখন রাজার শব ভস্মসাৎ করার আয়োজন হইল। ২১ কড়া কড়ি দিয়া মৃত্তিকা কিনিয়া লইয়া আম্রপল্লব হস্তে করিয়া ময়নামতী সঙ্গে চলিলেন। যখন মাণিকচাঁদের দেহ জ্বলিতে লাগিল, তখন ময়নামতীও সেই অনলে "সাতদিন নও রাত" পর্য্যন্ত রহিলেন; কিন্তু অনলের তেজ এবং জ্ঞাতিগণের নিগ্রহে ময়নামতীর কেশও বিচলিত হইল না। তিনি সুস্থ শরীরে পতির অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সমাপনের পর এক পুত্র প্রসব করিলেন। সোনাই দাই নাড়ী ছেদ করিল। পুত্রকে গৃহে আনিবার সময় ময়নামতী রাস্তায় আর এক শিশু পাইলেন, তাহাকেও কুড়াইয়া আনিয়া লালন পালন করিতে লাগিলেন। নবকুমারের তিন দিনে তিন কামান, চতুর্থ দিনে চতুর্থী, দশ দিনে দশা এবং ত্রিশ দিনে ত্রিশা হইল। রাজপুত্রের নাম রাখা হইল গোবিচন্দ্র, অপর বালকের নাম হইল খেতুয়া। ক্রমে রাজার বিদ্যাশিক্ষা হইল, তাহার পর ময়নামতী বিবাহের আয়োজন করিলেন। নয় বৎসর বয়সে (কোন মতে ১২ বৎসর বয়সে) বিবাহের আয়োজন হইল; হরিচন্দ্র বা হরিশ্চন্দ্র রাজার কন্তা অদুনা ও পদুনার সহিত সম্বন্ধ উপস্থিত হইল। গুয়া পান কাটিয়া শুভ দিন ধার্য্য করা হইল। "পঞ্চগাছি" কলার গাছ, সোনালী চাদুনবাতি ও পঞ্চ বৈয়াতীর সাহায্যে এক রবিবার দিন বিবাহকার্য্য সম্পন্ন হইল,—

"অদুনাক বিবাহ ক'রে পদুনাক পাইলে দানে। এক শত বান্দী পাইলে ব্যবহার করণে॥"

গোবিচন্দ্র রাজত্ব করিতে লাগিলেন, ক্রমে তাঁহার মৃত্যুকাল নিকটে আসিল। তখন ময়নামতী এক দিন ধবল বস্ত্র পরিধান করিয়া, হেমতালের লাঠি হস্তে লইয়া সুবাস তাম্বুল চর্ব্বণ করিতে করিতে রাজসভায় উপস্থিত হইলেন এবং রাজা সভাভঙ্গ করিলে তাঁহার নিকট গিয়া হাড়ির চরণ ভজিবার প্রস্তাব উপস্থিত করিলেন। কিন্তু রাজা হাড়িকে গুরু-করার কথা শুনিয়া চমকিয়া উঠিলেন।

"ডুবালু মা জাতকুল আর সব্ব গাও। বাইশ দণ্ডের রাজা হঞা হাড়ির ধরম পাও॥"

ময়নামতী পুত্রকে এমন অবজ্ঞাসূচক বাক্যপ্রয়োগের জন্ত ভর্ৎসনা করিলেন, ভবিষ্যতের জন্ত সাবধান করিয়া দিলেন এবং বুঝাইয়া বলিলেন—

"এ দেশীআ হাড়ি নএ বঙ্গদেশে ঘর। চান্দ সুরুজ রাখছে দুই কাণের কুণ্ডল॥"

রাজা বিশ্বাস করিলেন না, জননীর প্রতি কটুবাক্য পর্য্যন্ত প্রয়োগ করিলেন—

"হাড়ির খাইছেন গুআ মা হাড়ির খাইছেন পান।
ভাব করি শিখি নিছেন ঐ হাড়ির গিআন॥
তোর জ্ঞানে হাড়ির জ্ঞানে একত্তর করিআ।
আমার পিতাক মাছেন তোরা গরল বিষ খাবাইআ॥
বুদ্ধি পরামিশে আমাক বনবাস পাঠাআ।
শেষে বিটি থাকেন ঐ হাড়ি নৈআ॥"

এই সাঙ্ঘাতিক অপমান ময়নামতীর মর্ম্ম ভেদ করিল, তিনি পুত্রকে শাস্তি দিবার উদ্দেশে গুরুকে স্মরণ করিলেন।

ময়নামতী সে দিনকার মত ফিরিয়া গেলেন, কিন্তু পুনরায় আসিয়া পুত্রকে নানারূপ উপদেশ দিয়া সন্ন্যাসে যাইবার জন্ত উৎসাহিত করিতে লাগিলেন। গোবিচন্দ্র অদুনা ও পদুনা রাণীকে সহসা ত্যাগ করিয়া যাইতে সম্মত নহেন, তাহাদিগকে তিনি "বটবৃক্ষের ছায়া"র মত দেখেন। ময়নামতী বিবিধ নারী-চরিত্র বর্ণনা করিয়া নারী-প্রেমের অসারতা প্রদর্শন করিলেন এবং পুত্রের নানা জটিল আধ্যাত্মিক প্রশ্নের উত্তর দিলেন।

অবশেষে রাজা সন্ন্যাস গ্রহণ করিতে সম্মত হইলেন। কিন্তু অন্দর মহলে আসিলেই অদুনা ও পদুনা রাণী কাণে অন্ত মন্ত্র দিল, ময়নামতীর জ্ঞানের পরীক্ষা লইবার পরামর্শ হইল। পরদিন ময়নামতী পুনরায় রাজ-দরবারে উপস্থিত হইলে গোবিচন্দ্র বলিলেন—

"হাট গেছেন বাজার গেছেন কিনিআ খাইছেন খই।
আমার পিতার মরণের দিন সতী গেছেন কই॥"

ময়নামতী উত্তরে বলিলেন যে তিনি সতী যাওয়ার জন্ত চেষ্টার ক্রটী করেন নাই, কিন্তু অগ্নি তাঁহাকে দগ্ধ করিতে অক্ষম। রাজা সুযোগ বুঝিয়া এই কথার সত্যতা পরীক্ষা করিতে অগ্রসর হইলেন। "বাইশ মোণী" কড়াই আশী মণ তৈলে পূর্ণ করা হইল। "সাত দিন সাত রাত" অগ্নিসংযোগে ঐ তৈল উত্তপ্ত করা হইল। ময়নামতী ছয় দিন পর্য্যন্ত তৈলে থাকিয়া,

অবশেষে সর্ষপরূপ ধারণ করিয়া উত্তপ্ত তৈলে ভাসিতে লাগিলেন। তখন রাজার এবং খেতুয়ার ভয় হইল যে ময়নামতী আর ইহজগতে নাই। রাজার মাতৃভক্তি অকস্মাৎ প্রবল হইয়া উঠিল, তিনি কান্দিতে লাগিলেন। রাজবধূগণ আনন্দে অধীর হইলেন, আর রাজাকে কে সন্ন্যাসে পাঠায়? কিন্তু ময়নামতী মরেন নাই, বধূগণের হর্ষ শীঘ্রই বিষাদে পরিণত হইল। রাজার মন কিন্তু ইহাতেও সন্ন্যাসাশ্রমের জন্য প্রস্তুত হইল না, তিনি জননীর অন্ত পরীক্ষা গ্রহণ করিতে চাহিলেন। যাহা হউক অনেক পরীক্ষার পর শুক্রবার দিন দ্বিপ্রহর সন্ন্যাসের জন্য ধার্য্য হইল। রাণীগণের বাধা ও উৎকোচসত্ত্বেও নাপিতকে ক্ষুর লইয়া হাজির হইতে হইল। তখন রাজাকে যোগী করিবার উদ্যোগ হইল—

"এক সোতা দুই সোতা তিন সোতা দিল।
যখন রাজার মস্তকের কেশ মৃত্তিকাএ পড়িল।
কেশী গঙ্গা নদী হঞা বহিতে লাগিল॥"

ময়নামতী রন্ধন করিলেন; হাড়িপা, মীননাথ, গোরক্ষনাথ প্রভৃতি সিদ্ধাগণের উদ্দেশে নিবেদন করিলেন। তার পর—

"পাঁচ মোটা কুআর জলে রাজাকে ছিনান করাইআ।
মাড়োআর তলে নিআ গেল ধরিআ।
এক খান রেজিছুরী আনিল জোগাইআ॥
ঐ রেজিনি গিআ হাড়িপক দিল।......
আড়াই হাত কাড়ি রাজার পরিবস সাজাইল।
সোআ তিন হাত কাপড় ফাড়ি রাজার খিঙ্কা বানাইল!
চৌদ্দ অঙ্গুলি কাপড় ফাড়ি কপ্নি সাজাইল।
আড়াই অঙ্গুলি ফাড়িয়া এ ডোর সাজাইল॥"

ময়নামতী তখন হাড়িপার হস্তে গোবিন্দচন্দ্রকে সমর্পণ করিলেন। হাড়িপা প্রথমেই রাজাকে আপনার জননীর মহলে গিয়া ভিক্ষা আনিতে আদেশ দিলেন। গুরুর আদেশানুসারে রাজা ভিক্ষায় গেলেন, ময়নামতী অন্নব্যঞ্জনাদি রন্ধন করিয়া সুবর্ণের থালায় রাজাকে ভোজন করিতে বলিলেন, কিন্তু রাজা এখন সন্ন্যাসী, তিনি সুবর্ণের থালায় ভোজন না করিয়া কচুর থালায় খাইতে বসিলেন। সুবর্ণ-ভৃঙ্গারের জল "করঙ্গ তুম্বায়" লইলেন। জল মাটীতে পড়িয়া গেল, রাজা তাহা চুমুক দিয়া খাইলেন। ময়নামতী রাজাকে বার কাহণ কড়ি ভিক্ষা দিয়া উপদেশ দিলেন—

"পরর স্ত্রীক দেখি বেটা হাস্ত না করিও।
আগে মা বলিআ পিছে ভিক্ষা নিও॥
পাখীগুলা দেখিআ ডিমা না মারিও॥"

রাজা আবার হাড়িপার সহিত মিলিত হইলেন। এবার হাড়িপার আদেশ হইল—

"আর কিছু আনক ভিক্খা তোর রাণীর মহল বাঞ্চা।"

রাজা অন্দরে আসিলে অদুনা ও পদুনা অনেক কাকুতি মিনতি করিল, সঙ্গে যাইবার জন্য অস্থির হইল, রাজাকে বুঝাইয়া বলিল তাহারা সঙ্গে গেল, "ভোকের কালে অন্ন এবং তিয়াস কালে পানি, জাড়ের কালে ওড়ন এবং গ্রীষ্মকালে বাতাস দিবে, সন্ধ্যা বেলা হাত পা টিপিয়া দেবে, হাসিয়া খলিয়া রজনী পোহাইবে", ইত্যাদি। রাজা এ প্রলোভনে মুগ্ধ হইলেন না। তিনি পথের নানা বিপদের উল্লেখ করিলেন, কিন্তু রাণীরা ছাড়িবার পাত্র নহেন। রাণীদ্বয় ডোর-কৌপীন পরিয়া, সম্মুখের ছয়টী দাঁত ভাঙ্গিয়া, মস্তক মুণ্ডন করিয়া ভিক্ষার ঝুলি লইয়া রাজার পশ্চাতে যাইবার জন্য অনুমতি চাহিলেন। দস্যুভীতির যুক্তি বিফল হইল। রাজা কিন্তু কিছুতেই স্ত্রীলোক সঙ্গে লইতে সম্মত নহেন। তাই খেতুয়ার হাতে রাজ্য-ভার এমন কি তাঁহার স্ত্রীগণকে পর্য্যন্ত সমর্পণ করিয়া একাকী বনে যাইতে কৃতসঙ্কল্প। কিন্তু রাণীদ্বয় খেতুয়ার নিকট যাইতে একেবারেই রাজি নহেন।

"হস্তপদ বান্ধিআ মোরে ডুবাও সাগরে। তবুও সঁপিয়া না জাও গোলাম খেতুর করে॥"

তাঁহারা রাজার নিকটে পুত্র চাহিলেন, কিন্তু রাজা সন্ন্যাসে চলিয়াছেন, পুত্র পাইবেন কোথায়? তিনি স্বয়ং রাণীদিগের পুত্র হইবার প্রস্তাব করিলেন। বলা বাহুল্য এই মাতৃ-সম্বোধনে রাণীদিগের মনস্তুষ্টি জন্মিল না। তাঁহারা বক্ষে ছুরিকা বসাইয়া আত্মহত্যা করিলেন। হাড়িপার মন্ত্র-বলে আবার তাহারা জীবন পাইল। রাণীরা এই অলৌকিক ঘটনায় অভিভূত হইয়া স্বামীকে হাড়িপার হস্তে ছাড়িয়া দিলেন। তখন রাজার বৈরাগ্যে সৈন্য-সামন্ত, হস্তী, ঘোড়া, পক্ষী ও বৃক্ষ যে যেখানে ছিল কান্দিতে লাগিল। রাজার অনুপস্থিতিকালে রাজপুরীর বিশুদ্ধতা রক্ষার জন্য বার জায়গায় চৌকী এবং তের জায়গায় থানা বসান হইল, রামজাল ও ব্রহ্মজালে পুরী বেষ্টিত হইল, বার বৎসর পর্য্যন্ত কোন লোক পুরীতে প্রবেশ করিতে পারিবে না এই আদেশ প্রচারিত হইল। সত্যের অস্ত্র, সত্যের পাশা এবং দামামা গৃহে লম্বিত রাখিয়া গোবিচন্দ্র হাড়িপার সহিত যাত্রা করিলেন। খেতুয়া রাজপ্রতিনিধি হইল এবং বাজে রাণীগুলিকে হস্তগত করিল।

হাড়িপা রাজার হস্ত ধরিয়া চলিতে লাগিলেন। তিনি মন্ত্রবলে রাজার ঝুলির ভার বৃদ্ধি করিলেন এবং এক বৃহৎ অরণ্যের সৃষ্টি করিয়া রাজার পথশ্রমের মাত্রা চড়াইয়া দিলেন। কণ্টকে রাজার শরীর বিদীর্ণ হইল, তিনি গুরুর করুণা ভিক্ষা করিয়া বালকের ন্যায় রোদন করিতে লাগিলেন এবং এই অরণ্য হইতে উদ্ধার পাইয়া সূর্য্যদেবের মুখ দেখিবার জন্য ব্যগ্রতা প্রকাশ করিলেন। বালুকার ভীষণ উত্তাপে গোবিচন্দ্র ছটফট করিতে লাগিলেন এবং গুরুর নিকট বৃক্ষের ছায়া প্রার্থনা করিলেন। হাড়িপা এক বৃক্ষ সৃষ্টি করিলেন। গুরুশিষ্য যাইয়া সেই বৃক্ষতলে বসিলেন। রাজার প্রার্থনানুসারে হাড়িসিদ্ধার বাম হাঁটু গোবিচন্দ্রের উপাধান হইল।

তারপর রাজার মন পরীক্ষার জন্য সিদ্ধা নিদ্রিতাবস্থায় রাজাকে এক বজ্রচাপড় মারিলেন। রাজা "বাপ বাপ" না বলিয়া "গুরু গুরু" বলিয়া কান্দিয়া উঠিলেন। তারপর উভয়ে আবার

চলিতে লাগিলেন। এক মনোরম কুসুম-সমাকীর্ণ প্রশস্ত পথে চলিতে চলিতে রাণীদিগের কথা স্বভাবতঃই রাজার মনে উঠিল, তিনি গুরুকে বলিলেন "যদি ফিরিবার সময় আমাকে এই পথ দিয়া নিয়া যান, তবে রাণীদিগের জন্ম গোটা কয়েক ফুল নিয়া যাইতে পারি।" হাড়িসিদ্ধা মনে মনে কুপিত হইলেন এবং এই ধৃষ্টতার জন্ম রাজাকে সমুচিত শিক্ষা দিতে কৃত-সংকল্প হইলেন। চলিতে চলিতে রাজার নিকট গাঁজা সেবনের জন্ম বার কড়া কড়ি চাহিলেন। রাজা গাঁজার কথা শুনিয়াই তীব্র মন্তব্য প্রকাশ করিলেন এবং সগর্ব্বে বলিলেন "বার কড়া কেন বার কাহনও দিতে পারি।" হাড়িসিদ্ধা বুঝিলেন, মূর্খতার নিকট ভিক্ষা লইয়া রাজার এই অহঙ্কার। তিনি মন্ত্রবলে রাজার ঝুলি হইতে কড়িগুলি উড়াইয়া দিলেন ও কড়ির জন্ম পীড়াপীড়ি করিতে লাগিলেন। তখন—

"ঝুলিতে হস্ত দিআ রাজা পড়িয়া গেল ধান্দা।
ঝুলির কড়ি ঝুলিতে নাই গুরুবাপ এ কেমন কথা॥"

রাজা এই কথা বলিবামাত্র হাড়িসিদ্ধা "বসুমাতা"কে সাক্ষী রাখিলেন এবং রাজাকে বাঁধা রাখিবার জন্ম বন্দরে চলিলেন।

"বোল্লাচাকী কলিঙ্গার বাজার গেইছে লাগিআ।
ঐ হাটক নাগি গুরু শিস্ দ গেলত চলিআ॥"

পসার সাজাইয়া নানা দ্রব্য বিক্রয় করিবার জন্ম বহু স্ত্রীলোক বন্দরে ছিল। তাহারা সকলেই রাজার রূপ দেখিয়া তাঁহাকে একেবারে কিনিয়া ফেলিবার জন্ম ইচ্ছুক, অল্প দিনের জন্ম বাঁধা রাখিতে কাহারও মন উঠিল না।

"থাল ভরি দেই টাকা ঝোলা ভরি নেও।
বান্ধা ছান্ধার কাজ নাই এইঠে বেচাইআ জাও॥"

হাড়িপা ক্রমে রাজাকে এক হালুয়ার নিকট উপস্থিত করিলেন, কিন্তু সে বলিল—

"এমন রূপ দেখি নাই দেবের দেবস্থান।......
কি দিআ গড়ছে দেহা নাগছে জলিবার॥
যেমন রূপ আছে রাজার শরীরের উপর।
এই কি খাঠিবার পারে আমার চাষালোকের ঘর॥"

পরিশেষে হালুয়া বলিয়া দিল—"ইহার যোগ্গ থান আছে সেই হীরানটীর ঘরে॥"

হাড়িপা হালুয়াকে আশীর্ব্বাদ করিয়া হীরার বাড়ীতে পৌছিলেন এবং কাষ্ঠখণ্ড দ্বারা দাবা-ঘার প্রহার করিলেন। ভীষণ শব্দ হইল, হীরার পুরী চমকিয়া উঠিল, একি ভূমিকম্প! হীরানটীর বান্দী বাহিরে আসিয়া দেখিল এক বৈরাগীর এই কাণ্ড,—

"চক্ষু দুটা দেখা জাইছে জেন স্বরগের তারা। দন্তগুলা দেখা জাএ যাযমাসিআ মূলা॥"

সিদ্ধা জানাইলেন তিনি নটীর প্রেমপিপাসু নহেন, নিজের শিষ্যকে বাঁধা রাখিতে আসিয়াছেন। বান্দী শিষ্যকে দেখিল এবং ফিরিয়া গিয়া হীরাকে জানাইল

"যেই রাজার তরে তপ কর এ বার বছর। সেই রাজা আইছে তোমার দরজার উপর॥
যেমন রূপ আছে তার চরণের উপর। তেমন রূপ নাই তোমার কপালের উপর॥"

হীরা তখন সাজিয়া গুজিয়া বনাতের "কারোয়াল"এর উপর দিয়া হাঁটিয়া বাহিরে আসিল। হীরা অবশ্যই গোবিচন্দ্রের রূপে মোহিত হইয়া গেল, তাঁহাকে কিনিয়া ফেলিবার জন্য ব্যগ্র হইল; কিন্তু হাড়িপা জানাইলেন তাঁহার শিষ্যকে বিক্রয় করিবার অধিকার নাই, তিনি বার কড়া কড়ি পাইলে বার বৎসরের জন্য দলিল লিখিয়া দিয়া রাজাকে বন্ধক রাখিয়া যাইতে প্রস্তুত। তাহাই স্থির হইল, তিন জন মহাজন দলিলের সাক্ষী হইল। রাজা স্বহস্তে খৎ লিখিয়া দস্তখৎ করিয়া দিলেন। এই আদান-প্রদানের পর স্বভাবতঃই "খট্টমট্ট নটী হাসিয়া উঠিল।" নটী মুখ ফিরাইলে পর সিদ্ধা কড়িগুলি তাহার দরজার সম্মুখে মৃত্তিকায় পুঁতিয়া ফেলিলেন, নিজের রূপ পরিবর্ত্তন করিয়া পাতালে প্রবেশ করিলেন এবং "চৌদ্দতাল" জলের তলে যোগাসনে বসিলেন। যাইবার পূর্ব্বে আর একটী কাজ করিয়া গেলেন—

"না তিরি না পুরুষ রাজাক করাইল। কাম ক্রোধ রতি মাত্র অঙ্গ সকলি টুটাইল॥"

হীরার আদেশে রাজার "তৈলে থৈলে" স্নানটা নির্ব্বিঘ্নে সম্পন্ন হইল। সোণার পালঙ্কে তাহার জন্য অপূর্ব্ব শয্যা রচিত হইল। "টাটীর উপর এক বুক-উচল পাটী" বিছান হইল, "আসগাড়ু," "পাশগাড়ু," "শিয়রের মাহুরা" "ছয়বুড়ী পাচেরা" ইত্যাদি দ্বারা শয্যা রচিত হইল, তাহার উপর নানা সুগন্ধি দ্রব্য বর্ষিত হইল, সুবাসিত তাম্বুল ইত্যাদির বন্দোবস্ত থাকিল। রাজার অনিচ্ছা সত্ত্বেও তাঁহাকে বিবিধ রসনা-তৃপ্তিকর খাদ্যের আস্বাদ গ্রহণ করিতে হইল। মনের মত বেশভূষা করিতে হীরার অনেক সময় লাগিল। কত বারই সে সাড়ী পরিবর্ত্তন করিল এবং কত বারই কবরী বিন্যাস করিল। অবশেষে শতেশ্বরী হার প্রভৃতিতে সজ্জিত ও চন্দনে চর্চ্চিত হইয়া হীরা রাজার পালঙ্কের নিকটে গেলে এক ভৃত্য ছত্র ধরিল, এক দাসী ব্যজন করিতে লাগিল। হীরা রাজার মুখে খিলি তুলিয়া দিল, রাজা চিবাইতে চিবাইতে বিদায়কালে মায়ের উপদেশ স্মরণ করিলেন। হীরার তুমুল আয়োজন ব্যর্থ হইল। রাজা তাম্বূল ফেলিয়া দিলেন, হীরার ভালবাসা প্রত্যাখ্যান করিলেন।

"অতকে ধর্ম্মী রাজা স'রে স'রে জাএ। অভাগীআ হীরা নটী গাও ঘেসিআ জাএ"॥

রাজা নটীর উপদ্রব নিবারণের জন্য তাহাকে অনেক কথা বলিলেন।—শেষে নটীকে পরাস্ত ও অপদস্থ হইতে হইল, তাহার প্রীতি ঘৃণায় পরিণত হইল। প্রত্যাখ্যাতা হীরা রাজাকে পদাঘাতে শয্যা হইতে মৃত্তিকায় ফেলিয়া দিল। হীরার প্রতিহিংসাবৃত্তি বীভৎস আকারে দেখা দিল। রাজার বস্ত্রালঙ্কার অপসারিত হইল, তিনি প্রত্যহ করতোয়া নদী হইতে ৬২ ভার জল আনিতে আদিষ্ট হইলেন। জলের পরিমাণ কম হইলে প্রহারের ব্যবস্থা হইল। জল আনা হইলে হীরার "ভাড়ুয়া"রা রাজাকে চিৎ করিয়া ধরে এবং

"সোণার খড়ম হীরানটী চরণে নাগাআ।
রাজার বকুখে গাও ধোএছে নটী দোমাআ দোমাআ॥"

"পাপের বিছানা" তোলা এবং পাপের কড়ি গণা রাজার নিত্যকর্ম হইল। হীরার অত্যাচারে রাজা মৃতকল্প হইলেন। অদুনা ও পদুনা রাণীর নিষেধবাক্য মনে পড়িল, তাঁহাদের নাম স্মরণ পড়ায় রাজপুরীস্থ সভোর পাশা "আউলাইয়া পড়িল", অদুনা ও পদুনা রাণী কান্দিতে লাগিল, তাহাদের ভয় হইল রাজা বুঝি আর ইহলোকে নাই। রাণীদিগের রোদনে গৃহপালিত শুক ও শারী বিকল হইল এবং রাজার অন্বেষণে যাইবার জন্য অনুমতি প্রার্থনা করিল। বন্ধনমুক্ত হইয়া তাহারা নানাদেশে রাজাকে খুঁজিয়া বেড়াইতে লাগিল। গোবিচন্দ্রের ন্যায় এক ব্যক্তিকে জল ভরিতে দেখিল এবং তাঁহার মস্তকের উপর উড়িতে লাগিল। গোবিচন্দ্রও দেখিলেন পক্ষী দুইটী তাঁহার পালিত পক্ষীর ন্যায়, তিনি কান্দিতে লাগিলেন; পক্ষীরা তখন তাঁহাকে নাম ধরিয়া ডাকিল, রাজা চমৎকৃত হইলেন—

"এওপানে কেউ নাই রঙ্গের বাপ ভাই। নাম ধরিআ কে ডাকাইলি বঙ্গের গোঁসাই॥"

পক্ষিদ্বয় তখন নিজমুখে রাজার পরিচয় লইয়া তাঁহার বাহুর উপর উড়িল এবং তাঁহার দুঃখবৃত্তান্ত আমূল শ্রবণ করিল। রাজা দেখাইলেন প্রহারে তাঁহার পঞ্জরে অস্থি পর্য্যন্ত ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। পক্ষীদিগের অনুরোধে রাজা স্নান করিলেন এবং রাজ্ঞীদিগের প্রদত্ত নাড়ু তাহাদিগের সহিত ভাগ করিয়া খাইলেন। তারপর "নাকর পাকর" দুইটী পত্র আনিয়া এবং দন্তদ্বারা এক লেখনী প্রস্তুত করিয়া, বাম উরুর রক্তদ্বারা দুইখানি পত্র লিখিলেন; একখানি অদুনা রাণীর সেখানি ব্যঙ্গোক্তিপূর্ণ—অপর খানি ময়নামতীর নিকট, তাহা করুণবিলাপোক্তিপূর্ণ। পক্ষিদ্বয় যথাস্থানে পত্র প্রদান করিল। ময়নামতী চরকা কাটিতে ছিলেন, পত্র পড়িয়া জলিয়া উঠিলেন, কত আশায় তিনি পুত্রকে হাড়িপার হস্তে সমর্পণ করিয়াছেন, সেই হাড়িপার এই কাজ! ময়নামতী ধ্যানে বসিলেন, তারপর—

"বজ্রচাপড় হাড়িক মএনা মারিলে তুলিআ। যেখানে আছিল হাড়ি উঠিল চমকিআ॥"

হাড়িসিদ্ধার অনুতাপ হইল,—এতকাল তিনি রাজপুত্রকে এই অবস্থায় রাখিয়াছেন, কোন খোঁজ খবর নেন নাই। তখনই হাড়িসিদ্ধা গোবিচন্দ্রকে উদ্ধার করিতে যাত্রা করিলেন। বিরাশী ক্রোশ অন্তর পা ফেলিয়া হাড়িসিদ্ধা অচিরেই করতোয়ার ঘাটে উপস্থিত হইলেন। রাজার তখন বার ভার জলের মধ্যে এক ভার তোলা বাকী, তিনি গুরুকে দেখিয়া জলতোলা বাঁক নদীতে ভাসাইয়া দিলেন, ঘড়া দুইটা ভাঙ্গিয়া ফেলিলেন। হাড়িসিদ্ধা রাজাকে আপন ঝোলার মধ্যে লুকাইয়া রাখিলেন এবং হীরার বাড়ীতে পৌঁছিয়া যথারীতি দামামায় ঘা মারিলেন। হীরার বান্দী আসিয়া হাড়িপাকে দেখিল এবং অন্তঃপুরে হীরাকে সংবাদ দিল যে, হাড়ি রাজাকে উদ্ধার করিতে আসিয়াছে। তখন হীরার মনে ভয় হইল, রাজাকে রাজপুত্র সাজাইয়া হাড়িপার নিকট উপস্থিত করিবার জন্য বিপুল আয়োজন করিতে লাগিল। কিন্তু রাজা কোথায়? নদীতীরে রাজা মিলিল না, তৈল-খৈল এবং বহুমূল্য পরিচ্ছদ বান্দীর হস্তেই রহিয়া গেল; বান্দী ভগ্ন জলপাত্র দেখিয়া হীরাকে জানাইল রাজার মৃত্যু হইয়াছে। সিদ্ধা রাজাকে খালাস করিবার অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়া তাঁহাকে আনিবার জন্য পীড়াপীড়ি করিতে লাগিলেন।

অনেক চৌর রাজাকে খুঁজিয়া পাওয়া গেল না, হীরা সিদ্ধার চরণে পড়িল। তখন হাড়িপা রাজাকে খোলা হইতে বাহির করিলেন এবং বারকড়া কড়ি হীরাকে প্রত্যর্পণ করিয়া খত ছিঁড়িয়া ফেলিয়া রাজার উদ্ধার সাধন করিলেন। তারপর হীরার শাস্তির ব্যবস্থা হইল। অতঃপর গোবিন্দচন্দ্র রাজধানীতে চলিলেন। রাজধানীতে প্রত্যাগমনের সময় পথে আসল কাজটা হাসিল হইল,—রাজার জ্ঞানশিক্ষা হইল।

এবার রাজা বেশ পরিবর্ত্তন করিয়া এক ভিক্ষুকের ন্যায় রাজপুরীতে পৌছিলেন। তখন কথা উঠিল, "কোন্ পুরুষ রাজাজ্ঞা অমান্য করিয়া এই পুরীতে প্রবেশ করিতে সাহসী হইল?" অদুনা ও পদুনা রাণীর আদেশে হেঙ্গল কুকুরগুলিকে বন্ধনমুক্ত করিয়া রাজার উপর ছাড়িয়া দেওয়া হইল, কিন্তু তাহারা রাজার অনিষ্ট করা দূরে থাকুক, তাঁহার পায়ে পড়িয়া কাঁদিতে লাগিল, মত্ত হস্তীও তাহাদেরই পন্থা অবলম্বন করিল। বান্দীগণ ভিক্ষা লইয়া আসিল, কিন্তু রাজা বান্দীর হস্তে ভিক্ষা লইলেন না। তখন অদুনা ও পদুনা রাণী উভয়ে ভিক্ষা দিতে অগ্রসর হইলেন, কিন্তু রাজা "তিরি" লোকের হাতের ভিক্ষা লইবেন না, তাহাদের "মাথার ছত্তর" অর্থাৎ স্বামীকে চাই। রাণীরা ভিক্ষুকের হস্তে রাজার অঙ্গুরীয় দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি ইহা কোথায় পাইলে?" ভিক্ষুক-বেশধারী রাজা বলিলেন, "তোমাদের রাজা ও আমি এক গুরুর শিষ্য ছিলাম, একদিন 'পইল সাঁঝে' আমরা গৃহস্থের বাড়ীতে অতিথি হইলাম, তোমাদের রাজা ভেদের পীড়ায় পঞ্চত্ব লাভ করিয়াছে এবং

"কাখো দিলে ঝুলি খেল্‌কা কাখো গোপালডান। ভাবত থাকি শ্রীআঙ্গুট মোক কল্লে দান॥"

রাণীরা বিশ্বাস করিলেন এবং ছুরিকাহস্তে আত্মহত্যা করিতে উদ্যত হইলেন। রাজা আর থাকিতে পারিলেন না—আপনার পরিচয় দিলেন।

"যখনে ধর্ম্মী রাজা মহলে সোন্দাইল। দুআরের জোড়নাগরা বাজিআ উঠিল॥"

তৎপরে রাজা কালবিলম্ব না করিয়া সোণার ভোমরা হইয়া ফেরুসা-নগরে উড়িয়া গেলেন এবং ময়নামতীর চরকা মন্ত্রবলে উড়াইয়া দিলেন।

"ও মএনা পাইছে গোরখনাথের বর। উড়িআ জাইতে ধরলে মএনা চরকার ছত্তর॥"

পরে মাতা ও পুত্রে মিলন হইল, গোবিন্দচন্দ্রের রাজধানীতে আনন্দের স্রোত বহিল। নাপিত রাজার মস্তক মুণ্ডন করিল। হস্তী রাজাকে তুলিয়া সিংহাসনে বসাইল, বীরসিংহ ভাণ্ডারী মুলুকের হিসাব দিতে লাগিল। নজর প্রণামী বিস্তর জুটিল। ময়নার হুকারে দেবগণ পর্য্যন্ত আসিয়া এই উৎসবে যোগ দিলেন। খাজনা পুনরায় দেড়বুড়ি স্থির হইল, প্রজার সুখের দিন ফিরিয়া আসিল।'[১১]

(১১) শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের 'ময়নামতীর গান' প্রবন্ধ হইতে গৃহীত। বিশ্বেশ্বর বাবু আদ্যোপান্ত "গোপীচন্দ্র" নাম গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার সংগৃহীত ময়নামতীর গানের মধ্যে "গোবিন্দাই" শব্দ, আসামে প্রাচীন গায়কের মুখে 'গোবিচন্দ্র' এবং রাঢ়, উৎকল, এমন কি সুদূর মহারাষ্ট্রে 'গোবিচন্দ্র' ও 'গোবিন্দ-চন্দ্র' নাম উক্ত থাকায় গোপীচন্দ্র, গোবিচন্দ্র ও গোবিন্দচন্দ্র এই নামত্রয় অভিন্ন বলিয়া গৃহীত হইল।

মাণিকচাঁদ বা ময়নামতীর উক্ত গান অদ্যাপি রঙ্গপুর, আসাম ও পূর্ব্ববঙ্গের স্থানে স্থানে প্রচলিত আছে। যদিও পরবর্ত্তী কালে নানা ধর্ম্মসম্প্রদায় বিশেষতঃ কণ্‌ফট্ যোগিগণের প্রভাবে এই গান অনেকটা রূপান্তরিত হইয়াছে, কিন্তু ইহার ভিতর তান্ত্রিক বৌদ্ধ-প্রভাবের পূর্ণ নিদর্শন বিদ্যমান। আমরা এই গান হইতে সে সময়ের সমাজ-চিত্র, আচার-ব্যবহার, প্রাচীন বঙ্গীয় রাজগণের আদবকায়দা ও রাজপুরীর অবস্থার কতকটা আভাস পাইতেছি। পূর্ব্বেই লিখিয়াছি যে, গৌড়াধিপ ১ম মহীপালের সময় দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান অতীশের অভ্যুদয়। তাঁহার জীবনীলেখকগণ তাঁহাকে বিক্রমপুর-রাজকুমার ও বজ্রাসনবাসী বলিয়া পরিচিত করিয়াছেন। বলা বাহুল্য, বঙ্গাধিপ পরমসৌগত শ্রীচন্দ্র বিক্রমপুর হইতে আপনার তাম্রশাসন দান করিয়াছেন। তাঁহার সময়ে বিক্রমপুর বৌদ্ধদিগের একটি কেন্দ্র বলিয়া পরিচিত ছিল। বর্ত্তমান ঢাকাজেলাস্থ মাণিকগঞ্জ মহকুমার মধ্যে ধামরাই, শুয়াপুর ও বাজাসনের ভিটা বর্ত্তমান। ঐ তিনটি নামই যথাক্রমে বৌদ্ধশাস্ত্রোক্ত ধর্ম্মরাজিকা, সুখাবতীপুর ও বজ্রাসনের অপভ্রংশ। বৌদ্ধ-প্রভাবের পূর্ণ নিদর্শন বিক্রমপুররাজের অধীন উক্ত বজ্রাসনেই সম্ভবতঃ অতীশদীপঙ্কর অবস্থান করিতেন। বলা বাহুল্য, তিনি এখানকার তান্ত্রিক গুরুরই শিষ্য ছিলেন এবং তাঁহার পূর্ব্ব হইতেই এখানে বৌদ্ধ তান্ত্রিক-মত বিশেষ ভাবে প্রচলিত ছিল। মাণিকচাঁদ বা ময়নামতীর গানে সেই অতীত তান্ত্রিক-প্রভাবেরই পরিচয় পাইতেছি। তিব্বতীয় টেঙ্গুর গ্রন্থে বহু তান্ত্রিক-গ্রন্থ রচয়িতা সিদ্ধাচার্য্য-হড্ডিপপাদের উল্লেখ আছে, তিনিই বোধ হয় মাণিকচন্দ্র ও গোবিন্দচন্দ্রের গানে হাড়ীসিদ্ধানামে পরিচিত হইয়াছেন। তিনি যে জাতিতে হাড়ী ছিলেন না, সে কথা উক্ত গ্রন্থসমূহে স্পষ্টই লিখিত আছে। তাঁহার আদিবাস জালন্ধর (বর্ত্তমান কাঙ্‌ড়া)। এজন্য তিনি তিব্বতীয় গ্রন্থে জালন্ধরাচার্য্য ও গোবিন্দচন্দ্রের গানে জালন্ধরী নামে বর্ণিত হইয়াছেন।

"পাটিকানগরে রাজা গোবিন্দচন্দ্র ভূপ।
জালন্ধরী হাড়ীপা হইল হাড়িরূপ ॥" (দুর্ল্লভমল্লিকের গোবিন্দচন্দ্রগীত)

কিন্তু তিনি বহুকাল বঙ্গদেশে বাস করায় ময়নামতীর গানে 'বঙ্গদেশী' বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন। রাজা গোবিন্দচন্দ্রকে লইয়া তিনি যেরূপ খেলা খেলিয়াছেন, তাহাতে তাঁহাকে একজন অসাধারণ তান্ত্রিক সিদ্ধ বলিয়াই মনে হয়, এবং এই জন্যই তিনি 'সিদ্ধাচার্য্য' বা 'সিদ্ধা' বলিয়া পরিচিত হইয়াছিলেন। তৎকালে তান্ত্রিক সিদ্ধগণ অনেক অসাধ্য সাধন করিতে পারিতেন। মাণিকচন্দ্রের গানে, গোবিন্দচন্দ্রের গীতে ও ময়নামতীর গানে তাহার পরিচয় পাইতেছি। রাণী ময়নামতী তিলোক বা ত্রৈলোক্যচন্দ্রের কন্যা বলিয়া অভিহিতা। পূর্ব্বেই লিখিয়াছি, শ্রীচন্দ্রদেবের তাম্রশাসন হইতেও জানা যায় যে, তিনি রাজা ত্রৈলোক্যচন্দ্রের পুত্র। এরূপ স্থলে ময়নামতীকে শ্রীচন্দ্রদেবের ভগিনী এবং মাণিকচন্দ্রকে ভিন্ন বংশীয় বলিয়া ধরিয়া লইতে হয়। মাণিকচন্দ্র ও তাঁহার পূর্ব্বপুরুষগণ সম্ভবতঃ পূর্ব্ব-বঙ্গের উত্তর অংশে এবং শ্রীচন্দ্রের পূর্ব্বপুরুষগণ দক্ষিণাংশে রাজত্ব করিতেন। হয়ত

মাণিকচন্দ্রের নিকট হইতেই শ্রীচন্দ্র বঙ্গাধিপত্য গ্রহণ করেন এবং তাঁহাকে উত্তরাংশে গিয়া আধিপত্য করিতে হয়। তাঁহার মৃত্যুর পর সম্ভবতঃ রাণী ময়নামতী আপনার অসাধারণ প্রভাবে সমস্ত বঙ্গরাজ্য উদ্ধার করিয়াছিলেন। তৎকালে সিদ্ধাচার্য্যগণই 'বজ্রডাক' বা কেবল 'ডাক' নামে এবং ঐরূপ সিদ্ধা স্ত্রীগণ বজ্রযোগিনী, বজ্রডাকিনী বা কেবল ডাকিনী বলিয়া খ্যাত হইতেন। ময়নামতী ঐরূপ একজন তান্ত্রিক সিদ্ধা ছিলেন, এই কারণে 'ময়নামতীর গানে' তিনি 'ডাহিনী' বা 'ডাকিনী' বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। ময়নামতী গোরক্ষনাথের শিষ্যা। গোরক্ষনাথই প্রথমে 'বজ্রাচার্য্য রমণবজ্র' নামে পরিচিত ছিলেন। তিনি মূলতঃ বৌদ্ধসমাজভুক্ত হইলেও পরে তাঁহার কতকগুলি স্বতন্ত্রমতের জন্য বৌদ্ধ-সাম্প্রদায়িকগণ তাঁহাকে বিরুদ্ধধর্ম্মাবলম্বী বলিয়া মনে করিতেন, এ জন্যই গোরক্ষনাথের গুরু মীননাথ নেপালের বৌদ্ধসমাজে 'মৎস্যেন্দ্র' নামে অদ্যাপি পূজিত হইলেও তাঁহারা কেহই গোরক্ষনাথকে সম্মান করেন না। গোরক্ষনাথ এখন নেপালের শৈবসম্প্রদায়মধ্যে এবং ভারতের সর্ব্বত্র কণ্‌ফট্‌-যোগীদিগের নিকট পূজিত হইতেছেন।

পূর্ব্ববঙ্গবাসী যোগীজাতির ধারণা ময়নামতীর চারি জায়গায় বাড়ী ছিল—১ম কুলিকনগরে (বর্ত্তমান রঙ্গপুর বা দিনাজপুর জেলায়), ২য় চট্টগ্রামে, ৩য় বিক্রমপুরে এবং ৪র্থ ত্রিপুরায় লালমাই-পাহাড়ে ময়নামতী নামক স্থানে। এই প্রবাদ হইতে মনে হয় যে, সমস্ত পূর্ব্ববঙ্গেই ময়নামতীর প্রভাব বিস্তৃত হইয়াছিল। ময়নামতীর গানেও পাওয়া যায় যে, রাজা গোবিন্দচন্দ্রের পিতৃভূমি গৌড়, মাতামহের স্থান কামলাঙ্ক বা কুমিল্লা, মাতৃস্থান কুলিকনগর এবং তাঁহার নিজের স্থান মেহারকুল; ৪০ জন রাজা তাঁহাকে কর দিতেন। যথা—

"ময়ানগর জাবে উনশত বাণিয়া ॥
বাপের নিবাস এরি জাইমু গৌর সহর।
দাদার নিবাস এরি জাব কামলাঙ্কনগর ॥
তুমি মাএর জত বাড়ী কুলিকনগর।
আমি বান্ধিয়াছি মেহারকুল সহর ॥
চল্লিশ রাজায় কর দেএ আমার গোচর।
আমা হোতে কোন জন আছয়ে ডাঙ্গর ॥"

দিনাজপুর জেলার রায়গঞ্জ থানার অধীনে 'সুলতান হোসেন-শাহের পাটের' কিছু দূরে গোবিন্দপুর নামে একটি প্রাচীন গ্রাম এবং এই গ্রামের অদূরে কুলিকনদী রহিয়াছে। এই নদী বরাবর উক্ত থানার অধীন পাতালঘরার কিছু দূর দিয়াও গিয়াছে। এই সুপ্রাচীন বহু ধ্বংসাবশেষপূর্ণ পাতালঘরার অদূরেই সাধারণে 'হাড়ীভিটা' দেখাইয়া থাকে। কুলিকনদীর নিকটস্থ গোবিন্দপুরের কি অপর নাম কুলিকনগর এবং বহু ইষ্টক ও প্রস্তরখণ্ডাচ্ছাদিত 'হাড়ীর ভিটা' নামক উক্ত প্রাচীন স্তূপই কি সিদ্ধাচার্য্য হাড়িপার স্মৃতিজ্ঞাপক?

এদিকে প্রবাদ অনুসারে সাভারের রাজা হরিচন্দ্র বা হরিশ্চন্দ্র বঙ্গাধিপ গোবিন্দচন্দ্রের শ্বশুর বলিয়া কথিত। এখন গোবিন্দচন্দ্রের মাতৃকুল, পিতৃকুল ও শ্বশুরকুল হইতে মনে হইতেছে যে, পূর্ব্ববঙ্গে চন্দ্র-উপাধিধারী বিভিন্ন বংশ রাজত্ব করিতেন, তাঁহারা সূর্য্য অথবা চন্দ্রবংশ বলিয়াই পরিচিত হইতেন। তিব্বতীয় তারনাথ ঐ বিভিন্ন বংশকে এক করিয়া ফেলিয়াছেন, তাই তাঁহার পরিগৃহীত নামমালায় ব্যবহৃত রাজগণ প্রকৃত পক্ষে কতকটা ঐতিহাসিক হইলেও উক্ত তালিকায় ঐতিহাসিক পৌর্ব্বাপর্য্য রক্ষিত হয় নাই।

যাহা হউক, চন্দ্রবংশের মধ্যে গোবিন্দচন্দ্রের নামই ভারতপ্রসিদ্ধ। যে সময় পাল-বংশের সহিত সমস্ত ভারতের সংস্রব ঘটিয়াছিল, যে সময় ভারতের দিগ্বিজয়ী নৃপতিবর্গ গৌড়বঙ্গের ঐশ্বর্য্য ও প্রতিভার পরিচয় পাইয়া লোলুপদৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছিলেন, গৌড়বঙ্গের সেই স্বর্ণযুগের অবসানকালে গোবিন্দচন্দ্রের অভ্যুদয়। সম্ভবতঃ কাঞ্চিপতি রাজেন্দ্রচোলের বঙ্গবিজয়কালে গোবিন্দচন্দ্র বৈরাগ্য অবলম্বন করিয়াছিলেন, সুতরাং রাজেন্দ্রচোলের বঙ্গজয় সহজসাধ্য হইয়াছিল। এই সময় কেবল গৌড়বঙ্গবাসী বলিয়া নহে, কাঞ্চিপতির সহযাত্রী দাক্ষিণাত্য বীরগণও করুণ-রসাত্মক গোবিন্দচন্দ্রের বৈরাগ্য-গাথা শুনিয়া মুগ্ধ হইয়াছিলেন, তাই কেবল বঙ্গীয় সাহিত্য বলিয়া নহে, উৎকল, তৈলঙ্গ, দ্রাবিড়, মহারাষ্ট্র, মধ্যপ্রদেশ ও রাজপুতানার প্রাচীন সাহিত্যে বঙ্গাধিপ গোবিন্দচন্দ্রের গীতি স্থান লাভ করিয়াছে, এবং অদুনা-পদুনার নিকট হইতে গোবিন্দচন্দ্রের বিদায়-চিত্র আজও সুদূর দাক্ষিণাত্যের সম্ভ্রান্ত জনগণের গৃহ অলঙ্কৃত করিতেছে। গোবিন্দচন্দ্র যে গৌড়াধিপ মহীপালের সমসাময়িক ছিলেন, তাহাও আমরা ময়নামতীর গান হইতে পাইয়াছি—

"ধর্ম্মপাল নামে ছিল রাজা অধিপতি।
কদলীপাটন নাম তাহার বসতি॥
তাহার বংশে রাজা হৈল মহীপাল নাম।
শান্ত দান্ত সুশীল মহা গুণধাম॥"[১২]

কোন কোন আধুনিক গায়ক মহীপালকে মাণিকচাঁদের পিতা বলিয়া উল্লেখ করেন। তাহার কারণ একই সময় মহীপাল ও গোবিন্দচন্দ্রের গান প্রচলিত ছিল এবং উভয় গানের মধ্যে একই সম্বন্ধ রাখিবার চেষ্টা হইয়াছিল। বাস্তবিক পূর্ব্বতন গানগুলিতে কোথাও এ কথা নাই। সম্ভবতঃ পূর্ব্ববঙ্গের উত্তরাংশে কদলীপাটন নামক স্থানে গৌড়াধিপ প্রথম ধর্ম্মপালের অভ্যুদয় হইয়াছিল এবং তাঁহারই বংশে মহীপাল জন্মগ্রহণ করেন,—

(১২) শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য মহাশয় এইরূপ পাঠ উদ্ধার করিয়াছেন—

"ধর্ম্মপাল নামে ছিলা রাজা অধিপতি।
কদলী সহরে গ্রাম তাঁহার বসতি॥
তাঁহার পুত্র রাজা মৌপাল নাম।"

কিন্তু এই পাঠ অপেক্ষা উপরি উদ্ধৃত পাঠই সমীচীন বলিয়া মনে হয়

বহু পূর্ব্বকাল হইতেই এ বিশ্বাস গায়কদিগের মধ্যে ছিল, তাই পরবর্ত্তী কালে কেহ মহী-পালকে গোবিন্দচন্দ্রের পিতামহ বলিয়া কল্পনার মাত্রা বাড়াইয়াছেন। খুব সম্ভব গোবিন্দচন্দ্র সিদ্ধিলাভ করিয়া ফিরিয়া আসিয়া আর সংসারী হন নাই, গায়কেরা শেষে মিলন পাইবার অভিপ্রায়ে পুনরায় রাজ্যগ্রহণের আভাস দিয়াছেন।[১৩]

গোবিন্দচন্দ্রের পর কেহ কেহ তৎপুত্র ভবচন্দ্র বা উদয়চন্দ্রের উল্লেখ করিয়াছেন। তৎপরেই উত্তর-পূর্ব্ববঙ্গ হইতে চন্দ্রবংশের অবসান হয়, কিন্তু তৎপরেও কিছুকাল চন্দ্রদ্বীপ শ্রীচন্দ্রদেবের বংশধর বা আত্মীয়স্বজনের অধিকারভুক্ত ছিল বলিয়াই মনে হয়। তন্মধ্যে রাজা চাণক্যচন্দ্র একজন। এই চাণক্যচন্দ্রের অনুরোধে মহাকবি উমাপতিধর 'চন্দ্রচূড়চরিত' রচনা করেন।

যেরূপ পালবংশধরগণ উত্তরকালে কায়স্থ-সমাজের অন্তর্নিবিষ্ট হইয়া গিয়াছেন, চন্দ্রবংশ সম্বন্ধে এরূপ প্রকৃত পরিচয়ের অভাব। এই বংশের এক ধারা পালবংশের জ্ঞাতিত্ব-নিবন্ধন সূর্য্যবংশ ও অপর ধারা চন্দ্রবংশ বলিয়া প্রথিত হইলেও পরবর্ত্তী কালে পালবংশের ন্যায় ইঁহারা অনেকেই কায়স্থ-সমাজভুক্ত হইয়াছিলেন বলিয়া মনে হয় না। বঙ্গীয় কায়স্থ-সমাজে মিত্রগুপ্তি-ধর কায়স্থের মধ্যে কুলগ্রন্থে ভরদ্বাজ, শাণ্ডিল্য, আলম্যান ও কাশ্যপ এই চারি প্রকার 'পাল' এবং রোহিত-ভরদ্বাজ ও কাশ্যপ এই দুই প্রকার 'চন্দ্র' বংশের পরিচয় আছে।[১৪] ইঁহাদের মধ্যে রোহিত-ভরদ্বাজগোত্র কেবল ভরদ্বাজ নামেও পরিচয় দিয়া আসিতেছেন, ইঁহাদিগকে আমরা শ্রীচন্দ্রদেবের তাম্রশাসন-বর্ণিত 'রোহিতাগি'[১৫] রাজ-বংশ বলিয়া মনে করিতে পারি। আমাদের মনে হয়, চন্দ্রবংশের মধ্যে বৌদ্ধধর্ম্মের গোড়ামি ত্যাগ করিয়া যাঁহারা সেন-বংশের অভ্যুদয়কালে ব্রাহ্মণ্যশাসনাধীন হন নাই, তাঁহারা সম্ভবতঃ কায়স্থ-সমাজভুক্ত হইতে পারেন নাই, তাঁহারাই দুর্ল্লভ মল্লিকের গোবিন্দচন্দ্রের গীতে 'বাণিয়া জাতি ক্ষেত্রীকুল' বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন এবং অধুনা-বণিক্‌সমাজে 'চন্দ্র' বা 'চন্দ' উপাধিতেই পরিচিত হইতে-ছেন।[১৬] বিপ্র গোবর্দ্ধনের বণিক্‌কুলকারিকায় "সূর্য্যবংশসমুদ্ভূতঃ চন্দঃ শ্রীরোহিতাগিরিঃ" নামেই তাঁহাদের বীজপুরুষ পরিচিত। এইরূপ পালবংশেরও বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী একধারা বণিক্-সমাজে মিলিত হইয়াছিলেন।[১৭]

(১৩) ঢাকা-সাহিত্য-পরিষৎ হইতে প্রকাশিত প্রতিভায় (১৩২০ সাল) 'ময়নামতীর গান' মুদ্রিত হইতেছে।

(১৪) "চন্দ্রবংশেষু রোহিত-ভরদ্বাজকাশ্যপৌ।
ভরদ্বাজশ্চ শাণ্ডিল্য আলম্যানশ্চ কাশ্যপঃ। পালবংশেষু বিখ্যাতমিতি গোত্রচতুষ্টয়ং।"
(রাঢ়ীয়-কায়স্থ-কুলপঞ্জিকা)

(১৫) ২০০ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

(১৬) ১৪১৪ শকে গোবর্দ্ধনরচিত বণিক্‌কুলকারিকায় লিখিত আছে—
"কনকা বৈশ্যকন্যা চ দাসী নৃপবরস্য চ। কনকাগর্ভসম্ভূতঃ সনকো বণিগুত্তমঃ।
কনকস্ক্রিয়খ্যাতি কথিতং ইতি কারণম্। তথাচ—
খ্যাতশ্রীবণিকাগ্রণী জয়পতি আদিত্যবংশোদ্ভবঃ চন্দখ্যাতিধরাজকে সুবণিকং বাণিজ্যধর্মাদিকম্।
বৈশ্যঃ পঞ্চদশবিশিষ্টনিকরৈঃ চন্দ্রেণ সম্মিলিতঃ তে সর্ব্বে বণিজো ভবন্তি বিদিতাং সংস্থাপিতঃ ভূপতিঃ।"
(৭ম-৮ম শ্লোক)

(১৭) বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস, বৈশ্যকাণ্ড, ৫মাংশে বিস্তৃত বিবরণ প্রকাশ।

বর্ম্মবংশ বা যাদববংশ

যে সময়ে বরেন্দ্রে বা গৌড়ে পালবংশ, বঙ্গে চন্দ্রবংশ ও রাঢ়ে শূরবংশ আধিপত্য করিতে ছিলেন, সেই সময়েই প্রথিত বর্ম্মবংশের অভ্যুদয়। হরিবর্ম্মদেবের বেজনীসার-তাম্রলেখ, ভট্ট ভবদেবের অনন্তবাসুদেবপ্রশস্তি এবং ভোজবর্ম্মার বেলাব-তাম্রলেখ হইতে বর্ম্মবংশের সমসাময়িক সংক্ষিপ্ত ইতিহাস উদ্ঘাটিত হইয়াছে।

বর্ম্মবংশের অভ্যুদয়

বঙ্গাধিপ হরিবর্ম্মদেবের বেজনীসার-তাম্রলেখের প্রথমাংশ অগ্নিদাহে অস্পষ্ট হওয়ায় তাঁহার পূর্ব্ব-পুরুষগণের পরিচয় অজ্ঞাত রহিয়াছে। কিন্তু এই প্রথমাংশের শেষভাগে তাঁহার যে পিতৃ-নাম পাওয়া যাইতেছে, এক সময়ে 'জ্যোতিবর্ম্মা' বলিয়া যাহা গ্রহণ করিয়াছিলাম,[১] এক্ষণে মূল-লিপির প্রতিকৃতির সহিত বেলাব-তাম্রলেখ-গৃহীত ভোজবর্ম্মার পিতামহের নামাংশ মিলাইয়া অবিকল সাদৃশ্য লক্ষিত হইতেছে।[২] উভয় লিপির অক্ষরের ছাঁদও ঠিক একই প্রকার। উভয় তাম্রশাসনেই "খলু বিক্রমপুরসমাবাসিত-শ্রীমজ্জয়স্কন্ধাবারাৎ-মহারাজাধিরাজ * * বর্ম্মপাদানুধ্যাত পরমেশ্বর পরমবৈষ্ণব পরমভট্টারক মহারাজ শ্রী * * * * শ্রীপৌণ্ড্রভুক্ত্যন্তঃ-পাতি"—এক রূপই লিখিত হইয়াছে। ইত্যাদি কারণে ভোজবর্ম্মার পিতামহ ও হরিবর্ম্মার পিতা অভিন্ন বলিয়াই মনে হইতেছে। ভোজবর্ম্মার তাম্রশাসন আলোচনা করিলেও বুঝা যায় যে, এই শাসন-লিপির মধ্যে তৎপূর্ব্ববর্ত্তী হরিবর্ম্মনরপতির ইঙ্গিত আছে।[৩] এই ইঙ্গিত হইতেও আমরা হরিবর্ম্মা ও ভোজবর্ম্মাকে যাদববংশসম্ভূত বলিয়াই মনে করি। উক্ত বেলাব-তাম্রলেখে বিবৃত হইয়াছে, 'বর্ম্মা উপাধিধারী হরির বান্ধব বা পিতৃবংশ বর্ম্মন্ এই অতিগভীর নাম ধারণ-পূর্ব্বক শ্লাঘ্য ভুজযুগল লইয়া মৃগেন্দ্রগণের গুহার মত সিংহপুর আশ্রয় করিয়াছিলেন',[৪] এই প্রমাণে হরিবর্ম্মার পিতৃবংশকে সিংহপুরবাসী যাদববংশ বলিয়া স্বীকার করিতে পারি।

'সিংহপুর মৃগেন্দ্রের গুহার মত' উল্লেখ থাকায় এই স্থান গুহাবেষ্টিত বা পার্ব্বত্য ভূভাগ বলিয়াই মনে হইতেছে। অধুনা হিমালয়-প্রদেশে দেরাদুন জেলায় মড়া নামে একটি সুপ্রাচীন

(১) বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস, ব্রাহ্মণকাণ্ড, ৩য়াংশ, ২১৫ পৃষ্ঠা।

(২) ভোজবর্ম্মার তাম্রশাসনে তাঁহার পিতামহের নাম 'জাত্রবর্ম্মা' 'জালবর্ম্মা' বা 'জাতবর্ম্মা' দেখা যায়। এই নামের 'জাত' বা 'জাল' শব্দের পাঠ সন্দেহজনক। এ সম্বন্ধে ঢাকা-রিভিউ ও সম্মিলন ১৩১৯ সাল, ৩১৪ পৃষ্ঠায় বিস্তৃত ভাবে আলোচনা করিয়াছি। হরিবর্ম্মার তাম্রশাসনবর্ণিত তাঁহার পিতৃনামটিও ঠিক এইরূপ একই ভাবে উৎকীর্ণ হইয়াছে।

(৩) মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদশাস্ত্রী মহাশয় বেলাব-তাম্রলেখের ৩য় হইতে ৫ম শ্লোকের মধ্যে বঙ্গাধিপ হরিবর্ম্মদেবের ইঙ্গিত আছে, আমাকে প্রথম দেখাইয়া দেন।

(৪) "বর্ম্মাণোহতিগভীরনামদধতঃ শ্লাঘ্যৌ ভুজৌ বিভ্রতো
ভেজুঃ সিংহপুরং গুহামিব মৃগেন্দ্রাণাং হরের্ব্বান্ধবাঃ।"৫

গ্রাম আছে, এই গ্রামের 'লক্ষা-মণ্ডল'নামক মন্দিরটি অতি প্রাচীন।[৫] তন্মধ্যে খৃষ্টীয় ৭ম শতাব্দীর অক্ষরে উৎকীর্ণ শিলালিপি আছে। সেই লিপি হইতে জানা যায় যে, এখানে সিংহপুরে কলিযুগের আরম্ভ হইতে যাদব-বংশীয় বর্ম্মরাজগণ রাজত্ব করিতেন। সেই শিলাফলকে বর্ম্মবংশীয় ১২ জন রাজার নাম পাওয়া গিয়াছে। শেষ বর্ম্মরাজ ভাস্করের কন্যা জালন্ধররাজকুমার চন্দ্রগুপ্তের পত্নী ঈশ্বরা দেবী কর্ত্তৃক উক্ত মন্দিরপ্রতিষ্ঠা উপলক্ষে শিলাপ্রশস্তি উৎকীর্ণ হইয়াছিল।[৬] খৃষ্টীয় ৭ম শতাব্দে চীনপরিব্রাজক যুয়ন্-চুঅঙ্ এই সিংহপুরে আসিয়াছিলেন। তাঁহার আগমনকালে পার্ব্বত্য সিংহপুর-রাজ্য কাশ্মীরের কর্কোট-নাগবংশীয় কায়স্থ-রাজবংশের শাসনাধীন হইয়াছিল।[৭] বলা বাহুল্য, এখানে বর্ম্মবংশ বহুকাল সামন্তনৃপতিরূপেই আধিপত্য করিতেছিলেন।[৮]

সিংহপুরের অবস্থান

বঙ্গাধিপ ভোজবর্ম্মার তাম্রশাসনে লিখিত আছে—'অনন্তর কোন সময়ে যাদবসেনার সমর-

(৫) Dr. Furher's List of Antiquarian Remains in N. W. P. Vol. I.

(৬) Epigraphia Indica, Vol. I. p. 11 উক্ত শিলাফলক হইতে এইরূপ বংশলতা বাহির হইয়াছে—
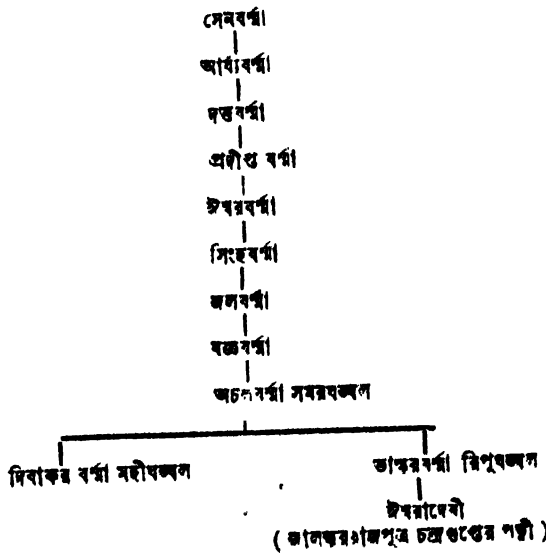
উক্ত শিলাফলকখানি রোহীতকনিবাসী দত্তনাগের পুত্র ঈশ্বরনাগকর্ত্তৃক উৎকীর্ণ হইয়াছিল। (Ep. Ind. Vol. I. p. 14.) এই রোহীতকের সহিত শ্রীচন্দ্রদেবের তাম্রশাসনবর্ণিত 'রোহিতাগি'র কোন সম্বন্ধ আছে কি না অনুসন্ধেয়।

(৭) Watter's Yuan Chuang, Vol. I.

(৮) বর্ম্মবংশের পূর্ব্ব-পরিচয়ে যেরূপ বঙ্গাগত বর্ম্মবংশের পূর্ব্বপুরুষগণ পার্ব্বত্য (হিমালয়স্থ) সিংহপুর হইতে বাহির হইবার প্রসঙ্গ পাইতেছি, সেইরূপ আবার হিমালয় প্রদেশে আলমোরা (কেদার) অঞ্চলে দক্ষিণ হইতে খৃষ্টীয় ১০ম শতাব্দীতে 'চন্দ' (চন্দ্র) বংশের গমনসংবাদ পাইতেছি। (Vide H. G. Walton's Almora G, 1911, p. 165) এই চন্দ্রবংশের সহিত বঙ্গের চন্দ্রবংশের কোন সম্বন্ধ আছে কি না, তাহাও অনুসন্ধেয়।

বিজয়যাত্রামঙ্গল স্বরূপ বজ্রবর্ম্মা জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি শত্রুদিগের পক্ষে শমন, বান্ধবদিগের পক্ষে সোম, কবিদিগের মধ্যে কবি এবং পণ্ডিতদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত ছিলেন। শান্তনু হইতে গাঙ্গেয় (ভীষ্মের) ন্যায় তাঁহা হইতে জাতবর্ম্মা (?) জন্ম লইয়াছিলেন ; দয়াই যাঁহার জীবনের ব্রত, যুদ্ধই যাঁহার ক্রীড়া এবং (স্বার্থ) ত্যাগই যাঁহার মহোৎসব ; তিনি বৈণ্য পৃথুশ্রীকে গ্রহণ করিয়া, কর্ণের (কন্যা) বীরশ্রীকে বিবাহ করিয়া, পৌণ্ড্রের * রাজশ্রীকে প্রথিত করিয়া, কামরূপশ্রীকে পরাভব করিয়া, দিব্যের ভুজশ্রীকে নিন্দা করিয়া, গোবর্দ্ধনের শ্রীকে বিকল করিয়া, শ্রীকে শ্রোত্রিয়সাৎ করিয়া সার্ব্বভৌমশ্রীকে বিস্তার করিয়াছিলেন।"[৯]

উদ্ধৃত প্রমাণ হইতে বুঝিতেছি যে, যাদববীর বজ্রবর্ম্মা সর্ব্বগুণভূষিত হইলেও তিনি শত্রুগণের শমনরূপী একজন সেনাপতিরূপেই পরিচিত হইয়াছেন। সম্ভবতঃ তাঁহার বীরত্বের জন্যই এই বংশের খ্যাতি বিস্তৃত হয়। তৎপুত্র জাতবর্ম্মাও একজন অদ্বিতীয় বীর ছিলেন। তাঁহার সম্বন্ধে 'বৈণ্য পৃথুশ্রীকে গ্রহণ করিয়া' ইত্যাদি উক্তি দ্বারা বুঝিতেছি, পৌরাণিক আখ্যায়িকায় বেণের পুত্র পৃথু প্রজাবৃন্দকে রক্ষা করিবার জন্য ধনুর্ব্বাণ হস্তে পৃথিবীর অনুসরণ করিয়াছিলেন। পৃথিবী গোমূর্ত্তি ধারণ করিয়াও পৃথুর হস্ত হইতে নিস্তার পাইলেন না, তখন তিনি পৃথুর নিকট একটী গোবৎস প্রার্থনা করিলেন। পৃথু স্বায়ম্ভুব মনুকে গোবৎসরূপে স্থাপিত করিয়া পৃথিবীকে দোহন করেন, এবং তদ্দ্বারা অভীষ্ট শস্যফলাদি উৎপন্ন হইয়াছিল। এইরূপ আভাস ও গাঙ্গেয় ভীষ্মদেবের সহিত তাঁহার তুলনা থাকায় মনে হইতেছে যে তিনি নিজে সার্ব্বভৌমশ্রী বিস্তার করিলেও আপনি রাজা হন নাই। তিনি স্বায়ম্ভুব মনুরূপে আপন প্রিয় পুত্রকে প্রতিষ্ঠিত করিয়া আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিলেন। তিনি যে কর্ণের কন্যা বীরশ্রীকে বিবাহ করেন, তিনি অপর কেহ নন, স্বয়ং চেদিপতি মহাবীর কর্ণদেব। পূর্ব্বেই লিখিয়াছি যে এক সময় চেদিপতি কর্ণদেব সমস্ত আর্য্যাবর্ত্ত জয় করিয়া সম্রাট্ পদবী লাভ করিয়াছিলেন।[১০] বলা বাহুল্য তাঁহার এই সার্ব্বভৌম

জাতবর্ম্মা

(৯) "অভবদথ কদাচিদ্‌যাদবীনাং চমূনাং সমরবিজয়যাত্রামঙ্গলং বজ্রবর্ম্মা।
শমন ইব রিপূণাং সোমবদ্বান্ধবানাং কবিরপি চ কবীনাং পণ্ডিতঃ পণ্ডিতানাম্॥
জাতবর্ম্মা ততো জাতো গাঙ্গেয় ইব শান্তনোঃ।
দয়া ব্রতং রণঃ ক্রীড়া ত্যাগো যস্য মহোৎসবঃ॥
বৃণ্বন্ বৈণ্যপৃথুশ্রিয়ং পরিণয়ন্ কর্ণস্য বীরশ্রিয়ং
পৌণ্ড্রেষু প্রথয়ন্ শ্রিয়ং পরিভবংস্তাং কামরূপশ্রিয়ম্।
নিন্দন্দিব্যভুজশ্রিয়ং বিকলয়ন্ গোবর্দ্ধনস্য শ্রিয়ং
কুর্বন্ শ্রোত্রিয়সাচ্ছ্রিয়ং বিতনবান্ যঃ সার্ব্বভৌমশ্রিয়ম্॥" (বেলাব-তাম্রলেখ ৬-৮ শ্লোক)

* কেহ কেহ "বোঙ্গেষু" পাঠ স্বীকার করিয়াছেন। এরূপ হলে অঙ্গদেশে প্রথিত হইবার কথা থাকে।

(১০) ১৮৬ পৃষ্ঠার বিস্তৃত বিবরণ দ্রষ্টব্য।

পশ্চাতে তাঁহার বীরজামাতা জাতবর্ম্মা তাঁহার প্রধান সহায় হইয়াছিলেন। যাদববীর যে দিব্য ও গোবর্দ্ধনকে উপেক্ষা করিয়াছিলেন, রামপালের প্রসঙ্গে এই উভয় নৃপতির কথা লিখিত হইয়াছে। কৈবর্ত্তনায়ক দিব্যই ২য় মহীপালের অধিকার হইতে গৌড়রাজ্য গ্রাস করিয়াছিলেন। কৌশাম্বীপতি গোবর্দ্ধন রামপালের সামন্ত-নৃপতি-মধ্যে পরিচিত হইয়াছিলেন।[১১]

জাতবর্ম্মা যাহাকে স্বায়ম্ভুব মনুরূপে স্থাপন করিয়া পৃথিবী দোহন করিয়াছিলেন, তাহার নাম ভোজবর্ম্মার তাম্রশাসনে স্পষ্ট উল্লেখ নাই। তবে হরিবর্ম্মদেবের তাম্রশাসনে "মহারাজাধিরাজ জাত(?)বর্ম্মপাদানুধ্যাত" ইত্যাদি উক্তি থাকায় জাতবর্ম্মাও কিছুকাল শাসনদণ্ড পরিচালন করিয়াছিলেন বলিয়াই মনে হয়। তবে ভোজবর্ম্মদেবের শাসনলিপির ৩য়, ৪র্থ ও ৫ম শ্লোকের মধ্যে প্রশস্তিরচয়িতা কৌশলে যেরূপ ভাবে হরিবর্ম্মদেবের উল্লেখ করিয়াছেন, তাহাতে আমরা তাঁহাকেই জাতবর্ম্ম-প্রতিষ্ঠিত স্বায়ম্ভুব মনু সদৃশ আদিরাজ মনে করিতে পারি। এই শ্লোকত্রয়ের ভাবার্থ এইরূপ—

হরিবর্ম্মা।

'বীরশ্রী ও হরি যে বংশে বহুবার প্রত্যক্ষরূপেই দেখা গিয়াছিল। সেই হরি (বর্ম্মাও) ইহলোকে (বা এখানে) গোপীশতকেলিকার মহাভারতসূত্রধার আত্মপুরুষ অংশাবতার কৃষ্ণ বলিয়াও অভিহিত হইয়াছিলেন। সেই পুরুষের আবরণ ত্রয়ী (বেদ), হীনাও নহে এবং নগ্নাও নহে (অর্থাৎ সেই পুরুষের বেদই অবলম্বন, তিনি কখনও বৈদিকাচার ছাড়া নহেন এবং নগ্ন অর্থাৎ বৌদ্ধক্ষপণকাদির মত অবৈদিকাচারসম্পন্নও ছিলেন না।) ত্রয়ী বিদ্যায় এবং অদ্ভুত সমরক্রীড়ায় আনন্দ হেতু রোমোদ্গমদ্বারা 'বর্ম্মিন্' (এক পক্ষে বর্ম্মাবৃত ও অপর পক্ষে বর্ম্মা উপাধিধারী)।'[১২]

কোটালিপাড়ের বৈদিক-সমাজ হইতে প্রাপ্ত 'ভবভূমিবার্ত্তা' নামক কুলপরিচয়গ্রন্থে হরিবর্ম্মদেবের এইরূপ পরিচয় আছে—

'যিনি নরপতিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিয়াছিলেন, যাঁহার প্রচণ্ড ভুজদণ্ডালঙ্কৃত করাল করবালভয়ে দক্ষিণাপথ হইতে সমাগত বহুসংখ্যক শত্রুরাজগণ কম্পিত হইত, জৈন, বৌদ্ধ প্রভৃতি বিধর্ম্মিগণের শান্তিসুখ যিনি বিদারিত করিয়াছেন; যাঁহার প্রভাবে সমস্ত রাজন্যগণের গর্ব্ব ও গৌরব খর্ব্ব হইয়াছিল। যিনি নাগেন্দ্রপত্তন প্রভৃতি নানাদেশ জয় করিয়া অতিমাত্র যশস্বী হইয়াছিলেন। যিনি একাম্রকাননে হরি, হর, ব্রহ্মা, সীতা, রাম, লক্ষ্মণ, হনুমান্ প্রভৃতি অষ্টোত্তরশত দেববিগ্রহ এবং চারিদিকে অপূর্ব্ব পতাকাপরিশোভিত সুরভি

(১১) রামপাল-প্রসঙ্গে বিস্তৃত বিবরণ দ্রষ্টব্য।

(১২) "সোঽপি প্রাপ বপুঃ ততঃ ক্ষিতিভুজাং বংশোহয়মুজ্জৃম্ভতে
বীরশ্রীশ্চ হরিশ্চ যত্র বহুশঃ প্রত্যক্ষমৈক্ষ্যত ॥৩
সোঽপীহ গোপীশতকেলিকারঃ কৃষ্ণো মহাভারতসূত্রধারঃ।
আদ্যঃ পুমানংশকৃতাবতারঃ প্রাদুর্বভূবোদ্ধৃতভূমিভারঃ ॥৪
পুংসোস্যাবরণং ত্রয়ী ন চ তয়া হীনা ন নগ্না ইতি
ত্রয্যাং চাদ্ভুতসঙ্গরেষু চ মুদা রোমোদ্গমৈর্বর্ম্মিণঃ ॥"

কুসুমসমূহাদির সৌন্দর্য্যে নন্দনকানন অপেক্ষা মনোহর অত্যুত্তম আমোদময় উদ্যানসমূহে পরিবেষ্টিত অত্যুচ্চ সুন্দর মন্দিরসকল এবং মন্দাকিনীর ন্যায় স্বচ্ছতোয় কমল-কহ্লার-ইন্দীবর ও কোকনদবৃন্দে সমুদ্ভাসিত বিস্তৃত সরোবর-সমূহ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন; যিনি নানা শাস্ত্র ও অস্ত্রবিদ্যায় বিলক্ষণ সুদক্ষ, অসাধারণ বিচক্ষণতাসম্পন্ন বালভট্ট, গর্গ, ভট্টাচার্য্য ও বাচস্পতিপ্রমুখ বিশ্ববিখ্যাত সাত জন সচিবের সাহায্যে স্বীয় এবং পরকীয় রাষ্ট্রের সকল কার্য্য সুসম্পন্ন করিতেন। যিনি স্বীয় জননীর বারাণসীশ্বর বিশ্বেশ্বরের পদারবিন্দ দর্শনে যাইবার অভিপ্রায় অবগত হইয়া তাঁহার স্বচ্ছন্দগমনের জন্য নূতন একটি প্রশস্ত পথ প্রস্তুত করাইয়া দিয়াছিলেন। যিনি প্রতিনিয়ত সাধুজন-সেবিত সুনীতির অনুসরণ করিয়া সর্ব্ববিষয়ে শুভ ফল প্রাপ্ত হইয়াছিলেন; অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ প্রভৃতি নানা দেশে যাঁহার অদ্ভুত রাজকাহিনী বিঘোষিত হইয়াছিল। যাঁহার কর্ম্মসকল ধর্ম্মানুগত, যাঁহার কীর্ত্তিকলাপ দিগ্‌দিগন্তরে বিস্তৃত, যিনি পরম দয়ালু, যিনি ব্রাহ্মণদিগকে ভূসম্পত্তি দান করিয়া অশেষ পুণ্য সঞ্চয় করিয়াছিলেন, যাঁহার কৃপায় আমাদিগের (অর্থাৎ গৌতম গোত্রের) পূর্ব্বপুরুষগণ এই কোটালিপাড়ে আসিয়া সুখে বাস করিয়াছিলেন, সেই নৃপকুল-শিরোমণি রাজাধিরাজ শ্রীহরিবর্ম্মদেবের জয় হউক।"[১৩]

ভবভূমিবার্ত্তায় হরিবর্ম্মদেবের যে সপ্ত সচিবের উল্লেখ আছে, তন্মধ্যে বালভট্ট সম্ভবতঃ সুপ্রসিদ্ধ বালবলভীভুজঙ্গ ভবদেব ভট্ট। ভুবনেশ্বরের অনন্তবাসুদেবের মন্দিরে বাচস্পতিমিশ্র-রচিত ভবদেব ভট্টের কুলপ্রশস্তি উৎকীর্ণ রহিয়াছে, তাহাতে বঙ্গাধিপ হরিবর্ম্মদেব "ধর্ম্ম-বিজয়ী" বলিয়াই অভিহিত হইয়াছেন। তিনি যে ধর্ম্মরক্ষার জন্য অস্ত্রধারণ করিয়াছিলেন এবং বৈদিক-বিদ্বেষী জৈন ও বৌদ্ধধর্ম্ম-সম্প্রদায়কে পরাজয় করিয়াছিলেন, তাহা ভবভূমি-বার্ত্তা হইতেই প্রমাণিত হইয়াছে। হরিবর্ম্মদেবের ৪২ রাজ্যাঙ্কে উৎকীর্ণ বেজনীসার-তাম্রলিপি হইতে জানা যায় যে, তিনি দীর্ঘকাল রাজত্ব করিয়াছিলেন। ভবদেবভট্টের প্রশস্তি আলোচনা করিলে মনে হইবে যে, প্রথমে ভবদেবের পিতামহ আদিদেব জাতবর্ম্মা এবং তৎপরে ভবদেবের পিতা গোবর্দ্ধন ও অবশেষে ভবদেব স্বয়ং হরিবর্ম্মদেবের মন্ত্রিত্ব বা সান্ধিবিগ্রহিকের কার্য্য করিয়াছিলেন।

(১৩) "স্বস্তি সমস্ত-নরপতিকুলললামঃপ্রাজ্যভুজবলসম্বিত-বিকরালকরবালজয়প্রকম্পিত-দক্ষিণাপথাগতাশেষরিপুরাজন্যজৈনবৌদ্ধাদিবিধর্ম্মিগণসম্মর্দ্দনধর্ম্মীকৃতসংগ্রামকীর্তিপর্ব্বগৌরবো নানাদেশপ্রণতনানানেকদেশবিজয়-লক্ষোদ্দামজয়শ্রীরেকাম্রকাননপ্রতিষ্ঠাপিতহরিহরবিবিধকিরীটৈরৌরাঘবশব্দাণকসুমদাদ্যুত্তমভানুভাতবৈজয়ন্তী-বিভাসিতাম্বরগগনপ্রসূনপটলসৌন্দর্য্যাদিসুকৃতনন্দনকাননবৈভবপরমামোদময়োদ্যানসমলঙ্কৃত-সুরপথসংস্পর্শিসুন্দরমন্দির-মন্দাকিনীবিমলনীলাল-কমলকহ্লারেন্দীবর-সোপারবিন্দবৃন্দসংশোভিতসুবিশালসরোবরসংহতিঃ ... ...যেনাখিল-বাসনিখিলশাস্ত্রাস্ত্রনিপুণ-পরিজ্ঞানলজ্ঞানন্ত-বৈচক্ষণ্যবালভট্টভট্টাচার্য্যগর্গবাচস্পতিপ্রমুখবিশ্ববিখ্যাতসপ্তসচিবসাহচর্য্য-নির্ব্বর্ত্তিতসম্যকস্বপররাষ্ট্র-সর্ব্বব্যাপারো-বারাণসীশ্বরবিশ্বেশ্বরপাদারবিন্দদর্শনার্থসমুদ্যতজননীস্বচ্ছন্দ-পরিচারকৃতে-প্রবর্ত্তিতপ্রশস্তবর্ত্মা নিত্যমুক্তপ্রতিনিয়তসাধুনীতিপরিসেবনসম্প্রাপ্তপরমপর্য্যা অঙ্গ-বঙ্গ-কলিঙ্গাদ্যশেষজনপদঘোষিতাদ্ভুতকর্ম্মা ধর্ম্মানুগতাখিলকর্ম্মা দিগন্তসন্ততকীর্ত্তিসন্ততিঃ ভূদেবভূদানার্জিতাশেষধর্ম্মা জয়তাচিরং রাজাধিরাজো দেবশ্রীহরিবর্ম্মা।" (ভবভূমিবার্ত্তা)

ভবদেবের অনন্ত-বাসুদেব-প্রশস্তিতে লিখিত আছে, "তিনি (আদিদেব) বঙ্গরাজের রাজ্যলক্ষ্মীর বিশ্রামসচিব, শুচি, মহামন্ত্রী, মহাপাত্র ও অব্যর্থ সন্ধিবিগ্রহী ছিলেন। তিনি পৃথিবীতে থাকিয়া উচ্চ পদলাভে সমর্থ ও পুরুষকারপ্রাপ্ত দেবকীগর্ভভব সরস্বতীপতি গোবর্দ্ধন নামে অচ্যুতোপম পুত্র উৎপাদন করেন। যিনি বীরস্থলীমধ্যে, সভাতে ও তীর্থিকদিগের মধ্যে হস্তলীলা, কলা ও বাগ্মিতা দ্বারা বিত্ত ও বসুমতীর বৃদ্ধি সংসাধন করিয়া দুই প্রকারে স্বীয় নামের সার্থকতা জন্মাইয়াছিলেন। তিনি পূজনীয়া বন্দ্যঘটীকুলোদ্ভবা সাঙ্গোকা নাম্নী প্রযতা অঙ্গনারত্নকে পত্নীরূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাহাতে স্বপ্নবিধানে বোধিত ভগবান্ হরিই যেন ভবদেবমূর্ত্তিতে ধরামণ্ডলের কল্পতরুরূপ গোবর্দ্ধন হইতে পৃথিবীমণ্ডলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।...যাঁহার মন্ত্রশক্তি-সচিব-রূপান্বিত হইয়া ধর্ম্মবিজয়ী হরিবর্ম্মদেব বহুকাল রাজ্য করিয়াছিলেন। তাঁহার পুত্রেও যাঁহার দণ্ডনীতিবশগা লক্ষ্মী কল্পলতার ন্যায় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। * * বৌদ্ধ-জল-নিধির অগস্ত্যস্বরূপ সেই মুনি পাষণ্ড ও বৈতণ্ডিকদিগের মত খণ্ডন করিয়া অবনীতে লীলা করিয়াছিলেন।"[১০]

ভবভূমিবার্ত্তা ও ভবদেবের প্রশস্তি হইতে বেশ বুঝা যাইতেছে যে, বঙ্গাধিপ হরিবর্ম্ম-দেবের সময়ে বৌদ্ধ ও জৈনগণ প্রবল ছিলেন। হরিবর্ম্মা অস্ত্রবলে এবং ভবদেব শাস্ত্রীয় যুক্তিবলে তাঁহাদিগকে পরাজিত করিয়াছিলেন। যেমন বঙ্গাধিপ গোবিন্দচন্দ্রের সময়ে দক্ষিণাপথপতি জৈনধর্ম্মানুরাগী রাজেন্দ্রচোল রাঢ়-বঙ্গ আক্রমণ করেন, হরিবর্ম্মদেবের সময়েও দক্ষিণাপথ হইতে ঐরূপ জৈন-বৌদ্ধাদির আক্রমণ চলিতেছিল। হরিবর্ম্মদেবের হস্তে তাঁহারা পরাজিত হন। খুব সম্ভব সেই সময়েই হরিবর্ম্মা কলিঙ্গ পর্য্যন্ত অধিকার করেন এবং

(১০) "যো বঙ্গরাজরাজ্যশ্রীবিশ্রামসচিবঃ শুচিঃ।
মহামন্ত্রী মহাপাত্রমবন্ধ্যঃ সন্ধিবিগ্রহী ॥ ১০
স দেবকীগর্ভভবঃ ভুবঃ স্থিতো সমর্থমুচ্চৈঃপদলব্ধপৌরুষম্।
সরস্বতী-জানিমজীজনৎ সুতং জগৎসু গোবর্দ্ধনমচ্যুতোপমম্ ॥ ১১
বীরস্থলীষু চ সভাসু চ তীর্থিকানাং দোর্লীলয়া চ কলয়া চ বচস্বিতায়াঃ।
যো বর্দ্ধয়ন্ বসুমতীঞ্চ সরস্বতীঞ্চ দ্বেধা ব্যধত্ত নিজনামপদং সমর্থং ॥ ১২
বন্দ্যাং বন্দ্যঘটীয়স্য ব্রাহ্মণঃ প্রযতাং সুতাং।
সাঙ্গোকামঙ্গনারত্নং পত্নীং স পরিণীতবান্ ॥ ১৩
তস্যাং স্বপ্নবিধানবোধিতনিজোৎপাদঃ স দেবো হরি-
র্জাতঃ শ্রীভবদেবমূর্ত্তিরমুতঃ ক্ষ্মামণ্ডলী কল্পপাৎ ॥ ১৪

* * * * *

যন্মন্ত্রশক্তিসচিবঃ সুচিরং চকার রাজ্যং স ধর্ম্মবিজয়ী হরিবর্ম্মদেবঃ।
তন্নন্দনে বলতি যস্য চ দণ্ডনীতির্বশ্যা বিপুলায়তকল্পলতেব লক্ষ্মীঃ ॥ ১৬

* * * *

বৌদ্ধাম্ভোনিধিকুম্ভসম্ভবমুনিঃ পাষণ্ডবৈতণ্ডিক-
প্রজ্ঞাখণ্ডনপণ্ডিতোহয়মবনৌ সর্ব্বজ্ঞলীলায়তে ॥ ২০" (অনন্তবাসুদেব-প্রশস্তি)

ভুবনেশ্বরক্ষেত্রে ১০৮টি দেবমন্দির নির্ম্মাণ করিয়া অক্ষয়কীর্ত্তি রক্ষা করিয়াছিলেন। ভবদেব-ভট্টের 'প্রায়শ্চিত্তনিরূপণ' গ্রন্থে তিনি 'সান্ধিবিগ্রহিক' বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন, আবার তাঁহার অনন্তবাসুদেবপ্রশস্তিতে তাঁহার পিতামহ আদিদেবও বঙ্গরাজের সন্ধিবিগ্রহী বলিয়াই পরিকীর্ত্তিত হইয়াছেন, ইহাতে মনে হয় যে, ভবদেব হইতে তিন পুরুষ বর্ম্মবংশের সান্ধিবিগ্রহিক ছিলেন। হরিবর্ম্মদেবের রাজত্বকালে বঙ্গভূমি বৌদ্ধপ্রভাবশূন্য হইতে পারে নাই, এই সময়ে বহুসংখ্যক বৌদ্ধাচার্য্য হরিবর্ম্মদেবের অধিকারমধ্যে বাস করিতেছিলেন। তাঁহাদের হস্তলিখিত বা রচিত গ্রন্থ এখনও নেপাল হইতে বাহির হইতেছে। তিব্বতের টেঙ্গুরগ্রন্থ মধ্যেও হরিবর্ম্মদেবের সময়ে রচিত বহু বৌদ্ধগ্রন্থের অনুবাদ পাওয়া যাইতেছে। ঐ সকল প্রমাণ হইতে মনে হয় যে, প্রথম প্রথম হরিবর্ম্মদেব বৌদ্ধদিগের প্রতিকূলতাচরণ করেন নাই, ক্রমে ক্রমে নিজ আধিপত্য বিস্তারের সঙ্গে ভবদেব ভট্ট প্রভৃতি স্মার্ত্ত বা মীমাংসকগণের পরামর্শে তিনি সম্ভবতঃ বৌদ্ধপ্রভাব খর্ব্ব করিতে যত্নবান্ হইয়াছিলেন।

ভট্ট ভবদেবের মত সর্ব্বশাস্ত্রবিৎ মীমাংসক তৎকালে বঙ্গে আর কেহ ছিলেন বলিয়া মনে হয় না। বলা বাহুল্য, বঙ্গের বৌদ্ধপ্রভাব খর্ব্ব করিবার জন্য তিনি যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছিলেন।[১৫]

হরিবর্ম্মদেবের আবির্ভাবকাল

বঙ্গাধিপ হরিবর্ম্মদেবের আবির্ভাবকাল লইয়া মতভেদ আছে। প্রত্নতত্ত্ববিদ্ কীলহোর্ণ ভবদেবভট্টের প্রশস্তির লিপিকাল ১২০০ খৃষ্টাব্দের সমসাময়িক মনে করেন।[১৬] অনন্তবাসুদেবের প্রশস্তিতে ভবদেবের এইরূপ কুলপরিচয় আছে—

(১৫) বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস, ব্রাহ্মণকাণ্ড ১মাংশ ৩০৪ হইতে ৩১২ পৃষ্ঠা এবং ৩য় অংশ ৬৮/০ হইতে ৬৮/০ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।
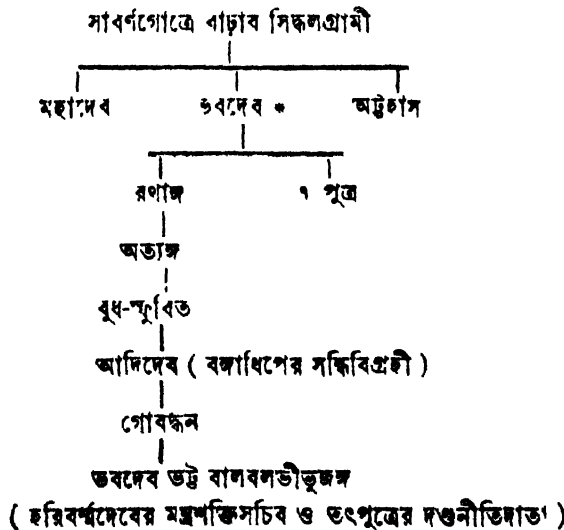
(১৬) Epigraphia Indica, vol. VI p. 204

* ইনি গৌড়পতির নিকট হস্তিনীভিট্ট গ্রাম লাভ করেন।

অধ্যাপক কীলহোর্ণের উক্তির উপর নির্ভর করিয়া কেহ কেহ বলিতে চান, "প্রশস্তিতে ভবদেব-বালবলভীভুজঙ্গকে ধরিয়া সাত পুরুষের বিবরণ আছে। প্রশস্তিতে উল্লিখিত প্রথম ভবদেব খৃষ্টীয় দশম শতাব্দীর শেষপাদে বর্ত্তমান ছিলেন, এরূপ অনুমান করা যাইতে পারে; এবং এই প্রথম ভবদেব যে গৌড়নৃপ হইতে হস্তিনীভিট্ট গ্রাম প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তিনি সম্ভবতঃ প্রথম মহীপাল। বাচস্পতি যে ভাবে প্রশস্তির সূচনায় সিদ্ধলগ্রামবাসী সাবর্ণগোত্রীয় ব্রাহ্মণগণের প্রসঙ্গের অবতারণা করিয়াছেন, তাহাতে মনে হয়, যেন স্মরণাতীত কাল হইতে সাবর্ণগোত্রীয় শ্রোত্রিয়েরা তথায় বাস করিতেছিলেন। এখন যেমন সাবর্ণগোত্রীয় রাঢ়ীয় বারেন্দ্র ব্রাহ্মণমাত্রই আদিশূর-আনীত বেদগর্ভ বা পরাশর হইতে বংশ-পরিচয় দিয়া থাকেন, তখন এই প্রবাদ প্রচলিত থাকিলে বাচস্পতি বোধ হয় প্রিয় সুহৃদের প্রশস্তিতে তাহার উল্লেখ করিতে বিরত হইতেন না। ভবদেবের ভুবনেশ্বরের প্রশস্তিতে আদিশূর কর্ত্তৃক সাবর্ণগোত্রীয় ব্রাহ্মণ আনয়নের প্রতিকূল প্রমাণ দেখিয়া আদিশূর-বৃত্তান্তের ঐতিহাসিকতা সম্বন্ধে ঘোর সংশয় উপস্থিত হয়।[১৭]"

গৌড়রাজমালাকার যে ভাবে ভবদেবের সময় অবধারণ করিয়াছেন, তাহা সমীচীন নহে। ভবদেব যে খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীতে বিদ্যমান ছিলেন, তাহা প্রমাণিত হইয়াছে।[১৮] গৌড়াধিপ মহীপালও ঐ শতাব্দীতে বিদ্যমান ছিলেন, পূর্ব্বেই তাহার আলোচনা করিয়াছি।[১৯] এরূপস্থলে বালবলভীভুজঙ্গ ভবদেবের ৭ম পুরুষ ঊর্দ্ধতন ১ম ভবদেবকে খৃষ্টীয় ৯ম শতাব্দীর লোক বলিতে হয়। গৌড়াধিপ আদিশূর জয়ন্ত তাঁহারও পূর্ব্ববর্ত্তী অর্থাৎ তিনি খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীতে বিদ্যমান ছিলেন। এ অবস্থায় ভবদেবভট্টের প্রশস্তিকার আদিশূরের পরিচয় দিবার কোন প্রয়োজন উপলব্ধি করেন নাই। খৃষ্টীয় ৮ম শতাব্দীর শেষভাগে পাল-বংশের অভ্যুদয় এবং ঐ সময়ে বা তাহার অনতিপরে সাবর্ণগোত্রীয় ১ম ভবদেবের পূর্ব্বপুরুষ রাঢ়বাসী হইয়া সিদ্ধলগ্রাম লাভ করেন, তখন হইতেই এই বংশ সিদ্ধলগ্রামীয় বলিয়া পরিচিত হইয়া আসিতেছেন, ভবদেবভট্টের প্রশস্তি হইতে তাহার আভাস পাওয়া যাইতেছে। এরূপস্থলে এই প্রশস্তিতে আদিশূরের নামোল্লেখ না থাকায় তাঁহার অস্তিত্বে সন্দেহ করা যুক্তিসঙ্গত বলিয়া মনে হয় না। আদিশূর-জয়ন্ত যে একজন প্রকৃত ঐতিহাসিক ব্যক্তি, তাহা যথাস্থানে আলোচিত হইয়াছে।

মহারাজ হরিবর্ম্মদেব যখন ভট্ট ভবদেব অপেক্ষা বয়োবৃদ্ধ ছিলেন এবং তাঁহার সুদীর্ঘ রাজত্বের প্রকৃষ্ট প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে, তখন আমরা অনায়াসেই তাঁহাকেও খৃষ্টীয় ১১শ শতাব্দীর বঙ্গাধিপ বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি।

(১৭) গৌড়রাজমালা ৫৯ পৃষ্ঠা।

(১৮) Bhatta Bhavadeva of Bengal by Manomohan Chakrabarti—Journal of the Asiatic Society of Bengal, (N S) Vol VIII. p. 347 দ্রষ্টব্য

(১৯) পূর্ব্ব অধ্যায়ে মহীপাল সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ দ্রষ্টব্য।

ভবদেবের কুলপ্রশস্তি হইতে পাওয়া যাইতেছে যে, তাঁহার দণ্ডনীতি হরিবর্ম্মার পুত্রের উপরও প্রবল ছিল। এই প্রসঙ্গ হইতে কেহ কেহ মনে করেন যে, হরিবর্ম্মদেবের পর তৎপুত্র বঙ্গাধিপত্য লাভ করেন এবং ভবদেব তাঁহারও মন্ত্রিত্ব করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু উক্ত প্রশস্তিতে হরিবর্ম্মদেবের নাম এবং কিছু পরিচয় থাকিলেও তৎপুত্রের নাম পর্য্যন্ত উক্ত হয় নাই, ইহা দ্বারা মনে হয় যে, তাঁহার পুত্রের ভাগ্যে সম্পূর্ণ আধিপত্য লাভ করিবার সুযোগ ঘটে নাই। হরিবর্ম্মদেবের বৃদ্ধাবস্থায় সম্ভবতঃ তৎপুত্র যৌবরাজ্যে অধিষ্ঠিত ছিলেন এবং ভবদেবের পরামর্শ লইয়া তিনি রাজদণ্ড পরিচালনা করিতেন। প্রকৃত পক্ষে হরিবর্ম্মদেবের পর তাঁহার অপর ভ্রাতা সামল বা শ্যামলবর্ম্মাই বঙ্গাধিপ হইয়াছিলেন।

সামল বা শ্যামলবর্ম্মা

সামলবর্ম্মাকে আমরা হরিবর্ম্মার বৈমাত্রেয় ভ্রাতা বলিয়াই মনে করি। ভোজবর্ম্মার বেলাব-তাম্রলেখ হইতে জানা যায় যে, বঙ্গাধিপ সামলবর্ম্মা জাতবর্ম্মার ঔরসে চেদিপতি সম্রাট্ কর্ণদেবের কন্যা বীরশ্রীর গর্ভে জন্মলাভ করেন[২০]। মালবপতি উদয়ীর পুত্র জগদ্বিজয়মল্লের কন্যা মালব্যদেবী ত্রৈলোক্যসুন্দরীর সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। এই মালব্যদেবী সামলবর্ম্মার পাটরাণী ছিলেন[২১]।

সামলবর্ম্মার পূর্ব্বোক্ত পরিচয় হইতে বেশ বুঝা যাইতেছে যে, তাঁহার মাতৃকুল ও শ্বশুরকুল ভারতপ্রসিদ্ধ ও প্রবল পরাক্রান্ত ছিলেন। চেদিপতি কর্ণদেব কিছুকাল মালব অধিকার করিয়াছিলেন, উদয়াদিত্য তাঁহার কবল কবল হইতে পৈতৃক রাজ্য উদ্ধার করেন[২২]। এই মালবপতি উদয়াদিত্যই ভোজের তাম্রশাসনে উদয়ী নামে পরিচিত হইয়াছেন। তাম্রশাসনোক্ত উদয়ীপুত্র জগদ্বিজয়মল্ল মালবের প্রাচীন ইতিহাসে জগদ্দেব, জগদেও পরমার এবং জগমল নামেও প্রথিত হইয়াছেন। জগদেও পরমারের অপূর্ব্ব প্রতিভা ও বীর্য্যবত্তার

(২০) "বীরশ্রিয়ামজনি সামলবর্ম্মদেবঃ
শ্রীমাঞ্জগৎপ্রথমমঙ্গলনামধেয়ঃ।" ৯ম শ্লোক।

(২১) "তথোদয়ীত্যুরভূৎ প্রভূতপ্রতাপবীরেষপি সঙ্গরেষু।
যচ্চন্দ্রহাসপ্রতিবিম্বিতং যমেকং মুখং সম্মুখমীক্ষতে স্ম॥
তস্য মালব্যদেব্যাসীৎ কন্যা ত্রৈলোক্যসুন্দরী।
জগদ্বিজয়মল্লস্য বৈজয়ন্তী মনোভুবঃ॥
পূর্ণেপ্যশেষভূপালপুত্রীসামবরোধনে।
তস্যাসীদগ্রমহিষী সৈব সামলবর্ম্মণঃ॥"
ভোজের বেলাব-তাম্রলেখ ১০—১২ শ্লোক।

(২২) "তস্মিন্ বাসববন্ধুতামুপগতে রাজ্যে চ কুল্যাকুলে
মগ্নস্বামিনি তস্য বন্ধুরুদয়াদিত্যোঽভবদ্ভূপতিঃ।
যেনোদ্ধৃত্য মহার্ণবোপমমিলৎ কর্ণাটকর্ণপ্রভু-
মুর্ব্বীপালকদর্থিতাং ভুবমিমাং শ্রীমদ্বরাহায়িতং॥" ৩২
লক্ষ্মদেব ও নরবর্ম্মার নাগপুরপ্রশস্তি (Ep. Ind. II. p. 186.

দিয়া পশ্চিমভারতে ভাট ও চারণদিগের মুখে আজও কীর্তিত হইয়া থাকে। উদয়াদিত্যের প্রথম পুত্র লক্ষ্মদেব, ২য় নরবর্ম্মা ও ৩য় জগদ্দেব২৩। মালবপতি লক্ষ্মদেবের নাগপুর-প্রশস্তিতে কীর্তিত হইয়াছে যে, তাঁহার যুদ্ধযাত্রার সময় পূর্ব্বদিকের নৃপতিগণ এতই বিহ্বল হইয়া পড়িয়াছিলেন যে, 'তাঁহারা আত্মবিস্মৃত হইয়া আত্মীয় স্বজনকে পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। যখন লক্ষ্মদেবের অদ্বিতীয় হস্তিদলের প্রয়োজন হইয়াছিল, তখনই তিনি হরির দিক্ অর্থাৎ হরিবর্ম্মাধিকৃত পূর্ব্ববঙ্গ জয় করিয়াছিলেন এবং তৎপরে গৌড়পতির পুরে প্রবেশকরিয়া তথাকার পুরন্দর বা গৌড়েন্দ্রকেও ভীতচকিত করিয়াছিলেন।'২৪ এমন কি অঙ্গ ও কলিঙ্গের নৃপতিগণও তাঁহার নিকট বদ্ধাঞ্জলি হইয়াছিলেন।'২৫ উদ্ধৃত বিবরণ হইতে মনে হয় যে, উদয়াদিত্যের পুত্রগণ অঙ্গ, বঙ্গ, ও কলিঙ্গ আক্রমণ করিয়াছিলেন। ভোজবর্ম্মার তাম্রশাসনের ১০ম শ্লোকে যেন সেই অতীত বীরত্বেরই আভাস প্রকটিত হইয়াছে।

নাগপুর-প্রশস্তির ৩৭ ও ৩৮ শ্লোকের সহিত ভোজের বেলাব-লিপির ৫ম শ্লোক একত্র আলোচনা করিলে আমরা আরও বলিতে পারি যে, মহারাজ হরিবর্ম্মা বা তাঁহার বান্ধবগণ যেন পরাজিত হইয়াই সিংহপুর বা উৎকলের কেশরীবংশের অধিকারে আশ্রয় লইয়াছিলেন। উদয়াদিত্যের পুত্র হয়ত সেখানেও তাঁহার অনুসরণ করিয়াছিলেন, তাহাতেই কলিঙ্গের সহিত তাঁহার যুদ্ধ ঘটে। অধ্যাপক কীলহোর্ণের মতে লক্ষ্মদেব প্রায় ১০৮০ হইতে ১১০৪ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করিয়া গিয়াছেন।২৬ পাশ্চাত্য বৈদিকগণের কুলপঞ্জিকাতেও দেখা যায় যে, বঙ্গাধিপ শ্যামলবর্ম্মা বিক্রমপুরে অধিষ্ঠিত হইয়া শাকুনসত্র সম্পন্ন করিবার জন্য ১০০১ শকে (১০৭৯-৮০ খৃষ্টাব্দে) কর্ণাবতীসমাজ হইতে বৈদিক ব্রাহ্মণ আনাইয়া ছিলেন। নাগপুরপ্রশস্তি ও বৈদিক কুলপঞ্জী একত্র করিলে মনে হইবে যে, মালবপতি লক্ষ্মদেব ও বঙ্গাধিপ সামলবর্ম্মার একই সময়ে অভ্যুদয় হইয়াছিল। সম্ভবতঃ বঙ্গাধিপ অতিবৃদ্ধ হরিবর্ম্মদেব বা তৎপুত্র রাজ্য হারাইলে মালবপতির সহিত আত্মীয়তাসূত্রে সামলবর্ম্মাই বঙ্গাধিকার প্রাপ্ত হন। সামলবর্ম্মাই সম্ভবতঃ সর্ব্বপ্রথম সমস্ত পূর্ব্ববঙ্গ অধিকার করিয়া আধিপত্য-বিস্তারে সমর্থ হইয়াছিলেন বলিয়াই ভোজবর্ম্মের তাম্রলেখকার ইঙ্গিতে হরিবর্ম্মদেবকে

(২৩) C. E. Luard's Paramaras of Dhar and Malwa, p. 281; Forbes, Rasmala.

(২৪) "যস্মিন্ সর্পতি যাত্রয়োপি বিধুরৈঃ পূর্ব্বৈঃ পরিত্যজ্যতে।"

"প্রযাতি যস্মিন্ প্রথমং দিশং হরের্জ্জিগীষয়ানন্তসমানবস্তিনাঃ

যথাবিশৎকোড়পতেঃ পুরং পুরন্দরো গৌড়পতেঃ পুরন্দরঃ॥"

লক্ষ্মদেবের নাগপুরপ্রশস্তি ৩৭—৩৮ শ্লোক (Ep. Ind. II. p. 186)

(২৫) "যৎসেনাকৃপাণবলিসুরনরলৈঃ নতিবিহ্বলৈঃ ক্ষিতিতলাঙ্গকলিঙ্গপ্রমুখৈর্নৃপৈর্বদ্ধাঞ্জলিঃ॥" ঐ ৪০শ্লোক।

(২৬) Epigraphia Indica, vol. II. p. 182.

'আত্মপুরুষ' বলিয়া পরিচিত করিলেও সামলবর্ম্মাকেই "শ্রীমাঞ্জগৎপ্রথমমঙ্গলনামধেয়ঃ" বলিয়া পরিচিত করিতে বাধ্য হইয়াছেন।[২৭]

ভোজশাসনে পাওয়া যাইতেছে, সামলবর্ম্মা অনেক রাজকন্যার পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে জগদ্বিজয়মল্লের কন্যা ত্রৈলোক্যসুন্দরী মালব্যদেবীই তাঁহার অগ্রমহিষী বা পাটরাণী ছিলেন। তাঁহার অপর পত্নীগণের মধ্যে কুলপঞ্জীতে সুদক্ষিণা নাম্নী এক রাণীর পরিচয় পাওয়া যায়, এই সুদক্ষিণা কনোজ অঞ্চলের রাজা নীলকণ্ঠের কন্যা বলিয়া অভিহিতা। রাজা নীলকণ্ঠও "জলধিসুতসন্তানপ্রসূতমতিশয়রাজন্যকুমুদপ্রমোদকারণং" অর্থাৎ 'চন্দ্রবংশসম্ভূত সমস্তরাজন্যকুলকুমুদগণের প্রমোদকারণ' বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন। ঈশ্বরবৈদিক এই নীলকণ্ঠের পিতৃনাম উল্লেখ না করিলেও বৈদিককুলমঞ্জরী নামক গ্রন্থে তিনি "হরিহরনৃপতেরাত্মজঃ কীর্ত্তিভাজঃ" অর্থাৎ হরিহররাজের পুত্র বলিয়া আখ্যাত। কান্যকুব্জের অন্তর্গত সীয়ডোনী নামক স্থান হইতে এক বৃহৎ শিলালিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহা হইতে জানা যায়, ১০২৫ সংবতের (৯৬৮ খৃষ্টাব্দের) কিছু পরে হরিরাজ নামক এক সামন্ত-নৃপতি মহোদয়ের অন্তর্গত সীয়ডোনী শাসন করিতেন।[২৮] এই হরিরাজই কুলগ্রন্থোক্ত হরিহররাজ হইতে পারেন। তাহার পৌত্রী সুদক্ষিণা কুলগ্রন্থে কনোজরাজকন্যা বলিয়া অভিহিতা হইয়া থাকিবেন। ঈশ্বরবৈদিক আরও লিখিয়াছেন যে, এই সুদক্ষিণার পাণিগ্রহণ করিবার জন্য সামলবর্ম্মা বহু সৈন্য-সামন্তে পরিবৃত হইয়া সরস্বতীনদীতীরস্থ কনৌজব্রহ্মশাসন অতিক্রম করিয়া উত্তরাপথে উপস্থিত হইয়াছিলেন।[২৯]

সামলবর্ম্মার বিবাহ

সামলবর্ম্মা বিবাহোপলক্ষে বরাবর শ্বশুরের রাজ্যে না গিয়া সরস্বতীনদী পার হইয়া উত্তরাপথে যাইবার কারণ কি?

ঈশ্বর বৈদিক লিখিয়াছেন, স্বর্ণগঙ্গা প্রবাহিত স্বর্ণরেখাপুরে সামলবর্ম্মার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ও কুটুম্ব আত্মীয়গণ অবস্থান করিতেন। ইহাতে মনে হয়, আত্মীয় স্বজনকে সঙ্গে লইবার জন্যই যেন তিনি শ্বশুরগৃহে যাইবার পূর্ব্বে উত্তরাপথে সিংহপুররাজ্যে যাত্রা করিয়াছিলেন। বৈদিক কুলগ্রন্থে লিখিত আছে যে, রাজকন্যা সুদক্ষিণার পাণিগ্রহণ করিয়া বিক্রমপুরে ফিরিয়া আসিবার পরই হঠাৎ একদিন সামলবর্ম্মার প্রাসাদে শকুনি আসিয়া পড়ে, তাহাতে রাজ্যমধ্যে নানারূপ উপদ্রব ঘটিতে থাকে। এই

বৈদিক-আগমন

(২৭) গত ১৩১৯ সালের ঢাকা-রিভিউ ও সম্মিলন, ৩১৭ পৃষ্ঠায় সামলবর্ম্মাকেই বর্ম্মবংশীয় প্রথম নৃপতি বলিয়া লিখিয়াছি। এখন সেই মত খণ্ডিত হইতেছে।

(২৮) Epigraphia Indica, Vol. I. p. 112. 178-179.

(২৯) "উচ্চৈরুচ্চৈঃ করিবরনিবহৈর্বাজিবাহপ্রবাহৈরুচ্চৈরুচ্চৈঃ পবনসদৃশৈরাবৃতঃ সামলোহসৌ।
আকাশঞ্চ ক্ষিতিতলমতুল্যাসিতং ঘোরধূলাং কৃত্বা সৈন্যৈঃ সকলক্ষিতিপতিঃ সত্যমেবং জগাম।
সরস্বতীনদীতীরে কনৌজব্রহ্মশাসনম্। সমুত্তীর্য্য সসৈন্যোহসৌ প্রাবৎ ত্রিবিধং পদং॥"

(ঈশ্বর বৈদিকের কুলপঞ্জী)

ব্যাপারে বিশেষ উদ্বিগ্ন হইয়া তিনি কর্ণাবতীসমাজ হইতে বেদবিদ্ যশোধরমিশ্রকে ১০০১ শকে আনয়ন করেন।'[৩০]

পাশ্চাত্য বৈদিকগণের সকল গ্রন্থেই প্রায় দেখা যায় যে, কর্ণাবতী-সমাজ হইতেই তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষগণ এদেশে আগমন করেন। মহাদেব-শাণ্ডিল্যের সম্বন্ধ-তত্ত্বার্ণবে এই কর্ণাবতীর অবস্থান সম্বন্ধে এইরূপ লিখিত আছে—

কর্ণাবতীসমাজ

'বারাণসীর পশ্চিমদিকে কর্ণাবতী নামক সমাজ অবস্থিত। তথায় বেদাঙ্গের সহিত তিন বেদে পারদর্শী সমস্ত পাণিনি ব্যাকরণে অভিজ্ঞ ঋগ্বেদী যশোধর বাস করিতেন। তথায় যশোধরের আবার তত্তুল্য ত্রিবেদবিদ্যায় নিপুণ হরি, রুদ্র ও গৌরীনামধেয় তিন পুত্র জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। ১০০১ শকে শুক্ল দশমী তিথিতে রাজাকে তুষ্ট করিয়া যশোধর (সপুত্র) কুরুক্ষেত্রদেশে আগমন করেন।'[৩১]

পাশ্চাত্য বৈদিকগণের কুল-পঞ্জিকায় আরও লিখিত আছে,—

"পূর্ব্বে যে সকল ব্রাহ্মণ কর্ণাবতীতে বাস করিতেন, তাঁহারাই পশ্চাৎ বঙ্গে আসিয়া পাশ্চাত্য নামে প্রথিত হইয়াছেন।"[৩২]

মহারাজ সামলবর্ম্মার মাতুল চেদিপতি কর্ণদেবের পুত্র যশঃকর্ণদেবের জবলপুরতাম্রলেখে লিখিত আছে,—'কি আর অধিক কীর্ত্তন করিব? দুগ্ধাব্ধির তরঙ্গবলয়ের ন্যায় এই কাশীধামে যাঁহার (কর্ণদেবের) বিশাল কীর্ত্তি কর্ণমেরু, যাহার কনকশিখরে বাতান্দোলিত বৈজয়ন্তী গগনমণ্ডলে ক্রীড়াশীলা খেচরীগণের শ্রান্তিখেদ নিবারণ করিতেছে! শ্রেয়ঃধামের অগ্রগণ্য, বেদবিদ্যাবল্লীর কন্দস্বরূপ, স্বর্গতরঙ্গিণীর কিরীট, ব্রহ্মার স্তম্ভ ও পৃথিবীর ব্রহ্মলোক স্বরূপ কর্ণাবতী

(৩০) "ততঃ শ্যামলবর্ম্মা তু গত্বা কর্ণাবতীং পুরীঃ।
ন কর্ত্তুঃ সম্মতঃ যজ্ঞে শশাক পৃথিবীপতিঃ॥
কাশীরাজসুতোঃ গত্বা সংস্তুয় চ যশোধরম্।
চকার সম্মতং তস্মিন্ যজ্ঞে শ্যামলবর্ম্মণঃ॥
যশোধরঃ শশধরহরনখপুত্রবিধুমানে শাকে বৈশাখমাসীয়শুক্লদশম্যাগমৎ গৌড়ে শ্যামলবর্ম্ম-রাজধানীম্।"
(পাশ্চাত্য বৈদিককুলপঞ্জিকা)

(৩১) "বারাণসীপশ্চিমসন্নিধানে কর্ণাবতীনাম সমাজসংস্থম্।
ঋগ্বেদিনং সাঙ্গত্রিবেদবিদ্যং অধীতনিঃশেষিতপাণিনীয়ম্॥
তত্তুল্যবিদ্যাশ্রিতয়া বিনীতা যশোধরস্যাত্র সুতা বভূবুঃ।
ভূপালতুল্যা হরিরুদ্রগৌরীশর্ম্মাভিধেয়াঃ সকুলপ্রদীপাঃ॥
শাকেন্দুশূন্যখবিধৌ শকাব্দে বৈশাখমাসস্য সিতে দশম্যাম্।
প্রহর্ষিতস্তেন নৃপেণ সার্দ্ধং যশোধরঃ কুরুক্ষেত্রদেশমাগতঃ॥"

(৩২) "কর্ণাবত্যাং পুরা বাসো যেষামাসীদ্দ্বিজন্মনাম্।
পশ্চাদ্বঙ্গসমায়াতাঃ পাশ্চাত্যাস্তে প্রকীর্ত্তিতাঃ॥"

(নামে সমাজ) বিনি প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন।"[৩৩] এই প্রমাণে বুঝিতেছি—সামলের মাতামহ কর্ণদেবই বৈদিকদিগের কেন্দ্র কর্ণাবতীসমাজ প্রতিষ্ঠা করেন।

কুলগ্রন্থমতে রাজা শ্যামলবর্ম্মা নিজে কর্ণাবতীতে গিয়াও যশোধরকে যজ্ঞ করিবার জন্য সম্মত করাইতে পারেন নাই। তখন কাশীরাজ স্বয়ং গিয়া যশোধরকে বিশেষরূপে স্তুতি করিয়া সামলবর্ম্মার যজ্ঞে ব্রতী হইবার জন্য সম্মত করাইয়াছিলেন। পাশ্চাত্য বৈদিক কুলপঞ্জিকায় উক্ত কাশীরাজের নাম নাই। কিন্তু উক্ত কাশীরাজ অপর কেহ নহেন, সামলের মাতামহ কর্ণাবতীসমাজপ্রতিষ্ঠাতা মহারাজাধিরাজ স্বয়ং কর্ণদেব। ৭৯৩ চেদি-সংবতে উৎকীর্ণ কর্ণদেবের তাম্রশাসন হইতে পাইয়াছি যে, তৎপূর্ব্বে তিনি কর্ণাবতীসমাজ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, এবং পূর্ব্বে দেখাইয়াছি যে, কর্ণদেব ১০২৯ হইতে ১০৮৯ খৃষ্টাব্দের মধ্যে প্রায় ৬০ বর্ষ রাজত্ব করেন।

একাধিক বৈদিক-কুলগ্রন্থে সামলবর্ম্মার শৌর্য্যবীর্য্য ও ধর্ম্মনিষ্ঠার পরিচয় পাইয়াছি। তন্মধ্যে অনেকগুলির মধ্যে পরবর্ত্তী ইতিহাসানভিজ্ঞের যথেষ্ট হাত পড়িয়াছে, আবার নকলকারীর অনবধানতায় কোন কোন কুলগ্রন্থ কিছু কিছু বিকৃত হইয়াছে।[৩৪]

বৈদিক কুলগ্রন্থ

বঙ্গের জাতীয় ইতিহাসে পাশ্চাত্য-বৈদিক-বিবরণ-প্রকাশকালে নানা স্থান হইতে তাহাদের নকল পাইয়াছিলাম। কথায় বলে "সাত নকলে আসল খাস্তা" এই কারণে বৈদিক বিবরণপ্রসঙ্গে বহু দিন হইল যাহা প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে কতকগুলি গুরুতর ভ্রম ঘটিয়া গিয়াছে।[৩৫] কিছু দিন হইল, ঈশ্বর-বৈদিক রচিত একখানি বৈদিক-কুলপঞ্জী আমাদের হস্তগত হইয়াছে। পুথিখানি তালপত্রে লিখিত—অতিপ্রাচীন। এই পুথিতে লিখিত আছে—

'কুলতত্ত্ব-সম্বন্ধীয় মূলগ্রন্থগুলি বিচার করিয়া এবং তাম্রশাসন দেখিয়া এই কুলপঞ্জী রচিত

(৩৩) "কনকশিখরবেল্লবৈজয়ন্তীসমীরগ্লপিতগগনখেলৎখেচরীচক্রখেদঃ।
কিমপরমিহ কাশ্যাং যস্য দুগ্ধাব্ধিবীচীবলয়বহলকীর্ত্তেঃ কীর্ত্তনং কর্ণমেরুঃ।
অগ্রাং ধাম শ্রেয়সো বেদবিদ্যাবল্লীকন্দঃ যৎপ্রবন্ধ্যাঃ কিরীটং।
ব্রহ্মস্তম্ভো যেন কর্ণাবতীতি প্রত্যষ্ঠাপি ক্ষ্মাতলব্রহ্মলোকঃ।"

যশঃকর্ণদেবের জবলপুর-তাম্রলেখ ১০-১১ শ্লোক (Epi. Ind. vol. II, p. 4)

উক্ত সম-সাময়িক লিপিতে কর্ণাবতী সম্বন্ধে যেরূপ পরিচয় আছে, পরবর্ত্তী বৈদিক কুলপঞ্জিকায় ঐরূপ পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। যথা—

'আস্তে কর্ণাবতী নাম নগরী স্বর্গরীয়সী। গঙ্গাকল্লোলপূতেন বাতেন বিমলীকৃতা।
বেদপারজ্ঞাঃ সর্ব্বে বৈদিকাচারতৎপরাঃ। বসন্তি ব্রাহ্মণাস্তত্র যজ্ঞনির্ধূতকল্মষাঃ।"

(রামভদ্রকৃত পাশ্চাত্যবৈদিককুলদীপিকা)

(৩৪) ভারতবর্ষ ১৩২০, ১ম সংখ্যায় "কুলগ্রন্থের ঐতিহাসিকতা" প্রবন্ধে আধুনিক বৈদিক কুলগ্রন্থগুলির সমালোচনা করা হইয়াছে।

(৩৫) বঙ্গপ্রকাশিত বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস, ব্রাহ্মণকাণ্ড, ১ম অংশে বিস্তৃত বিবরণ দ্রষ্টব্য।

হইয়াছে।"[৩৬] পাশ্চাত্যবৈদিকগণের কুলগ্রন্থের পাতড়া মধ্যে অনেক স্থলে শ্যামলবর্ম্মার তাম্রশাসনের প্রতিলিপি পাইয়াছি, ঈশ্বর বৈদিক তাম্রশাসনের আভাস দিলেও তাঁহার গ্রন্থ মধ্যে শাসনলিপি উদ্ধৃত হয় নাই, সুতরাং তিনি কিরূপ পাঠ অবলম্বন করিয়াছিলেন, তাহা ঠিক বুঝা গেল না।[৩৭] তাঁহার গ্রন্থে ঠিক এইরূপ সামলবর্ম্মার বংশ-পরিচয় আছে—

'কাশীর নিকটস্থ' প্রদেশে যেখানে স্বর্ণবস্ত্রময়ী মঙ্গলপ্রদা, সজ্জনতোষিণী, ও স্বর্ণগঙ্গার সলিল দ্বারা পবিত্রা 'স্বর্ণরেখা' নাম্নী পুরী বিদ্যমান, তথায় বীরবংশীয় ত্রিবিক্রম মহারাজ আধিপত্য করিতেন। সেই স্থানে সেই মহীপাল মালতী নাম্নী স্ত্রীতে 'কর্ণসেন' নামে এক আত্মজ উৎপাদন করিয়াছিলেন। সেই মহামতি কর্ণসেনও সেই পুরে রাজত্ব করিতেন। তাহার কন্যা পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় রূপবতী বিলোলা স্ত্রীর গর্ভে মল্ল ও স্যামলবর্ম্মা নামে পৃথিবীর রক্ষকস্বরূপ দুইটী পুত্র জন্মগ্রহণ করেন।[৩৮]

ঈশ্বর বৈদিক পিতা ও পিতামহের নাম উল্লেখ না করিয়া মাতামহ কর্ণের[৩৯] নাম করিলেন কেন?

(৩৬) "বিচার্য্য রত্নমূলানি চালোক্য তাম্রশাসনম্।
ক্রিয়তে কুলপঞ্জীয়মীশ্বরেণ চ ধীমতা॥"

(৩৭) পাশ্চাত্য-বৈদিকগণের সকল কুলগ্রন্থে "শ্যামলবর্ম্মা" পাঠ আছে, কিন্তু আমাদের আলোচ্য ঈশ্বরবৈদিক রচিত তালপত্রে লিখিত কুলপঞ্জীর মধ্যে "সামলবর্ম্মা" ও "শ্যামলবর্ম্মা" এই উভয় পাঠই দৃষ্ট হয়। অথচ এই পুথিখানিতে বর্ণাশুদ্ধি নাই বলিলেই চলে। এদিকে নবাবিষ্কৃত ভোজের তাম্রশাসনের সর্ব্বত্রই "সামলবর্ম্মা" ও এক স্থানে মূলের প্রতিকৃতিতে "স্যামলবর্ম্মা" (১ম পৃষ্ঠা ২০শ পংক্তি) পাঠই আছে। ইহাতে মনে হয় যে, এরূপ কোন তাম্রশাসন ঈশ্বর বৈদিকের নয়নগোচর হইয়া থাকিবে।

(৩৮) "ত্রিবিক্রম মহারাজ শূরবংশসমুদ্ভবঃ। আসীৎ পরমধর্ম্মজ্ঞো দেশে কাশীসমীপতঃ॥
স্বর্ণরেখা পুরী যত্র স্বর্ণবস্ত্রময়ী শুভা। স্বর্ণগঙ্গাসলিলৈঃ পূতা সর্ব্বসজ্জনতোষিণী॥
অসৌ তত্র মহীপালো মালত্যাং নামতঃ স্ত্রিয়াং। আত্মজং জনয়ামাস নাম্না-কর্ণসেনকং॥
আসীৎ স এব রাজা চ তত্র পুর্য্যাং মহামতিঃ। কন্যা তস্য বিলোলা চ পূর্ণচন্দ্রসমদ্যুতিঃ॥
স্ত্রিয়াং তস্যাং হি যৌ পুত্রৌ মল্লস্যামলবর্ম্মকৌ। স এব জনয়ামাস ক্ষৌণীরক্ষাকরাবুভৌ॥"

(৩৯) মূল পুথিতে এই নামটী অস্পষ্ট থাকায়, পরবর্ত্তী অপর বৈদিক-পঞ্জীকারগণ কেহ 'বিমলসেন' কেহ বা 'বিজয়সেন' পাঠ গ্রহণ করিয়াছেন। ঈশ্বরের কুলপঞ্জীর যে নকল পাইয়াছিলাম এবং বঙ্গের জাতীয় ইতিহাসে বৈদিক-বিবরণ-প্রসঙ্গে যাহা উদ্ধৃত করিয়াছি, তাহাতে বিজয়সেন নাম ভুল হইয়াছে। যিনি নকল করিয়া পাঠাইয়াছিলেন, তাঁহার বর্ত্তমান বাঙ্গালার ইতিহাসে জ্ঞান থাকায়, এখন দেখিতেছি—তিনি মূল পুথির পাঠ কাটিয়া উদ্ধৃত শ্লোকের এইরূপে পাঠ পরিবর্ত্তন করিয়াছেন—

১ম "শূরবংশ" স্থানে 'সেনবংশ', ২ "দেশে কাশীসমীপতঃ" স্থানে "কাশীপুরী সমীপতঃ", ৩ "স্বর্ণরেখা পুরী যত্র" স্থানে "স্বর্ণরেখা নদী যত্র", ৪ "স্ত্রীকর্ণসেনকং" স্থানে 'স্ত্রীবিজয়সেনকং', ৫ "কন্যা তস্য বিলোলা চ" স্থানে "পত্নী তস্য বিলোলা চ" এবং আরও দুই এক স্থলে অবশিষ্ট অংশ পূরণ করিয়া দিয়াছেন। পূর্ব্বে মূল পুথিখানি হস্তগত না হওয়ায় এই ভ্রম সংশোধন করিবার সুযোগ আসে নাই। এ জন্য সামলবর্ম্মা সম্বন্ধে অনেক ভ্রম কথা লিখিতে হইয়াছে। এক্ষণে সেই ভ্রম সংশোধন করিতেছি।

মনে হয়, যখন মহারাজ হরিবর্ম্মদেব বঙ্গে আধিপত্য করিতেছিলেন, তৎকালে সামলবর্ম্মা মাতুলালয়ে অবস্থান করিতেছিলেন। তাঁহার মাতামহ কর্ণদেব যখন মালব অধিকার করেন, তৎকালে হয়ত সামলও তাঁহার সহিত মালবে উপস্থিত ছিলেন, তাহাতে মালবরাজকন্যার পাণিগ্রহণে তাঁহার সুবিধা ঘটিয়াছিল। মাতুলালয়েই তাঁহার অভ্যুদয় হইয়াছিল, বিশেষতঃ তাঁহার মাতামহপ্রতিষ্ঠিত কর্ণাবতী সমাজই পাশ্চাত্য-বৈদিকগণের বীজপুরুষগণের আদি লীলাস্থলী ছিল বলিয়া কুলপঞ্জিকায় মাতামহবংশের পরিচয় উদ্ধৃত হইয়া থাকিবে। পূর্ব্বেই লিখিয়াছি যে, সামলবর্ম্মা শ্বশুরকুলের সাহায্যেই বঙ্গাধিপত্য লইতে সমর্থ হইয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা মল্লবর্ম্মার ভাগ্যে আধিপত্যলাভ ঘটে নাই, তিনি মাতুলালয়েই প্রথিত হইয়াছিলেন। ঈশ্বর বৈদিক লিখিয়াছেন,—'গৌড়দেশবাসী শত্রুগণকে জয় করিয়া, ও বঙ্গদেশনিবাসী রিপুশার্দ্দূলকে বিশেষভাবে পরাজিত করিয়া পরম ধর্ম্মজ্ঞ রাজা সামলবর্ম্মা নামে প্রথিত হইয়াছিলেন। ভুজবলে পঞ্চাননের তুল্য মহাবলশালী সেই নৃপতি বর্ম্মমহীপতিকে জয় করিয়াই শ্রীমদ্‌বিক্রমপুর নামক নগরে রাজা হইয়াছিলেন।'[৪০]

ঈশ্বর বৈদিক যাঁহাকে বঙ্গবাসী 'রিপুশার্দ্দূল' ও 'বর্ম্মমহীপতি' বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, তাঁহাকেই আমরা বঙ্গাধিপ হরিবর্ম্মদেব অথবা তৎপুত্র বলিয়া মনে করি।

পাশ্চাত্যবৈদিককুলপঞ্জিকায় লিখিত আছে—

"গৌড়ে ধর্ম্মপরায়ণ মহারাজ শ্যামল আবির্ভূত হইয়াছিলেন। সেই মহীপতি বহু প্রচণ্ড নৃপতি-কর্ত্তৃক অর্চ্চিত হইয়াছিলেন। ৯৯৪ শকে বা ১০৭২ খৃষ্টাব্দে নিজ বাহুবলে শত্রুগণকে পরাভূত করিয়া স্বয়ং গৌড়ে রাজা হইয়াছিলেন।"[৪১] যে সময়ের কথা লিখিত হইল, তৎকালে গৌড় ও বঙ্গ ভিন্ন রাজ্য বলিয়াই গণ্য ছিল। অথচ রাঢ়দেশ গৌড়মধ্যেই গণ্য হইত, সে সময়কার "প্রবোধচন্দ্রোদয় নাটক" হইতেই তাহার প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে।[৪২] এ অবস্থায় শ্যামলবর্ম্মার প্রথম অভিষেক গৌড়দেশেই হইয়াছিল, তখনও পূর্ব্ববঙ্গে হরিবর্ম্ম

(৪০) "মল্লস্তত্রৈব প্রথিতঃ সামলোঽত্র সমাগতঃ।
জেতুং শত্রুগণান্ সর্ব্বান্ গৌড়দেশনিবাসিনঃ।
বিজিত্য রিপুশার্দ্দূলং বঙ্গদেশনিবাসকং।
রাজাসীৎ পরমধর্ম্মজ্ঞো নাম্না সামলবর্ম্মকঃ॥
জিত্বা বর্ম্মমহীপতিং ভুজবলৈঃ পঞ্চাস্যতুল্যো বলী
শ্রীমদ্বিক্রমপুরনাম নগরে রাজা ভবন্নিশ্চিতম্।
ভূপালেন্দ্রকুলাবতারকলিতঃ ক্ষৌণীসরঃপঙ্কজঃ
সোঽয়ং বঙ্গশিরোমণিঃ ক্ষিতিতলে ব্যালেন্দুকীর্ত্তিপরা॥"
(ঈশ্বর বৈদিক কৃত বৈদিককুলপঞ্জী)

(৪১) "আসীদ্ গৌড়ে মহারাজঃ শ্যামলো ধর্ম্মতৎপরঃ। প্রচণ্ডাশেষভূপালৈরর্চ্চিতঃ স মহীপতিঃ॥
বেদগ্রহগ্রহমিতে স বভূব রাজা গৌড়ে স্বয়ং নিজবলৈঃ পরিভূয় শত্রূন্॥" (পাশ্চাত্য-বৈদিক-কুলপঞ্জিকা)

(৪২) "গৌড়রাষ্ট্রমনুত্তমং নিরুপমা তত্রৈব রাঢ়াপুরী।"—(প্রবোধচন্দ্রোদয়-নাটক)

দেশে অধিষ্ঠিত ছিলেন এবং উত্তরবঙ্গে পালগৌড়েশ্বর ও কৈবর্ত্তনায়ক ভীমের সমরক্রীড়ার অবসান হইয়া আসিতেছিল। বলাবাহুল্য তৎকালে রাঢ় ও নিকটবর্ত্তী জনপদ-সমূহের বীরগণ সকলেই প্রায় রামপালের পক্ষভুক্ত থাকিয়া সসৈন্যে উত্তরবঙ্গে বিরাজ করিতেছিলেন। এই শুভ অবসরে মালব ও কর্ণাটগণের সাহায্যে[৪৩] যাদববীর সামলবর্ম্মা রাঢ়দেশেই প্রথমতঃ প্রতিষ্ঠিত হইয়া থাকিবেন। তৎপরে ক্রমে ক্রমে সমস্ত পূর্ব্ববঙ্গে আধিপত্য বিস্তারে সমর্থ হইয়াছিলেন। ঈশ্বর-বৈদিকের সংক্ষিপ্ত বিবরণী হইতে মনে হয় যে, গৌড়দেশে তাঁহাকে অনেকের সহিত যুদ্ধ করিতে হইয়াছিল। কিন্তু একমাত্র রিপু-শার্দ্দূল বঙ্গমহী-পতিকে জয় করিয়া তিনি বিক্রমপুরের সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন।

৯৯৪ শক

গৌড়ের সামাজিক ইতিহাসে "৯৯৪ শকাব্দ" স্বর্ণাক্ষরে অঙ্কিত দেখিতে পাই; কি রাঢ়ীয়, বঙ্গজ বা বারেন্দ্র কায়স্থ, কি পাশ্চাত্য বৈদিক, কি ব্রাহ্মণ-কায়স্থ ইঁহাদের সমাজের কুলগ্রন্থে এই ৯৯৪ শকাব্দটী লিপিবদ্ধ রহিয়াছে। যে দেশের কুলাচার্য্যগণ কাল-নির্ণয়ে বা শকাব্দাদি রক্ষায় সাধারণতঃ অনভ্যস্ত, সেই দেশেরই কুলগ্রন্থকারদিগের হস্তে এরূপ বিশেষভাবে শকাব্দ অবধারণের কারণ কি? উপরে বলিয়াছি, ৯৯৪ শকে পাশ্চাত্য বৈদিক-প্রতিষ্ঠাতা সামলবর্ম্মার অভিষেক। এদিকে এদেশের ভাটগণ দক্ষিণরাঢ়ীয় কায়স্থগণের বিবাহসভায় সমস্বরে কীর্ত্তন করিয়া থাকেন যে, পঞ্চ কায়স্থ পঞ্চব্রাহ্মণের সহিত ৯৯৪ শকে আশ্বিনমাসে পূর্ণিমায় শুক্রবারে গৌড়-রাজসভায় আগমন করেন।[৪৪] শতাধিক বর্ষ পূর্ব্বে রচিত দ্বিজবাচস্পতির "বঙ্গজ-কুলজী-সার-সংগ্রহে"ও ভাটগাথারই সমর্থন পাইতেছি[৪৫]। আবার প্রসিদ্ধ বারেন্দ্র-ঢাকুর-রচয়িতা যদুনন্দনও লিখিয়াছেন যে, ঐ সময়ে পঞ্চঘর কায়স্থ আসিয়াছিলেন, কিন্তু সম্মানিত ও মূল বারেন্দ্র কায়স্থবংশের তখন ২০ পুরুষ গণিত হইতেছিল, তৎকালে বল্লালী কৌলীন্যের নাম-গন্ধ ছিল না, সপ্তদশ ঘর কায়স্থ এসময়ে মিলিত হন নাই।[৪৬]

(৪৩) সামলবর্ম্মার অভ্যুদয়কালে রাঢ়ের কর্ণাট ক্ষত্রিয় সেনবংশ বোধ হয় কোনপ্রকারে তাঁহাকে সাহায্য করিয়াছিলেন। পরে তিনি বিজয়সেনের অভ্যুদয়ের পর রাঢ় ছাড়াইয়া সেনরাজের অধীন নৃপতিরূপে বঙ্গে কিছুকাল রাজত্ব করিয়াছিলেন। সেই ঘটনাই বিকৃত করিয়া ও পূর্ব্ব ইতিহাসে গোলযোগ ঘটাইয়া পাশ্চাত্যকুলপঞ্জিকাকার সামলকে বিজয়ের পুত্র-নির্দ্দেশ করিয়া ভ্রমে পতিত হইয়াছেন।

(৪৪) "শক ব্যবধান কর অবধান ব্রাহ্মণ পশ্চাৎ যথা। অঙ্কে অঙ্কে বামাগতি বেদযুক্ত তথা॥
কন্যাগত তুলার অঙ্কে শুক্র পূর্ণদিনে। সহর পঞ্চর ত্যেজিয়া গৌড়ে প্রবেশিলেন এসে॥"

(ভাটের কথা)

(৪৫) "নবশত চৌয়ানই শক পরিমাণে। আসিলেন দ্বিজগণ রাজসন্নিধানে॥
পঞ্চ কায়স্থ সঙ্গে আরোহণ ঘোষানে। সম্মানপূর্ব্বক স্থান রাখিলা সর্ব্বজনে॥"

(দ্বিজ বাচস্পতি)

(৪৬) "কারো কিন্তু পূর্ব্বভাব নহে উপেক্ষিত। আর পঞ্চঘর পরে হইলা উপনীত॥
পরে সপ্তদশ ঘর পাইল সম্মান। প্রাণপণে কুলকার্য্য করিয়া প্রধান॥

উদ্ধৃত কুলপরিচায়ক বিবরণী হইতে মনে হইতেছে, গৌড়ান্তর্গত রাঢ়ের রাজসভায় ঐ শকে বিশেষ কোন ধর্ম্মনৈতিক, সমাজনৈতিক অথবা রাজনৈতিক ব্যাপার অনুষ্ঠিত হইয়াছিল, যে জন্য ঐ শকাঙ্ক বহুকাল গৌড়বাসীর হৃদয়ে অঙ্কিত ছিল। আমাদের মনে হয়, যে সময়ে কৈবর্ত্ত-নায়কের হস্ত হইতে গৌড়েশ্বর রামপাল হিন্দুধর্ম্মানুরাগী রাজন্যবর্গের আনুকূল্যে বরেন্দ্রী উদ্ধার করিয়া মহোৎসবে ব্যাপৃত ছিলেন, তৎকালে রাঢ়দেশে শ্যামলবর্ম্মার অভিষেক-উৎসব উপলক্ষেও ব্রাহ্মণ গৌরব প্রতিষ্ঠার সূচনা হইতেছিল। যাদব, কর্ণাট ও মালব বীরগণ সকলেই প্রায় বৈদিক-ধর্ম্মানুরাগী ছিলেন, তাঁহাদের উৎসাহে নানাস্থান হইতে বেদবিদ্ ব্রাহ্মণ আসিয়া রাঢ়াধিপতির সভায় সম্মানিত হইয়াছিলেন। এই সময়ে উত্তররাঢ় হইতে পঞ্চঘর কায়স্থ আসিয়া রাঢ়াধিপের নিকট উপযুক্ত সমাদর লাভ করিয়া দক্ষিণরাঢ়ের অধিবাসী হইয়াছিলেন। সমাগত ব্রাহ্মণ কায়স্থের মধ্যে সমাজসংস্কারের উদ্যোগ আরম্ভ হয় একারণ তাঁহাদের অধিকাংশ কুলগ্রন্থে উক্ত শকাঙ্ক প্রতিবদ্ধ হইয়াছে। কিন্তু রাঢ়ের রাজলক্ষ্মী বেশীদিন সামলবর্ম্মার প্রতি প্রসন্না ছিলেন না। সামলের শ্বশুর-কুলপালিত মালব ও মাতামহপুষ্ট কর্ণাটসেনা রাঢ়ভূমি পরিত্যাগ করিবার পর সেনবংশ প্রবল হইয়া তাঁহাকে রাঢ়দেশ হইতে সম্ভবতঃ বিতাড়িত করেন এবং পূর্ব্ববঙ্গে সেন বংশের করদরূপে কিছুকাল আধিপত্য করিতে থাকেন।[৩৭]

বলা বাহুল্য হরিবর্ম্মদেবের ন্যায় মহারাজ সামলবর্ম্মাও একজন পরম বৈষ্ণব ও বৈদিক বিপ্রভক্ত ছিলেন, তাঁহার সময়ে পশ্চিমাঞ্চল হইতে বহু বৈদিক ব্রাহ্মণ বঙ্গদেশে আসিয়া বাস করেন, তাঁহাদের বংশধরগণই এক্ষণে পাশ্চাত্য বৈদিক নামে খ্যাত। ঈশ্বর বৈদিকের বিবরণী হইতে জানা যায় যে, তাঁহার রাজধানী বিক্রমপুর 'বীরেশ্বরশঙ্করবসতি, ব্রহ্মপুত্র-জলকল্লোল-

বিক্রমপুর রাজধানী

বলয়িত, বিবিধ মনোহর মন্দিরনগরতরুবরাদিভূষিত ও বিবিধ বুধগণ সেবিত' ছিল। 'বীরেশ্বর শঙ্কর' সম্ভবতঃ সামলের মাতা বীরশ্রীর স্মৃতি-উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠিত কোন বৃহৎ শিবমূর্ত্তি হইবে। তিনি কত দিন বঙ্গরাজ্য শাসন করেন,

যাহার বিশেতি লোকে বল্লাল মর্য্যাদা। মরণ চুয়ানব্বই শকে ছিল না একদা ॥
এই সব কালে নহে সপ্তদশ ঘর। দুই তিন পঞ্চ সপ্ত ঘর মাত্র সার ॥" (যদুনন্দনের ঢাকুর)

(৩৭) তাই আমরা সামন্তসারের বৈদিক-কুলার্ণব হইতে এইরূপ বচন পাইয়াছি—

"গঙ্গায়াঃ পূর্ব্বভাগঞ্চ মেঘনাদস্য চ পশ্চিমং।
উত্তরাল্লবণাব্ধেশ্চ বারেন্দ্রাচ্চৈব দক্ষিণম্॥
করদং রাজ্যমাসাদ্য শ্যামলাখ্যোপ্যশাসয়ৎ।
সেনবংশীয়ভূপানামাজ্ঞয়া বর্ম্মভাক্ ॥"

গঙ্গার পূর্ব্বভাগ, মেঘনাদনদীর পশ্চিম, লবণসমুদ্রের উত্তর এবং বারেন্দ্রের দক্ষিণে সেনবংশীয় রাজার আজ্ঞায় করদরূপে বর্ম্মণরাজ শ্যামল রাজ্য-শাসন করিতেন।

তাহা ঠিক বলিতে পারা যায় না।[৪৮] বেলাব-তাম্রলেখ হইতে জানিতে পারি যে, সামলবর্ম্মার পর তাঁহার পাটরাণী মালবদেবীর গর্ভজাত ভোজবর্ম্মদেব বিক্রমপুরের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। ঐ শাসনলিপির ১৩শ শ্লোক হইতে মনে হয় যেন ভোজবর্ম্মা পিতৃকুল ও মাতৃকুল উভয় বংশের একমাত্র বংশধর ছিলেন।[৪৯] রাজপুতনার ভাটদিগের গ্রন্থে বঙ্গাধিপ ভোজদেবের মাতামহ জগদেবের মৃত্যু-সম্বন্ধে এই কবিতাটি পাওয়া যায়—

ভোজবর্ম্মা

> "সম্বৎ গায়সৌ একাবন চৈত্র সুদী রবিবার।
> জগদেব সীস সমীপয়ে ধারানগর পঁবার॥"

১১৫১ সংবৎ অর্থাৎ ১০৯৪ খৃষ্টাব্দে চৈত্র শুক্লপক্ষে রবিবার দিবসে ধারানগরের পরমার জগদেব কালীমাতার সম্মুখে নিজমস্তক উৎসর্গ করিয়াছিলেন। সম্ভবতঃ তাঁহার কন্যা ভিন্ন এ সময়ে অপর কোন বংশধর ছিলেন না। ঐ সময়ে সামলবর্ম্মা বিক্রমপুরে অধিষ্ঠিত ছিলেন। পূর্ব্বেই লিখিয়াছি যে ১০৭৯ খৃষ্টাব্দে তিনি বিক্রমপুরে শাকুনসত্র সম্পন্ন করেন। সম্ভবতঃ তিনি ঐ সময়ে বা তাহার কিছু পূর্ব্বে রাঢ় হইতে এ দেশে আসিয়া রাজত্ব করিতে থাকেন। তাঁহার রাজ্যকাল মোটামুটী ২৫ বর্ষ স্বীকার করিলে ১০৯১ খৃষ্টাব্দে তৎপুত্র ভোজবর্ম্মার রাজ্যারম্ভ ধরিয়া লইতে পারি। ভোজবর্ম্মার তাম্রলেখ হইতে জানা যায় যে, তাঁহার শাসনের শ্লোকরচয়িতা কবি পুরুষোত্তম তাঁহার পিতৃসভাতেও রাজকবির আসন অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। কবি উক্ত রাজপ্রশস্তির শেষ শ্লোকে লিখিয়াছেন,—

"হা ধিক্! কি কষ্ট! অদ্য পৃথিবী বীরশূন্য হইয়াছে! তবে কি আবার রাক্ষসগণের উৎপাত উপস্থিত? শঙ্কাই বা কি? এখন ভুবন অলঙ্কাধিপ অর্থাৎ রাবণশূন্য হইয়াছে। (রাজা ভোজ) কুশলী হউন।"[৫০]

পূর্ব্বেই লিখিয়াছি যে, সামলবর্ম্মার পিতা জাতবর্ম্মা দিব্য নামক কৈবর্ত্ত-নায়কের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন। হয়ত কৈবর্ত্তপতি রাবণরূপী ভীমের পক্ষীয় যোদ্ধৃবর্গের অনুসরণ করিয়া রামপাল কিছু দিনের জন্য পূর্ব্ববঙ্গে আগমন করিয়াছিলেন, আর সামলবর্ম্মা তৎকালে ভীমপক্ষকে ধ্বংস করিয়া উৎপাত নিবারণ করিয়াছিলেন, রাজকবি যেন তাহারই আভাস দিয়াছেন। যেখানে সামলবর্ম্মা গৌড়াধিপ রামপালকে অভ্যর্থনা করিয়াছিলেন, সেই

(৪৮) কোন কোন আধুনিক বৈদিক কুলগ্রন্থমধ্যে শ্যামলবর্ম্মার তাম্রশাসনের প্রতিলিপি উদ্ধৃত হইয়াছে, কিন্তু নানাকারণে সেই আধুনিক অনুলিপির উপর আমাদের সন্দেহ জন্মিয়াছে। অল্প দিন হইল, ঢাকার সেটলমেণ্ট অফিসর আস্কলি সাহেব ইদিলপুরে শ্যামলবর্ম্মার তাম্রশাসনের অস্তিত্বসংবাদ প্রকাশ করিয়াছেন। (Dacca Review, 1912, p, 136) কিন্তু এখনও পর্য্যন্ত সেই মূল তাম্রশাসনের প্রকৃত পাঠ কোথাও প্রকাশিত না হওয়ায় পূর্ব্বোক্ত অনুলিপির মৌলিকতা সম্বন্ধে স্থিরসিদ্ধান্ত হইতেছে না।

(৪৯) "আসীত্তয়োঃ সমুদ্ভবিষ্ণুরভবৎ যঃ শ্রীভোজবর্ম্মোজ্জ্বলদীপঃ।"

(৫০) "হাধিক্ কষ্টমবীরমদ্যভুবনং ভূয়োপি কিং রক্ষসা-
মুৎপাতোহয়মুপস্থিতোত্র কুশলী শঙ্কাহলঙ্কাধিপঃ।"১৩ (ভোজবর্ম্মার বেলাবলিপি)

স্থানই বোধ হয় এক্ষণে বিক্রমপুরের মধ্যে "রামপাল" নামে পরিচিত রহিয়াছে। যাহা হউক, রাজকবির উক্তি হইতে আরও মনে হয় যেন ভোজবর্ম্মার উক্ত তাম্রশাসন দানকালেও কোন প্রকার বিঘ্ন উপস্থিত হইয়াছিল এবং সেই বিঘ্ন শান্তি করিয়াছিলেন বলিয়াই যেন বঙ্গাধিপ শান্ত্যাগারাধিকৃত সাবর্ণগোত্র যজুর্ব্বেদ কণ্বশাখাধ্যায়ী শ্রীরামদেবকে তাম্রলেখ দ্বারা ভূমিদান করিয়াছিলেন। তাঁহার তাম্রলেখে শ্রীরামদেবের পিতার নাম বিশ্বরূপ, পিতামহের নাম জগন্নাথ ও প্রপিতামহের নাম পীতাম্বর দেবশর্ম্মা লিখিত আছে এবং পীতাম্বর 'মধ্যদেশবিনির্গত উত্তররাঢ়ায়াং সিদ্ধলগ্রামীয়' বলিয়া অভিহিত হইয়াছেন। এদিকে ভবদেবভট্টের কুলপ্রশস্তিতেও তাঁহার পূর্ব্বপুরুষগণ সাবর্ণ গোত্রীয় ও সিদ্ধলগ্রামবাসী বলিয়া পরিচিত। উক্ত রামদেব ও ভবদেব উভয়ের এক গোত্র ও উভয়ে এক স্থানের অধিবাসী বলিয়া উল্লেখ থাকায় কেহ কেহ উভয়কে এক বংশসম্ভূত বলিয়া মনে করেন। কিন্তু উভয় বংশের এক বেদ ছিল কি না, তাহাতে সন্দেহ রহিয়াছে। ভবদেবের গ্রন্থাবলী ও তাঁহার কুলপ্রশস্তি হইতে মনে হয় না যে, তিনি যজুর্বেদী ছিলেন। তিনি সামবেদীর জন্য 'ছন্দোগসংস্কারপদ্ধতি' রচনা করেন। ইহাতে বরং তাঁহাকে সামবেদী বলিয়াই মনে হয়। হয়ত বঙ্গাধিপের সান্ধিবিগ্রহিক তাঁহার পিতামহ নিজ গ্রামবাসী অনেক নিষ্ঠাবান্ ব্রাহ্মণসন্তানকে আনিয়া বঙ্গাধিপের কার্য্যে নিয়োজিত করিয়া থাকিবেন, তাঁহাদের মধ্যে রামদেবের প্রপিতামহ একজন হইতে পারেন। অথবা সামলবর্ম্মার সহিতই রাঢ়বাসী রামদেব বঙ্গরাজধানীতে আসিয়া শান্তিগারাধিকারীর পদে অধিষ্ঠিত হইয়া থাকিবেন।

বঙ্গাধিপ ভোজবর্ম্মা বিক্রমপুর পরগণার মধ্যে যেখানে নিজ নামে ভোজেশ্বর নামে দেবমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করেন, সেই স্থানই সম্ভবতঃ অধুনা ভোজেশ্বর নামে পরিচিত ও পাশ্চাত্য বৈদিকগণের একটি সমাজ বলিয়া পরিগণিত হইতেছে।

নিম্নে বর্ম্মবংশের বংশলতা ও আনুমানিক রাজত্বকাল প্রদত্ত হইল—
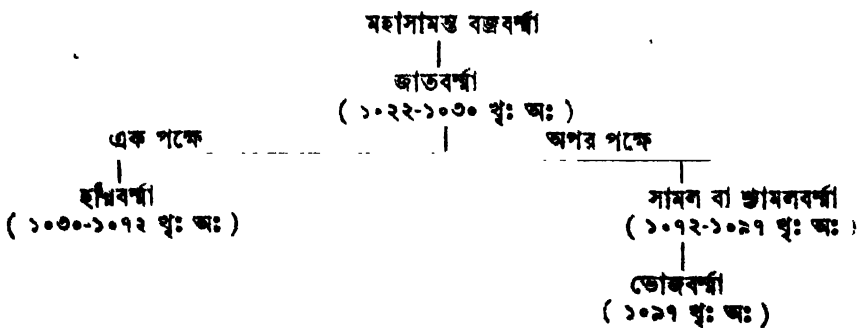
বেলাব-তাম্রলেখ হইতে জানা যায় যে, ভোজবর্ম্মা রাজত্বের ৫ম বর্ষে রামদেবকে তাম্রশাসন দিয়াছিলেন। তৎপরে তিনি আর কতদিন রাজত্ব করেন, তাহা জানিবার উপকরণ পাওয়া যায় নাই, সম্ভবতঃ বিক্রমপুরে সেনবংশের অপর রাজধানী প্রতিষ্ঠার সহিত বর্ম্মবংশের হস্ত হইতে বঙ্গাধিপত্য বিলুপ্ত হইয়াছিল।

অষ্টম অধ্যায়

সেন-রাজবংশ

যে সময়ে সুদূর উত্তরবঙ্গে কৈবর্ত্ত-বিপ্লব এবং পূর্ব্ববঙ্গে বর্ম্মবংশের অভ্যুদয় হইতেছিল, সেই সময়ে রাঢ়দেশে পুণ্যতোয়া ভাগীরথীতীরে সেনবংশ ধীরে ধীরে মস্তকোত্তোলন করিতেছিলেন। গৌড়াধিপ বিজয়সেনের প্রদ্যুম্নেশ্বরপ্রশস্তি বা দেওপাড়া-শিলালিপিতে বিবৃত হইয়াছে যে, 'দাক্ষিণাত্যে চন্দ্রবংশে বীরসেন প্রভৃতি যে সকল কীর্ত্তিমান্ নৃপতি রাজত্ব করিয়া গিয়াছেন, পরাশরনন্দন বেদব্যাসের লেখনীতে যাঁহাদের কীর্ত্তি বিঘোষিত হইয়াছে, তাঁহাদেরই ব্রহ্ম-ক্ষত্রিয়বংশে সামন্তসেন জন্ম গ্রহণ করেন।'[1] এই সামন্তসেন একজন অদ্বিতীয় বীর ছিলেন। দীর্ঘ ৫টি শ্লোকে কবি উমাপতিধর তাঁহার শৌর্য্যবীর্য্যের পরিচয় দিয়া গিয়াছেন। লক্ষ্মণসেনের

সামন্তসেন

মাধাই-নগর-তাম্রলেখেও সামন্তসেন 'কর্ণাটক্ষত্রিয়দিগের কুল-শিরোদাম'[2] বলিয়াই পরিকীর্ত্তিত হইয়াছেন। এদিকে বিজয়সেনের শিলালিপিতেও বর্ণিত হইয়াছে, 'যিনি শত্রুকুলাচ্ছন্ন কর্ণাটরাজলক্ষ্মীর লুণ্ঠনকারী-দুর্বৃত্তগণের ধ্বংসসাধন করিয়া একাঙ্গবীর নামে প্রথিত হইয়াছিলেন।'[3] 'যে স্থান আজ্যধূমের সুগন্ধে আমোদিত, যেখানে মৃগশিশু বৈখানস-রমণীগণের স্তন্যক্ষীর পান করিত, যে স্থান শুকপক্ষিগণের

(১) "বংশে তস্যামরস্ত্রীবিততরতকলাসাক্ষিণো দাক্ষিণাত্য
ক্ষৌণীন্দ্রৈর্বীরসেনপ্রভৃতিভিরভিতঃ কীর্ত্তিমদ্ভির্ব্বভূবে
যচ্চারিত্রানুচিন্তাপরিচয়শুচয়ঃ সূক্তিমাধ্বীকধারাঃ
পারাশর্য্যেণ বিশ্বশ্রবণপরিসরপ্রীণনায় প্রণীতাঃ॥
তস্মিন্ সেনান্ববায়ে প্রতিসুভটশতোৎসাদনব্রহ্মবাদী
স ব্রহ্মক্ষত্রিয়াণামজনি কুলশিরোদাম সামন্তসেনঃ।"
(বিজয়সেনের দেওপাড়া-লিপি ৪-৫ শ্লোক)

(২) "কর্ণাটক্ষত্রিয়াণামজনি কুলশিরোদাম সামন্তসেনঃ।"
(লক্ষ্মণসেনের মাধাইনগর-তাম্রলেখ)

(৩) "দুর্বৃত্তানাময়মরিকুলাকীর্ণকর্ণাটলক্ষ্মী-
লুণ্ঠাকানাং কদনমতনোত্তাদৃগেকাঙ্গবীরঃ।"
(বিজয়সেনের দেওপাড়া-লিপি ৮ম শ্লোক)

ব্রহ্মপারায়ণ বা বেদপাঠ-পরিচিত, ভব-ভয়াক্রান্ত ধার্ম্মিক তপস্বিগণে যে স্থল পরিপূর্ণ, সেই গঙ্গার পবিত্র পুলিনে অরণ্যময় পুণ্যাশ্রমে যিনি বৃদ্ধ বয়সে অতিবাহিত করিয়াছিলেন।"[৪]

উদ্ধৃত প্রমাণ হইতে বেশ জানা যাইতেছে যে, দাক্ষিণাত্যে কর্ণাট-অঞ্চলে সেনরাজবংশের পূর্ব্বপুরুষগণ বাস করিতেন, তথায় ব্রহ্মক্ষত্রিয় বা কর্ণাট-ক্ষত্রিয় বলিয়াও তাঁহারা পরিচিত ছিলেন।

এদিকে বল্লালসেনের সীতাহাটী-তাম্রলেখে লিখিত হইয়াছে, 'সেই (চন্দ্রদেবের) সমৃদ্ধিশালী বংশে রাজপুত্রগণ জন্মগ্রহণ করেন, যাঁহারা সদাচারচর্য্যার খ্যাতি-গৌরবে রাঢ়মণ্ডল অতুল প্রভাবে বিভূষিত করিয়াছিলেন। সেই রাজপুত্রগণের বংশধর শত্রুসেনাসাগরের প্রলয়-তপন, কীর্ত্তিরূপ জ্যোৎস্নায় সমুজ্জ্বলশ্রী, কুমুদবনে শশাঙ্কস্বরূপ প্রিয়জনের আনন্দবর্দ্ধক, আজন্মানুরক্ত সুহৃদগণের মনোরাজ্যে হিমাচলের স্থায় সুপ্রতিষ্ঠ, সত্যশীল ও অকপট করুণা-ধার সামন্তসেন জন্মগ্রহণ করেন।"[৫]

কর্ণাটলক্ষ্মী-লুণ্ঠনকারী দুর্বৃত্তগণের দমন, শেষবয়সে গঙ্গাবাস, আবার রাঢ়মণ্ডলের চন্দ্রবংশে জন্ম এই বিরোধ লক্ষ্য করিয়া কেহ কেহ বলিতে চান, "যদি অনুমান করা যায়, রাঢ়দেশ কর্ণাটরাজের পদানত ছিল, এবং কর্ণাটরাজ কর্ত্তৃক রাঢ়শাসনার্থ নিয়োজিত কর্ণাটক্ষত্রিয়বংশজাত রাজপুত্রগণের বংশে সামন্তসেন জন্মগ্রহণ করিয়া রাঢ়দেশেই কর্ণাটরাজের শত্রুগণের সহিত যুদ্ধে রত ছিলেন, তাহা হইলে এই বিরোধ ভঞ্জন হয়। বিহ্লণ-বিবৃত চালুক্যরাজকুমার বিক্রমাদিত্য * * * গৌড়াধিপকে পরাজিত করিয়া,

(৪) "উদ্দামধ্বান্তধূমৈর্ম্মগশিশুরসিতাশিষ্টবৈখানসস্ত্রী-
স্তন্যক্ষীরাণি ক্ষীরপ্রকরপরিচিতব্রহ্মপারায়ণানি।
যেনাসেব্যন্ত শেষে বয়সি ভবভয়াস্কন্দিভির্ম্মস্করীন্দ্রৈঃ
পূর্ণোৎসঙ্গানি গঙ্গাপুলিনপরিসরারণ্যপুণ্যাশ্রমাণি।" (দেওপাড়া-লিপি ৯ম শ্লোক)

উমাপতি ধরের উক্তি হইতে মনে হয় যে এই সেনবংশ অতি প্রাচীন, পুরাণেও ইঁহাদের পূর্ব্বপুরুষ বীরসেনের কথা আছে। এদিকে স্কন্দপুরাণের সহ্যাদ্রিখণ্ডে দাক্ষিণাত্যের কতকগুলি ব্রহ্মক্ষত্রিয়-রাজবংশের পরিচয় মধ্যে বীরসেনের নামও পাওয়া গিয়াছে। ২৫ বর্ষ পূর্ব্বে বিশ্বকোষে 'কুলীন' শব্দে এই বীরসেনের সন্ধান বাহির করিয়াছি। সহ্যাদ্রিখণ্ডে লিখিত আছে, 'সৌমিনীদেবভক্ত শাণ্ডিল্য ঋষির গোত্রে ভুবনঙ্কর নামে খ্যাত এক মহারাজ আবির্ভূত হইয়াছিলেন, তদ্বংশে দ্যুমৎসেন নামে এক ব্যক্তি রাজচক্রবর্ত্তী বলিয়া খ্যাতিলাভ করেন। তদ্বংশে বীরসেন ও তদনন্তর কান্তিমালী প্রভৃতি জন্মগ্রহণ করেন।' (সহ্যাদ্রিখণ্ড, পূর্ব্বার্দ্ধ, ৩৪।২৫-২৬ শ্লোক)

(৫) 'বংশে তস্যাভ্যুদয়িনি সদাচারচর্য্যানিরূঢ়ি-প্রৌঢ়াং রাঢ়ামকলিতচরৈ র্ভূষয়ন্তোঽনুভাবৈঃ।
শশ্বদ্বিশ্বাভয়বিতরণস্থূললক্ষ্যাবলক্ষৈঃ কীর্ত্ত্যুল্লোলৈঃ স্নপিতবিয়তো জজ্ঞিরে রাজপুত্রাঃ।
তেষাং বংশে মহৌজাঃ প্রতিভটপৃতনাজোধিকালান্তরুদ্রঃ
কীর্ত্তিজ্যোৎস্নোজ্জ্বলশ্রীঃ প্রিয়কুমুদবনোল্লাসলীলামৃগাঙ্কঃ।
আসীদাজন্মরক্তপ্রণয়িগণমনোরাজ্যসিদ্ধিপ্রতিষ্ঠা শ্রীশৈলঃ সত্যশীলো নিরুপধিকরুণাধাম সামন্তসেনঃ।"
(বল্লালসেনের সীতাহাটী-তাম্রলেখ ৩য়, ৪র্থ শ্লোক)

সেই রাঢ়দেশ গৌড়রাষ্ট্র হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়াছিলেন। নবজিত রাঢ়শাসনার্থ কর্ণাটরাজ যে রাজপুত বা ক্ষত্রিয়-সেনানায়ককে নিয়োগ করিয়াছিলেন, সামন্তসেন তাঁহারই বংশধর।"[৬] কিন্তু চালুক্য বিক্রমাদিত্যের সহিত সামন্তসেনের কোন প্রকার সম্বন্ধ ছিল বলিয়া মনে হয় না। সামন্তসেন যে বিক্রমাদিত্যের পূর্ব্ববর্ত্তী, তাহা পরবর্ত্তী সেনরাজবংশের ইতিহাস আলোচনা করিলেই প্রতিপন্ন হইবে।

বাস্তবিক নারায়ণপাল হইতে মদনপাল পর্য্যন্ত পালবংশীয় নৃপতিগণের তাম্রশাসন আলোচনা করিলে আমরা জানিতে পারি যে, তাঁহাদের আধিপত্যকালে যেন তাঁহাদের অধিকারভুক্ত গৌড়মণ্ডলে গোদ বা গৌড়,[৭] মালব, খশ, হূণ, কুলিক, কর্ণাট ও লাটগণ বাস করিতেছিলেন এবং তাঁহারা "সমুপাগতাশেষরাজপুরুষান্" মধ্যে পরিচিত হইয়াছেন। ইহাতে মনে হয় যে নারায়ণপালের পূর্ব্ব হইতে কর্ণাট, লাট প্রভৃতি দেশীয় রাজপুরুষগণ গৌড়দেশে প্রভাব বিস্তার করিতেছিলেন। যাঁহাদের পূর্ব্বাবাস দাক্ষিণাত্যে কর্ণাটে ছিল, পরে রাঢ়দেশে আসিয়া কোন কোন স্থানে সামন্তরূপে কিছুদিন যাঁহারা রাজত্ব করিতে থাকেন, তাঁহারা তাম্রশাসনে কর্ণাটক্ষত্রিয় বা ব্রহ্মক্ষত্রিয় বলিয়া পরিচিত হইয়া থাকিবেন।

আদিশূরের প্রসঙ্গে লিখিয়াছি যে, তিনি মালব কর্ণাট পর্য্যন্ত জয় করিয়াছিলেন। এ সময়ে তাঁহার অধিকারভুক্ত রাঢ়দেশে কর্ণাটসামন্তবংশের সমাগম অসম্ভব নহে। তৎপরে গৌড়-বিজেতা বৎসরাজ রাষ্ট্রকূটনৃপতির হস্তে পরাজিত হইয়া যখন মরুভূমি আশ্রয় করেন, তৎকালে সমস্ত গৌড়মণ্ডল এক প্রকার অরাজক হইয়া পড়িয়াছিল। মনে হয়, এই সময় কর্ণাট-সামন্তবংশ গঙ্গাবিধৌত রাঢ়জনপদে অপরাপর জাতির সহিত প্রাধান্য বিস্তার করিয়াছিলেন।[৮] রাঢ়দেশে কর্ণাটগণের যে উপনিবেশ ও সামন্তরাজ্য ছিল, সম্ভবতঃ পরবর্ত্তীকালে সামন্তসেন দুর্বৃত্ত-আক্রমণকারিগণের হস্ত হইতে সেই অধিকার রক্ষা করিয়া থাকিবেন, বিজয়সেনের প্রদ্যুম্নেশ্বর-প্রশস্তিতে তাহারই আভাস রহিয়াছে। এ অবস্থায় সেনরাজবংশের বীজপুরুষ কর্ণাটবাসী হইলেও পালবংশের সহিত দাক্ষিণাত্যের ঘনিষ্ঠতা বৃদ্ধির সহিত প্রায় খৃষ্টীয় ৯ম শতাব্দী হইতে তাঁহারা দলে দলে রাঢ়দেশে আসিয়া প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। অথচ দাক্ষিণাত্যের কর্ণাটগণের সহিত তাঁহারা এককালে সম্বন্ধবিচ্যুত হইয়াছিলেন

(৬) গৌড়রাজমালা ৪৭ পৃষ্ঠা।

(৭) নারায়ণপালের তাম্রশাসনে 'গোদ' এবং মহীপাল ও মদনপালের তাম্রশাসনে 'গৌড়' নামে পরিচিত।

(৮) ধর্ম্মপালের খালিমপুর-তাম্রশাসনে লিখিত আছে, "মহাসামন্তাধিপতি শ্রীনারায়ণবর্ম্মণা দূতক শ্রীযুবরাজ শ্রীভুবনপালমুখেন বয়মেবং বিজ্ঞাপিতাঃ। যথাস্মাভির্মাতাপিত্রোরাত্মনশ্চ পুণ্যাভিবৃদ্ধয়ে শুভস্থল্যাং দেবকুলং কারিতমত্র প্রতিষ্ঠাপিত ভগবন্নন্ননারায়ণভট্টারকায় তৎপ্রতিপালক-লাটদ্বিজদেবার্চ্চকাদি মূলসমেতায় পূজোপ-স্থানাদিকর্ম্মণে চতুরো গ্রামান্ অত্রত্য হট্টিকা তলপাটকসমেতান্ দদাতু দেব ইতি।" ইত্যাদি উক্তি হইতে বুঝিতেছি যে, গৌড়াধিপ ধর্ম্মপালের সময় পৌণ্ড্রবর্দ্ধনভুক্তির মধ্যে লাটব্রাহ্মণের বাস ছিল এবং দেবপূজক বলিয়াই পরিচিত ছিলেন। ধর্ম্মপাল তাঁহাদিগকে ৪ খানি গ্রাম দান করিয়াছিলেন।

বলিয়াও মনে হয় না। সম্বন্ধতত্ত্বার্ণব নামক বৈদিক-কুলগ্রন্থ হইতে পাওয়া যায় যে, ৯৫১ শকে বা ১০২৯ খৃষ্টাব্দে বিজয়সেন জন্মগ্রহণ করেন।[৯] তৎপূর্ব্বে তাঁহার পিতামহ সামন্তসেনের অভ্যুদয়।

মালবরাজ উদয়াদিত্য ও তৎপুত্র লক্ষ্মদেবের শিলালিপি হইতে বেশ জানা গিয়াছে যে, কর্ণাটগণ চেদিবংশীয় গাঙ্গেয়দেব ও তৎপুত্র সম্রাট্ কর্ণদেবের দক্ষিণহস্ত স্বরূপ ছিলেন।[১০] পূর্ব্ব পূর্ব্ব অধ্যায়ে কর্ণদেব প্রসঙ্গে লিখিয়াছি যে অঙ্গ, বঙ্গ ও কলিঙ্গ পর্য্যন্ত সর্ব্বত্রই তাঁহার পিতার সময় হইতেই কর্ণদেবের প্রভাব প্রসারিত হইয়াছিল। গৌড়াধিপ বিগ্রহপাল ও বঙ্গাধিপ জাতবর্ম্মা তাঁহার জামাতা ছিলেন। সুতরাং গৌড়ে ও বঙ্গে না হউক রাঢ়দেশে (বর্ত্তমান বর্দ্ধমান জেলায়) কর্ণদেবের অনুগত ও অনুরক্ত কর্ণাটগণ তৎকালে প্রভাব-বিস্তারে সুবিধা পাইয়াছিলেন। আমরা মনে করি সেই শুভ অবসরে কর্ণাট-সামন্ত সামন্তসেনের অভ্যুদয়। কেবল রাঢ়দেশ বলিয়া নহে, তৎকালে ভারতের নানা স্থানে এমন কি মিথিলাপর্য্যন্ত কর্ণাটকগণ স্ব স্ব প্রভাববিস্তারে মনোযোগী হইয়াছিলেন।

কর্ণাটবংশের অভ্যুদয় হইতে রাঢ়দেশে দাক্ষিণাত্যের বৈদিকাচার-প্রবর্ত্তনের সুবিধা হইয়াছিল। এ কারণ সেনরাজগণের প্রাচীন লেখমালাসমূহে সর্ব্বত্রই তাঁহাদের বৈদিক-ধর্ম্মপ্রিয়তার উল্লেখ দৃষ্ট হয়।

বিজয়সেনের প্রদ্যুম্নেশ্বর-প্রশস্তিতে লিখিত আছে, ভীষ্মের ন্যায় অশেষ পরমাত্মজ্ঞান-সম্পন্ন সেই সামন্ত হইতে নিজভুজমদে মত্ত অরাতিগণের মারাঙ্কবীর ও চিরস্থায়িরূপে প্রকাশিত নিষ্কলঙ্ক গুণসমূহ-মহিমার আধার হেমন্তসেন জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার মস্তকে অর্দ্ধেন্দুচূড়ামণি (মহাদেবের) চরণধূলি, কণ্ঠ মধ্যে সত্যবাক্, কর্ণে শাস্ত্র, পদতলে শত্রুগণের কেশজাল এবং বাহুযুগলে সুদৃঢ় ধনুর ন্যায় চিহ্ন নিয়ত শোভিত ছিল।'[১১]

হেমন্তসেন

(৯) "ষষ্ঠীন্দুগ্রহচন্দ্রশীতবর্ষ্যৈশ্বর্য্য-শৌর্য্যার্জ্জবধৈর্য্যভাজী।
অপূর্ব্বভক্তির্ভবদেবদেবেষবে শশাঙ্কস্বরসন্ধশাকে।
জাতো বিজয়সেনো গুণিগণগণিতস্তত্র দৌহিত্রবংশে।
পুণ্যাত্মা দোষশূন্যো ধরণিপতিগণৈঃ পূজ্যমানঃ প্রধানঃ॥"
(সামন্তসারনিবাসী কাশীচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ-প্রদত্ত)

(১০) ১১২ পৃষ্ঠা ও Epigraphia India, Vol. II. p. 185-185 দ্রষ্টব্য।

(১১) "অচরমপরমাত্মজ্ঞানভীষ্মাদমুষ্মান্নিজভুজমদমত্তারাতিমারাঙ্কবীরঃ।
অভবদনবসাদোদ্ভিন্ননির্ব্বিঘ্নতত্তদ্গুণনিবহমহিম্নাং বেশ্ম হেমন্তসেনঃ॥
মূর্দ্ধন্যর্দ্ধেন্দুচূড়ামণিচরণরজঃ সত্যবাক্কণ্ঠভিত্তৌ
শাস্ত্রং শ্রোত্রেঽরিকেশাঃ পদভুবি ভুজয়োঃ জ্যাকিণাঙ্কঃ॥"
(বিজয়সেনের দেওপাড়া-লিপি ১০-১১ শ্লোক)

রাঢ়ীয়ব্রাহ্মণকুলপঞ্জিকায় লিখিত আছে,—'শূরবংশীয় নৃপতি নিজবংশ সংহার করিয়া স্বর্গপ্রাপ্ত হইলে পর অয়ত্নকরাজ্যে সেনবংশধর হেমন্ত গৌড়রাজশ্রীসম্পন্ন হইয়া বা রাজ্যলক্ষ্মী ধারণপূর্ব্বক শ্রীধর নামে খ্যাত হইয়াছিলেন।'[১২] হেমন্তসেনের সমসাময়িক উক্ত শূররাজের নাম কুলগ্রন্থে স্পষ্ট উল্লেখ নাই, তবে তিনি যে শূরবংশের সহিত আত্মীয়তা-সূত্রে আবদ্ধ ছিলেন, সে কথা আমরা মহাদেবশাণ্ডিল্যের সম্বন্ধতত্ত্বার্ণব হইতে জানিতে পারি।[১৩] যদুনন্দনের ঢাকুরগ্রন্থে লিখিত আছে, 'নিত্যশূর নামে এক শূরবংশীয় রাজা বহু নিম্ন শ্রেণীর কায়স্থকন্যার পাণিগ্রহণ করেন। সেই নিম্নশ্রেণীর গর্ভজাত পুত্রগণের আচরণে বিরক্ত হইয়া তাঁহাদিগের প্রাণ-সংহারের ব্যবস্থা করিয়া ছিলেন। তাঁহারা প্রাণভয়ে সেনরাজের আশ্রয় গ্রহণ করেন।'[১৪] অনেকে সেনবংশের আশ্রয় পাইয়া প্রাণরক্ষা করিতে পারিলেও হয়ত নিত্যশূরের প্রকৃত উত্তরাধিকারী সেই সময়ে পিতৃ-আদেশে নিহত এবং পরে নিজে নিত্যশূর পুত্রশোকে মনের দুঃখে ইহলোক পরিত্যাগ করিলে হেমন্তসেন সেই শূর-নৃপতির রাজ্য অধিকার করেন, সম্ভবতঃ হেমন্তের আশ্রিত শূররাজবংশীয়গণ এ সময়ে তাঁহার প্রতিবন্ধকতাচরণে সাহসী হন নাই।

রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ-কুলপঞ্জিকায় লিখিত আছে যে, হেমন্তসেনের পুত্রের নাম বীসেন, তিনি অরাতিগণকে পরাজয় করিয়া 'বিজয়' নামে খ্যাত হইয়াছিলেন[১৫]। বিজয়সেনের দেওপাড়া-লিপিতে আছে, 'হেমন্তসেনের ঔরসে তাঁহার সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠা মহিষী যশোদেবীর গর্ভে বিজয়সেনের জন্ম। কুমারকাল হইতেই অরাতিবল ধ্বংস ও চতুঃসাগরমেখলা বসুন্ধরাকে জয় করিয়া বিজয়সেন নামে খ্যাত হইয়াছিলেন।'[১৬] শুনা যায়, বিজয়সেনের অপ্রকাশিত একখানি তাম্রশাসনেও নাকি লিখিত আছে যে তিনি শূররাজকন্যা বিলাস বা বিলাসদেবীকে বিবাহ করেন।[১৭]

বিজয়সেন

(১২) বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস, ব্রাহ্মণকাণ্ড, ৩য় অংশ, ১৯ - ২০ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

(১৩) ঐ ব্রাহ্মণকাণ্ড, ৩য় অংশ, ২১ পৃষ্ঠা।

(১৪) ১৮১৩ শকে প্রকাশিত মূল ঢাকুর, ৩২ পৃষ্ঠা।

(১৫) "বিপ্রা বীসেনসংজ্ঞোঽসৌ বিজিতারাতিসংহতিঃ।
বিজয়ো নামকস্তাসীৎ সর্ব্বভূমিভুজাং বরঃ।
প্রাগ্‌জন্মার্জ্জিতপুণ্যেন বিজয়ী বিজয়োঽভবৎ॥"
(রাণাঘাটনিবাসী সাতকড়িঘটক-সংগৃহীত কুলপঞ্জী)

(১৬) "মহারাজ্ঞী যস্য স্বপরনিখিলান্তঃপুরবধূশিরোরত্নশ্রেণীকিরণসরণিস্মেরচরণা।
নিধিঃ কান্তেঃ সাধ্বীব্রতবিততনিত্যোজ্জ্বলযশা যশোদেবী নাম ত্রিভুবনমনোজ্ঞাকৃতিরভূৎ॥
ততস্ত্রিজগদীশ্বরাৎ সমজনিষ্ট দেব্যাস্ততোঽপ্যরাতিবলশাতনোজ্জ্বলকুমারকেলিক্রমঃ।
চতুর্জলধিমেখলাবলয়সীমবিশ্বম্ভরাবিশিষ্টজয়সাধনো বিজয়সেনপৃথ্বীপতিঃ॥"
(বিজয়সেনের দেওপাড়া-লিপি, ১৪-১৫ শ্লোক)

(১৭) শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রবন্ধ, মানসী, ১৩২০।

পূর্ব্বে লিখিয়াছি, আদিশূরের দৌহিত্রবংশে ৯৫১ শকে (১০২৯ খৃষ্টাব্দে) বিজয়সেন জন্মগ্রহণ করেন। সামন্তসেন হইতে এই বংশের খ্যাতি এবং হেমন্তসেন হইতে অধিকারবিস্তারের সূত্রপাত হইলেও প্রকৃত প্রস্তাবে বিজয়সেন হইতেই সেনবংশের গৌরব ও সৌভাগ্যসূর্য্য সমুদিত হইয়াছিল, তাঁহার ন্যায় মহাবীর, তাঁহার ন্যায় রণকুশল ও তাঁহার ন্যায় বুদ্ধিমান্ নৃপতি সেনবংশে আর কেহ জন্মিয়াছেন কি না সন্দেহ। উমাপতিধর লিখিয়া গিয়াছেন, 'প্রতিদিন রণস্থলে তাঁহার হাতে কত নৃপতি পরাজিত ও নিহত হইয়াছে, কে তাহা গণনা করিতে পারে? এই জগতে তাঁহার নিজ পূর্ব্বপুরুষ সুধাংশুতেই কেবলমাত্র রাজশব্দ হইত। সংখ্যাতীত কপীন্দ্রপতি রাম বা পাণ্ডবচমূনাথ পার্থের সহিতই বা কি তুলনা করিব? যিনি খড়্গলতাবতংসিত ভুজদ্বারা হেলায় বলয়াকারসমুদ্রবেষ্টিত বসুধাচক্রের একরাজ্য ফলস্বরূপ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এক এক গুণে সিদ্ধ হইয়া কেহ সংহার করেন, কেহ রক্ষা করেন, আবার অন্যে জগৎ সৃষ্টি করেন, কিন্তু ইনি বহুগুণে ভূষিত হইয়া বিদ্বেষিগণকে দলন, আশ্রিতগণকে পালন ও শত্রুগণকে সংহারপূর্ব্বক দিব্যপ্রজাপ্রতিষ্ঠা (সৃষ্টি স্থিতি ও লয় এই ত্রিকার্য্য) করিয়া স্বয়ং দেব বলিয়া অভিহিত হইয়াছিলেন। পৃথ্বীর (নিজাধিকৃত ভূমির) শ্রেষ্ঠত্বের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া (এই বিজয়সেন) প্রতিপক্ষ রাজগণকে দিব্যভূমি দান করিয়া বীরের রক্তলাঞ্ছিত অসি আবৃত করিয়াছিলেন। এরূপ না হইলে ভোগে বিবাদোন্মুখী (অর্থাৎ অননুরক্তা) বসুমতী আকৃষ্ট-কৃপাণধারী এই রাজাকে কেন প্রাপ্ত হইবে, আর শত্রুপতিগণই বা কেন ভঙ্গ দিবে?'[১৮]

উদ্ধৃত শিলালেখের ১৭শ, ১৮শ ও ১৯শ শ্লোক হইতে কতকটা প্রচ্ছন্ন ঐতিহাসিক ঘটনার আভাস পাইতেছি। ঐ শ্লোকত্রয়ের দ্ব্যর্থ রহিয়াছে। ১৭শ শ্লোকোক্ত রাম ও পার্থ এক পক্ষে রঘুকুলতিলক রামচন্দ্র ও মহাবীর অর্জ্জুন, অপর পক্ষে গৌড়াধিপ রামপাল ও তাঁহার দক্ষিণহস্তস্বরূপ অঙ্গাধিপ মহনকে ইঙ্গিত করিতেছে। ১৮শ শ্লোকের 'দিব্যাঃ প্রজাঃ' মদনপালের মনহলি-তাম্রলেখের ১৫শ শ্লোক-বর্ণিত 'দিব্যপ্রজা' এবং বিজয়সেনের দেওপাড়া-

(১৮) "গণয়তু গণশঃ কো ভূপতীংস্তাননেন প্রতিদিনরণভাজা যে জিতা বা হতা বা।
ইহ জগতি বিষেহে যস্য বংশস্য পূর্ব্বঃ পুরুষ ইতি সুধাংশৌ কেবলং রাজশব্দঃ॥
সংখ্যাতীতকপীন্দ্রসৈন্যবিভুনা তস্যারিজেতুস্তুলাং কিং রামেণ বদাম পাণ্ডবচমূনাথেন পার্থেন বা।
হেতোঃ খড়্গলতাবতংসিতভুজামাত্রস্য যেনার্জ্জিতং সপ্তাম্ভোধিতটীপিনদ্ধবসুধাচক্রৈকরাজ্যং ফলম্॥

একৈকেন গুণেন যৈঃ পরিণতং তেষাং বিবেকাদৃতে
কশ্চিদ্বষ্ট্যপরশ্চ রক্ষতি সৃজত্যন্যশ্চ কৃৎস্নং জগৎ।
যেষোঽয়ং তু গুণৈঃ কৃতো বহুভির্ধৈর্য্যবান্ জয়ান দিবো
বৃত্তহানপুষ্পকাম চ রিপুচ্ছেদেন দিব্যাঃ প্রজাঃ॥

যদা দিব্যভুবঃ প্রতিক্ষিতিভৃতামুর্ব্বীমুরীকুর্ব্বতা বীরাহস্রিশিলাঞ্ছিতোঽসিরমুনা প্রাগেব পত্রীকৃতঃ।
নৈষং চেৎ কথমন্যথা বসুমতী ভোগে বিবাদোন্মুখী তত্রাকৃষ্টকৃপাণধারিণি গতা ভঙ্গং দিবাং সন্ততিঃ॥"

(বিজয়সেনের দেওপাড়া-লিপি ১৭-১৯ শ্লোক)

লিপির ১৯শ শ্লোকের 'দিব্যভুবঃ' এবং সন্ধ্যাকরনন্দীর রামচরিতোক্ত (৩।২) 'দিব্যবিষয়' যেন একই বিষয়ের ইঙ্গিত করিতেছে। রামপালের সাহায্যকারী সামন্ত-নৃপালগণের মধ্যে 'নিদ্রাবলীর বিজয়রাজ' নামক এক সামন্তরাজের উল্লেখ করিয়াছি। বরেন্দ্রভূভাগে বিজয়নগর নামক প্রাচীন স্থানের নিকটই নিদ্রাবলী বা নিদ্রালী নামক গ্রাম বিদ্যমান ছিল। এই গ্রামের নাম হইতে বরেন্দ্র-ব্রাহ্মণদিগের নিদ্রালী গাঞির নামকরণ হইয়াছিল। গৌড়াধিপ বল্লালসেনের দানসাগরে পাওয়া যায় যে, বরেন্দ্র-অঞ্চলে বিজয়সেনের প্রথম অভ্যুদয়।[১১]

বৈদিককুলগ্রন্থানুসারে ৯৫১ শকে বা ১০২৯-৩০ খৃষ্টাব্দে বিজয়সেনের জন্ম। সুতরাং নয়পাল ও বিগ্রহপালের অধিকার-কালেই তাঁহার বাল্য ও যৌবন অতিবাহিত হয়। তৎপরে ২য় মহীপালের সময় কৈবর্ত্তবিদ্রোহে যখন সমস্ত উত্তরবঙ্গ আলোড়িত হইতেছিল, সেই সময়ে বিজয়সেন পিতার সহিত নানা যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত থাকিয়া সেনবংশের প্রভাব ও গৌরব বৃদ্ধি করিবার অবসর পাইয়াছিলেন। তাঁহার বাল্য ও প্রথম যৌবনের লীলাস্থলী উত্তররাঢ় বটে, কিন্তু যখন ২য় মহীপালের হস্ত হইতে বরেন্দ্রভূমি কৈবর্ত্তনায়ক দিব্যোর অধিকারে আসিল, শূরপাল ও রামপাল পৈতৃকরাজ্য উদ্ধার করিবার জন্য ব্যতিব্যস্ত ছিলেন, সেই সময় বিজয়সেন নৌবিতানসাহায্যে গঙ্গার অপর পারে নিদ্রাবলী নামক স্থানে আসিয়া আধিপত্য বিস্তার করেন, তৎপরে নিজ অধিকাররক্ষার জন্য কৈবর্ত্তনায়ক দিব্যোর সহিত তাঁহাকে একাধিকবার যুদ্ধ করিতে হইয়াছিল। অবশেষে তিনি গৌড়াধিপ রামপালের আহ্বানে তাঁহার সহিত সম্মিলিত হইয়া ভীমের বিরুদ্ধে ঘোরতর যুদ্ধ করিয়াছিলেন। রামপালের জয়লক্ষ্মী-অর্জ্জন ও কৈবর্ত্তনায়ক ভীমের সম্পূর্ণ পরাজয়ের সহিত বিজয়সেনেরও ভাবী সৌভাগ্যপথ উন্মুক্ত হইয়াছিল। রামপাল-প্রসঙ্গে লিখিয়াছি যে, সামন্তরাজগণ সকলে মিলিয়া কৈবর্ত্তপ্রভাব ধ্বংস করিয়া বরেন্দ্রী উদ্ধার করিয়াছিলেন। অবশ্য ঐ ব্যাপারে বিজয়সেনেরও কিছু হাত ছিল সন্দেহ নাই। অত্যুক্তিপ্রিয় বিজয়সেনের প্রশস্তিকার 'দত্বা দিব্যভুবঃ প্রতিক্ষিতিভৃতাং' ইত্যাদি উক্তি দ্বারা যেন বিজয়সেনের উপরই সেই পুরা বাহাদুরী দিতে চান। যাহা হউক বাল্যকাল হইতেই ক্রমাগত রণক্ষেত্রে অতিবাহিত করিয়া বয়োবৃদ্ধির সহিত বিজয়সেনের উচ্চাকাঙ্ক্ষা ও নিজ প্রভুত্ববিস্তারে ব্যগ্রতা আসিয়া পড়িয়াছিল। তাহার ফলে পার্শ্ববর্ত্তী সকল নৃপতির সহিতই তাঁহার বিরোধ অবশ্যম্ভাবী হইয়াছিল। সুতরাং যে পালবংশের হইয়া একদিন তিনি অস্ত্র ধারণ করিয়াছিলেন, সেই সেই পালবংশই তাঁহার উদীয়মান প্রভাব খর্ব্ব করিবার জন্য ব্যগ্র হইয়াছিলেন, তাই বিজয়সেনের প্রশস্তিতে পালবংশ 'প্রতিক্ষিতিভৃৎ' অর্থাৎ প্রতিপক্ষ নৃপতি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন। উক্ত প্রশস্তিকার উমাপতিধর আরও লিখিয়াছেন—

(১১) "তস্মিন্ বিজয়সেনো প্রাদুরাসীদ্বরেন্দ্রে
নিখিলনৃপচক্রতিলকঃ ... বীরমল্লঃ।" (দানসাগর উপক্রম)

"আপনি নান্যবীরবিজয়ী" কবিগণের এই উক্তি শুনিয়া মনে মনে ক্রুদ্ধ হইয়াই তিনি গৌড়েশ্বরকে সবলে আক্রমণ করিয়াছিলেন, কামরূপপতিকে দূরীভূত করিয়াছিলেন এবং ক্ষিপ্রগতিতে কলিঙ্গ জয় করিয়াছিলেন। "নান্য! তুমি কি এইরূপ শূরকে মনে কর? রাঘব! তুমি কিরূপে এখানে শ্লাঘা করিতেছ? বর্দ্ধন! তুমি স্পর্দ্ধা ত্যাগ কর। বীর! অদ্যাপি কি তোমার দর্প দূর হইল না?" (বিজয়সেন কর্তৃক কারানিবদ্ধ) নৃপতিগণ পরস্পরে দিবারাত্র এইরূপ বলাবলি করিত, তাহাতে কারাগৃহের প্রহরীগণের নিদ্রাপনোদনের ক্লান্তি কতকটা নিয়মিত হইয়াছিল। পাশ্চাত্যচক্র-জয়রূপ কেলিকালে যাঁহার নৌবিতান যতদূর গঙ্গা প্রবাহিত ততদূর ধাবিত হইয়াছিল, তাহা যেন শিবের মৌলিসরিতের জলে ভস্মপঙ্কলগ্নোত্থিত ইন্দুকলার তরির ন্যায় প্রতিভাত হইত।'[২০]

উদ্ধৃত উক্তি হইতে স্থির হইতেছে—বিজয়সেন গৌড়েশ্বর, কামরূপপতি ও কলিঙ্গরাজের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়াছিলেন। শূর, নান্য, রাঘব, বর্দ্ধন ও বীর প্রভৃতি রাজগণ তাঁহার হস্তে পরাজিত ও বন্দী হইয়াছিলেন। এমন কি গঙ্গাপথে নৌকাযোগে বহুদূর অগ্রসর হইয়া পাশ্চাত্য-চক্রবর্ত্তী (সম্ভবতঃ কান্যকুব্জ বা কাশীপতিকেও) জয় করিয়াছিলেন।

উপরি উক্ত রাজগণের মধ্যে শূর, বর্দ্ধন ও বীরের নাম রামচরিত ও তাহার টীকায় পাওয়া গিয়াছে, রামপালের প্রসঙ্গে তাঁহাদের পরিচয় পূর্ব্বেই বিবৃত হইয়াছে। নান্য বা নান্যদেব হইতেই মিথিলার কর্ণাটকবংশের প্রতিষ্ঠা। শিমরুণগড় হইতে আবিষ্কৃত শিলালিপি হইতে জানা যায়, ১০১৯ শকে বা ১০৯৭ খৃষ্টাব্দে নান্যদেব রাজত্ব করিতেছিলেন।[২১] এদিকে রামচরিতের টীকায় বীরগুণ "কোটাটবীকণ্ঠীরব দক্ষিণসিংহাসনচক্রবর্ত্তী" বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন। সুতরাং দেখা যাইতেছে,—বিজয়সেনের প্রভাব সুদূর উত্তর ও দক্ষিণ-প্রদেশেও বিস্তৃত হইয়াছিল।

(২০) "ত্বং নান্যবীরবিজয়ীতি গিরঃ কবীনাং শ্রুত্বান্যথা মননরূঢ়নিগূঢ়রোষঃ।
গৌড়েন্দ্রমদ্রবদপাকৃত কামরূপভূপং কলিঙ্গমপি যস্তরসা জিগায়॥
শূরং মন্য ইবাসি নান্য কিমিহ স্বং রাঘব শ্লাঘসে
স্পর্দ্ধাং বর্দ্ধন মুঞ্চ বীর বিরতো নাদ্যাপি দর্পস্তব।
ইত্যন্যোন্যমহর্নিশপ্রণয়িভিঃ কোলাহলৈঃ ক্ষ্মাভুজাং
যৎকারাগৃহযামিকৈর্নিয়মিতো নিদ্রাপনোদক্লমঃ॥
পাশ্চাত্যচক্রজয়কেলিষু যস্য যাবদ্গঙ্গাপ্রবাহমনুধাবতি নৌবিতানে।
ভর্গস্য মৌলিসরিদম্ভসি ভস্মপঙ্কলগ্নোজ্ঝিতেব তরিরিন্দুকলা চকাস্তি॥"

(বিজয়সেনের দেওপাড়া-শিলালিপি ২০—২২ শ্লোক)

(২১) "নন্দেন্দুবিন্দুবিধুসম্মিতশাকবর্ষে তৎশ্রাবণে সিতদলে মুনিসিদ্ধতিথ্যাম্।
স্বাতিশনৈশ্চরদিনে করিবৈরিলগ্নে শ্রীনান্যদেবনৃপতের্ব্যদধীত বাস্তুম্॥"

(নান্যদেবের সিমরাওগড়-শিলালিপি)

উপরোক্ত নৃপতিগণের আনুপূর্ব্বিক ইতিহাস আলোচনা করিলেও মনে হয় যে, রামপালের আধিপত্যকালে বিজয়সেনের প্রবল প্রতাপ উদ্ভাসিত এবং রামপালের মৃত্যুর পর পালাধিকারভুক্ত দক্ষিণ-বারেন্দ্র ও রাঢ়ের অধিকাংশ বিজয়সেনের অধিকারভুক্ত হইয়াছিল। এই সময় সামলবর্ম্মাও তাঁহার রাঢ়-রাজধানী পরিত্যাগ করিয়া বিক্রমপুরে গিয়া আশ্রয় লইতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

প্রথমতঃ বিজয়সেন দক্ষিণ-বারেন্দ্রের অন্তর্গত বর্ত্তমান গোদাগাড়ী মহকুমার অধীন দেওপাড়ার নিকট বিজয়নগরেই অধিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। এখানেই নিজ বিজয়-কীর্ত্তি-স্তম্ভস্বরূপ সুপ্রসিদ্ধ ও বিশাল প্রদ্যুম্নেশ্বরমন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। কবিবর উমাপতিধর উক্ত মন্দির-স্মৃতি-উপলক্ষে যে প্রশস্তি রচনা করেন, তাহাই দেওপাড়া-শিলালিপি বলিয়া প্রত্নতাত্ত্বিকগণের নিকট পরিচিত। বিজয়সেন এই মন্দির-প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে উক্ত দেওপাড়ায় বহু যজ্ঞ সম্পন্ন করিয়াছিলেন এবং তদুপলক্ষে বহু বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণও আহূত হইয়াছিলেন।

গৌড়রাজমালাকার লিখিয়াছেন, "গৌড়রাষ্ট্রের পশ্চিমাংশ ["পাশ্চাত্যচক্র"] জয় করিবার জন্য, তিনি যে "নৌবিতান" প্রেরণ করিয়াছিলেন, তাহা অধিক দূর অগ্রসর হইতে পারিয়াছিল বলিয়া বোধ হয় না। দক্ষিণদিকে বঙ্গে এবং রাঢ়ে বর্ম্মরাজ কর্ত্তৃক বিজয়সেনের গতি রুদ্ধ হইয়াছিল।" (৭৪ পৃঃ) কিন্তু দেওপাড়ালিপির ২৫ শ্লোক হইতে আমরা আভাস পাইতেছি যে, তিনি 'যজ্ঞে ব্রতী হইয়া মেরু হইতে দেবগণকে আহ্বান করিয়া আনিয়াছিলেন, সেই মেরুর পাদদেশ তৎকর্ত্তৃক নিহত শত্রুনিকরে পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল, তাহাতেই স্বর্গের ও মর্ত্ত্যের পুরবাসিগণ স্বস্থান পরিবর্ত্তন করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। বহুসংখ্যক অত্যুচ্চ দেবমন্দির নির্ম্মাণ ও সুবৃহৎ হ্রদসকল খনন করাইয়া স্বর্গ ও পৃথিবীর আয়তন যেন তুল্য করিয়াছিলেন।'[২২]

কর্ণদেব-প্রতিষ্ঠিত কর্ণমেরুই উক্ত শ্লোকের মেরু। সুতরাং কর্ণমেরুভূষিত সুস্বর্গ কাশীধামে গিয়া বিজয়সেন শত্রুকুল সংহার করিয়া বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ আনয়ন করিয়াছিলেন তাহারই আভাস পাইতেছি। বলা বাহুল্য, তৎকালে কাশীধামে তাঁহার বিজয়-বৈজয়ন্তী উড্ডীন হইয়াছিল। যজ্ঞ উপলক্ষে তিনি যে সকল দেব বা ব্রাহ্মণ আনয়ন করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগকে বারাণসীর মধ্যবর্ত্তী কর্ণমেরুর পার্শ্ববর্ত্তী কর্ণাবতী-সমাজস্থ বৈদিক ব্রাহ্মণ বলিয়াই মনে হয়। বিজয়সেন

(২২) "অশ্রান্তবিশ্রাণিতযজ্ঞযূপস্তম্ভাবলীং ব্রাগবলম্বমানঃ।
যস্তাদ্ভুতাধার্ ভুবি সঞ্চচার কালক্রমাদেকপদোঽপি ধর্ম্মঃ।
মেরোরাহূতবৈরিসঙ্কুলতটাদাহূয় যজ্বামরান্
ব্যত্যাসং পুরবাসিনামকৃত যঃ স্বর্গস্য মর্ত্ত্যস্য চ।
উচ্চৈঃ সুরসদ্মভিশ্চ বিততৈস্তত্তৈশ্চ শেষীকৃতং
চক্রে যেন পরস্পরস্য চ সমং দ্যাবাপৃথিব্যোর্বপুঃ।"
(বিজয়সেনের দেওপাড়ালিপি, ২৪-২৫ শ্লোক)

বহু বৈদিক ব্রাহ্মণ আনিয়া প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন বলিয়াই তাঁহার নাম নানা বৈদিককুলগ্রন্থে নানাভাবে বর্ণিত হইয়াছে। কায়স্থকুলগ্রন্থেও ইনি এক জন আদিশূর বলিয়া অভিহিত হইয়াছেন। একাধিক কুলগ্রন্থে পাওয়া যায় যে, আদিশূর কাশীরাজকে পরাজিত করিয়া সাগ্নিক বা বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ আনাইয়াছিলেন। দেওপাড়ালিপির ২৫শ শ্লোকের 'মেরোরাহৃতবৈরিসঙ্কুলতটাদ্' ইত্যাদি উক্তি কুলগ্রন্থোক্ত প্রবাদেরই যেন সমর্থন করিতেছে। এদিকে রাঢ়ীয়-বারেন্দ্রদোষকারিকায় লিখিত আছে, (তান্ত্রিক) বৌদ্ধপ্রভাবে বারেন্দ্রবাসী যে সকল ব্রাহ্মণ বৈদিক-সংস্কারচ্যুত হইয়াছিলেন, বিজয়সেনের সময় সমাগত বৈদিকব্রাহ্মণগণের যত্নে আবার তাঁহারা বৈদিকসংস্কার গ্রহণ করিয়াছিলেন। এ সময় বৃদ্ধ হেমন্তসেন জীবিত ছিলেন, তিনিও বৈদিকানুষ্ঠানের এক জন প্রধান উৎসাহদাতা বলিয়াই শিলালিপি ও তাম্রশাসনে পরিচিত হইয়াছেন। বলিতে কি, সেনরাজ বিজয়ের বৈদিক ধর্ম্মানুরাগিতার ফলে বৈদিকব্রাহ্মণগণ প্রভূত বিভবশালী হইয়া পড়িয়াছিলেন। কবিবর উমাপতি বৈদিকগণের সেই অভূতপূর্ব্ব ঐশ্বর্য্যপ্রাপ্তির এইরূপ আভাস দিয়াছেন যে, 'তাঁহার প্রসাদে শ্রোত্রিয় (বা বেদজ্ঞ) ব্রাহ্মণগণ এরূপ বহুবিভবশালী হইয়াছিলেন যে, নাগরিকগণ সেই শ্রোত্রিয়-রমণীগণের নিকট মুক্তাকে কার্পাসবীজ, মরকতকে শাকপত্র, রৌপ্যকে অলাবুপুষ্প, রত্ন বা জহরতকে পক্কদাড়িম্ববীজ এবং স্বর্ণকে কুষ্মাণ্ডীলতার বিকসিতকুসুম বলিয়া শিক্ষালাভ করিয়াছিল।'[২৩]

এই ঘটনা সম্ভবতঃ স্মরণীয় ৯৯৪ শকে বা ১০৭২ খৃষ্টাব্দে ঘটিয়া থাকিবে। দক্ষিণ-বারেন্দ্রে বিজয়সেনের মন্দির-প্রতিষ্ঠার মহোৎসব এবং রাঢ়দেশে সামলবর্ম্মার অভিষেকোৎসব গৌড়-বঙ্গের কুলগ্রন্থ বা সামাজিক ইতিহাসে চিরস্মরণীয় রহিয়াছে। বিজয়সেনের উদীয়মান মহাশক্তি লক্ষ্য করিয়া পাল-গৌড়েশ্বর উত্তরবারেন্দ্র আশ্রয় করিয়াছিলেন। হয় ত পালনৃপতি তাঁহার কতকটা অধিকার ছাড়িয়া দিয়া, বিজয়সেনের সহিত মিত্রতাস্থাপন করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন, বোধ হয় এই কারণেই বারেন্দ্র-অঞ্চলের প্রবাদ লইয়া রচিত আধুনিক 'শেখ শুভোদয়া' নামক গ্রন্থে রামপালের মৃত্যুর পর তাঁহার অমাত্যগণ কর্ত্তৃক বিজয়সেনকে গৌড়াধিকার প্রদান করিবার কথা পাইতেছি। বাস্তবিক পূর্ব্বাপর ঘটনা আলোচনা করিলে মনে হইবে যে, তৎকালে সেনবংশের আত্মীয়-স্বজনগণ পালরাজসভায় প্রবিষ্ট হইয়া ধীরে ধীরে প্রভুত্ব বিস্তার করিতেছিলেন। এ সময় পালরাজপুরে নানা ষড়যন্ত্রের অবতারণা চলিতেছিল। এই সময় "শক্রুয়বধোপায়ে" ৩য় গোপাল কালগ্রাসে পতিত হইলেন। রাম-পালের কনিষ্ঠ পুত্র মদনপালই এ সময় সম্ভবতঃ সেনবংশের সাহায্যে গৌড়-সিংহাসনে

(২৩) "মুক্তাঃ কর্পাসবীজৈর্মরকতশকলং শাকপত্রৈরলাবূ-
পুষ্পৈ রূপ্যাণি রত্নং পরিণতিভিদুরৈঃ কুক্ষিভির্দাড়িমানাং।
কুষ্মাণ্ডীবল্লরীণাং বিকসিতকুসুমৈঃ কাঞ্চনং নাগরীভিঃ
শিক্ষ্যন্তে যৎপ্রসাদাদ্বহুবিভবযুজো যোষিতঃ শ্রোত্রিয়াণাং॥"
(ঐ দেওপাড়া-লিপি ২৩ শ্লোক)

অভিষিক্ত হইয়াছিলেন। রামচরিতে "বিজপরিকর-পরিপালনরুচিন্মোচ্চৈর্মণ্ডলাধিপতিনা চ।" ইত্যাদিক্রমে মদনপালের সুহৃদ্ ও সহায় যে মণ্ডলাধিপতির উল্লেখ আছে, তিনিই সম্ভবতঃ মহাবীর ও বৈদিকব্রাহ্মণ-ভক্ত বিজয়সেন। বলা বাহুল্য, সেনবংশের সাহায্যে মদনপাল পিতৃ-সিংহাসন লাভ করিয়াছিলেন বলিয়াই তিনি শূরসেন নামক এক ব্যক্তিকে সেনাপতিত্ব প্রদান করিয়াছিলেন। বোধ হয় সেনবংশের প্রভাবেই মদনপাল নিজে একজন সৌগত ও পরম-সৌগতের বংশধর হইলেও "চণ্ডীচরণসরোজপ্রসাদসম্পন্ন-বিগ্রহশ্রীকং" বলিয়াই রামচরিতে পরিচিত হইয়াছেন। মনে হয় যে, মদনপালের মতিগতি এইরূপ পরিবর্তিত হইয়াছিল বলিয়াই আত্মীয়স্বজনগণ ঘোর বিরোধী হইয়া তাঁহার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করেন, সম্ভবতঃ বিজয়সেন সেই পালবংশীয়দিগকে সমূলে বিনাশ করিয়া[২৪] তাঁহাদিগের চক্রজাল ব্যর্থ করিয়াছিলেন।[২৫] যেখানে বিজয়সেন পালবংশধরদিগের ধ্বংসের জন্য ছাউনি করিয়াছিলেন, তাহা অদ্যাপি বগুড়ার আদমদীঘী থানার মধ্যে 'বিজয়কান্দি' নামে পরিচিত রহিয়াছে। বলিতে কি, এ সময়ে মদনপাল নামমাত্র গৌড়েশ্বর ছিলেন, মণ্ডলাধিপ বিজয়সেনই একপ্রকার গৌড়, রাঢ় ও বঙ্গভূমির অধীশ্বর হইয়া বসিয়াছিলেন। এমন কি দানসাগর হইতে আরও জানিতে পারি যে, পরাক্রান্ত শেখর-ভূপতিও যে উন্নত রাজবংশের আজ্ঞা পালন করিতেন, তাঁহারাও বিজয়-সেনের বৈজয়ন্তী বীরধ্বজ ভজনা করিয়াছিলেন।[২৬]

বিজয়সেন অন্তিমকালে যুদ্ধবিগ্রহ পরিত্যাগ করিয়া যেন কেবল ধর্মচর্চাতেই কালযাপন করিতেন। তাঁহার তেজঃপুঞ্জ-বিশাল ও মনোহর অঙ্গকান্তিদর্শনে প্রজাসাধারণে তাঁহাকে সাক্ষাৎ মহাদেব বলিয়া ভয়-ভক্তি করিত। এই কারণে তাঁহার বংশধর বিশ্বরূপ ও কেশব-সেনের তাম্রশাসনে তিনি সাক্ষাৎ মহাদেবের অবতার বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।[২৭] এদিকে তাঁহার একটি উপাধি ছিল—বৃষভশঙ্কর।

বিজয়সেনের প্রকৃত আবির্ভাব-কাল

বিজয়সেনের আবির্ভাবকাল সম্বন্ধেও ঐতিহাসিকগণ একমত নহেন। প্রত্নতত্ত্ববিৎ মনোমোহন চক্রবর্ত্তী মহাশয় দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন যে, বিজয়সেন প্রায় ১১৪৭ হইতে ১১৫৮ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন; তিনি উৎকলপতি চোড়গঙ্গ ও রাঘবের সমসাময়িক[২৭]। গৌড়রাজমালাকার অনেকটা তাঁহারই

(২৪) এ সম্বন্ধে বিশ্বরূপসেনের মদনপাড়-তাম্রলেখ ও কেশবসেনের ইদিলপুর-তাম্রশাসনে এইরূপ লিখিত আছে— "তাবন্নিস্ত্রিংশবিস্রাবিরং বিলসিতৈর্বৈরিভূপালবংশা-
মূচ্ছিদ্যোচ্ছিদ্য মূলাববিভুবমখিলাং শাসতো যস্য রাজ্ঞঃ।"

(২৫) "ভক্তারতূর্ণবিলপার্থিবচক্রবর্ত্তী নির্ব্যাজবিক্রম-তিরস্কৃতসাহসাঙ্কঃ।
দিক্‌পালচক্রপুটভেদনগীতকীর্ত্তিঃ পৃথ্বীপতির্বিজয়সেনঃ পদপ্রকাশঃ।"
(বল্লালসেনের সীতাহাটী-তাম্রলেখ, ৭ শ্লোক)

(২৬) "ভবতু বিজয়সেনঃ প্রাদুরাসীদ্বরেন্দ্রে দিশিবিদিশি ভজন্তে যস্য বীরধ্বজং।
শেখরবিনিহিতাজ্ঞা বৈজয়ন্তীং বহন্তঃ প্রণতিপরিগৃহীতাঃ প্রাংশবো রাজবংশাঃ।
(বল্লালসেনের দানসাগর উপক্রম)

(২৭) Journal of the Asiatic Society of Bengal, (N. S.) 1905, p. 50.

অনুবর্ত্তী হইয়া ১১৫০ খৃষ্টাব্দে কর্ণাটক নান্যদেব ও বিজয়সেনের আবির্ভাবকাল স্থির করিয়াছেন। গৌড়রাজমালার মতে—"হরিসিংহের মন্ত্রী চণ্ডেশ্বর ঠকুরের সংগৃহীত "বিবাদ-রত্নাকরের" মঙ্গলাচরণ হইতে জানা যায়, হরিসিংহ ১২৩৯ শকাব্দে [১৩১৭ খৃষ্টাব্দে] জীবিত ছিলেন। প্রতি পুরুষ গড়ে ২৫ বৎসর হিসাবে হরিসিংহের ঊর্দ্ধতন সপ্তম পুরুষ নান্যদেব, মোটামুটি ১১৫০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত জীবিত ছিলেন, এরূপ অনুমান করা যাইতে পারে।" (৬১ পৃষ্ঠা) আমরা কিন্তু পূর্ব্বোক্ত কোন মতই সমীচীন বলিয়া মনে করি না। বিজয়-সেনকে যদি চোড়গঙ্গ-সখা ধরা হয়, তাহা হইলে তাঁহাকে রাঘবের সমসাময়িক বলা যাইতে পারে না। চোড়গঙ্গের তাম্রলেখানুসারে ৯৯৯ শকে বা ১০৭৮ খৃষ্টাব্দে তাঁহার রাজ্যাভিষেক হয়। তিনি ৭০ বর্ষ রাজত্ব করেন, তৎপরে তৎপুত্র ভানুদেব ১০৬৪ শকে (১১৪২ খৃষ্টাব্দে) এবং পরে রাঘব ১১৫২ খৃষ্টাব্দে সিংহাসনে আরোহণ করেন।২৮ এদিকে শিমরৌণগড়ের শিলালিপি উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছি যে, ১০৯৭ খৃষ্টাব্দে নান্যদেব রাজত্ব করিতেছিলেন। মিথিলার কুলপঞ্জী হইতে জানা যায়, নান্যদেবের ৭ম পুরুষ অধস্তন হরিসিংহদেব ১২৪৮ শকে [১৩২৬ খৃষ্টাব্দে] তাঁহার ৩২ রাজ্যাব্দে সভাস্থ পণ্ডিতগণের কুলমর্য্যাদা পঞ্জীতে লিপিবদ্ধ করাইয়াছিলেন। শিমরৌণ-গড়ের শিলালেখ ও পঞ্জীবচন আলোচনা করিলেও আমরা নান্যদেব ও হরিসিংহের নির্দ্দিষ্ট কাল মধ্যে ২২৯বর্ষ ব্যবধান পাইতেছি। পুরাবিদ্‌গণের সাধারণতঃ নির্দ্দিষ্ট তিন পুরুষে শতাব্দী-গণনা ধরিয়া লইলেও নান্যদেবকে অনায়াসেই আমরা খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীর শেষ পাদের লোক বলিয়া স্বীকার করিতে পারি। বলা বাহুল্য, ঐ সময়ে চোড়গঙ্গ উৎকলে আধিপত্য করিতেছিলেন। চোড়গঙ্গ বিজয়সেনের সখা বলিয়া আধুনিক বল্লাল-চরিতে পরিচিত হইয়াছেন। এ অবস্থায় ১১৫২ খৃষ্টাব্দের পরবর্ত্তী উৎকলপতি রাঘব দেওপাড়া-লিপির রাঘব হইতে পারেন না। বিজয়সেনকর্ত্তৃক বন্দী রাঘবকে অপর কোন নৃপতি বলিয়াই মনে হয়। বিশেষতঃ পূর্ব্বেই সমসাময়িক প্রমাণ-বলে দেখাইয়াছি যে, গৌড়াধিপ রামপালের সময় বিজয়সেনের অভ্যুদয়। এ অবস্থায় তাঁহাকে খৃষ্টীয় ১২শ শতাব্দীর নৃপতি না ধরিয়া ১১শ শতাব্দীর বলিয়া ধরাই কর্ত্তব্য। সাতকড়ি ঘটক মহাশয়ের সংগৃহীত রাঢ়ীয়-কুলপঞ্জিকার বচনানুসারে হেমন্তসেন ৩৪ বর্ষ ও বিজয়সেন ৪০ বর্ষ রাজত্ব করেন। আবুল-ফজলের আইন্-ই-আকবরীর মতে, বল্লালসেনের রাজত্বকাল ৫০ বর্ষ। এদিকে বল্লালসেনের দানসাগর ও অদ্ভুতসাগরের নির্দ্দিষ্ট সময় ধরিয়া আলোচনা করিলে মনে হইবে যে, ১১৬৯-৭০ খৃষ্টাব্দে গৌড়াধিপ বল্লালসেন ইহলোক পরিত্যাগ করেন। এখন উপরোক্ত রাজ্যকাল হইতে বুঝিতেছি যে, বল্লালের মৃত্যুর ৫০বর্ষ পূর্ব্বে অর্থাৎ ১১১৯

(২৮) Epigraphia Indica, Vol. V. appendix, p. 51 & 52.

(২৯) "শাকে শ্রীহরিসিংহদেবনৃপতের্ভূপার্কতুল্যেঽজনি।
তস্মাদন্তমিতেঽব্দকে দ্বিজগণৈঃ পঞ্জীপ্রবন্ধঃ কৃতঃ॥"
(মহামহোপাধ্যায় চিত্রধরমিশ্রধৃত পঞ্জীবচন)

খৃষ্টাব্দে তাঁহার অভিষেক, তাঁহার ৪০ বর্ষ পূর্ব্বে অর্থাৎ ১০৭৯ খৃষ্টাব্দে বিজয়সেনের অভিষেক এবং তাঁহার ৩৪ বর্ষ পূর্ব্বে অর্থাৎ ১০৪৫ খৃষ্টাব্দে হেমন্তসেনের রাজ্যাভিষেক হইয়া থাকিবে। আশ্চর্য্যের বিষয়, বিজয়সেনের উক্ত অভিষেকবর্ষেই কণীবতী হইতে বঙ্গে বৈদিকাগমনের সংবাদ একাধিক বৈদিককুলগ্রন্থে বিবৃত হইয়াছে। সম্ভবতঃ উক্ত ১০৭৯ খৃষ্টাব্দেই শ্যামলবর্ম্মা বিক্রমপুরে গিয়া আশ্রয় লইয়াছিলেন এবং বৈদিক ব্রাহ্মণ আনাইয়া শান্তি-স্বস্ত্যয়ন করাইয়াছিলেন।

বিজয়সেনের রাজধানী বিজয়পুর

বিজয়সেনের প্রকৃত রাজধানী কোথায় ছিল, তাহা লইয়াও মতভেদ আছে। কাহারও মতে নবদ্বীপে,[৩১] আবার কাহারও মতে রাজসাহী জেলায় দেওপাড়ার নিকট বিজয়নগরে তাঁহার রাজধানী ছিল।[৩২]

পূর্ব্বেই লিখিয়াছি যে, দক্ষিণবারেন্দ্রের অন্তর্গত নিদ্রাবলী নামক সামন্তরাজ্যে রামপুর-বোয়ালিয়া হইতে ১০ মাইল পশ্চিমে যেখানে বিজয়সেনের অভ্যুদয় হইয়াছিল, সেই স্থান অধুনা বিজয়নগর নামে প্রসিদ্ধ। তাঁহার অভ্যুদয়-কালে তাঁহার পিতা হেমন্তসেন জীবিত ছিলেন, এজন্য তিনি তৎকালে 'কুমার' বলিয়াই অভিহিত হইতেন। বিজয়নগরের পার্শ্ববর্ত্তী কুমারপুর জন-প্রবাদ অনুসারে অদ্যাপি "কুমার রাজার রাজধানী" বলিয়া পরিচিত। ইহারই ৭ মাইল দূরে বিজয়সেনের প্রদ্যুম্নেশ্বর-প্রশস্তির প্রাপ্তিস্থান দেওপাড়া। দেওপাড়ার একাংশ 'পদুমসহর' শিলালিপি-বর্ণিত প্রদ্যুম্নেশ্বরের স্মৃতিই রক্ষা করিতেছে। যাহা হউক, বিজয়নগর ও দেওপাড়ার মধ্যে কুমার বিজয়সেনের প্রথম রাজধানী ছিল, সন্দেহ নাই। কিন্তু তাঁহার পিতা হেমন্তসেন রাঢ়দেশেই গঙ্গাপ্রবাহিত স্থানে রাজত্ব করিতেন। সেই-গঙ্গা-সলিল বাহিত স্থানই হেমন্তপুর নামে খ্যাত হইয়াছিল। বিজয়সেনের সৌভাগ্যোদয়স্থান বিজয়-নগরের পার্শ্বে তৎকালে গঙ্গা বা এখনকার পদ্মানদীও প্রবাহিত ছিল না। তাঁহার পিতার মৃত্যুর পর এবং চারিদিকে আধিপত্য-বিস্তারের সহিত তিনি উত্তররাঢ়ে আসিয়া তাঁহার পৈতৃক রাজধানী হেমন্তপুরের নিকট অতি সমৃদ্ধিসম্পন্ন বিজয়পুর-রাজধানী প্রতিষ্ঠা করেন।

বিজয়পুর

শূরবংশ-বিবরণ-প্রসঙ্গে লিখিয়াছি, বর্ত্তমান মুর্শিদাবাদ জেলায় নসীপুর হইতে দেড়মাইল উত্তরপূর্ব্বে এবং ভাগীরথী হইতে দেড়মাইল পূর্ব্বে 'সিঙ্গা' নামক স্থানে মহারাজ অনুপূরের সময় 'সিংহেশ্বর' নামক রাজধানী ছিল। তাহারই নিকটবর্ত্তী শূরুই ও বা শূরপুরী ও অনুপুর শূরবংশীয় মহারাজ অনুপূরের স্মৃতিরক্ষা করিতেছে। এই অনুপুর হইতে ৩ মাইল উত্তরপূর্ব্বে হেমতপুর ও হেমতপুরের ১ মাইল

(৩০) "অবাতরদথাম্বয়ে মহতি তত্র দেবঃ স্বয়ং সুধাকিরণশেখরো বিজয়সেন ইত্যাখ্যয়া।
যদস্থি নবযৌবনশিখরিতক্রমৌলয়ঃ আকুলাং দশাক্ষমভিবিক্রমং বিদধতে বিজৈকেকশঃ॥"
(বিশ্বরূপ ও কেশবসেনের তাম্রলেখ, ৫ শ্লোক)

(৩১) Journal of the Asiatic Society of Bengal, (N. S.) 1908, p. 285.

(৩২) গৌড়রাজমালা, ৭৫ পৃষ্ঠা।

পশ্চিমে সুপ্রসিদ্ধ বিজয়পুর বিদ্যমান। মহারাজ লক্ষ্মণসেনের সভাকবি ধোয়ীর 'পবনদূত' পাঠ করিলে মনে হইবে যে, সুহ্মদেশ বা রাঢ়ের মধ্যেই ভাগীরথীর নিকট 'বিজয়পুর' রাজধানী ছিল। পবনদূতে লিখিত আছে—

'গঙ্গাতরঙ্গে চতুর্দ্দিক্ প্লাবিত শ্রেষ্ঠ প্রাসাদরাজিপূর্ণ সরস সুহ্মদেশে গেলে তুমি বিস্ময়প্রাপ্ত হইবে। যে স্থানে নবচন্দ্রকলার ন্যায় কোমল তালীপত্রসকল ব্রাহ্মণপত্নীগণের শ্রোত্রের ক্রীড়াভরণরূপে পরিণত হইয়াছে। তরঙ্গবিধৌত জলক্রীড়ায় সরস-নিপতিত ব্রহ্মসীমন্তিনী-গণের স্তন-মৃগ-মদ দ্বারা শ্যামলবর্ণ ভূষাসম্পন্ন যে দেশ, ভাগীরথী এবং যমুনা যে দেশে প্রবাহিতা, পৃথিবীমধ্যে পবিত্র সেই দেশে ভক্তিনম্র হইয়া তুমি গমন কর। ইতস্ততঃ গমনশীলা প্রকৃতিকুটিলা দর্শিতাবর্ত্তচক্রা গঙ্গাজল হইতে নির্গতা সেই যমুনাকে দেখিয়া নির্ম্মুক্ত অসিতবর্ণ সর্পবধূশঙ্কায় তুমি কাতর হইবে, কারণ সর্প দেখিলে সকলেই ভীত হয়, তোমার ন্যায় অবস্থাপন্নের কথা আর কি? তরঙ্গ-ভঙ্গে রহস্যবশে জলে ক্রীড়াকারিণী কামিনী-গণের স্তনদ্বয়ের বস্ত্রস্রংসন দেখিবে, সদ্যঃই রমণালোকনব্যাকুল সেই রমণীগণের ক্রীড়া-মন্থণ হাস্যজাত উত্তরীয়রূপে পরিণত হউক। ভুবনবিজয়ী সেই রাজার বিজয়পুর স্কন্ধাবার—সেই অত্যুন্নত রাজধানী দেখিয়া তুমি সেস্থানে গমন কর, যেস্থানে তোমার ন্যায় চতুর গঙ্গাবাত সম্ভোগান্তে পৌরাঙ্গনাগণের অঙ্গসংবাহন করিতেছে এবং যেখানে সৌধোপরি স্নিগ্ধ বড়ভীশাল-ভঞ্জীতে প্রকৃতিমধুরা কেলি-কৌতূহলে লীলাপরায়ণা হস্তপঙ্কজস্পর্শপুলকা সুভ্রূগণ বল্লভকর্ত্তৃক গোপনে অতি কষ্টেই যেন নীত হইয়া থাকে। প্রাঙ্গণে রমণমণি দ্বারা স্নিগ্ধশাখ বদ্ধমনোরম-আলবাল ক্রমুকতরুসকল পৌরস্ত্রীগণ কর্ত্তৃক রোপিত হইয়াছিল। যেখানে অযত্নোপাগত যমুনা-সলিল দ্বারা রাত্রিতে সিক্তমূল তরুগণ পরিজনবধূপাণিপ্রদত্ত জল উপেক্ষা করে নাই।'[৩৩]

(৩৩) "গঙ্গাবীচিপ্লুতপরিসরঃ সৌধমালাবতংসো
বাস্যত্যুচ্চৈস্ত্বয়ি রসময়ো বিস্ময়ং সুহ্মদেশঃ।
শ্রোত্রক্রীড়াভরণপদবীং ভূমিদেবাঙ্গনানাং
তালীপত্রং নবশশিকলাকোমলং যত্র যাতি ॥২৭
তোয়ক্রীড়াসরসনিপতদ্ব্রহ্মসীমন্তিনীনাং
বীচিধৌতৈঃ স্তনমৃগমদৈঃ শ্যামলীভূতভূমঃ।
ভাগীরথ্যা তপনতনয়া যত্র নির্যাতি দেবী
দেশং যায়াস্তমথ জগতীপাবনং ভক্তিনম্রঃ ॥৩৩
সংসর্পন্তীঃ প্রকৃতিকুটিলাং দর্শিতাবর্ত্তচক্রাং
তামালোক্য ত্রিদশসরিতং নির্গতামম্বুগর্ভাৎ।
সা নির্মুক্তাসিতফণিবধূশঙ্কয়া কাতরোঽভূ-
র্ভীতঃ সর্ব্বো ভবতি ভুজগাৎ কিং পুনস্তদ্বিধো যঃ ॥৩৪
ক্রীড়ন্তীনাং পয়সি রভসাদত্র লীলাবতীনাং
বীচীহস্তৈরুরসিজযুগোরাংশুকস্রংসনানি।

মহারাজ লক্ষ্মণসেনের সমসাময়িক কবিবর ধোয়ী বিজয়পুরের যেরূপ বর্ণনা করিয়াছেন, তাহাতে দক্ষিণবারেন্দ্রের অন্তর্গত বিজয়নগর ও রাঢ়ের বিজয়পুর দুইটি ভিন্ন স্থান বলিয়াই প্রতিপন্ন হইতেছে। কবিরাজ ধোয়ী তাঁহার সময়ের কএকটি প্রধান স্থানের মাত্র উল্লেখ করিয়াছেন। তাহা হইতে মোটামুটি বুঝিতে পারি যে, অগ্রে গঙ্গা-যমুনার সঙ্গম ত্রিবেণী, তাহার পর আর্য্যচক্রা বা চাকদহ, তাহা ছাড়াইয়া বরাবর উত্তরে গিয়া এক দিকে গঙ্গা ও অপরদিকে রমণা (সরোবর), তন্মধ্যে মহাসমৃদ্ধিশালী বিজয়পুর। এরূপ স্থলে উপরে যে মুর্শিদাবাদ জেলায় 'বিজয়পুর' নামক প্রসিদ্ধ স্থানের উল্লেখ করিয়াছি, তাহাই মহারাজ বিজয়সেনের রাজধানী বিজয়পুর বলিয়া মনে হইবে। বলা বাহুল্য, এই বিজয়পুরের অনতিদূরে সুবৃহৎ রমণাদীঘী বিদ্যমান, এ অঞ্চলে এতবড় দীঘী আর নাই। মুসলমানেরা আসিয়া এই স্থান অধিকার করিয়া বাস করিলে এই রমণা দীঘী শেখের দীঘী এবং হেমন্তপুর হেমৎপুর-নামে খ্যাত হয়।

পূর্ব্ব অধ্যায়ে লিখিয়াছি যে, বিজ বাচস্পতির কুলজীসার-সংগ্রহ ও রাঢ়ীয় ভট্ট-বচনানুসারে ৯৯৪ শকে বা ১০৭২ খৃষ্টাব্দে গৌড়রাজ-সভায় পঞ্চকায়স্থসহ বেদবিদ্ ব্রাহ্মণগণ আগমন করিয়াছিলেন।[৩৪] বলা বাহুল্য, ঐ শকে যিনি প্রকৃত গৌড়েশ্বর নামে পরিচিত ছিলেন, তিনি পালবংশীয় নৃপতি, তিনি বৌদ্ধ-সম্প্রদায়ভুক্ত, তাঁহার সভায় বৈদিক ব্রাহ্মণাগমন সম্ভবপর নহে। ঐ সময়ে বিজয়সেন নানাস্থান হইতে বৈদিক ব্রাহ্মণ আনাইয়াছিলেন, তাহা পূর্ব্বেই লিখিয়াছি। গৌড়ের অন্তর্গত দক্ষিণ-বারেন্দ্রে তিনি আধিপত্য করিতেছিলেন বলিয়াই সম্ভবতঃ কুলগ্রন্থে গৌড়েশ্বর বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন। তাঁহার সভায় বৈদিকব্রাহ্মণের ন্যায় কায়স্থগণেরও সমাগম ঘটিয়াছিল, কিন্তু

গৌড়রাজ-সভায় কায়স্থাগমন

সন্ত্যাসামপি চ রমণালোকনব্যাকুলানাং
যাসু ক্রীড়ামহণহসিতাম্বুম্বরীশাকলনং ।৩৫
স্কন্ধাবারং বিজয়পুরমিত্যুন্নতাং রাজধানীং
দৃষ্ট্বা হংবদ্ধবনজমিনস্তত্র রাজ্ঞোঽধিগচ্ছেঃ ।
গঙ্গাবাতস্তমিব চতুরো যত্র পৌরাঙ্গনানাং
সম্ভোগান্তে সপদি বিতনোত্যঙ্গসংবাহনানি ।৩৬
যৎসৌধানামুপরি বড়ভীশাখক্রীড়ু লীলাঃ
শম্বিকাসু প্রকৃতিমধুরাঃ কেলিকৌতূহলেন ।
উদ্গীয়ন্তে কথমপি রহঃ পাণিপঙ্কেরুহাগ্র-
স্পর্শোন্মাদপ্রচুরপুলকমুকুলাঃ সুভ্রুবো বসতেন ।৩৭
মিশ্রভাবা রমণমণিভির্ভঙ্গুকালশালাঃ
পৌরস্ত্রীভিঃ ক্রমুকতরবো রোপিতাঃ প্রাঙ্গণেষু ।"

(ধোয়ী কবির পবনদূত)

(৩৪) ২১৩ পৃষ্ঠায় ৩৩ ও ৩৫ সংখ্যক পাদটীকা দ্রষ্টব্য।

সেই কায়স্থগণের নাম কি তাহার স্পষ্ট উল্লেখ নাই। আধুনিক ঘটকগণের মতে, ঐ পঞ্চকায়স্থের নাম মকরন্দ ঘোষ, দশরথ বসু, কালিদাস মিত্র, দশরথ গুহ ও পুরুষোত্তম দত্ত। আবার কোন কোন ঘটকের মতে বিজ্ঞবাচস্পতির পঞ্চকায়স্থ শব্দ পঞ্চব্রহ্মবৎ, তাঁহাদের মধ্যে পঞ্চগোত্র ছিল, কিন্তু সংখ্যায় তাঁহারা পঞ্চজনের অধিক। তাঁহারাই মকরন্দ প্রভৃতি পঞ্চগোত্রীয় পঞ্চকায়স্থের বংশধর। আবার আধুনিক কুলগ্রন্থের ভ্রান্ত-মতে পরিচালিত হইয়া অনেকে বিশ্বাস করিয়া থাকেন, গৌড়াধিপ ১ম আদিশূরের সমকালীন ভট্টনারায়ণাদি পঞ্চসাগ্নিক বিপ্রগণের সঙ্গেই মকরন্দাদি পঞ্চকায়স্থ গৌড়রাজ-সভায় আগমন করেন, কিন্তু ভট্টনারায়ণ, বেদগর্ভ, দক্ষ, শ্রীহর্ষ ও ছান্দড় এই পঞ্চ মহাত্মা যে মকরন্দ প্রভৃতির সময়ে বিদ্যমান ছিলেন না, তাঁহারা মকরন্দাদির বহু-পূর্ব্ববর্ত্তী শূরবংশ-প্রসঙ্গে তাহা আলোচিত হইয়াছে।[৩৫] খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীর শেষভাগে ভট্টনারায়ণাদির আবির্ভাবকাল এবং খৃষ্টীয় নবম শতাব্দীর শেষভাগে মকরন্দ ঘোষের পিতামহ সোম ঘোষ এবং কালিদাস মিত্রের প্রপিতামহ সুদর্শন মিত্রের অভ্যুদয়কাল নির্ণীত হইয়াছে।[৩৬] উত্তর-রাঢ়ীয় কায়স্থ-কুল-পঞ্জিকায় লিখিত আছে, সোম ঘোষের পুত্র অরবিন্দ, তৎপুত্র মহেশ ও মকরন্দ। মকরন্দ দক্ষিণরাঢ়ে সপ্তগ্রামে আসিয়া বাস করেন এবং বসুবংশে কন্যা দান করেন।[৩৭] বাচস্পতির দক্ষিণরাঢ়ীয়-ঢাকুরী গ্রন্থেও লিখিত আছে যে, সোমঘোষের বংশে মকরন্দঘোষের জন্ম।[৩৮] পঞ্চাননের উত্তররাঢ়ীয়-কারিকায় পাওয়া যায় যে, সোম ঘোষের সহযাত্রী সুদর্শন মিত্র। এই সুদর্শনের বংশেই কালিদাস মিত্রের জন্ম।[৩৯] সুদর্শনের পুত্র সোম,

(৩৫) ১১০ হইতে ১১৭ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

(৩৬) ১৩৪ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

(৩৭) "অযোধ্যা হইতে আইল সোম। বিপ্রসাথে করি হোম॥
তস্য সুত অরবিন্দ। সুত মহেশ মকরন্দ॥
মকরন্দ সপ্তগ্রামে। পূজিত পিতার নামে॥
দক্ষিণে বাড়িল মান। বোসে কৈল কন্যাদান॥" (উত্তররাঢ়ীয় কুলপঞ্জিকা)

(৩৮ "সোম ঘোষ-বংশ গুণাবতংস মকরন্দ সুতাত্মজ।"
(বাচস্পতির দক্ষিণ-রাঢ়ীয় ঢাকুরী)

(৩৯) "সুদর্শনসুতঃ সোমস্তৎসুতঃ শম্ভুমিত্রকঃ।
শ্রীকণ্ঠস্তৎসুতো জাতস্তৎসুতো ব্যাসমিত্রকঃ॥
পুরুষোত্তমস্তস্য পুত্রশ্চত্বারস্তস্য নন্দনাঃ।
জ্যেষ্ঠো বাচস্পতির্নাম্নো ঘটমিশ্রশ্চ মধ্যমঃ॥
কনিষ্ঠাখ্যো নরপতিশ্চত্বারঃ সোদরা ইমে।
বল্লালপূজিতো ভূত্বা ঘটোহভূন্মগধেশ্বরঃ॥
সুদর্শনবংশে কোহপি কালিদাসস্য মিত্রকঃ।
গতবান্ দক্ষিণরাঢ়ে তত্রৈব খ্যাতিমাপ্তবান্॥" (পঞ্চাননের উত্তররাঢ়ীয় কারিকা)

সোমের পুত্র শম্ভুমিত্র। বাচস্পতির দক্ষিণরাঢ়ীয় ঢাকুরী-মতে শম্ভুমিত্রের তিন পুত্রের মধ্যে কালিদাস (ও উত্তররাঢ়ীয়-কারিকা-বর্ণিত শ্রীকণ্ঠ) প্রসিদ্ধ।[৪০] পঞ্চাননের উত্তর-রাঢ়ীয় কারিকা-অনুসারে মৌদগল্য পুরুষোত্তম দত্ত সোম ঘোষাদির সমসাময়িক। এই পুরুষোত্তম-বংশে ছয় পুরুষ পর্য্যন্ত দত্ত উপাধিভূষিত ছিলেন। যথা—১ম মৌদগল্য পুরুষোত্তম, তৎপুত্র ২ কুলকর দত্ত কবীন্দ্র, তৎপুত্র ৩ বিক্রমদত্ত, তৎপুত্র ৪ বিশ্বম্ভর দত্ত, তৎপুত্র ৫ গদাধর, তৎপুত্র ৬ দামোদর দত্ত এবং এই দামোদরের পুত্র (পুরুষোত্তম দত্তের ৭ম পুরুষে) রামদাস সরস্বতী।[৪১] উত্তর রাঢ়ীয় কুলপঞ্জিকা-মতে, মৌদ্গল্য গোত্র (দামোদর দত্ত ?) অতিশয় হরিভক্ত ছিলেন বলিয়া 'দাস' উপাধিতে পরিচিত হইয়াছিলেন।[৪২]

এখন দেখিতেছি, সৌকালীন গোত্রজ সোম ঘোষ, বিশ্বামিত্র গোত্রজ সুদর্শন মিত্র এবং মৌদগল্য গোত্রজ পুরুষোত্তম দত্ত এই তিন জনই যথাক্রমে বর্ত্তমান উত্তররাঢ়ীয়, দক্ষিণরাঢ়ীয় ও বঙ্গজ ঘোষ, মিত্র ও দত্তবংশের বীজপুরুষ হইতেছেন এবং মহারাজ আদিত্যশূরের সময়ে উত্তর রাঢ়ে আগমন করেন। তাঁহাদের বংশধর হইতেছেন যথাক্রমে মকরন্দঘোষ, কালিদাস মিত্র ও পুরুষোত্তম দত্ত। সম্ভবতঃ এই তিন ব্যক্তি বা তাঁহাদের বংশধরগণ মূল কুলস্থান ছাড়িয়া দূর দক্ষিণরাঢ়ে আসিয়া বসু ও গুহবংশের সহিত আত্মীয়তা স্থাপন করেন ও পূর্ব্বতন আত্মীয়-স্বজনগণের সহিত একটু পৃথক্ হইয়া পড়েন। বলা বাহুল্য, তৎকালে গৌড়বঙ্গের কায়স্থসমাজে শ্রেণীবিভাগ ঘটে নাই। সম্ভবতঃ পৈতৃক সামন্তরাজ্য বা কুলস্থানের অধিকার লইয়া ভ্রাতৃগণের মধ্যে বিরোধ উপস্থিত হইয়াছিল, তাহারই ফলে যাঁহারা দক্ষিণরাঢ়বাসী হইয়া পূর্ব্বকুলস্থানের সংস্রব ত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন, তাঁহারাই তদ্বংশধর দক্ষিণরাঢ়ীয়গণের বীজপুরুষ বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন। দক্ষিণরাঢ়ে আসিয়া তাঁহাদের সহিত বসু ও গুহবংশের সম্বন্ধ হইয়াছিল। উত্তররাঢ়ীয়-কারিকায় গৌতম গোত্রজ বসু ও কাশ্যপ গুহবংশের কোন উল্লেখ নাই।

রাঢ়ীয় ও বঙ্গজ সকল কুলগ্রন্থেই গুহবংশের বীজপুরুষ রাজকুমার বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন। কোন কোন কুলকারিকায় 'অয়মগ্নিকুলোদ্ভবো গুহবংশাভিধানো মহান্' অর্থাৎ ইনি অগ্নিকুলোদ্ভব মহান্ গুহবংশীয় বলিয়া পরিচিত। মির্জ্জানগরগ্রাম হইতে প্রাপ্ত ঘটক নন্দরাম মিত্র-সংগৃহীত প্রাচীন কারিকায়

গুহবংশের আদিপরিচয়

(৪০) "শম্ভুমিত্র নাম সুত অনুপাম কালী আদি তিন জন।"

(বাচস্পতির দক্ষিণ-রাঢ়ীয় ঢাকুরী)

(৪১) "মৌদগল্যবীজো পুরুষোত্তমাখ্যো তস্মাৎ কবীন্দ্রো কুলকরদত্তঃ।
তস্মাদভূৎ বিক্রমনামধারী তস্মাচ্চ বিশ্বম্ভরদত্তকারী॥
তস্মাৎ গদাধরো নৈকষ্য কক্ষঃ তস্মাদভূদ্দাস-দামোদরাখ্যঃ।
তস্যাত্মজো কবিরামদাসঃ সরস্বতীখ্যাতিঃ ভুবি প্রকাশঃ॥" (পঞ্চাননের কারিকা)

(৪২) "হরিতে ভকতি বড় মৌদগল্যনন্দন।
দাস বলি খ্যাতি তার গুন বিচক্ষণ॥" (উত্তররাঢ়ীয় ঢাকুরী)

দশরথ গুহ সম্বন্ধে লিখিত আছে, 'এই যে জ্ঞানবান্ শুদ্ধবংশ দশরথ গুহ, ইনি গুহবংশের উজ্জ্বল চন্দ্রস্বরূপ, কোটদেশের অধিপতি, বেদনিষ্ঠ ব্রাহ্মণভক্ত ;—গুহের এইরূপ কুলপরিচয় পাইয়া সকলে হাসিয়াছিলেন।' ৪৩

উক্ত পরিচয় হইতে দশরথ গুহকে কোটদেশের রাজকুমার বলিয়া মনে হইতেছে। পূর্ব্বেই লিখিয়াছি, বীর নামক এক নৃপতি রামচরিত টীকায় 'কোটাটবীকিরীরবদক্ষিণসিংহাসন-চক্রবর্ত্তী' বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন। এই বীর নৃপতি বিজয়সেনের হস্তে বন্দী হইয়াছিলেন, সে কথাও পূর্ব্বেই বলিয়াছি। উক্ত 'কোটাটবী' কুলগ্রন্থে 'কোটদেশ' বলিয়া পরিচিত হওয়া সম্ভবপর। উড়িষ্যার গড়জাত অঞ্চলই কোটাটবী বা কোটদেশ বলিয়া গৌড়বাসীর নিকট পরিচিত ছিল। আইন-ই-অক্‌বরীমতে কোটদেশ কটকসরকারের অন্তর্গত। রামচরিতের হস্তলিপিতে কোটরাজ বীরের 'গুণ' উপাধি দৃষ্ট হয়। লিপিকর-প্রমাদে 'গুহ'-স্থানে কি 'গুণ' হইয়াছে ? বহু পূর্ব্বকাল হইতেই গুহবংশ কলিঙ্গে আধিপত্য করিতেন, নানা প্রাচীন পুরাণ ও বৌদ্ধ গ্রন্থ হইতে তাহার সন্ধান পাওয়া যায়।৪৪

এই গুহবংশীয় কলিঙ্গাধিপ গুহশিব বা শিবগুহের নাম বৌদ্ধধর্ম্মের ইতিহাসে সুপ্রসিদ্ধ। সিংহলের 'দাঠাবংশ'৪৫ নামক পালিগ্রন্থে বুদ্ধদেবের দন্তরক্ষা-প্রসঙ্গে এই গুহশিবের ইতিহাস বিবৃত হইয়াছে। এই প্রাচীন পালিগ্রন্থপাঠে বুঝিতে পারি যে, শাক্যবুদ্ধের নির্ব্বাণের পর ক্ষেম নামা তাঁহার এক শিষ্য চিতা হইতে বুদ্ধদেবের পবিত্র দন্ত লইয়া কলিঙ্গাধিপ ব্রহ্ম-দত্তকে অর্পণ করেন। ব্রহ্মদত্ত নিজ রাজধানীতে মণিমাণিক্যখচিত একটি সুবর্ণমন্দির নির্ম্মাণ করিয়া তন্মধ্যে সেই পবিত্র দন্ত রক্ষা করেন। এই দন্ত হইতে কলিঙ্গের রাজধানী দন্তপুর নামে খ্যাত হইয়াছিল। খৃষ্টীয় ৪র্থ শতাব্দে (৩১০-৩২০ খৃঃ অব্দমধ্যে) উত্তরাধিকারসূত্রে শিবগুহ দন্তপুরের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইলেন, তিনি প্রথমে অতিশয় ব্রাহ্মণভক্ত ছিলেন। প্রথমে তিনি ব্রাহ্মণদিগের পরামর্শে তৎপূর্ব্বতন রাজাদিগের ন্যায় দন্তের পূজায় বিরত হন, কিন্তু কোন এক নৈসর্গিক ঘটনায় বিচলিত হইয়া পরে তিনিও দন্তের একজন গোঁড়া ভক্ত হইয়া পড়েন। ব্রাহ্মণগণ তাহাতে বিরক্ত হইয়া পাটলিপুত্রাধিপের নিকট কলিঙ্গাধিপের বিরুদ্ধে অভিযোগ উপস্থিত করেন। তাঁহাদের পরামর্শে পাটলিপুত্রাধিপ বুদ্ধদন্তসহ গুহ শিবকে আনিবার জন্য চিত্তযান নামক এক সামন্তরাজকে পাঠাইয়া দেন। গুহশিব তাঁহার গতিরোধ করিতে সমর্থ হইলেন না, তাঁহাকে দন্তসহ পাটলিপুত্র নগরে আসিতে হইল। পাটলিপুত্রে দন্ত আনীত হইলে

(৪৩) "দশরথ গুহ এব জ্ঞানবান্ শুদ্ধবংশো গুহকুলশশীশঃ কোটদেশক্ষিতীশঃ।
দ্বিজবরকুলসেবী বেদনিষ্ঠোপজীবী শ্রুতগুহকুলস্ত বস্তুত্র সর্ব্বদা হাসঃ।" (প্রাচীন কারিকা)

(৪৪) মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় ও প্রত্নতত্ত্ববিৎ কে, পি, জয়স্বাল মহোদয় এই সংবাদ দিয়া আমাকে বাধিত করিয়াছেন।

(৪৫) এই গ্রন্থ ধর্ম্মকীর্ত্তি থের কর্ত্তৃক ১১৯৭ খৃষ্টাব্দে রচিত হয়, তৎপরে শ্যাম এবং ব্রহ্ম-ভাষাতেও এই গ্রন্থ অনুবাদিত হইয়াছে।

এখানে বহু অভূতপূর্ব্ব কাণ্ড ঘটিতে লাগিল, তাহাতে পাটলিপুত্রপতি বুদ্ধদন্তের ভক্ত হইয়া পড়িলেন। তাঁহার মৃত্যুর পর গুহশিব পুনরায় সেই দন্ত দন্তপুরে লইয়া আসিলেন। কিন্তু এখানেও তিনি নিশ্চিন্ত হইতে পারিলেন না। অল্প দিন পরেই ক্ষীরধার নামক পার্শ্ববর্ত্তী এক নৃপতি আসিয়া গুহশিবের রাজ্য আক্রমণ করিলেন। ক্ষীরধার পরাস্ত ও নিহত হইলে তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র বহু সৈন্যসামন্ত লইয়া দন্তপুরী আক্রমণ করেন। গুহশিব এবার আর নিস্তার নাই ভাবিয়া তাঁহার প্রিয় জামাতা উজ্জয়িনীরাজকুমার দন্তকুমারকে আদেশ করিয়া গেলেন যে, তাঁহার অবর্ত্তমানে যেন পবিত্র বুদ্ধ[illegible] সিংহলে পাঠাইয়া দেওয়া হয়। গুহশিব যুদ্ধে প্রাণত্যাগ করিলে দন্তকুমার রাজকন্যাসহ ছদ্মবেশে সেই পবিত্র দন্ত লইয়া তাম্রলিপ্ত হইয়া সিংহলে গমন করিলেন। তদবধি বুদ্ধদন্ত সিংহলে রক্ষিত ও পূজিত হইতেছে।

সম্ভবতঃ উক্ত শিবগুহের বংশ দন্তপুরী হারাইয়া উৎকলের গড়জাত আশ্রয় করেন এবং ক্রমে ক্রমে সমস্ত গড়জাত প্রদেশে প্রভুত্ব-বিস্তারে সমর্থ হন। তাঁহাদের বংশধর গৌড়-কবির নিকট "নানারত্নকূটকুট্টিম-বিকটকোটাটবীকণ্ঠীরবো দক্ষিণসিংহাসনচক্রবর্ত্তী" বলিয়া পরিচিত হইয়া থাকিবেন। প্রাচীন হস্তলিখিত কুলগ্রন্থে গৌড়াগত গুহবংশের বীজী দশরথ গুহের পিতামহের নাম বীরাট বা বিরাট লিখিত আছে। এই কোটদেশাধিপ বিরাট গুহ ও 'কোটাটবীকণ্ঠীরব বীরগুণ' অভিন্ন ব্যক্তি কি না অনুসন্ধেয়। একখানি জীর্ণ শীর্ণ প্রাচীন বঙ্গজকুলগ্রন্থে ৯৯৪ শকে সেন-রাজসভায় ব্রাহ্মণকায়স্থাগমন[illegible]ঙ্গে লিখিত আছে যে, যজ্ঞোপলক্ষে যখন সেনরাজ ব্রাহ্মণ এবং কায়স্থগণকে আহ্বান করেন, তৎকালে (সম্ভবতঃ দাক্ষিণাত্য বৈদিক) ব্রাহ্মণেরা এইরূপ পরামর্শ করেন—

"চল যাই বিরাটবাড়ী, তবে সে যাইতে পারি, রাজা না বলি যাইবে কে।
শুনিবা যে মুনিবর, চলে যাই সত্বর, কহিতে লাগিলা রাজাকে ॥
শুন রাজা নৃপবর, চল যাই সত্বর, আবাহন করিছে গৌড়পতি।
বিরাট রাজা কহেন কথা, আমি না যাইব তথা, পৌত্রে পাঠাইয়া দিব সম্প্রতি ॥"
(ইদিলপুর হইতে সংগৃহীত ও বিশ্বকোষ-কার্য্যালয়ে রক্ষিত প্রাচীন পুথি ২য় পৃষ্ঠা।)

প্রবাদ, মেদিনীপুর জেলায় গুহবংশের সুপ্রাচীন রাজধানী দন্তপুর বা দাঁতন হইতে ৫ মাইল দূরে রাইবনিয়া-গড়ে বিরাট নৃপতি রাজত্ব করিতেন, এখনও তথায় তাঁহার বহুতর কীর্ত্তিনিদর্শন বিদ্যমান। এই রাই-বনিয়া গড় এবং ময়ূরভঞ্জের নানা স্থানে সাধারণকর্ত্তৃক বহুতর বিরাটকীর্ত্তি নির্দ্দেশিত হইয়া থাকে। সম্ভবতঃ সেই বিরাট নৃপতির নাম লুপ্ত হওয়ায় কুলগ্রন্থে তিনি বিরাট বা বীরাট গুহ নামে পরিচিত হইয়া থাকিবেন। এই বিরাটগুহ ও বীরগুণ যদি অভিন্ন ব্যক্তি হয়েন, তাহা হইলে মনে হইবে যে, তিনি বিজয়সেনের নিকট এক সময়ে পরাজিত হওয়ার পরে তাঁহার আমন্ত্রণরক্ষা করিতে সাহসী হন নাই, তিনি আপনার পৌত্র দশরথ গুহকে ব্রাহ্মণগণের সহিত পাঠাইয়াছিলেন। এই সকল ব্রাহ্মণ গুহবংশের আশ্রিত ছিলেন বলিয়াই গৌড়রাজসভায় যাইবার সময় তাঁহাদিগকে বিরাট নৃপতির অনুমতি লইতে হইয়াছিল। মেদিনীপুর ও উৎকলের

বিরাটবংশ প্রধানতঃ নাগপূজক ও তজ্জন্য নাগবংশ বলিয়াও খ্যাত ছিলেন। লক্ষ্মণসেনের মাধাইনগর তাম্রলেখ হইতেও পাওয়া যায় যে, বিজয়সেন নাগদিগকে দমন করিয়াছিলেন।[৩৬]

বলা বাহুল্য, তৎকালে দক্ষিণরাঢ়ে সুপ্রতিষ্ঠ মকরন্দঘোষ প্রভৃতির বংশধরগণও গৌড়ে উপস্থিত হইয়াছিলেন। প্রকৃত প্রস্তাবে এ সময়ে মকরন্দ ঘোষাদির অভাব হইয়াছিল, তবে মকরন্দ ঘোষাদি প্রথমে দক্ষিণরাঢ়ীয়গণের বীজপুরুষ বলিয়া পরিচয়ের সুবিধা হইবে মনে করিয়া তাঁহাদের নাম পঞ্চগোত্রীয় কায়স্থমধ্যে পরিগৃহীত হইয়াছে। ৯২৩ শকে রাঢ় হইতে যে পঞ্চগোত্রীয় কএকজন কায়স্থ বৈদিক-বিপ্রসহ বিজয়সেনের সভায় উপস্থিত হইয়াছিলেন, তন্মধ্যে দশরথগুহ একজন, তিনি পরাক্রান্ত সেননৃপতির অনুগ্রহলাভাশায় রাজসভায় উপস্থিত হইয়াছিলেন, সন্দেহ নাই, কিন্তু যে ব্যক্তি রাজকীয় সম্মান বা পদপ্রাপ্তির আশায় আসিয়াছেন ও যাঁহার পিতামহ (?) বিজয়সেনের নিকট পরাজিত হইয়াছেন, তাঁহার মুখে 'আমি রাজার কুমার' এরূপ কথা শুনিয়া সভাস্থ সকলে যে হাসা করিবে, তাহা বিচিত্র নহে। এই কারণে ক্ষুব্ধ হইয়াই তিনি গৌড় পরিত্যাগ করেন। এ সময়ে হয় ত তাঁহার পৈতৃক বিরাটরাজ্য পরহস্তগত হওয়ায়, অথবা সামলবর্ম্মার সহিত গুহবংশের কোন প্রকার আত্মীয়তা থাকায় বিজয়সেনের ভয়ে সামল পূর্ব্ববঙ্গ আশ্রয় করিলে দশরথগুহও হয়ত তাঁহার সহিত পূর্ব্ববঙ্গে গিয়া তাঁহার নিকট রাজসম্মান লাভ করিয়া বঙ্গবাসী হইয়াছিলেন।

পূর্ব্বেই লিখিয়াছি যে, গুহবংশের ন্যায় বসুবংশও পূর্ব্বে উত্তররাঢ়বাসী ছিলেন না, এই কারণে উত্তররাঢ়ীয় কায়স্থ-কারিকায় বসুবংশের নাম নাই। দক্ষিণরাঢ়ীয় ও বঙ্গজসমাজেই বসুবংশের প্রতিষ্ঠা। আধুনিক কুলগ্রন্থের মতে দশরথ বসু কান্যকুব্জ হইতে এ দেশে আগমন করেন, কিন্তু ইদিলপুর সমাজের সুপ্রাচীন আচার্য্যচূড়ামণির কুলকারিকায় যেরূপ বংশপরিচয় পাইতেছি, তাহাতে দশরথের বহুপূর্ব্বে এই বংশ রাঢ়বাসী হইয়াছিলেন বলিয়া মনে হয়।

বসুবংশের আদি পরিচয়

আচার্য্যচূড়ামণির প্রাচীন কারিকায় বসুবংশের ১ম ব্যক্তি অনন্তানন্দ, তৎপুত্র বিজয়ী, তৎপুত্র মহার্ণব, তৎপুত্র গুণাকর, তৎপুত্র জয়ধন, তৎপুত্র যশোধন এবং তৎপুত্র গৌতম, তৎপুত্র রাবণ, সূর্য্যবংশীয়া মোহিনী নাম্নী এক কন্যার সহিত রাবণের বিবাহ হয়, তাঁহাদের পুত্র দশরথ ও শম্ভু, দশরথের পুত্র পরম, পরমের পুত্র লক্ষ্মণ ও পূষণ।[৩৭] এদিকে কাশীনাথের দক্ষিণরাঢ়ীয় ঢাকুরী-মতে—

(৩৬) "ভুচক্রং কিরদেকপাদুমহ চুম্বকামস্তাজিব পা
নাগানাং কিমাস্তবর্ণমুরসালক্ষাস্তি গুহাশ্রু রঃ।"
(লক্ষ্মণসেনের মাধাইনগর-তাম্রলেখ, ৭ শ্লোক)

(৩৭) "বসুপূর্ব্বে সমাখ্যাত অনন্তানন্দসংজ্ঞকঃ।
তৎপুত্রো বিজয়ী নাম তস্য পুত্রো মহার্ণবঃ।
গুণাকরস্তৎপুত্রস্তৎপুত্রো জয়ধনস্তথা।
যশোধনো মহাবীর্য্যঃ গৌতমস্তস্য বৈ সুতঃ। তৎসুতো রাবণঃ।

"বীরনাথসুত বসু।
দশরথ নাম, দক্ষরাঢ়ে ধাম, গৌতম গোত্রেতে ইবু॥"

এখানে রাবণের নামান্তর বা উপাধি বীরনাথ মনে হইতেছে। দক্ষিণরাঢ়ীয় ঢাকুরী হইতেও জানা যাইতেছে, দক্ষিণরাঢ়েই দশরথ বসুর বাস ছিল।

কোন-কোন কুলগ্রন্থে 'চৈন্তকুলকমলের সূর্য্য' বলিয়া দশরথ বসুর পরিচয় পাওয়া যায়। ইহাতে মনে হয় যে, চেদিরাজ্যেই তাঁহার পূর্ব্বপুরুষের প্রতিষ্ঠালাভ হইয়াছিল বলিয়া দশরথ 'চৈন্তকুলাম্বুজভানু' বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন। চেদিরাজসভায় বহু পূর্ব্বকাল হইতেই শ্রীবাস্তব কায়স্থগণ উচ্চপদে অধিষ্ঠিত ও সম্মানিত ছিলেন, নানা তাম্রশাসন ও শিলালিপি হইতে তাহার সন্ধান পাওয়া গিয়াছে।[৪৮] এদিকে কোন কোন প্রাচীন কুলগ্রন্থে বসুবংশ শ্রীবাস্তব্যকুলজাত বলিয়াও আখ্যাত হইয়াছেন।[৪৯] ৯২৪ শকে দশরথ বসু যদি বিজয়-সেনের সভায় আসিয়া থাকেন, তাহা হইলে তাঁহার উর্দ্ধতন ৯ম পুরুষ অনন্তানন্দকে আমরা খৃষ্টীয় ৮ম শতাব্দীর বা ১ম আদিশূরের সমসাময়িক ব্যক্তি বলিয়া মনে করিতে পারি। তাই আদিশূরের সময় বসুবংশের বীজপুরুষের গৌড়াগমনপ্রবাদ চলিয়া আসিতেছে। কিন্তু বরেন্দ্র ও উত্তররাঢ়ে পালবংশের আধিপত্য-বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে বসুবংশও সম্ভবতঃ দক্ষিণরাঢ়ে চলিয়া আসেন, এই হেতু উত্তররাঢ়ীয় বা বারেন্দ্রসমাজের সহিত বসুবংশের কোন সম্বন্ধ ঘটে নাই। এইরূপে ভরদ্বাজ দত্তবংশও উত্তররাঢ়ীয় বা বারেন্দ্রসমাজে মিলিত হন নাই।

ভরদ্বাজ দত্তবংশ　　ভরদ্বাজ গোত্রীয় দক্ষিণরাঢ়ীয় দত্তবংশের ঢাকুরী হইতেও জানা যায় যে—

"বীজী পুরুষোত্তম দত্ত, সদাশিব অনুরক্ত, কাঞ্চীপুর হইতে গৌড়দেশে।
শ্রীবিজয় মহারাজ, অহঙ্কারী সভামাঝ, কুলাভাব হইল নিজদোষে॥"

যাহা হউক, নানা কুলগ্রন্থ আলোচনা করিয়া বুঝিতেছি যে, বিজয়সেনের অভ্যুদয়কালে তাঁহার সভায় ৯২৪ শকে বা ১০০২ খৃষ্টাব্দে দক্ষিণরাঢ় হইতে সৌকালীন মকরন্দঘোষ-বংশধর, বিশ্বামিত্র কালিদাস মিত্রবংশ ও মৌদগল্য পুরুষোত্তমদত্তের বংশধর এবং নিজে কাশ্যপ দশরথগুহ, গৌতম দশরথবসু ও ভরদ্বাজ পুরুষোত্তম দত্ত স্বয়ং উপস্থিত হইয়াছিলেন। দক্ষিণরাঢ়ীয় ঢাকুরী-মতেও ৯২৪ শকে ইঁহারা গৌড়দেশে আগমন করেন এবং কুলীন বলিয়া সম্মানিত হন ঃ—

"সূর্য্যবংশে সমুৎপন্না মোহিনী নাম্নী কন্যকা।
রাবণেন পরিণীতা সূর্য্যসোমগুণৌ সুতৌ।
(সুতৌ শম্ভু-দশরথৌ পরমো দশরথাত্মজঃ।)*
লক্ষ্মণপুরুষৌ সুতৌ ভাবিতমহাজনৌ॥" (আচার্য্যচূড়ামণির কারিকা)

(৪৮) কায়স্থের বর্ণ-নির্ণয়, ৬৩ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

(৪৯) ঐ　　১৫৭ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

* বন্ধনীর মধ্যবর্ত্তী অংশ কোন কোন পুঁথিতে নাই।

"চৌরানই শকে নবশত লেখে গৌড়দেশে আগমন।
সভায় বিচার নবগুণ যার কুলীন করিল স্থাপন॥"

ঐ সময় রাঢ়দেশে বিজয়সেনের নূতন রাজধানী-প্রতিষ্ঠার সহিত উক্ত পঞ্চগোত্রও তাঁহাদের পূর্ব্ববাস দক্ষিণরাঢ়ে আসিয়া প্রথমে সপ্তগ্রামে মিলিত হন।[৫০] পরে রাজদত্ত বিভিন্ন শাসন গ্রাম লাভ করিয়া, তত্তৎস্থানে গিয়া বাস করিতে থাকেন। ঐ সকল স্থান দক্ষিণরাঢ়ে অদ্যাপি বসুগ্রাম বা বসুয়া, ঘোষগ্রাম, মিত্রগ্রাম, দত্তগ্রাম প্রভৃতি নামেই পরিচিত রহিয়াছে।[৫১] এই সময় দেব, দত্ত, কর, পালিত, সেন, সিংহ, দাস ও ভিন্ন বংশীয় গুহপরিবার আসিয়া তাঁহাদের সহিত সম্মিলিত হন, এই অষ্টঘরও গৌড়পতির নিকট হইতে কোণা, বট, দ্রোণ, বর্দ্ধমান, মধু, কর্ণ, কঙ্ক ও রায়না এই আটখানি শাসন লাভ করেন।[৫২]

'বল্লালোদয়' নামক একখানি খণ্ডিত জীর্ণ পুথিতে লিখিত আছে,—গৌড়াধিপ বিজয়সেনের যত্নে গৌড় ও রাঢ়ে দাক্ষিণাত্য ও পাশ্চাত্য বিপ্রসমাগম হইয়াছিল।' বলা বাহুল্য, তাঁহারই সময়ে দক্ষিণরাঢ়ে পাশ্চাত্য ও দাক্ষিণাত্য-কায়স্থগণের মধ্যে পরস্পর সম্বন্ধ ঘটিয়াছিল। এড়ু-মিশ্রের কারিকার মতে দায়ভাগকার পারিভদ্রীয় জীমূতবাহন বিষক্‌সেনের প্রাড়্‌বিবাক ও অমাত্য ছিলেন।[৫৩] বিষক্‌সেন বিজয়সেনের নামান্তর বলিয়া বোধ হয়।[৫৪] সেনবংশের তাম্রলেখ

(৫০) "ঘোষ বসু দত্ত মিত্র এই চারি জন।
রাজাজ্ঞায় সপ্তগ্রামে রহিল তখন॥"
(ঘটক নন্দরামমিত্র-সংগৃহীত কারিকা)

(৫১) দক্ষিণরাঢ়ীয় কায়স্থকাণ্ডে বিস্তারিত 'ঘবরণ ও কুলস্থানের বর্ত্তমান অবস্থান দ্রষ্টব্য।

(৫২) "অষ্ট কোণো বটঃ দ্রোণো বর্দ্ধমানঃ মধুস্তথা।
কর্ণঃ কঙ্কোচ রায়না কায়স্থানাং স্থানাষ্টকাঃ॥"
(দ্বিজ বাচস্পতির বঙ্গজকুলজীসারসংগ্রহ)

(৫৩) এড়ু মিশ্র জীমূতবাহনের এইরূপ বংশপরিচয় দিয়াছেন—

"শাণ্ডিল্যগোত্রজঃ শ্রেষ্ঠো ভট্টনারায়ণঃ কবিঃ।
তস্যাম্বয়ে বটুর্নাম পারিগ্রামী বহুশ্রুতঃ॥
বটুকস্য ত্রয়ঃ পুত্রা মণিভদ্রস্তু শেষকঃ।
পারিগ্রামে তৎসূনুনাং মণিভদ্রো জগদ্গুরুঃ॥
ভদ্রমুনেঃ সুতো জাতো ধনঞ্জয়ো মহাকবিঃ।
তৎপুত্রকঃ শুভবুদ্ধির্লোকে বিখ্যাতপৌরুষঃ॥
তস্যান্বয়ে বিধুর্জাতঃ কবীনাঞ্চ শিরোমণিঃ।
তস্য পুত্রো হলো নাম বঙ্গরাজ্যে প্রতিষ্ঠিতঃ॥
পারিকুলে মুনিশ্রেষ্ঠঃ সর্ব্বত্র বুধপূজিতঃ।
তস্য পুত্রঃ সুধীঃ শ্রীমান্ চতুর্ভুজঃ সদা শুচিঃ॥
বিষমঙ্গল-জীমূতৌ চতুর্ভুজ-সুতাবুভৌ।
গৌড়ভূমৌ জনাখ্যাতো জীমূতস্তু মনীষীঃ॥

বল্লাল সেন

। হরিমিশ্র প্রভৃতির প্রাচীন কারিকামতে বিজয়সেনের পর তৎপুত্র বল্লালসেন সিংহাসনে আরোহণ করেন। বল্লালসেনের জন্ম সম্বন্ধে নানাপ্রকার কিংবদন্তী প্রচলিত আছে। কেহ বলেন, তিনি ব্রহ্মপুত্র দের গর্ভজাত, আবার কেহ বলেন, তিনি বিষক্‌সেনের ক্ষেত্রজ পুত্র।[৫৪] সম্ভবতঃ ল্লালসেন পিতার বৃদ্ধ বয়সের সন্তান বলিয়া এরূপ অপূর্ব্ব প্রবাদ প্রচলিত হইয়া থাকিবে। দ্ধ বিজয়সেন বর্ম্মবংশকে শাসন করিবার জন্য যে সময় ব্রহ্মপুত্রতীরে উপনীত ছিলেন, সেই ময় বল্লালসেনের জন্ম হইয়া থাকিবে। বেশী বৃদ্ধ বয়সের সন্তান বলিয়াই হয়ত কুলাচার্য্য- গণ তাঁহাকে ক্ষেত্রজ বলিয়া অপবাদ দিয়া থাকিবেন। বল্লালসেন স্বরচিত দানসাগরে 'গুণাবি- চাবগর্ব্বেশ্বর' বলিয়া আত্মপরিচয় দিয়া গিয়াছেন। এতদ্দ্বারাও মনে হয় যে, বৃদ্ধ বিজয়সেন ল্লালসেনের জন্ম হইতেই তাঁহাকে আপনার উত্তরাধিকারী মনোনীত করিয়া থাকিবেন। পাছে বিজয়সেনের দেহত্যাগের পর অপর কেহ সিংহাসনের দাবী করেন, সেই জন্যই হয়ত বুদ্ধিমান্ পরিণামদর্শী মহারাজ বিজয়সেন বল্লালসেনের জন্ম হইতেই তাঁহাকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিয়াছিলেন।

পিতার ন্যায় মহারাজ বল্লালসেনও একজন পরম শৈব, মহাবীর, রাজনীতিকুশল, নানা- শাস্ত্রবিৎ এবং দেবদ্বিজভক্ত ছিলেন। বঙ্গদেশে এই বল্লালসেনের ন্যায় সর্ব্বজন পরিচিত দ্বিতীয় নৃপতি আছে কি না সন্দেহ? এক দিকে দানসাগর ও অদ্ভুত[illegible]র সঙ্কলন করিয়া তিনি যেমন স্মৃতি, পুরাণ ও জ্যোতিঃশাস্ত্রে অসাধারণ পাণ্ডিত্য প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন, অপর দিকে নিজ অধিকারভুক্ত রাজ্যমধ্যে প্রজাসাধারণের সামাজিক উন্নতি বিধানের উদ্দেশ্যে কুলপদ্ধতি ও কুলাচার্য্য-প্রতিষ্ঠা করিয়া চিরস্মরণীয় হইয়াছেন। তৎপুত্র লক্ষ্মণসেনের মাধাইনগর- তাম্রলেখে লিখিত আছে,—

'এই (বিজয়সেন) হইতে অশেষ ভুবনোৎসবকারণ চন্দ্রস্বরূপ ভূপতি বল্লালসেন জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি যে কেবল সকল নরেশ্বরগণের একমাত্র রাজচক্রবর্ত্তী ছিলেন, তাহা নহে, তিনি সমগ্র পণ্ডিতমণ্ডলীরও চক্রবর্ত্তী ছিলেন।'[৫৫]

পঞ্চগৌড়ে তদা সম্রাট্ বিষক্‌সেনো মহাব্রতঃ।
জীমূতোঽপি নৃপাধ্যক্ষঃ স প্রাড়্‌বিবাক ঈরিতঃ।"

উক্ত বংশপরিচয় অনুসারে জীমূত-বাহন ভট্টনারায়ণের ৯ম পুরুষ অধস্তন হইতেছেন।

(৫৪) কোন ঘটক-কারিকায় এই বচনটি পাওয়া যায়—

"আদিশূরের বংশধ্বংস সেনবংশ তাজা।
বিষক্‌সেনের ক্ষেত্রজ পুত্র বল্লালসেন রাজা।"

উক্ত বচনানুসারেও বিজয়সেন ও বিষক্‌সেন অভিন্ন হইতেছেন।

(৫৫) "অস্মাদশেষভুবনোৎসবকারণেন্দুর্বল্লালসেনজগতীপতিরুজ্জগাম।
যঃ কেবলং ন খলু সর্ব্বনরেশ্বরাণামেকঃ সমগ্রবিবুধানপি চক্রবর্ত্তী।"
(লক্ষ্মণসেনের মাধাইনগর-তাম্রলেখ, ৮ শ্লোক)

বল্লালসেনের স্বদত্ত সীতাহাটী-তাম্রশাসনেও লিখিত আছে 'এই রাণী (বিলাসদেবীর) সুতপস্যার পুণ্যফলে গুণগৌরবে অতুল বল্লালসেন জন্মগ্রহণ করেন। যে অদ্বিতীয় বীর নরদেবসিংহ পিতার পরে সিংহাসনাদ্রিশিখরে অধিষ্ঠিত হইয়াছিলেন, যাঁহার অরিরাজগণের শিশুপুত্রগণ শবরালয়ে বালকগণ কর্ত্তৃক অলীক রাজপদে অভিষিক্ত হইলে তাহাদের আনন্দাশ্রু-বিগলিতা জননীগণ পুত্রবাৎসল্য হেতু দীর্ঘনিশ্বাসত্যাগ করিয়া তাঁহাদিগকে নিষেধ করিয়াছিলেন।'৫৬ অর্থাৎ বল্লালের ভয়ে বনে গিয়াও রাজপরিবারগণ সশঙ্কিত থাকিতেন। আবার লক্ষ্মণসেনের তপনদীঘী তাম্রশাসনে পাইতেছি যে, 'তারপর কলিসম্পদ-নাশক অনলস ও একমাত্র বেদপথাশ্রয়ী বল্লালসেন সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়া গতিশীলতা লাভ করিয়াছিলেন।'৫৭

বল্লালসেন রাজপদে আসীন হইয়াই পৈতৃক রাজ্য-বিস্তারের উদ্দেশ্যে বিক্রমপুর হইয়া মিথিলা পর্য্যন্ত জয়ে অগ্রসর হইয়াছিলেন। এদেশে কুলজ্ঞদিগের মধ্যে প্রবাদ আছে যে, মিথিলায় যুদ্ধযাত্রা করিলে বল্লালের মৃত্যু-সংবাদ রটিত হইল এবং ঐ সময় বিক্রমপুরে লক্ষ্মণসেন জন্মগ্রহণ করেন।'৫৮ আধুনিক কোন কোন ঐতিহাসিক ঐ প্রবাদটি এককালে উড়াইয়া দিতে চাহেন। কিন্তু মিন্‌হাজের তবকাত-ই-নাসিরি হইতে লক্ষ্মণের জন্ম-বিবরণ পাঠ করিলে ঐ প্রবাদটি সম্পূর্ণ উপেক্ষার বিষয় বলিয়া মনে হইবে না। মিন্‌হাজ লিখিয়াছেন যে, লখ্‌মনিয়ার জন্মমাত্র, তাঁহার মাতার মৃত্যু হয় ও সেই সদ্যোজাত শিশুকে বঙ্গের সিংহাসনে অভিষিক্ত করা হয়। এই ঘটনা হইতে গণনা ধরিয়াই মিন্‌হাজ বলিয়াছেন যে, লখ্‌মানিয়ার ৮০ বর্ষ রাজত্বকালে (১১৯৯ খৃষ্টাব্দে) মহম্মদ-ই-বখ্‌তিয়ার নদীয়া আক্রমণ করেন।৫৯ এরূপ অবস্থায় (১১৯৯—৮০=) ১১১৯ খৃষ্টাব্দের শেষভাগে লক্ষ্মণের জন্মাভিষেক এবং প্রথম ভাগে বল্লালসেনের রাজ্যাভিষেক ধরা যাইতে পারে। কিন্তু বল্লালসেনের 'অদ্ভুতসাগর' গ্রন্থে

বল্লালের অভিষেককাল

(৫৬) "অস্য প্রধানা মহিষী জগতীশ্বরস্য শুদ্ধান্তমৌলিমণিরাসবিলাসদেবী॥
এষা সুতং সুতপসাং সুকৃতৈরসূত বল্লালসেনমতুলং গুণগৌরবেণ।
অধ্যাস্ত যঃ পিতুরনন্তরমেকবীরঃ সিংহাসনাদ্রিশিখরং নরদেবসিংহঃ।
যস্যারিরাজশিশবঃ শবরালয়েষু বালৈরলীকনরনাথপদেঽভিষিক্তাঃ।
দৃষ্টাঃ প্রমোদতরলেক্ষণয়া জনন্যা নিশ্বাস্য বৎসলতয়া সভয়ং নিষিদ্ধাঃ॥"
(বল্লালসেনের সীতাহাটী-তাম্রলেখ, ১০-১১ শ্লোক)

(৫৭) "প্রত্যূহঃ কলিসম্পদামনলসো বেদার্থনৈকাশ্রয়ঃ
সংগ্রামজিতজগমাকৃতিরভূদ্বল্লালসেনস্ততঃ।"
(লক্ষ্মণসেনের তপনদীঘীর তাম্রলেখ, ৬ শ্লোক)

(৫৮) "মিথিলে যুদ্ধযাত্রায়াং বল্লালোঽভূন্মৃতধ্বনিঃ।
তদানীং বিক্রমপুরে লক্ষ্মণো জাতবানসৌ॥" (লঘুভারত)

(৫৯) Col. Raverty's Tabakat-i Nasiri. p. 554-555.

লিখিত আছে,—‘ভুজ-বসু-দশ-মিতে ১০৮২ শাকে [১১৬০-৬১ খৃষ্টাব্দে] শ্রীমান্ বল্লালসেনের রাজ্যাদিতে বিশাখা নক্ষত্রে সপ্তর্ষি ৬১ বর্ষ অবস্থিত ছিল।’৬০

উক্ত প্রমাণ হইতে কেহ কেহ বলিতে চান যে, ১০৮২ শকেই (১১৬০ খৃষ্টাব্দেই) বল্লালসেনের রাজ্যাভিষেক হইয়াছিল। এদিকে অদ্ভুতসাগর ও শ্রীধরদাসের সদুক্তিকর্ণামৃত হইতে স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায় যে, ১০৯০ শকে লক্ষ্মণসেনের রাজ্যারম্ভ। বল্লালসেন লক্ষ্মণসেনকে রাজ্যাভিষিক্ত করিয়া উক্ত শকে গঙ্গা ও যমুনার সঙ্গমে (সম্ভবতঃ ত্রিবেণীর নিকট) স্বর্গলোকে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছিলেন, তাঁহার ভার্য্যাও তাঁহার অনুগমন করিয়াছিলেন। অদ্ভুতসাগরে লিখিত আছে, বল্লালসেন উক্ত শকে অদ্ভুতসাগর আরম্ভ করিয়া যান, পরে লক্ষ্মণসেন মহোদ্যোগে তাহা সম্পূর্ণ করেন।৬১

এদিকে বল্লালসেনের স্বরচিত ‘দানসাগর’ ও ‘সময়প্রকাশ’ নামক গ্রন্থে লিখিত আছে, অপূর্ণে ১০৯১ শকে দানসাগর সম্পূর্ণ হয়।৬২ আবার কেহ কেহ শেষোক্ত দানসাগর ও অদ্ভুতসাগর-নির্দ্দিষ্ট শকাঙ্কদ্বয় প্রক্ষিপ্ত বলিয়া উড়াইয়া দিতে চাহেন।৬৩ কিন্তু ঐ দুই শকাঙ্ক-নির্দ্দেশক বচনগুলি যে প্রক্ষিপ্ত নয়, তাহাও অনেকে স্বীকার করিয়াছেন।৬৪ আমরাও ২০ বর্ষ পূর্ব্ব হইতে বলিয়া আসিতেছি যে, ঐ দুইটি শ্লোক প্রক্ষিপ্ত হইতে পারে না।৬৫ কিন্তু ঐ শকাঙ্ক দুইটী

(৬০) "ভুজবসুদশ ১০৮২ মিতে শাকে শ্রীমদ্বল্লালসেনরাজ্যাদৌ
বৰ্ষৈকষষ্টে মুনির্বিহিতো বিশাখায়াং"
(এসিয়াটিক সোসাইটিতে রক্ষিত গবর্মেণ্ট-সংগৃহীত অদ্ভুতসাগর ৫২।১ পৃষ্ঠা।)

(৬১) "শাকে খনবখেন্দ্বব্দে আরেভেহদ্ভুতসাগরম্।
গৌড়েন্দ্রকুঞ্জরালানস্তম্ভবাহুর্মহীপতিঃ॥
গ্রন্থেহস্মিন্নসমাপ্ত এব তনয়ং সাম্রাজ্যরক্ষামহা-
দীক্ষাপর্ব্বণি দীক্ষণান্নিজকৃতে নিষ্পত্তিমভ্যর্থ্য সঃ।
নানাদানচিতাম্বুসঙ্কলনতঃ সূর্য্যাত্মজাসঙ্গমং
গঙ্গায়াং বিরচয্য নির্জ্জরপুরং ভার্য্যানুযাতো গতঃ॥
শ্রীমল্লক্ষ্মণসেনভূপতিরতিশ্লাঘ্যো মহোদ্যোগতঃ।
নিষ্পন্নোহদ্ভুতসাগরঃ কৃতিরসৌ বল্লালভূমিভুজঃ॥" (অদ্ভুতসাগর, প্রস্তাবনা)

(৬২) "নিখিলভূভূতিলক-শ্রীমদ্বল্লালসেনেনাপূর্ণে শশিনবদশমিতে শকবর্ষে দানসাগরো রচিতঃ।"
(বিশ্বকোষ-কার্য্যালয়ে রক্ষিত দানসাগর-পুথি ২২০।১ পৃষ্ঠা।)

(৬৩) Journal of the Asiatic Society of Bengal, (N. S.) 1913, p. 275.

(৬৪) গৌড়রাজমালা, ৬০ পৃষ্ঠা।

(৬৫) Journal of the Asiatic Society of Bengal, 1896, pt. I. Chronology of the Sena Kings of Bengal প্রবন্ধে দানসাগরের শ্লোকসমালোচনা দ্রষ্টব্য।

বিরুদ্ধবাদী শ্রীযুক্ত রাখালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় লিখিয়াছেন যে, পাথুরিয়াঘাটার রাজবাটীর দানসাগরের পুথিতে তিনি উক্ত অব্দনির্দ্দেশক শ্লোকগুলি দেখিতে পান নাই, ইহা যে নিতান্ত বিস্ময়ের কথা, তাহাতে সন্দেহ নাই,

সম্বন্ধে কিছু বলিবার আছে, যদি ১০৯০ শকে বৃদ্ধ বল্লালসেন প্রিয় পুত্র লক্ষ্মণসেনকেই সিংহাসনে অভিষিক্ত করিয়া থাকেন ও অদ্ভুতসাগর অসম্পূর্ণ রাখিয়াই মৃত্যুমুখে পতিত হইয়া থাকেন, তাহা হইলে ১০৯১ শকে আবার তাঁহাদ্বারাই দানসাগর সম্পূর্ণ হইল কিরূপে ? বলা বাহুল্য, তাঁহার গুরুদেব অনিরুদ্ধ ভট্টই তাঁহার হইয়া দানসাগর সমাধা করেন।৬৬ দানসাগরের প্রথমাংশে বল্লালসেন যেরূপ ব্রাহ্মণভক্তি ও দৈন্য প্রকাশ করিয়াছেন, শেষাংশে তাহার সম্পূর্ণ অভাব লক্ষিত হয়। শেষাংশে বল্লালসেনের গুণ-গৌরব যেরূপ ভাবে বর্ণিত হইয়াছে, তাহা পাঠ করিলে কখনই তাহা বিনয়ী বল্লালসেনের রচনা বলিয়া মনে হইবে না। অদ্ভুতসাগরের ন্যায় দানসাগরের শেষাংশও ভিন্নহস্ত-রচিত বলিয়া মনে করি। বলা বাহুল্য, এই সময়ে অর্থাৎ ১০৯১ শকের প্রারম্ভে (১১৬৯ খৃষ্টাব্দে) বল্লালসেনের জীবনকাল শেষ হইয়া আসিয়াছিল। কেহ কেহ অদ্ভুত-সাগরোক্ত রাজ্যাদিজ্ঞাপক ১০৮২ শক হইতে দানসাগরের ১০৯১ শক পর্য্যন্ত ৯ বর্ষমাত্র বল্লালসেনের রাজ্যকাল অবধারণ করিয়াছেন। কিন্তু বল্লালসেনের নানা অনুষ্ঠান সম্বন্ধে বঙ্গের সর্ব্বত্র যেরূপ প্রবাদ প্রচলিত আছে, তাহাতে বল্লালসেনের রাজ্যকাল কখনই এত অল্প হওয়া সম্ভবপর নহে। বল্লালসেনের নবাবিষ্কৃত সীতাহাটীতাম্রশাসন বল্লালসেনের বিক্রমপুর-সমাবাসিত জয়স্কন্ধাবার হইতে তাঁহার ১১শ বর্ষে প্রদত্ত হইয়াছিল।৬৭ এরূপ স্থলে ১০৮২ শক তাঁহার অভিষেকবর্ষ হইলে, ১০৯৩ শকে বিক্রমপুর হইতে তাম্রশাসন দান স্বীকার করিতে হয়, কিন্তু স্থান অদ্ভুতসাগরের উপক্রম হইতে ১০৯০ শকে তাঁহার রাজ্যত্যাগ এবং অদ্ভুতসাগর ও সুক্তিকর্ণামৃত এই উভয় গ্রন্থ হইতেই শেষোক্ত বর্ষে লক্ষ্মণসেনের রাজ্যাভিষেকের সংবাদ পাওয়া যাইতেছে, বিশেষতঃ ঐ বর্ষে গঙ্গাযমুনা-সঙ্গমে আসিয়া বল্লালসেন যখন মৃত্যুর জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন, তখন কিছুতেই ১০৮২ শকে তাঁহার আদি-রাজ্যাভিষেক স্বীকার করা যাইতে পারে না। এদিকে মিন্‌হাজ্ ১২৪২ খৃষ্টাব্দে লক্ষ্মণাবতীতে আসিয়া সমসাময়িক লোকের মুখে শুনিয়া তাঁহার তবকাতে লক্ষ্মণসেনের যে জন্মকাল নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহা হইতেও আমরা বুঝিতে পারি যে, ১১১৯ খৃষ্টাব্দে বা ১০৪১ শকে লক্ষ্মণের পিতা নিশ্চয়ই রাজা হইয়াছিলেন। এদিকে ময়মনসিংহ জেলাস্থ অষ্টগ্রাম প্রভৃতি স্থাননিবাসী দত্তবংশের কুর্শিনামা হইতেও আমরা জানিতে পারি

কারণ আমরা পাথুরিয়াঘাটা ও শোভাবাজার-রাজবাটীর পুথিতে যথাস্থানেই ঐ শ্লোকগুলি পাইয়াছি। আমাদের সংগৃহীত পুথি ছাড়া অপর ২।৩ খানি দানসাগরের হস্তলিপিতে ঐ সকল শ্লোকের সন্ধান পাইতেছি। রাখাল বাবু দানসাগর আদ্যোপান্ত পাঠ না করিয়াই যে এরূপ লিখিয়াছেন, তাহাতে সন্দেহ নাই।

(৬৬) "বেদার্থস্মৃতিসঙ্কথাদিপুরুষঃ শ্লাঘ্যো বরেন্দ্রীতলে
নিত্তদ্রোজ্জ্বলবীচিলাসনয়নঃ সারস্বতং ব্রহ্মণি।
ষট্‌কর্ম্মাভবদার্য্যশীলবিনয়ঃ প্রখ্যাতঃ সত্যব্রতো
বৃত্রারেরিব গীষ্পতির্নৃপতিরস্যানিরুদ্ধো গুরুঃ।" (দানসাগর)

(৬৭) সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ১৩১৭ সাল, ২৩৯ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য

যে, তত্রত্য দত্তবংশের পূর্ব্বপুরুষ অনন্তদত্ত শ্রীকণ্ঠ নামক গুরুদেবের সহিত ১০৬১ শকে বল্লালের ভয়ে বঙ্গে পলাইয়া গিয়াছিলেন।[৬৮] এই কুলপরম্পরাগত বচন-অনুসারেও বলা যাইতে পারে যে, ১০৬১ শকের পূর্ব্বেই বল্লাল আধিপত্য লাভ করিয়াছিলেন।

তবে অদ্ভুতসাগরে '১০৮২ শকে [১০৬০-৬১ খৃষ্টাব্দে] বল্লালসেনের রাজ্যাদি'তে এরূপ কথা কেন লিখিত হইল? বিজয়সেনের দেওপাড়া-লিপি ও বল্লালসেনের সীতাহাটী-তাম্রশাসন আলোচনা করিলে বুঝিতে পারি যে, যদিও বিজয়সেন গৌড়েন্দ্রকে আক্রমণ করিয়াছিলেন এবং তিনি ও তৎপুত্র বল্লাল উভয়েই মহারাজাধিরাজ উপাধিতে ভূষিত ছিলেন, কিন্তু ঐ উভয় লিপিকালে তাঁহারা কেহই 'গৌড়েশ্বর' বলিয়া পরিচিত হইতে পারেন নাই। গৌড়-অঞ্চলে প্রবাদ আছে, দুষ্ট মন্ত্রীর প্ররোচনায় মদনপালের মহিষী পতিকে বিষ খাওয়াইয়া মারে। মদনপালের সেনাপতি শূরসেন দুষ্ট মন্ত্রী ও রাণীকে অগ্নিতে দগ্ধ করিয়া উপযুক্ত শাস্তি বিধান করেন।[৬৯] শূরসেন নাম হইতে মনে হয় যে, মদনপালের সময় পর্য্যন্ত পালবংশের সহিত সেনবংশের যেন কিছু সংস্রব ছিল, অন্ততঃ মদনপালের সময় পর্য্যন্ত বল্লালসেন 'গৌড়েশ্বর' উপাধি-গ্রহণে সুবিধা বোধ করেন নাই।[৭০] তাঁহার অদ্ভুত-সাগরে ও দানসাগরে তিনি "নিঃশঙ্কশঙ্কর গৌড়েশ্বর" বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন। আবার অদ্ভুতসাগরের গ্রন্থসূচনায় তাঁহাকে 'গৌড়েন্দ্রকুঞ্জরালানস্তম্ভবাহুর্মহীপতিঃ' বলা হইয়াছে, অর্থাৎ তাঁহার বাহুবলে গৌড়েন্দ্ররূপ কুঞ্জরও আবদ্ধ বা পরাজিত হইয়াছিল। এই গৌড়েন্দ্র কে?

পূর্ব্বেই পালবংশপ্রসঙ্গে লিখিয়াছি, ১১৬১ খৃষ্টাব্দে (বিকারিসংবৎসরে ১০৮২ শকে) গৌড়েশ্বর গোবিন্দপালের রাজ্যাবসান হইয়াছিল।[৭১] এই গোবিন্দপালকেই আমরা অদ্ভুত-সাগরনির্দ্দিষ্ট 'গৌড়েন্দ্র' বলিয়া মনে করি। ১০৮২ শকে বা ১১৬০-৬১ খৃষ্টাব্দে গোবিন্দ-পালকে পরাজয় করিয়া বল্লালসেন সমস্ত গৌড়মগধ অধিকার করেন। সমস্ত গৌড়মগধে আধিপত্য-বিস্তারের সঙ্গে তিনি 'গৌড়েশ্বর' বলিয়া রাজ্যাভিষিক্ত হইয়া থাকিবেন। গৌড়েশ্বররূপে অভিষেককাল হইতে তাঁহার একটি স্বতন্ত্র রাজ্যাব্দ ধরা হইতে পারে এবং সেই স্মরণীয় ঘটনালক্ষ্য করিয়াই অদ্ভুতসাগরে "ভুজবসুদশমিতে ১০৮২ শাকে শ্রীমদ্বল্লালসেন-রাজ্যাদৌ" লিখিত হইয়াছে।

বিজয়সেন-প্রসঙ্গে লিখিয়াছি যে, বঙ্গাধিপ সামলবর্ম্মা বিজয়সেনের অধীনতা স্বীকার করিতে

(৬৮) "চন্দ্রার্ক শূন্যাবনিসংখ্যশাকে বল্লালভীতঃ খলু দত্তরাজঃ।
শ্রীকণ্ঠনাম্না গুরুণা দ্বিজেন শ্রীমাননন্তস্তু জগাম বঙ্গম্।"

(৬৯) পণ্ডিত রজনীকান্ত চক্রবর্ত্তীর গৌড়ের ইতিহাস, ১ম খণ্ড, ১৩৮ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

(৭০) কারণ ঐ সময়ের মধ্যে উৎকীর্ণ কোন লিপিতে সেনবংশ গৌড়েশ্বর বলিয়া পরিচিত হন নাই।

(৭১) ২০১ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

বাধ্য হইয়াছিলেন। আইন্-ই-অকবরীতেও পাওয়া যায় যে, রাজা নৌজার জীবন শেষ হইলে তাঁহার রাজ্য লখ্‌মণিয়ার হস্তে আইসে।'[৭২] পুরাবিদ্ লাসেন সাহেব 'নৌজা' স্থানে 'ভোজ' পাঠ স্বীকার করিয়াছেন।[৭৩]

বল্লালের রাজ্যসীমা

পূর্ব্ব অধ্যায়ে লিখিয়াছি যে, সামলবর্ম্মার পর তৎপুত্র ভোজবর্ম্মা বঙ্গাধিপত্য লাভ করেন। সম্ভবতঃ এই ভোজবর্ম্মার মৃত্যু হইলে বল্লালসেন সর্ব্বপ্রথমে বঙ্গরাজ্য অধিকার করেন এবং বিক্রমপুর হইতেই তিনি মিথিলাভিমুখে যাত্রা করেন। বোধহয় ঐ সময়ে বিক্রমপুরে লক্ষ্মণসেনের জন্ম হইয়া থাকিবে। মিন্‌হাজের উক্তির যদি কিছুমাত্র সার্থকতা থাকে, তাহা হইলে বলিতে হয় যে, লখ্‌মণিয়ার জন্মের পরই বঙ্গপ্রজাগণ তাঁহাকে বিক্রমপুরের সিংহাসনে স্থাপিত করিয়াছিলেন। তাই ভোজের পর লক্ষ্মণসেনের বঙ্গাধিপত্য-লাভের কথা আইন্-ই-অক্‌বরীতে লিখিত হইয়া থাকিবে।

পূর্ব্বেই লিখিয়াছি যে, বল্লালসেনের অভ্যুদয়কালে মিথিলায় কর্ণাটকবংশ, গৌড়মগধে পালবংশ এবং পূর্ব্ববঙ্গে বর্ম্মবংশ প্রবল ছিলেন। তিনি জানিতেন, ঐ তিনটি রাজবংশকে শাসনে আনিতে না পারিলে তাঁহার সাম্রাজ্য-বিস্তারের আশা বৃথা, তাই প্রথমেই তিনি বঙ্গ অধিকার করিয়া বিক্রমপুরে সেন-রাজধানী প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। মিথিলা জয় করিয়া ফিরিয়া আসিয়া তিনি কিছুকাল বিক্রমপুরের সিংহাসনেই অধিষ্ঠিত ছিলেন। তাঁহার ১১শ বর্ষে উৎকীর্ণ সীতাহাটী হইতে আবিষ্কৃত তাম্রশাসন বিক্রমপুর-রাজধানী হইতেই প্রদত্ত হইয়াছিল। বিক্রমপুর ব্যতীত বিজয়পুরেও তাঁহার [illegible]রাজধানী ছিল, এখানেও তিনি মধ্যে মধ্যে অবস্থান করিতেন। আইন্-ই-অকবরী-মতে, বল্লালসেনই (মালদহের নিকট) সুপ্রসিদ্ধ গৌড়নগর নির্ম্মাণ করেন। সম্ভবতঃ গোবিন্দপালের পরাজয়ের পর শাসন-শৃঙ্খলা-স্থাপনের জন্য গৌড়মগধের মধ্যবর্ত্তী স্থানে একটী রাজধানী বা শাসনকেন্দ্রের প্রয়োজন হইয়াছিল। প্রিয় পুত্রের নামানুসারে বল্লালসেন সেই গৌড়রাজধানীর লক্ষ্মণাবতী নাম রাখেন।

আধুনিক বল্লালচরিত হইতে পাওয়া যায় যে, পূর্ব্বতন পালরাজধানী পৌণ্ড্রবর্দ্ধন বা মহাস্থানেও বল্লালের সমাগম হইয়াছিল। তাঁহার প্রধানা মহিষী এখানে উগ্রমাধবের পূজা করিতে আসিয়াছিলেন। দিনাজপুর জেলায় রায়গঞ্জ থানার অধীন পাথরঘরা নামক প্রাচীন স্থানের নিকট বল্লালদীঘী নামে একটি সুবৃহৎ দীঘী দেখিয়া আসিয়াছি। এদিকে বিক্রমপুরে রামপালের নিকট বল্লালবাড়ী এবং দক্ষিণরাঢ়ে নবদ্বীপের মধ্যেও বল্লালদীঘী বিদ্যমান। উত্তররাঢ়ীয় কুলপঞ্জিকায় লিখিত আছে, উত্তররাঢ়াগত সুদর্শন মিত্রের ৬ষ্ঠ পুরুষ অধস্তন বটেশ্বর মিত্র বল্লাল কর্ত্তৃক সম্মানিত হইয়া মগধের শাসনকর্ত্তৃত্ব লাভ করিয়াছিলেন।[৭৪] ভাগলপুরের

(৭২) Jarrett's Ain-i Akbari, Vol. II. p. 148.

(৭৩) Lassen's Indische Alterthumskunde.

(৭৪) "বল্লালপূজিতো ভূত্বা বটেশ্বরো মগধেশ্বরঃ।" (উত্তররাঢ়ীয় কুলকারিকা)

৩ ক্রোশ দূরে কাহালগাঁয়ে "বটেশ্বরনাথ" নামক প্রসিদ্ধ শিবমন্দির অদ্যাপি বটেশ্বর মিত্রের স্মৃতি রক্ষা করিতেছে। উপরোক্ত স্থানের পরিচয় হইতে মনে হয়, উত্তরে দিনাজপুর ও রঙ্গপুর, দক্ষিণে দক্ষিণরাঢ় ও সমুদ্র, পূর্ব্বে পূর্ব্ববঙ্গ এবং পশ্চিমে মগধের পূর্ব্বাংশ পর্য্যন্ত, বল্লালসেনের অধিকারভুক্ত ছিল।

বল্লালসেন আপনার রাজ্য রাঢ়, বরেন্দ্র, বঙ্গ, বগড়ী ও মিথিলা এই পাঁচভাগে বিভক্ত করেন এবং প্রত্যেক ভাগে এক এক জন শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করেন। তাঁহার সময়ে বগড়ী উপবঙ্গ নামে আখ্যাত ছিল। তৎকালে যশোহর হইতে বিক্রমপুর পর্য্যন্ত উপবঙ্গের মধ্যে ছিল। তখন ধলেশ্বরী দিয়া পদ্মা প্রবাহিত হইত, সুতরাং বিক্রমপুর পদ্মার দক্ষিণে অবস্থিত ছিল। সে সময়ে বগড়ী বা উপবঙ্গের দক্ষিণাংশ কতকটা সমুদ্রগর্ভশায়ী ছিল। নানা স্থান বনজঙ্গলে পূর্ণ ছিল, মাঝে মাঝে ঘন লোকবসতিও ছিল। এই সকল জনস্থান অন্ধদ্বীপ, সূর্য্যদ্বীপ, মধ্যদ্বীপ, জয়দ্বীপ, চক্রদ্বীপ, কুশদ্বীপ, নবদ্বীপ, প্রবালদ্বীপ, চন্দ্রদ্বীপ প্রভৃতি নামে পরিচিত হইত। তন্মধ্যে অধুনাতন বনগ্রাম, যাদবপুর, আন্ধারকোটা প্রভৃতি অন্ধদ্বীপ, ইচ্ছামতী হইতে মধুমতী পর্য্যন্ত ভৈরব-নদের উত্তরবর্ত্তী সমুদয় স্থান সূর্য্যদ্বীপ, জলঙ্গী, চূর্ণী ও ইচ্ছামতীর মধ্যবর্ত্তী স্থান মধ্যদ্বীপ বা মাঝদিয়া; জয়দিয়া, দুর্গাপুর প্রভৃতি স্থান জয়দ্বীপ, বর্ত্তমান চাকদহ অঞ্চল চক্রদ্বীপ; নদীয়া নবদ্বীপ; গোবরডাঙ্গা, কুশদহ প্রভৃতি স্থান কুশদ্বীপ, পলাবাড়ী জয়নগর প্রবালদ্বীপ এবং মধুমতীর পূর্ব্বাংশ বর্ত্তমান বরিশাল জেলা চন্দ্রদ্বীপ নামে খ্যাত ছিল।

পূর্ব্বেই লিখিয়াছি, বল্লালসেনের পূর্ব্বপুরুষগণ সকলেই [illegible] বৈদিকাচারপ্রিয় ছিলেন।

বল্লালসেনের সমাজ-সংস্কার

বল্লালসেনও প্রথমতঃ পূর্ব্বতন পৈতৃক ধর্ম্মমত ও বিশ্বাস লইয়া লালিত ও পালিত হইয়াছিলেন। পৈতৃক সিংহাসন লাভ করিয়াই তাঁহাকে বিক্রমপুরে আসিয়া অধিষ্ঠিত হইতে হইয়াছিল। বলা বাহুল্য, পূর্ব্ব হইতেই বিক্রমপুর তান্ত্রিকপ্রধান স্থান বলিয়া পরিচিত ছিল। বৈদিকভক্ত বর্ম্মরাজগণ বিশেষ চেষ্টা করিয়াও এখানকার তান্ত্রিকপ্রভাব একবারে লোপ করিতে সমর্থ হয়েন নাই। মহাবীর বল্লালসেন এখানকার তান্ত্রিকতায় বিমোহিত হইয়াছিলেন। আপাততঃ আনন্দদায়ক ও দীর্ঘজীবনলাভাশায় উন্মত্ত হইয়া তিনি তান্ত্রিকতার স্রোতে গা ঢালিয়া দিয়াছিলেন। এই সময়ে তিনি তান্ত্রিকদের দ্বারা সিদ্ধ হইবার আশায় নীচজাতীয়া কুমারী আনিয়া শক্তি-সাধনে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, ইহা হইতেই ডোমজাতীয়া কন্যাঘটিত অপবাদ প্রচলিত হইয়াছে। প্রবাদ আছে, প্রথমতঃ তিনি বৌদ্ধতান্ত্রিকতার পক্ষপাতী ছিলেন। তজ্জন্য তাঁহার পিতা ও পিতামহের সময়কার নিষ্ঠাবান্ ব্রাহ্মণসন্তানগণ বল্লালের আচরণে অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হইয়াছিলেন, বৌদ্ধভাব বল্লালের হৃদয় অধিকার করিয়াছে ভাবিয়া বৈদিক-ব্রাহ্মণমাত্রেই বল্লালের নিন্দা করিতে লাগিলেন। এই উপলক্ষেই তাঁহার সম্বন্ধে নানাপ্রকার প্রবাদ রটিয়াছিল। এমন কি, বৈদিক বিপ্রগণ ষড়যন্ত্র করিয়া লক্ষ্মণসেনকে পিতার বিরুদ্ধে খাড়া করিতেও প্রস্তুত হইয়াছিলেন। ঐ সময় রাজনীতিকুশল রাজা বল্লাল এক দিকে নিজ রাজপদরক্ষা ও অপর দিকে প্রজাদিগকে সন্তুষ্ট

রাখিবার অভিপ্রায়ে প্রিয় পুত্র লক্ষ্মণকে দূরদেশে সরাইয়া রাখিয়াছিলেন, তাহা হইতেই বল্লাল-লক্ষ্মণ ঘটিত নানা প্রবাদের সৃষ্টি হইয়াছে, কিন্তু ঐ সকল প্রবাদের মূলে কিছু সত্য আছে বলিয়া মনে হয় না। ঘটনাক্রমে সেই সময়ের কিছুপরে সিংহগিরিনামে এক শৈবতান্ত্রিক সিদ্ধ আসিয়া বল্লালসেনের সভায় উপস্থিত হইলেন। তাঁহার অসাধারণ ক্ষমতা দেখিয়া বল্লালসেন চমৎকৃত হইয়াছিলেন।

পূর্ব্ব হইতে বিক্রমপুর অঞ্চলে বৌদ্ধগণই ধনে মানে কুলে শীলে শ্রেষ্ঠ ছিলেন। এখন সিংহগিরির প্ররোচনায় তিনি স্বমতাবলম্বী ব্রাহ্মণ-তান্ত্রিকদিগকেই সমাজশ্রেষ্ঠ বলিয়া চালাইতে লাগিলেন। ইহা লইয়া নানা সম্প্রদায়ের মধ্যে ঘোরতর আন্দোলন উপস্থিত হইল। এই সময়ে যাঁহারা বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন, তাঁহাদেরই উপর বল্লালপক্ষীয় ব্রাহ্মণগণের কিছু বেশী বিদ্বেষভাব জন্মিয়াছিল। এক সময়ে যাঁহারা বৌদ্ধসমাজে অতিশয় উন্নত ও মান্যগণ্য ছিলেন, ব্রাহ্মণপ্রাধান্য স্বীকার না করায় তাঁহাদের অনেককেই অপদস্থ, নির্য্যাতিত ও হিন্দুসমাজের বাহির হইয়া পড়িতে হইয়াছিল। এখন যেমন শৈব, শাক্ত ও বৈষ্ণব প্রভৃতি ধর্ম্মাবলম্বিগণ হিন্দুসমাজের অধীন এক একটি ভিন্ন ধর্ম্ম-সম্প্রদায় বলিয়া পরিচিত, বল্লালের পূর্ব্বে বৌদ্ধসম্প্রদায়ও ঐরূপ হিন্দুসমাজের অধীন একটি স্বতন্ত্র সম্প্রদায় বলিয়া গণ্য ছিল। বিভিন্ন ধর্ম্মসম্প্রদায়ের মধ্যে পরস্পর বৈবাহিক আদানপ্রদানে তেমন বাধা ছিল না, কিন্তু বল্লালসেনের সময় শৈব ও শাক্ত ব্রাহ্মণগণের প্রভাবে বৌদ্ধগণ একঘরে হইয়া পড়িলেন, তাঁহাদের আচার্য্যগণও [illegible] বলিয়া পরিগণিত হইলেন। বৌদ্ধগণের মধ্যে যাঁহারা বল্লালসেনের প্রিয় ব্রাহ্মণসমাজের আনুগত্য স্বীকার করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগকে ব্রাহ্মণেরা জলাচরণীয় শূদ্র বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন, কিন্তু তৎকালে যাঁহারা ধনে মানে ও আভিজাত্যে ধর্ম্মীয় জনসাধারণের নিকট সম্মানিত ছিলেন, বল্লালের বিরুদ্ধমতাবলম্বী হওয়ায় তাঁহাদিগের মধ্যে অনেকেই বল্লালসেনের অধিকারে নিগৃহীত হইতেছিলেন। তাঁহারা রাজসভায় পূর্ব্বতন সামাজিক অধিকারলাভে বঞ্চিত হইয়া বল্লালসেনের মহাশত্রু হইয়া পড়িয়াছিলেন এবং এই সময়ে তাঁহারা বল্লালসেনের বিরুদ্ধে বহু অযথা নিন্দাবাদ রটনা করিয়াছিলেন। সুবর্ণবণিকেরাও এই সময়েই রটনা করেন যে, বল্লাল অতিশয় অর্থলোভী ছিলেন, তাঁহার অর্থপিপাসা মিটাইতে না পারায় তিনি তাঁহাদিগকে অনাচরণীয় করিয়াছেন এবং উপবীতধারণে সকলেই নিবারিত হইয়াছেন।[৭৫] যাহা হউক, অপর সমাজের অধঃকরণ বা অবনমন সম্বন্ধে বল্লালসেনের কতদূর হাত

(৭৫) আধুনিক বল্লালচরিতে এরূপ প্রসঙ্গ থাকিলেও ১৪১৪ শকে রচিত গোবর্দ্ধনের বণিক্‌কুলকারিকায় এরূপ কোন কথা নাই। গোবর্দ্ধনের গ্রন্থে সুবর্ণবণিক্‌সমাজের বিস্তৃত পরিচয় থাকিলেও বল্লালসেনের নামগন্ধ নাই। এরূপ স্থলে বল্লালচরিতে সুবর্ণবণিক্‌সমাজের উপবীতত্যাগ-প্রসঙ্গে বল্লালসেনের কথা যাহা লিখিত হইয়াছে, তাহা কল্পিত বলিয়া মনে হয়।

পশূনাং প্রথমং ভাবং বীরস্তু বীরভাবনম্।
দিব্যানাং দিব্যভাবস্তু ত্রিশ্রো ভাবাস্ত্রয়ঃ স্মৃতাঃ।

ছিল, তাহা এখনও আমরা ঠিক করিতে পারি না। সাধারণে বল্লালসেনকে যেরূপ দোষী মনে করেন, বাস্তবিক তিনি তাদৃশ কোন দোষের কার্য্য করিয়াছিলেন কি না, তাহা এখনও আমরা ঠিক বুঝিতে পারিতেছি না।

বল্লালসেনের কুলবিধি

যে ব্যক্তি যাঁহার অনুগত বা আশ্রিত থাকেন, সেই ব্যক্তির প্রতি তাঁহার স্বভাবতঃই একটা টান থাকে। সেই ব্যক্তির পদমর্য্যাদার প্রতিও লক্ষ্য থাকা স্বাভাবিক। এই কারণেই বল্লালসেন নিজ দলভুক্ত জনগণের মধ্যে কুলমর্য্যাদার ব্যবস্থা করেন। ইতিহাস প্রমাণ দিতেছে যে, দেশের অধিপতি যখন যে ধর্ম্মমতের পক্ষপাতী হন, তখন সেই ধর্ম্মমতাবলম্বী প্রধান প্রধান অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ সাধারণতঃ সেই অধিপতির সভা উজ্জ্বল করিয়া থাকেন। সুতরাং যখন বল্লালসেন তান্ত্রিকমতে অনুরক্ত হইলেন, তখন যে শ্রেষ্ঠ তান্ত্রিকগণ আসিয়া তাঁহার সভা অলঙ্কৃত করিবেন, তাহা স্বভাবসিদ্ধ।

কুলশাস্ত্র-আলোচনা করিলে মনে হইবে যে, মহারাজ বল্লালসেনের কুলবিধি প্রথমতঃ রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ ও রাঢ়ীয় কায়স্থসমাজে প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল, ইহাদ্বারা বুঝা যায় যে, সেনবংশের মুখ্য রাজধানী বিজয়পুর হইতেই কুলবিধি প্রচারিত হইয়াছিল। কারণ বঙ্গজ কুলীনগণও পরিচয় দিবার সময় বলিয়া থাকেন যে, "আদৌ রাঢ়ে ততো বঙ্গে।" বল্লালসেনের সীতাহাটী হইতে আবিষ্কৃত তাম্রশাসনখানি যদিও বিক্রমপুর হইতেই প্রদত্ত [illegible]ছিল, কিন্তু ঐ শাসনোক্ত প্রদত্ত জমি রাঢ়দেশে বর্ত্তমান কাঁটোয়ার নিকটই হইতেছে। [illegible]লে আমরা মনে করিতে পারি যে, বল্লালসেনের ১০শ বর্ষে রাঢ়দেশের উপর তাঁহার ও তাঁহার অনুগৃহীত ব্রাহ্মণগণের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছিল। সম্ভবতঃ ঐ সময়ের কিছু পরে অর্থাৎ বিক্রমপুররাজ্যে শাসন শৃঙ্খলা স্থাপন করিয়া তিনি রাঢ়দেশে পৈতৃক রাজধানীতে আসিয়া সমাজ ও শাসনসংস্কারে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন।

পূর্ব্ব পূর্ব্ব অধ্যায়ে দেখাইয়াছি যে, সেনবংশের অভ্যুদয়কালে গৌড়, রাঢ় ও বঙ্গে সর্ব্বত্রই তান্ত্রিক-প্রভাব।—জনসাধারণের অধিকাংশই মহাযান তান্ত্রিকসম্প্রদায় বা ধর্ম্ম-সম্প্রদায়-ভুক্ত ছিল, কেহ কেহ জৈন ধর্ম্মাবলম্বীও ছিলেন। উচ্চ জাতীয় সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ কেহ শৈব, কেহ শাক্ত, কেহ বা বৈষ্ণব তান্ত্রিক ছিলেন। নবাগত বৈদিকগণ তাঁহাদিগকে পাশ্চাত্য বা দাক্ষিণাত্য বৈদিকমার্গে আনিবার চেষ্টা করিতেছিলেন। কিন্তু রাঢ়বঙ্গের জলবায়ুর গুণে বৈদিকগণের উদ্দেশ্য কতটা সুসিদ্ধ হইয়াছিল, বলা যায় না। এমন কি ১ম আদিশূরের সময়াগত পঞ্চ সাগ্নিক বিপ্রসন্তানগণ ক্রমে ক্রমে বৈদিকাচার ভুলিয়া তান্ত্রিকাচার গ্রহণ করিয়াছিলেন। বর্ম্ম ও সেনবংশের যত্নে প্রথম প্রথম নানা বৈদিক যাগযজ্ঞের অনুষ্ঠানবশতঃ উচ্চ জাতীয়ের মধ্যে বৈদিকধর্ম্মের প্রতি অনুরাগ দৃষ্ট হইয়াছিল বটে, কিন্তু বহু ব্যয়সাধ্য যাগযজ্ঞ সাধারণের আয়ত্তাধীন না হওয়ায়, বেদ ও বৈদিকগণের প্রতি শ্রদ্ধাভক্তি আসিলেও বৈদিকগণ স্থায়ী প্রভাব বিস্তার করিতে সমর্থ হন নাই। যখন পাশ্চাত্য ও দাক্ষিণাত্য বৈদিকগণ স্ব স্ব প্রভুত্ব-বিস্তারে

ও উদ্দেশ্য-প্রচারে অগ্রসর, সেই সময় সাত্ত্বিক বিপ্রসন্তানগণ তান্ত্রিক হইয়া পড়িয়াছিলেন। তাঁহারা ঘোষণা করিতে ছিলেন যে, 'এখন বৈদিকমন্ত্রসকল বিষহীন সর্পের ন্যায় বীর্য্যহীন হইয়াছে। সত্য ত্রেতা ও দ্বাপর যুগে ঐ সকল মন্ত্র সফল হইত, এখন মৃততুল্য হইয়াছে। ভিত্তিতে চিত্রিত পুত্তলিকা যেরূপ সকল বহিরিন্দ্রিয়সম্পন্ন হইয়াও স্বকার্য্যসাধনে অসমর্থ, কলিতে বৈদিক মন্ত্রসমুদায়ও প্রায় সেইরূপ। বন্ধ্যা স্ত্রীতে ... যেমন কোন ফল হয় না, সেইরূপ বৈদিক মন্ত্র দ্বারা কার্য্য করিলে ফল সিদ্ধ হয় না, উহা কেবল শ্রমমাত্র। এই কলিকালে বৈদিকাদি অন্য শাস্ত্রোক্ত বিধিদ্বারা যে ব্যক্তি সিদ্ধিলাভ করিতে ইচ্ছা করে, সে নির্ব্বোধ তৃষ্ণাতুর হইয়া গঙ্গাতীরে কূপখনন করে। কলিযুগে একমাত্র তন্ত্রোক্ত মন্ত্রই শীঘ্র ফলপ্রদ।'[৭৬]

রাঢ়বঙ্গের বহু ব্যক্তিই সহজ-সাধ্য ও আপাত-মনোরম ঐরূপ তান্ত্রিকমতেরই পক্ষপাতী হইয়াছিলেন। মহারাজ বল্লালসেনও তান্ত্রিক গুরুর অনুবর্ত্তী হইয়া প্রথমতঃ ঐরূপ বেদবিরুদ্ধ মতই প্রচার করিয়াছিলেন, তাহাতে এদেশীয় বৈদিক বিপ্রসমাজ, বল্লালসেনের কোন কোন আত্মীয় এবং উত্তররাঢ়ীয় ও বারেন্দ্র কায়স্থসমাজ বল্লালসেনের বিরোধী হইয়াছিলেন। এদিকে আবার আদিশূরানীত কনৌজীয় বিপ্রবংশধর রাঢ়ীয় ও বারেন্দ্রগণ বল্লালসেনের পক্ষপাতী হইয়াছিলেন। সপ্তশতী বিপ্রগণও তাঁহাদিগের সহিত যোগদান করিয়াছিলেন। সেনবংশের সম্পর্কিত কায়স্থসমাজও বল্লালসেনের মতানুবর্ত্তী হইয়াছিলেন।

যে যে সমাজ গৌড়াধিপের তান্ত্রিক ধর্ম্ম অনুমোদন করিয়াছিলেন, বল্লালসেন তাঁহাদিগকে পাইয়া নূতন সমাজ[illegible]; তাহা হইতেই বল্লালসেন-প্রবর্ত্তিত অভূতপূর্ব্ব কৌলীন্য-মর্য্যাদার সৃষ্টি। বল্লালসেনের অনুবর্ত্তী হইয়া যাঁহারা প্রকৃত প্রস্তাবে কুলাচারী[৭৭] হইয়াছিলেন, গৌড়াধিপ তাঁহাদিগকেই কুলীন বলিয়া সম্মান করেন।

(৭৬) "নির্বীর্য্যাঃ শ্রৌতজাতীয়া বিষহীনোরগা ইব।
সত্যাদৌ সফলা আসন্ কলৌ তে মৃতকা ইব।
পাঞ্চালিকা যথা ভিত্তৌ সর্ব্বেন্দ্রিয়সমন্বিতাঃ।
অমূরশক্তাঃ কার্য্যেষু তথান্যে মন্ত্ররাশয়ঃ।
অন্যমন্ত্রৈঃ কৃতং কর্ম্ম বন্ধ্যাস্ত্রীসঙ্গমো যথা।
ন তত্র ফলসিদ্ধিঃ স্যাৎ শ্রম এব হি কেবলম্।
কলাবন্যোদিতৈর্মার্গৈঃ সিদ্ধিমিচ্ছতি যো নরঃ।
তৃষিতো জাহ্নবীতীরে কূপং খনতি দুর্ম্মতিঃ।
কলৌ তন্ত্রোদিতা মন্ত্রাঃ সিদ্ধাস্তূর্ণফলপ্রদাঃ।" (মহানির্ব্বাণতন্ত্র)

(৭৭) রুদ্রযামলে এইরূপ কুলাচারের প্রসঙ্গ আছে—
"নিত্যশ্রাদ্ধং তথা সন্ধ্যাবন্দনং পিতৃতর্পণম্।
দেবতার্চ্চনং তীর্থার্চ্চনং তীর্থার্চ্চনম্।
গুরোরাজ্ঞাপালনঞ্চ দেবতাদিত্যপূজনম্।
পশুভাবস্থিতো মর্ত্ত্যো মহাসিদ্ধিং লভেদ্ধ্রুবম্।

এই সময় পঞ্চমকারের সেবা মুখ্য ধর্ম্ম বলিয়া গণ্য হইয়াছিল। এমন কি, শ্রুতিস্মৃতিমতে বেদমাতা-সাবিত্রীজপই ব্রাহ্মণত্বের মুখ্য লক্ষণ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট থাকিলেও কৌলিক সুরাপানই ব্রাহ্মণত্বের কারণ বলিয়া নির্ণীত হইতেছিল।[৭৮] ১ম আদিশূরানীত ব্রাহ্মণগণ তান্ত্রিক হইয়া পড়িলেও শূরবংশ ও বল্লালের পূর্ব্ববর্ত্তী সেনরাজগণের যত্নে তাঁহারা বৈদিকধর্ম্মের কতকটা পক্ষপাতী হইয়া উঠিতেছিলেন। কনোজবিপ্রবংশধর বারেন্দ্রগণের মধ্যে যাঁহারা পালবংশের প্রভাবে বৌদ্ধতান্ত্রিক হইয়া পড়িয়াছিলেন, বল্লালের প্রভাবে তাঁহারা শাক্ত বা শৈবতান্ত্রিক হইলেও তাঁহাদের আচার-ব্যবহার অনেকটা ভিন্ন হইয়া পড়িয়াছিল, এই কারণে রাঢ়ীয় ও বারেন্দ্রব্রাহ্মণগণ এক কনোজ-বিপ্রবংশধর হইলেও পরস্পরে আত্মীয়তা-স্থাপনে পরাঙ্মুখ ছিলেন। রাঢ়ীয়কুলমঞ্জরীতে বিবৃত হইয়াছে—

'রাজা বল্লালসেন ভাগীরথীতটে যোগিনীঘট্ট নামক স্থানে কুলবিধিসংস্থাপনের জন্ম একবর্ষ কাল কুললক্ষ্মীর আরাধনা করেন। তাঁহার তপস্যায় তুষ্ট হইয়া ও তাঁহাকে অভীপ্সিত বর প্রদান করিয়া দেবী অন্তর্হিতা হইলেন। দেবী কর্ত্তৃক প্রত্যাদিষ্ট হইয়া ও কুললক্ষ্মীর পূজা করিয়া তিনি এইরূপে কুললক্ষণ প্রকাশ করেন:—আচার, বিনয়, বিদ্যা, প্রতিষ্ঠা, তীর্থদর্শন, নিষ্ঠা, বৃত্তি, তপঃ ও দান এই নয়টি কুললক্ষণ। এইরূপ লক্ষণযুক্ত ভূদেব-

স্বকুলাচারহীনো যঃ সাধকঃ স্থিরমানসঃ।
নিষ্ফলার্থী ভবেৎ ক্ষিপ্রং কুলাচারাদ্যভাবতঃ॥"

(রুদ্রযামল, ২য় পটল, ৪-৭ শ্লোক)

অর্থাৎ নিত্যশ্রাদ্ধ, তান্ত্রিক সন্ধ্যাবন্দনা, পিতৃতর্পণ, দেবতাদর্শন, পীঠদর্শন, তীর্থদর্শন, গুরুর আজ্ঞাপালন, তান্ত্রিক ইষ্টদেবতার নিত্যপূজা, ইহাই কুলাচার। পশ্বাচারী মানব এই ভাবে থাকিলে মহাসিদ্ধি লাভ করে। পশুর ভাবই প্রথম, বীরের আচারই বীরভাব, দিব্যগণের আচারই দিব্যভাব—এই তিনপ্রকার ভাব কুলাচারের অন্তর্গত। যে স্থিরমতি সাধক নিজে কুলাচারহীন, কুলাচার অভাবে তাহার সকল বাসনাই নিষ্ফল হয়।

উক্ত কুলাচারের উপর লক্ষ্য করিয়াই মহারাজ বল্লালসেন আচার, বিনয়, বিদ্যা, প্রতিষ্ঠা, তীর্থদর্শন, নিষ্ঠা, বৃত্তি, তপঃ ও দান এই নয়টি কুললক্ষণ স্থির করিয়াছিলেন। এগুলি অনেক অংশে সদাচারসম্মত হইলেও বৈদিকাচার হইতে ভিন্ন ছিল।

(৭৮) বীরাচারী তান্ত্রিকগণ ইহার পরিপোষক তান্ত্রিক বচনও উদ্ধৃত করেন—

"বেদমাতৃ-জপেনৈব ব্রাহ্মণো ন হি শৈলজে॥
ব্রহ্মজ্ঞানং যদা দেবি তদা ব্রাহ্মণ উচ্যতে।
দেবানামমৃতং ব্রহ্ম তদীয়ং কৌলিকী সুরা।
সুরায়-ভোগমাত্রেণ বহির্বিপ্রো ভবেন্নরঃ॥
শাপমোচনমাত্রেণ সুরা মুক্তিপ্রদায়িনী।
অতএব হি দেবেশি ব্রাহ্মণঃ পানমাচরেৎ॥
স ব্রাহ্মণঃ স বেদজ্ঞঃ সোঽগ্নিহোত্রী স দীক্ষিতঃ।"

(মাতৃকাভেদতন্ত্র ৩য় পটল)

গণেরই কৌলীন্য। অমরগণের ন্যায় এই কলিকালে কৌলদিগের মধ্যেই এই নিয়ম প্রচলিত থাকিবে।৭৯

কুলমঞ্জরীর প্রমাণেও বলিতে পারি যে, রাজা বল্লালসেন এক জন দেবীভক্ত তান্ত্রিক কুলাচারী ছিলেন। কৌল বা তান্ত্রিক কুলাচারীর জন্যই তাঁহার কুলবিধি।

এখন যেমন কোন কোন স্থানে রাজা বা রাজ-প্রতিনিধি দরবার করিয়া সেই সেই স্থানের মান্যগণ্য ব্যক্তিগণকে উপাধি ও খেলাত দিয়া সম্মানিত করিয়া থাকেন, রাঢ়রাজধানীতে আসিয়া মহারাজ বল্লালসেনও সভা করিয়া সেইরূপ মান্যগণ্য ও উপযুক্ত কুলাচারী রাঢ়ীয়গণকে আহ্বান করিয়া কুলমর্য্যাদা দিয়াছিলেন। রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণগণের মধ্যে যাঁহারা রাজসম্মান লাভ করিয়াছিলেন, অন্যত্র বিশদভাবে তাঁহাদের পরিচয় দেওয়া হইয়াছে, এখানে পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন।৮০ কায়স্থমধ্যে বসু, ঘোষ, গুহ, মিত্র এই চারিঘর ব্যতীত দত্ত, নাগ, নাথ, দাস, সেন, কর, দাম, পালিত, চন্দ্র, পাল, রাহা, ভদ্র, ধর, নন্দী, দেব, কুণ্ড, সোম, সিংহ, রক্ষিত, অঙ্কুর, বিষ্ণু, আঢ্য ও নন্দ এই ২৩ ঘরও যথাক্রমে সম্মানিত হইয়াছিলেন। সুতরাং বল্লালের সভায় মোট ২৭ ঘর কায়স্থ প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছিলেন।৮১ এই ২৭ ঘর কায়স্থের মধ্যে বসু দশরথের পৌত্র লক্ষ্মণ ও পূষণ এবং প্রপৌত্র হংস, গুহ দশরথের পৌত্র চাড় ও পীতাম্বর, ঘোষ মকরন্দের প্রপৌত্র গঙ্গাধর ও প্রপৌত্র-পুত্র গাব, মিত্র কালিদাসের ৬ষ্ঠ পুরুষ সৌরী ও মৃত্যুঞ্জয় এই কয়জন বল্লালের [illegible]য় মর্য্যাদা ও কুলস্থান লাভ করিয়াছিলেন। অবশিষ্ট ২৩ ঘরকেও

(৭৯) "ততো ভক্তিং প্রকুর্ব্বাণো ভক্তাভীষ্টপ্রদায়িনীম্।
উপাসে সলিলাহারৈর্ব্বর্ষমেকং সমাহিতঃ॥
যোগিনীঘট্টমাশ্রিত্য ভাগীরথ্যাস্তটালয়ে।
তপসা তোষিতা দেবী সুখমোক্ষপ্রদায়িনী।
তদীপ্সিতং বরং দত্ত্বা তদেবান্তর্দধে দিবি॥
প্রত্যাদিষ্টৈর্নৃপৈস্তুষ্টৈর্ভুবি ভক্ত্যুপচারতঃ।
কুললক্ষ্মীং পূজয়িত্বা কথিতং কুললক্ষণম্॥
আচারো বিনয়ো বিদ্যা প্রতিষ্ঠা তীর্থদর্শনম্।
নিষ্ঠা বৃত্তিস্তপো দানং নবধা কুললক্ষণম্॥
এতল্লক্ষণলক্ষ্যাণাং ভূসুরাণাং কুলীনতাম্।
কল্পয়ামি কলৌ কৌলে শুবিব্যস্ত্যমরা ইব।" (রাঢ়ীয় কুলমঞ্জরী)

(৮০) বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস, ব্রাহ্মণকাণ্ড, ১মাংশে বিস্তৃত বিবরণ দ্রষ্টব্য।

(৮১) "বসুঃ ঘোষঃ গুহঃ মিত্রঃ দত্তঃ নাগশ্চ নাথকঃ।
দাসঃ সেনঃ করঃ দামঃ পালিতঃ চন্দ্রঃ পালকঃ॥
রাহা ভদ্রঃ ধরঃ নন্দী দেবঃ কুণ্ডশ্চ সোমকঃ।
সিংহঃ রক্ষিতোঽঙ্কুরশ্চৈব বিষ্ণুঃ আঢ্যশ্চ নন্দকঃ।
এতে সপ্তবিংশতিজাঃ বল্লালেন প্রতিষ্ঠিতাঃ॥" (ঘটকরাজের বঙ্গজ-কুলপঞ্জী)

বল্লাল যথাক্রমে বটগ্রাম, বল্লপুর, পদ্মদ্বীপ, লোহিত, মল্লকোটি, লক্ষ্মীপুর, কেশিনী, কুমার, নন্দী-গ্রাম, দেবগ্রাম, বাটাজোর, স্বর্ণগ্রাম, দক্ষপুর, মাণ্ডব, মণিকোটী, ভল্লকোটী, শম্ভুকোটী, সিংহ-পুর, মৎস্যপুর, মেঘনাদ, ভল্লকুলী, সিন্দুরাঢ় ও শূরপুরী এই ২৩ খানি কুলস্থান নির্দেশ করিয়া-দিয়াছিলেন।[৮২] হরিমিশ্রও লিখিয়াছেন, বিজয়নন্দন মহারাজ বল্লালসেন প্রথমে শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ-দিগকেই কুলস্থান দান করিয়াছিলেন। তৎপরে অপর সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রথমে উত্তমদিগকে, তৎপরে মধ্যমদিগকে এবং অবশেষে অভিশাপের ভয়ে অধমদিগকেও যথাবিধি শাসন দান করিয়াছিলেন।[৮৩] দ্বিজ বাচস্পতির বিভিন্ন পুঁথির পাঠবিপর্য্যয় হইতে মনে হয়, প্রথমে রাজা বিজয়সেন বা ৩য় আদিশূরের নিকট প্রথমতঃ ৮ ঘরই শাসন লাভ করেন, তৎপরে তাঁহাদের বংশধরগণ ও অপর কএক ঘর মোট ২৭ ঘর বল্লালকর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত ও কুলস্থান প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

বিজয়সেন কর্ত্তৃক সম্মানিত দত্তবংশ বল্লালের নিকট কুলীন চারি ঘরের ন্যায় উপযুক্ত সম্মান লাভ করিতে না পারায় প্রথমে বল্লালের বিরুদ্ধাচরণ করেন। তাঁহাদের আচরণে বিরক্ত হইয়া বল্লালসেন তাঁহাদের মধ্যে কাহারও কাহারও প্রাণদণ্ডের আদেশ করেন। প্রাণভয়ে তাঁহারা বল্লালের অধিকারের বাহিরে সুদূর পূর্ব্বোত্তর বঙ্গে পলাইয়া যান। সেই দত্তবংশীয়দিগের কুলপরিচয় হইতে জানা যায় যে, ১০৬১ শকে বা ১১৩৯ খৃষ্টাব্দে এই ঘটনা ঘটিয়াছিল।[৮৪]

(৮২) "বটগ্রামো বল্লপুরঃ পদ্মদ্বীপশ্চ লোহিতঃ।
মল্লকোটির্লক্ষ্মীপুরঃ কেশিনী চ কুমারকঃ। কীর্ত্তিমতী নন্দীগ্রামো দেবগ্রামস্তথা স্মৃতঃ।
বাটাজোড়ঃ স্বর্ণগ্রামো দক্ষপুরশ্চ মাণ্ডবঃ। মণিকোটির্ভল্লকোটিঃ শম্ভুকোটিস্তথৈব চ।
সিংহপুরো মৎস্যপুরো মেঘনাদস্তথাপি চ। ভল্লকুলী সিন্দুরাঢ়ঃ শূরপুরৌ তথা স্মৃতৌ।
সপ্তবিংশতিনামানি গ্রামাণি নমুন্নানি চ। বাসার্থং প্রদত্তস্তেভ্যঃ বল্লালেন মহীভুজা।"

বাচস্পতির বিভিন্ন স্থানের কারিকার পাঠান্তর লক্ষিত হয়। বিক্রমপুরের পুথিতে 'বল্লালেন মহীভুজা' স্থানে 'শূরবংশ্যাঃ নৃপোত্তমাঃ' পাইয়াছি এবং তাহাই কায়স্থের বর্ণ-নির্ণয়ে প্রকাশিত হইয়াছে। কিন্তু ইদিলপুরের পুথির পাঠই সঙ্গত বলিয়া এখানে উদ্ধৃত হইল। বিক্রমপুরের পুথি অনুসারে বলিতে হয় যে, কায়স্থগণ উক্ত গ্রামগুলি শূরবংশীয় বিভিন্ন রাজগণের নিকট হইতে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

(৮৩) "বিপ্রপালো হি রাজা বিজয়নন্দনঃ।
ব্রাহ্মণায় কুলস্থানং দত্তবান্ ভুবি দুর্লভম্।...
উত্তমেভ্যো দদৌ পূর্ব্বং মধ্যমেভ্যস্ততো নৃপঃ।
অধমেভ্যো ভয়াৎ পশ্চাৎ শাসনং বিধিবদ্দদৌ।
তাম্রপাত্রে কুলং লেখ্যং শাসনানি বহূনি চ।
এতেভ্যো দত্তবান্ পূর্ব্বং কলৌ বল্লালসেনকঃ।" (হরিমিশ্র)

(৮৪) "চন্দ্রভূশূন্যাবনিসংখ্যশাকে বল্লালভীতঃ খলু দত্তরাজঃ।
শ্রীকণ্ঠনাম্না ভগ্না বিজেন শ্রীমাধবস্তত্র জগাম বঙ্গম্।"

যদুনন্দনের বারেন্দ্র-ঢাকুরে লিখিত আছে—'বারেন্দ্র কায়স্থ, বৈদ্য ও বৈদিক ব্রাহ্মণ এই তিন সমাজ বল্লালের কুলমর্য্যাদা স্বীকার করেন নাই।'[৮৫]

উত্তর-রাঢ়ীয় কুলপঞ্জিকা ও বারেন্দ্র কায়স্থগণের ঢাকুর হইতে জানা যায় যে, তৎকালে উত্তররাঢ়ীয় কায়স্থপ্রধান ব্যাসসিংহ ও বারেন্দ্রপ্রধান ভৃগুনন্দী বল্লালসেনের অন্যতম মন্ত্রী ছিলেন। ইঁহারা উভয়েই বল্লালের মতবিরুদ্ধে অভিপ্রায় প্রকাশ করায় বল্লালসেন ব্যাস-সিংহকে করাত দিয়া চিরিয়া ফেলিবার ও ভৃগুনন্দীকে বন্দী করিবার আদেশ করিয়াছিলেন।[৮৬] বলা বাহুল্য, বল্লালসেনের তৎকালীন সমাজ-সংস্কার কোন কোন ব্যক্তির অভিপ্রেত না হইলেও রাঢ় ও বঙ্গের জনসাধারণ যে সাদরে গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। কেবল অশেষ সমাজমান্য ব্যাসসিংহ ও ভৃগুনন্দীকে অপমানিত করায় এই উভয়ের দলভুক্ত অল্প কএক জন লইয়া যথাক্রমে উত্তররাঢ়ীয় ও বারেন্দ্রসমাজের প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল। বাচস্পতির বঙ্গজ-কারিকায় লিখিত আছে যে, সেনরাজের নিকট যে ২৭ ঘর কায়স্থ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন, এই ২৭ ঘরের সন্তানেরাই ভিন্ন ভিন্ন স্থানে গিয়া বাস করিয়া উত্তররাঢ়ীয়, দক্ষিণ রাঢ়ীয়, বঙ্গজ ও বারেন্দ্র নামে পরিচিত হইয়াছিলেন, স্থানভেদেই তাঁহাদের মধ্যে পরস্পর আচারভেদ ঘটিয়াছে।[৮৭]

যে সময় রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ-কায়স্থগণের মধ্যে বল্লালসেন কুলবিধি প্রচার করেন, তৎকালে সমস্ত বারেন্দ্র-ব্রাহ্মণ-সমাজে তৎপ্রবর্ত্তিত কুলবিধি প্রচলিত হইয়াছিল বলিয়া মনে হয় না এবং সেই সময়ে সমস্ত বারেন্দ্রভূমি তাঁহার শাসনাধীন ছিল কি না সন্দেহ, এই কারণেই সমস্ত বারেন্দ্রব্রাহ্মণ তাঁহার কুলবিধি স্বীকার করেন নাই। এখনও উত্তর-বারেন্দ্র বা দিনাজপুর জেলার উত্তরাংশ, নোয়াখালী জেলা ও মেদিনীপুর জেলাবাসী অনেক ব্রাহ্মণসন্তান কনোজাগত পঞ্চ সাগ্নিক বিপ্রবংশধর বলিয়া পরিচিত হইলেও তাঁহারা বল্লালী কৌলীন্য স্বীকার করেন না। ইহাতে মনে হয়, উক্ত জনপদসমূহে বল্লালসেনের শাসন বা আধিপত্য বিস্তৃত হয় নাই। যত দূর তাঁহার অধিকারভুক্ত ছিল, সেই সকল স্থানবাসী সাগ্নিক বিপ্রবংশধর ও সম্মানিত কায়স্থ-সমাজ তাঁহার কুলবিধি স্বীকার করিয়াছিলেন। উত্তর-বারেন্দ্রে তখনও পাল ও নাগবংশের

(৮৫) "বারেন্দ্রকায়স্থ বৈদ্য বৈদিকব্রাহ্মণ।
বল্লালমর্য্যাদা নাহি নৈল তিন জন॥"

(১৩১৮ শকে মুদ্রিত যদুনন্দনের মূলঢাকুর, ২৩ পৃষ্ঠা)

(৮৬) উত্তররাঢ়ীয় কায়স্থকাণ্ডে এবং বারেন্দ্রকায়স্থকাণ্ডের ইতিহাস-অংশে যথাক্রমে উক্ত উভয় মহাত্মার বিবরণ দ্রষ্টব্য।

(৮৭) "এতেষাঞ্চ সুতাঃ সর্ব্বে দেশান্তরগতাঃ ক্রমাৎ। কুলং চতুর্ব্বিধং তেষাং বিভক্তং শ্রেণীভেদতঃ॥
উত্তর দক্ষিণরাঢ়ৌ চ বঙ্গবারেন্দ্রকৌ তথা। ইতি চত্বারঃ সংজ্ঞাঃ স্যুস্তত্তদ্দেশনিবাসিনাম্॥
স্থানভেদাচ্চ তে সর্ব্বে আচারান্তরতাং গতাঃ। যেষু স্থানেষু যদ্ধর্ম্মঃ কুলাচারশ্চ যাদৃশঃ।
তত্র তন্নাবমন্তেত ধর্ম্মস্তত্রৈব তাদৃশঃ। কুলধর্ম্মস্ততস্তেষাং ভিন্নো ভিন্নো ব্যবস্থিতঃ॥"

প্রভাব একবারে বিলুপ্ত হয় নাই, এই কারণে ভৃগুনন্দী উত্তরে নাগাশ্রয়ে গিয়া স্বতন্ত্র বারেন্দ্রকায়স্থ-সমাজ-প্রতিষ্ঠায় যত্নবান্ হইয়াছিলেন।[৮৮]

পূর্ব্বেই লিখিয়াছি, ১১৬০-৬১ খৃষ্টাব্দ মধ্যে মহারাজ বল্লালসেন পালবংশের শেষ নৃপতি গোবিন্দপালকে পরাস্ত করিয়া সমস্ত "গৌড়েশ্বর"রূপে গৌড়রাজধানীতে অধিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। সেই রাজ্যাভিষেকের মহোৎসবকালে তাঁহার প্রতিষ্ঠিত ব্রাহ্মণকায়স্থগণও সকলেই আহূত হইয়াছিলেন। এখানে অভিষেক-উৎসব শেষ হইবার পর তাঁহার প্রতিষ্ঠিত কুলীনগণ কি ভাবে অবস্থান করিতেছিলেন, তাহারও আলোচনা হয়।[৮৯] এ সময়ে কুলীনদিগের মধ্যে পদমর্য্যাদা লইয়া একটু গোলযোগ উপস্থিত হইয়াছিল, এজন্য তিনি সমীকরণ করাইয়া কায়স্থ কুলীন-পুত্রগণের মধ্যে বিবাহের গোলযোগ মিটাইয়া দিয়াছিলেন। কায়স্থসমাজে তিনি যে সমীকরণ বা একজাই করিয়াছিলেন, তাহাই প্রথম সমীকরণ নামে কুলগ্রন্থে পরিচিত। তাঁহার প্রথম সমীকরণে হংসজ সোমবসু, গঙ্গাধরজ শুভঘোষ, লক্ষ্মণজ হাড়গুহ, ভরতজ পীতাম্বর গুহ, তমোপহজ অহর্পতি বসু, গঙ্গাধরজ অনন্তঘোষ ও সৌরীজ জয়মিত্র বঙ্গে এই সাত জন সমী অর্থাৎ সমান ঘর বলিয়া পরিচিত হইয়াছিলেন।[৯০] এদিকে হংসজ শুক্তি ও মুক্তিবসু, গাবজ প্রভাকর ও নিশাপতি ঘোষ এবং মৃত্যুঞ্জয়জ ধুঁই ও শুঁই মিত্র রাঢ়ে এই ছয় জন সমী বলিয়া চিহ্নিত হইয়াছিলেন।[৯১] বলা বাহুল্য, বঙ্গজ ও রাঢ়ীয় কুলগ্রন্থে উক্ত ১৩ জন ৫ম পর্য্যায় বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছেন। এরূপ স্থলে ৪র্থ পর্য্যায় হইতেই বল্লালী কুল আরম্ভ। ৯৯৯ শকে যে যে ব্যক্তি গৌড়ে বিজয়[illegible] উপস্থিত ছিলেন, তাঁহাদিগকে প্রথম হইতে ধরিয়া এই পর্য্যায় নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। সম্ভবতঃ এই কারণে যাঁহারা উক্ত শকের বহুপূর্ব্বে এদেশে আসিয়া বাস করিয়াছিলেন, অনেক কুলগ্রন্থকার তাঁহাদিগের আদ্যন্ত বংশাবলী প্রকাশ করা কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করেন নাই, কাজেই আদিপর্য্যায়ের নাম লইয়া কুলগ্রন্থকারগণ একমত নহেন।[৯২]

বল্লালসেনের ব্রাহ্মণভক্তি

গৌড়ে অধিষ্ঠানকালে বল্লাল দেখিয়াছিলেন যে, এখনও তাঁহার অধিকারভুক্ত গৌড় ও পার্শ্ববর্ত্তী জনপদসমূহে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রবল রহিয়াছে, তাঁহাদের মধ্যে ব্রাহ্মণ থাকিলেও তাঁহারা ব্রাহ্মণপ্রাধান্য স্বীকার করেন না, তাঁহারা

(৮৮) বারেন্দ্র কায়স্থকাণ্ডে বিবৃত ইতিহাস দ্রষ্টব্য।

(৮৯) বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস, ব্রাহ্মণকাণ্ড ১মাংস (২য় সংস্করণ) ১৪৫ পৃঃ।

(৯০) "সোমবসুঃ শুভঘোষঃ হাড়শ্চ গুহসংজ্ঞকঃ।
পীতাম্বরগুহশ্চৈব অহর্পতিবসুস্তথা॥
অনন্তঘোষকশ্চৈব জয়মিত্রস্তথাপরঃ।
তএব সপ্ত কায়স্থা বল্লালেন সমীকৃতাঃ॥"
(বাচস্পতির সমীকরণকারিকা)

(৯১) দক্ষিণরাঢ়ীয় কায়স্থকাণ্ডে বিবরণ দ্রষ্টব্য।

বরং ব্রাহ্মণবিদ্বেষী।[৯২] যাহাতে সর্ব্বত্র ব্রাহ্মণ-প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয় ও ব্রাহ্মণবিদ্বেষীর উপযুক্ত দণ্ড হয়, তাহা লক্ষ্য রাখিবার জন্য তিনি গৌড়দেশে ১০০, মগধে ৫০, ভোটে (তিব্বতে) ৬০, রসাঙ্গে (আরাকানে) ৬০, উৎকলে ২২ এবং মোড়ঙ্গে (আসাম ও তরাই) ২২ জন ব্রাহ্মণ স্থাপন করিয়াছিলেন।[৯৩] যদিও বৈদিক ব্রাহ্মণেরা বল্লালের বড় অনুকূল ছিলেন না, কিন্তু রাঢ়ীয় ও বারেন্দ্র ব্রাহ্মণগণ বল্লালসেনকে আপনাদের একমাত্র ধর্ম্মরক্ষক ও প্রতিপালক বলিয়াই মনে করিতেন। বল্লালসেনের পূর্ব্বপুরুষগণ যেমন এদেশের ব্রাহ্মণ-সমাজকে ধনে মানে সমধিক উন্নত করিয়াছিলেন, বল্লালসেন তান্ত্রিক দীক্ষায় দীক্ষিত হইয়া গুরু-ব্রাহ্মণসমাজকে পূর্ব্বপুরুষ অপেক্ষা সমধিক পূজিত ও প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। দানসাগরে তাঁহার ঐকান্তিক ব্রাহ্মণভক্তির পরিচয় পাওয়া যায়।[৯৪] বলিতে কি বল্লালসেন হইতেই সমগ্র গৌড়মণ্ডলে ব্রাহ্মণগণ সাক্ষাৎ দেবতার ন্যায় পূজা পাইতে লাগিলেন। আজও যে সমগ্র বঙ্গদেশে ব্রাহ্মণগণ সমাজের শীর্ষস্থানে অধিষ্ঠিত ও সর্ব্বত্র পূজিত হইতেছেন, বল্লালসেনের সময় হইতেই সেই গুরু বা বিপ্রপূজার প্রতিষ্ঠা। এক দিকে তিনি যেমন ব্রাহ্মণের সম্মান-প্রতিষ্ঠাসহ বঙ্গসমাজে উচ্চ আদর্শ রাখিবার চেষ্টা করিতেছিলেন, সেইরূপ তাঁহার বিশাল অধিকারে নিগৃহীত অনেক জাতির সমাজ-সংস্কারের প্রতিও তাঁহার লক্ষ্য ছিল। তাঁহারই যত্নে রাঢ়ের কৈবর্ত্তসমাজ জলাচরণীয় হইয়া-

(৯২) সে সময়ের [illegible] বৌদ্ধগণ কিরূপ ব্রাহ্মণবিদ্বেষী ছিলেন, মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদশাস্ত্রী মহাশয়-সংগৃহীত দোহাকো[illegible]পঞ্জিকা নাম্নী তাহার টীকা হইতে তাহার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। এই দোহাকোষের সহজাম্নায়পঞ্জিকার উপক্রমেই লিখিত আছে—

"ষড়্দর্শনেষু যত্তত্ত্বং ন জানন্তি তদাশ্রিতাঃ।
জাতিবাদাদিমাত্রেণ্য ব্রাহ্মণাদিনিরর্থকাঃ॥"

(৯৩) "গৌড়ে শতং নৃপতিনা পঞ্চাশন্মগধে তথা। ভোটে ষষ্টি সমাখ্যাতঃ মোড়ঙ্গে চ তথাবিধাঃ।
উৎকলে দ্বাবিংশতিশ্চ রসাঙ্গে চ তথাবিধঃ। এবং স্থিতিব্রাহ্মণানাং সর্ব্বদেশনিবাসিনাম্॥
(চক্চণ্ডীপুর ও ভারেঙ্গার ঘটক-সংগৃহীত বারেন্দ্রকুলজী)

(৯৪) "ত্বরধিগমধর্ম্মনির্ণয়বিষয়াধ্যবসায়সংশয়স্তিমিতঃ।
নরপতিরয়মারেভে ব্রাহ্মণচরণারবিন্দপরিচর্য্যাং॥
শুশ্রূষাপরিতোষিতৈরবিরতং সংভূয় ভূদেবতৈ-
র্দত্তামোঘবরপ্রসাদবিশদধ্বান্তঃস্থলং সংশয়ঃ।
শ্রীবল্লালনরেশ্বরো বিরচয়ত্যেতং গুরোঃ শিক্ষয়া
স্বপ্রজ্ঞাবধি দানসাগরময়ং প্রজ্ঞাবতাং শ্রেয়সে॥
ভূয়ো ভূয়ঃ প্রণম্য ক্ষিতিবলয়মিলন্মৌলিবন্দ্যান্ দ্বিজেন্দ্রান্
শ্রীমদ্বল্লালসেনঃ স্থিরবিনয়নিবদ্ধোঽঞ্জলির্যাচতে বঃ।
কালে কালে ভবদ্ভিঃ স্বতনয়কৃতনয়ৈঃ পালনীয়ো মমায়ং
সামান্যঃ পুণ্যভাজাং ভবজলধিমহাসেতুবন্ধো নিবন্ধঃ॥" (দানসাগর, উপক্রম)

ছিলেন।[২৫] বৌদ্ধ সমাজ ত্যাগ করিয়া যে নয় জাতি প্রথমতঃ বল্লালী পদ্ধতি ও ব্রাহ্মণ-প্রাধান্ত স্বীকার করিয়াছিলেন, তাঁহারাই "নবশাখ" বলিয়া প্রতিষ্ঠিত হইলেন। যাঁহারা ব্রাহ্মণপ্রাধান্ত-স্বীকার করেন নাই, অথবা পূর্ব্বতন বৌদ্ধাচার বা জৈনাচার ছাড়িতে পারেন নাই, তাঁহারা সমাজবাহ্য ও অচল হইয়া রহিলেন। বলিতে কি বেদ এবং তন্ত্রের বিরুদ্ধে আচারবান্ অপরাপর ব্রাহ্মণকায়স্থগণও তাঁহার কুলব্যবস্থার পর 'অচল' বলিয়া গণ্য হইয়াছিলেন। এদিকে তৎপ্রতিষ্ঠিত সমাজের গতিবিধি, আচার-ব্যবহার ও কুলপরিচয় রক্ষা করিবার জন্ত তিনি কুলাচার্য্য নিযুক্ত করিয়াছিলেন।[২৬]

বল্লালসেনের কুলবিধি-প্রসঙ্গে বারেন্দ্রব্রাহ্মণকুলাচার্য্যগণ সকলেই প্রায় আদিশূরকে বল্লালসেনের মাতামহকুলোদ্ভব বলিয়া পরিচয় দিয়া গিয়াছেন।[২৭] সম্প্রতি নবাবিষ্কৃত তাম্র-শাসনেও বল্লালসেনের মাতা (বিজয়রাজ মহিষী) শূররাজকন্যা বলিয়াই বর্ণিত হইয়াছেন।[২৮]

(২৫) কৈবর্ত্তগণের জলাচরণ সম্বন্ধে নানা প্রবাদ প্রচলিত আছে, তন্মধ্যে দূরদেশ হইতে সত্বর লক্ষ্মণসেনকে আনয়ন অন্যতম। যদুনন্দনের বারেন্দ্র-ঢাকুরে লিখিত আছে, কৈবর্ত্তগণের জলাচরণ করিবার কারণেই বল্লালের সহিত ভৃগুনন্দীর মতবিরোধ উপস্থিত হয়।

"তাহারা আনিল গিয়া লক্ষ্মণসেনেরে। সন্তুষ্ট হইয়া রাজা তা সবা আচরে॥
ব্রাহ্মণদিগকে তাহা কথন না যায়। শুনি রাজসভাসদ্ হইল বিস্ময়॥
ইহা দেখি ভৃগুনন্দী কায়স্থপ্রধান। নিষেধ করিলা নৃপে বুঝায়ে প্র[illegible]
অনেক দৃষ্টান্ত দিয়া রাজাকে কহিলা। মহাকোপে নৃপবর নন্দীকে রুষিলা॥
নন্দী বন্দী হৈলা এই হেন কাজে। বলিতে লাগিলা নন্দী মরি আমি লাজে॥"

(যদুনন্দনের ঢাকুর)

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ভৃগুনন্দীর পূর্ব্বপুরুষগণ সকলেই পালরাজসভায় উচ্চপদে ও আত্মীয়তাসূত্রে আবদ্ধ ছিলেন। রামপালের হস্তে কৈবর্ত্ত-প্রভাব ধ্বংস হইবার পর গৌড়াধিপ-পালবংশের চেষ্টায় পরাজিত কৈবর্ত্তগণ সমাজবাহ্য ও অস্পৃশ্য বলিয়া গণ্য হন। ভৃগুনন্দীও পূর্ব্ব হইতেই তাঁহাদের প্রতি সেইরূপ ঘৃণা পোষণ করিয়া আসিতেছিলেন, সহসা তাঁহাদের জল চল করিতে ভৃগুনন্দী প্রস্তুত ছিলেন না, কিন্তু বল্লালসেন সমাজ-রক্ষার জন্তই কৈবর্ত্তের জল চল করিয়া বুদ্ধিমত্তারই পরিচয় দিয়া ছিলেন। ইহা দ্বারা বঙ্গের একটী বিশাল ও বলশালী সমাজকে তিনি হস্তগত করিয়া ফেলিয়া ছিলেন।

(২৬) বল্লালসেনের কুলবিধি ও সমাজসংস্কার সম্বন্ধে অপরাপর বিবরণ ব্রাহ্মণকাণ্ড ১ম ও ২য় অংশে এবং দক্ষিণরাঢ়ীয় ও বঙ্গজ কায়স্থ-কাণ্ডের ইতিহাস-অংশে দ্রষ্টব্য।

(২৭) গৌড়রাজমালা, ৫৮ পৃষ্ঠা ও বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস, ব্রাহ্মণকাণ্ড, ২য়াংশ, ৩১ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

(২৮) মানসী, ১৩১৯ সাল, শ্রীযুক্ত রাখালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মানসীর প্রবন্ধে বারেন্দ্রকুলগ্রন্থ হইতে "জাতো বল্লালসেনো গুণিগণিতগুণ দৌহিত্রবংশে।" এই উক্তি উদ্ধার করিয়া কুলগ্রন্থের অসারতা-প্রতিপাদনে অগ্রসর হইয়াছেন, কিন্তু অনেকেই জানেন যে, বারেন্দ্রকুলাচার্য্যগণ অনেকেই ভাল সংস্কৃত জানিতেন না, তাঁহাদের সংস্কৃত রচনায় যথেষ্ট গোলযোগ থাকিত, কিন্তু তাঁহাদের মূল বাঙ্গালায় কোন গোলই নাই। নদীয়া চক-চণ্ডীপুর, ভারেলা ও মালদীর কুলাচার্য্যগণের গ্রন্থে এইরূপ পাইয়াছি—

"পঞ্চগোত্রের পঞ্চব্রাহ্মণ আনয়ন কোরে গৌড়মণ্ডল পবিত্র করে আদিশূর রাজার স্বর্গারোহণ। তদন্তে বিজু-

সম্ভবতঃ মাতৃপ্রভাবেই বল্লালসেন মাতামহবংশ-প্রতিষ্ঠিত সাগ্নিকবিপ্রবংশধরগণকে সমধিক সম্মান দেখাইয়াছিলেন।

বল্লালসেনের সময় অসবর্ণ-বিবাহ নিষিদ্ধ হইয়াছিল, অথচ প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে যে, বল্লালসেন চালুক্যরাজতনয়া রামদেবী[৯৯] ও সুদর্শন-মিত্রবংশোদ্ভব বটেশ্বর-মিত্রের কন্যা লক্ষণার পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন, ইহাতে মনে হয় যে, তৎকালে চালুক্যবংশ ও কায়স্থ-মিত্রবংশ ব্রহ্ম-ক্ষত্রিয় সেনবংশের সবর্ণ বলিয়া পরিচিত ছিল। উত্তররাঢ়ীয় কায়স্থকুলকারিকায় লিখিত আছে যে, মহারাজ বল্লালসেন দূত পাঠাইয়া কন্যাসহ বটমিত্রকে নিজ-আবাসে আনাইয়া সেই কন্যার পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন। তজ্জন্য বটমিত্রের আত্মীয় বন্ধু সকলেই তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, কিন্তু বটমিত্র বল্লালকর্ত্তৃক পূজিত হইয়া মগধেশ্বর হইয়াছিলেন। পরবর্ত্তী কালে এই বটমিত্রের বংশধরগণ আবার রাঢ়দেশে ফিরিয়া আসিয়া ধনবলে উত্তর রাঢ়ীয়সমাজে মিলিত হইয়াছিলেন[১০০]। এরূপ মনে হয় যে ব্যাসসিংহের নিগ্রহ হেতু তাঁহার আত্মীয়-স্বজন অনেকেই বল্লালপক্ষ পরিত্যাগ করেন। এদিকে বটমিত্র বল্লালকে কন্যা সম্প্রদান করায় তাঁহার প্রতি রুষ্ট হইয়া উত্তররাঢ়ীয় আত্মীয়-স্বজনগণ তাঁহাকে একঘরে করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। সম্ভবতঃ তাহার পরই উত্তররাঢ়ীয়-সমাজে বিবাহপ্রথার কতকটা বাঁধাবাঁধি হইয়াছিল। বট-মিত্রের কুলপ্রসঙ্গের পরই উক্ত কুলগ্রন্থে পাইতেছি যে, "আদিশূরাৎ বল্লালপর্য্যন্ত পঞ্চকরণযূথে একাবলীধারা" অর্থাৎ আদিশূরের সময় হইতে বল্লালসেনের সময় পর্য্যন্ত পঞ্চকরণ-ঘরে পরস্পরের বিবাহে কোন প্রকার বাঁধাবাঁধি ছিল না, এক ভাবই চলিয়াছিল। বল্লালসেনের পর উত্তররাঢ়ীয় কায়স্থসমাজে স্বতন্ত্র কুলপদ্ধতি প্রচলিত হইয়াছিল।[১০১]

পূর্ব্বেই লিখিয়াছি যে, বল্লালসেনের পূর্ব্বপুরুষগণ পরম শৈব ছিলেন, তিনিও প্রথমে

কালান্তর তাহার বংশের দৌহিত্রসন্তান জন্মিলেন বল্লালসেন।......বল্লালসেন কহিলেন যেমত মাতামহ কুলেতে জন্মেছিলেন মহারাজ আদিশূর।" ইত্যাদি উক্তি হইতে স্পষ্ট পাওয়া যাইতেছে যে প্রাচীন কুলাচার্য্যগণ বল্লাল-সেনকে আদিশূরের ঠিক দৌহিত্র বলিয়া জানিতেন না। তাঁহারা জানিতেন আদিশূরের বহু পুরুষ পরে তাঁহার কোন বংশধরের দৌহিত্র হইতেছেন বল্লালসেন।

(৯৯) লক্ষ্মণসেনের মাধাই-নগর তাম্রলেখ, ৯ শ্লোক।

(১০০) "মিত্রবংশে তদা ধারা বটমিত্রশ্চ ভাগ্যবান্।
কন্যকা লক্ষণা তস্য কুমারী রত্নমন্দিরে॥
দূতং প্রেষ্য সমানীয় বল্লালো গৌড়ভূপতিঃ।
সা কন্যা পরিণীতবান্ যথাশাস্ত্রনিয়োজ্জয়া॥
বল্লালপূজিতো ভূত্বা বটোঽভূৎ মগধেশ্বরঃ।
তাতভ্রাতৃপরিত্যাগী বিরাগী সর্ব্ববন্ধুষু॥
মগধাৎ পুনরায়াতো বটধারা ধনাশ্রয়াৎ।
রাঢ়ায়াং শীঘ্রতে সর্ব্বে কুলস্থানে পুনঃ স্থিতাঃ॥" (উত্তর-রাঢ়ীয় কারিকা)

(১০১) উত্তর-রাঢ়ীয় কায়স্থকাণ্ডে বিস্তৃত বিবরণ দ্রষ্টব্য।

শৈব ছিলেন ও শৈব আচার-ব্যবহারে লালিত পালিত হইয়াছিলেন। রাজ্যলাভের পর তিনি বৌদ্ধ তান্ত্রিক ধর্ম্মে অনুরক্ত হইলে কতকগুলি শৈব-বৌদ্ধ মিশ্রাচারও চালাইয়া থাকিবেন। তন্মধ্যে চড়কপূজায় প্রচলিত নীলাবতীর ব্রত বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ঐ ব্রতকথায় 'সুলুক মুলুকের নন্দাপাটনের রাজকন্যা' বলিয়া নীলাবতীর পরিচয় আছে। চালুক্যবংশই এক সময়ে 'সুলুক' বলিয়া পরিচিত ছিল। বল্লালসেন চালুক্যরাজকন্যার পাণিগ্রহণ করেন। এই রাজকন্যা হয়ত পতির সহিত চড়কের অনুষ্ঠান করিতেন, তাঁহার গৌরব-স্মৃতি-রক্ষার্থই হয়ত চড়কে নীলাবতীর পূজার ব্যবস্থা হয়। বল্লালসেন পুনরায় যখন বৌদ্ধ-তান্ত্রিকতা ছাড়িয়া শাক্ত বা শৈব তান্ত্রিক হইলেন, তখনও সেই পূর্ব্বানুষ্ঠান পরিত্যক্ত হয় নাই। বলা বাহুল্য, বল্লালসেনের শৈব-তান্ত্রিকাচার-গ্রহণের সহিত বহু বৌদ্ধতান্ত্রিক তাঁহার সহিত শৈব-তান্ত্রিক হইয়াছিলেন, অবশ্য তাঁহারা বহুদিনের অনুষ্ঠিত সকল আচার-ব্যবহার এককালে পরিত্যাগ করিতে পারেন নাই। এই সময়ে ধর্ম্মের গাজনই শিবের গাজনে পরিণত হইল।

১১৬০-৬১ খৃষ্টাব্দে গৌড়েশ্বর হইবার পর বল্লালের মতিগতি আবার পূর্ব্বপুরুষগণের আদর্শের দিকে ধাবিত হইয়াছিল। সেই সময় হইতেই বেদ, স্মৃতি ও পুরাণোদিত সনাতন ধর্ম্মের দিকে তাঁহার লক্ষ্য পড়িয়াছিল, তাহারই প্রভাবে তিনি দানসাগর ও অদ্ভুতসাগরগ্রন্থ-সঙ্কলনে অগ্রসর হইয়াছিলেন।

পূর্ব্বেই লিখিয়াছি, মহারাজ বল্লালসেন চালুক্যরাজকন্যা [illegible]দেবীর পাণিগ্রহণ করেন, তাঁহারই গর্ভে লক্ষ্মণসেনের জন্ম। [illegible] হিজরী বা ১২৪২ খৃষ্টাব্দে মুসলমান-ঐতিহাসিক মিন্‌হাজ লক্ষ্মণাবতী বা গৌড়ে আসিয়া এখানে যেরূপ লক্ষ্মণসেনের জন্ম-বিবরণ শুনিয়াছিলেন, তাঁহার তবকাত-ই-নাসিরি গ্রন্থে তাহা এইরূপ লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন,—

লক্ষ্মণসেন

'ইহলোক হইতে তাঁহার পিতার স্থানান্তরকালে লখ্‌মণিয়া মাতৃগর্ভে ছিলেন। রাজমুকুট তাঁহার মাতৃগর্ভে স্থাপিত হইয়াছিল এবং সকলেই তাঁহার আজ্ঞার বশবর্ত্তী হইয়াছিল। খলিফা-বংশের ন্যায় হিন্দুরাজগণও ধর্ম্মরক্ষক বলিয়া পরিচিত ছিলেন। লখ্‌মণিয়ার জন্মকাল নিকট-বর্ত্তী হইলে তাঁহার মাতা প্রসবের লক্ষণ বুঝিতে পারিয়া জ্যোতিষিগণকে আনাইলেন, তাঁহারা শুভ লগ্ন ঠিক করিয়া এক বাক্যে জানাইলেন যে, কুমার এখন জন্মগ্রহণ করিলে তাহার নিতান্ত অশুভ হইবে, কখনই রাজ্যলাভ করিতে পারিবে না, কিন্তু যদি দুই ঘণ্টা পরে জন্ম হয়, তাহা হইলে ৮০ বর্ষ রাজ্য করিতে পারিবে। জ্যোতিষিগণের মুখে এরূপ উক্তি শুনিয়া রাজ্ঞী আদেশ করিলেন যে, তাঁহার পা দুখানি বাঁধিয়া ঝুলাইয়া মাথা হেঁট করিয়া রাখা হউক।

(১০২) "ধরাধরান্তঃপুরমৌলিরত্নচালুক্যভূপালকুলেন্দুলেখা।
তস্য প্রিয়াভূদ্রমানভূমির্লক্ষ্মীপৃথিব্যোরপি রামদেবী।
বসুদেবদেবকসুতাদেহান্তরাসাদিব শ্রীমল্লক্ষ্মণসেনমূর্ত্তিরজনি শ্রীপালনারায়ণঃ।"
(লক্ষ্মণসেনের মাধাইনগর তাম্রলেখ, ৯-১০ শ্লোক)

তাহাই করা হইল। যথাকালে জ্যোতির্বিদগণ শুভ মুহূর্ত্ত জানাইলেন। রাজমাতাও তখনই তাঁহাকে নামাইয়া প্রসব করাইবার জন্য আদেশ করিলেন ও তৎক্ষণাৎ লখ্‌মণিয়া ভূমিষ্ঠ হইলেন। কিন্তু রাজমাতা প্রসববেদনা সহ্য করিতে না পারিয়া ইহলোক ত্যাগ করিলেন। সদ্যোজাত শিশু লখ্‌মণিয়াকে সিংহাসনে অভিষিক্ত করা হইল।'[১০৩]

লঘুভারতকারও প্রায় ৪০ বর্ষ পূর্ব্বে বিক্রমপুর হইতে প্রবাদ শুনিয়া লিখিয়াছেন,—

'লোকপরম্পরায় প্রবাদ শুনা যায়, মিথিলায় যুদ্ধযাত্রাকালে বল্লালের মৃত্যুসংবাদ প্রচারিত হয়, এই সময়ে বিক্রমপুরে লক্ষ্মণ জন্মগ্রহণ করেন।'[১০৪]

মিন্‌হাজের 'ইহলোক হইতে স্থানান্তরকালে' উক্তির যদি 'বিক্রমপুর হইতে বল্লালসেনের স্থানান্তরগমনকালে' এইরূপ অর্থ করা যায়, তাহা হইলে লঘুভারতবর্ণিত প্রবাদের সহিত সামঞ্জস্য থাকে। কাশীপ্রভৃতির জ্যোতির্বিদগণ অদ্ভুতসাগরপ্রণেতা বল্লালসেনকে মিথিলাধিপ বলিয়াই বিশ্বাস করেন।[১০৫] এরূপ স্থলে বল্লালসেনের মিথিলাজয় সম্বন্ধে যে প্রবাদ আছে, তাহা উড়াইয়া দেওয়া যায় না। সাধারণতঃ পূর্ব্বতন হিন্দুরাজগণ দূর দেশে দিগ্বিজয়গমন-কালে তাঁহার পুত্র বা কোন পরমাত্মীয়ের উপর রাজ্যশাসন-ভার দিয়া যাইতেন। বল্লালসেনের মিথিলা-অভিযানকালে সম্ভবতঃ চালুক্যরাজকন্যা বুদ্ধিমতী রামদেবীর উপরই বিক্রমপুরের শাসন ভার অর্পিত হয়, অবশ্য তিনি উপযুক্ত অমাত্যগণের পরামর্শেই রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন। প্রসবান্তে তিনি ইহলোক প[illegible]গ করিলে অমাত্যগণ লক্ষ্মণসেনকেই সিংহাসনে বসাইয়া রাজ-কার্য্য পরিচালনা ক[illegible]ন। দানসাগরের উপক্রমে মহারাজ বল্লালসেন যেরূপ 'গর্ড়েশ্বর' বলিয়া নিজ পরিচয় দিয়া গিয়াছেন, লক্ষ্মণসেনও সেইরূপ 'গর্ড়েশ্বর' বলিয়া পরিচিত হইয়া থাকিবেন। তাঁহার জন্মাভিষেক হইতে বিক্রমপুরে যে রাজ্যাব্দ গণিত হয়, তাঁহার জন্মকালে অধিকৃত মিথিলা-রাজ্যেও হয়ত বল্লালসেন সেই অব্দই চালাইয়া থাকিবেন, তাহাই 'লক্ষ্মণ-সংবৎ' বা 'লসং' নামে প্রচলিত হইয়া থাকিবে। সুতরাং লক্ষ্মণসেনের জন্ম মিথিলার ও বাঙ্গালার ইতিহাসে বিশেষ স্মরণীয় ঘটনা বলিতে হইবে।

পিতার ন্যায় লক্ষ্মণসেনও এক জন মহাবীর, পরম ধার্ম্মিক ও বহুশাস্ত্রদর্শী ছিলেন। তাঁহার মাধাইনগরতাম্রলেখ হইতে জানা যায় যে, কৌমারকাল হইতেই তিনি রণস্থলে বীরত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন, কলিঙ্গের অঙ্গনাদিগের সহিত তিনি কৌমারকেলি করিয়াছিলেন। রণ-স্থলে কাশীরাজও তাঁহার নিকট পরাজিত হইয়াছিলেন।[১০৬] এবং তিনি নিজবিক্রমে কামরূপ

(১০৩) Col. Raverty's Tabakat-i-Nasiri, p, 555.

(১০৪) "প্রবাদঃ শ্রূয়তে চাত্র পারম্পর্য্যীণবার্ত্তয়া।
মিথিলে যুদ্ধযাত্রায়াং বল্লালোঽভূন্মৃতধ্বনিঃ।
তদানীং বিক্রমপুরে লক্ষ্মণো জাতবানসৌ।" (লঘুভারত)

(১০৫) মহামহোপাধ্যায় সুধাকর দ্বিবেদীর গণকতরঙ্গিণী, ২২ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

(১০৬) "প্রাগ্‌গৌড়েশ্বর শ্রীহটহবণ (?) কর্ম্মবন্য কৌমারকেলিঃ কলিঙ্গে নাঙ্গনাভি…যত্রপূর্ব্বঃ। যেনাসৌ

বশীভূত করিয়াছিলেন। তৎপুত্র বিশ্বরূপসেনের মদনপাড়তাম্রলেখেও স্পষ্টই লিখিত আছে যে, 'হলধর (বলরাম) ও গদাধর (জগন্নাথের) অধিষ্ঠানবেদী দক্ষিণ-সমুদ্রকূলে (অর্থাৎ পুরুষোত্তম-ক্ষেত্রে), অসি, বরণা ও গঙ্গার সঙ্গমস্থান বিশ্বেশ্বর-ক্ষেত্রে (কাশীধামে), এমন কি ব্রহ্মার, যজ্ঞভূমি ত্রিবেণী-সঙ্গমে তিনি সমুচ্চ যজ্ঞযূপ সহ বহু সমরজয়স্তম্ভ স্থাপিত করিয়াছিলেন।'[১০৭]

উদ্ধৃত প্রমাণ হইতে বলা যাইতে পারে, কেবল বারাণসীধাম বলিয়া নহে, পশ্চিমে সুদূর প্রয়াগে ত্রিবেণীসঙ্গম এবং দক্ষিণে পুরুষোত্তমক্ষেত্র পর্য্যন্ত তাঁহার বিজয়পতাকা উড়িয়াছিল, সুতরাং গৌড়েশ্বর লক্ষ্মণসেন একজন সামান্য নৃপতি ছিলেন না। এদিকে কনোজরাজ (কাশীপতি) গোবিন্দচন্দ্রের তাম্রশাসন হইতে জানা যায় যে, ১২০২ বিক্রম-সংবতে (১১৪৬ খৃষ্টাব্দে) তিনি মগধ আক্রমণ করিয়াছিলেন, ঐ তাম্রশাসনখানি মুদ্গগিরি বা মুঙ্গের হইতে সম্পাদিত হইয়াছিল।[১০৮] সম্ভবতঃ ঐ সময়ে সেনরাজের সহিত কাশীপতির সংঘর্ষ উপস্থিত হইয়াছিল, পরে লক্ষ্মণসেন তাঁহাকে পরাজিত করিয়া প্রয়াগ পর্য্যন্ত তাঁহার অনুসরণ করিয়াছিলেন। দাক্ষিণাত্যেও যে এক সময়ে তিনি যুদ্ধ করিতে গিয়াছিলেন, তাঁহার সভাস্থ ধোয়ী কবির পবনদূত হইতেই তাহা জানিতে পারা যাইতেছে, সুতরাং লক্ষ্মণসেনের পাশ্চাত্য ও দাক্ষিণাত্য-বিজয় নিতান্ত কবিকল্পনা নহে।

লক্ষ্মণসেন যেমন মহাবীর, তেমনি ধার্ম্মিক, তেমনি সুপণ্ডিত ও পণ্ডিতগণের আশ্রয়স্থল ছিলেন। সমসাময়িক গ্রন্থ ও লিপিমালা হইতে বেশ জানা যায় [illegible] তিনি অতিশয় পিতৃভক্ত ছিলেন। পিতাপুত্রের বিরোধ সম্বন্ধে এ দেশে যে প্রবাদ আছে [illegible] কতদূর বিশ্বাসযোগ্য বলিতে পারি না। আধুনিক অনেক গ্রন্থেই ডোম বা চর্ম্মকার-কন্যা প্রসঙ্গে লক্ষ্মণসেনের নির্ব্বাসন বা পিতৃরাজ্য পরিত্যাগের কথা আছে, কিন্তু যদুনন্দনের মূল ঢাকুরে বর্ণিত হইয়াছে—

"অনেক ভাবিয়া রাজা বিবাহ না কৈল। তথাপি ডোমের কন্যা ছাড়িতে নারিল॥
তদন্তরে আর এক শুন বিবরণ। ধনার্থে বিদেশ গত রাজার নন্দন॥
তাহার বনিতা সাধ্বী থাকে নিজ ধামে। বিরহিণী হয়ে আছে পথনিরীক্ষণে॥" ইত্যাদি।

বল্লাল পুত্রবধূর বিরহ-শ্লোক পড়িয়াই ধনার্থে বিদেশগত লক্ষ্মণসেনকে অতি সত্বর আনিয়া দিবার জন্য কৈবর্ত্তগণকে আজ্ঞা করিয়াছিলেন।

কাশিরাজঃ সমরভুবি জিতো যস্ত...ধারাভীর...যাহিতস্তরণজরজসা নির্গমে কর্ণপানি(?)। আকৌমারজয়ময়কৃতি..." "বিক্রমবশীকৃতকামরূপ" (লক্ষ্মণসেনের মাধাইনগর-তাম্রলেখ, ১১ শ্লোক ও শেষ পরিচয়াংশ)

(১০৭) "বেলায়াং দক্ষিণাব্ধের্মুসলধরগদাপাণিসংবাসবেদ্যাং
ক্ষেত্রে বিশ্বেশ্বরস্য স্ফুরদসিবরণাশ্লেষগঙ্গোর্ম্মিভাজি।
তীরোৎসঙ্গে ত্রিবেণ্যাঃ কমলভবমখারম্ভনির্ব্যাজপূতে
যেনোচ্চৈর্যজ্ঞযূপৈঃ সহ সমরজয়স্তম্ভমালান্যধায়ি।"
(বিশ্বরূপসেনের মদনপাড়-তাম্রলেখ, ১২শ শ্লোক)

(১০৮) Epigraphia Indica, Vol. VII. p. 99.

সুতরাং দেখা যাইতেছে, বল্লালসেন প্রিয় পুত্রকে কখনও নির্ব্বাসিত করেন নাই, পিতার আদেশেই সম্ভবতঃ ধনসংগ্রহের জন্য লক্ষ্মণসেন বিজয়যাত্রা করিয়াছিলেন।

দানসাগরের উপসংহারে লিখিত আছে, 'ধর্ম্মের অভ্যুদয় ও নাস্তিকগণের পদচ্ছেদ করিবার জন্য সরস্বতীপরিবৃত সাক্ষাৎ শ্রীকান্ত নারায়ণই কলিকালে বল্লালসেনরূপে জন্মগ্রহণ করেন।'[১০৯] এদিকে মাধাইনগরতাম্রশাসনে লক্ষ্মণসেনও বসুদেব ও দেবকীর গর্ভজাত সাক্ষাৎ 'ক্ষ্মাপাল নারায়ণ' বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন, সে কথা আরম্ভেই লিখিয়াছি। উভয় সমসাময়িক বিবরণী আলোচনা করিলে মনে হইবে যে, বৃদ্ধ বল্লালসেন পণ্ডিতমণ্ডলীর সাহায্যে যে হিন্দুধর্ম্ম-সংস্থাপনে অগ্রসর হইয়াছিলেন, তৎপুত্র লক্ষ্মণসেন সেই সকল কার্য্য বাহুবলে ও বিদ্যাবলে কতকটা সুসিদ্ধ করিয়াছিলেন। রাঢ়ীয়-কুলমঞ্জরী নামক ব্রাহ্মণকুলগ্রন্থে স্পষ্ট লিখিত আছে, মহারাজ বল্লালসেন মৃত্যুকালে প্রিয় পুত্র লক্ষ্মণসেনকে তৎকর্ত্তৃক প্রারব্ধ সমাজসংস্কার সুসম্পন্ন করিবার জন্য আদেশ দিয়া যান, লক্ষ্মণসেনও পিতার অন্তিম বাসনা পূর্ণ করিয়াছিলেন।[১১০]

পূর্ব্বেই লিখিয়াছি যে, বল্লালসেনের অন্তিমকালে আবার বেদ, স্মৃতি ও পুরাণের সম্মান বাড়িতেছিল। লক্ষ্মণসেন সম্ভবতঃ পিতার শেষ অভিপ্রায় অনুসারেই বৈদিক ও তান্ত্রিকগণের সমন্বয়-চেষ্টা করিয়াছিলেন। তিনি সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইয়া দেখিলেন, যদিও শেষাবস্থায় বল্লালসেন নাস্তিক বা বৌদ্ধ[illegible]চ্ছেদ ও বেদাভ্যুদয়ের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার প্রবর্ত্তিত তান্ত্রিকতায় [illegible] প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধাচার প্রসারিত হইয়াছে। তিনি উপযুক্ত মন্ত্রী ও সচিবগণের সহিত যুক্তি করিয়া বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, তান্ত্রিক-কুলাচারের প্রশ্রয় দিলে কঙ্কালসার বৈদিকধর্ম্ম নামমাত্রে পর্য্যবসিত হইবে। অবৈদিক ভোগ-বিলাসময় প্রচ্ছন্ন-তান্ত্রিক-বৌদ্ধাচার সমাজকে গ্রাস করিয়া ফেলিবে, তাই তিনি অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া পশুপতি ও হলায়ুধের সাহায্যে ধীরে ধীরে সমাজসংস্কারে প্রবৃত্ত হইলেন। তৎকালে তান্ত্রিকগণ তন্ত্রব্যতীত অপর কোন শাস্ত্রই প্রামাণ্য বলিয়া স্বীকার করিতেন না, সুতরাং লক্ষ্মণসেনকেও প্রথমে তন্ত্রের আশ্রয় লইতে হইল। তাঁহার প্রধান ধর্ম্মাধিকারী ও রাজপণ্ডিত হলায়ুধ প্রভৃতি, স্মৃতি, পুরাণ ও তন্ত্রের সারসংগ্রহপূর্ব্বক সেই সময়ের উপযোগী মৎস্যসূক্ত নামে এক মহাতন্ত্র প্রচার করিলেন। হিন্দুসমাজে সদাচার রক্ষা হয়, অথচ সাধারণ তান্ত্রিকগণ বিরোধী না হয়, যেন এই মহদভিপ্রায় সিদ্ধির উদ্দেশ্যেই মৎস্যসূক্ত মহাতন্ত্র রচিত হইয়াছে। প্রথমেই মৎস্যসূক্তে বীরাচারীদিগের অভিমত তারাক্রম; একজটা, উগ্রতারা, এবং ত্রিপুরাদেবীর পূজাক্রম, মন্ত্রোদ্ধার, তৎপরে বৌদ্ধ

(১০৯) "ধর্ম্মস্যাভ্যুদয়ায় নাস্তিকপদোচ্ছেদায় জাতঃ কলৌ
শ্রীকান্তোঽপি সরস্বতীপরিবৃতঃ প্রত্যক্ষনারায়ণঃ ॥"
(বিশ্বকোষকার্য্যালয়ে রক্ষিত দানসাগরপুথি ২৪২।২ পৃষ্ঠ)

(১১০) বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস, ব্রাহ্মণকাণ্ড, ১মাংশ (২য় সংস্করণ) ১৪৮-১৫২ পৃষ্ঠা।

তন্ত্রানুমোদিত মহাচীনক্রমে তারার বীরসাধন ও নীলসারস্বতক্রম এবং মধ্যে মধ্যে বেদের প্রশংসা করিয়া যেন বৌদ্ধ তন্ত্রানুসারেই তারার স্তব করা হইয়াছে।১১১

প্রথমাংশ পাঠ করিলে মৎস্যসূক্ত যেন বীরাচারীর প্রিয় বস্তু বলিয়া মনে হইবে, কিন্তু বীরাচারসমর্থন করা মৎস্যসূক্ত-তন্ত্রকার হলায়ুধের উদ্দেশ্য নহে। শ্রুতি, স্মৃতি এবং পুরাণে যে সদাচারের বিধান আছে, মৎস্যসূক্তের পরবর্ত্তী পটল হইতে গ্রন্থসমাপ্তি পর্য্যন্ত অংশে তাহারই তিনি সমর্থন করিয়া গিয়াছেন। বর্ত্তমান বঙ্গীয় হিন্দুসমাজ যাহা সদাচার বলিয়া অদ্যাবধি পালন করিতেছেন, বর্ত্তমান শাক্ত, শৈব ও বৈষ্ণবগণের প্রধানতঃ অনুষ্ঠেয় আহ্নিক ও মাসকৃত্য, বারব্রত এবং নানা দেবদেবীর পূজামন্ত্রাদিতে মৎস্যসূক্তের অধিকাংশ ভূষিত। মৎস্য-সূক্তের ৩১শ পটল হইতে ৪১শ পটল পর্য্যন্ত আলোচনা করিলে সহজেই মনে হইবে, মন্বাদির প্রাচীন স্মৃতিতে শৌচাশৌচ, ভক্ষ্যাভক্ষ্য, চাতুর্বর্ণের অবশ্য কর্ত্তব্য ও প্রায়শ্চিত্তাদি যাহা নিরূপিত হইয়াছে, হলায়ুধ তাহারই যেন সারসংগ্রহ করিয়া মৎস্যসূক্তে বিধিবদ্ধ করিয়াছেন। তিনি প্রথমে তারা প্রভৃতি তান্ত্রিক দেবদেবীর পূজা ও মাহাত্ম্যপ্রচার করিয়া বীরাচারীদিগকে হাতে আনিয়াছেন। তৎপরে মদ্য১১২ ও মাংসাদির যথেষ্ট নিন্দা করিয়া তাহার অসাত্ত্বিকতা ও প্রায়শ্চিত্তার্হতা প্রতিপাদন করিয়াছেন।১১৩ অবশেষে বৌদ্ধাদির যথেষ্ট নিন্দা করিতেও মৎস্য-

(১১১) বৌদ্ধতন্ত্রমতে তারা লোকেশ্বর বুদ্ধের সুতা এবং তাঁহার একটি নাম প্রজ্ঞাপারমিতা। মৎস্যসূক্ত-তন্ত্রে ৭ম পটলে—

"লোকেশস্য সুতাপ্যথমত্তা বালা বৃদ্ধা কালী শ্বেতা স্বাহা

ঐ পটলে— "জয় জয় তারে দেবি নমস্তে প্রভবতি ভবতি বদিহ সমস্তে।
প্রজ্ঞাপারমিতামিতচরিতে প্রণতজনানাং দুরিতহরিতে।"

এইরূপে মৎস্যসূক্তে তারা লোকেশসুতা ও প্রজ্ঞাপারমিতা নামে কীর্ত্তিতা।

(১১২) "নারিকেলঞ্চ খর্জ্জুরং পনসঞ্চ তথৈব চ।
ঐক্ষবং মধুকং টঙ্কং তালঞ্চৈব চ মাক্ষিকম্।
দ্রাক্ষাস্তু দশমং জ্ঞেয়ং গৌড়ীং চৈকাদশং স্মৃতম্।
পৈষ্টীন্তু দ্বাদশং প্রোক্তং সর্ব্বেষামধমং স্মৃতম্।
মধ্যমং মধুজং গৌড়ং শেষকোত্তমমিষ্যতে।
এতদ্দ্বাদশকং মদ্যং ন পাতব্যং দ্বিজৈঃ কচিৎ।
কামাৎ পীত্বা সুরাঃ বিপ্রো মরণান্তিকমাচরেৎ।" (মৎস্যসূক্ত, ৩৬ পটল)

১১৩) "যো যজ্ঞেনাশ্বমেধেন মাসি মাসি যতব্রতঃ।
মাংসানি চ ন খাদেদ্‌যস্তয়োঃ পুণ্যফলং সমং।
দ্বাদশাব্দং ত্যজেদ্ যস্তু ব্রহ্মলোকে মহীয়তে।
সংবৎসরন্তু যেবেশি সর্ব্বযজ্ঞফলং লভেৎ।
যাবজ্জীবং ত্যজেদ্‌যস্তু সোঽশ্মাকং সমতাং ব্রজেৎ।
নৈত্যিকং পৈতৃকং কাম্যং সর্ব্বত্রৈব বিবর্জয়েৎ।
যেন মাংসং পরিত্যক্তং সোঽপি মৎস্যং ন ভক্ষয়েৎ।" (মৎস্যসূক্ত ৩৭ পং)

সূক্তকার পশ্চাৎপদ হন নাই।[১১৪] এদিকে প্রত্যেক মহাপূজায় পূজা ও হোমাদির মধ্যে বৈদিক মন্ত্র উচ্চারণ করিবার নিয়ম করা হইয়াছে। বলা বাহুল্য যে তান্ত্রিক পূজাদিতেও বৈদিক মন্ত্র চালাইয়া বৈদিক ও তান্ত্রিকের মধ্যে সমন্বয়ের স্পষ্ট উদ্যোগ চলিয়াছিল।

মহারাজ লক্ষ্মণসেন এক দিকে যেমন মৎস্যসূক্ততন্ত্র প্রচার করাইয়া সাধারণ তান্ত্রিক-গণের কদাচার বর্জ্জনের উপায় করিলেন, অপর দিকে আবার বারেন্দ্র-ব্রাহ্মণসমাজের জন্য প্রধান মন্ত্রী পশুপতি দ্বারা "সংস্কার-পদ্ধতি" এবং রাঢ়ীয় ও বারেন্দ্রবিপ্রসমাজের ব্রাহ্মণত্বরক্ষার সুব্যবস্থা করিবার জন্য হলায়ুধদ্বারা "ব্রাহ্মণ-সর্ব্বস্ব" প্রচার করাইলেন। এই সময়েই হলায়ুধের অপর ভ্রাতা পণ্ডিতবর ঈশান গৌড়-বঙ্গীয় ব্রাহ্মণসমাজের জন্য "আহ্নিক-পদ্ধতি" প্রচার করেন। লক্ষ্মণসেন কিরূপে বঙ্গের হিন্দু-সমাজের উন্নতি করিবার জন্য যত্নবান্ হইয়াছিলেন, তাহা উক্ত চারিখানি গ্রন্থ পাঠ করিলে অনায়াসেই হৃদয়ঙ্গম হইবে। বিশেষতঃ মৎস্যসূক্ত আলোচনা করিলে মনে হইবে যে, লক্ষ্মণসেন যে প্রণালী অবলম্বন করিয়াছিলেন, আজও প্রায় সেই প্রণালীতেই বঙ্গীয় হিন্দুসমাজ পরিচালিত হইতেছে।

লক্ষ্মণসেনের যতগুলি তাম্রশাসন আবিষ্কৃত হইয়াছে, তৎপাঠে জানা যায় যে, তিনি বৈদিক-বিপ্রভক্ত ছিলেন, বৈদিক বিপ্রগণের উদ্দেশেই তাঁহার তাম্রশাসনগুলি উৎকীর্ণ হইয়াছে, কোন তাম্রশাসনে তাঁহার তান্ত্রিক ভক্তির আভাস নাই, তাঁহার আধিপত্যকালে সমস্ত গৌড়-মণ্ডলে বৈদিক ব্রাহ্মণগণ একপ্রকার সর্ব্বেসর্ব্বা হইয়া উঠিতেছিলেন, ব্রাহ্মণেতর সকল জাতির উপরই তাঁহারা প্রভুশক্তি চালাইতে ছিলেন। এমন কি শূন্যপুরাণে সংযোজিত 'নিরঞ্জনের রুষ্মা' নামক অংশ পাঠ করিলে বেশ মনে হইবে, বৈদিকেরা ধর্ম্ম বা বৌদ্ধ-সম্প্রদায়ের উপর যথেষ্ট অত্যাচার করিতেছিলেন। সদ্ধর্ম্মিগণের উপর যেন তাঁহারা জিজিয়া কর বসাইয়া ছিলেন। যাঁহারা বৈদিকের ইচ্ছানুরূপ কর না দিত, তাঁহাদের কষ্টের সীমা থাকিত না।[১১৫] গৌড়েশ্বর

(১১৪) "অস্পৃশ্যমথ বক্ষ্যামি তাং শৃণুষ বরাননে।
বৌদ্ধান্ পাশুপতাংশ্চৈব লোকায়তিকনাস্তিকান্।
বিকর্ম্মস্থং দ্বিজং স্পৃষ্ট্বা সচেলো জলমাবিশেৎ॥"
(মৎস্যসূক্ত, ৩৮ পটল ১ম শ্লোক)

(১১৫) "মালদহে লাগে কর দিলএ কর যুন।
নখিজা মাগিতে যায়, জার ঘরে নাপি পাএ,
সাপ দিয়া পুড়াএ ভুবন॥
মালদহে লাগে কর, না চিনে আপন পর,
জালের নাহিক দিসপাস।
বোলিষ্ঠ হইল বড়, দশ বিস হয়্যা জড়,
সদ্ধর্ম্মিরে করএ বিনাস॥
বেদে করে উচ্চারণ, বের্যায় অগ্নি ঘনে ঘন,
দেখিয়া সভাই কম্পমান।

কিন্তু তাহার প্রতিবিধানে মনই দিতেন না। খৃষ্টীয় ১২শ শতাব্দের শেষভাগে বৈদিকেরা মালদহ অঞ্চলে যথেষ্ট অত্যাচার করিয়াছিলেন, ঐ সময়ে লক্ষ্মণসেন বোধ হয় বিজয়পুরেই অবস্থান করিতেন ও পরম ভাগবত হইয়া পড়িয়াছিলেন। পবনদূত হইতে জানিতে পারি যে "সুহ্ম [রাঢ়] দেশে গঙ্গাতীরে সেনবংশের ইষ্টদেব মুরারি অপূর্ব্ব সৌধমালায় অভিষিক্ত হইয়াছিলেন।[১১৬] বিজয়পুরে উন্নত স্কন্ধাবারে লক্ষ্মণসেনের রাজধানী ছিল।[১১৭] তাঁহার রাজধানীতে আদিরসের স্রোতটা কিছু বেশী প্রবাহিত হইত। রাজধানীর মধ্যে প্রকাণ্ড রাজপথ—বারাঙ্গনাগণের মঞ্জীর-নিক্কণে চমকিত ও নিশীথের অন্ধকার স্বেচ্ছাবিহারিণী অভিসারিকাগণের চঞ্চল গতিতে মুখরিত। সম্ভ্রান্ত নাগরীগণও নাগরিকগণের সহিত জ্যোৎস্নালোকে দোলায় চড়িয়া প্রেমালাপে রজনী অতিবাহিত করিত।[১১৮] এই সময়ে রাজ্যেশ্বর ও তাঁহার প্রধান সভাসদ্‌গণের কিরূপ রুচি আসিয়া পড়িয়াছিল, রাজকবি ধোয়ীর 'পবনদূত,' অন্যতর সভাকবি গোবর্দ্ধনাচার্য্যের 'আর্য্যাসপ্তশতী' ও মহাকবি জয়দেবের প্রসিদ্ধ 'গীতগোবিন্দ' পাঠ করিলে সহজেই বুঝা যায়। গোবর্দ্ধন, শরণ, জয়দেব, উমাপতি ও কবিরাজ ধোয়ী এই পঞ্চজনে মহারাজ লক্ষ্মণসেনের সভা অলঙ্কৃত করিতেন।[১১৯] গীতগোবিন্দের প্রারম্ভ

মনেত পাইআ মর্ম্ম, সভে বোলে রাখ ধর্ম্ম,
তোমা বিনে কে করে পরিত্রান॥
এইরূপে দ্বিজগণ, করে সৃষ্টি সংহার
ই বড় হোইল অবিচার।
বৈকুণ্ঠে থাকিয়া ধর্ম্ম, মনেত পাইআ মর্ম্ম,
মায়াত হোইল অন্ধকার॥
ধর্ম্ম হইল যবনরূপী, মাথায় ত কাল টুপি,
হাতে শোভে ত্রিকচ কামান।
চাপিয়া উত্তম হয়, ত্রিভুবনে লাগে ভয়,
খোদায় বলিআ এক নাম॥" (শূন্যপুরাণ)

(১১৬) "তস্মিন্ সেনান্বয়নৃপতিনা দেবরাজ্যাভিষিক্তো
দেবঃ সাক্ষাদ্বসতি কমলাকেলিকারো মুরারিঃ।
যাপেৌ লীলাকমলমসকৃদ্যৎসমীপে বহন্ত্যো
লক্ষ্মীশঙ্কাং প্রকৃতিসুভগাঃ কুর্ব্বতে বাররামাঃ॥" (পবনদূত ২৮ শ্লোক।)

(১১৭) "স্কন্ধাবারং বিজয়পুরমিত্যুন্নতাং রাজধানীং
দৃষ্ট্বা তাবদ্ভুবনবিজয়ী তস্য রাজ্ঞোঽধিগচ্ছেঃ।
গঙ্গাবাতধ্বনিত চতুরো যত্র পৌরাঙ্গনানাং
সম্ভোগান্তে সপদি বিতনোত্যঙ্গসংবাহনানি॥" ঐ ৩৬ শ্লোক।

(১১৮) পবনদূতে ৩৯ হইতে ৪৫ শ্লোক দ্রষ্টব্য।

(১১৯) রূপসনাতন লক্ষ্মণসেনের সভামণ্ডপদ্বারে এইরূপ শ্লোক দেখিয়াছিলেন—

শ্লোকে লিখিত আছে—যে 'কথা বাড়াইতে উমাপতিধর, বিশুদ্ধ অথচ সুললিত রচনায় জয়দেব, দুরূহ কবিতা দ্রুত রচনায় শরণ, শৃঙ্গাররঘটিত ভাল রচনায় আচার্য্য গোবর্দ্ধনের তুল্য কে স্পর্দ্ধা করিতে পারে, কবিরাজ ধোয়ী শ্রুতিধর।'[১২০]

বিজয়সেন হইতে লক্ষ্মণসেন পর্য্যন্ত তিন পুরুষ যুদ্ধবিগ্রহ লইয়াই থাকিতেন। রাজ্যবিস্তারেচ্ছা, যুদ্ধজয়াশা, ব্রাহ্মণপ্রতিষ্ঠা ও সমাজ-সংস্কার নিয়ত তাঁহাদের একমাত্র চিন্তার বিষয় ছিল। বাঙ্গালীর নিতান্ত দুরদৃষ্ট, তাই বৃদ্ধ বয়সে লক্ষ্মণসেন স্বভাবসিদ্ধ আকৌমারআচরিত সঙ্কল্প হইতে যেন দূরে সরিয়া পড়িয়াছিলেন। আজীবন যুদ্ধবিগ্রহে লিপ্ত থাকিয়া বৃদ্ধ বয়সে তাঁহার সহিত তাঁহার সেনানী ও কর্ম্মচারিবৃন্দেরও যেন আলস্য ও জড়তা আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিল।

যে দেশের প্রজা-সাধারণের বীরত্ব কথা একদিন কাশ্মীর হইতে দাক্ষিণাত্য পর্য্যন্ত কীর্ত্তিত হইয়াছিল, যে দেশের প্রজার রাজভক্তি অনন্যসাধারণ বলিয়া কাশ্মীর-ঐতিহাসিক কহ্লণকেও চমৎকৃত করিয়াছিল,—আলস্য-পরতন্ত্র হইয়া ব্যভিচারস্রোতে গা ঢালিয়া দিয়া এখন তাঁহারা যেন পূর্ব্বপ্রকৃতি হারাইয়াছেন, পূর্ব্ব পুরুষের গুণগৌরব বিস্মৃত হইয়াছেন। আলস্যের প্রধান অলঙ্কার ভীরুতা আশ্রয় করিয়া অনেকে অদৃষ্টবাদী হইয়া পড়িয়াছেন। পালবংশের আধিপত্যকালে শাকদ্বীপী ব্রাহ্মণগণ এক প্রকার সর্ব্বেসর্ব্বা ছিলেন—তাঁহারা কেবল পূর্ব্বসম্মান ও কর্ত্তৃত্ব ব[illegible]। সাগ্নিক ও বৈদিক বিপ্রবংশধরগণের অভ্যুদয়ে ও ধর্ম্মনৈতিক কর্ত্তৃত্বে তাঁহা[illegible]কতকটা সমাজবাহ্য হইয়া পড়িতেছিলেন, সুতরাং তাঁহারা যে সেনবংশের অধঃপতন কামনা করিবেন, তাহা অসম্ভব নহে। তখনও তাঁহারা জ্যোতিঃশাস্ত্র লইয়াই একপ্রকার জীবিকানির্ব্বাহ করিতেছিলেন। এদিকে তাঁহারাও জ্যোতিঃশাস্ত্রের দোহাই দিয়া রটনা করিতে লাগিলেন যে শীঘ্রই গৌড়বঙ্গে তুরুষ্কের অধিকার বিস্তৃত হইবে। ঘটনাক্রমে সংবাদ আসিল যে মুসলমানেরা মগধ অধিকার করিয়াছে ও নালন্দার প্রধান বৌদ্ধ বিহার ধ্বংস করিয়া ফেলিয়াছে। এ সংবাদ জ্যোতিষিক উক্তির সমর্থন করিল। তাহা সমস্ত গৌড়রাঢ়ে রাজপুরুষ ও সম্ভ্রান্ত প্রজাদিগের মধ্যে ভীতিসঞ্চারিত করিল। দৈবজ্ঞের কথায় বিশ্বাস করিয়া অনেকেই জন্মভূমির মায়া ত্যাগ

"গোবর্দ্ধনশ্চ শরণো জয়দেব উমাপতিঃ।
কবিরাজশ্চ রত্নানি পঞ্চৈতে লক্ষ্মণস্য চ॥" (কবিরাজপ্রতিষ্ঠা)

(১২০) "বাচঃ পল্লবয়ত্যুমাপতিধরঃ সন্দর্ভশুদ্ধিং গিরাং
জানীতে জয়দেব এব শরণঃ শ্লাঘ্যো দুরূহে দ্রুতে।
শৃঙ্গারোত্তরসৎপ্রমেয়রচনৈরাচার্য্যগোবর্দ্ধন-
স্পর্দ্ধী কোঽপি ন বিশ্রুতঃ শ্রুতিধরো ধোয়ী কবিক্ষ্মাপতিঃ॥"

নারায়ণ ভট্টের গীতগোবিন্দটীকামতে ঐ শ্লোকটী লক্ষ্মণসেনেরই রচিত। তাহা হইলে লক্ষ্মণসেন আচার্য্যগোবর্দ্ধনের উপর যেরূপ স্তুতিবাক্য প্রয়োগ করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার আদিরসের উপর কতটা রুচি ছিল, তাহাই প্রতিপন্ন হইতেছে।

করিল ;—অনেকে পূর্ব্ববঙ্গে আশ্রয় লইল, কেহ কেহ উত্তরে সুদূর হিমালয়-প্রদেশে কেহ বা দক্ষিণে কলিঙ্গে গিয়া যেন হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিল। ঐতিহাসিক মিন্‌হাজ সেই পলায়নের আখ্যায়িকা লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। যখন গৌড়-রাঢ়বাসী উচ্চ হিন্দুসমাজ অলীক আশঙ্কায় বিব্রত, সেই সময় গৌড়ের নিগৃহীত (বৌদ্ধ) ধর্ম্মসম্প্রদায় মুসলমানগণের পক্ষাবলম্বন করিয়াছিলেন। ধর্ম্মসম্প্রদায়ের শূন্যপুরাণ-বর্ণিত নিরঞ্জনের রুষ্মায় আমরা তাহার স্পষ্ট আভাস পাইতেছি।

মিন্‌হাজের বর্ণনা হইতে জানা যায় যে, 'বেহার জয়ের পর বহুসংখ্যক দলবল সংগ্রহ করিয়া মহম্মদ-ই-বখ্‌তিয়ার গৌড়রাজ্য আক্রমণার্থ অগ্রসর হইয়াছিলেন। সে সময় 'নওদীয়া' (নবদ্বীপে) লখ্‌মণিয়া অবস্থান করিতেছিলেন। রাজধানীর অদূরে গোপনে দলবল রাখিয়া আঠার জনমাত্র অশ্বারোহী লইয়া মহম্মদ-ই-বখ্‌তিয়ার নওদীয়ায় প্রবেশ করিলেন। নগররক্ষিগণ অশ্ববিক্রেতা মনে করিয়া তাঁহাদের গতিরোধ করিল না। সুতরাং খিলজী-বীর অবাধে রাজবাটীতে প্রবেশ করিয়া অতর্কিতভাবে প্রহরিগণকে আক্রমণ করিলেন। বৃদ্ধ লখ্‌মণিয়া সে সময়ে মধ্যাহ্ন-ভোজনে বসিয়াছিলেন, হঠাৎ আক্রমণ-সংবাদ পাইয়া কিংকর্ত্তব্য-বিমূঢ় হইয়া খিড়্‌কী দিয়া বাহির হইয়া পড়িলেন। এদিকে সঙ্গে সঙ্গে মহম্মদ-ই-বখ্‌তিয়ারের বিপুল দলবল আসিয়া নদীয়া-রাজধানী (১১৯৯ খৃষ্টাব্দে) অধিকার করিয়া বসিল।'[১২১]

'যখন নদীয়া-রাজধানী ও তাহার চারি দিক্ অধিকৃত হইল, তৎকালে মহম্মদ-ই-বখ্‌তিয়ার নদীয়াতেই অবস্থান করিতে লাগিলেন এবং লখ্‌মণিয়া 'শঙ্কনট' ও বঙ্গাভিমুখে প্রস্থান করিলেন। তথায় কিছুকাল পরে তাঁহার রাজ্যভোগের অবসান [illegible][১২২] সহজে নদীয়া

(১২১) "When they became assured of these peculiarities, most of the Brahmans and inhabitants (Sâhâns) of that place left, and retired into the province of Sankanat, the cities and towns of Bang and towards Kâmrud, but to begin to abandon his country was not agreeable to Râe Lakhmaniah. The following year after that, Muhammad-i-Bakht-yar caused a force to be prepared, pressed on from Bihar, and suddenly appeared before the city of Nudia, in such wise that no more than eighteen horsemen could keep up with him, and the other troops followed after him. On reaching the gate of the city, Mahammad-i-Bakht-yar did not molest any one, and proceeded onwards steadily and sedately, in such manner that the people of the place imagined that mayhap his party were merchants and had brought horses for sale, and did not imagine that it was Mahammad-i-Bakht-yar, until he reached the entrance to the palace of Râe Lakhmaniah, when he drew his sword and commenced an onslought on the unbelievers."

Tabakat-i-Nasiri, p. 557.

(১২২) "When the whole of Muhammad-i-Bakht-yar's army arrived, and the city and round about had been taken possession of, he there took up his quarters and Rae Lakhmaniah got away towarde Sankanat and Bang, and there the period of his reign shortly afterwards came to a termination. His descandants up to this time, are rulers in the country of Bang." Do. p. 558.

রাজধানী বখ্‌তিয়ারের অধিকৃত হইলেও সমস্ত রাঢ়ে মুসলমান-শাসন প্রতিষ্ঠিত হইতে কিছু দিন সময় লাগিয়াছিল। তৎকালে লক্ষ্মণ-পুত্র কেশবসেন বরেন্দ্র বা গৌড়মণ্ডল শাসন করিতেছিলেন। হরিমিশ্রের কারিকা হইতে মনে হয় যে, 'কেশবসেন আপনার দলবল লইয়া মুসলমানগণের গতিরোধ করিতে অগ্রসর হইয়াছিলেন। কএক বর্ষ তাঁহার সহিত যুদ্ধ চলিয়াছিল। কিন্তু তিনি সফলকাম না হওয়ায় মুসলমানভয়ে পূর্ব্ববঙ্গে পলায়ন করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। ব্রাহ্মণেরাও সেই বিপ্লবকালে গৌড়ে অবস্থান করিতে সমর্থ হন নাই।'[১২৩]

বঙ্গে আসিয়া বৃদ্ধ লক্ষ্মণসেনের চৈতন্যোদয় হইয়াছিল। এখানে আসিয়া যে তিনি বঙ্গরক্ষার বিপুল আয়োজন করিয়াছিলেন, সন্দেহ নাই। সেই জন্যই মুসলমানেরা তৎপরেও বহুকাল বঙ্গাধিকারে সমর্থ হন নাই। কুলাচার্য্য হরিমিশ্র লিখিয়াছেন, তাঁহার জন্মগ্রহের দোষেই এরূপ কলঙ্ক ঘটিয়াছিল, তিনি ব্রাহ্মণগণকে বহু দান করিয়া শান্তি বিধান করেন।[১২৪]

বিক্রমপুরে আসিয়া তিনি ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ-সমাজের সমীকরণ করিয়াছিলেন। তাঁহার সমীকরণ-কালে সোম বসুজ শঙ্কর, অহর্পতি বসুজ বনমালী ও পুরন্দর, শুভ ঘোষজ রাম, হাড় গুহজ রুদ্র, পীতাম্বর গুহজ শাক্রি, শুভ ঘোষজ কার্ণা, অনন্ত ঘোষজ পীতাম্বর এবং জয়মিত্রজ শূলপাণি এই নয়জন সমীকুলীন বলিয়া সম্মানিত হন।[১২৫]

১২০৫ খৃষ্টাব্দের পর আর লক্ষ্মণসেন সম্বন্ধে কোন সংবাদ পাওয়া যায় নাই, সম্ভবতঃ ঐ বর্ষে বা অনতিপরেই তিনি ইহলোক পরিত্যাগ করেন। কেহ কেহ মনে করেন যে, জগন্নাথ-তীর্থ-যাত্রা-কালে [illegible]র কুঁয়াপাল নামক স্থানে তাঁহার মৃত্যু হয়, ২০ বর্ষ পূর্ব্বে কুঁয়াপালে অবস্থানকালে [illegible] শুনিয়া আসিয়াছি।[১২৬] মিনহাজের বর্ণনা হইতে জানা যায় যে, ৬০২

(১২৩) "তৎপুত্রঃ কেশবো রাজা গৌড়রাজ্যং বিহায় চ।
মতিং চাপ্যকরোদ্বঙ্গে যবনস্য ভয়াত্ততঃ।
ন শক্রুবন্তি তে বিপ্রাস্তত্র স্থাতুং যদা পুনঃ॥"

(১২৪) "বল্লালতনয়ো রাজা লক্ষ্মণোঽভূম্মহাশয়ঃ।
জন্মগ্রহভয়াদ্দোষাৎ কলঙ্কোঽভূদনন্তরম্‌॥" (হরিমিশ্র)

(১২৫) "শঙ্করো বনমালী চ পুরশ্চ রামঘোষকঃ।
গুহরুদ্রশ্চ শাক্রিশ্চ কার্ণাপীতাম্বরাখ্যকৌ।
শূলপাণিকমিত্রশ্চ নবৈতে সমতাং গতাঃ॥" (বাচস্পতি)

(১২৬) রাঢ়ীয়ব্রাহ্মণদিগের মেলমালায়ও লিখিত আছে—
"যে কালে লক্ষ্মণসেন নীলাচলে চলে।
হিন্দুরাজ্য শেষ হইল যবনের বলে॥"

এই বচন হইতে অনেকে মনে করেন যে, লক্ষ্মণসেনের নীলাচলযাত্রা হইতেই হিন্দুরাজ্য শেষ হয়। বাস্তবিক তখনও হিন্দুরাজ্য শেষ হয় নাই। বঙ্গে বৃদ্ধ লক্ষ্মণসেন যত দিন জীবিত ছিলেন, সম্ভবতঃ তত দিন তিনি রাঢ়-উদ্ধারের উপযুক্ত চেষ্টাও করিয়া থাকিবেন, বোধ হয়, তাঁহার নীলাচলযাত্রার সহিত সেরূপ চেষ্টা আর হয় নাই। তাই রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ আক্ষেপে বলিতেছেন যে, তাঁহার নীলাচলযাত্রার সঙ্গে রাঢ়ের হিন্দুরাজ্য শেষ হইল।

হিজিরায় মহম্মদ-ই-বখ্‌তিয়ার ইহলোক পরিত্যাগ করেন। তৎপূর্ব্ব বর্ষে লক্ষ্মণাবতী রাজধানী হইতে যখন তিনি কামরূপ ও তিব্বতজয়ে অগ্রসর হন, তৎপূর্ব্বেই তিনি মহম্মদ-ই-সেরান্ ও তাঁহার ভ্রাতাকে তাঁহার কিয়দংশ সৈন্যসহ লখ্‌নোর ও যাজনগর অভিমুখে পাঠাইয়াছিলেন।[১২৭]

মিন্‌হাজের বর্ণনায় আরও জানিতে পারি যে, যাজনগর, বঙ্গ, কামরূপ ও ত্রিহুত এই বিস্তীর্ণ ভূখণ্ড এক সময় লক্ষ্মণাবতী বা গৌড়রাজ্য নামে পরিচিত ও লক্ষ্মণসেনের অধিকারভুক্ত ছিল।[১২৮] লক্ষ্মণাবতী প্রদেশ গঙ্গা দ্বারা দুই অংশে বিভক্ত ছিল। ইহার মধ্যে পশ্চিম ভাগ রাঢ়, লখ্‌নোর নগরী ইহারই অন্তর্গত এবং পূর্ব্বভাগ 'বরিন্দ' (বরেন্দ্র) নামে অভিহিত এক লক্ষ্মণাবতীনগরী ইহারই অন্তর্গত ছিল।[১২৯]

সুতরাং মহম্মদ-ই-বখ্‌তিয়ারের তিব্বত-অভিযানকালে সমস্ত উত্তরবঙ্গ বা বরেন্দ্র-প্রদেশ তাঁহার রীতিমত শাসনাধীন হইলেও রাঢ় প্রদেশে তখনও গোলযোগ চলিতেছিল। বলা বাহুল্য, এ সময় লক্ষ্মণ পুত্র কেশবসেন পিতৃরাজ্য উদ্ধারের জন্য রাঢ় ও যাজনগরের সামন্তবর্গ লইয়া পিতৃরাজ্য উদ্ধারের চেষ্টা করিতেছিলেন।

পূর্ব্বেই লিখিয়াছি, মহারাজ লক্ষ্মণসেনের জন্ম হইতে যে অব্দ প্রচলিত হয়, তাহাই পরে 'লক্ষ্মণসংবৎ' বা 'লসং' নামে পরিচিত হইয়াছে।

লক্ষ্মণ-সংবৎ

শ্রীযুক্ত মনোমোহন চক্রবর্ত্তী মহাশয় মনে করেন যে, লক্ষ্মণসেনের [illegible] পুরুষ সামন্ত-সেন হইতেই উক্ত অব্দ আরম্ভ। লক্ষ্মণসেনের অভিষেককালে তিনি সেই অব্দই ব্যবহার করেন বলিয়া অথবা তাঁহার সময়ে সর্ব্বত্র বিশেষভাবে ঐ অব্দ প্রচলিত হওয়ায় উহা 'লক্ষ্মণাব্দ' নামে পরিচিত হইয়াছিল।[১৩০] অল্পদিন হইল, শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ঐ মতের প্রতিবাদ করিয়া প্রকাশ করেন যে, 'মনোমোহন বাবু যে সকল সাময়িক লিপি উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহাতে 'অতীত' বা তদনুরূপ কোন শব্দ প্রযুক্ত হয় নাই।' এদিকে এক নৃপতির প্রবর্ত্তিত অব্দ অপর নৃপতির নামে প্রচারিত হইবার ঐতিহাসিক প্রমাণ না পাইয়া রাখালবাবু স্বীকার করেন না যে, লক্ষ্মণাব্দ লক্ষ্মণসেনের জন্ম হইতে তৎপিতা বল্লালসেনকর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত হইয়াছে।[১৩১]

একের অব্দ অপরের নামে প্রচলিত হইবার প্রমাণ ভারতীয় পুরাতত্ত্বে বিরল নহে। বিক্রমাদিত্যের বহু পূর্ব্ব হইতে প্রচলিত সংবৎ বা মালবস্থিত্যব্দ তাঁহার সময়ে বিক্রম-সংবৎ নামে প্রচলিত হইয়াছে। বল্লালসেন মিথিলা জয় করিয়া নবজাত প্রিয়পুত্রের নামানুসারে

(১২৭) "When Muhammad-i-Bakht-yar led his troops towards the mountains of Kâmrud and Tibbat, he had despatched Muhammad-i-Sheran and his brother, with a portion of his forces, towards Lakhanor and Jajnagar" Raverty, T. N. p. 578.

(১২৮) Raverty, p. 588.

(১২৯) Raverty, p. 585.

(১৩০) Journal A. S. B. (N. S) Vol I. p. 45.

(১৩১) Journal A. S. B, 1913, Vol IX. p. 277.

নূতন অব্দ প্রচলিত করিয়া থাকিবেন, তাহা অসম্ভব বলিয়া কেন মনে করিব? মিথিলায় যুদ্ধ-যাত্রাকালে হয়ত তিনি এমন সঙ্কটে পড়িয়াছিলেন, যাহাতে তাঁহার জীবনের আশা ছিল না। সম্ভবতঃ এই সময়ই তাঁহার মৃত্যুসংবাদ রটিয়াছিল। সেই সময়ে লক্ষ্মণসেনের জন্ম হয়। লক্ষ্মণের জন্ম এবং সেই সময়ে বল্লালের পুনর্জীবনলাভ ও তৎপরেই মিথিলা-জয় বল্লালের হৃদয়ে একটী অজ্ঞাতপূর্ব্ব আনন্দ সঞ্চার করিয়াছিল, তজ্জন্যই হয়ত তিনি পুত্রের নামে নূতন অব্দ প্রচারিত করিয়া থাকিবেন। কেবল 'অব্দ' বলিয়া নহে, সমস্ত গৌড় অধিকার করিয়া পুত্রের নামানুসারে বল্লালসেন গৌড়রাজধানীর 'লক্ষ্মণাবতী' নামকরণ করিয়াছিলেন। পরে এই লক্ষ্মণাবতীই কেবল গৌড় নামে পরিচিত হয়। বলা বাহুল্য, বল্লালসেনের পূর্ব্বে এই গৌড়নগরী বা লক্ষ্মণাবতীর অস্তিত্বই ছিল না। আবুলফজলের আইন্-অকবরী-মতে বল্লালসেনই গৌড়নগরী বা লক্ষ্মণাবতীর প্রতিষ্ঠাতা। এতদ্ব্যতীত তিনি উত্তররাঢ়ে বীরভূম জেলায় লক্ষ্মণনগর নামেও একটি প্রসিদ্ধ নগর প্রতিষ্ঠা করেন, তবকাত-ই-নাসিরি প্রভৃতি মুসলমান-ইতিহাসে তাহাই 'লখ্নোর' এবং অধুনা কেবল 'নগর' নামে পরিচিত। সমসাময়িক ঐতিহাসিক মিন্হাজের বিবরণীমধ্যে যদি কিছু মাত্র সত্য থাকে, তাহা হইলে অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে, মহম্মদ-ই-বখ্তিয়ার কর্ত্তৃক নদীয়া-জয়ের (১১৯৯ খৃষ্টাব্দের) ৮০ বর্ষ পূর্ব্বে লখ্মণিয়া বা লক্ষ্মণসেনের জন্ম।

আবুল-ফজলের [illegible]অনুসরণ করিলে বলিতে হয় যে, ১০৪১ শকে বা ১১১৯ খৃষ্টাব্দে লক্ষ্মণাব্দ আরম্ভ।[১৩২] প্রত্নতত্ত্ববিদ্ কীলহোর্ণও নিঃসন্দেহে প্রমাণ করিয়াছেন যে, মিথিলার আধুনিক পঞ্জিকানুসারে ১০২৮ শকে যে 'লসং' প্রারম্ভকাল নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে, তাহা ভ্রমাত্মক। তিনি নানা প্রাচীন পুথির প্রমাণবলে নিঃসন্দেহে প্রমাণ করিয়াছেন যে, ১০৪১ শকেই কার্ত্তিকাদি বর্ষে অমান্ত সুদী হইতেই প্রকৃত প্রস্তাবে 'লসং' আরম্ভ হইয়াছে।[১৩৩] মিন্হাজের তবকাত্-ই-নাসিরির প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া পূর্ব্বেই দেখাইয়াছি যে, লক্ষ্মণসেনের ৮০ বর্ষে অর্থাৎ ১১৯৯ খৃষ্টাব্দে মহম্মদ-ই বখ্তিয়ার নদীয়া আক্রমণ করেন এবং লক্ষ্মণসেন পূর্ব্ববঙ্গে চলিয়া যান। ডাক্তার কীলহোর্ণ উক্ত বর্ষ '৮০ লসং' বলিয়াই স্থির করিয়াছেন।[১৩৪] লক্ষ্মণসেন যে দীর্ঘজীবী ছিলেন, তাহা তাঁহার ধর্ম্মাধিকারী হলায়ুধের 'ব্রাহ্মণসর্ব্বস্ব' হইতেই প্রমাণিত হয়। হলায়ুধ লিখিয়াছেন যে, 'তাঁহার বাল্যকালে অখিলক্ষ্মাপাল-নারায়ণ শ্রীমল্লক্ষ্মণসেনদেব তাঁহাকে রাজপণ্ডিত-পদে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন, যৌবনারম্ভে শ্বেতাংশুবিম্বোজ্জ্বল

(১৩২) Akbar-Nama, tr. by Beveridge.

(১৩৩) Indian Antiquary, Vol XIX, p. 1. ff.

(১৩৪) "When we are told that, at the conquest of Bengal by Muhammad-i-Bakhtyar, which by Mr. Blochmann is placed about A. D. 1198-99, the last Hindu King Lakhmaniyâ had been reigning for 80 years, does not this really mean that the conquest took place in the year 80 of Lakshmanasena,"

Indian Antiquary, Vol. XIX. p. 7.

ছত্রতলে উৎসিক্ত করিয়া তাঁহাকে মহামহত্তপদ এবং যৌবনের শেষে তাঁহাকে যোগ্য ধর্ম্মাধিকারপদ দিয়াছিলেন।'১৩৫

সুতরাং লক্ষ্মণসেনের দীর্ঘজীবন এবং দীর্ঘকালশাসনকর্তৃত্ব সম্বন্ধে আর কোন সন্দেহই থাকিতেছে না। মিন্‌হাজ১৩৬ ও পরবর্ত্তী মুসলমান-ঐতিহাসিকগণ সকলেই একবাক্যে

(১৩৫) "বাল্যে খ্যাপিতরাজপণ্ডিতপদঃ শ্বেতাংশুবিম্বোজ্জ্বল-
ছত্রোৎসিক্ত-মহামহত্তমপদং দত্বা নবে যৌবনে।
যস্মৈ যৌবনশেষযোগ্যমখিলক্ষ্মাপালনারায়ণঃ
শ্রীমল্লক্ষ্মণসেনদেবনৃপতির্ধর্ম্মাধিকারং দদৌ॥" (ব্রাহ্মণসর্ব্বস্ব)

(১৩৬) মিন্‌হাজ নদীয়া-বিজয়ের ৪২ বর্ষ পরে বখ্‌তিয়ারের সঙ্গী দুই জন বিচক্ষণ সৈনিকের মুখে শুনিয়া তৎকালীন ঘটনা লিপিবদ্ধ করিয়া গেলেও আশ্চর্য্যের বিষয় কোন কোন নবীন ঐতিহাসিক তাঁহার কথায় বিশ্বাস করিতে প্রস্তুত নহেন। অনেকেই তদ্বর্ণিত ১৮ জন অশ্বারোহীর নদীয়া বিজয়-কাহিনী অতিরঞ্জিত বলিয়া উড়াইয়া দিতেছেন। প্রসিদ্ধ বিহারকে দুর্গ বলিয়া প্রকাশ করায় ও মুণ্ডিতমস্তক শ্রমণদিগকে ব্রাহ্মণরূপে পরিচিত করায় মিন্‌হাজের গৌড়বিজয়-কাহিনী নিতান্ত অবিশ্বাসযোগ্য বলিয়াই কেহ কেহ স্থির সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। কিন্তু মিন্‌হাজ প্রত্যক্ষদর্শী লোকদিগের মুখে শুনিয়া যাহা লিখিয়াছেন, তাহা উড়াইয়া দেওয়া যায় না। মিন্‌হাজের বর্ণনায় বেশ বুঝা যায়, মহম্মদ-ই-বখ্‌তিয়ারের চাতুর্য্যেই নদীয়া-বিজয় সাধিত হইয়াছিল। মধ্যাহ্নকালে অশ্বারোহী বণিকের বেশে বখ্‌তিয়ার নদীয়া-রাজধানীতে [illegible] রাজরক্ষিগণকে প্রতারিত করিয়াছিলেন, সন্দেহ নাই। তখন মধ্যাহ্নভোজনকাল, রক্ষিগণ কেহই প্রস্তুত ছিল না। অল্পসংখ্যক প্রহরী যাহারা রাজবাটী রক্ষা করিতেছিল, সহসা মুসলমান-আক্রমণে তাহারাও কিছু হতবুদ্ধি হইয়া পড়িয়াছিল, সন্দেহ নাই। যখন রাজবাটীর প্রহরীগণের সহিত মহম্মদ ই বখ্‌তিয়ারের সঙ্ঘর্ষ উপস্থিত ও নগরের চারিদিকে আর্ত্তনাদ উপস্থিত হইয়াছিল, সেই সুযোগে পঙ্গপালের ন্যায় বখ্‌তিয়ারের বিপুল বাহিনী নগরমধ্যে প্রবেশ করিয়া অতর্কিতভাবে আক্রমণ করিয়াছিল। তাহার ফলেই লক্ষ্মণসেনের পলায়ন ও মুসলমানের নদীয়া-বিজয়। বলা বাহুল্য—মিন্‌হাজের আদ্যোপান্ত কাহিনী পাঠ করিলে মনে হয় যে, মুসলমান-আক্রমণের পূর্ব্ব হইতেই ভিতরে ভিতরে ষড়যন্ত্র চলিয়াছিল। যাহা হউক, মিন্‌হাজ যে ভাবে নদীয়া-বিজয় কীর্ত্তন করিয়াছেন, তাহা অবিশ্বাস করিবার কারণ নাই। কারণ রাঢ়দেশ তাহার বহু পর পর্য্যন্ত সম্পূর্ণ মুসলমানশাসনাধীন হইতে পারে নাই, সে কথাও মিন্‌হাজ লিখিয়াছেন। মিন্‌হাজ আরও লিখিয়াছেন যে, নদীয়া-বিজয়ের পরও কিছুকাল লক্ষ্মণ পূর্ব্ববঙ্গে রাজত্ব করিয়াছিলেন। সমসাময়িক অপর প্রমাণদ্বারাও তাহাই সমর্থিত করিতেছে। মিন্‌হাজ 'বিহার'কে 'দুর্গ' ও মুণ্ডিতমস্তক শ্রমণকে ব্রাহ্মণ ধরায় তিনি বিশেষ ভ্রম করিয়াছেন বলিয়া মনে হয় না। বাস্তবিক পূর্ব্বকালে গৌড়বঙ্গে ও উৎকলে যে সকল মন্দির বা বিহারাদি নির্ম্মিত হইত, তাহার চারিদিকে দুর্গপ্রাকারের ন্যায় পরিখা থাকিত, ময়ূরভঞ্জের 'কণাকিয়া বৈদ্যনাথের মন্দির' এখনও তাহার সাক্ষ্যদান করিতেছে। (Mayurabhanja Archæological Survey Reports, Vol. I. p) মন্দির-প্রদক্ষিণার উপর দাঁড়াইয়া অনেক সময়ে যুদ্ধ চালান যাইত। এই কারণে বিহারকে মুসলমানেরা দুর্গ মনে করিয়াছিলেন। বাস্তবিক যে সময়ের কথা মিন্‌হাজ লিখিয়াছেন, সে সময়ে বৌদ্ধাচার্য্যগণ 'ব্রাহ্মণ' বলিয়া এবং সাধারণ শ্রমণেরা 'নাঁড়া' বা 'নাঁড়িয়া' বলিয়া পরিচিত হইতেছিলেন। মিন্‌হাজ লক্ষ্মণাবতী নগরীর পরিচয়দানকালে লিখিয়াছেন, 'এখানে ব্রাহ্মণ ও নাদিয়া বা নাঁড়িয়াদিগের সমাজ আছে।' বলা বাহুল্য, মিন্‌হাজের 'নাদিয়া'ই মুণ্ডিতমস্তক (নাড়া) বা বৌদ্ধ শ্রমণ। (Raverty's Tabakat-i-Nasiri, p. 567) বলিতে কি মিন্‌হাজের ন্যায়

স্বীকার করিয়া গিয়াছেন যে, লক্ষ্মণসেনের জন্ম হইতেই তাঁহার রাজ্যাভিষেক-গণনা চলিয়াছে ও আবুলফজল অকবর-নামায় লক্ষ্মণের অভিষেক হইতেই লক্ষ্মণসংবৎ আরম্ভ ঘোষণা করিয়াছেন।

আমরাও প্রায় উনবিংশতিবর্ষ পূর্ব্ব হইতে বলিয়া আসিতেছি যে, ১১১৯ খৃষ্টাব্দে লক্ষ্মণসেনের জন্ম হইতে 'লসং' আরম্ভ এবং ৮০ লসং বর্ষে (১১৯৯ খৃষ্টাব্দে) লক্ষ্মণসেন নদীয়া ত্যাগ করেন।[১৩৭] পর বর্ষে গৌড় বা লক্ষ্মণাবতী মুসলমান-অধিকারভুক্ত হইয়াছিল এবং এই বর্ষ হইতে লক্ষ্মণসেনের অতীতাব্দ গণিত হইতে থাকে। আশ্চর্য্যের বিষয় ডাক্তার কীলহোর্ণ ১১১৯ খৃষ্টাব্দ হইতে 'লসং' আরম্ভ প্রতিপন্ন করিলেও মহম্মদ-ই-বখ্‌তিয়ারের বঙ্গবিজয়কালকে অর্থাৎ ৮০ লক্ষ্মণসংবৎকে "শ্রীমল্লক্ষ্মণসেনদেবপাদানামতীতরাজ্যে সং ৮০" বলিয়া ভ্রমে পতিত হইয়াছেন। শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ও সম্প্রতি ঐরূপ ভ্রমেরই অনুবর্ত্তী হইয়াছেন।[১৩৮]

লক্ষ্মণসেনের অতীত রাজ্যাব্দ

বোধগয়া হইতে লক্ষ্মণসেনের অতীত রাজ্যজ্ঞাপক দুইখানি শিলালিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে, তন্মধ্যে ১ম খানি "শ্রীমল্লক্ষ্মণসেনস্যাতীতরাজ্যসং ৫১" এবং ২য় খানি "শ্রীমল্লক্ষ্মণসেনদেবপাদানামতীতরাজ্যসং ৭২" অঙ্কে উৎকীর্ণ হইয়াছিল।

লক্ষ্মণসংবৎ এবং লক্ষ্মণের অতীত-রাজ্যসংবৎ অভিন্ন মনে করিয়া রাখাল বাবু বড়ই ভুল করিয়াছেন, তাই তিনি লক্ষ্মণ সং ৫১ অতীত রাজ্যসংবৎকে ১১৭৫-৭১ খৃষ্টাব্দ ধরিয়া তৎপূর্ব্বেই লক্ষ্মণসেনের মৃত্যুকাল অবধারণ করিয়াছেন এবং দানসাগর ও অদ্ভুতসাগরের বহু পুথি হইতে বল্লালসেন ও লক্ষ্মণসেনের প্রকৃত আবির্ভাবকাল নিঃসন্দেহে অবধারিত হইলেও তিনি সমসাময়িক উভয় গ্রন্থের প্রমাণ প্রক্ষিপ্ত বলিয়া উড়াইয়া দিবার চেষ্টা করিয়াছেন। পূর্ব্বেই দেখাইয়াছি যে, তাঁহার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় নাই। লক্ষ্মণসেন যে ১১৬৮-১১৬৯ খৃষ্টাব্দে রাজ্যাভিষিক্ত হইয়াছিলেন, তাঁহার সাময়িক ও তাঁহার মহামাণ্ডলিক শ্রীধর দাসের 'সূক্তিকর্ণামৃত' হইতেও ইহার অপর প্রমাণ বাহির হইয়াছে। শ্রীধরদাস লিখিয়াছেন—

"১১২৭ শাকে শ্রীমল্লক্ষ্মণসেন নৃপতির ৩৭ বর্ষে ফাল্গুন মাসের ২০ দিবসে শ্রীধরদাস দ্বারা এই সূক্তিকর্ণামৃত রচিত হইয়াছে।"[১৩৯] শ্রীধরদাসের উক্তির সহিত অদ্ভুতসাগরের ঐক্য রহিয়াছে। সুতরাং ১১৭০ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে লক্ষ্মণসেন ইহলোক পরিত্যাগ করেন নাই, তিনি ১১২৭ শক বা

বৈদেশিক যে ভাবে সে সময়ের গৌড়রাজ্যের পরিচয় দিয়া গিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার প্রশংসা না করিয়া থাকা যায় না। তিনি তৎকালের অন্ধকারাবৃত গৌড়েতিহাসে যে ক্ষীণালোক রাখিয়া গিয়াছেন, তদ্বারা আমরা অনেক ঐতিহাসিক তত্ত্ব উদ্ধারে সমর্থ হইতেছি। এমন কি সমসাময়িক শিলালিপি ও গ্রন্থগত বিবরণীর সহিত তাঁহার উক্তির বিরোধ লক্ষিত হইতেছে না। এ অবস্থায় মিন্‌হাজের উক্তি প্রামাণিক বলিয়াই স্বীকার করিতে হইবে।

(১৩৭) J. A. S. Bengal, 1896, pt. I, p. 27.

(১৩৮) J. A. S. Bengal, 1913, p. 277

(১৩৯) "শাকে সপ্তবিংশত্যধিকশতোপেতদশশতেশরদাম্
শ্রীমল্লক্ষ্মণসেনক্ষিতিপস্য রসৈকত্রিংশে।

১২০৫ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত জীবিত ছিলেন তাহা সূক্তিকর্ণামৃত হইতেই প্রমাণিত হইতেছে। পূর্ব্বেই লিখিয়াছি যে, ১২০০ খৃষ্টাব্দে তাঁহারা গৌড়রাজধানী মুসলমান-অধিকারভুক্ত হইয়াছিল। এই ঘটনার ৪২ বর্ষ পরে মিন্‌হাজ লিখিয়াছেন যে, তখনও বঙ্গে (পূর্ব্ববঙ্গে) সেনরাজবংশ স্বাধীনভাবে রাজত্ব করিতেছিলেন।[১৪০] সুতরাং শ্রীধরদাস যখন 'সূক্তিকর্ণামৃত' রচনা করেন, তৎকালে (১২০৫ খৃষ্টাব্দে) বৃদ্ধ লক্ষ্মণসেন পূর্ব্ববঙ্গে বিরাজ করিতেছিলেন। সমকালে লিখিত নেপাল হইতে আবিষ্কৃত নানা প্রাচীন পুথি ও শিলালিপি হইতে জানা যায় যে, ১১৯৯ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত গোবিন্দপালদেবের অতীত রাজ্য[১৪১] এবং ঐ বর্ষে মুসলমান-অধিকার-বিস্তারের সঙ্গে লক্ষ্মণসেনের অতীতরাজ্যাব্দ গণনা চলিতে থাকে। লক্ষ্মণসেনের আধিপত্যকালে "প্রবর্দ্ধমান বিজয়রাজ্যে" লিখিত হইত এবং গৌড়রাজ্য তাঁহার হস্তচ্যুত হইলে 'অতীতরাজ্যে' লিখিত হইতে থাকে। লক্ষ্মণসেনের রাজ্য গত হইবার পর যে তাঁহার অতীত-রাজ্যসংবৎ চলিয়াছিল, এ সম্বন্ধে সমসাময়িক অপর প্রমাণও রহিয়াছে। লক্ষ্মণসেনের ৫১ অতীতরাজ্যাব্দে উৎকীর্ণ শিলালিপি হইতে জানা যায় যে, অশোকচল্লদেব উক্ত বর্ষে মহাবোধিতে বুদ্ধমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা ও তদুদ্দেশে কতকগুলি দানও করিয়াছিলেন। তৎপরবর্ত্তী ৭৪ অতীতরাজ্যাব্দে উৎকীর্ণ লিপিতে লিখিত আছে, যে সপাদলক্ষশৈলস্থ খশদেশাধিপ অশোকচল্লদেবের কনিষ্ঠ ভ্রাতা কুমার দশরথের কোষাধ্যক্ষ সহজপাল কতকগুলি দান করিয়াছেন। ঐ দুইখানি লিপি ভিন্ন বোধগয়া হইতে আবিষ্কৃত অপর একখানি শিলাফলকে অশোকচল্লদেব, কমারাজগুরু ধর্ম্মরক্ষিত, সিংহলস্থবিরমণ্ডলী, সাধনিক ব্রহ্মচাট ও তৎপুত্র মাণ্ডলিক [illegible]পালের নাম লিখিত আছে।[১৪২] ইহাতে কোন সন তারিখ নাই। এ ছাড়া গয়ার বিষ্ণুপদমন্দির-নিকটস্থ সূর্য্যমন্দিরগাত্রে উৎকীর্ণ একখানি শিলাফলকে দেখিতে পাই 'কমাদেশাধিপপুরুষোত্তম সিংহ বুদ্ধধর্ম্মের মলিন অবস্থা অবলোকন করিয়া তাঁহার নিকটবর্ত্তী সপাদলক্ষপতি অশোকচল্ল ও ছিন্দরাজের সাহায্যে বুদ্ধধর্ম্মের পবিত্রতা আনয়ন করিয়াছিলেন। পুরুষোত্তম সিংহের দৌহিত্র (রত্নশ্রীর গর্ভজাত) মাণিক্যসিংহের মুক্তিকামনায় গয়ায় গন্ধকুটী নির্ম্মিত হইয়াছিল, পুরুষোত্তমসিংহের গুরু স্থবির ধর্ম্মরক্ষিতের তত্ত্বাবধানে ১৮১৩ নির্ব্বাণাব্দে উক্ত নির্ম্মাণকার্য্য সুসম্পন্ন হয়।'[১৪৩]

সুতরাং দেখা যাইতেছে, ১৮১৩ নির্ব্বাণাব্দের সমকালেই ৫১ ও ৭৪ সংখ্যক লক্ষ্মণসেনদেবের অতীতরাজ্যাব্দ পড়িতেছে। চীনপরিব্রাজক য়ুয়ন্-চুয়ঙ্ বুদ্ধনির্ব্বাণাব্দ লইয়া একটা স্থির-

সবিতুর্গত্যা কাব্যনবিংশেষু পরার্থহেতোবধূভুকাৎ
শ্রীধরদাসেনেদং সূক্তিকর্ণামৃতং চক্রে।" (সূক্তিকর্ণামৃত)

(১৪০) Raverty's Tabakat-i-Nasiri, p. 558.

(১৪১) ২১০ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

(১৪২) Cnnningham's Mahâbodhi.

(১৪৩) Indian Antiqnary, Vol. X. p. 341.

সিদ্ধান্তে উপনীত না হইলেও বহু পূর্ব্বকাল হইতে অদ্যাবধি সিংহল, শ্যাম, ব্রহ্ম ও চট্টগ্রাম অঞ্চলে ৫৪৩ খৃঃ পূর্ব্বাব্দ হইতে নির্ব্বাণাব্দ গণিত হইয়া আসিতেছে। এদিকে গয়াস্থ উক্ত শিলালিপির মধ্যে যখন সিংহলস্থবিরগণের স্পষ্ট উল্লেখ ও তাঁহাদের অধিষ্ঠানেই বৌদ্ধধর্ম্মের উন্নতির আভাস রহিয়াছে, তখন যে সিংহল-প্রচলিত নির্ব্বাণাব্দই ব্যবহৃত হইয়াছিল, তাহাতে আর সন্দেহ করিবার কারণ দেখি না। এ অবস্থায় (১৮১৩—৫৪৩)১২৭০ খৃষ্টাব্দে যে অশোকচল্লদেব বিদ্যমান ছিলেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। পূর্ব্বেই লিখিয়াছি যে, ১১৯৯ খৃষ্টাব্দে গৌড়রাজ্য লক্ষ্মণসেনের হস্তচ্যুত হইলে ১২০০ খৃষ্টাব্দ হইতে তাঁহার অতীত-রাজ্যাব্দ গণিত হয়। এ অবস্থায় লক্ষ্মণসেনের ৫১ অতীত-রাজ্যাঙ্ককে ১২৫১ খৃঃ অব্দ এবং ৭২ অতীত-রাজ্যাঙ্ককে ১২৭২ খৃঃ অব্দ বলিয়া অনায়াসেই স্বীকার করিতে পারি। অতীতরাজ্যাঙ্ক-নির্দ্দেশক উভয় লিপির অক্ষরবিন্যাস আলোচনা করিলেও উভয় লিপিই লক্ষ্মণসেনের তাম্রশাসন-লিপির অক্ষরের পরবর্ত্তী বলিয়া মনে হইবে। এ অবস্থায় লক্ষ্মণসংবৎ বা লসং এবং লক্ষ্মণ-সেনের অতীতরাজ্যাঙ্ক যে সম্পূর্ণ ভিন্ন, তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

এখন কথা হইতেছে, কমারাজ পুরুষোত্তম সিংহ এবং অশোকচল্লদেব ও তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা দশরথের লিপিতে লক্ষ্মণসেন-দেবের অতীত রাজ্যাঙ্ক গৃহীত হইল কেন? লক্ষ্মণসেনের জন্ম-পরিচয়-প্রসঙ্গে লিখিত হইয়াছে যে, চালুক্যরাজকন্যার গর্ভে তাঁহার জন্ম। চালুক্য, চুলুক, সুলুক, চলকিক ও চল্ল এক বংশোপাধি। বল্লালসেনমহিষী চালুক্যরাজকন্যা এ দেশের নীলা-বতীর ব্রতকথায় যেন [illegible]কমুলকের নন্দাপাটনের' কলাবতীর কন্যা বলিয়াই পরিচিত হইয়াছেন, পূর্ব্বেই তাহার আভাস দিয়াছি। বর্ত্তমান কমাউন শিলালিপিতে 'কমা' দেশ বলিয়া পরিচিত। কমাউনের সমুচ্চ নন্দাদেবীশৈল ও নন্দাকোট প্রসিদ্ধ। চালুক্যবংশীয় অশোক-চল্লের রাজ্য সপাদলক্ষ ও অপভ্রংশে সওলখ, সৌলক এবং সুলুকমুলুক বলিয়া পরিচিত হওয়া বিচিত্র নহে।[১৪৪] পূর্ব্বেই লিখিয়াছি, গয়ার শিলালিপিতে কমা ও সপাদলক্ষ পার্শ্বস্থ জনপদ বলিয়া পরিচিত হইয়াছে। এরূপ স্থলে বোধ হয়, বল্লালসেনের সময় সপাদলক্ষ ও কমাদেশ এক চালুক্য-নৃপতির শাসনাধীন এবং নন্দাকোট বা নন্দাপাটনে তাঁহার রাজধানী ছিল। এখানকার চালুক্যরাজকন্যার সহিত বল্লালসেনের বিবাহ হইয়াছিল। পরে প্রকাশ পাইবে যে, গৌড়মগধ মুসলমানের অধিকারভুক্ত হইলে লক্ষ্মণ-পুত্র মাধবসেন এই সুদূর কেদারখণ্ডে আসিয়া কিছুকাল অবস্থান করিয়াছিলেন। সুতরাং গৌড়ের সেনবংশের সহিত কমা ও সপাদলক্ষ রাজবংশের পূর্ব্বাপর-সম্বন্ধ ছিল বলিয়াই তাঁহারা আত্মীয়তাসূত্রে 'লক্ষ্মণসেনের অতীত রাজ্যাঙ্ক' গ্রহণ করিয়া থাকিবেন। তাঁহারা আত্মীয়তাসূত্রে লক্ষ্মণসেনের নাম গ্রহণ করিলেও আর কেহ এরূপভাবে লক্ষ্মণের অতীতরাজ্যাঙ্ক গ্রহণ করেন নাই।

মিথিলায় ও উত্তরবঙ্গে বহুকাল লসং প্রচলিত ছিল, তত্রত্য নানা প্রাচীন পুথি হইতে জানা গিয়াছে। সেই সেই স্থলের কোথাও 'লসং' লক্ষ্মণসেনের অতীতরাজ্যাঙ্ক বলিয়া গৃহীত হয় নাই,

(১৪৪) বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস, বৈশ্যকাণ্ড, ১মাংশ, ১৭৯ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

বরং 'লক্ষ্মণসেনভূপ-সম্বন্ধি অব্দ' বলিয়াই পরিচিত ছিল।' লক্ষ্মণসেনের রাজ্যাতীতাব্দ মুসলমান-আমলে 'পরগণাতীত সন' বা 'পরগণাতী সন' নামে বহুকাল প্রচলিত ছিল। বিক্রমপুরের বহু প্রাচীন কাগজপত্রে এই 'পরগণাতী সনের' উল্লেখ রহিয়াছে। ১২০০ খৃষ্টাব্দে ম বর্ষ ধরিয়া এই 'পরগণাতী' সনের বর্ষ গণনা চলিয়া আসিতেছে। মনে হয়, এই অতীত-রাজ্যাব্দ মুসলমানের গৌড়বিজয়-নির্দ্দেশক ছিল বলিয়া 'লক্ষ্মণসেনের' নাম তুলিয়া দিয়া মুসলমান-রাজপুরুষগণ তাহাই 'পরগণাতী সন' নামে চালাইয়া গিয়াছেন।

লক্ষ্মণসেনের পর ঠিক কে বঙ্গের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইয়াছিলেন, তাহা লইয়া গোলযোগ আছে। বিংশতি বর্ষ পূর্ব্বে বিশ্বকোষে ও তৎপরে এসিয়াটিক সোসাইটির পত্রিকায়[১৪৫] প্রকাশ করি যে, লক্ষ্মণসেনের পর তৎপুত্র বিশ্বরূপসেন পূর্ব্ব-বঙ্গের অধিপতি হইয়াছিলেন। কিন্তু হরিমিশ্র ও এড়ুমিশ্রের কারিকা এবং রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ ও কায়স্থসমাজের সমীকরণের ইতিহাস আলোচনা করিয়া এখন মনে হইতেছে যে, লক্ষ্মণসেনের পর তৎপুত্র দনুজমাধব বা দনৌজামাধব বঙ্গাধিপত্য লাভ করিয়াছিলেন। কেশব ও বিশ্বরূপসেনের তাম্রশাসন হইতেও পাইতেছি যে, যেখানে যেখানে তাঁহাদের নামোল্লেখ আছে, সেই সেই স্থানে পূর্ব্বে যেন অপর কাহারও নাম ছিল, সেই নাম চাঁচিয়া তুলিয়া "বিশ্বরূপের" নাম বসান। বোধ হয়, পূর্ব্বে মাধবসেনের নামই ছিল, তাঁহার স্থানে বিশ্বরূপের নাম হইয়াছে। হরিমিশ্র লিখিয়াছেন, 'লক্ষ্মণপুত্র কেশবসেন যবনের ভয়ে গৌড়রাজ্য ছাড়িয়া তাঁহাদের সহিত (কিছু দিন) বঙ্গ চালাইতে ছিলেন। এ সময় ব্রাহ্মণেরাও তথায় তিষ্ঠিতে পারেন নাই। অনন্তর সেনবংশে দনৌজামাধব প্রাদুর্ভূত হন। সকল নৃপতিই তাঁহার পদসেবা করিত। এই মহারাজের সভায় দ্বাবিংশতি-কুলোদ্ভূত নানাগুণসমাযুক্ত বহুসংখ্যক ব্রাহ্মণ আগমন করেন। পিতামহকেও হারাইবার অভিপ্রায়ে তিনি ধনদ্বারা ও রাজসম্মানদ্বারা ব্রাহ্মণগণের সম্বন্ধ নির্ণয় করিয়াছিলেন।'[১৪৬] এড়ুমিশ্রের খণ্ডিত পুথি হইতেও পাইয়াছি, রাজা কেশবসেন সৈন্যগণ, পিতামহ-প্রতিষ্ঠিত বিপ্রগণ ও অপরাপর স্বজনবর্গ সঙ্গে লইয়া এক রাজার নিকট গমন

মাধব সেন
বা
দনুজমাধব

(১৪৫) Journal of the Asiatic Society of Bengal 1896, pt. 1. p. 31.

(১৪৬) "তৎপুত্রঃ কেশবো রাজা গৌড়রাজ্যং বিহায় চ।
যস্মিং চাপ্যকরোদ্বঙ্গে যবনস্য ভয়ান্বিতঃ।
ন শক্নুবন্তি তে বিপ্রাস্তত্র স্থাতুং যথা পুনঃ॥
প্রাদুর্ভূতবদ্ধগাত্রা সেনবংশাদনন্তরম্।
দনৌজামাধবঃ সর্ব্বভূপৈঃ সেব্যপদাম্বুজঃ॥
এতৎ সভায়াং বহব আগতা ব্রাহ্মণাস্তদা।
নানাগুণসমাযুক্তাঃ দ্বাবিংশতিকুলোদ্ভবাঃ॥
ধনৈশ্চ রাজসম্মানৈঃ পিতামহজিগীষয়া।
সম্বন্ধঃ কৃতবাংশ্চ সর্ব্বৈ ভূধরপুঙ্গবাঃ॥" হরিমিশ্র।

করিয়াছিলেন। সেই বিখ্যাত নরপতি অতিশয় আদরপূর্ব্বক কেশবের সম্মাননা করিয়াছিলেন এবং তাঁহার অনুচর ও পারিষদ্‌বর্গের জীবিকার বন্দোবস্ত করিয়া দিয়াছিলেন। এক দিন প্রসঙ্গক্রমে সেই রাজা কেশবকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, পিতামহ রাজা বল্লালসেন ব্রাহ্মণগণের কিরূপ কুলাকুলাদি-নিয়ম স্থাপন করিয়াছেন। কেন, কোন্ সময়ে, কোথায় এই নিয়ম প্রচার করেন? তাঁহার কথা শুনিয়া কেশব বহুশাস্ত্রবিদ্ বিপ্র-প্রথাপারগ আপনার কুলপণ্ডিত এড়ুমিশ্রকে কুল-কাহিনী বর্ণনা করিতে আদেশ করেন।'[১৪৭] হরিমিশ্রকর্ত্তৃক দনৌজামাধবের পরিচয়স্থলে 'পিতামহজিগীষয়া' এবং এড়ুমিশ্রের 'পিতামহঃ কৃতী বল্লালসেনো নৃপঃ' ইত্যাদি প্রসঙ্গ হইতে এখন বেশ মনে হইতেছে, যাঁহার সভায় কেশব সদলবলে উপস্থিত হইয়াছিলেন, তিনিই বল্লালসেনের অন্যতম পৌত্র দনৌজামাধব হইতেছেন। আইন্-ই-অক্‌বরীতে এই নৃপতিই লক্ষ্মণসেনের পরবর্ত্তী মাধুসেন (মাধবসেন) নামে পরিচিত হইয়াছেন। ইহাতে মনে হয় যে, এই নৃপতির প্রকৃত নাম "মাধবসেন" ছিল। সম্ভবতঃ কুলগ্রন্থকারগণ অপর মাধব হইতে তাঁহাকে স্বতন্ত্র করিবার জন্য দনৌজামাধব বা দনুজমাধব নামে পরিচিত করিয়াছেন। ঘটকচূড়ামণির বঙ্গজকারিকা হইতে জানিতে পারি যে, লক্ষ্মণসেনের সমীকরণে গৃহীত পুরবসুর তৃতীয় কন্যার সহিত দনুজমাধবের বিবাহ হইয়াছিল।[১৪৮] হরিমিশ্র লিখিয়াছেন যে, এই দনুজমাধবের সভায় ৫০৮ জন ব্রাহ্মণ উপস্থিত হইয়াছিলেন, রাজা পণ্ডিতগণকে আহ্বান করিয়া তন্মধ্যে ধার্ম্মিক ও সৎপণ্ডিত বাছিয়া লইয়া সম্মানিত

(১৪৭) * * যন্নৃপং তং কেশবো ভূপতিঃ
সৌস্তৈর্বিপ্রগণৈঃ পিতামহকৃতৈরন্যৈশ্চ যুক্তো গতঃ।
তাং চক্রে নৃপতির্মহাদরতয়া সম্মানয়ন্ জীবিকাং
তদ্বর্গস্য চ তস্য চ প্রথমতশ্চক্রে প্রতিষ্ঠান্বিতঃ।
ক্ষ্মাপালঃ স চ কেশবং নরপতিং কিঞ্চিৎ প্রসঙ্গান্তরে
বাক্যং প্রাহ তদা পিতামহঃ কৃতী বল্লালসেনো নৃপঃ।
কীদৃগ্ বিপ্রকুলাকুলাদিনিয়মঃ কস্মাৎ কথং বা কৃতঃ
কেনোদ্যোগভরেণ বিপ্রনিকরং চক্রে তদাখ্যাহি মে॥
তং শ্রুত্বা কুলপণ্ডিতং কথয়িতুং তত্তজ্জগাদাদরাৎ
এড়ুমিশ্রমশেষশাস্ত্রমখিলং বিপ্রং প্রথাপারগম্।" (এড়ুমিশ্র)

ইহার পর এড়ুমিশ্রের পুথি খণ্ডিত থাকায় সমস্ত বিবরণ ঠিক জানা গেল না। সম্বন্ধ-নির্ণয় প্রভৃতি নানা গ্রন্থে এড়ুমিশ্রের নাম দিয়া যে সকল শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে, আমাদের সংগৃহীত মূল এড়ুমিশ্রের কারিকার সহিত তাহার সম্পূর্ণ পার্থক্য দৃষ্ট হয়। এই কারণ সেই সেই বচন কুলপণ্ডিত এড়ুমিশ্রের প্রকৃত বচন কি না, তাহাতে সন্দেহ আছে।

(১৪৮) "সন্তোষ কার্য্যবোধায় পশ্চাত্তীর্থত্রয়ায় চ।
মহত্রাজে দনুজায় মাধবায় বিশেষতঃ॥" (ঘটকচূড়ামণি)

করিয়াছিলেন।[১৪৯] ধ্রুবানন্দমিশ্রের মহাবংশ হইতে জানা যায় যে, এই দনুজমাধবের সভায় রাঢ়ীয় কুলীন ব্রাহ্মণদিগের ৩য়, ৪র্থ, ৫ম ও ৬ষ্ঠ এই চারিটি সমীকরণ হইয়াছিল, তন্মধ্যে ৩য় সমীকরণে ৪ জন, ৪র্থ সমীকরণে ৫ জন, ৫ম সমীকরণে ৫ জন এবং ৬ষ্ঠ সমীকরণে ১২ জন সমীকুলীন বলিয়া গণ্য হইয়াছিলেন। এই সমীকুলীনগণের মধ্যে জয়পাণি বন্দ্য, প্রিয়ঙ্করচট্ট এবং পূতিতুণ্ডবংশীয় হরি, নীলাম্বর, পীতাম্বর ও বাসুদেব—মোট এই ছয় জন বিশেষভাবে পূজিত হইয়াছিলেন।[১৫০]

এতদ্ব্যতীত তাঁহার সভায় বঙ্গজ-কায়স্থ-কুলীনগণেরও সমীকরণ হইয়াছিল। এই সমীকরণে রুদ্র গুহজ চণ্ডেশ্বর ও ভীম, শাক্রি গুহজ ভাণ্ডু, বনমালী বসুজ চাক্রি, রাম ঘোষজ চাক্রি, পুরবসুজ ভাক্রি, শাক্রি গুহজ তপন এবং শূলপাণি মিত্রজ তিলমিত্র—প্রথমে এই পাঁচ জন, তৎপরে শঙ্কর বসুজ নারায়ণ, বনমালী বসুজ মধু, কার্ণ্য ঘোষজ পুপি ও ভাস্কর এবং পীতাম্বর ঘোষজ দাঁযু এই পাঁচ জনে সমীকুলীন বলিয়া সম্মানিত হইয়াছিলেন।[১৫১] সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, দনুজমাধবের সভায় রাঢ়ীয় কুলীন ব্রাহ্মণদিগের চারি বার এবং বঙ্গজ কুলীন কায়স্থদিগের দুই বার সমীকরণ হইয়াছিল। দনুজমাধবের সভায় বঙ্গজ-কায়স্থকুলীনগণের যে সমীকরণ হইয়াছিল, তাহাই বঙ্গজ-কুলগ্রন্থে তৃতীয় সমীকরণ বলিয়া প্রসিদ্ধ হইয়াছে।

দনুজমাধবের সভায় রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণদিগের ৩য় সমীকরণে যাঁহারা উপস্থিত ছিলেন, তাঁহাদের কাহারও পুত্র তাঁহার ৬ষ্ঠ সমীকরণের সময় গৃহীত হইয়াছেন। এতদ্দ্বারা মনে হয় যে, রাজা দনুজমাধবের রাজ্যারম্ভকালে ৩য় সমীকরণ ও তাহার কিছুকাল পরে, অন্ততঃ ১৫।১৬ বর্ষ গত হইলে, ৬ষ্ঠ সমীকরণ হইয়া থাকিবে। এরূপ স্থলে দনুজমাধবের দীর্ঘ-রাজত্বেরই আভাস পাওয়া যাইতেছে।

মিন্‌হাজের বর্ণনা হইতে জানা যায় যে, মহম্মদ-ই-বখ্‌তিয়ার তিব্বত হইতে ফিরিয়া আসিয়া ১২০৫ খৃষ্টাব্দে মৃত্যুমুখে পতিত হন। এদিকে সূক্তিকর্ণামৃত হইতে উক্ত বর্ষে লক্ষ্মণসেনের ৩৭

(১৪৯) "অষ্টাধিকাঃ পঞ্চশতাঃ পুত্রাস্তেষাং মহাত্মনাম্ ।......
আহূয় পণ্ডিতান্ সর্ব্বান্ প্রযচ্ছতি মহীপতিঃ ।
মধ্যে সৎপণ্ডিতাশ্চ ধার্ম্মিকাণাং বিশেষতঃ ॥" (হরিমিশ্র)

(১৫০) বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস, ব্রাহ্মণকাণ্ড ১মাংশ রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ-বিবরণ (২য় সংস্করণ) ১৪৫-১৫৫ পৃষ্ঠায় বিস্তৃত পরিচয় দ্রষ্টব্য।

(১৫১) "চণ্ডেশ্বরশ্চ ভাণ্ডুশ্চ ভীমশ্চ গুহকাত্রয়ঃ ।
বসুশ্চাক্রিশ্চ ঘোষশ্চ বসুকো ভাক্রিকস্তথা ।
তপনস্তিলমিত্রশ্চ পঞ্চৈতে সমতাং গতাঃ ॥
নারায়ণশ্চ মধুকঃ পুপিভাস্কর এব চ ।
দাযুশ্চ ঘোষকশ্চৈব পঞ্চৈতে সমতাং গতাঃ ॥
ইতি দনুজসভায়াং ঘটকো ভারতীকৃতম্ ।" (দ্বিজবাচস্পতির সমীকরণকারিকা)

বর্ষের সন্ধান পাইতেছি। সম্ভবতঃ ঐ একই সময়ে অর্থাৎ ১২০৫-৬ খৃষ্টাব্দে বিজেতা ও বিজিত উভয়েই সংসার পরিত্যাগ করেন। আইন্-ই-অক্বরীতে লক্ষ্মণসেনের রাজ্যকাল ৭, বর্ষ মাত্র লিপিবদ্ধ হইয়াছে। সম্ভবতঃ ৩৭ অঙ্কের ৩ পড়িয়া ৭ রহিয়া গিয়াছে, উহা ৩৭ বর্ষই হইবে। কিন্তু তখনও সমস্ত লক্ষ্মণাবতীরাজ্য সম্যক্ ভাবে মুসলমান-শাসনাধীন হয় নাই। পূর্ব্বেই লিখিয়াছি যে, বখ্‌তিয়ারের মৃত্যুকালে (১২০৫ খৃষ্টাব্দে) তাঁহার অন্যতম প্রধান সঙ্গী মহম্মদ-ই-সেরাণ লখ্‌নোর ও বাহ্মনগরে সৈন্যপরিচালনা করিতেছিলেন। এই ঘটনার পর ৪।৫ বর্ষ পরে (১২০৯-১০ খৃষ্টাব্দে) আলীমর্দ্দন দেওকোটে আসিয়া শাসনভার গ্রহণ করেন। মিন্‌হাজ লিখিয়াছেন, আলীমর্দ্দনই সমস্ত লক্ষ্মণাবতী-রাজ্য আপনার এক ছত্রাধীন করিয়াছিলেন।[১৫২] কিন্তু তখনও কেশবসেন ও বিশ্বরূপ গৌড় বা রাঢ়ে থাকিয়া পিতৃরাজ্য উদ্ধারে চেষ্টা করিতেছিলেন। ১২০৯ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত তাঁহাদের রণকৌশলে মুসলমানেরা সমস্ত রাঢ়দেশ অধিকার করিতে সমর্থ হন নাই। তৎপরে কেশবসেন বঙ্গে আসেন। তৎকালে মাধবসেন পিতৃ-সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। বিশ্বরূপ ও কেশবসেনের তাম্রশাসনে তাঁহাদের নামাংশ যেমন চাঁচিয়া তোলার স্পষ্ট আভাস পাওয়া যায়, তাঁহাদের মাতৃনামস্থলেও ঐরূপ এক নাম তুলিয়া অপর নাম যেন বসান হইয়াছে। এরূপ স্থলে মনে হয় উক্ত তাম্রশাসনে পূর্ব্বে যাঁহার নাম ছিল, তাঁহার মাতা এবং বিশ্বরূপ ও কেশবসেনের মাতা এক ছিলেন না। এরূপ অবস্থায় মাধবসেনেরা দনুজমাধবকে আমরা কেশব ও বিশ্বরূপের বৈমাত্রেয় ভ্রাতা বলিয়াই মনে করি। এই জন্যই কুলগ্রন্থে বল্লালসেন দনুজমাধব ও কেশব উভয়ের পিতামহ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইলেও কোথাও উভয়ে সহোদর ভাই বলিয়া পরিচিত হন নাই। এড়ুমিশ্রের কারিকা হইতে মনে হয় যে, কেশবসেন যখন পূর্ব্ববঙ্গে গমন করেন, সেই সময়ে বহু কুলীন ও কুলাচার্য্য তাঁহার সহিত বঙ্গবাসী হইয়াছিলেন। রাঢ়াগত কুলাচার্য্যের নিকট বল্লালী কুলবিধি অবগত হইয়াই দনুজমাধব আবার নূতন করিয়া কুলবিধির সংস্কার করেন।[১৫৩] তিনিও একজন সামান্য ব্যক্তি ছিলেন না। তিনিও সেনবংশের গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য প্রাণপণে মুসলমানদিগের সহিত যে যুদ্ধ চালাইয়া ছিলেন, কেশব ও বিশ্বরূপের তাম্রলেখবর্ণিত 'গর্গযবনান্বয়প্রলয়কালরুদ্র' এই বিশেষণ দ্বারাই তাহা প্রতিপন্ন হইতেছে। বটুভট্টের 'দেববংশ' নামক বংশাখ্যান হইতেও পাওয়া যায় যে, মাধব পৈতৃক-রাজ্য উদ্ধার করিবার জন্য বহুদিন বরেন্দ্রে যুদ্ধ চালাইয়া ছিলেন। দনুজমাধব, কেশব ও বিশ্বরূপ লক্ষ্মণসেনের এই তিন পুত্রই তাঁহার বিভিন্ন মহিষীর গর্ভজাত, সুতরাং তাঁহাদের মধ্যে পরস্পর একতা রক্ষা করিয়া চলা সহজ ছিল না। মুসলমান-উপদ্রবের সময় পরস্পরে একতা থাকিলেও

(১৫২) "Ali Mardan proceeded to Diwkot and assumed the Government and brought *the whole of the country of the Lakmanawati under his sway.*" Raverty. Tabakat-i-Nasiri. p. 578.

(১৫৩) বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস, ব্রাহ্মণকাণ্ড, ১মাংশ, (২য় সংস্করণ) ১৫২—১৫৩ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

সম্ভবতঃ উপদ্রব দূর হইবার পর তাঁহাদের মধ্যে পরস্পর গৃহবিবাদ হওয়া যেন কতকটা স্বাভাবিক। তিন জনই লক্ষ্মণসেনের উপযুক্ত বীরপুত্র, তিন জনেই মুসলমানের হাত হইতে গৌড় রাজ্য উদ্ধার করিবার জন্ত যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছেন, তিন জনের বাহুবলেই মুসলমান-সৈন্ত বঙ্গদেশে পদার্পণ করিতে সমর্থ হয় নাই। এ অবস্থায় তিন জনেই যে পৈতৃক আধিপত্য লইয়া একটু গোলযোগ করিবেন, তাহা নিতান্ত অসম্ভব নহে। এই গোলযোগের সময় ধার্ম্মিক মাধবসেন পিতৃরাজ্য পরিত্যাগ করিয়া তীর্থযাত্রাপ্রসঙ্গে হিমালয়ের কেদারনাথে যাত্রা করিয়াছিলেন। কেদারখণ্ডে (বর্ত্তমান কমাউনের) আল্‌মোরা নগরস্থ যোগেশ্বর-মন্দিরে অত্মাপি মাধবসেনের তাম্রশাসন রহিয়াছে। এখানকার বলেশ্বর-মন্দিরে রক্ষিত ১১৪৫ (১২২৩ খৃষ্টাব্দে) উৎকীর্ণ তাম্রশাসন হইতে জানা যায় যে, প্রসিদ্ধ ভট্টনারায়ণবংশীয় 'বঙ্গজ ব্রাহ্মণ' রুদ্রশর্ম্মা উক্ত তাম্র-শাসন পাইয়াছিলেন।[১৫৪] এই তাম্রশাসন হইতেই জানা যাইতেছে যে, রাঢ়ীয় কায়স্থগণ যেমন বঙ্গে গিয়া বাস করিয়া 'বঙ্গজ কায়স্থ' বলিয়া অভিহিত হইয়াছেন, রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণসন্তানগণও কেহ কেহ বঙ্গে বাস করিয়া পরে 'বঙ্গজ ব্রাহ্মণ' বলিয়াও পরিচিত হইয়াছিলেন। যাহা হউক মহারাজ মাধব যে একজন অতিশয় বিপ্রভক্ত, রাজনীতিজ্ঞ, সমাজসংস্কারক ও ধার্ম্মিক নৃপতি ছিলেন তাহাতে আর সন্দেহ নাই। তিনি যে সৎপণ্ডিত ও ধার্ম্মিক ব্রাহ্মণদিগকে বহু তাম্রশাসন দ্বারা বহু গ্রাম দান করিয়াছিলেন, কেশব ও বিশ্বরূপের তাম্রলেখ হইতেই তাহা বুঝা যাইতেছে। তিনি ব্রাহ্মণদিগকে দান করিবার উদ্দেশ্যে যে বহু সংখ্যক তাম্রশাসন প্রস্তুত করাইয়া ছিলেন, এবং পরে সেই সকল তাম্রশাসনের কএকখানি কেশব ও বিশ্বরূপ উভয়েই ব্যবহার করিয়া-ছিলেন, তাহা ইদিলপুর ও মদনপাড় হইতে আবিষ্কৃত উভয়ের তাম্রশাসন হইতেই প্রতিপন্ন হইয়াছে। কমাউনের বলেশ্বর-তাম্রলিপি হইতে মনে হয় যে, ১২২৩ খৃষ্টাব্দে বা তাহার কিছু পূর্ব্বেই মাধবসেন হিমালয়ে মহাপ্রস্থান করিয়াছিলেন।[১৫৪]

কেশবসেন

পিতার জীবদ্দশায় কেশবসেন গৌড় বা বরেন্দ্রের শাসনকর্ত্তা ছিলেন; ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের ষড়-যন্ত্রে মহম্মদ-ই-বখ্‌তিয়ারের হস্তে তিনি গৌড়রাজধানী অর্পণ করিতে বাধ্য হইলেও পরে তিনি লখ্‌নোর বা রাঢ় এবং যাজনগর বা উৎকলে থাকিয়া পিতৃরাজ্য উদ্ধার করিবার জন্য দীর্ঘকাল চেষ্টা করিয়াছিলেন। এই সকল কারণে ধর্ম্মপ্রাণ মাধবসেন তাঁহাকেই বঙ্গাধিপত্য দিয়া গিয়া থাকিবেন।[১৫৫] কেশবসেনও নিজ

(১৫৪) E. Atkinson's Kumaon, p. 516.

(১৫৫) কেশবসেনের ইদিলপুর-তাম্রশাসনে ও বিশ্বরূপসেনের মদনপাড়-তাম্রশাসনের প্রশস্তি অংশে শ্লোকে শ্লোকে মিল আছে, তবে ইদিলপুরের তাম্রশাসনে তিনটি অতিরিক্ত শ্লোক থাকায় এই শ্লোকাধিক্য বা পরবর্ত্তী যোজনা মনে করিয়া কেহ কেহ কেশবকে বিশ্বরূপের পরবর্ত্তী বলিয়া মনে করেন, কিন্তু তৎপিতা লক্ষ্মণসেনের তপনদীঘী ও মাধাইনগরের তাম্রশাসন হইতেও এইরূপ শ্লোকের ন্যূনাধিক্য লক্ষিত হয়। বিশেষতঃ প্রিন্সেপ হইতে অধুনাতন সকল পুরাবিদ্ যখন মনে করিতেছেন যে কি কেশব কি বিশ্বরূপ উভয়ের তাম্রশাসনই যখন মাধবসেনের সময় উৎকীর্ণ হইয়াছিল, তখন শ্লোকের কম বেশ ধরিয়া কাহাকেও অগ্রপশ্চাৎ করা চলে না।

বাহুবলে মুসলমানের খরতর দৃষ্টি হইতে বঙ্গরাজ্য রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। মিন্‌হাজ লিখিয়াছেন যে, যাজনগর বা উৎকলের উত্তরাংশ লক্ষ্মণসেনের অধিকারভুক্ত ছিল। সম্ভবতঃ কেশবসেন উৎকলের সেই পিতৃ-অধিকার বজায় রাখিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, তাই তাঁহার ইদিলপুর-তাম্রশাসনে 'অশ্বপতি গজপতি নরপতি রাজত্রয়াধিপতি' ইত্যাদি মহাসম্মানসূচক উপাধি পাইতেছি।

কেশবসেন বেশী দিন বঙ্গরাজ্য শাসন করিতে পারিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয় না। তাঁহার ইদিলপুর-শাসন তাঁহার ৩য় রাজ্যাঙ্কে উৎকীর্ণ হইয়াছে। ঐই তাম্রশাসন দ্বারা তিনি বৎস গোত্র বনমালি-দেবশর্ম্মার পুত্র ঈশ্বর দেবশর্ম্মাকে বিক্রমপুরের অন্তর্গত শঙ্করপাসার নিকটবর্ত্তী ক্ষত্রকাঠী গ্রাম দান করেন।

বিশ্বরূপসেন

কোটালিপাড় পরগণার অন্তর্গত মদনপাড় হইতে আবিষ্কৃত বিশ্বরূপসেনের তাম্রশাসনখানি উক্ত ঈশ্বর দেবশর্ম্মার অপর ভ্রাতা বিশ্বরূপ দেবশর্ম্মাকে প্রদত্ত হইয়াছে,—প্রদত্ত গ্রামের নাম পিঞ্জকাঠী। এই পিঞ্জকাঠী ক্ষত্রকাঠী গ্রামের নিকটবর্ত্তী কোন গ্রাম হওয়াই সম্ভব। মদনপাড়-তাম্রলেখ বিশ্বরূপের ১৪শ রাজ্যাঙ্কে উৎকীর্ণ হইয়াছিল। এরূপ স্থলে বিশ্বরূপসেন কিছু বেশী দিন রাজত্ব করিয়াছিলেন বলিয়াই বোধ হয়।

আবুল ফজলের আইন্-ই-অক্‌বরীতে মাধবসেন যেমন 'মাধুসেন' নামে এবং কেশবসেন 'কেশু' নামে পরিচিত হইয়াছেন, বিশ্বরূপসেনও সেইরূপ সম্ভবতঃ 'বিশুসেন' নামেই লিখিত হইয়াছিল। অবশেষে পাঠের বিকৃতিতে 'বিশুসেন' কোন কোন পুথিতে কেবল 'শুসেন' নামে অভিহিত হইয়াছেন। মাধব ও কেশবের ন্যায় বিশ্বরূপও যে একজন মহাবীর ও ব্রাহ্মণভক্ত এবং 'অশ্বপতি গজপতি নরপতি রাজত্রয়াধিপতি' ইত্যাদি মহাসম্মানসূচক উপাধিতে ভূষিত ছিলেন, তাহা তাঁহার মদনপাড়-তাম্রলেখ হইতেই প্রতিপন্ন হইয়াছে।

লক্ষ্মণনারায়ণ

আইন্-ই-অক্‌বরীর কোন কোন হস্তলিপিতে 'বিশুসেন' বা 'শুসেনের' পর এই বংশীয় 'নারায়ণ' নামে রাজার নাম পাওয়া যায়। কুলগ্রন্থেও কেশবের পুত্র লক্ষ্মণ-নারায়ণের উল্লেখ আছে।[১৫৬] আধুনিক কোন কোন লেখক এই লক্ষ্মণনারায়ণকেই লাক্ষ্মণেয় নামে পরিচিত করিয়াছেন এবং ইঁহারই সময় নদীয়া মুসলমান-করলিত হইয়াছিল বলিয়া মনে করেন। বাস্তবিক তাঁহাদের এ ধারণা সমীচীন নহে। ১ম লক্ষ্মণসেনের সময়েই যে বখ্‌তিয়ার নদীয়া অধিকার করেন, তাহাতে সন্দেহ করিবার কোন কারণ নাই। আইন্-ই-অক্‌বরী মতে, নারায়ণ ১০ বর্ষ মাত্র রাজত্ব করেন।

মধুসেন

নারায়ণের পরে সেন বংশীয় মধুসেন নামক এক পরাক্রান্ত নৃপতির উল্লেখ পাই। বেঙ্গল গবর্মেণ্ট সংগৃহীত একখানি প্রাচীন সংস্কৃত পুথি হইতে জানা যায় যে, "পরম ভট্টারক মহারাজাধিরাজ পরম সৌগত মধুসেন" ১১৯৪

(১৫৬) "তার সুত নারায়ণ লক্ষ্মণ সে হয়।" (বৈদ্যকুলগ্রন্থ)

শকে বা ১২৭২ খৃষ্টাব্দে বঙ্গে আধিপত্য করিতেছিলেন।[১৫৭] এই মধুসেনের পরিচয় হইতে বুঝিতেছি যে সেনবংশ বৌদ্ধসমাচ্ছন্ন পূর্ব্ববঙ্গে গিয়া কিছু কাল পরে বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। সেনবংশ প্রথমে পরম মাহেশ্বর বা গোঁড়া শৈব ছিলেন। লক্ষ্মণসেন মধ্যে বৈষ্ণব হইয়া পড়িয়া ছিলেন। কিন্তু ইদিলপুর ও মদনপাড় হইতে আবিষ্কৃত তৎপুত্রের তাম্রশাসন হইতে জানিতে পারি যে, নদীয়া-পরিত্যাগের পর পূর্ব্ববঙ্গে গিয়া লক্ষ্মণসেন "পরম সৌর" বলিয়া পরিচিত হইয়াছিলেন। বলা বাহুল্য মাধব, কেশব ও বিশ্বরূপ এই তিন জনেই শ্রুতিপাঠককে ভূমিদান করিলেও স্ব স্ব তাম্রশাসনে 'পরমসৌর' বলিয়াই অভিহিত হইয়াছেন। সম্ভবতঃ এ সময় তাঁহারা কোন প্রকার রাজনীতিক কারণে পালরাজ-সম্মানিত সৌর ব্রাহ্মণগণের নিকট দীক্ষিত হইয়া থাকিবেন। পালবংশ-প্রসঙ্গে লিখিয়াছি যে, সৌর ব্রাহ্মণগণ কেবল মন্ত্রিত্ব বা সেনাপতিত্ব বলিয়া নহে, বৌদ্ধ পাল-নৃপতিগণের পৌরোহিত্যও করিতেন। সম্ভবতঃ পালবংশধ্বংসের পর ঐ সকল ব্রাহ্মণ পূর্ব্ববঙ্গে আসিয়া পূর্ব্ববৎ কেহ কেহ সম্ভ্রান্ত বৌদ্ধগণের পৌরোহিত্য গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং কিছুকাল সৌর ও সৌগত সংস্রবে থাকিয়া ঐরূপ বৌদ্ধ পুরোহিত ও বৌদ্ধ-প্রজা সাধারণের প্রভাবে অবশেষে সেনবংশও 'সৌগত' বলিয়া পরিচিত হইয়াছিলেন। মনে হয়, পূর্ব্ববঙ্গের বৌদ্ধ সমাজের আনুকূল্যে সেনবংশ প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী মুসলমানগণের সহিত বিরোধ করিয়াও বঙ্গাধিপত্য রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। পূর্ব্বে লিখিয়াছি যে, মালদহ অঞ্চলের ধর্ম্মী বা বৌদ্ধগণের ষড়যন্ত্রে সেখানকার সেনাধিকার গিয়াছিল, পরবর্ত্তী সেনবংশ তাহা বিস্মৃত হন নাই। তাই সেনবংশ বঙ্গে আসিয়া তাঁহাদের বিপক্ষতাচরণ না করিয়া বরং তাঁহাদের সহিত এক যোগে রাজ্যরক্ষায় তৎপর হইয়াছিলেন। ধর্ম্ম-সম্প্রদায় যে আশায় প্রথমে মুসলমান ডাকিয়া আনিয়াছিলেন, তাঁহাদের সে উদ্দেশ্য সিদ্ধ না হওয়ায়, পরে সেনবংশের পক্ষাবলম্বন করিয়া থাকিবেন। যাহা হউক, যে সেনবংশ চিরদিন একান্ত ব্রাহ্মণভক্ত বলিয়া পরিচিত ছিলেন, এখন তাঁহারা সৌগত বা বৌদ্ধ ধর্ম্মাবলম্বী হওয়ায় তাঁহারা যে সেনবংশ-প্রতিষ্ঠিত ব্রাহ্মণ-সমাজের বিদ্বেষভাজন হইবেন, তাহা যথেষ্ট সম্ভবপর। এই কারণেই ব্রাহ্মণ কুলাচার্য্যগণ পরবর্ত্তী সেন-নৃপতিগণের নামোল্লেখ করেন নাই। পূর্ব্বেই লিখিয়াছি যে, কমারাজ পুরুষোত্তমসিংহ ও সপাদলক্ষপতি অশোকচল্লের যত্নে গয়া অঞ্চলে আবার বৌদ্ধধর্ম্ম নবীন ভাবে প্রতিষ্ঠিত হইতেছিল, সমসাময়িক শিলালিপি হইতেই তাহা প্রমাণিত হইয়াছে। ঐ সময়েই পূর্ব্ববঙ্গে 'মহারাজাধিরাজ পরম সৌগত মধুসেন' বিরাজ করিতে ছিলেন। মনে হয় ঐ সময়ের বৌদ্ধধর্ম্মপ্রতিষ্ঠায় সেনবংশধর মধুসেনও সহায় হইয়াছিলেন। এই কারণেও হয়ত গয়া হইতে আবিষ্কৃত তৎকালীন বৌদ্ধলিপিতে 'লক্ষ্মণসেন দেবপাদানামতীতরাজ্যে' ব্যবহৃত হইয়াছে। তৎকালে নালন্দা, বিহার প্রভৃতি স্থান মুসলমান-অধিকারভুক্ত হইলেও উত্তরমগধ বা গয়াক্ষেত্র ও তৎপার্শ্ববর্ত্তী জনপদ তখনও মুসলমান-

(১৫৭) মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদশাস্ত্রী মহাশয় এই সংবাদ দিয়া ও উক্ত পুথিখানি দেখাইয়া কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ করিয়াছেন।

শাসনাধীন হয় নাই। তখনও ঐ সকল স্থান স্বাধীন ছিল। সম্ভবতঃ পূর্ব্বতন সেনরাজবংশের অধীন সামন্তরাজগণ-দ্বারাই শাসিত হইতে ছিল। বলিতে কি, ঐ সময় নির্ব্বাণোন্মুখ বৌদ্ধধর্ম্ম সমস্ত প্রাচ্যভারতে যেন অল্প দিনের জন্য দেখা দিয়া ছিল। হয়ত এ সময় সাধারণ বৌদ্ধ-সমাজকেও তজ্জন্য মুসলমানের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিতে হইয়াছিল। এ সময়ে রাঢ় ও বরেন্দ্রের অধিকাংশ বাণিজ্যকেন্দ্র বা শ্রেষ্ঠ নগরসমূহে মুসলমান-আধিপত্য সুপ্রতিষ্ঠিত হইলেও তখনও স্থানে স্থানে দূর ও দুর্গমপল্লী মধ্যে সেনবংশের আত্মীয় স্বজন বা সামন্তগণ স্বাধীনভাবেই রাজত্ব করিতেছিলেন, তাঁহাদের প্রজাগণের মধ্যে তখনও অধিকাংশই বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন। তাই খৃষ্টীয় ১৩শ শতাব্দীর শেষ ও ১৪শ শতাব্দীর প্রথম ভাগে যখন মুসলমানেরা প্রকৃত প্রস্তাবে সমগ্র রাঢ় ও বরেন্দ্রে আধিপত্য-বিস্তারের চেষ্টা করেন, তখন বৌদ্ধ প্রজাসাধারণের সহিত তাঁহাদের যথেষ্ট সংঘর্ষ উপস্থিত হইয়াছিল। বলিতে কি, ঐ সময়ে মুসলমান-অত্যাচারে সামন্তরাজগণের পরাভবের সহিত বৌদ্ধ শ্রমণগণ, নেপাল, মিথিলা, পূর্ব্ববঙ্গ ও কলিঙ্গ আশ্রয় করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। রাঢ় বা বরেন্দ্র-পরিত্যাগকালে তাঁহারা তাঁহাদের প্রিয়তম যে সকল ধর্ম্মপুস্তক সঙ্গে লইয়া গিয়াছিলেন, উক্ত স্থানসমূহ হইতে তাহার নিদর্শন বাহির হইয়াছে। ঐ সময়ের রাঢ়ীয় ও বারেন্দ্র ব্রাহ্মণদিগের কুলগ্রন্থ পাঠ করিলে মনে হইবে যে, তৎকালে অনেক সম্ভ্রান্ত ব্রাহ্মণও মুসলমানরাজ-দরবারে প্রতিপত্তি লাভ করিতে ছিলেন। সম্ভবতঃ ঐ সকল ব্রাহ্মণ ও মুসলমান-রাজপুরুষগণের চেষ্টায় রাঢ় ও বরেন্দ্র হইতে বৌদ্ধ শ্রমণেরা সম্যক্ বিতাড়িত বা উৎসাদিত হইয়াছিল। তাই প্রত্যেক বাণিজ্যকেন্দ্রে ও নগরে মুসলমান-প্রভাবে এবং নগর হইতে সুদূর পল্লীমধ্যে ব্রাহ্মণ-প্রভাবে প্রকাশ্য বৌদ্ধপ্রাধান্য বা বৌদ্ধধর্ম্ম ক্রমে বিলুপ্ত হইল—প্রকাশ্য চিহ্নমাত্র রহিল না। যাহা বা রহিল, তাহা প্রচ্ছন্নভাবে বা নামান্তরপরিগ্রহ করিয়া জীবিত রহিল। পূর্ব্ববঙ্গে যে বহুসংখ্যক মুসলমান দেখা যায়, তাঁহাদের অধিকাংশই সেই প্রাচীন বৌদ্ধ-জন সাধারণের বংশধর বলিয়াই মনে হয়।

পরম সৌগত মহারাজ মধুসেনের রাজত্বকালে বৌদ্ধ বিদ্বেষী অনেক ব্রাহ্মণসন্তান বিরক্ত হইয়া বঙ্গরাজসভা পরিত্যাগ করিয়া আবার রাঢ়দেশে চলিয়া আসেন। মুসলমান-ঐতিহাসিক জিয়াউদ্দীন্ বরণীর তারিখ্-ই-ফিরোজশাহী নামক গ্রন্থে দনুজরায় নামে সোণার গাঁওর এক পরাক্রান্ত নৃপতির সন্ধান পাই। পূর্ব্বোক্ত সেনরাজগণের সহিত ইঁহার কিরূপ সম্বন্ধ ছিল, তাহা জানা যায় নাই। কৃত্তিবাস তাঁহার রামায়ণে আত্মপরিচয়-দানকালে এই দনুজরায়কেই সম্ভবতঃ বেদানুজ নামে উল্লেখ করিয়া থাকিবেন। উক্ত মুসলমান-ইতিহাসে লিখিত আছে যে, প্রায় ১২৮০ খৃষ্টাব্দে দিল্লীশ্বর বল্‌বন্ তুঘরিল তুঘান্ খাঁকে শাসন করিবার জন্য যখন বঙ্গে আগমন করেন, তৎকালে দনুজরায় জলপথে সম্রাট্‌কে সাহায্য করিয়াছিলেন। আবুল-ফজল এই দনুজরায়কেই সম্ভবতঃ শেষ সেনবংশীয় নৃপতি 'নৌজে' নামে উল্লেখ করিয়াছেন। সম্ভবতঃ এই দনুজরায়ের পরই সুবর্ণগ্রাম মুসলমান-অধিকারভুক্ত হইয়াছিল। মুসলমান-ইতিহাস হইতে জানিতে পারি যে,

দনুজরায়

১৩৩০ খৃষ্টাব্দে মহম্মদ তোগলক সমস্ত পূর্ব্ববঙ্গ অধিকার করেন। তাঁহার সময়ে বঙ্গরাজ্য লক্ষ্মণাবতী, সপ্তগ্রাম এবং ঢাকা সহ সুবর্ণগ্রাম—এই তিন প্রদেশে বিভক্ত ছিল। ইহারই ৮ বর্ষ পরে ফখর্-উদ্দীন্ মুবারকশাহ সুবর্ণগ্রাম অধিকার করিয়া দিল্লীশ্বরের বিরুদ্ধে স্বাধীনতা ঘোষণা করিয়াছিলেন্। তাঁহারই যত্নে হিন্দুমুসলমানের মিলন হইয়াছিল এবং তৎকর্ত্তৃক পূর্ব্ববঙ্গের অনেক হিন্দু জমিদার সম্মানিত হইয়াছিলেন। এই সময় যাঁহারা তাঁহার পক্ষাবলম্বন করিয়াছিলেন, তাঁহারা কতকটা স্বাধীন ভাবেই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভূখণ্ড শাসন করিতেছিলেন। ইহারই কিছুকাল পরে বিক্রমপুরে আর এক 'সেন' উপাধিধারী বল্লালসেনের সন্ধান পাওয়া যায়।

২য় বল্লালসেন বা পোড়ারায়

কোন কোন আধুনিক ঐতিহাসিক তাঁহাকে পূর্ব্বতন সেনবংশজাত বলিয়া অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু এই ২য় বল্লালের সহিত পূর্ব্বতন সেনবংশের কোন প্রকার সম্বন্ধের আভাস পাওয়া যায় না। বৈদ্যকুল-গ্রন্থে তিনি 'বৈশ্বানর-কুলোদ্ভূত' বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন। এদিকে মুসলমান-ঐতিহাসিকগণ 'নৌজে' বা 'দনুজরায়' হইতেই সেনবংশের অবসান স্বীকার করিয়াছেন। এরূপ স্থলে এই ২য় বল্লালকে আমরা ভিন্ন জাতীয় ও ভিন্ন বংশজাত বলিয়াই মনে করি। অনেকেই লিখিয়াছেন যে, তিনি বৈদ্য জাতীয় ও ১৩০০ শকে বা ১৩৭৮ খৃষ্টাব্দে বিদ্যমান ছিলেন। বৈদ্যসমাজের মধ্যে সামাজিক মর্য্যাদায় হীন থাকায় তিনি অনেক সম্ভ্রান্ত কুলীন বৈদ্যের সহিত সম্বন্ধ স্থাপনের চেষ্টা করিয়াছিলেন। বৈদ্যসমাজ-সংস্কারে তাঁহার যথেষ্ট মনোযোগ ছিল, তজ্জন্য সমস্ত পূর্ব্ববঙ্গে তিনি বিশেষ প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন। প্রসিদ্ধির সঙ্গে পরবর্ত্তী কালে গৌড়াধিপ সেনবংশ-তিলক বল্লালসেন সম্বন্ধীয় অনেক কথা কিংবদন্তীর মূলে এই ২য় বল্লালের স্কন্ধে আরোপিত হইয়াছে। বিশেষতঃ যে বিক্রমপুর হইতে বল্লালসেন ও লক্ষ্মণসেনের অভ্যুদয়, আবার সেই স্থানেই তাঁহাদের বহুকাল পরে বৈদ্য বল্লালের অভ্যুদয় হইয়াছিল বলিয়া পরবর্ত্তী কালে প্রকৃত ইতিহাসানভিজ্ঞ নানা কুলগ্রন্থকারের হস্তে গৌড়াধিপ সেনবংশীয় নৃপতিগণও বৈদ্য বা অম্বষ্ঠ বলিয়া অভিহিত হইয়াছেন। সেনোপাধিধারী বৈদ্য বল্লালের প্রভাব হেতুই যে, এরূপ প্রবাদ ও ধারণা সাধারণের হৃদয়ে বদ্ধমূল হইয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। এই স্বাধীনচেতা ২য় বল্লাল সমাজসংস্কার ও দেবদ্বিজভক্ত ছিলেন বলিয়া তিনি মুসলমানদিগকে ঘৃণার চক্ষেই দেখিতেন, তজ্জন্যই মুসলমানদিগের সহিত তাঁহার বিরোধ উপস্থিত হয়। তাঁহার সহিত বাবা আদম্ নামক ফকিরের যুদ্ধসম্বন্ধীয় প্রবাদ বিক্রমপুর অঞ্চলে আজও শুনিতে পাওয়া যায়। বাবা আদম্ বহুসংখ্যক দলবল লইয়া তাঁহাকে আক্রমণ করিবার চেষ্টা করেন, ২য় বল্লাল যুদ্ধ-সজ্জা করিয়া তাঁহার উপযুক্ত শাস্তিবিধান করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছিলেন। তিনি যুদ্ধ-যাত্রাকালে সঙ্গে একটি পারাবত লইয়া যান এবং পুরমহিলাগণকে বলিয়া যান যে, যদি এই পারাবত ফিরিয়া আসে, তাহা হইলে আমার পরাজয় জানিবে ও তোমরা সকলে অগ্নিকুণ্ডে প্রাণ-বিসর্জ্জন করিয়া স্ব স্ব কুলমান-রক্ষা করিবে। কিন্তু সেই যুদ্ধে ২য় বল্লালের জয় লাভ হইলেও তিনি রণক্লান্তি দূর করিবার জন্য যখন সরোবরে নামিয়া গা ধুইতেছিলেন, সেই

সময় ঘটনাক্রমে তাঁহার পারাবতটী রাজপাটী অভিমুখে উড়িয়া আসে। পারাবত-দর্শনে পুরমহিলাবর্গ সকলেই অগ্নিকুণ্ডে আত্মবিসর্জ্জন করেন। বল্লাল তাড়াতাড়ি রাজবাটীতে আসিয়া সেই শোচনীয় কাণ্ড অবলোকন করিয়া ক্ষোভে ও দুঃখে সেই অগ্নিকুণ্ডে ঝম্প প্রদান করিলেন। তাঁহার ইহলোক-পরিত্যাগের সহিত বিক্রমপুর মুসলমান-শাসনাধীন হইল।

সেনরাজগণের উপাধি ও বিদ্যাবত্তা

সেনরাজগণের শিলালেখ ও তাম্রশাসন হইতে প্রত্যেক সেন-নৃপতির এক একটী বিশেষ উপাধি জানিতে পারা যায়, যথা—মহারাজ বিজয়সেন-দেবের বৃষভশঙ্করগৌড়েশ্বর, তৎপুত্র বল্লালসেনদেবের নিঃশঙ্ক-শঙ্করগৌড়েশ্বর, তৎপুত্র লক্ষ্মণসেনদেবের মদনশঙ্কর-গৌড়েশ্বর, তৎপুত্র কেশবসেনদেবের অসহ্যশঙ্কর-গৌড়েশ্বর এবং বিশ্বরূপসেনদেবের বৃষভাঙ্কশঙ্কর-গৌড়েশ্বর। সেনরাজগণ কেবল যে রাজ্যশাসন ও যুদ্ধবিগ্রহ লইয়াই থাকিবেন, তাহা নয়। তাঁহারা যেমন বিদ্যানুরাগী ও পণ্ডিতগণের আশ্রয়স্থল ছিলেন, সেইরূপ প্রত্যেকে উপযুক্ত শাস্ত্রালোচনা করিতেন এবং সুকবি বলিয়া প্রসিদ্ধ হইয়াছিলেন। লক্ষ্মণসেনের সমসাময়িক মহামাণ্ডলিক শ্রীধরদাসের সদুক্তিকর্ণামৃতে লক্ষ্মণসেন, মাধবসেন, কেশবসেন প্রভৃতির সুললিত কবিতা উদ্ধৃত হইয়াছে।

সেনবংশের জাতিনির্ণয়

সেনবংশের প্রকৃত জাতি লইয়া বহুদিন হইতে তর্ক-বিতর্ক চলিতেছে। কেহ বলেন, সেনবংশ বিশুদ্ধ ক্ষত্রিয়, কেহ বলেন বৈদ্য, আবার কেহ বলেন কায়স্থ। পূর্ব্বেই লিখিয়াছি, বিক্রমপুরের শেষ হিন্দুনৃপতি ২য় বল্লাল জাতিতে বৈদ্য এবং তাঁহার প্রভাবের কথা পূর্ব্ববঙ্গে প্রচলিত থাকায় সেনবংশের বৈদ্যত্ব-প্রবাদ প্রচলিত হইয়া পড়িয়াছে। তদনুসারে আধুনিক কুলগ্রন্থকারেরা কেহ কেহ সেনবংশকে বৈদ্য বা অম্বষ্ঠ বলিয়াই স্থির করিয়াছেন, কিন্তু সেনরাজগণ স্ব স্ব শিলালেখ ও তাম্রশাসনে কোথাও বৈদ্য বা অম্বষ্ঠ বলিয়া পরিচিত হন নাই। তাঁহাদের সমসাময়িক প্রশস্তি ও তাম্রশাসনসমূহে তাঁহারা ব্রহ্মক্ষত্রিয় বা কর্ণাটক্ষত্রিয় এবং চন্দ্রবংশোদ্ভব বলিয়াই পরিচিত হইয়াছেন। বিজয়সেনের দেওপাড়া-শিলালিপিতে লিখিত আছে—'অমরস্ত্রীগণের অবিরত রতিকলার সাক্ষিগণের বংশে উভয় কুলে কীর্ত্তিমান্ বীরসেন প্রভৃতি দাক্ষিণাত্য নৃপতিগণ জন্মগ্রহণ করেন। যাঁহাদের চরিত্রানুচিন্তার পরিচয়সূচক সূক্তির মধুধারা বিশ্ববাসিগণের শ্রবণপরিসর আমোদিত করিয়া পরাশর-নন্দন ব্যাসের দ্বারা প্রণীত হইয়াছে। সেই সেনবংশে প্রতিপক্ষ শত শত যোদ্ধৃবর্গের উৎসাদন-কারী ও ব্রহ্মক্ষত্রিয়দিগের কুলের শিরোমাল্যস্বরূপ ব্রহ্মবাদী সামন্তসেন জন্মগ্রহণ করেন।'[১৫৮]

(১৫৮) "বংশে তস্যামরস্ত্রীবিততরতকলাসাক্ষিণো দাক্ষিণাত্য-
ক্ষোণীন্দ্রৈর্বীরসেনপ্রভৃতিভিরভিতঃ কীর্ত্তিমদ্ভির্বভূবে।
যচ্চারিত্রানুচিন্তাপরিচয়শুচয়ঃ সূক্তিমাধ্বীকধারাঃ
পারাশর্য্যেণ বিশ্বশ্রবণপরিসরপ্রীণনায় প্রণীতাঃ ॥
তস্মিন্ সেনান্ববায়ে প্রতিসুভটশতোৎসাদনব্রহ্মবাদী
স ব্রহ্মক্ষত্রিয়াণামজনি কুলশিরোদাম সামন্তসেনঃ।"
(বিজয়সেনের দেওপাড়ালিপি ৪-৫ শ্লোক)

উদ্ধৃত পরিচয় হইতে বেশ বুঝা যাইতেছে যে, যে বীরসেন প্রভৃতি দাক্ষিণাত্যনৃপতিগণের পরিচয় স্বয়ং ব্যাসদেব কীর্ত্তন করিয়া গিয়াছেন, সেই ব্রহ্মক্ষত্রিয়গণের বংশে সামন্তসেন জন্মগ্রহণ করেন। এদিকে কেরলবাসী লক্ষ্মীদাস তাঁহার 'শুকসন্দেশ' গ্রন্থে কেরলকে 'ব্রহ্মক্ষত্রং জনপদং' বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। কেরল পৌরাণিক সহ্যাদ্রিখণ্ডের অন্তর্গত। স্কন্দপুরাণীয় সহ্যাদ্রিখণ্ডে পূর্ব্বার্দ্ধে ৩৪-৩৬ অধ্যায়ে ব্রহ্মক্ষত্রবংশের পরিচয় আছে।[১৫৯] আশ্চর্য্যের বিষয় এই পুরাণবর্ণিত দাক্ষিণাত্যরাজগণের মধ্যে আমরা বীরসেন প্রভৃতি রাজগণের এইরূপ পরিচয় পাইতেছি—

'সৌমিনী-দেবতাভক্ত শাণ্ডিল্যান্বিক ঋষির গোত্রে 'মহারাজ' নামে একব্যক্তি খ্যাত হইয়াছিলেন, তদনন্তর ভুবশঙ্কর, এই ভুবশঙ্করের বংশে দ্যুমৎসেন নামে এক চক্রবর্ত্তী নৃপতি খ্যাত হইয়াছিলেন, তাঁহার বংশে বীরসেন জন্মগ্রহণ করেন।'[১৬০] পুরাণবর্ণিত এই ভুবশঙ্কর-বংশধর বীরসেন সম্ভবতঃ দেওপাড়া-লিপিতে উক্ত হইয়াছেন। যেন মনে হয় সহ্যাদ্রিখণ্ডবর্ণিত সেনবংশের বীজপুরুষ ভুবশঙ্কর হইতেই গৌড়ের সেনরাজবংশ প্রায় সকলে 'শঙ্কর' উপাধিতে পরিচিত হইয়া থাকিবেন। লক্ষ্মণসেনের তাম্রশাসনে এই ব্রহ্মক্ষত্রিয়গণ কর্ণাটক্ষত্রিয় নামেও পরিচিত হইয়াছেন। কর্ণাটকপ্রদেশ হইতে আবিষ্কৃত শত শত শিলালিপিতে এই ব্রহ্মক্ষত্রিয়-গণের প্রসঙ্গ রহিয়াছে।[১৬১] কর্ণাটক হইতে আবিষ্কৃত কোন কোন শিলালিপিতে 'সেনবর' নামেও ব্রহ্মক্ষত্রিয়বংশের এক শাখা পরিচিত হইয়াছে। এমন কি, কর্ণাটক প্রদেশের অন্তর্গত কদুর জেলায় কোপ্পা তালুকের মধ্যবর্ত্তী শৃঙ্গেশ্বরমন্দিরে খৃষ্টীয় ১৭ম শতাব্দে উৎকীর্ণ শিলালিপিতে এই সেনবরবংশে কেহ কেহ 'ধর্ম্মকরণিক' এবং কোথাও কোথাও 'খচর' বলিয়াও পরিচিত হইয়াছেন।[১৬২] বোম্বাই প্রেসিডেন্সীতে মসিজীবী জাতি অদ্যাপি প্রধানতঃ দুইটী শ্রেণীতে বিভক্ত,—কায়স্থ প্রভু ও ব্রহ্মক্ষত্রী ঠাকুর। ব্রহ্মক্ষত্রী ঠাকুরেরা কেবল তথায় 'ঠাকুর' বলিয়াও খ্যাত।[১৬৩] গুজরাত অঞ্চলে এই মসিজীবী ব্রহ্মক্ষত্রীগণ কোথাও কোথাও মঠাধ্যক্ষতা ও ব্রাহ্মণের ন্যায় পৌরোহিত্যও করিয়া থাকেন। আশ্চর্য্যের বিষয়, স্কন্দপুরাণীয়

(১৫৯) বিংশতি বর্ষপূর্ব্বে বিশ্বকোষ ৪র্থ ভাগ ৩১০ পৃষ্ঠায় এই ব্রহ্মক্ষত্রিয়বংশের উৎপত্তির কথা লিপিবদ্ধ করিয়াছি। প্রয়োজনবোধে সংক্ষেপে পুনরায় এখানে কিছু লিখিত হইল।

(১৬০) "সৌমিনীদেবতাভক্তঃ শাণ্ডিল্যাখ্যঋষেঃ কুলে।
মহারাজ ইতি খ্যাতস্ততোহভূদ্ভুবশঙ্করঃ।
তদন্বয়ে চক্রবর্ত্তী দ্যুমৎসেন ইতীরিতঃ।
তদন্বয়ে বীরসেনঃ কান্তিমালী হতোহপি চ।"
(সহ্যাদ্রিখণ্ড পূর্ব্বার্দ্ধ ৩৪।২৫-২৬ শ্লোক)

(১৬১) Vide B. L. Rice, Epigraphia Karnatica, Vols I—X.

(১৬২) B. L. Rice, Epigraphia Karnatica, Vol. VI. p. 82.

(১৬৩) Bombay Gazetteer, Vol. XVI. p. 43.

সহ্যাদ্রিখণ্ডে প্রভু ও ব্রহ্মক্ষত্রিয়বংশের পরিচয় একত্রই লিপিবদ্ধ হইয়াছে।[১৬৪] প্রভু কায়স্থগণের সহিত ব্রহ্মক্ষত্রিয়গণের একত্র উল্লেখ এবং অদ্যাপি উভয়ের প্রধানতঃ লেখ্য-বৃত্তি, দূর অতীত কাল হইতে কর্ণাটবাসী ব্রহ্মক্ষত্রিয় সেনবংশদিগের মধ্যে করণিকপদ, এ ছাড়া গৌড়াধিপ বল্লালসেনের সহিত উত্তররাঢ়ীয় কায়স্থপ্রবর বটমিত্রকন্যার এবং বল্লাল-পৌত্র দনুজমাধবের সহিত বঙ্গজকায়স্থ পুরবসুর কন্যার বিবাহ হইতেও উক্ত ব্রহ্মক্ষত্রিয় সেনবংশ মূলতঃ চন্দ্রবংশীয় ক্ষত্রিয় বলিয়া পরিচিত হইলেও বহুকাল হইতেই তাঁহাদের মধ্যে কায়স্থবৃত্তি ও কায়স্থসংস্রবই সূচিত হইতেছে। কায়স্থপ্রধান এই বঙ্গদেশে পরে তাঁহারা কায়স্থজাতির সহিত মিশিয়া গিয়া মসিজীবী কায়স্থ জাতিরই এক প্রধান শাখা বলিয়া গণ্য হইয়াছিলেন, তাই আবুল্‌ফজল্ তাঁহার আইন্-ই-অক্‌বরী গ্রন্থে প্রায় সার্দ্ধ তিনশত বর্ষ পূর্ব্বে সেনরাজবংশকে কায়স্থ বলিয়াই নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, কোন কোন কুলগ্রন্থে সেনবংশকে 'অম্বষ্ঠ' বলা হইয়াছে। এদিকে 'সেন' পদ্ধতি কায়স্থ সম্বন্ধে বাচস্পতির বঙ্গজকুলজীসারসংগ্রহে লিখিত আছে যে, 'অম্বষ্ঠের কুলে এক সেনবংশ প্রসিদ্ধ হইয়াছিলেন। সেই বংশ অম্বষ্ঠদেশ হইতে গৌড়ে আসিয়া গৌড়-কায়স্থ বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।'[১৬৫] গরুড়পুরাণে কর্ণাট ও লাটের সহিত এক অম্বষ্ঠ জন-পদের উল্লেখ আছে।[১৬৬] সুতরাং যে স্থান হইতে কর্ণাটক্ষত্রিয় বা ব্রহ্মক্ষত্রিয় সেনবংশ প্রাচ্য-ভারতে আসিয়াছিলেন, সেই কর্ণাটের পার্শ্বে অম্বষ্ঠ নামক এক জনপদ ছিল, এবং এই অম্বষ্ঠ হইতে যে সেনবংশ গৌড়ে আগমন করেন, তাঁহারাই নিজ জন্মভূমির পরিচয়ে অম্বষ্ঠ নামে পরিচিত হইয়া থাকিবেন। দাক্ষিণাত্যের সুদূর দক্ষিণ-পশ্চিম হইতে আসিয়া অম্বষ্ঠ ও কর্ণাটের সেনবংশ বঙ্গে এক জাতি ও এক দেশের লোক বলিয়া পরিচিত হওয়া কিছু বিচিত্র নহে, এই কারণে হয়ত সেনরাজবংশকে অম্বষ্ঠ বা বৈদ্য বলিয়া কেহ কেহ স্থির করিয়া থাকিবেন। বঙ্গের আদিকায়স্থসমাজ-প্রসঙ্গে লিখিয়াছি যে, খৃষ্টীয় ৬ষ্ঠ শতাব্দীতেও বঙ্গদেশে 'সেন' উপাধিধারী শ্রেষ্ঠ কায়স্থ রাজপুরুষ বিদ্যমান ছিলেন।[১৬৭] এদিকে প্রাচীন বৈদ্য-কুলগ্রন্থ

(১৬৪) "পাঠারীয়প্রভূণাং বৈ কথিতো বিস্তরস্তয়া ॥
সূর্য্যবংশাগতাশ্চত্বা ব্রহ্মক্ষত্রিয়নামতঃ।
তেষাং নামানি বংশাশ্চ কথিতাঃ পূর্ব্বতস্তয়া ॥" (সহ্যাদ্রিখণ্ড, পূর্ব্বার্দ্ধ, ৩৬ অঃ)

(১৬৫) "অম্বষ্ঠস্য কুলমেকং সেনবংশপ্রসিদ্ধকম্।
অম্বষ্ঠাদ্‌গৌড়মাসাদ্য ততো গৌড়ঃ প্রকীর্ত্তিতঃ ॥" (দ্বিজ বাচস্পতি)

(১৬৬) "কর্ণাটাঃ কাম্বোজা ঘাণ্টা দক্ষিণাপথবাসিনঃ ॥
অম্বষ্ঠা দ্রবিড়া লাটাঃ কাম্বোজাঃ স্ত্রীমুখাঃ শকাঃ।
আনর্ত্তবাসিনশ্চৈব জ্ঞেয়া দক্ষিণপশ্চিমে ॥"
(গরুড়পুরাণ ৫৫।১৪-১৫ শ্লোক)

(১৬৭) ৪৭ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

হইতেও পাওয়া যাইতেছে যে, পূর্ব্বে রাঢ়ীয়, বারেন্দ্র ও বঙ্গজ এই তিন শ্রেণীর সেন উপাধিধারী অনেক শ্রেষ্ঠ বৈদ্যের সহিত বঙ্গীয় কায়স্থের বৈবাহিক সম্বন্ধ বিরল ছিল না।[১৬৮] এই সকল নানা কারণে ব্রহ্মক্ষত্রিয় সেনরাজবংশ কোথাও বৈদ্য, কোথাও অম্বষ্ঠ, কোথাও বা কায়স্থ বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন। বিক্রমপুরের বৈদ্যবংশীয় ২য় বল্লাল বৈশ্বানরগোত্র ছিলেন, কিন্তু স্কন্দপুরাণীয় সহ্যাদ্রিখণ্ডে ব্রহ্মক্ষত্রিয় বীরসেনবংশ শাণ্ডিল্যকুল বা শাণ্ডিল্যগোত্র বলিয়াই পরিচিত হইয়াছেন।[১৬৯] বর্ত্তমান বৈদ্যসমাজে শাণ্ডিল্যগোত্রীয় সেনবংশের অস্তিত্ব নাই, কিন্তু বঙ্গজ কায়স্থসমাজে শাণ্ডিল্যগোত্রে অদ্যাপি সম্মানিত সেনবংশ বিদ্যমান। প্রসিদ্ধ পুরাতত্ত্ববিদ্ বঙ্গজ-কায়স্থ স্বর্গীয় ডাক্তার রামদাস সেন এই শাণ্ডিল্য সেনবংশ অলঙ্কৃত করিয়া গিয়াছেন এবং তাঁহার পূর্ব্বপুরুষগণ পূর্ব্ববঙ্গ হইতেই রাঢ়ে আগমন করিয়াছিলেন, এরূপ প্রবাদও তাঁহার বংশধরগণমধ্যে প্রচলিত রহিয়াছে। কুলগ্রন্থ হইতেও প্রতিপন্ন হইতেছে যে, বঙ্গের শাণ্ডিল্য গোত্রজ সেন-উপাধিধারী কায়স্থগণ অনেকেই গৌড়াধিপ সেনবংশের দায়াদগণের অধস্তন সন্তান।[১৭০] নিম্নে সেনবংশলতা ও আনুমানিক রাজত্বকাল প্রদত্ত হইল—
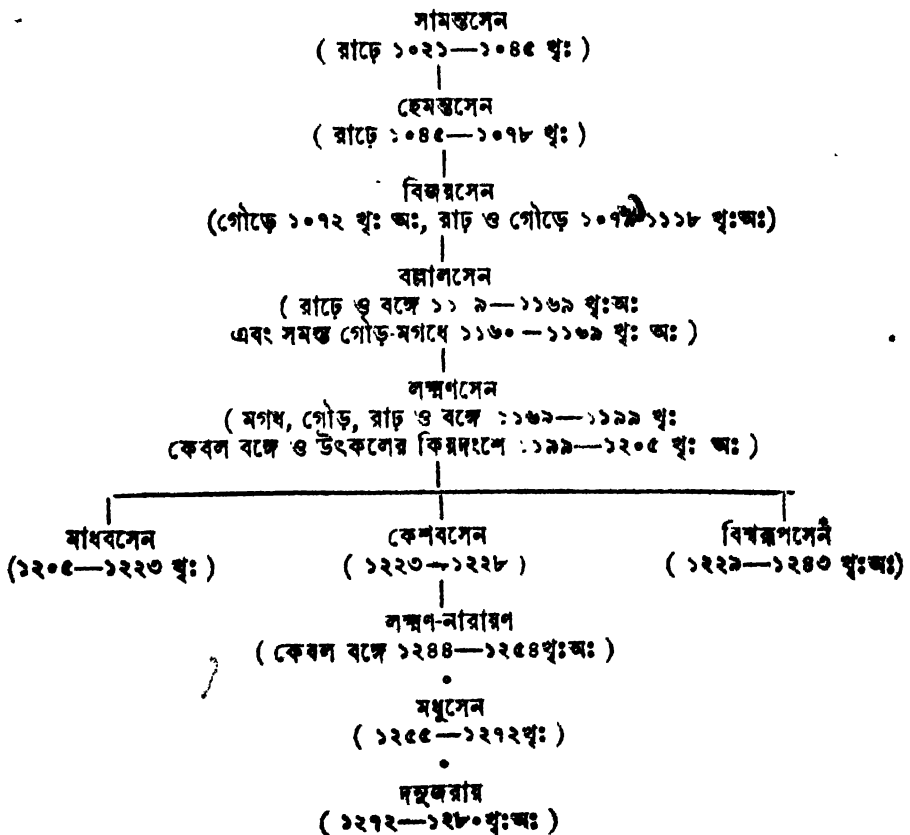
সামন্তসেন
(রাঢ়ে ১০২১—১০৪৫ খৃঃ)
|
হেমন্তসেন
(রাঢ়ে ১০৪৫—১০৭৮ খৃঃ)
|
বিজয়সেন
(গৌড়ে ১০৭২ খৃঃ অঃ, রাঢ় ও গৌড়ে ১০৭৮—১১১৮ খৃঃঅঃ)
|
বল্লালসেন
(রাঢ়ে ও বঙ্গে ১১ ৯—১১৬৯ খৃঃঅঃ
এবং সমস্ত গৌড়-মগধে ১১৬০—১১৬৯ খৃঃ অঃ)
|
লক্ষ্মণসেন
(মগধ, গৌড়, রাঢ় ও বঙ্গে ১১৬৯—১১৯৯ খৃঃ
কেবল বঙ্গে ও উৎকলের কিয়দংশে ১১৯৯—১২০৫ খৃঃ অঃ)
|

মাধবসেন	কেশবসেন	বিশ্বরূপসেন
(১২০৫—১২২৩ খৃঃ)	(১২২৩—১২২৮)	(১২২৯—১২৪৩ খৃঃঅঃ)

কেশবসেন
|
লক্ষ্মণ-নারায়ণ
(কেবল বঙ্গে ১২৪৪—১২৫৪খৃঃঅঃ)
•
মধুসেন
(১২৫৫—১২৭২খৃঃ)
•
দনুজরায়
(১২৭২—১২৮০খৃঃঅঃ)

(১৬৮) বিশ্বকোষ বৈদ্যশব্দ দ্রষ্টব্য। (১৬৯) সহ্যাদ্রিখণ্ড পূর্ব্বার্দ্ধ, ৩৪ ও ৩৬ অধ্যায় দ্রষ্টব্য।
(১৭০) বঙ্গজ কায়স্থকাণ্ডে শাণ্ডিল্যসেনবংশের বিবরণ দ্রষ্টব্য।

পূর্ব্বতন ব্রাহ্মণভক্ত সেনরাজগণ কায়স্থগণকে অতি প্রীতির চক্ষেই দেখিতেন, তাই মহারাজ লক্ষ্মণসেনের সমসাময়িক রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ শূলপাণির 'দীপকলিকা' নাম্নী যাজ্ঞবল্ক্য-টীকায় 'কায়স্থগণ রাজসম্বন্ধপ্রযুক্তপ্রভাবশালী' বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছেন। তাই মহারাজ বিজয়সেনের সভায় কায়স্থপ্রতিষ্ঠা কুলগ্রন্থে বিবৃত হইয়াছে এবং সেনরাজগণের স্ব স্ব তাম্রশাসন হইতেও জানা যায় যে, সকল সেননৃপতিরই সান্ধিবিগ্রহিক ছিলেন কায়স্থ। যে নৃপতির যিনি সান্ধিবিগ্রহিক ছিলেন, তাঁহাদের নাম নিম্নে উদ্ধৃত হইল,—

সেনাধিকারে কায়স্থপ্রভাব

নৃপতির নাম		তাঁহার সান্ধিবিগ্রহিকের নাম
মহারাজ বল্লালসেন	...	হরি ঘোষ
মহারাজ লক্ষ্মণসেন	...	ভানুদত্ত ও নারায়ণ দত্ত
মহারাজ কেশবসেন	...	দত্তোদ্ভব গৌড়মহাভট্টক
মহারাজ বিশ্বরূপসেন	...	কোপিবিষ্ণু

পূর্ব্বেই লিখিয়াছি, বারেন্দ্র কায়স্থ-দাসবংশ পালরাজগণের আশ্রয়ে সামন্তাদি উচ্চপদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তাঁহাদের বংশে বটুদাস জন্মগ্রহণ করেন, তিনি মহারাজ বল্লালসেনের পক্ষাবলম্বন করায় তাঁহার পিতা তাঁহাকে পরিত্যাগ করেন। বল্লালসেন বটুদাসকে বঙ্গের সামন্তপদে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন,[১৭১] তাঁহারই পুত্র শ্রীধরদাস। এই শ্রীধরদাসের সূক্তিকর্ণামৃত হইতে জানা যায় যে, তাঁহার পিতা মহাসামন্তাধিপতি এবং তিনি নিজে এক জন মহামাণ্ডলিক ছিলেন।[১৭২] বঙ্গজ-সমাজে অত্রিগোত্র দাসবংশমধ্যে অদ্যাপি শ্রীধরদাসের বংশধরগণ বিরাজ করিতেছেন।

সেনাধিকারে কায়স্থ সামন্তরাজ

দাসবংশের ন্যায় দেববংশেরও অনেকে সেনাধিকারে সামন্তরাজ্য শাসন করিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের মধ্যে মৌদ্গল্যগোত্র দেববংশের পূর্ব্বপুরুষ রামদেব 'রাঢ়েশ্বর' বলিয়া রাঢ়ীয় কায়স্থ-কুলগ্রন্থে পরিচিত হইয়াছেন।[১৭৩] বটুভট্টের দেববংশ হইতেও রাঢ়েশ্বর শাণ্ডিল্য দেববংশের কতক কতক পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। পূর্ব্বে কর্ণসুবর্ণপ্রসঙ্গে যে কর্ণসেনের পরিচয় দিয়াছি,[১৭৪] তাঁহারই বহুপুরুষ পরে সুরদেব জন্মগ্রহণ করেন। এই সুরদেবের পুত্র দনুজারি দেব ও তৎপুত্র হরিদেব। বটুভট্টের মতে দনুজারি দেবের সহিত গৌড়াধিপ লক্ষ্মণসেনের সৌহৃদ্য ও সম্পর্ক ছিল। দনুজারি কণ্টকদ্বীপের অধিপতি

(১৭১) ২২২ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

(১৭২) বিশ্বকোষ, ৪র্থ ভাগ, ৩১০-১১ পৃষ্ঠা।

(১৭৩) রাজা রাজকৃষ্ণ দেব বাহাদুরের একজাইগ্রন্থ ও বিতাগড়ীনিবাসী ৺জগচ্চন্দ্র ঘটকরাজ-সংগৃহীত রাঢ়ীয় মৌলিককুলপরিচয়।

(১৭৪) ৫৮ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

বা সামন্তরাজ ছিলেন। তিনি মকরন্দ বন্দ্যোর পুত্র দাশরথীকে বন্দ্যঘটী নামক স্থানে পূজা করেন এবং তাঁহার পুত্রগণকে হরিকোটি, নৈহাটি, লাটগ্রাম, পৈড় ও নবচর এই পাঁচখানি গ্রাম প্রদান করিয়াছিলেন। এতদ্ভিন্ন তিনি অগ্রদ্বীপ ও নবদ্বীপে দুইটী মহাকালমূর্ত্তিও প্রতিষ্ঠা করেন। যখন লক্ষ্মণসেন মুসলমানকর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া রাঢ় পরিত্যাগ করেন, তৎকালে দনুজারিও তাঁহার সহিত গিয়াছিলেন। তিনি সসৈন্যে লক্ষ্মণপুত্র মাধব-সেনের পার্শ্বে থাকিয়া মুসলমানদিগের সহিত যথেষ্ট যুদ্ধ চালাইয়াছিলেন। অবশেষে তিনি ভাগী-রথীর পবিত্র সলিলে দেহ বিসর্জ্জন করেন। কণ্টকদ্বীপ মুসলমানের অধীন হইলে তৎপুত্র হরিদেব পাণ্ডুনগরে গিয়া বাস করেন। তৎপুত্র নারায়ণদেব ধর্ম্মজ্ঞ ও ধর্ম্মপালক ছিলেন, কিন্তু রাজ্যশ্রী তৎপ্রতি বিমুখ হন। তাঁহার দুই পুত্র পুরন্দর ও পুরুজিৎ। পুরন্দর সন্ন্যাসা-শ্রম গ্রহণ করেন। পুরুজিতের পুত্র আদিত্য, আদিত্যের দুই পুত্র দেবেন্দ্র ও ক্ষিতীন্দ্র। রণ-চণ্ডীর প্রসাদে দেবেন্দ্র পাণ্ডুনগরের অধিপতি হইয়াছিলেন। দেবেন্দ্রদেবের ঔরসে মহেন্দ্র-দেব জন্মগ্রহণ করেন। তিনি মুসলমানদিগকে দূরীভূত করিয়া এবং কংসকুল নিহত করিয়া-পাণ্ডুনগরের আধিপত্য লাভ করিয়াছিলেন। তৎপুত্র মহাশক্ত মহাবীর দনুজমর্দ্দনদেব গৌড়রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া ভার্য্যাপুত্রসহ গুরুর আদেশে সমুদ্রকূলে চন্দ্রদ্বীপে আসিয়া রাজ-ধানী করেন। মধুমতীর পূর্ব্ব হইতে লৌহিত্য বা ব্রহ্মপুত্রের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত এবং ইছামতী হইতে সমুদ্রকূল পর্য্যন্ত তাঁহার শাসনাধীন হইয়াছিল।[১৭৫]

সুখের বিষয়, বটুভট্ট দেববংশের যেরূপ পরিচয় দিয়াছেন, তাহা সে সময়ের ইতিহাসের বিরোধী নহে। অল্প দিন হইল, গৌড়ের নিকটস্থ পাণ্ডুয়া হইতে মহেন্দ্রদেব ও দনুজমর্দ্দন-দেবের রৌপ্যমুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছে।[১৭৬] এতন্মধ্যে মহেন্দ্রদেবের মুদ্রায় ১৩৩৬ শক এবং দনুজমর্দ্দনদেবের মুদ্রায় ১৩৩৯ শক আছে।[১৭৭] এই উভয় মুদ্রায় "চণ্ডীচরণপরায়ণ" ও "পাণ্ডুনগর" শব্দ আছে। এই পাণ্ডুনগরই অধুনা পাণ্ডুয়া নামে খ্যাত।[১৭৮] উভয় মুদ্রার শক হইতে জানা যায় যে, ১৩৩৬ শকে বা ১৪১৪ খৃষ্টাব্দে মহেন্দ্রদেব এবং ১৩৩৯ শকে বা ১৪১৭ খৃষ্টাব্দে দনুজমর্দ্দন দেব পাণ্ডুনগরে অধিষ্ঠিত ছিলেন। ঐ সময়ের গৌড়ের ইতিহাস আলোচনা করিলে বেশ বুঝা

রাজা গণেশ

যায়, তাঁহাদের অভ্যুদয়ের পূর্ব্বে কিছুকালের জন্য গৌড়মণ্ডল

(১৭৫) বটুভট্টের দেববংশে ২৬ হইতে ৫৫ শ্লোক।

(১৭৬) রঙ্গপুর-সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা ১৩১৭ সন, ৭১ পৃষ্ঠা।

(১৭৭) মুদ্রাবিষ্কারকর্ত্তা ৺রাধেশচন্দ্র শেঠ মহাশয় সহস্রাঙ্কের "১"পাঠ করিতে না পারায় গোলযোগ ঘটাইয়াছেন।

(১৭৮) এই বাইশহাজারী পাঁড়ুয়াকে এক সময়ে আমরা প্রাচীন পৌণ্ড্রবর্দ্ধন বলিয়া মনে করিয়াছিলাম, এখন নবাবিষ্কৃত মুদ্রাসাহায্যে সে অনুমান ব্যর্থ হইতেছে। পাণ্ডুনগরের অপভ্রংশে যে পাণ্ডুয়া হইয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই।

হিন্দুরাজের শাসনাধীন হইয়াছিল। উত্তর বঙ্গে দিনাজপুরের রাজা গণেশের নাম অনেকেই শুনিয়াছেন। দিনাজপুরজেলায় রাইগঞ্জ থানার মধ্যে রাজা গণেশের একতম রাজধানী গণেশপুর বিদ্যমান, এই গণেশপুর হইতে পাণ্ডুয়া পর্য্যন্ত রাজা গণেশ নির্ম্মিত সুপ্রাচীন রাস্তা রহিয়াছে। রাঢ়ীয় কুলগ্রন্থে ইনি 'দত্তখান' নামে পরিচিত।১৭৯ ১৩৮৫ খৃষ্টাব্দে তৎপূর্ব্ববর্ত্তী গৌড়েশ্বর ২য় সাম্‌স্‌উদ্দীন্‌কে নিহত করিয়া রাজা গণেশ গৌড়ের অধীশ্বর হইয়াছিলেন।১৮০ সম্ভবতঃ এই দত্তরাজের অভ্যুদয়কালে মুসলমানের অধীনতা হইতে গৌড়রাজ্য মুক্ত করিবার জন্য পূর্ব্বতন সামন্তবংশধর দেবেন্দ্রদেব ও তৎপুত্র মহেন্দ্রদেব তাঁহার সহায় হইয়াছিলেন এবং গণেশ দত্ত রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হইলে, তাঁহারা প্রথমে তাঁহার সামন্তনৃপতি বলিয়াই গণ্য হইয়া থাকিবেন।

দত্তখান বা দত্তখাস মহাশয়ের প্রকৃত পরিচয় না পাইয়া তাঁহাকে এক সময়ে আমরা মুসলমান-আমলের একজন প্রধান কর্ম্মচারী বলিয়া স্থির করিয়াছিলাম। এখন উত্তররাঢ়ীয় কুলগ্রন্থ ও অপরাপর আনুসঙ্গিক প্রমাণদ্বারা বুঝিতেছি যে, রাজা গণেশ প্রথমে মুসলমান-দরবারে 'দত্তখান্‌' নামে পরিচিত ছিলেন, এই কারণেই ধ্রুবানন্দ, দেবীবর প্রভৃতি কুলাচার্য্যগণ তাঁহাকে 'রাজা দত্তখান্‌' নামেই পরিচিত করিয়াছেন।১৭৯ রাজা গণেশ ২য় সামস্‌উদ্দীন্‌কে বিনাশ করিয়া গৌড়াধিপত্য গ্রহণ করিবার পর তাঁহার সভায় রাঢ়ীয় ও বারেন্দ্র ব্রাহ্মণদিগের আবার অভিনব কুলব্যবস্থা হইয়াছিল১৮১ এবং নানা স্থান হইতে কায়স্থ-কুলীন ও কুলাচার্য্য আসিয়া তাঁহার নিকট সম্মান লাভ করিয়াছিলেন। বলিতে কি মুসলমান-প্রভাবান্বিত ও গূঢ় বৌদ্ধভাবাপন্ন গৌড়মণ্ডলে তাঁহার যত্নে আবার দেবতা ও ব্রাহ্মণের সমাদর এবং বৈদিক ও তান্ত্রিক উভয় সমাজই সম্মানিত হইয়াছিল। মুসলমানরাজপুরুষগণের প্রীতি ও সহানুভূতি-আকর্ষণের জন্য বাহিরে মুসলমানী কায়দা দেখাইলেও তিনি যে অন্তরে চণ্ডীচরণপরায়ণ ছিলেন, তাহা তাঁহার ও তাঁহার হিন্দুবংশধরগণের কীর্ত্তির অবশেষ হইতে বুঝিতে পারা গিয়াছে।১৮২ সম্ভবতঃ তিনি তাঁহার আধিপত্যকালে বহু পূর্ব্ব হইতেই সমাজসম্মানিত কর্ণসেনী দেবেন্দ্র বা তৎপুত্র মহেন্দ্রদেবকে গৌড়ের সর্ব্বপ্রধান সামন্ত বা প্রধান শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করিয়াছিলেন। কিন্তু রাজা গণেশের জ্যেষ্ঠ পুত্র ইস্‌লামধর্ম্মগ্রহণ করিলেও তাঁহার পরলোকের পর সেই ইস্‌লাম-ধর্ম্মাবলম্বীর আধিপত্যলাভের সহিত রাজা গণেশের অভিপ্রেত হিন্দুপ্রাধান্য-প্রতিষ্ঠার উচ্চ

(১৭৯) বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস ব্রাহ্মণকাণ্ড ১মাংশে ও অন্যত্র "দত্তখাস" নামে ইঁহাকে পরিচিত করিয়াছিলাম, কিন্তু মহাবংশের কতকগুলি প্রাচীন পুথি ও তাহার সুপ্রাচীন টীকা হইতে স্পষ্ট 'দত্তখান্‌' নাম পাওয়া গিয়াছে। লিপিকরপ্রমাদে কোন কোন আধুনিক পুথিতে 'খান' স্থানে 'খাস্‌' হইয়াছে, সন্দেহ নাই।

(১৮০) উত্তররাঢ়ীয় কায়স্থকাণ্ডে মহারাজ গণেশ দত্ত খানের সবিস্তার পরিচয় দ্রষ্টব্য।

(১৮১) বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস, ব্রাহ্মণকাণ্ড, ১মাংশ, (২য় সংস্করণ), ১৭১-১৭২ পৃষ্ঠা এবং ২য়াংশ, ৪৮-৪৯ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

(১৮২) উত্তররাঢ়ীয় কায়স্থকাণ্ডে বিস্তৃত বিবরণ দ্রষ্টব্য।

আশা বিলুপ্ত হইয়াছিল। রাজা গণেশের পুত্র মুসলমানধর্মগ্রহণ ও জলাল্ উদ্দীন্ নামে পরিচিত হইলেও গৌড়াধিপ হইয়া প্রথমতঃ তিনি আত্মীয়স্বজনের বিরুদ্ধাচরণ করেন নাই, প্রথম প্রথম তাঁহাদিগের উপযুক্ত সম্মান ও মর্য্যাদারক্ষায় তাঁহার লক্ষ্য ছিল, কিন্তু অল্প দিন পরেই তাঁহার মতি-গতি সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল। তিনি হিন্দু আত্মীয়-স্বজনের প্রতি সেরূপ ভক্তি বা মর্য্যাদা না দেখাইয়া বরং অবহেলা করিতে লাগিলেন, তাহাতে তাঁহারা সকলেই তাঁহার বিদ্বেষী ও শত্রু হইয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। এদিকে জলাল্ ক্রমেই অত্যন্ত প্রজাপীড়ক হইয়া পড়িতে-ছিলেন। তাহার ফলে ১৪০৯ খৃষ্টাব্দে [illegible] জন ক্রীতদাসের হস্তে তিনি গুপ্তভাবে নিহত হইলেন। রাজা গণেশ মুসলমানরাজ্য অধিকার করিবার পর মুসলমান রাজপুরুষগণ সকলেই তাঁহাকে ও তাঁহার বংশধরগণকে সন্দেহ ও বিদ্বেষের চক্ষে দেখিতেন। সুতরাং জলালের রাজত্বকালে হিন্দু ও মুসলমান দুই দল হইয়া নিজ নিজ উদ্দেশ্য-সিদ্ধির জন্য এক এক ব্যক্তিকে খাড়া করিয়া রাজপদ দিবার জন্য প্রস্তুত হইতেছিলেন। সেই সময় হিন্দুগণ রাঢ়ের বহু প্রাচীন রাজবংশধর বীরবর মহেন্দ্রদেবকে এবং মুসলমানেরা সুলতান সাম্‌স্‌-উদ্দীনের পুত্র নাসির-উদ্দীন্‌কে সিংহাসনে বসাইবার চেষ্টা করিতেছিলেন। জলাল্ উদ্দীনের জ্যেষ্ঠ পুত্র (রাজা গণেশের পৌত্র) আহ্মদ শাহ বহু কষ্টে গৌড়ের উত্তরাংশে পিতৃসিংহাসন লাভ করিলেও হিন্দু-রাজপুরুষগণের যত্নে মহেন্দ্রদেবই পাণ্ডুনগরের অধীশ্বর বলিয়া ঘোষিত হইলেন। বলা বাহুল্য, এ সময় আহ্মদশাহের সহিত তাঁহাকে কিছুকাল যুদ্ধ চালাইতে হইয়াছিল। আহ্মদশাহ নিজ রাজপদ-রক্ষার আশায় জৌনপুরাধিপ সুলতান ইব্রাহিমকে আহ্বান করিয়াছিলেন। কিছুকাল যুদ্ধবিগ্রহের পর রাজা মহেন্দ্রদেব কালকবলে পতিত হন। মালদহ হইতে আবিষ্কৃত তাঁহার রৌপ্যমুদ্রা হইতে জানা যায় যে, তিনি ১৩৩৬শক বা ১৪১৪ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত জীবিত ছিলেন।

মহেন্দ্রদেব

তাঁহার মৃত্যুর পর হিন্দু-প্রজাসাধারণ তৎপুত্র দনুজমর্দ্দনদেবকেই পাণ্ডুনগরের সিংহাসনে অভিষিক্ত করিয়াছিলেন, এবং তিনিও স্বাধীন নৃপতিরূপে পাণ্ডুনগর হইতে স্বনামে মুদ্রা-প্রচার করিতে থাকেন। পূর্ব্বেই লিখিয়াছি যে, মালদহ হইতে তাঁহার ১৩৩৯ শক বা ১৪১৭ খৃঃ অব্দে অঙ্কিত মুদ্রা পাওয়া গিয়াছে, আবার সুদূর বরিশাল জেলাস্থ চন্দ্রদ্বীপ হইতেও তাঁহার '১৩৩৯' শকাঙ্কিত মুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছে। চন্দ্রদ্বীপের মুদ্রায় একপৃষ্ঠে 'শ্রীশ্রীদনুজমর্দ্দনদেব' ও তাহার ডান পাশে '১৩৩৯' ও 'চন্দ্রদ্বীপ' এবং অপর পৃষ্ঠে 'শ্রীচণ্ডীচরণপরায়ণ' অঙ্কিত আছে। এ অবস্থায় বলিতে পারা যায় যে, তিনি ৩ বর্ষমাত্র পাণ্ডুনগরে আধিপত্য করিয়া ১৪১৭ খৃষ্টাব্দে ঐ স্থান ছাড়িতে বাধ্য হন এবং ঐ বর্ষেই চন্দ্রদ্বীপে আসিয়া রাজধানী প্রতিষ্ঠা করেন। চন্দ্রদ্বীপের রাজা হইয়া তিনি এখানকার কায়স্থ-সমাজের গোষ্ঠীপতি হইয়াছিলেন। দ্বিজ বাচস্পতির বঙ্গজ-কুলজীসারসংগ্রহে লিখিত আছে—

দনুজমর্দ্দন দেব

"দনুজমর্দ্দন১৮৩ রাজা চন্দ্রদ্বীপপতি।
সেই কৈল বঙ্গজ কায়স্থগোষ্ঠীপতি ॥
দেবপদ্ধতিতে হোমমহিমা অপার।
সমাজ করিতে রাজা হৈলা চিন্তাপর ॥
গৌড় হতে আনিলা কায়স্থ-কুলপতি।
কুলাচার্য্য আনাইয়া করাইল স্থিতি ॥"

চন্দ্রদ্বীপে রাজা দনুজমর্দ্দনদেবের সভায় বঙ্গজ কুলীন কায়স্থগণের সমীকরণ হইয়াছিল।১৮৪ এতদ্ভিন্ন তিনি বল্লালসেনের ন্যায় মাত্র ২৭ ঘরকে প্রকৃত কায়স্থ বলিয়া গণ্য করেন। তাঁহার সমাজসংস্কার উপলক্ষে দ্বিজ বাচস্পতি লিখিয়াছেন,—'বসু, ঘোষ, গুহ, মিত্র, দত্ত, নাগ, নাথ, দাস, সেন, কর, দাম, পালিত, চন্দ্র, পাল, রাহা, ভদ্র, ধর, নন্দী, দেব, কুণ্ড, সোম, রক্ষিত, অঙ্কুর, সিংহ, বিষ্ণু, আঢ্য ও নন্দ এই ২৭ ঘর বংশসম্মানহেতু প্রকৃত কায়স্থ বলিয়া প্রতিষ্ঠিত হইলেন, এতদ্ভিন্ন রাজপুত্র হইলেও অপরে প্রকৃত (বঙ্গজ) কায়স্থ নহে।'১৮৫

দ্বিজ বাচস্পতির উদ্ধৃত বচন হইতে প্রমাণিত হইতেছে যে, রাজা দনুজমর্দ্দনদেবের সময় পর্য্যন্ত গৌড় ও বঙ্গের কায়স্থ-সমাজে কতকটা সম্বন্ধ ছিল, তৎকালেও কুলাচার্য্যগণ কেহ কেহ গৌড়ে অবস্থান করিতেছিলেন। রাজা দনুজমর্দ্দনদেব তাঁহাদিগকে আনাইয়া চন্দ্রদ্বীপে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। এই সময় হইতেই চন্দ্রদ্বীপ-সমাজের প্রাধান্য ঘোষিত হইল। গৌড়াধিপ বল্লালসেনের সময় গৌড়মণ্ডলের কায়স্থসমাজে শ্রেণিবিভাগ ঘটিলেও মহারাজ দনুজমর্দ্দন দেবের সময় হইতেই প্রকৃত প্রস্তাবে রাঢ় ও বঙ্গের কায়স্থসমাজ সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র হইয়া পড়িলেন।১৮৬

(১৮৩) মূল পুথি হইতে নকলকারীর দোষে এক স্থানে 'দনুজমর্দ্দন' স্থানে 'দনুজমাধব' পাঠ পাইয়া ভ্রমক্রমে পূর্ব্বে দনুজমাধব সেন ও দনুজমর্দ্দনদেবকে অভিন্ন বলিয়া লিপিবদ্ধ করিয়া ছিলাম, এখন উভয়ে ভিন্ন বংশীয় ও ভিন্ন সময়ের লোক বলিয়াই প্রতিপন্ন হইতেছেন।

(১৮৪) বঙ্গজ-কায়স্থ-কাণ্ডে সমীকরণের বিস্তৃত ইতিহাস দ্রষ্টব্য।

(১৮৫) "বসুর্ঘোষো গুহো মিত্রঃ দত্তনাগৌ চ নাথকঃ।
দাসঃ সেনঃ করো দামঃ পালিতশ্চন্দ্রপালকৌ।
রাহা ভদ্রো ধরো নন্দী দেবকুণ্ডশ্চ সোমকঃ।
রক্ষিতোঽঙ্কুরসিংহশ্চ বিষ্ণুরাঢ্যশ্চ নন্দকঃ।
তে সপ্তবিংশতিকায়স্থাঃ বংশহেতুঃ প্রতিষ্ঠিতাঃ।
এতদ্ভিন্না রাজপুত্রা ন কায়স্থাঃ কদাচন।" (দ্বিজ বাচস্পতি)

(১৮৬) বঙ্গজ কায়স্থকাণ্ডে চন্দ্রদ্বীপ-রাজবংশ ও চন্দ্রদ্বীপসমাজের বিস্তৃত বিবরণ দ্রষ্টব্য।

প্রথমাংশ সমাপ্ত

বর্ণানুক্রম-নাম-সূচী

(পৃঃ = পৃষ্ঠা, পা = পৃষ্ঠার পাদটীকা)